

তাওহীদে মূলনীতি

১ম খন্ড



আহমাদ মুসা জিবরিল

ତାତ୍ତ୍ୱିକ ମୂଲ୍ୟନୀତି

ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ



ଆହମାଦ ମୁସା ଜିତାବିଲ

তাওহীদ মূলনীতি

[প্রথম খন্ড]

আহমাদ মুসা জিবরিল

অনুবাদ

ইলমহাউস অনুবাদক টিম

অনুবাদ নিরীক্ষণ ও তথ্যসূত্র সংযোজন

শাইখ মুনীরুল ইসলাম ইবনু যাকির



তাত্ত্বিক মূলনীতি

[প্রথম খণ্ড]

প্রথম সংস্করণ

সফর ১৪৪৯ হিজরি, নভেম্বর ২০১৮

গ্রন্থস্বত্ব © ইলমহাউস পাবলিকেশন ২০১৮

সর্বস্বত্ব ইলমহাউস পাবলিকেশন কর্তৃক সংরক্ষিত

ISBN: 978-984-8041-12-3



প্রকাশক

ইলমহাউস পাবলিকেশন

ফোন : +৮৮ ০১৮২৮৬১৬০৬৭

www.facebook.com/IlmhouseBD

পৃষ্ঠাসজ্জা, মুদ্রণ ও বাঁধাই সহযোগিতায়

বই কারিগর ০১৯৬ ৮৮ ৪৪ ৩৪৯

নির্ধারিত মূল্য: ৩৬০ টাকা

Tawhider Mulniti (Principles Of Monotheism), Based on the lecture series
'Explanation of The Three Fundamental Principles' by Shaikh Ahmad Musa Jibril.

Published by Ilmhouse Publication. First Edition, November 2018.

উৎসর্গ

বিশুদ্ধ তাওহিদের পথের পথিকদের প্রতি.....

সূচী পত্র

পূর্বকথা		১৭
লেখক পরিচিতি		২২
ভূমিকা	ইলম অর্জন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া	২৫
	ইলম অর্জনের তিন পদ্ধতি	২৭
	সালাফদের নিয়ম ছিল ইলম লিখে রাখা	২৮
	আল উসুল আস-সালাসাহ	২৯
দারস-১	বাসমালাহ	৩০
	বাসমালাহ-এর মাঝে নিহিত তাওহিদের শিক্ষা	৩০
	তাওহিদুর রুবুবিয়াহ	৩১
	তাওহিদুল আসমা ওয়াস সিফাত	৩১
	বাসমালাহ-এর ভাষাতাত্ত্বিক কিছু নিয়ম	৩২
	প্রথম নিয়ম	৩২
	দ্বিতীয় নিয়ম	৩৩
	বাসমালাহ দিয়ে শুরু করার দলিল	৩৪
	এটি কুরআনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ	৩৪
	রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চিঠির শুরু করতেন	
	বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম দিয়ে	৩৪
	বাসমালাহ-এর ব্যাপারে একটি দুর্বল হাদিস	৩৫
	বাসমালাহ-এর বারাকাহ	৩৬
দারস-২	বিসমিল্লাহ নাকি বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম?	৩৮
	আল্লাহ	৪২
	আল্লাহ এক অনন্য নাম	৪৪

শুধু 'আল্লাহ' শব্দে কোনো যিকির নেই	৪৫
যে পবিত্র নামের অনুগামী অন্য সব নাম	৪৫
আল্লাহ নামের মাঝে নিহিত তাওহিদ	৪৬
আল্লাহ এক পরাক্রান্ত নাম	৪৬
আর রাহমান আর-রাহীম	৪৮
আর-রাহমান ও আর-রাহীম	৫০
আল্লাহ ﷻ-এর রাহমাহ	৫৩
আল্লাহ ﷻ-এর রাহমাহ অর্জন	৫৬
দারস-৩	
ই'লাম রাহিমাকাল্লাহ	৫৯
ইলমের গুরুত্ব	৫৯
ইলম ছাড়া কোনো নেতৃত্ব, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নেই	৬৩
ইলমের সংজ্ঞা	৬৫
মানুষ ছাড়া অন্য কিছুকে কি শেখানো সম্ভব?	৬৫
নিজের চেয়ে অধিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে	
উদ্দেশ্য করে কি ই'লাম বলা যাবে?	৬৮
ইলমের স্তর	৬৯
ইলমের মর্যাদা	৭১
সালাফদের সময়ের আলিম	৭৭
জাবির এবং আবু আইয়ূব (রাহিমাল্লাহু আনহুম)	৭৭
মুহাম্মাদ বিন হাসান আশ-শাইবানি	
ও আসাদ ইবনুল ফুরাত	৭৯
সাইদ ইবনু মুসাইয়্যিব, আর-রাযি ও আল-বুখারি	৮০
ইমাম নাওয়াউয়ী, লিসানুদ দ্বীন, ইবনুল খাতীব	
ও মুয়ায ইবনু জাবাল (রাহিমাল্লাহু আনহু)	৮২
সুলাইমান ইবনু আবদিল মালিক	
এবং আতা ইবনু আবি রাবাহ	৮৪
আল-কাসামি ও খলিফাহ হারুনুর রশিদের ছেলেরা	৮৫

আশ-শাফে'ঈ ও ইবনুল জাওযী	৮৬
রাহিমাকাল্লাহ	৮৬
একজন কাফিরকে উদ্দেশ্য করে কি	
রাহিমাকাল্লাহ বলা যাবে?	৮৭
লেখক কেন শুরুতে ই'লাম রাহিমাকাল্লাহ বললেন?	৮৯
দারস-৪	
চারটি বুনিয়াদি বিষয়	৯৫
ওয়াজিবের সংজ্ঞা কী?	৯৫
ওয়াজিব আর ফরয কি আলাদা?	৯৬
যারা ওয়াজিব ও ফরযকে	
সমার্থক মনে করেন, তাঁদের দলিল	৯৬
যারা ওয়াজিব ও ফরযকে	
আলাদা মনে করেন, তাঁদের দলিল	৯৯
এ মতপার্থক্যের ফল কী?	১০১
ইসলামি জ্ঞানের শাখাগুলো পরস্পর সংযুক্ত	১০৩
লেখক ওয়াজিব বলতে কী বুঝিয়েছেন?	১০৪
আল্লাহ ﷻ-এর সাথে সম্পর্কিত জ্ঞান	১০৪
ফারযুল আইন	১০৫
ফারযুল কিফায়াহ	১০৫
ইলম, আমল, বিরত থাকা	
ও বিশ্বাসের ব্যাপারে ফারযুল আইন	১০৬
আল্লাহ ﷻ-এর সাথে সম্পর্কিত	
জ্ঞানের ব্যাপারে ফারযুল আইন	১০৬
বিরত থাকার ক্ষেত্রে ফারযুল আইন	১০৭
বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ফারযুল আইন	১০৮
চারটি আবশ্যক বিষয়	১০৮
মাসআলার সংজ্ঞা	১০৯
প্রথম বুনিয়াদি বিষয়—ইলম	১১০
আল্লাহ ﷻ-কে জানা	১১০

মা'রিফাতুল্লাহ	১১০
হালাল ও হারামের ব্যাপারে জ্ঞান	১১২
মা'রিফাতুল্লাহর গুরুত্ব	১১২
আল্লাহ ﷻ-এর ব্যাপারে জ্ঞান হলো সর্বোচ্চ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান	১১৩
মা'রিফাতুল্লাহর ব্যাপারে অজ্ঞতা	১১৬
নবি মুহাম্মাদ ﷺ-কে জানা	১১৮
ইসলামকে জানা	১২১
ইসলামের সংজ্ঞা	১২১
আল্লাহ ﷻ-এর কাছে গ্রহণযোগ্য একমাত্র ধীন হলো ইসলাম	১২১
ইসলামে আমলের ভিত্তি	১২৫
দারস-৫	
ইলমের সংজ্ঞার ক্রমধারা	১২৬
আল্লাহ ﷻ, নবি মুহাম্মাদ ﷺ ও ধীন ইসলাম সম্পর্কে দলিলসহ জানা	১২৬
আকিদাহর ক্ষেত্রে তাকলিদ	১২৮
প্রথম মত—দলিল জানতে হবে	১২৯
দ্বিতীয় মত—দলিল জানা বাধ্যতামূলক না	১২৯
তৃতীয় মত—দলিল প্রমাণ জানার চেষ্টা করা হারাম	১২৯
প্রথম দুটি মতের সারসংক্ষেপ	১৩০
আকিদাহর ক্ষেত্রে তাকলিদ জায়েজ হবার প্রমাণ	১৩১
দ্বিতীয় বুনিয়াদি বিষয়—ইলমের ওপর আমল করা	১৩৫
আমলের শ্রেণিবিভাগ	১৩৫
হারাম থেকে বিরত থাকার কারণে কি মানুষ পুরস্কৃত হবে?	১৩৫
ইলম প্রয়োগের অপরিহার্যতা	১৩৬
যে ব্যক্তির আমল তার ইলমের সাথে মেলে না	১৩৮

	ব্যক্তি তার ইলমের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে	১৩৯
	ব্যক্তি নিজে যা করে না, তা বলা	১৩৯
	অনুপকারী ইলম	১৪০
দারস-৬	অপ্রয়োজনীয় ইলম	১৪৬
	ইলম ও আমলের পার্থক্য	১৪৬
	ইলম নাযিলের উদ্দেশ্য আমল	১৪৭
	ইলমের ওপর আমল না করার পরিণাম	১৪৯
	জবাবদিহিতার ভয়ে ইলম অন্বেষণ পরিত্যাগ করা অনুচিত	১৫১
	ইলমসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য বিচারের মাপকাঠি ভিন্ন	১৫৩
	ইলমের ওপর আমলের উদাহরণ	১৫৬
	ওলামায়ে সু	১৫৯
	ওলামায়ে সু কারা?	১৫৯
	দাওয়াহর ক্ষেত্রে ইলম অনুযায়ী আমল করা	১৬৩
	ইবনুল জাওযী ও তাঁর শাইখগণ	১৬৩
	স্রষ্টা কিংবা সৃষ্টি, কারও সামনেই নিজেকে নিয়ে অহমিকায় ভুগবেন না	১৬৫
দারস-৭	দাওয়াহ কি ফারযুল আইন নাকি ফারযুল কিফায়াহ?	১৬৮
	বিশদ ইলম অর্জন করা ফারযুল কিফায়াহ	১৬৮
	দাওয়াহ প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব	১৭০
	পরিপূর্ণ ইলম অর্জনের আগে কি দাওয়াহ বন্ধ রাখা উচিত?	১৭২
	আল্লাহ ﷻ-এর ব্যাপারে না জেনে কথা বলার বিপদ	১৭৪
দারস-৮	দাওয়াহর অজুহাতে গুনাহয় লিপ্ত হবেন না	১৮১

	পাপাচার ছড়িয়ে পড়লে	
	সবার ওপরে এর প্রভাব পড়ে	১৮৫
	দাওয়াহর সঠিক পদ্ধতি জানতে হবে	১৮৮
	দাওয়াহর প্রমাণপঞ্জি	১৯১
	মানুষকে আল্লাহ ﷻ-এর দিকে আহ্বান করুন	
	ইলমের সাথে	১৯১
	দাওয়াহ আমাদের গর্ব	১৯২
	উঠুন, সতর্ক করুন	১৯৪
	একজন মানুষকে হিদায়াতের ওপর আনার মূল্য	১৯৫
	উহুদ ও তাইফের দিবস	১৯৬
	শ্রোতার জ্ঞান ও অবস্থা অনুযায়ী দাওয়াহ	১৯৯
দারস-৯	দাওয়াহর ক্ষেত্রে প্রয়োজন হিকমাহর	২০৪
	দাওয়াহ হবে সর্বোত্তম আচরণের সাথে	২০৪
	হিকমাহর অর্থ ইসলামের ব্যাপারে ছাড় দেয়া না	২০৬
	দাওয়াহর ক্ষেত্রে রাহমাহ	২০৮
	কঠোরতাও হিকমাহর অন্তর্ভুক্ত	২১৭
	মুদারাহ ও মুদাহানাহর মধ্যে পার্থক্য	২২৫
	সালাফদের দাওয়াহর উদাহরণ	২২৬
	দাওয়াহ ইল্লাল্লাহর ব্যাপারে উপসংহার	২৩২
দারস-১০	চতুর্থ বুনিয়াদি বিষয় : সবর	২৩৩
	সবর একজন দা'ঈর অপরিহার্য গুণ	২৩৪
	সবরের প্রতিদান	২৩৫
	সবরের সংজ্ঞা	২৪০
	অভিযোগ কি সবরকে বাতিল করে দেয়?	২৪১
	সবরের প্রকারভেদ	২৪৩
	আল্লাহ ﷻ কেন আমাদের পরীক্ষা করেন?	২৪৪

পরীক্ষা নেই এমন জীবনের প্রত্যাশা করবেন না	২৪৭
কুরআনে পরীক্ষা-সংক্রান্ত কিছু আয়াত	২৫৪
একজন দা'ঈ তার কঠিনতম মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি আশাবাদী হবে	২৬১

দারস-১১

সত্যের পথ দুঃখ-কষ্ট ঘেরা	২৬৭
পরীক্ষা গুনাহ থেকে পরিশুদ্ধির উপায়	২৭১
নিয়্যাতির গুরুত্ব	২৭৪
সত্যের ওপর দৃঢ় থাকুন একাকী হলেও	২৭৭
কুরআনে সংখ্যাগরিষ্ঠদের তিরস্কার করা হয়েছে	২৭৮
কুরআনে অল্পসংখ্যকদের প্রশংসা করা হয়েছে	২৭৯
আল্লাহ ﷻ তো সবকিছু জানেন, তারপরও কেন আমাদের পরীক্ষা করেন?	২৮০
মুমিনের জন্য সবকিছুই কল্যাণকর	২৮৩
কষ্টদায়ক কথার বিপরীতে সবার করুন	২৮৪
পরীক্ষার মুখোমুখি হলে তাওবাহ করুন, আল্লাহ ﷻ-এর রহমতের প্রত্যাশী হোন	২৮৭
দাওয়াহর পথে সবরের রয়েছে বিশেষ মর্যাদা	২৯১
শাইখ মুসার কিছু প্রজ্ঞাময় বাণী	২৯২
উপসংহার	২৯৬

দারস-১২

ভূমিকা	২৯৯
‘আসর’ অর্থ	৩০১
প্রথম অভিমত : শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ সময়	৩০১
দ্বিতীয় অভিমত : নবি মুহাম্মাদ ﷺ এর যুগ	৩০২
তৃতীয় অভিমত : দিনের শেষাংশ	৩০২

	চতুর্থ অভিমত : সালাতুল আসর বা	
	আসরের সালাতের ওয়াক্ত	৩০৫
	নির্বাচিত অভিমত	৩০৫
	আল-আসরের গুরুত্ব	৩০৯
	কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে শপথ	৩১০
	কেন কুরআন ও সুন্নাহয় শপথের কথা এসেছে	৩১২
	মানুষের শপথ	৩১৪
দারস-১৩	সময়ের অপচয় করবেন না	৩১৭
	শপথের মূল বিষয়বস্তু	৩১৯
	মানবজাতি ক্ষতিতে নিমজ্জিত	৩১৯
	খুসর কেন নাকিরাহ (অনির্দিষ্ট)	
	হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে	৩২০
	আল্লাহ ﷻ 'আলা' (على) এর বদলে	
	'ফি' (فى) ব্যবহার করেছেন	৩২০
	এই সূরার সাথে সংশ্লিষ্ট	
	বাস্তব জীবনের কিছু উদাহরণ	৩২১
	ক্ষতির বিভিন্ন মাত্রা	৩২৭
	কেন সূরাতে প্রথমে সর্বজনীন ঘোষণার পর	
	নির্দিষ্ট করা হয়েছে?	৩২৭
	আল্লাহ ﷻ মানবজাতির ক্ষতিগ্রস্ত হবার কারণ	
	উল্লেখ করেননি	৩২৯
	যারা ঈমান আনে	৩৩০
	ঈমান ইলম থেকে উৎসারিত	৩৩০
	এই আয়াতে ঈমানের তাৎপর্য	৩৩১
	আল্লাহ ﷻ কেন সবিস্তারে	
	ঈমানের আলোচনা করলেন না	৩৩১
	আল্লাহ ﷻ-এর নির্দেশ মেনে চলা	৩৩১
	যারা সংকর্ম করে	৩৩৩

ঈমানের শর্ত আমল	৩৩৩
ঈমানবিহীন আমল	৩৩৬
সর্বপ্রকার নেক আমল এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত	৩৩৮
হক ও সবর-সংক্রান্ত কিছু নাসীহাহ	৩৩৯
দাওয়াহ কারও একচেটিয়া অধিকার নয়	৩৪০
পরামর্শ দান একটি সামষ্টিক প্রচেষ্টা	৩৪০
হক হলো কুরআন ও সুন্নাহ	৩৪১
সবর	৩৪২
সম্পূর্ণ সূরাব্যাপী সবরের শিক্ষা নিহিত	৩৪২
সর্বপ্রকার ধৈর্য 'সবর'-এর অন্তর্ভুক্ত	৩৪২
আশ-শাফে'ঈ এর বক্তব্য	৩৪৫
দারস-১৪	
বুখারি থেকে উদ্ধৃত অধ্যায়ের শিরোনাম	৩৪৮
বুখারির শিরোনামকে দলিল সাব্যস্তকরণের কারণ	৩৫০
আমলের আগে ইলম	৩৫২
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ	৩৫৩
রাসূল ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে নাযিলকৃত আয়াত কি	
আমাদের জন্যও প্রযোজ্য?	৩৫৪
উসূল আস-সালাসাহ পুস্তিকার গঠন-বিন্যাস	৩৫৫

পূর্ববৃত্তান্ত

সকল প্রশংসা আল্লাহ ﷻ-এর, যিনি আসমান ও যমিনের একচ্ছত্র অধিপতি, যিনি অনন্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়নকারী, যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু, যিনি তাওবাহ কবুলকারী, যিনি শাস্তি প্রদানে অত্যন্ত কঠোর, যিনি অতীব দানশীল। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, অমুখাপেক্ষী, অপ্রতিরোধ্য, সার্বভৌম। তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমরা তাঁর কাছ থেকেই এসেছি এবং তাঁর কাছেই আমাদের চূড়ান্ত গন্তব্য।

সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবার ও তাঁর সাহাবি রাহিমুল্লাহ-দের ওপর।

বিভিন্ন ব্লকবাস্টার সিনেমা, বেস্টসেলার নভেল এমনকি ছোটকালের শোনা রূপকথাগুলোর মধ্যে একটি কমন থিম দেখতে পানেন। ভালো ও মন্দের চিরন্তন যুদ্ধ। ইসলামও আমাদের কাছাকাছি ধরনের একটা ধারণা দেয়। তবে মানুষের কল্পনায় গড়ে ওঠা গল্পের সাথে ইসলামের জানানো এ সত্যের কিছু পার্থক্য আছে। ইসলাম ভালো ও মন্দের এ লড়াইকে চিরন্তন বলে না। এর শুরুটা আমাদের পিতা আদম আলয়হিস সালাম-এর সৃষ্টির সময় থেকে। আর এ লড়াই চলবে কিয়ামতের আগ পর্যন্ত। মানব ইতিহাসের সূচনালগ্ন থেকে আমাদের প্রকাশ্য শত্রু নিরন্তর যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। তার উদ্দেশ্য— আমাদের মধ্য থেকে যত বেশিজনকে সম্ভব তার সাথে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া। নানাভাবে মানুষকে পিরাতুল মুস্তাকিম থেকে, সত্য থেকে বিচ্যুত করা। যুগে যুগে মানুষ ও জিনজাতির অনেকেই এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আর-রাজীম ইবলিশের অনুসারী হয়েছে।

অন্যদিকে আল্লাহ সব্ব্বান যুগে যুগে তাঁর বান্দাদের মাধ্যমে আমাদের সামনে সুস্পষ্টভাবে সত্যকে উপস্থাপন করেছেন। আমাদের সতর্ক করেছেন এ যুদ্ধের বাস্তবতা এবং আখিরাতের পরিণতি সম্পর্কে। অবহিত করেছেন মানব অস্তিত্বের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে। একইসাথে কীভাবে আমরা নিজেদের রক্ষা করতে পারব তার পুঙ্খানুপুঙ্খ দিকনির্দেশনা তিনি আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং একদিকে বিতাড়িত শয়তান এবং মানুষ ও জিনজাতির মথ্যেকার তার

অনুসারীরা যুদ্ধ করছে আমাদের সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করতে। অন্যদিকে আর-রাহমানের বান্দারা যুদ্ধ করছেন আমাদের আল্লাহ ﷻ-এর আনুগত্য ও সত্যের ওপর দৃঢ় ও অবচল রাখতে। আর-রাহমানের এ বান্দাদের মধ্যে অগ্রগামী হলেন নবি ও রাসূল আলাইহিস সালাম। ওয়াস সালামগণ। আর মূল যে বিষয়টির শিক্ষা দিয়ে আল্লাহ ﷻ তাঁদের পাঠিয়েছেন তা হলো তাওহিদ, যার স্তম্ভ হলো দুটি। কুফর বিত তাগুত ও ঈমান বিল্লাহ। সকল তাগুত, সকল মিথ্যা উপাস্যকে প্রত্যাখ্যান করা ও এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ ﷻ-কে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করা। এটিই হলো মানবজাতির ওপর প্রথম ফারযিয়াত, প্রথম দায়িত্ব।

আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

প্রত্যেক জাতির কাছে আমি রাসূল পাঠিয়েছি (এ সংবাদ দিয়ে) যে, আল্লাহর ইবাদত করো আর তাগুতকে বর্জন করো। অতঃপর আল্লাহ তাদের মধ্যে কতককে সৎপথ দেখিয়েছেন, আর কতকের ওপর অবধারিত হয়েছে গোমরাহী, অতএব জমিনে ভ্রমণ করে দেখো, সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণতি কী ঘটেছিল! (সূরা আন-নাহল, ৩৬)

এবং তিনি ﷻ বলেন :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا

অতএব, যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত রশি আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়। (সূরা আল-বাকারাহ, ২৫৬)

যারা আল্লাহ ﷻ ব্যতীত অন্য কিছু ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করে, যারা আল্লাহ ﷻ ব্যতীত অন্য কোনো সত্তার আনুগত্য করে তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং তাদের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করাও এই তাওহিদের অংশ। আল্লাহ ﷻ বলেন :

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

তোমাদের জন্য ইব্রাহিম ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। তাঁরা তাঁদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদাত করো তার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের অস্বীকার করি; তোমাদের ও

আমাদের মধ্যে শুরু হলো শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য, যদি না তোমরা এক আল্লাহয় ঈমান আনো। (সূরা আল-মুমতাহিনা, ৪)

অতএব প্রত্যেক নবি-রাসূল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের মিশন ছিল এক ও অভিন্ন। সমস্ত মিথ্যা ইলাহকে প্রত্যাখ্যান ও এক আল্লাহ ﷻ-এর ইবাদতের শিক্ষা দেওয়া। শিরক ও শিরকের অনুসারীদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা। তাওহিদের শিক্ষা দেওয়া। এটিই ইসলামের মূল ভিত্তি। তাওহিদ ছাড়া ইসলাম হয় না। যার তাওহিদ নেই তার কিছুই নেই। পাহাড়সম আমল ও তাওহিদ ছাড়া মূল্যহীন। তাওহিদ হল সকল মূলনীতির চূড়ান্ত মূলনীতি। কিন্তু দুঃখজনকভাবে আজ একদিকে সমাজের বিশাল একটি অংশের কাছে ইসলাম অবহেলিত। অন্যদিকে যারা ইসলামকে আঁকড়ে রাখার চেষ্টা করেন তাওহিদের বদলে আজ তারা বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান ও মতপার্থক্য নিয়ে ব্যস্ত। শেকড়কে তুলে আজ শাখা-প্রশাখার দিকে আমাদের সব মনোযোগ। অন্তর বিগলিত করা, পিতা-মাতা কিংবা স্বামী-স্ত্রীর অধিকার, ইতিহাস, বিশ্লেষণ কিংবা নানা ফিকহি মতপার্থক্য-বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা আমরা দেখছি। 'আল্লাহ আছেন কি নেই' এ প্রশ্ন নিয়েও আমরা আলোচনা করছি। কিন্তু আল্লাহ ﷻ-এর প্রতি আমার দায়িত্ব কী? আমার কাছ থেকে আল্লাহ ﷻ কী চাচ্ছেন-সেটা নিয়ে আলোচনা বিরল। আল্লাহ ﷻ-এর প্রতি বিশ্বাসের শর্ত কী, কীভাবে এ বিশ্বাস পূর্ণ হবে-সেই বিশুদ্ধ তাওহিদ নিয়ে পর্যাাপ্ত আলোচনা নেই।

এই শূন্যস্থান পূরণের ইচ্ছা থেকেই শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল হাফিয়াহুল্লাহ-এর শারহুল উসূল আস-সালাসাহ (Explanation Of The Three Fundamental Principles) নামের লেকচার সিরিযটি (যা 'তাওহিদ সিরিয' নামে অধিক পরিচিত) বাংলায় অনুবাদ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। শাইখ আহমাদ বর্তমান সময়ের ওইসব বিরল সত্যপন্থী আলিমদের একজন যারা বিশুদ্ধ তাওহিদকে আঁকড়ে আছেন। যাদের কথা ও কাজ সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যারা কেবল মুখে সালাফ আস-সালাহিনের অনুসরণের কথা বলেন না; বরং তা করে দেখান। শাইখের তাওহিদের সিরিয এখনো পর্যন্ত ইংরেজি ভাষায় এ বিষয়ে উপস্থাপিত সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও বিস্তারিত আলোচনাগুলোর অন্যতম। এ আলোচনাতে তিনি শুধু তাত্ত্বিকভাবে তাওহিদের শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করেননি, বরং এর বাস্তব প্রয়োগ এবং আমাদের বর্তমানের সাথে এর সম্পর্কেও তুলে ধরেছেন। শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলের এ লেকচার সিরিযে জীবন্ত হয়ে উঠেছে নবি-রাসূল আলাইহিস সালামগণ ও সালাফ আস-সালাহিন ﷺ-এর শিক্ষার ওপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠ মহান সংস্কারক ইমাম ওয়াল মুজাদ্দিদ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব ﷺ-এর দাওয়াহর মূল নির্ঘাস। প্রায় দীর্ঘ এক বছরের চেষ্টা এবং বিভিন্ন চড়াই-উতরাইয়ের পর শেষ পর্যন্ত বইটির প্রথম খণ্ড মলাটবদ্ধ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব ﷺ-এর রচিত পুস্তিকা উসূল আস-সালাসাহ নিয়ে ব্যাখ্যামূলক এ আলোচনাকে শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলে চারটি অধ্যায়ে ভাগ করেছেন। এই চারটি অধ্যায়ের প্রথমটি নিয়েই 'তাওহিদের মূলনীতির' এর প্রথম খণ্ড। শাইখের লেকচার সিরিযের প্রথম টেক্সটটি

দারসের আলোচনা এই খণ্ডে উঠে এসেছে। ইন শা আল্লাহ বাকি খণ্ডগুলোও যথাশীঘ্র পাঠকের সামনে উপস্থাপন করা হবে বিইয়নিম্নাহ।

অনুবাদের ক্ষেত্রে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে শাইখ আহমাদের মূল আলোচনা ও বক্তব্যকে কোনোরকম পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও বিয়োজন ছাড়াই উপস্থাপন করার। মূল লেকচার চলাকালীন উপস্থিত ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলা শাইখের অল্প কিছু কথা অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনায় বাদ দেয়া হয়েছে। যুক্ত করা হয়েছে শাইখের দেয়া উদ্ধৃতিগুলোর রেফারেন্স (তাকরীজ) এবং প্রয়োজনীয় টীকা। আমরা আশা করি এ বইটি বাংলা ভাষায় তাওহিদ-বিষয়ক আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হবে। বইটির কাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জড়িয়ে আছে অনেক মানুষের স্বপ্ন, সময়, শ্রম। তাঁদের নাম এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি না, যার সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা সেই সর্বজ্ঞানী তো তাঁর বান্দাদের চেনেনই। তিনি যেন এ কাজটি কবুল ককন, এর সাথে জড়িত সকল উত্তম প্রতিদান দান করেন এবং এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে তাঁর এই গুনাহগার বান্দাদের নাজাতের উসিলা বানিয়ে দেন।

‘মানবজীবনের মূল উদ্দেশ্য কী’ দার্শনিকরা যুগে যুগে এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন। কিন্তু আসমানি জ্ঞান থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কারণে সত্যকে চিনতে পারেনি। তত্ত্বকথার ফুলঝুরি, আর জটিল থেকে জটিলতর আলংকারিক বিশ্লেষণ যে সত্যকে চিনতে ব্যর্থ হয়েছে, আল্লাহ ﷻ কুরআনে অল্প কিন্তু গভীর অর্থবোধক কথায় আমাদের তা জানিয়ে দিয়েছেন। তাওহিদের মূলনীতি বইটি এই সত্যকে নিয়েই। ছকে বাঁধা যান্ত্রিক জীবনের চক্র থেকে কিছুটা সময় বের করে এই সত্যের আলোতে পাঠক নিজেকে বিচার করবেন, নিজের প্রকৃত গন্তব্য ও উদ্দেশ্যকে চিনে নেবেন সেই প্রত্যাশা রইল।

ইলমহাউস পাবলিকেশন

সফর ১৪৪০, অক্টোবর ২০১৮

লেখক পরিচিতি

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলের জন্ম যুক্তরাষ্ট্রে। তাঁর পিতা শাইখ মুসা জিবরিল ছিলেন মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সেই সুবাদে আহমাদ মুসা জিবরিল তাঁর শৈশবের বেশ কিছু সময় মদিনায় কাটান। সেখানেই এগারো বছর বয়সে তিনি হিফয সম্পন্ন করেন। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার আগেই তিনি বুখারি ও মুসলিম মুখস্থ করেন। কৈশোরের বাকি সময়টুকু তিনি যুক্তরাষ্ট্রেই কাটান এবং সেখানেই ১৯৮৯ সালে হাইস্কুল থেকে পাশ করেন। পরবর্তীকালে তিনি বুখারি ও মুসলিমের সনদসমূহ মুখস্থ করেন, এরপর হাদিসের ছটি কিতাব (কুতুবুস সিত্তাহ) মুখস্থ করেন। তারপর তিনিও তাঁর বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শরিয়াহর ওপর ডিগ্রি নেন।

আহমাদ মুসা জিবরিল শাইখ ইবনু উসাইমিনের তত্ত্বাবধানে অনেকগুলো কিতাবের অধ্যয়ন সম্পন্ন করেন এবং তিনি তাঁর কাছ থেকে অত্যন্ত বিরল তাকিয়াহও লাভ করেন। শাইখ বাকর আবু যাইদের সাথে একান্ত দারসে তিনি আল ইমাম ওয়াল মুজাদ্দিদ শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহহাব ও শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহর কিছু কিতাবও অধ্যয়ন করেন। তিনি শাইখ মুহাম্মাদ মুখতার আশ শানকিতির অধীনে চার বছর পড়াশোনা করেন। আল্লামাহ হামুদ বিন উকলা আশ শুয়াইবির অধীনেও তিনি অধ্যয়ন করেন এবং তাকিয়াহ লাভ করেন।

তিনি তাঁর পিতার সহপাঠী শাইখ ইহসান ইলাহি জহিরের অধীনেও পড়াশোনা করেছেন। শাইখ মুসা জিবরিল শাইখ ইহসানকে অ্যামেরিকায় আমন্ত্রণ জানান। শাইখ ইহসান অ্যামেরিকায় কিশোর শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলের সাথে পরিচিত হবার পর চমৎকৃত হয়ে তার বাবাকে বলেন, ইন শা আল্লাহ আপনি একজন মুজাদ্দিদ গড়ে তুলেছেন। তিনি আরও বলেন, এই ছেলেটি তো আমার বইগুলো সম্পর্কে আমার চেয়েও বেশি জানে।

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল আর রাহিকুল মাখতুম বইয়ের লেখক শাইখ সফিয়ুর রাহমান আল মুবারাকপুরির অধীনে দীর্ঘ পাঁচ বছর অধ্যয়ন করেন। এ ছাড়াও তিনি অধ্যয়ন করেন

শাইখ মুকবিল, শাইখ আব্দুল্লাহ গুনাইমান, শাইখ মুহাম্মাদ আইয়ুব এবং শাইখ আতিয়াহ আস সালিমের অধীনে। শাইখ আতিয়াহ আস সালিম ছিলেন শাইখ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ আমিন আশ শানকিতির প্রধান ছাত্র এবং তিনি শাইখ আশ শানকিতির ইস্তিকালের পর তাঁর প্রধান তাফসিরগ্রন্থ *আদওয়ায়ুল বায়ান* এর কাজ শেষ করেন। শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল শাইখ ইবরাহিম আল হুসাইনেরও ছাত্র ছিলেন। শাইখ ইবরাহিম ছিলেন শাইখ আব্দুল আযিয বিন আব্দুল্লাহ বিন বাযের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহচর। আল-লাজনাহ আদ-দাইমাহ লিল বুহসিল ইলমিয়াহ ওয়াল ইফতাহর প্রথম দিকের সদস্য শাইখ আব্দুল্লাহ আল কুদের সাথে শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল হাজ্জ করার সুযোগ লাভ করেন। এ ছাড়া দুই পবিত্র মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ কমিটির প্রধান শাইখ সালিহ আল হুসাইনের অধীনেও তিনি অধ্যয়নের সুযোগ পান।

মুহাদ্দিস শাইখ হামাদ আল আনসারির অধীনে হাদিস অধ্যয়ন করেন এবং তাঁর কাছ থেকেও তাযকিয়াহ লাভ করেন তিনি। তিনি শাইখ আবু মালিক মুহাম্মাদ শাকরাহর অধীনেও অধ্যয়ন করেন। শাইখ আবু মালিক ছিলেন শাইখ আলবানির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। শাইখ আল আলবানি ওয়াসিয়াহতে শাইখ আবু মালিককে তার জ্ঞানযার ইমামতি করার জন্য অনুরোধ করেন। শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল শাইখ মুসা আল কারনিরও ছাত্র। কুরআনের ব্যাপারে শাইখ আহমাদ ইজাযাহপ্রাপ্ত হন শাইখ মুহাম্মাদ মাবাদ ও অন্যান্যদের কাছ থেকে। শাইখ মুসা জিবরিল ও শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলের ইলম থেকে উপকৃত হবার জন্য শাইখ বিন বায অ্যামেরিকায় থাকা বিলাদুল হারামাইনের ছাত্রদের উৎসাহিত করেন। শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল শাইখ বিন বাযের কাছ থেকেও তাযকিয়াহ অর্জন করেন। শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলের ব্যাপারে মন্তব্য করার সময়ে শাইখ বিন বায তাঁকে ‘শাইখ’ হিসেবে সম্বোধন করেন এবং বলেন, তিনি (আলিমদের কাছে) পরিচিত এবং উত্তম আকিদাহ পোষণ করেন। শাইখ আহমাদ বর্তমানে অ্যামেরিকায় নিজ পরিবারের সাথে অবস্থান করছেন।

ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମୂଳନୀତି

‘উসুল আস-সালাসাহ’ অর্থ তিনটি মূলনীতি। এটি তাওহিদের তিনটি মূলনীতির ওপর লেখা একটি ছোট পুস্তিকা। শব্দ-সংখ্যার দিক দিয়ে অভ্যস্ত সংক্ষিপ্ত হলেও ছোট এ পুস্তিকার অর্থের গভীরতা ব্যাপক। এতে বর্ণিত শিক্ষা ও মূলনীতিগুলোর ব্যাপারে কারো অঙ্গ থাকার সুযোগ নেই। বইটি প্রকাশ হবার পর থেকে আলিমগণ সব সময় বইটি অধ্যয়ন করে আসছেন, এর ওপর দারস দিয়েছেন এবং তাওহিদ-বিষয়ক অধ্যয়ন সব সময় এই পুস্তিকা দিয়েই শুরু করা হয়।

এই পুস্তিকাতে আলোচিত তিনটি মৌলিক নীতি এবং এগুলোর ব্যাপারে লেখকের আলোচনার দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, মূলত কবরে যে বিষয়গুলো নিয়ে প্রশ্ন করা হবে লেখক এই পুস্তিকাতে সেগুলো নিয়েই আলোচনা করেছেন। আমাদের সবার এ তিনটি মূলনীতি সম্পর্কে যথাসম্ভব ভালোভাবে জানা দরকার, যাতে করে আমাদের জীবনকে এই নীতিগুলোর আলোকে আমরা সাজাতে পারি, জীবনে এই শিক্ষাগুলো প্রয়োগ করতে পারি এবং কবরের প্রশ্নগুলোর উত্তর দ্রুত ও সঠিকভাবে দিতে সক্ষম হই।

ইলম অর্জন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া :

তাওহিদের মূলনীতি-সংক্রান্ত এ আলোচনায় আমরা এগোব ধীরে ধীরে, পর্যায়ক্রমে। কারণ, দীন ইসলামের জ্ঞান ধীরে ধীরে শেখা উচিত। রাতারাতি কেউ আলিম হতে পারে না। ইবনু আব্দিল বার رحمہ اللہ আল-জামিতে উল্লেখ করেছেন, যুহরী رحمہ اللہ বলেছেন,

من رام العلمَ جملةً ذهب عنه جملة، إنما يُطلب العلم على مَرِّ الأيام والليالي

যে রাতারাতি জ্ঞান অর্জন করতে চায়, জ্ঞান তাকে ত্যাগ করে। আসলে জ্ঞান অর্জিত হয় ধীরে ধীরে, দিন-রাতের সাধনায়।^{১)}

১ ইবনু আবদিল বার رحمہ اللہ, জামিযু বায়ানিল ইলম, বর্ণনা নং : ৪৭৬ (শাব্বিক ভিন্নতা-সহকারে)।

ইলম অৰ্জনের জন্য বৈধ ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। এই পথে অগ্রসর হতে হয় ধাপে ধাপে। শুরুতেই আকিদাহ অথবা তাওহিদেৰ গভীর আলোচনার বইগুলো দিয়ে শুরু করলে আপনি এমন কিছু বিষয়ের মুখোমুখি হবেন যা হয়তো পুরোপুরি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবেন না। যার ফলে আপনি হতাশ হয়ে যাবেন। কিন্তু ধাপে ধাপে অগ্রসর হলে হয়তো বিষয়গুলো আপনি বুঝতে পারতেন। অনেক ভাইকে দেখা যায় শুরুতেই আকিদাহ ও তাওহিদ নিয়ে এমনসব বই পড়া শুরু করে দিয়েছেন, যেগুলোকে ডেঙে বোঝাতে আলিমদেরও বেগ পেতে হয়। তারচেয়েও বড় সমস্যা হলো, দেখা যায় তারা কোনোরকমের তত্ত্বাবধান ছাড়া মূল বইয়ের বদলে কোনো অনুবাদ পড়ছেন। এভাবে আসলে কতটুকু সঠিকভাবে বোঝা সম্ভব? এটা ঠিক যে, আজকের যুগে অনেকেই নানা কারণে সরাসরি আলিমদের তত্ত্বাবধানে পড়ার সুযোগ পান না। আপনার ক্ষেত্রেও যদি ব্যাপারটা এমন হয়, তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। তবে সে ক্ষেত্রেও অন্তত ইলম অৰ্জনের প্রক্রিয়া কীভাবে শুরু করতে হয়, সেটা আপনাকে সঠিকভাবে জানতে হবে।

উসুল আস-সালাসাহ, তাওহিদ নিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনার একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা। হয়তো আমার এই ভূমিকা শেষ করার আগেই আপনি এটি পড়ে শেষ করে ফেলতে পারবেন। কিন্তু এ ছোট পুস্তিকার গভীর, অন্তর্নিহিত জ্ঞান অর্জন করতে হলে প্রয়োজন প্রতিটি বাক্যের বিশ্লেষণ। ধাপে ধাপে এগোলেও হয়তো আপনার কাছে বিষয়টি কঠিন মনে হতে পারে, কিন্তু হাল ছাড়বেন না ইন শা আল্লাহ। আপাতদৃষ্টিতে ছোট ও সাধারণ এ বইটি ও এর ব্যাখ্যা আমি অধ্যয়ন করেছি এগারো জন আলিমের তত্ত্বাবধানে। আর কিছু অংশ পড়েছি তারচেয়েও অধিকসংখ্যক আলিমের অধীনে।

আল-খাতীব আল-বাগদাদি তার আল-জামিতে অভূত সুন্দর একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। একজন তালিবুল ইলম জ্ঞান অৰ্জনের জন্য একজন মুহাদ্দিসের কাছে গেলেন। কিন্তু তার কাছে হাদিস-সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন অত্যন্ত কঠিন মনে হলো। হতাশ হয়ে তিনি ধরে নিলেন, তিনি এ কাজের উপযুক্ত নন।

তারপর একদিন হাটার সময় তিনি দেখলেন একটি পাথরের ওপর পানি পড়ছে—হয়তোবা কোনো ঝরনার কাছে। আপনারা দেখবেন, বছরের পর বছর ধরে কোনো পাথরের ওপর পানি পড়লে যে জায়গাটায় পানি পড়ে, সেটা একসময় দেবে যায়। পানি পড়ার সেই স্থানটি আস্তে আস্তে ক্ষয়ে যেতে থাকে। কোনো ঝরনা কিংবা ফোয়ারার কাছে গিয়ে আপনারা এটা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। এই দৃশ্য দেখার পর তালিবুল ইলম চমৎকৃত হলেন—‘কী অবাক ব্যাপার! পানি এত নরম, কোমল, হালকা হওয়া সত্ত্বেও তা শক্ত পাথরকে প্রভাবিত করে। ইলম তো পানির চেয়েও নরম আর হালকা, আর আমার হৃদয় ও বুদ্ধি তো পাথরের মতো শক্ত না!’ তারপর তিনি হাদিসশাস্ত্র অধ্যয়নে ফিরে গেলেন এবং একসময় তৎকালীন সময়ের হাদিসের বিখ্যাত আলিম হয়ে উঠলেন।

তাই ধীরে ধীরে শুরু করুন। বৈধ ধরে, অধ্যবসায়ের সাথে ধাপে ধাপে অগ্রসর হোন। এটিই হলো ইলম অর্জনের সনাতন (classical) পদ্ধতি, আর এভাবে পড়ার মাধ্যমেই একজন মানুষ আলিম হয়ে ওঠেন। সাধারণত আপনারা যেসব আলোচনা পড়ে ও শুনে থাকেন সেগুলো অনুপ্রেরণা দেয়, তথ্যবহুল এবং নিশ্চয় সেগুলোতে ইলম আছে—তবে এগুলো আলিম তৈরি করে না। আলিম হবার জন্য যে জ্ঞান প্রয়োজন, এ ধরনের লেকচার বা আলোচনা তা দিতে পারে না। আপনি দু-একটা লেকচার শুনলেন, সেমিনারে গেলেন, কিছু কোর্স করলেন, কিছু ভিডিও দেখলেন—এটা ভালো, কিন্তু এর মাধ্যমে আলিম হওয়া সম্ভব না। যদি তা-ই হতো, তাহলে গোটা মুসলিম উম্মাহর সবাই আলিম। কেননা, গত পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে আমাদের বাবা-দাদারা ঐতিহ্য জুমুআয় খুতবা শুনে আসছেন এবং মাগরিব থেকে ইশা পর্যন্ত বহু বয়ানও তারা শুনেছেন।

একজন তালিবুল ইলম কিংবা আলিম হওয়ার জন্য, প্রকৃত অর্থে ইলম অর্জনের জন্য, প্রয়োজন নিয়মতান্ত্রিক পড়াশোনার। এ ছাড়া সনাতন পদ্ধতিতে ইসলাম অধ্যয়নের আরও অনেক অনেক উপকারিতা আছে, যা শুনে শেষ করা যাবে না।

ইলম অর্জনের তিন পদ্ধতি

আগেকার দিনগুলোতে তিনভাবে ইলম অর্জন করা হতো। প্রথম পদ্ধতি হলো, ‘সামা আল-মুবাশশির’ (السامع المباشر), সরাসরি একজন শাইখের কাছ থেকে শেখা। এটা সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি এবং এর জন্য পুরস্কারও অপরিমিত। দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো ‘আল-ওয়াসিতাহ’ (الواسطة), এ পদ্ধতিতে ছাত্র এবং শিক্ষকের মধ্যে একজন মধ্যস্থ ব্যক্তি থাকবে। আপনি যদি সরাসরি একজন শাইখের কাছ থেকে তালিম নিয়ে অন্য কাউকে গিয়ে পুরো তালিম জানান, তাহলে তা হবে ‘ওয়াসিতাহ’। এ ক্ষেত্রে শাইখ এবং যাকে আপনি শেখাচ্ছেন, এ দুজনের মাঝে আপনি হবেন সেই মধ্যস্থ ব্যক্তি। সাহাবিদের অনেকে, বিশেষ করে যারা ব্যবসায়ী বা কৃষক ছিলেন, এই পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। তাঁরা পালাক্রমে নিজেরা শিখতেন এবং একে অপরকে শেখাতেন। ইলম অর্জনের তৃতীয় পদ্ধতি ‘ওয়াজাদাহ’ (وَجَادَة), কোনো শাইখের লিখিত একটি বই নিজে নিজে অধ্যয়ন করা।

যদি সরাসরি কোনো শাইখের অধীনে পড়ার সুযোগ থাকে তবে ‘ওয়াজাদাহ’, ‘ওয়াসিতাহ’ বা অন্য কোনো উপায় অবলম্বন করা উচিত না। পৃথিবীর অপর কোনাতেও যদি হকপন্থী কোনো শাইখের সন্ধান পান আর আপনার যদি সামর্থ্য থাকে, তাহলে এখনই ব্যাগ গোছান এবং তার কাছে গিয়ে শিখুন।

সরাসরি একজন শাইখের কাছ থেকে শেখার উপকারিতা অনেক। যেমন : একজন শাইখের সরাসরি তত্ত্বাবধানে শেখার ফলে আপনি তার ব্যক্তিগত জীবন, আচার-আচরণ দেখতে পাবেন। এ থেকে শিখতে পারবেন। জানতে পারবেন তিনি কোন পরিস্থিতিতে কী রকম

আচরণ করেন। কাজেই যদি একজন হকপন্থী, যোগ্য আলিমকে খুঁজে পান—এমন কেউ যিনি আল্লাহকে ভয় করেন, যিনি ভণ্ড, বিভ্রান্ত, বিকিয়ে যাওয়া মর্ডানিস্ট নন, যিনি কুফর কিংবা কুফফারের পক্ষে কথা বলেন না, যিনি কোনো সরকারি, অধীনস্থ আলিম না—যদি এমন কাউকে খুঁজে পান এবং রাজি করাতে পারেন, তাহলে তিনি বিশ্বের যে প্রান্তেই থাকুন না কেন, আপনার অবশ্যই তার কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা এবং তাঁকে অনুসরণ করা উচিত।

আলিমদের সম্পর্শ ছাড়া শুধুই বই থেকে শেখার ব্যাপারে সালাফগণ ভালো ধারণা পোষণ করতেন না। তারা বলতেন,

من كان شيخه كتابه كان خطؤه أكثر من صوابه

বই-ই যদি কারও শাইখ হয়, তাহলে তার ভুলই বেশি হবে।^[১]

শাইখ ইবনু উসাইমিন رحمته الله-কে আলিমদের অডিও টেপ শুনে ইলম অর্জন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি একে উৎসাহিত করেছেন তবে একইসাথে এও বলেছেন যে, সরাসরি একজন আলিমের তত্ত্বাবধানে শেখা উত্তম। কারণ, এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী প্রয়োজনমতো প্রশ্ন এবং আলোচনা করার সুযোগ পায়।

সালাফদের নিয়ম ছিল ইলম লিখে রাখা

আমার বয়স তখন সাত, মদীনায়ে থাকতাম। বাবা তখন মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছিলেন। একদিন তাঁর এক ইরাকি বন্ধু (তিনি ছিলেন সামারার অধিবাসী, ১৯৮০ সালে তিনি ইজ্তেকাল করেন) আমাকে বললেন, তোমার বাবা তো একজন সিংহ! ক্লাসে শিক্ষক যা-ই বলেন সে খাতায় নোট করে ফেলে। পরে আমি লক্ষ করলাম, বাবা যেখানেই থাকতেন—মাসজিদ আন-নববি, ক্লাস, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস—সব সময় তিনি সবকিছু খাতায় নোট করতেন। আর তার সাথে সব সময় একটা অডিও রেকর্ডার থাকত যেটা দিয়ে তিনি সব ক্লাস লেকচারগুলো রেকর্ড করে রাখতেন। সেই রেকর্ডগুলো এখনো আমাদের কাছে আছে। তারপর থেকে আমি নিজেও এই পদ্ধতি অনুসরণ করে আসছি। আমি যেসব শাইখদের অধীনে পড়েছি তাঁদের বলা প্রতিটি শব্দ নোট করেছি। যদিও সব সময় সবকিছু লেখার প্রয়োজন হয় না, আর অনেক সময় লেখার সময় কিছু কথা ছুটেও যায়, তবু আমি সব সময় চেষ্টা করেছি শাইখরা যা বলছেন তার সবকিছু লিখে রাখার। এখনো আমি আমার এই নোটগুলোর সহায়তা নিই।

সালাফদের অভ্যাস ছিল ইলম লিখে রাখার। আবদুল্লাহ ইবনু আমর رضي الله عنه রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদিসগুলো লিখে রাখতেন। একসময় কুরাইশরা তাঁকে এ কাজে বাধা দেয়। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে আবারও হাদিস লেখা শুরু করতে বলেন এবং তাঁকে উৎসাহ দেন। মুয়াবিয়া ইবনু কুররাহ আবি ইয়াস رضي الله عنه বলেছেন,

مَنْ لَمْ يَكْتُبْ عِلْمَهُ لَمْ يَمُدَّ عَلَيْهِ عِلْمًا

যারা তাদের ইলম লিপিবদ্ধ করে না তাদের ইলমকে ইলম গণ্য করা হয় না।^[১]

হয়তো এ ক্ষেত্রে হাদিসের জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কথাটা আজ আমরা যে ধরনের ইলম অর্জনের চেষ্টা করছি সেটার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সাইদ ইবনু যুবাইর রাঃ যা শুনতেন তা-ই লিখে রাখতেন। লেখার জন্য অন্য কিছু না থাকলে বালুতে লিখে রাখতেন। তারপর অপেক্ষা করতেন ভোর হওয়া পর্যন্ত। ভোর হবার পর অন্য কিছু খুঁজে বের করে তাতে লিখে নিতেন। মাওয়ারদি, খালিল ইবনু আহমাদ এবং অন্যান্যদের ব্যাপারেও এ ধরনের বর্ণনা আছে। তারা নিজেরা ইলম লিখে রাখতেন অথবা ইলমকে লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণের জন্য উৎসাহ দিতেন।

আল উসুল আস-সালাসাহ :

উসুল আস-সালাসাহ অত্যন্ত ছোট একটি পুস্তিকা। লেখক ভূমিকা হিসাবে চারটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করার পর তিনটি মূলনীতির আলোচনা করেছেন। তারপর একটি উপসংহার এসেছে। অল্প কিছু পৃষ্ঠা। কিন্তু অল্প এ কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যে ছড়িয়ে আছে গভীর ও বিস্তৃত জ্ঞান। তাই আমরা চেষ্টা করব বইটির প্রতিটি বাক্য, সম্ভব হলে প্রতিটি শব্দ নিয়ে আলোচনা করার। আমরা আলোচনা শুরু করব, বাসমালাহ বা ‘বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম’ দিয়ে। আমরা ভেঙে ভেঙে এর অর্থ শিখব। একজন তালিবুল ইলম হিসেবে বিসমিল্লাহর ব্যাপারে আপনার বুঝ আর দশজনের মতো হলে তো হবে না। আজ পৃথিবীতে প্রায় ১.৫ থেকে ১.৮ বিলিয়ন মুসলিম আছে। কিন্তু কোনো কাজের শুরুতে কেন আমরা বিসমিল্লাহ বলছি, এ প্রশ্ন করলে তাদের অনেকেই হয়তো উত্তর দিতে পারবে না। একজন তালিবুল ইলম হিসেবে এ ব্যাপারে আপনার সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান থাকা উচিত। উসুল আস-সালাসাহ বা তাওহিদের মূলনীতি নিয়ে আলোচনার শুরুটা আমরা বিসমিল্লাহ থেকেই করব।

বাসমালাহ :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

বাসমালাহ-এর মাঝে নিহিত তাওহীদের শিক্ষা :

বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীমকে বাসমালাহ বলা হয়।

কোনো কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম বলার মানে হলো, ওই কাজের শুরুতে আল্লাহ ﷻ-এর একত্বের ওপর বিশ্বাসের সবক'টি দিক প্রয়োগ করা। বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীমের মধ্যে নিহিত আছে তাওহীদের প্রতিটি দিক।

কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার মাধ্যমে আমরা মূলত বলছি, 'আল্লাহ ﷻ-এর নামে শুরু করছি, আল্লাহ ﷻ আমাদের এই কাজের অনুমতি দিয়েছেন, (أُذِنَ اللَّهُ لِي) আল্লাহ ﷻ যদি অনুমতি না দিতেন, তাহলে আমরা কাজটি করতাম না।'

সুতরাং কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার মাধ্যমে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ﷻ আমাদের এ কাজের অনুমতি দিয়েছেন এবং আমরা একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই কাজটি করছি। আখিনালাহ লি। এ কারণে কোনো হারাম কাজের আগে বিসমিল্লাহ বলা যায় না। যেহেতু আল্লাহ ﷻ আমাদের এ কাজের অনুমতি দেননি; বরং তা হারাম করেছেন। যেমন, মদ পান করার আগে (لَا سَعَاءَ اللَّهُ) বিসমিল্লাহ বলা যাবে না। কারণ, আল্লাহ ﷻ মদ্যপানকে হারাম করেছেন। যদি কেউ মদ পান করার আগে বিসমিল্লাহ বলে, তাহলে সে দুটো গুনাহ করলো। প্রথমত বিসমিল্লাহ বলার মাধ্যমে সে সাক্ষ্য দিলো, আল্লাহ তাকে মদপান করার অনুমতি দিয়েছেন—অথচ আল্লাহ ﷻ তাকে এ কাজের অনুমতি দেননি। তাই এই কারণে সে গুনাহগার হলো। আবার হারামে লিপ্ত হবার দরুন, অর্থাৎ মদ পান করার কারণেও সে গুনাহগার হলো।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, কিছু মুসলিম দেশে মদ পানের আগে বিসমিল্লাহ বলার এই প্রবণতা চালু আছে।

কাজেই বিসমিল্লাহ বলার মাধ্যমে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি—আমি আল্লাহর নামে শুরু করছি, আল্লাহ ﷻ আমাকে এ কাজের অনুমতি দিয়েছেন এবং একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই আমি এই কাজটি করছি। আর এটাই হচ্ছে তাওহিদুল উলুহিয়াহ।

তাওহিদুর রুবুবিয়াহ

আমরা যখন লেখি, কে আমাদের লেখার শক্তি দেন? আল্লাহ ﷻ-ই আমাদের লেখার শক্তি দিয়েছেন। তাই লেখার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার মাধ্যমে আমরা সাক্ষ্য দিই যে, আল্লাহ ﷻ লেখার শক্তি না দিলে আমি লিখতে পারতাম না। কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার মাধ্যমে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ﷻ-এর দেয়া শক্তির মাধ্যমে আমি এই কাজ করছি। বিসমিল্লাহ—আল্লাহ ﷻ-এর নামে আল্লাহ ﷻ-এর দেয়া রিয়িক থেকে আমি খাচ্ছি এবং আল্লাহ ﷻ যদি আমাকে সক্ষমতা না দিতেন, আমি খেতে পারতাম না। বিসমিল্লাহ—আল্লাহ ﷻ-এর নামে আমি লিখছি, কেননা আল্লাহ ﷻ আমাকে সক্ষমতা না দিলে, আমি এ হাত নাড়াতে পারতাম না, তা অবশ্য থাকত। এটা অনেকটা লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ (হাওকাল) বলার মতো। কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার মাধ্যমে আমরা কার্যত বলছি যে, আল্লাহ ﷻ আমাকে এ কাজ করার শক্তি না দিলে, আমার দ্বারা কোনোভাবেই তা করা সম্ভব হতো না। এ জন্যই আল্লাহ বলেছেন,

وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ.....

‘তোমাদের নিকট যে সমস্ত নিয়ামত রয়েছে, তা তো আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে...।’
(সূরা আন-নাহল, ৫৩)

কাজেই বিসমিল্লাহ বলার মাধ্যমে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমরা যা কিছু নিয়ামত পেয়েছি, তার সবই এক আল্লাহ ﷻ-এর কাছ থেকে। এটাই হলো তাওহিদুর রুবুবিয়াহর ওপর বিশ্বাস।

তাওহিদুল আসমা ওয়াস সিফাত

কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম বলার মাধ্যমে সেই কাজে আল্লাহ ﷻ-এর পবিত্র নামের সাহায্যে বারাকাহ ও কল্যাণ কামনা করা হয়। এর মাধ্যমে আমরা বলছি—বিসমিল্লাহ, আমি আল্লাহ ﷻ-এর নামে শুরু করছি যাতে তিনি এতে বারাকাহ দেন। বিসমিল্লাহর পর আমরা আল্লাহ নামের সাথে আর-রাহমান এবং আর-রাহীম যুক্ত করি। এগুলো আল্লাহ ﷻ-এর পবিত্র নামসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা তাঁর পবিত্র বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। পরে আমরা এগুলো নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব ইন শা আল্লাহ। সুতরাং কাজের

শুরুতে আল্লাহ ﷻ-এর নাম নেয়ার মাধ্যমে আমরা এতে কল্যাণ ও বারাকাহ কামনা করছি। আর এর মধ্যে নিহিত রয়েছে তাওহিদুল আসমা ওয়াস সিকাফ-এর বিশ্বাস।

সুতরাং বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম বলার মাধ্যমে তাওহিদেদ প্রতিটি দিকের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়া হয়।

ধরুন খাওয়া শুরু করার আগে বা পরীক্ষার খাতায় লিখতে শুরু করার আগে আমরা বিসমিল্লাহ বললাম। বিসমিল্লাহ বলার দ্বারা আল্লাহ ﷻ-এর পবিত্র নাম উল্লেখ করে বারাকাহ ও কল্যাণ কামনা করলাম। এটা হলো তাওহিদুল আসমা ওয়াস সিকাফ। আবার বিসমিল্লাহর মাধ্যমে আমরা সাক্ষ্য দিলাম আল্লাহ ﷻ-ই আমাদের লেখার বা খাবার সক্ষমতা দিয়েছেন। এটা হচ্ছে তাওহিদুর রুবুবিয়াহ। বিসমিল্লাহর মাধ্যমে আমরা আরও সাক্ষ্য দিলাম যে, আমি আল্লাহ ﷻ-এর জন্য, আল্লাহ ﷻ-এর অনুমতিক্রমেই এই কাজটি করছি। তিনি আমাকে এর অনুমতি দিয়েছেন এবং একে হালাল করেছেন বলেই আমি এটা করছি। আর এটা হলো তাওহিদ আল-উলুহিয়াহ। এভাবে প্রতিটি কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার মাধ্যমে আমরা তাওহিদেদ প্রতিটি দিকের ওপর বিশ্বাসের সাক্ষ্য দিচ্ছি।

ইন শা আল্লাহ এখন থেকে বিসমিল্লাহ বলার সময় আপনার মনে এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে এক ভিন্ন উপলব্ধি কাজ করবে। আগে হয়তো আপনি বিসমিল্লাহ বলতেন, কারণ হাদিসে বিসমিল্লাহ বলার কথা এসেছে, কিন্তু এখন আপনি বিসমিল্লাহ বলার সময় এর যথার্থ কারণ ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্যও অনুধাবন করবেন।

আসুন এবার বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীমের ভাষাতাত্ত্বিক কিছু নিয়ম সম্পর্কে জানা যাক।

বাসমালাহ-এর ভাষাতাত্ত্বিক কিছু নিয়ম :

প্রথম নিয়ম

বিসমিল্লাহর ‘ب’ দ্বারা ইস্তিয়ানাহ এবং তাওয়াক্কুল বোঝানো হয়। অর্থাৎ বিসমিল্লাহর যে ব সেটা দ্বারা আল্লাহ ﷻ-এর প্রতি মুখাপেক্ষিতা ও নির্ভরশীলতা নির্দেশ করা হয়। আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী এই নীতির নাম হলো : الجار والمجرور في البسمة متعلق بحذوف، : تقديره فعل لائق بالمقام (আল-জার ওয়াল-মাজরুর ফিল-বাসমালাহ মুতামাল্লিকুন বিল-মাহযুফ তাকদিরুহু ফি’লুন লায়িকুন বিল-মাকাম)।

কাজের শুরুতে যখন আপনি আরবিতে বিসমিল্লাহ বলেন, এটা অটোম্যাটিকালি সংশ্লিষ্ট কাজ-যেমন : খাওয়া, পান করা, লেখা ইত্যাদির প্রতি-ইঙ্গিত করে। আলাদাভাবে- ‘আমি খাওয়া, লেখা কিংবা পান করার জন্য বিসমিল্লাহ বলছি’-এটা বলার প্রয়োজন হয় না।

আরবিতে বিসমিল্লাহ বললে এগুলো উহ্য থাকে। অর্থাৎ আমি খাচ্ছি, আমি পান করছি এগুলো মুখে উচ্চারণ করতে হয় না—এমনিতেই বলা হয়ে যায়। এটা আরবি ভাষার অসংখ্য মাধ্যমের অন্যতম।

খাওয়ার শুরুতে শুধু বিসমিল্লাহ বলার মাধ্যমেই আপনি বলছেন, ‘আমি আল্লাহ স্তুতি-এর নামে খাচ্ছি’, যদিও আপনি খাওয়ার ব্যাপারটি উল্লেখ করেননি। যদি কিছু লেখার আগে বিসমিল্লাহ বলেন, তাহলে অটোম্যাটিকালি এটা বোঝাবে যে, ‘আমি আল্লাহ স্তুতি-এর নামে লিখছি’। অর্থাৎ যখন কোনো কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা হয় তখন আরবি ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী কাজটির কথা মুখে উল্লেখ করা না হলেও শুধু বিসমিল্লাহ বলার মাধ্যমেই অটোম্যাটিকালি ওই কাজকে নির্দেশ করা হয়। প্রতিবার বিসমিল্লাহ বলার দ্বারা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এটা প্রকাশ পায় যে, আমি আল্লাহ স্তুতি-এর নামে খাচ্ছি, আল্লাহ স্তুতি-এর নামে পান করছি, আল্লাহ স্তুতি-এর নামে গাড়িতে চড়ছি ইত্যাদি।

দ্বিতীয় নিয়ম

লক্ষ করুন আমি প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা আগে বিসমিল্লাহ বলছি এবং তারপর খাওয়া, পান করা, গাড়িতে চড়া ইত্যাদি কাজের কথা বলছি। কেন? কারণ, আল্লাহ স্তুতি-এর নাম সব সময় বাক্যের শুরুতে বসবে। লক্ষ করুন, আমাদের বলতে হবে ‘বিসমিল্লাহ, আমি খাচ্ছি’। ‘আমি খাচ্ছি, বিসমিল্লাহ’, এমনটা কখনো বলা যাবে না। দুটোর মাঝে বিরাট পার্থক্য।

কেন আমি খাচ্ছি, বলার আগেই বিসমিল্লাহ বলতে হবে? পরে কেন বলা যাবে না?

আরবি ব্যাকরণ-শাস্ত্রবিদদের মতে, এর দুটি কারণ আছে।

প্রথমত, বাক্যের শুরুতে আল্লাহ স্তুতি-এর নাম নিলে তা বারাকাহপূর্ণ হয়।

দ্বিতীয়ত, এই সামান্য পরিবর্তনের ফলেও বিরাট তারতম্য ঘটে। আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী প্রথমে আল্লাহ স্তুতি-এর নাম উচ্চারণ করে কাজের উল্লেখকে বিলম্বিত করার মাধ্যমে—অর্থাৎ, ‘আমি খাচ্ছি, বিসমিল্লাহ’ বলার পরিবর্তে ‘বিসমিল্লাহ আমি খাচ্ছি’ বলার মাধ্যমে—আপনি আপনার কাজকে শুধুই আল্লাহ স্তুতি-এর জন্য নির্দিষ্ট করে নিচ্ছেন। আরবি ব্যাকরণের এই নিয়মটি হলো : تأخير العامل يفيد الحصر (তা’খিরুল আমিল ইউফিদুল হাসর)।

অর্থাৎ শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার মাধ্যমে আমরা কাজটিকে শুধুই আল্লাহ স্তুতি-এর জন্য নির্দিষ্ট করে নিচ্ছি। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, ‘আল্লাহ স্তুতি-এর নামে আমি খাচ্ছি। আল্লাহ স্তুতি ব্যতীত অন্য কারও নামে আমি খাই না।’ বাক্যের শুরুতেই বিসমিল্লাহ বলার মাধ্যমে আপনি আপনার কাজকে শুধু আল্লাহ স্তুতি-এর জন্য নির্ধারণ করে নিলেন। এটাই হলো ‘আমি খাচ্ছি, বিসমিল্লাহ’ এবং ‘বিসমিল্লাহ, আমি খাচ্ছি’ এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য। একইভাবে, ‘হে আল্লাহ,

আমি শুধু আপনারই জন্য লিখি', 'হে আল্লাহ, আমি শুধু আপনারই জন্য পান করি' এমন বলার মাধ্যমে আমরা আমাদের কাজগুলোকে শুধু আল্লাহ ﷻ-এর জন্য নির্ধারিত করে নিই।

বাসমালাহ দিয়ে শুরু করার দলিল :

লেখক কেন বিসমিল্লাহ দিয়ে তাঁর বই শুরু করলেন? কেন কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে হবে? যেহেতু এটা এক ধরনের ইবাদত, তাই কোনো কিছুকে ইবাদত বলে দাবি করলে প্রমাণ করতে হবে যে, আপনি যা করছেন তা আসলেই ইবাদত। দলিল পেশ করার এই দায়িত্ব ইবাদতকারীর ওপরেই বর্তায়।

সুতরাং কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার দলিল কী?

এটি কুরআনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ

বিসমিল্লাহ দিয়ে শুরু করার বিষয়টি কুরআন থেকে প্রমাণিত। কুরআনে ১১৪ বার বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম এসেছে। সূরা আত-তাওবাহ ছাড়া বাকি ১১৩টি সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম এসেছে, আর সূরা আন-নামলে শুরুর পাশাপাশি মাঝখানেও একবার, অর্থাৎ মোট দুইবার, বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম এসেছে।

আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

'নিশ্চয়ই সেটা ছিল সুলাইমানের পক্ষ হতে (চিঠি)। (এতে বলা হয়েছে) পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু।' (সূরা আন-নামল, ৩০)

এই আয়াতের কারণে সূরা আত-তাওবাহর শুরুতে বিসমিল্লাহ না থাকা সত্ত্বেও কুরআনে মোট ১১৪ বার বিসমিল্লাহ এসেছে। ইবনু আব্বাস রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম দ্বারা সূরাসমূহের শুরু ও সমাপ্তি নির্ধারণ করতেন।

রাসূলুল্লাহ সঃ তাঁর চিঠির শুরু করতেন বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম দিয়ে

কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার আরেকটি দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ সঃ তাঁর চিঠির শুরুতে বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম লিখতেন। বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত আছে, রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে পাঠানো রাসূলুল্লাহ সঃ-এর চিঠির শুরু হয়েছিল বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম দিয়ে। তারপর বলা হয়েছিল, 'যারা হিদায়াতের পথ অনুসরণ করবে, তাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক'।^{১৫}

হুদাইবিয়ার চুক্তির সময়, কুরাইশের পক্ষ থেকে মুসলিমদের কাছে দূত হিসেবে পাঠানো হয় সুহাইল ইবনু আমরকে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী ﷺ-কে বলেছিলেন,

اَكْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

‘লেখো, বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম।’^(৫)

যুহরি ﷺ অনুক্রম আরেকটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। এ ব্যাপারে ইবনু হাজার ﷺ বলেছেন, ‘আলেমদের মাঝে এর ব্যাপক চর্চা ছিল এবং এটি একটি প্রতিষ্ঠিত বিষয় যে, তারা সব সময় বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম বলে তাদের কাজ শুরু করতেন।’ আবু বকর ﷺ-ও একই কাজ করতেন। আনাস ইবনু মালিক ﷺ-কে সাদাকার ব্যাপারে চিঠিসহ বাহরাইনে পাঠাবার সময় আবু বকর ﷺ চিঠির শুরুতে বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম লিখেছিলেন।

বাসমালাহ-এর ব্যাপারে একটি দুর্বল হাদিস

কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার ব্যাপারে একটি যইফ বা দুর্বল হাদিস আছে। এই হাদিসে বলা হয়েছে—‘বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম ছাড়া শুরু করা কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে কল্যাণ হবে না।’^(৬)

একটি বর্ণনায় এখানে আকতা (أَفْع) ও অন্য একটি বর্ণনায় আবতার (أُبْر) শব্দটি এসেছে। হাদিসটি ইবনু হিব্বানসহ আরও কিছু গ্রন্থে পাওয়া যায় এবং এটি যইফ। কিছু কিছু আলামিন এ হাদিসটির বিশ্বস্ততা প্রমাণের অনেক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু হাদিসটি যইফ। ইবনু হাজার, আস-সুয়ুতী, আলবানি ﷺ এবং আরও অনেক মুহাদ্দিস এই হাদিসটিকে যইফ বলেছেন। এর পেছনে অনেকগুলো কারণ আছে, যেগুলোর বিস্তারিত আলোচনায় আমরা এখন যাচ্ছি না। তবে হাদিসটির যইফ হবার কারণগুলোর বিস্তারিত আলোচনা নিয়ে মাগরিবের বিখ্যাত হাদিস বিশারদ শাইখ আল-কাত্তানি ﷺ-এর-যিনি প্রায় ৮০ বছর আগে ইন্তেকাল করেন—একটি সম্পূর্ণ পুস্তিকা আছে, যার নাম হলো: الأَوَّلُ المَفْصَلَةُ لِبَيَانِ حَدِيثِ الْإِبْدَاءِ بِالْبِسْمَةِ : (আল আকায়িলুল মুফাস্সালাহ লিবায়ানি হাদিসিল ইবতিদায়ি বিল-বাসমালাহ)।

এই হাদিসটি সহিহ হলে, আমাদের অন্য কোনো দলিল পেশ করার প্রয়োজন হতো না। প্রমাণ হিসেবে এটাই যথেষ্ট হতো। কিন্তু হাদিসটি যইফ হওয়াতে আমরা একে দলিল হিসেবে ব্যবহার করতে পারি না। এ কারণে আমরা অন্যান্য দলিল-প্রমাণাদির ভিত্তিতে দেখিয়েছি যে, কোনো কিছুর শুরুতে, যেমন বই লেখার আগে, বিসমিল্লাহ বলার অনুমোদন আছে।

৫ সহিহ মুসলিম, হাদিস নং : ৪৭৩২

৬ এর সনদে কুররাহ ইবনু আবদিল রাহমান রয়েছে। ইমাম আবু যুরয়া ﷺ তাকে মুনকার বলেছেন। ইমাহইয়া ইবনু যামিন ﷺ দুর্বল বলেছেন। ইমাম আহমাদ ﷺ বলেছেন, হাদিসটি মারাত্মক পর্যায়ের অগ্রহণযোগ্য। (দেখুন : তাহযিবুত তাহযিব, ৮/৩৭৩)

বাসমাল্লাহ-এর বারাকাহ :

কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার মাধ্যমে আমরা এতে বারাকাহ চেয়ে থাকি। যেকোনো কাজে বারাকাহ পাবার জন্য শুরুতে বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহিম বলুন। ইসলাম আমাদের উদ্বুদ্ধ করে সর্বাবস্থায়, সকল পরিস্থিতিতে বিসমিল্লাহ বলতে।

যানবাহনে চড়ার সময় বিসমিল্লাহ বলুন। নূহ আলাইহিস সালাম তাঁর কণ্ঠকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন :

ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللّٰهِ.....

এতে আরোহণ করো, আল্লাহর নামে। (সূরা হুদ, ৪১)

কুরবানির সময় বিসমিল্লাহ বলুন।

فَكُلُوا مِنَّا ذَكْرًا اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ

'যে জন্তুর জবাইকালে আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়, তা থেকে ভক্ষণ করো।' (সূরা আল-আনআম, ১১৮)

খাওয়া ও পান করার সময় বিসমিল্লাহ বলুন। উমার ইবনু আবি সালামাহ রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন,

سَمِ اللّٰهَ وَكُلْ بِبَيْنِكَ وَكُلْ مِنَّا يَلِيكَ

'বিসমিল্লাহ বলে খাবার শুরু করো, ডান হাত দিয়ে খাও। আর তোমার নিকটাত্ম থেকে খাও।' ^(১)

এমনকি স্ত্রীর সাথে অন্তরঙ্গতার সময়ও রাসূলুল্লাহ সঃ আমাদের বিসমিল্লাহ বলতে শিখিয়েছেন :

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

আল্লাহর নামে শুরু করছি। হে আল্লাহ, আমাদের শয়তান হতে বাঁচান এবং আমাদের যে সন্তান দেবেন তাকেও শয়তান হতে বাঁচান। ^(২)

ঘরের বাতি নেভানো এবং পাত্র ঢেকে রাখার সময়ও বিসমিল্লাহ বলুন। বুখারি ও মুসলিমে আছে, জাবির ইবনু আবদিল্লাহ রাঃ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, 'আল্লাহ সঃ -এর

১ সহিহুল বুখারি : ৫৩৭৬; সহিহ মুসলিম : ৫৩৮৮

২ সহিহুল বুখারি : ১৪১; সহিহ মুসলিম : ৩৬০৬

নামে পাত্র ঢেকে রাখবে এবং আল্লাহ ﷻ-এর নামে বাতি নিভিয়ে দেবে।”^১

জীবনকে বারাকাহপূর্ণ করে তুলতে প্রতিটি কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার অভ্যাস করুন। বর্তমানে আমাদের জীবন থেকে বারাকাহ চলে যাবার একটি কারণ হলো দৈনন্দিন জীবনের কাজগুলোর শুরুতে বিসমিল্লাহ না বলা। অন্যরা যখন দুনিয়াবি উপকরণের মাঝে বারাকাহ খুঁজে বেড়ায়, আমরা মুসলিমরা তখন আল্লাহ ﷻ-এর কাছে বারাকাহ চাই। বিসমিল্লাহ হলো প্রতিটি কাজে বারাকাহ পাবার উপায়। যদি আল্লাহ ﷻ-এর পক্ষ থেকে বারাকাহ আপনার সাথে থাকে, তবে অন্য কিছু কি আর প্রয়োজন আছে?

আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

‘যদি নগরবাসী ঈমান আনতো এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তাহলে অবশ্যই আমি তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর কল্যাণসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম।’ (সূরা আল-আরাফ, ৯৬)

বিসমিল্লাহ বলুন, আল্লাহ ﷻ আপনার জন্য আসমান ও জমিনের কল্যাণের দরজা খুলে দেবেন। বারাকাহ আল্লাহ ﷻ-এর পক্ষ থেকে কল্যাণ। আমরা অনেক সময় চিন্তা করি, কেন আজ আমাদের সময়, খাবার, ঘুম কিংবা কুরআন তিলাওয়াত - কিছুতেই কোনো বারাকাহ নেই। নিজেকে প্রশ্ন করুন, আপনি কি এতদিন কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলেছেন? অন্তরের গভীর থেকে এর প্রকৃত অর্থ বুঝে বলেছেন? ইন শা আল্লাহ এই আলোচনার পর আপনি বিসমিল্লাহর তাৎপর্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ নতুনভাবে চিন্তা করতে শিখবেন।

বিসমিল্লাহ নাকি বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম? :

কোনো কাজের শুরুতে আমরা কি শুধু 'বিসমিল্লাহ' বলব, নাকি 'বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম'? এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, যেসব কাজের শুরুতে শুধু 'বিসমিল্লাহ' বলার সুনির্দিষ্ট দলিল আছে সেগুলো ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ 'বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম' বলা যাবে। যেমন : বই লেখা, দৈনন্দিন ডাইরি লেখা এসব ক্ষেত্রে আপনি সম্পূর্ণ বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম বলতে পারেন। এটা মুত্তাহাব। অবশ্য লেখালেখির বিষয়, যেমন বই লেখার ক্ষেত্রে, সম্পূর্ণ বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম বলার স্বপক্ষে দলিলও পাওয়া যায়। যেমন : হুদাইবিয়া সন্ধির সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ চুক্তিপত্রে সম্পূর্ণ বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম লেখার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং যে বিষয়ে শুধু 'বিসমিল্লাহ' বলার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট দলিল নেই, সে ক্ষেত্রে আপনি বিসমিল্লাহ কিংবা বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম, যেকোনো একটা বলতে পারবেন।

তবে কিছু বিষয়ের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধু বিসমিল্লাহ বলেছেন, এমন দলিল আছে। যেমন : খাওয়ার আগে কি আপনি বিসমিল্লাহ বলবেন, নাকি বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম? এ ব্যাপারে স্পষ্ট দলিল পাওয়া যায়। *সুনান আত-তিরমিযি*তে আ'ইশা রাঃ থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, খাবার সময় বিসমিল্লাহ বলো। আর যদি খাবার শুরুতে বলতে ভুলে যাও তাহলে বলো,

بِسْمِ اللَّهِ أَوْلَهُ وَأَخِرُهُ

আল্লাহর নামেই শুরু এবং শেষ।^(১০)

লক্ষ করুন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিন্তু বলেননি, **أُولَهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** বলা। এই হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ খাবার শুরুতে শুধু ‘বিসমিল্লাহ’ বলতে বলেছেন এবং তিনি এ কথাটি দুবার বলেছেন। প্রথমবার বলেছেন, খাবার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা। দ্বিতীয়বার খাবার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে গেলে কী বলতে হবে, সেটা তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। যদি কেউ শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে যায়, তাহলে যখনই মনে পড়বে তখন সে বলবে,

بِسْمِ اللَّهِ أُولَهُ وَآخِرُهُ

দুবারই রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধু বিসমিল্লাহ বলতে বলেছেন।

ইবনু মাসউদ রাঃ থেকেও এই হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। ইবনু হাজার আসকালানি রাঃ বলেছেন, এটি উক্ত বিষয়ের (অর্থাৎ খাবার আগে বিসমিল্লাহ বলার) ওপর বর্ণিত সবচেয়ে স্পষ্ট হাদিস।

সমস্যা হলো, ইমাম নাওয়াউয়ী রাঃ তার *আল-আযকার* গ্রন্থে বলেছেন, খাবার আগে বিসমিল্লাহ বলার চেয়ে বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম বলা ভালো।^{১১} শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ রাঃ ও বলেছেন, এ ক্ষেত্রে বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম বলা উত্তম।^{১২} তবে ইমাম নাওয়াউয়ী রাঃ-এর এই উদ্ধৃতির ব্যাপারে ইবনু হাজার আসকালানি রাঃ মন্তব্য করেছেন, ‘বিসমিল্লাহর চেয়ে বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম বলা উত্তম, এ কথার পক্ষে কোনো দলিল আছে বলে আমার জানা নেই।’^{১৩}

সামুরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِذَا حَدَّثُكُمْ حَدِيثًا فَلَا تَزِيدَنَّ عَلَيْهِ

‘তোমরা হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে আমার কথার সাথে অতিরিক্ত কিছু যোগ করো না।’^{১৪}

‘আমার কথার সাথে বাড়তি কিছু যোগ করো না’ এই কথাটির দুটো অর্থ আছে। সাধারণভাবে এর অর্থ হলো কোনো হাদিস শেখার পর তা বর্ণনা করার সময় বাড়তি কিছু যোগ করা যাবে না। তবে প্রায়োগিক দিক থেকে, আমল ও ইবাদতের ক্ষেত্রেও এর একটি অর্থ আছে। আর এ অর্থটি হলো, ইবাদতের ক্ষেত্রেও হাদিসে যা এসেছে তার সাথে বাড়তি যোগ করা যাবে না। যদি হাদিসে শুধু ‘বিসমিল্লাহ’ বলার কথা এসে থাকে, তাহলে শুধু বিসমিল্লাহ বলুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি কোনো ক্ষেত্রে বিসমিল্লাহর সাথে আর-রাহমান, আর-রাহীম যুক্ত না করে থাকেন, তাহলে আমাদের আগ বাড়িয়ে সেটা করার দরকার নেই।

একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ এক বালককে শেখাচ্ছিলেন—মাথায় রাখুন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ

১১ নাওয়াউয়ী, *আল-আযকার* : ১/২৩১

১২ ইবনু তাইমিয়াহ, *ফাতাওয়া আল-কুবরা* : ৫/৪৮০

১৩ আসকালানি, *ফাতহুল বারি* : ৯/৪৩১

১৪ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, বর্ণনা নং : ২০১৩৮

কখনোই দ্বীনের কোনো ইলম গোপন করতেন না, বিশেষ করে কিছু শেখানোর সময়। তিনি ছিলেন আল্লাহ ﷻ-এর পক্ষ থেকে একজন ফায়সালা প্রদানকারী, যখন তিনি কিছু দেখতেন সে বিষয়ে ফায়সালা দিতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ উমার ইবনু আবি সালামাহ ﷺ-কে বলেছিলেন :

قُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَكُلْ بِبَيْتِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ

‘বিসমিল্লাহ বলে খাও, ডান হাতে খাও এবং তোমার কাছ থেকে খাও।’^{১০}

এ হাদিসে খাবার শুরুতে শুধু বিসমিল্লাহ বলার কথা এসেছে। অনেকেই বলবেন যে, এ বিষয়টিকে এত গুরুত্ব দেয়ার কী আছে? বিসমিল্লাহ নাকি বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহিম, এটাকে এত বড় করে দেখার কী হলো? গুরুত্ব দেয়ার কারণ হলো, বিষয়টি ইবাদতের সাথে সম্পৃক্ত। ইবাদতের বেলায়, আমরা কেবল দলিল ও প্রমাণের ওপর ভিত্তি করেই আমল করব। কেননা, ইবাদত কিংবা ইসলামের অন্য কোনো বিষয়ে নিজ থেকে বাড়তি কিছু সংযোজন করার অর্থ হলো আমরা যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে বলছি, ‘এ ব্যাপারে আপনারা পুরোপুরি জানেন না, তাই আমি নিজের পক্ষ থেকে সামান্য কিছু যোগ করতে চাই’ ইসলামে নতুন বিষয় সংযোজন করা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে এ কথা বলার মতোই।

সহিহ মুসলিমে এসেছে, এক জুমুআর দিনে উমারাহ ইবনু রুয়া ইবাহ ﷺ দেখলেন বিশর ইবনু মারওয়ান মিস্বারে দাঁড়িয়ে দুহাত তুলেছেন। তখন উমারাহ বললেন, فَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ, আল্লাহ ﷻ এ দুহাতকে লাঞ্চিত করুন। আমি নবি ﷺ-কে মিস্বারে দাঁড়ানো দেখেছি, তিনি কখনোই তর্জনী ওঠানোর বেশি আর কিছু করেননি। নবি ﷺ কেবল এতটুকুই করেছিলেন, তুমি কোথা থেকে এই নতুন বিষয় (দুহাত তোলা) আমদানি করলে?^{১১}

ইমাম নাওয়াউদী ﷺ এ হাদিসের ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, ‘খুতবাহ দেয়ার সময় হাত না তোলা সুন্নাহ।’^{১২}

কিছুদিন আগে এ বিষয়টি নিয়ে আমি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। আমি এলাকার একটি মাসজিদে জুমুআ পড়তে গিয়েছিলাম। খতিব ছিলেন একজন যুবক। তিনি এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে বললেন খুতবার সময় দুহাত তোলা উচিত না। তারপর তো মাসজিদে গন্ডগোল বেধে গেল। ‘হ্যাঁ! হাত তোলা যাবে না মানে?! কোন সাহসে আপনি এ কথা বলছেন?’ এ ধরনের উত্তেজিত কথাবার্তা শুরু হয়ে গেল। তাই বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য আমি প্রবন্ধটি লিখেছিলাম। বিষয়টি নিয়ে আরও বিস্তারিত জানতে চাইলে আপনারা প্রবন্ধটি দেখতে পারেন।^{১৩}

১৫ বাগাবি, মু'জামুস সাহাবাহ, বর্ণনা নং : ১৭৭২

১৬ সহিহ মুসলিম : ২০৫৩, সুন্নাহু আবি দাউদ : ১১০৬

১৭ নাওয়াউদী, শারহ মুসলিম : ১৫/১৬২

১৮ Raising the Hands During Jumma Khutbah for Dua'
http://www.ahmadjibril.com/articles/jummahhands.html

যুস্তাদারাক আল-হাকিমের বর্ণনায় এসেছে, ইবনু উমার রাঃ একবার এক লোককে হাঁচি দিতে দেখার পর বললেন, 'হাঁচি দেওয়ার পর তুমি কী বলো? তুমি আলহামদুলিল্লাহ বলবে।'

আসলে ওই লোকটি হাঁচি দেয়ার পর 'আলহামদুলিল্লাহি ওয়াস-সালাতু ওয়াস-সালাম 'আলা রাসূলিল্লাহ' বলেছিলেন। তিনি 'ওয়াস-সালাতু ওয়াস-সালাম 'আলা রাসূলিল্লাহ', এই অংশটুকু বাড়িয়ে বলেছিলেন। লক্ষ করুন, ওয়াস-সালাতু ওয়াস-সালাম 'আলা রাসূলিল্লাহ এর অর্থ অত্যন্ত চমৎকার। 'দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলুল্লাহ সঃ-এর ওপর।' কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, 'হাঁচি দেয়ার পর আলহামদুলিল্লাহর পাশাপাশি এই চমৎকার কথাটা বললে অসুবিধাটা কোথায়? এটা তো সুন্দর কথা!' কিন্তু ইবনু উমার রাঃ তাকে বাড়তি এ কথাটুকু বলতে মানা করলেন। তিনি লোকটিকে শুধু 'আলহামদুলিল্লাহ' বলতে বললেন, কারণ রাসূলুল্লাহ সঃ শুধু আলহামদুলিল্লাহ-ই বলেছেন, বাড়তি কিছু বলেননি।

ইবনু আবিদিন রাঃ বলেছেন, তোমাদের কেউ হাঁচি দিলে আলহামদুলিল্লাহ বলবে, আর এর সাথে 'ওয়াস-সালাতু ওয়াস-সালাম 'আলা রাসূলিল্লাহ' যুক্ত করা অপছন্দনীয়। আস-সুয়ুতি রাঃ বলেছেন, যদিও রাসূলুল্লাহ সঃ তাঁর কিছু খুতবাহর শুরুতে আলহামদুলিল্লাহ ওয়াস-সালাতু ওয়াস-সালাম 'আলা রাসূলিল্লাহ বলেছেন, তারপরও এ ব্যাপারে দ্বিমত নেই যে, হাঁচির পর 'আলহামদুলিল্লাহ'-এর সাথে এমনটা বলা জঘন্য বিদআহ। তাই হাঁচির পর শুধু আলহামদুলিল্লাহ বলবেন, কারণ নব্বিজি সঃ আলহামদুলিল্লাহ-ই বলেছেন, আর কিছু বলেননি। আপনি আলহামদুলিল্লাহ বলার পর কেউ সেটার জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বললে, সেটার জবাব দিন। তারপর ইচ্ছে হলে আলাদাভাবে 'ওয়াস-সালাতু ওয়াস-সালাম 'আলা রাসূলিল্লাহ' বলুন। যতবার ইচ্ছা বলুন। কোনো সমস্যা নেই।

আমরা খাবার ব্যাপারটাতে ফিরে যাই। রাসূলুল্লাহ সঃ উমার ইবনু আবি সালামাহ রাঃ-কে বলেছেন :

إِذَا أَكَلْتَ، فَقُلْ : بِسْمِ اللَّهِ، وَكُلْ بَيِّنِكَ

যখন তুমি খাবার খাবে, তখন বিসমিল্লাহ বলবে এবং ডান হাতে খাবে।^[১১]

আমরা এ হাদিসেও দেখছি, তিনি সঃ সম্পূর্ণ বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম বলতে বলেননি। এ ছাড়া এ ব্যাপারে আ'ইশা রাঃ এবং ইবনু মাসউদ রাঃ হতে বর্ণিত হাদিসগুলোও আছে, যেগুলোকে ইবনু হাজার রাঃ এই বিষয়ের সবচেয়ে স্পষ্ট দলিল বলেছেন। কাজেই হাদিসের বক্তব্যের অনুসরণ করাই উত্তম।

আরও কিছু ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সঃ শুধু 'বিসমিল্লাহ' বলার কথা বলেছেন।

যেমন : ক্রীর সাথে অন্তরঙ্গতার সময়। বুখারি ও মুসলিমে^[২০] আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَبَبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَبَبَ الشَّيْطَانُ مَا رَزَقْتَنَا

অর্থ : আল্লাহর নামে শুরু করছি, হে আল্লাহ, আমাদের তুমি শয়তান থেকে দূরে রাখো এবং আমাদের তুমি যা দান করবে তা থেকেও শয়তানকে দূরে রাখো।

আনাস রূঃ হতে বর্ণিত হাদিসে^[২১] এসেছে, টমলেটে যাবার সময় বলতে হবে,

بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبَيْثِ وَالْخَبَائِثِ

অর্থ : আল্লাহর নামে শুরু করছি, হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুই পুরুষ জিন ও দুই নারী জিনের অনিষ্ট থেকে।

লক্ষ করুন, সবগুলো ক্ষেত্রেই সুনির্দিষ্টভাবে শুধু বিসমিল্লাহ বলার কথা এসেছে। কাজেই যেসব ক্ষেত্রে শুধু ‘বিসমিল্লাহ’ বলার বিষয়টি এভাবে সুনির্দিষ্ট হাদিস বা দলিল দ্বারা প্রমাণিত না, সেসব ব্যাপারে আপনি চাইলে সম্পূর্ণ ‘বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহিম’, বলতে পারেন। কিন্তু যেসব বিষয়ে শুধু ‘বিসমিল্লাহ’ বলার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই এর ওপরেই আমল করতে হবে।

আল্লাহ :

আল্লাহ হলো ওই রবের স্বতন্ত্র নাম যিনি সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন এবং নির্দিষ্ট আকৃতি দিয়েছেন। ‘আল্লাহ’ হলো ওই নাম যা শুধুই আল্লাহ ﷻ-এর জন্য নির্ধারিত।

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا

তিনি আকাশ, জমিন আর এ দুয়ের মাঝে যা আছে তার প্রতিপালক, কাজেই তুমি তাঁর ইবাদত করো এবং এর ওপর দৃঢ় থাকো। তুমি কি তাঁর সমগুণসম্পন্ন আর কাউকে জানো? (সূরা মারইয়াম, ৬৫)

‘তুমি কি তাঁর সমগুণসম্পন্ন আর কাউকে জানো?’ আয়াতের শেষাংশের এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য কী? এখানে মূলত উত্তর জানার জন্য প্রশ্ন ছুড়ে দেওয়া হয়নি; বরং এটা একটা রেটোরিকাল প্রশ্ন, যা করা হয়েছে একটি নির্দিষ্ট উত্তরের দিকে ইঙ্গিত করার জন্য। আমাদের সামনে একটি নির্দিষ্ট উত্তর তুলে ধরার জন্য। কিছু আলিম বলেছেন, ‘আপনি কি আপনার রবের সমগুণসম্পন্ন আর কাউকে জানেন?’ এর অর্থ হলো আল্লাহ ছাড়া এমন আর কোনো সত্তা নেই যার নাম ‘আল্লাহ’।

২০ সহিহুল বুখারি : ১৪১; সহিহ মুসলিম : ৩৬০৬

২১ নাওয়াউদী, আল-আযকার, ৩৮ পৃ.

এর মানে কী? আসুন একটু বিস্তারিতভাবে দেখা যাক।

আল্লাহ শব্দটি এসেছে আরবি ইলাহ (إله) থেকে। ইবনুল কাইয়িম رحمہ اللہ এবং আরও অনেকের মতে আল্লাহ শব্দের মূল শব্দ হলো ইলাহ। ইলাহ এসেছে উলুহিয়াহ (একত্ব) থেকে। ইলাহ অর্থ একত্ব। এই মূল ইলাহ শব্দ থেকেই আল্লাহ নামের উৎপত্তি। সিবাওয়াইহ বলেন, ইলাহর সাথে যথাক্রমে আলিফ ও লাম যুক্ত হয়েছে তাযিম বা সম্মানার্থে। ইলাহর সাথে আলিফ ও লাম যোগ করে যদি আপনি শাদ্দাহ যোগ করেন এবং একটি হামযা বের করে দেন, তাহলে ‘আল্লাহ’ নামটি পাবেন।

কুরআনে ‘আল্লাহ’ এবং ‘রব’, কোনটি কখন ব্যবহার করা হয়েছে লক্ষ করুন :

মুসা عليه السلام তাঁর পরিবারকে শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচাতে আগুনের সন্ধানে বের হয়েছিলেন। উষ্ণতার জন্য আগুন ও পথচলার জন্য তাঁর প্রয়োজন ছিল আলোর। আল্লাহ ﷻ কুরআনে বলেন :

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى

হে মুসা, নিশ্চয় আমিই তোমার রব। সূতরাং তুমি তোমার জুতা খুলে ফেলো, কেননা তুমি এখন পবিত্র তুয়া উপত্যকায় রয়েছ। (সূরা আত-ত্বহা, ১২)

আল্লাহ বলছেন, হে মুসা, নিশ্চয় আমিই তোমার রব। তিনি এখানে ‘রব’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তিনি পালনকর্তা হিসেবে তাঁর পরিচয় বেছে নিয়েছেন, কেননা এ সময় এটাই ছিল সবচেয়ে উপযুক্ত। আল্লাহ ﷻ মুসা عليه السلام-কে এর মাধ্যমে বলছেন, আমিই তোমার দেখাশোনা করি এবং তোমাকে বাঁচিয়ে রাখি। আমিই তোমাকে রক্ষা করি, নিরাপত্তা দিই এবং আমিই তোমাকে রিয়ক দিই। বলুন তো, এগুলো তাওহিদের কোন দিক? এটা হলো তাওহিদ আর-রুবুবিয়াহ। অর্থাৎ রব হিসেবে আল্লাহ ﷻ-এর একত্ব।

তারপর একই কথোপকথনে আল্লাহ ﷻ তাঁর ‘আল্লাহ’ নামটি ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ۖ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

আমি তোমাকে মনোনীত করেছি, অতএব যা প্রত্যাদেশ করা হচ্ছে, তা শুনতে থাকো। আমিই আল্লাহ। আমি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। অতএব আমার ইবাদত করো এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম করো। (সূরা আত-ত্বহা, ১৩-১৪)

এবার আল্লাহ ﷻ বলছেন ‘আনাল্লাহ’ (أَنَا اللهُ)–আমিই আল্লাহ। এখানে তিনি ‘রাব্বুকা (رَبُّكَ)–তোমার রব’ ব্যবহার করেননি। কিছুক্ষণ আগেই তিনি নিজেকে ‘রব’ নামে অভিহিত করেছেন, আবার এখন ‘আল্লাহ’ বলছেন, কেন?

প্রথমে মুসা ﷺ তীতসম্মত হয়ে পড়েছিলেন, তাই আল্লাহ ﷻ তাকে আশ্বস্ত করলেন, নিজেকে রব অভিহিত করে মুসা ﷺ-কে বোঝালেন—আমি তোমার খেয়াল রাখি, তোমাকে রক্ষা করি, নিরাপত্তা দান করি এবং সাহায্য করি। আর পরেরবার আল্লাহ ﷻ মুসা ﷺ-কে তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করলেন। অর্থাৎ মুসা ﷺ-কে জানালেন, হে মুসা, তোমাকে এই এই কাজগুলো করতে হবে।

তাওহিদের এই শাখাকে কী বলা হয়? যখন আল্লাহ ﷻ-এর আনুগত্যের ব্যাপার আসে, তখন সেটা তাওহিদের কোন শাখায় পড়ে? তাওহিদ আল-উলুহিয়াহ। অর্থাৎ ইবাদত ও আনুগত্যের মালিক হিসেবে, ইলাহ হিসেবে আল্লাহ ﷻ-এর একত্ব।

আর এ কারণেই আল্লাহ ﷻ এ ক্ষেত্রে ‘রব’-এর পরিবর্তে ‘আল্লাহ’ নামটি ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ ﷻ বলছেন :

فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ

আমার ইবাদত করো, সালাত কয়েম করো।

এগুলো কী? আনুগত্য ও ইবাদতের নির্দেশ। আর এসবই হচ্ছে তাওহিদ আল-উলুহিয়াহর অন্তর্ভুক্ত।

তাই প্রথমে আল্লাহ ﷻ বললেন :

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ

নিশ্চয়ই আমি তোমার রব।

পরেরবার বললেন :

إِنِّي أَنَا اللَّهُ

নিশ্চয়ই আমিই আল্লাহ।

চাইলে তিনি যেকোনো একটি নাম ব্যবহার করতে পারতেন। কিন্তু বিভিন্ন প্রেক্ষাপট অনুযায়ী কখনো ‘আল্লাহ’, কখনো ‘রব’ ব্যবহৃত হয়েছে। আর এটা কুরআনের ভাষাগত গভীরতা ও সূক্ষ্মতার প্রমাণ।

আল্লাহ এক অনন্য নাম

আল্লাহ ﷻ-কে ডাকার সময় আমরা বলি, ‘ইয়া আল্লাহ’ বা ‘হে আল্লাহ’। আরবি ভাষাতত্ত্ববিদ ও সালাফদের অন্তর্ভুক্ত আলিমগণ, সবাই বলেছেন যে, ইয়া আল্লাহ বলতে হবে (ইয়া ইলাহ

না)। কিন্তু আল্লাহ ﷻ-এর অন্য নামগুলোর দিকে তাকান। আমরা কি বলি 'ইয়া আল-জাব্বার', 'ইয়া আল-কারিম' কিংবা 'ইয়া আর-রাহীম'? না, বরং আমরা শুরুতে 'আল' যুক্ত না করেই, ইয়া কারিম, ইয়া রাহীম, ইয়া গাফুর ইত্যাদি বলি। আল্লাহ নামের শুরুতে আলিফ এবং লাম থাকার কারণে, তা 'নির্দিষ্ট' অর্থ বোঝায়।^[২২] এটাই হচ্ছে অন্য সব নামের তুলনায় আল্লাহ নামের স্বাতন্ত্র্য। এর ওপর ভিত্তি করে ইমাম ত্বহাবি, ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ-সহ অনেকে বলেছেন, কেউ যদি এই মহান, বরকতময় নাম উল্লেখ করে দুআ করে, ডিম্বা চায়, তবে আল্লাহ ﷻ তার উত্তর দিয়ে থাকেন। আসমা ওয়াস সিন্ধাত নিয়ে আলোচনা করার সময় ইন শা আল্লাহ এ বিষয়ে আমরা আরও আলোকপাত করব।

শুধু 'আল্লাহ' শব্দে কোনো যিকির নেই

দুআ, প্রশংসা, সম্মান ও শাহাদাহ সবকিছুতে আমরা আল্লাহ ﷻ-এর নাম নিই। কিন্তু শুধু 'আল্লাহ' শব্দে কোনো যিকির হয় না। এটাই আমাদের নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষা। সুতরাং এক শ বার 'আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ' বলায় আপনার কোনো লাভ নেই। তাসবীহ হাতে নিয়ে এক শ বার আল্লাহ বলতে হবে না; বরং আপনি বলুন আলহামদুলিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আপনি এভাবে বলুন যে, 'ইয়া আল্লাহ আমার অমুক জিনিসটির খুব প্রয়োজন!' শুধু 'আল্লাহ, আল্লাহ' যিকির করার শিক্ষা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দেননি।

যে পবিত্র নামের অনুগামী অন্য সব নাম

অন্য সমস্ত গুণবাচক নাম 'আল্লাহ' নামের অনুসরণ করে। আল্লাহ নামটি অন্য কোনো নামের অনুসরণ করে না। এর অর্থ কী? একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাই, তাহলে ইন শা আল্লাহ ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। দেখুন : আল-কুদ্দুস, আল-আযিয, আল-জাব্বার, আল-খালিক—এ সবগুলোই আল্লাহ ﷻ-এর নাম। কিন্তু আমরা কখনো বলি না যে, আল-আযিযের আরেকটি নাম হলো 'আল্লাহ'। আমরা বলি না যে, আর-রাহমানের আরেকটি নাম হলো আল্লাহ। এভাবে বলা অনুচিত। বরং আমরা এটাকে একটু ঘুরিয়ে বলি, আল-কুদ্দুস হলো আল্লাহ ﷻ-এর আরেক নাম। আল-আযিয হলো আল্লাহ ﷻ-এর আরেক নাম। আর-রাহমান হলো আল্লাহ ﷻ-এর আরেক নাম। অর্থাৎ অন্যান্য গুণবাচক নামগুলো 'আল্লাহ' নামের অনুসরণ করে।

২২ যেমন ইংলিশে আমরা the ব্যবহার করি। a door মানে একটি দরজা। এটা যেকোনো দরজা হতে পারে। কিন্তু the door মানে 'দরজাটি', অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট দরজা। আরবি 'আল' 'the'-এর মতো নির্দিষ্টতা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

আল্লাহ নামের মাঝে নিহিত তাওহিদ

আমরা এরই মধ্যে দেখেছি যে বাসমালাহর মধ্যে তাওহিদের তিনটি শাখার শিক্ষা অন্তর্নিহিত আছে। যখন আমরা বিসমিল্লাহ বলি, আমরা তাওহিদের তিনটি শাখার স্বীকৃতি দিই। একইভাবে আল্লাহ নামটির মধ্যেও তাওহিদের তিনটি শাখাতে বিশ্বাস নিহিত আছে। বরং আল্লাহ নামটির যে মূল শব্দ ইলাহ, তাতেই তাওহিদের পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সমন্বয় ঘটেছে এবং এই বিশ্বাসের ওপর ঈমান আনার আবশ্যিকতা প্রকাশ পেয়েছে।

توحيد الألوهية متضمن توحيد الربوبية بمعنى أن توحيد الربوبية جزء من معنى توحيد
الألوهية

তাওহিদ আর-রুবুবিয়াহ হলো তাওহিদ আল-উলুহিয়াহর অন্তর্ভুক্ত একটি অংশ। কিন্তু উল্টোটা না। তাওহিদ আল-উলুহিয়াহ কিন্তু তাওহিদ আর-রুবুবিয়াহর অংশ না। লক্ষ্য করুন, 'আল্লাহ' শব্দটি মূলত এসেছে উলুহিয়াহ (একত্ববাদ) থেকে, আবার তাওহিদ আল-উলুহিয়াহর মধ্যে তাওহিদ আর-রুবুবিয়াহ অন্তর্ভুক্ত। কাজেই 'আল্লাহ' শব্দের মাধ্যমে উলুহিয়াহ এবং রুবুবিয়াহ দুটোই প্রকাশ পায়। কাজেই এখানে তাওহিদের তিনটি প্রকারের মধ্যে দুটি পাওয়া গেল। আর 'আল্লাহ' শব্দটি স্বয়ং একটি 'ইসম' বা নাম। তাই এর মাধ্যমে তাওহিদ আল-আসমা ওয়াস সিফাতও প্রকাশ পায়। এভাবেই আল্লাহ শব্দের মাঝে তাওহিদের তিনটি শাখার সমন্বয় খুঁজে পাওয়া যায়। শুধু আল্লাহ-ই না, বরং এর মূল শব্দ ইলাহর ক্ষেত্রেও এটা সত্য।

আল্লাহ এক পরাক্রান্ত নাম

আল মু'জামুল মুফাহরাস অনুযায়ী কুরআনে মোট ২৬০২ বার 'আল্লাহ' নামটি এসেছে। এটি আল্লাহ ﷻ-এর সর্বাধিক প্রচলিত নাম। আল্লাহ ﷻ-এর সব নামের মধ্য থেকে তাওহিদের সাক্ষ্য তথা শাহাদাহর জন্য বাছাই করা হয়েছে এই নামটিকেই। শাহাদাহ পড়ার সময় আমরা বলি, 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। 'আল্লাহ' এই মহিমাধিত্ব নামের ওপরেই আমরা ঈমানের সাক্ষ্য দিই।

আল্লাহ-নিছক একটি নাম না। আপনি যখন বলছেন 'আল্লাহ', তখন মহিমাধিত্ব, পরাক্রমশালী ও পরম সম্মানিত এক সত্তার নাম উচ্চারণ করছেন। চরম আতঙ্কের মুহূর্তে নিরাপত্তার জন্য আমরা এ নাম ধরেই ডাকি। অভাবের সময় সামান্য জিনিসের ওপর বারাকাহর প্রয়োজনে আমরা এই পবিত্র নামটিই স্মরণ করি, আর অপ্রতুলতা প্রাচুর্যে পরিণত হয়। আশঙ্কায় পতিত ব্যক্তি নিরাপত্তার আশায় এই নাম উচ্চারণ করে। চরম দুর্দশা, দুঃখ, কষ্ট ও নিদারুণ যন্ত্রণায় আমরা এই নামটিই স্মরণ করি-আল্লাহ! যখন মানুষ বিপদ ও চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় আল্লাহ ﷻ-কে ডাকে, আল্লাহ ﷻ তার বিপদ ও চিন্তা দূর করে দেন। যখন কোনো অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি

‘আল্লাহ’ নামকে আঁকড়ে ধরে, আল্লাহ ﷻ তাকে সচ্ছলতা দান করেন। পীড়িত ব্যক্তি যখন আল্লাহ ﷻ-কে এ নামে ডাকে, আল্লাহ ﷻ তাকে সুস্থতা দান করেন। এ নাম যখন চরম দুর্দশাপন্ন ব্যক্তির মুখে উচ্চারিত হয়, সে নিরাপত্তা লাভ করে। যখন অসহায় ব্যক্তির মুখে উচ্চারিত হয়, আল্লাহ ﷻ তাকে ক্ষমতা ও মর্যাদা দান করেন। যখন কোনো মাযলুম এ নামকে আঁকড়ে ধরে, এই নামে মালিককে ডাকে, আল্লাহ ﷻ তাকে বিজয় দান করেন।

যদি অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী হন, তবে আপনার রবকে ‘আল্লাহ’ নামে ডাকুন। প্রাচুর্য ও বারাকাহ চাইলে ‘আল্লাহ’ বলে ডাকুন। আপনার শুনাই খাতা মাফ করাতে চাইলে আল্লাহ নামে ডাকুন।

আল্লাহ! এ কোনো সাধারণ নাম না! আমরা কি আদৌ এ নামের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করতে পারি? যে ব্যক্তি আল্লাহ ﷻ-এর নামগুলোর অর্থ অনুধাবন করবে, এ নামগুলোর মাহাত্ম্য অন্তরের গভীর থেকে উপলব্ধি করবে, সে লাভ করবে পরমানন্দ।

আল্লাহ নামটি যে হৃদয়ে রাজত্ব করে তা পরিণত হয় এক দৃঢ়, শক্তিশালী, বিশুদ্ধ ও একইসাথে রাহমাহপূর্ণ হৃদয়ে। এ হৃদয় যে আল্লাহ নামকে ধারণ করেছে! আল্লাহ তো যেনতেন কোনো নাম না! যে হৃদয় সত্যিকারভাবে ‘আল্লাহ’ নামের মর্মার্থ অনুধাবন করেছে তা কখনো, কোনো শুনাহকে তুচ্ছ ভাবতে পারে না। আমরা প্রতিদিন ১৭ বার ফরয আদায় করার জন্য আল্লাহকে ডাকি। প্রতিদিন ফরয সালাতে সূরা ফাতিহার সাথে ১৭ বার আমাদের বিসমিল্লাহ বলতে হয়। সেই সাথে সূরাহ সালাতের জন্য আরও ১০ বার আমাদের বিসমিল্লাহ বলতে হয়। আল্লাহ ﷻ-এর নির্ধারিত ফরয আদায়ের জন্য বিসমিল্লাহ বলার সময় একে অন্যান্য কোনো সাধারণ শব্দের মতো মনে করবেন না। আল্লাহ—এ কোনো মামুলি শব্দ না। স্বামী-স্ত্রী, বস, রাজা, প্রেসিডেন্ট কিংবা প্রধানমন্ত্রীর নাম নেয়ার সময় অনেকের মধ্যে এত বেশি ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখা যায়, যা আল্লাহ ﷻ-এর প্রতি তাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধাকেও ছাপিয়ে যায়। কাজেই আল্লাহ ﷻ-এর নাম শোনার পর হৃদয়ে কী অনুভব করেন, তার মাধ্যমে নিজের ঈমানের গভীরতা যাচাই করুন।

وَإِذَا دُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, এক আল্লাহর কথা বলা হলে তাদের অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়। (সূরা আয-যুমার, ৪৫)

যখন আপনি ‘আল্লাহ’ বলছেন, আপনি সেই এক ও অদ্বিতীয় সত্তার নাম নিচ্ছেন যিনি সাত আসমানকে ঊর্ধ্বে স্থাপন করেছেন কোনোরকম স্তম্ভ ছাড়াই। আপনি উচ্চারণ করছেন সেই একচ্ছত্র অধিপতির নাম, যিনি ‘কুন’ (كُنْ) আদেশ দিয়ে সাত জমিনকে আপনার নিচে সুবিন্যস্ত করেছেন, আর নিঃসৃত বীর্ষ থেকে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন সুন্দর ও শ্রেষ্ঠতম আকৃতিতে। যখনই আপনি কোনো বাক্যে ‘আল্লাহ’ শুনতে পাবেন, মনের গভীর থেকে এ কথাগুলো স্মরণ করবেন। যখন এ মহিমাযিত ও পবিত্র নাম উচ্চারণ করবেন, স্মরণে

কমবেন :

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

তারা আল্লাহর যথোচিত সম্মান করে না। এবং শেষ বিচারের দিন গোটা পৃথিবী তাঁর হাতের মুঠোয় থাকবে। আর আসমানসমূহ থাকবে তাঁর ডান হাতে ডাঁড় করা অবস্থায়। তিনি পবিত্র, আর এরা তাঁকে যার সাথে শরীক করে, সেসব থেকে তিনি বহু উর্ধ্বে। (সূরা আয-যুমার, ৬৭)

যারা আল্লাহ ﷻ-কে অবমূল্যায়ন করে, আল্লাহ ﷻ-এর নাম উচ্চারিত হলে যারা যথ্যযথ সম্মান দেয় না, তাদের মতো হবেন না। এই নামের অর্থ, এই নামের মাহাত্ম্য অনেক গভীর, অনেক ব্যাপক।

আর রাহমান আর-রাহিম :

রাহমান বলতে সেই সত্তাকে বোঝানো হয় যিনি পরিপূর্ণ দয়ার অধিকারী। যার দয়া সমস্ত সৃষ্টিকে ঘিরে রেখেছে। 'আর-রাহমান' আল্লাহ ﷻ-এর স্বতন্ত্র নামগুলোর একটি। এ নামটি শুধু মহান আল্লাহ ﷻ-এর জন্য নির্ধারিত। এটি একটি ওয়াসফ বা বর্ণনামূলক নাম, যা আল্লাহ ﷻ-এর রাহবাহ বা দয়ার বৈশিষ্ট্যকে বর্ণনা করে। তিনিই হলেন আর-রাহমান যিনি মহান, সুবিশাল, ব্যাপক ও পরম করুণার অধিকারী। আর এ পরিপূর্ণ, পরম দয়া শুধু আল্লাহ ﷻ-এর, আর কারও নয়।

আরবি ভাষার নিয়ম অনুযায়ী ফা'লান (فعلان)-এর ওয়নে (form or scale) থাকা শব্দগুলো দ্বারা মূলত বিশালতা, আধিক্য ও ব্যাপকতা বোঝানো হয়। ফা'লানের ওয়নের কিছু শব্দ হলো রাহমান, গাদ্বান, সারকান ইত্যাদি। লক্ষ্য করুন, এ প্রতিটি শব্দ ছন্দের দিক দিয়ে ফা'লানের সাথে মেলে। আর আরবিতে এ রকম শব্দগুলোর দ্বারা বিশালতা, আধিক্য ও ব্যাপকতা বোঝানো হয়। কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে এ ধরনের শব্দগুলো প্রয়োগ করা হলে কেমন অর্থ প্রকাশ পায় দেখুন :

গাদ্বান, এ শব্দটির অর্থ রাগ। কিন্তু কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হলে এটা শুধু রাগ বোঝায় না, বরং প্রচণ্ড ও চরমমাত্রার রাগ বোঝায়। একইভাবে ব্যক্তির ক্ষেত্রে আত্মশান শব্দটি ব্যবহার করা হলে সেটা প্রচণ্ড, মারাত্মক ও তীব্র পিপাসাকে বোঝায়। অর্থাৎ ফা'লানের সাথে একই ছন্দে থাকা এ শব্দগুলো দ্বারা ব্যাপকতা ও আধিক্য বোঝানো হয়। আর-রাহমান এর ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই রকম, আর তাই শুধু আল্লাহ ﷻ-এর জন্যই এ শব্দটি প্রযোজ্য। আর-রাহমান দ্বারা এমন পর্যায়ের দয়া বা করুণা বোঝানো হয় যা একমাত্র আল্লাহ ﷻ-এর এগতিয়ারডুস্ত। মু'জামুল মুফাহরাস অনুযায়ী কুরআনে ৫৭ বার আর-রাহমান এসেছে।

আল্লাহ ﷻ হলেন আর-রাহমান, পরম দয়াময়, পরম করুণাময়।

এবার আসা যাক আর-রাহিমের আলোচনায়। আর-রাহিম হলো এমন একটি নাম যা ক্রিয়া বা কর্ম নির্দেশ করে। এ নামটির অর্থ কাজের সাথে যুক্ত। আর রাহিম দ্বারা বোঝানো হয় সেই একক সত্তাকে যার করুণা সকলের কাছে পৌঁছায়। এটি আল্লাহ ﷻ-এর নাম, তবে শর্তসাপেক্ষে মানুষের ক্ষেত্রে এ নাম ব্যবহার করা যায়। মু'জামুল মুফাহরাস অনুযায়ী কুরআনে ১১৪ বার আর-রাহিম নামটি এসেছে। এর দ্বারা আল্লাহ ﷻ-এর দয়াকে বোঝানো হয় যা পরিব্যাপ্ত করে আছে সব সৃষ্টিকে।

রাহিম শব্দটি ফায়ীল (فعليل)-এর মাত্রাভুক্ত। আরবিতে ফায়ীলের অনুরূপ শব্দ, অর্থাৎ যেগুলো ফায়ীলের সাথে ছন্দে মেলে, সেগুলোর দ্বারা কোনো কাজের প্রগাঢ়, তীব্র রূপকে বোঝায় যার প্রভাব অন্যদের ওপর পড়ে। সুতরাং আল্লাহ ﷻ হলেন আর-রাহিম—এই মহাবিশ্ব ও সকল সৃষ্টির প্রতি সর্বাপেক্ষা দয়াশীল।

শর্তসাপেক্ষে এই নামটি অন্যদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায়। যেমন : মানুষ তার সন্তান, ভাই ও পরিবারের প্রতি দয়াশীল হতে পারে। তবে নিঃসন্দেহে, আল্লাহ ﷻ-এর দয়ার সাথে সৃষ্টির দয়ার তুলনা অসম্ভব। এমনকি শুরু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত সৃষ্টি এসেছে ও আসবে, তাদের সবার দয়া একত্র করলেও মহান আল্লাহ ﷻ-এর দয়া ও করুণার সাথে তুলনা সম্ভব না। আল্লাহ ﷻ আর-রাহিমের দয়ার তুলনায় সমগ্র সৃষ্টিজগতের দয়া পাখির পালক কিংবা একটি পরমাণুর সমান ওজনও রাখে না। বরং আর-রাহিমের তুলনায় সমগ্র সৃষ্টিজগতের দয়া এর চেয়েও তুচ্ছ। আপনার মধ্যে দয়া থাকতে পারে, কিন্তু সৃষ্টির দয়া কোনোভাবেই আল্লাহ ﷻ-এর দয়ার সাথে তুলনা করার যোগ্যও না। কাজেই রাহিম নামটি মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে, তবে শর্তসাপেক্ষে।

فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ
فِيهِ لَيْسَ كَيْثُلُهُ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

তিনি নভোমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং পশুদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন পশুদের জোড়া; এভাবে তিনি ওতে তোমাদের বংশবিস্তার করেন। কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (সূরা আশ-শুরা, ১১)

আল্লাহ ﷻ আরও বলেন :

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

দৃষ্টিসমূহ তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না, কিন্তু দৃষ্টিসমূহ তাঁর আয়ত্তে আছে এবং তিনিই

সুন্দরদর্শী; সম্যক পরিজ্ঞাত। (সূরা আল-আনআম, ১০৩)

আর-রাহমান ও আর-রাহীম

আর-রাহমান হলেন মহান ও পরম করুণার অধিকারী। আর-রাহীম হলেন তিনি, যার করুণা ও দয়া বর্ষিত হচ্ছে তাঁর সকল বান্দা ও সৃষ্টির ওপর। যখন একসাথে ব্যবহৃত হয় তখন 'আর-রাহমান, আর-রাহীম' শব্দগুচ্ছ দ্বারা আল্লাহ ﷻ-এর মহান, অপরিমিত ও পরম দয়াকে বোঝানো হয়।

আর-রাহমান ও আর-রাহীমের মাঝে একটি পার্থক্য আছে। যেটি আমাদের একটু আগের আলোচনায় এসেছে। পার্থক্যটি হলো, শুধু আল্লাহ ﷻ ছাড়া আর কারও ক্ষেত্রে আর-রাহমান নামটি ব্যবহার করা যাবে না। এটি আল্লাহ ﷻ-এর একটি স্বতন্ত্র নাম। তবে আল্লাহ ﷻ-এর বান্দাদের মধ্যে কারও কারও ক্ষেত্রে আর-রাহীম নামটি ব্যবহার করা যেতে পারে। আর-রাহমান নামটি শুধু আল্লাহ ﷻ-এর জন্য নির্দিষ্ট। যেসব নাম শুধুই আল্লাহ ﷻ-এর জন্য নির্দিষ্ট, সেই স্বতন্ত্র নামগুলো আর কারও ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না। পরিপূর্ণ, সামগ্রিক ও পরম দয়ার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ ﷻ। আর কারও পক্ষে এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া সম্ভব না। যেহেতু আর-রাহমান নামের মাধ্যমে প্রকাশ পাওয়া গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির মধ্যে অনুপস্থিত, তাই আমরা এই নাম ব্যবহার করতে পারি না। আমরা যেমন 'আল্লাহ' নাম ধারণ করতে পারি না, কারণ এ মহিমাযিত নামের বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের মাঝে অনুপস্থিত, ঠিক একই কথা আর-রাহমানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এটি আল্লাহ ﷻ-এর স্বতন্ত্র ও বিশেষ নামগুলোর একটি, যেগুলো শুধু তাঁরই জন্য নির্ধারিত।

একইভাবে আপনি চাইলেই আল-খালিক (সৃষ্টিকর্তা), আর-রায়যাক (পালনকর্তা), আল-আহাদ, আস-সামাদ, আল-বারি, আল-কাইয়ুম—এ নামগুলো রাখতে পারবেন না। আল-খালিক হলেন সেই সত্তা যিনি কোনো ধরনের সাদৃশ্য (কোনো তুলনা, তুলনাযোগ্য ও এর সদৃশ বস্তু) ছাড়া সৃষ্টি করেন। আপনি কি তেমন কিছু সৃষ্টি করতে পারবেন? পারবেন না। সুতরাং আপনাকে আল-খালিক নামে সম্বোধন করা যাবে না, কারণ আপনার মাঝে আল-খালিকের গুণাবলি নেই। আল-বারি হলেন নির্মাতা, যিনি একেবারে নির্ভুল ও নিখুঁত জিনিস তৈরি করেন। আপনি কি সম্পূর্ণভাবে নিখুঁত ও নির্ভুল কিছু নির্মাণ করতে পারবেন? অবশ্যই আপনি সেটা পারবেন না, তাই আপনাকে আল-বারি সম্বোধন করা যাবে না।

আবার কিছু নাম আছে যেগুলো শর্তসাপেক্ষে মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে। যেমন : গনি, মালিক, আযিয, জাব্বার ইত্যাদি।

আল-কুরআনে আল্লাহ ﷻ ইউসুফ عليه السلام-এর বিপক্ষে অভিযোগ আরোপকারী নারীর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন :

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا

নগরে মহিলারা বলাবলি করতে লাগল যে, আযিযের স্ত্রী স্বীয় গোলামকে কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য ফুসলায়। সে তার প্রেমে উন্মত্ত হয়ে গেছে। (সূরা ইউসুফ, ৩০)

এই আয়াতে আল্লাহ ﷻ ওই নারীকে আযিযের স্ত্রী বলে সম্বোধন করেছেন। সুতরাং বোঝা গেল, যদিও ‘আযিয’ আল্লাহ ﷻ-এর পবিত্র নামসমূহের একটি, তবুও সৃষ্টির ক্ষেত্রে আযিয নামটি ব্যবহার করা যাবে। একইভাবে আল্লাহ ﷻ-এর নামসমূহের একটি নাম হলো হাকিম। এ নামটিও সৃষ্টির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে। যেমন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একজন সাহাবি ছিলেন, যার নাম ছিল আল-হাকিম। হাকিম ইবনু হিজাম ؓ।

আল্লাহ ﷻ কুরআনে বলেন :

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُنْكَرٍ جَبَّارٍ

এভাবে আল্লাহ প্রত্যেক উদ্ধত ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়ে মোহর মেহে দেন। (সূরা গাফির, ৩৫)

এ আয়াতে আল্লাহ ﷻ তাঁর সৃষ্টির ব্যাপারে জাব্বার নামটি ব্যবহার করেছেন। জাব্বার আল্লাহ ﷻ-এর নাম, আবার আল্লাহ ﷻ সৃষ্টির বেলায়ও এ নাম ব্যবহার করেছেন। কুরআনে এই নামটি মোট ১০ বার ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে ৯ বার জাব্বার শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে শক্তিশালী, অত্যাচারী, স্বৈরাচারী মানুষ কিংবা কোনো ধরনের যুলুমকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে। সর্বশেষ বার আল-জাব্বার ব্যবহৃত হয়েছে সূরা হাশরে এবং এ দ্বারা আল্লাহ ﷻ-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলে এসব নাম দ্বারা কোনো না কোনোভাবে খারাপ বা নেতিবাচক অর্থ প্রকাশ পায়। যখন ইতিবাচকভাবে উল্লেখ করা হয় তখনো কিছুটা হলেও নেতিবাচকতা প্রকাশ পায়। কারণ, আমরা মানুষ, আমরা ত্রুটি মুক্ত নই। আমরা অসম্পূর্ণ। কিন্তু আল্লাহ ﷻ তো অদ্বিতীয়, অতুলনীয়। যা মানুষের ক্ষেত্রে নেতিবাচকতা প্রকাশ করে, তা-ই আল্লাহ ﷻ-এর ক্ষেত্রে স্পষ্ট, নিশ্চিত ও পরিপূর্ণ উদাহরণ। যখন আল্লাহ ﷻ-এর ক্ষেত্রে কোনো নাম প্রয়োগ করা হয় তখন সে নামের পরিপূর্ণ ও চূড়ান্ত ইতিবাচক অর্থ প্রকাশ পায়। লক্ষ করুন, আল্লাহ ﷻ কুরআনে বলছেন :

إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

নিঃসন্দেহে, আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। (সূরা আন-নিসা, ৫৮)

সূরা আল-ইনসানে মানুষের ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ বলছেন :

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্রবিন্দু থেকে, যাতে তাকে পরীক্ষা করে দেখতে পারি।
অতঃপর আমি তাকে শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন করেছি। (সূরা আল-ইনসান, ২)

এবং আল্লাহ ﷻ কুরআনে অসংখ্যবার তাঁর নিজের সম্পর্কে বলেছেন :

وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

এবং তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। (সূরা আশ-শুরা, ১১)

অর্থাৎ শোনা ও দেখা বিষয়টি সৃষ্টির ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে আবার স্রষ্টার ক্ষেত্রেও হয়েছে, তবে কোনোভাবেই এ দুটো তুলনীয় না।

তাই রাহীম নামটি মানুষের ক্ষেত্রে রাখা যেতে পারে। আপনি সন্তানের জন্য এই নাম রাখতে পারেন।

আল্লাহ ﷻ কুরআনে বলেন :

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا

এবং তিনি বিশ্বাসীদের প্রতি পরম দয়ালু। (সূরা আল-আহযাব, ৪৩)

এই আয়াতে আল্লাহ ﷻ তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-কে রাহীম সম্বোধন করেছেন।

যদিও আল্লাহ ﷻ-এর নামগুলোর মধ্য থেকে কিছু নাম মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়, কিন্তু সব সময় মনে রাখবেন, কোনোভাবেই আল্লাহ ﷻ-এর গুণাবলির সাথে সৃষ্টির গুণাবলির তুলনা করার কোনো অবকাশ নেই। অভিশপ্ত মিথ্যাবাদী মুসাইলামাহ নিজেকে রাহমান দাবি করেছিল। যে নাম শুধুই আল্লাহ ﷻ-এর জন্য নির্ধারিত তা সে নিজের সাথে যুক্ত করার ঔদ্ধত্য দেখিয়েছিল। এ স্পর্ধার শাস্তি হিসেবে আল্লাহ ﷻ তার মুখোশ উন্মোচন করে দিলেন এবং তাকে কিয়ামত পর্যন্ত মিথ্যাবাদী হিসেবে সুপরিচিত করলেন। সে নিজেকে রাহমান দাবি করেছিল, নিজের নাম রেখেছিল রাহমান আল-ইয়ামামাহ। আল্লাহ ﷻ তার পরিচিতি সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন ‘মুসাইলামাহ আল-কাযাব’ অর্থাৎ মিথ্যাবাদী মুসাইলামাহ নামে। শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত তাকে সবাই এভাবেই চিনবে। আজ যদি আপনি কাউকে প্রশ্ন করেন ‘রাহমান আল-ইয়ামামাহকে চেনো?’ কেউ কি চিনতে পারবে? কেউ এ নামে তাকে চিনতে পারবে না। মানুষের স্মৃতি এবং ইতিহাসের পাতায় সে মুসাইলামাহ আল-কাযাব বা মিথ্যাবাদী মুসাইলামাহ নামেই পরিচিত। শহর, বন্দর, গ্রাম, মরুভূমির বেদুইন ও ইতিহাসের পাতা—সব মানুষের জন্য মুসাইলামাহ পরিণত হয়েছে চূড়ান্ত মিথ্যাচারের এক দৃষ্টান্তে। এই হলো আল্লাহ ﷻ-এর স্বতন্ত্র নাম ব্যবহারের চেষ্টার শাস্তি।

সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম, আর-রাহমান এবং আর-রাহীমের প্রথম পার্থক্য হলো—আপনি চাইলে রাহীম নাম রাখতে পারেন কিন্তু আর-রাহমান নাম রাখতে পারবেন না। আর-

রাহমান কেবল আল্লাহ ﷻ-এর জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত এবং অন্য কারও বেলায় এই নাম ব্যবহার করা যাবে না। আর যে নামটি মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে, অর্থাৎ আর-রাহিম, সেটার ক্ষেত্রেও স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যকার বিভিন্ন গুণাবলির ভিন্নতা থেকেই যাবে।

ইবনু জারির আত-তাবারি رحمه الله, আল-ফারিসি এবং অন্যান্যদের মতে, আর-রাহমান নামটি মানুষ, জিন, পশু-পাখি, ভালো-মন্দ, মুমিন ও কাফির-সমগ্র সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ ﷻ-এর দয়া ও করুণা বোঝায়। অন্যদিকে, আর-রাহিম শুধু মুমিনদের প্রতি তাঁর দয়াশীলতা বোঝায়। আল্লাহ ﷻ-এর দয়ার ক্ষেত্রে ‘আর-রাহমান’ আরও ব্যাপকতর অর্থ প্রকাশ করে। আল-ফারিসি, ইবনু জারির ও অন্যান্যরা তাঁদের এ মতের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে নিচের দলিল পেশ করেছেন :

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا

এবং তিনি বিশ্বাসীদের প্রতি পরম দয়ালু। (সূরা আল-আহযাব, ৪৩)

সুতরাং আলিমদের একটি মত অনুযায়ী ‘আর-রাহমান’ ও ‘আর-রাহিম’ এ পবিত্র নাম দুটির একটির দ্বারা ব্যাপকার্থে, সর্বজনীনভাবে দয়া বোঝায় এবং অপরটির মাধ্যমে শুধু মুমিনদের জন্য দয়া বোঝানো হয়। তবে কিছু আলিম এ মতের বিরোধিতাও করেছেন। এখানে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই। তবে আমরা এটা জেনে রাখি যে, এই ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে।

ইবনু আব্বাস رحمه الله বলেছেন, আর-রাহমান ও আর রাহিম দুটোই কোমল, স্নেহময়তায় পরিপূর্ণ এবং রাকিক। তবে এদের একটি অপরটি থেকে অধিকতর কোমল :

إِسْمَانِ رَقِيقَانِ أَحَدُهُمَا أَرْقُ مِنْ الْآخَرِ

অর্থাৎ একটির অর্থের গভীরতা ও আধিক্য অপরটির চেয়ে ব্যাপক। একটি অপরটির চাইতে অধিক করুণা ও দয়াশীলতা প্রকাশ করে। ইবনুল মুবারাক رحمه الله বলেছেন, আর-রাহমানের কাছে চাইলে তিনি দান করেন। আর-রাহিমের কাছে না চাইলে তিনি ক্রোধাশ্বিত হন।

আল্লাহ ﷻ-এর রাহমাহ

আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

لَيْسَ كَيْفِيَّةُ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (সূরা আশ-সূরা, ১১)

لَا تُذَكِّرُكَ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُذَكِّرُكَ الْأَبْصَارُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

দৃষ্টিসমূহ তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না, কিন্তু দৃষ্টিসমূহ তাঁর আয়ত্তে আছে এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী; সম্যক পরিজ্ঞাত। (সূরা আল-আনআম, ১০৩)

আর-রাহমান এবং আর-রাহীম দ্বারা মহান আল্লাহ ﷻ-এর দয়া নির্দেশ করা হয়। আল্লাহ ﷻ-এর ব্যাপারে তিনি যা বলেছেন এবং সৃষ্টিজগতের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী আল্লাহর রাসূল ﷺ যা সত্যায়ন করেছেন-যা বলেছেন, যতটুকু বলেছেন, যেভাবে বলেছেন-আমরা ঠিক ততটুকুই স্বীকার করি, সত্য বলে সাক্ষ্য দিই (affirm)। আমরা এই সাক্ষ্য দিই কোনো ধরনের 'তাশবিহ', তামসিল, তা'তিল এবং তাহরিফ ছাড়াই। আমরা মহান আল্লাহ ﷻ-এর পবিত্র নাম ও বৈশিষ্ট্যসমূহের ব্যাপারে তাশবিহ করি না। অর্থাৎ আমরা আল্লাহ ﷻ-এর বৈশিষ্ট্যকে সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যের সাথে তুলনা করি না, সমতুল্য মনে করি না। আমরা তামসিল করি না, অর্থাৎ আল্লাহ ﷻ-এর বৈশিষ্ট্যকে সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ মনে করি না। আমরা তাহরিফ করি না, অর্থাৎ আল্লাহ ﷻ-এর নাম ও সিফাতগুলোর মধ্যে কোনো পরিবর্তন ও বিকৃতি করা ছাড়াই আমরা সেগুলো স্বীকার করে নিই। এবং আমরা তা'তিল করি না, অর্থাৎ আল্লাহ ﷻ-এর কোনো বৈশিষ্ট্যকে বা এগুলোর কোনো একটি দিককেও আমরা অস্বীকার করি না। ইন শা আল্লাহ যখন আমরা আকিদাহ নিয়ে আলোচনায় যাব, তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস সিফাতের বিস্তারিত আলোচনায় আমরা আবার এ বিষয়টি নিয়ে কথা বলব।

আল্লাহ ﷻ বলেন :

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

বলো, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়।

আল্লাহ ﷻ এক, অদ্বিতীয়। তার কোনো শরীক বা অংশীদার নেই। এ আয়াত শুনলে আমরা সবাই মোটামুটি এটুকু বুঝি। তবে এই আয়াত আরও বোঝায় যে, আল্লাহ ﷻ তাঁর নাম, বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলিতেও এক ও অদ্বিতীয়। এ আয়াত দ্বারা বোঝায়, বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেও তাঁর কোনো সমকক্ষ নেই, তিনি আহাদুন ফিস-সিফাত। কর্মের দিক থেকে তাঁর সমকক্ষ কেউই নেই। একইভাবে তাঁর কোনো অংশীদারও নেই।

যখন বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম বা কোনো আয়াত পড়া হয়, যখন আল্লাহ ﷻ-এর প্রশংসা করা হয় অথবা আল্লাহ ﷻ-এর মহত্ত্ব ঘোষণা করা হয়-তখন যদি আপনি সে কথাগুলোর অর্থ বুঝতে পারেন, তাহলে সেটা আপনার ঈমানকে তাজা করবে। মুখস্থ বুলির মতো আওড়ে না গিয়ে, জেনে-বুঝে, উপলব্ধির সাথে এ কথাগুলো বললে দিনের মধ্যে অনেকবার আপনি আপনার ঈমানকে তাজা করতে পারবেন। এ জন্যই আমরা এ বিষয়গুলো ও এগুলোর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য নিয়ে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করছি।

‘আর-রাহমান, আর-রাহীম’ এ শব্দগুলো আল্লাহ ﷻ-এর বিশাল, ব্যাপক ও পরম ক্ষমাশীলতার কথা প্রকাশ ধরে। তাই আসুন আল্লাহ ﷻ-এর দয়া নিয়ে কিছু হাদিস এবং কুরআনের আয়াত দেখা যাক।

আল্লাহ বলেন :

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

বলো, হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছ, তোমরা আল্লাহর রাহমাহ থেকে নিরাশ হোয়ো না। আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি অতি ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু। (সূরা আয-যুমার, ৫৩)

এই আয়াতের ব্যাপারে আলী ইবনু আবু তালিব ؓ বলেছেন, ‘এ হলো পুরো কুরআনের সবচেয়ে ব্যাপক আয়াত।’ ইবনু মাসউদ ؓ বলেছেন, ‘এ হলো কুরআনের সবচেয়ে স্বত্তিদানকারী আয়াত।’ আশ-শাওকানি বলেছেন, ‘এটি সর্বাধিক আশা দানকারী আয়াত।’

কেন?

কারণ, এই আয়াতে আল্লাহ ﷻ-এর করুণার কথা বলা হচ্ছে। তিনি আমাদের আশা দিচ্ছেন। কিন্তু কাদের উদ্দেশ্য করে তিনি এ কথাগুলো বলছেন? আল্লাহ কি ফিরিশতাদের উদ্দেশ্য করে বলছেন, যারা আল্লাহ ﷻ-এর অনুগত এবং কখনো ভুল করতে পারেন না? না, তিনি কথাগুলো বলছেন পাপীদের উদ্দেশ্য করে। তবে সাধারণ পাপীদের না, তিনি বলছেন সর্বোচ্চ পর্যায়ের পাপীদের উদ্দেশ্য করে।

সহিহ মুসলিম এবং সহিহ বুখারিতে আবু হুরায়রাহ ؓ থেকে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ ﷻ যখন সৃষ্টিসমূহ তৈরি করেন তখন তিনি তাঁর আরশের ওপর লিখে দেন,

رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي

‘আমার রাহমাহ আমার গযবের ওপর বিজয়ী।’^[২০]

সহিহ বুখারিতে উমার ؓ থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখলেন একজন মহিলা তার সন্তানকে খুঁজে পাচ্ছে না। ব্যাকুল হয়ে সে তাকে খুঁজছে। কিছুক্ষণ পর ছেলেকে খুঁজে পাবার পর সে শক্তভাবে তাকে আঁকড়ে ধরল, তাকে পরম মমতায় খাওয়াতে শুরু করল। সাহাবি ؓ-গণও এই আবেগপূর্ণ দৃশ্যটি দেখছিলেন। দরদি এ মায়ের ভালোবাসা রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবি ؓ-দের মনে নাড়া দিলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তাদের আল্লাহ ﷻ-এর করুণা সম্পর্কে ধারণা দিলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, তোমরা

কি মনে করো এমন মা তার সন্তানের কোনো ক্ষতি করতে পারে? তোমাদের কি মনে হয়, এমন মা তার ছেলেকে আশ্রমে ফেলে দিতে পারে? তাঁরা বললেন, না। এমনকি তারা আল্লাহ ﷻ-এর নামে শপথ করে বললেন, ওয়াল্লাহি, আল্লাহর কসম! এই মা বেঁচে থাকা অবস্থায় এটা কখনোই সম্ভব না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন,

اللَّهُ أَرْحَمُ رِجَالِهِ مِنْ هَذِهِ يَوْلِيَهَا

এই মা তার ছেলের প্রতি যতটা না দয়ালু আল্লাহ তার বান্দার প্রতি তার চেয়ে বেশি দয়ালু।^(৩০)

সালাফদের অনেকে দু'আ করতেন, হে আল্লাহ, এই পৃথিবীতে আমার মা হলো আমার প্রতি সবচেয়ে দয়ালু। আমি জানি আপনি আমার মায়ের চেয়েও বেশি দয়ালু। আমার মা কখনো আমার ওপর কোনো শাস্তি বা ক্ষতি আসতে দেবেন না। হে আল্লাহ, আপনি আমাকে সব শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।

আবু হুরায়রাহ র. থেকে বর্ণিত সহিহ মুসলিমের^(৩১) একটি হাদিসে এসেছে, রাহমাতের এক শ অংশ। আল্লাহ তার রাহমাতের মাত্র একটি অংশ পৃথিবীতে দিয়েছেন। এই এক অংশই তিনি ভাগ করে দিয়েছেন জিন, মানুষ, জীব-জন্তু, কীটপতঙ্গ—সকল সৃষ্টির মধ্যে। এই এক অংশের কারণেই তারা একে অপরকে ভালোবাসে। এই এক ভাগ দয়ার কারণে তারা অন্যের প্রতি দয়ালু হয়। হিংস্র পশুও তার সন্তানকে ভালোবাসে এই এক ভাগের কারণেই। আর বাকি নিরানব্বই ভাগ রাহমাত-ই আল্লাহ তাঁর কাছে রেখে দিয়েছেন।

আর-রাহমান, আর-রাহিম এর অর্থ কি এখন বুঝতে পারছেন? উপলব্ধি করতে পারছেন এই দয়া, এই ক্ষমাশীলতার ব্যাপকতা? 'আর-রাহমান, আর-রাহিম' উচ্চারিত হতে শোনার সময় আমাদের হৃদয়ে কি এই উপলব্ধি কাজ করে?

আল্লাহ ﷻ-এর রাহমাত অর্জন

আল্লাহ ﷻ-এর রাহমাত অর্জনের সবচেয়ে ভালো উপায় হলো ইস্তিগফার করা। সূরা আন-নামলের এই আয়াতটি দেখুন। সালিহ র. তার সম্প্রদায়কে বলছেন :

لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

'তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছ না কেন? সম্ভবত তোমরা দয়াপ্রাপ্ত হবে।' (সূরা আন-নামল, ৪৬)

আল্লাহ ﷻ-এর রাহমাত পাবার জন্য তাঁর কাছে ক্ষমা চান। নিয়মিত ইস্তিগফারের মাধ্যমে

আল্লাহ ﷻ-এর কাছে থেকে ক্ষমা পাওয়া যায়।

আল্লাহ ﷻ তাঁর নেককার বান্দাদের রাহমাহ দান করেন :

إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

'নিশ্চয় আল্লাহর রাহমাহ সংকর্ষশীলদের নিকটবর্তী।' (সূরা আল-আরাফ, ৫৬)

মুসা ﷺ দুই বোনকে পানি তুলে দিয়ে সাহায্য করার পর বলেছিলেন :

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহই নাযিল করবে আমি তার মুখাপেক্ষী।
(সূরা আল-কাসাস, ২৪)

মুসা ﷺ ওই দুই বোনের প্রতি দয়া করেছিলেন, তাদের সাহায্য করেছিলেন আর তারপর সেটা তাঁর কাছে ফেরত এসেছিল।

فَجَاءَتْهُ إِخْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِخْيَاءٍ فَلَتَتْ إِنْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَفَعْتِ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتُ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

অতঃপর নারীদ্বয়ের একজন তাঁর কাছে সলজ্জ পদে আসল। সে বলল, আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন, যেন তিনি আপনাকে পারিশ্রমিক দিতে পারেন, আমাদের পশুগুলোকে আপনি যে পানি পান করিয়েছেন তার বিনিময়ে। অতঃপর যখন মুসা তার নিকট এল এবং সকল ঘটনা তার কাছে খুলে বলল, তখন সে বলল, 'তুমি ভয় কোরো না। তুমি যালিম কওম থেকে রেহাই পেয়ে গেছ।' (সূরা আল-কাসাস, ২৫)

অর্থাৎ যখন আপনি কারও প্রতি দয়া করবেন, সেটা আপনার কাছে ফেরত আসবে। এটা হলো আল্লাহ ﷻ-এর রাহমাহ অর্জনের দ্বিতীয় উপায়।

সুনানুত তিরমিযিতে বর্ণিত হাদিসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা দুনিয়ার মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল হও, তাহলে যিনি আসমানের ওপরে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন। তাই ক্ষমাশীল হোন আপনার দ্বারী, সন্তান, ছাত্র, আপনার অধীনস্থ-যাদের ওপর আপনি দায়িত্বশীল এমনকি অন্যান্য প্রাণীদের প্রতিও। তাদের প্রতি দয়াশীল হোন, তাদের সাহায্য করুন, যেমনটা মুসা ﷺ করেছিলেন। তাহলে আপনিও সাহায্যপ্রাপ্ত হবেন। এটা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর হাদিসের বক্তব্য।

আল্লাহ বলেছেন :

إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

‘নিশ্চয় আল্লাহর রাহমাহ সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী।’ (সূরা আল-আরাফ, ৫৬)

আনাস রাঃ দশ বছর রাসূলুল্লাহ সঃ-এর খেদমত করেছিলেন। এ দীর্ঘ সময়ে রাসূলুল্লাহ সঃ কখনোই তাঁর প্রতি কঠোর হননি, একটি বারও তাঁর সাথে কঠোর আচরণ করেননি। আপনার কি মনে হয় এই লম্বা সময়জুড়ে আনাস রাঃ কোনোদিন একটি ভুলও করেননি? অন্যের সাথে আচরণের সময় বিষয়টা মাথায় রাখবেন। নিজের স্বার্থেই, আল্লাহ সঃ-এর রাহমাহ পাওয়ার জন্য।

বাসমালাহর পর উসুল আস-সালাসার প্রথম বাক্য হলো,

إِغْلَمْ رَحْمَكُ اللهُ

অবগত হোন, আল্লাহ ﷻ আপনার ওপর রহম করুন।

ই'লাম রাহিমাকাল্লাহ :

ইলমের গুরুত্ব

ইলম শব্দটি বিভিন্নভাবে কুরআনে মোট ৭৭৯ বার ব্যবহৃত হয়েছে। সূরা বাকারাহতে বর্ণিত আদম ﷺ-এর ঘটনার দিকে তাকালে, আদম ﷺ-এর সৃষ্টির বর্ণনায় একটা বিষয় লক্ষ্য করবেন :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الْدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ○ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ
كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَأِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○ قَالُوا
سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ○ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ
فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ
وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ○

আর স্মরণ করো, যখন তোমার রব ফিরিশতাদের বললেন, ‘নিশ্চয় আমি জমিনে একজন

খলীফা সৃষ্টি করছি।' তারা বলল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে তাতে ফাসাদ করবে এবং রক্ত প্রবাহিত করবে? আর আমরা তো আপনার প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করছি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি।' তিনি বললেন, নিশ্চয় আমি জানি যা তোমরা জানো না। এবং তিনি আদমকে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন, তারপর সেগুলো ফিরিশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন এবং বললেন, 'এ বস্তুগুলোর নাম আমাদের বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' তারা বলল, 'আপনি পবিত্র মহান। আপনি আমাদের যা শিখিয়েছেন, তা ছাড়া আমাদের কোনো জ্ঞান নেই। নিশ্চয় আপনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' তিনি নির্দেশ করলেন, 'হে আদম, এ জিনিসগুলোর নাম তাদের জানিয়ে দাও।' যখন সে এ সকল নাম তাদের বলে দিলো, তখন তিনি বললেন, 'আমি কি তোমাদের বলিনি যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্য বস্তু সম্পর্কে আমি নিশ্চিতভাবে অবহিত এবং তোমরা যা প্রকাশ করো ও গোপন করো, আমি তাও অবগত'? (সূরা বাকারাহ, ৩০-৩৩)

এই চারটি আয়াতে আদম ﷺ-এর সৃষ্টির ব্যাপারে আলোচনায় জ্ঞান তথা ইলম শব্দটি ভিন্ন ভিন্ন রূপে মোট ৮ বার ব্যবহৃত হয়েছে। কখনো আ 'লাম, কখনো তা 'লামুন, কখনো আল্লাহা, কিংবা আল্লামতানা—এভাবে আদম ﷺ-এর সৃষ্টি নিয়ে আলোচনায় ৮ বার বিভিন্নভাবে 'ইলম' শব্দটি এসেছে। আর সমগ্র কুরআন জুড়ে এটা এসেছে মোট ৭৭৯ বার। তবে এ আয়াতগুলো ইলমের পাশাপাশি আরও সূক্ষ্ম অর্থ প্রকাশ পেয়েছে। এ আয়াতগুলো থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, আদম ﷺ-কে এমন কিছু গুণাবলি ও বিশেষত্ব প্রদান করা হয়েছিল যার কারণে ফিরিশতারা আল্লাহ ﷻ-এর নির্দেশে তাঁর জন্য সিঁজদাহ করেছিলেন। আল্লাহ ﷻ-এর প্রশংসা করা, তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা করা এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে ফিরিশতাগণ আদম ﷺ-এর চেয়ে এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও, ইলম এবং ইলমের প্রায়োগিক দিক থেকে আদম ﷺ-কে ফিরিশতাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে।

আল্লাহ ﷻ আদম ﷺ-কে দুনিয়াতে খলিফা হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। আল্লাহ ﷻ বলেন :

আর (স্মরণ করো), যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাদের বললেন : 'আমি অবশ্যই পৃথিবীতে (আমার) একজন খলিফা নিযুক্ত করতে যাচ্ছি'। (সূরা বাকারাহ, ৩০)

ইলম হলো একটি মৌলিক বিষয়। যে উম্মাহ অন্য সব জাতিকে নেতৃত্ব দিতে চায় তাদের অবশ্যই জ্ঞানী হতে হবে। তাদের মাঝে ইলম থাকতে হবে। ইলমের অভাবের কারণেই কোনো জাতির মাঝে শিরক প্রবেশ করে। কোনো ব্যক্তির ভেতর শিরক ঢুকে গেলে সে যেমন ধ্বংস হয়ে যায়, তেমনি শিরক একটি জাতিকেও ক্ষয় করে ফেলে। ধ্বংস করে ফেলে। যা কিছুর ভেতর শিরক প্রবেশ করবে, শিরক সেটাকে ধ্বংস করে ফেলবে।

শুধু তাওহিদের জন্য না, ইলম সবকিছুর জন্যই প্রয়োজন। তবে তাওহিদের জ্ঞান হলো জ্ঞানের মূল ভিত্তি, মূল নির্ধারক। তবে অন্যান্য সবকিছুর জন্যও জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সঠিক আদব-আখলাকের জন্য জ্ঞানের দরকার। এ জ্ঞান না থাকলে সেটা দাগ ফেলে মানুষের

আচরণ ও ব্যক্তিত্বের ওপর। নীতি-নৈতিকতা এবং এর সঠিক মাপকাঠি নির্ধারণের জন্য জ্ঞান প্রয়োজন। ইলম না থাকায় মানুষ আজ ওইসব লোককে হিরো মনে করছে, আদর্শ মনে করছে, যারা বাস্তবে কাপুরুষ।

জ্ঞান না থাকার কারণে আজ ফ্রি-মিস্ট্রিকে-নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা-বলা হচ্ছে মুক্তি ও স্বাধীনতা। জ্ঞান না থাকার কারণে ইসলাম, আল্লাহ ﷻ এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর আক্রমণ ও অবমাননাকে বলা হচ্ছে চিন্তার স্বাধীনতা, মুক্তচিন্তা ও বাকস্বাধীনতা। ইলম এতটাই দরকারি যে, আপনি ইলম যত কমতে দেখবেন-বুঝবেন যে আমরা কিয়ামতের তত কাছাকাছি যাচ্ছি। কারণ, এটি কিয়ামতের একটি লক্ষণ।^(২০)

যারা বর্তমান অবস্থান পরিবর্তন আনতে চান, তাদের অবশ্যই ইলম প্রয়োজন। আমরা আল্লাহ ﷻ-এর কাছে দুআ করি যেন তিনি আপনাদের মধ্যে থেকে দ্বীনের মুজাদ্দিদ^(২১) তৈরি করেন। এমন মুজাদ্দিদ, যিনি উম্মাহর মাঝে নতুন প্রাণের সঞ্চারণ ঘটাবেন, উম্মাহর হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনবেন। আর এ পুনর্জাগরণের মূল চাবিকাঠি হলো ইলম। নবি-রাসূল আলাইহিমুস সালামগণ, যারা ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মুজাদ্দিদ, তাদের দিকে লক্ষ করলেও আমরা এই ব্যাপারটি দেখতে পাব। আমরা ইতিমধ্যে আদম ﷺ-এর কথা উল্লেখ করেছি। সূরা বাকারাহর ৩০ থেকে ৩৩ এই চার আয়াতে আদম ﷺ-এর বর্ণনা প্রসঙ্গে ৮ বার ইলমের কথা এসেছে। এবার দেখুন লূত ﷺ-এর সম্পর্কে কী বলা হয়েছে :

وَلَوْ كُنَّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا

আর (স্মরণ করো), লূতকে আমরা (নুবুওয়াত ও সঠিক ন্যায্যবিচারের) প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছিলাম। (সূরা আল-আশ্বিয়া, ৭৪)

আল্লাহ ﷻ এখানে লূত ﷺ সম্পর্কে বলেছেন যে, আমরা তাঁকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছিলাম। মুসা ﷺ-এর ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا

২৬ এ ব্যাপারে অনেক হাদিস এসেছে। সহিহ বুখারি, কিতাবুল ইলমে আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَبْلُغَ الْبَيْتُ وَيَنْظُرَ الْجَبَلُ وَيَنْظُرَ الْإِنْسَانُ وَيَكْفُرَ الْبَشَرُ وَيَبْلُغَ الْزَّجَالُ حَتَّى يَكُونُ الْجَنِينُ امْرَأَةً
الْفُتَى الزَّاجِدُ

'কিয়ামতের আলামতগুলোর মধ্যে রয়েছে, ইলম কমে যাওয়া, মূর্খতা বৃদ্ধি পাওয়া, ব্যভিচার বৃদ্ধি পাওয়া, নারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা, পুরুষের সংখ্যা কমে যাওয়া-এমনকি পরিস্থিতি এমন হবে যে, ৫০ জন মহিলার কর্তা হবে মাত্র একজন পুরুষ।'

২৭ মুজাদ্দিদ আরবি শব্দ, বাংলায় পুনঃনবায়নকারি বা সংস্কারক। প্রতি হিজরি শতাব্দীতে মুসলিম সমাজ সংস্কার, মুসলমানদের মধ্যে অনুপ্রবেশকৃত অনৈসলামিক রীতির মূলোৎপাটন এবং ইসলামের প্রকৃত আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আবির্ভূত হন একেকজন মুজাদ্দিদ।

যখন সে (শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে) পূর্ণ যৌবনে উপনীত ও পরিণত বয়স্ক হলো, তখন আমি তাকে (নুবুওয়াত ও সঠিক ন্যায়বিচারের জ্ঞান) হিকমাহ ও (তার পূর্বসূরীদের স্বীন-একত্ববাদের) ধর্মীয় জ্ঞান দান করলাম। (সূরা আল-কাসাস, ১৪)

ইউসুফ عليه السلام-এর ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا

আর সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলো, আমরা তাকে হিকমত ও (নুবুওয়াতের) জ্ঞান দান করলাম। (সূরা ইউসুফ, ২২)

ইয়াকুব عليه السلام-এর ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

وَأَنَّهُ لَدُوْرٍ عَلِيمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ

আর নিঃসন্দেহে, সে ছিল জ্ঞানী। কারণ, আমরা তাকে শিক্ষাদান করেছিলাম। (সূরা ইউসুফ, ৬৮)

দাউদ এবং সুলাইমান আলহিহ্মুস সালামের ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

فَقَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا

এবং আমরা সুলাইমানকে (মীমাংসা) বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদের উভয়কে হুকমান ও জ্ঞান দান করেছিলাম। (সূরা আল-আম্বিয়া, ৭৯)

ঈসা عليه السلام-এর ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

وَإِذْ عَلَّمْنَاكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ

আমি তোমাকে কিতাব, হিকমাহ (সঠিক বুঝ), তাওরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়েছিলাম। (সূরা আল-মায়িদা, ১১০)

রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ-এর ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ

আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব ও হিকমাহ (শারীয়াহ, হালাল-হারামবিষয়ক জ্ঞান) অবতীর্ণ করেছেন এবং তুমি যা জানতে না, তা তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। (সূরা আন-নিসা, ১১৩)

ইলম ছাড়া কোনো নেতৃত্ব, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নেই

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর সর্বপ্রথম যে অম্মাত নাযিল হয়েছিল সেটাও ছিল ইলম-সম্পর্কিত :

أَفْرَأُوْا بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ افْرَأُوْا رَبَّكَ الْأَكْبَرُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

পড়ো তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড হতে। পড়ো, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমাধিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। (সূরা আল-আলাক, ১-৪)

ইকরা, আল্লামা, কালাম এই সবগুলো শব্দ জ্ঞান বা ইলমের সাথে সম্পর্কিত। কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় ইলম শব্দটি বিভিন্নরূপে মোট ৭৭৯ বার এসেছে। ‘আল্লাহ’ শব্দের পর এটি কুরআনে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত শব্দ।

আল্লাহ ﷻ তালূতকে বনী ইসরাইলের জন্য নেতা মনোনীত করেছিলেন। তালূতের কোন গুণাবলির কারণে আল্লাহ ﷻ তাকে মনোনীত করেছিলেন সেটা লক্ষ করুন। আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ ابْتَلَاكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَعَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ.....

আর তাদের নবি তাদেরকে বলেছিল, আল্লাহ অবশ্যই তালূতকে তোমাদের রাজা নিযুক্ত করেছেন। তারা বলল, সে কীভাবে আমাদের ওপর রাজা হতে পারে। অথচ রাজা হওয়ার জন্য আমরা তার চেয়ে বেশি হকদার। তা ছাড়া তাকে আর্থিক সম্বলতাও দেওয়া হয়নি! নবি বললেন, আল্লাহ তাকে তোমাদের ওপর মনোনীত করেছেন এবং তাকে জ্ঞান ও দৈহিকভাবে সম্বদ্ধ করেছেন। (সূরা বাকারাহ, ২৪৭)

আল্লাহ ﷻ তাঁর রাসূলকে বলছেন, ওদের বলো, তালূত তোমাদের রাজা। তালূত ছিলেন বনী ইসরাইলের এমন এক গোত্রের সদস্য যাদের মধ্যে থেকে এর আগে বনী ইসরাইলের কোনো রাজা আসেনি। আগের রাজারা এসেছিল অন্যান্য গোত্রগুলো থেকে। কিন্তু আল্লাহ ﷻ ভিন্ন কিছু চাইলেন। বনী ইসরাইল তালূতকে মেনে নিতে পারল না। তারা আপত্তি করল তারা বলল, তালূত রাজা হবার যোগ্য না। কারণ, প্রথমত তার বাপ-দাদারা রাজা ছিল না। তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ রাজা ছিল না। সে রাজাদের বংশধর না। আর আমরা হয়তো এ পয়েন্টে কিছুটা ছাড় দিতাম কিন্তু দ্বিতীয় পয়েন্ট আরও গুরুতর, আর সেটা হলো—তালূতের কোনো সম্পদ নেই।

তারা তাদের রাসূল ﷺ-এর কাছে গিয়ে তর্ক জুড়ে দিলো। এমন লোককে কিছুতেই তারা রাজা হিসেবে মেনে নেবে না। আমরা তালুতকে মানি না। সে দরিদ্র এবং নীচু গোত্রের লোক। যখন এ তর্ক চলছে, আল্লাহ ﷻ তাঁর রাসূলের প্রতি ওয়াহি নাখিল করলেন,

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ عَلَىٰكُمْ

অর্থাৎ, আল্লাহ ﷻ তাঁকে তোমাদের ওপর মনোনীত করেছেন। ব্যস। এখানেই সব তর্ক, সব বাগ্বিতণ্ডা শেষ। এটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

কিন্তু কেন আল্লাহ ﷻ তালুতকে বাছাই করলেন? চলুন, দেবা যাক, কুরআনে তাঁর কী কী গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে :

وَرَزَّادُهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ

অর্থাৎ, জ্ঞান ও শক্তির দিক দিয়ে আল্লাহ ﷻ তাকে প্রাচুর্য দান করেছেন। শক্তি এবং জ্ঞান, এই দুটি হলো সফল ও শক্তিশালী জাতির বৈশিষ্ট্য। এমনকি জিনদের মধ্যেও ইলম প্রশংসিত এবং ইলমের স্তরের ভিত্তিতে জিনদের সম্মান ও মর্যাদা নির্ধারিত হয়। সুলাইমান ﷺ যখন রানি বিলকিসের সিংহাসন চাইলেন :

قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِيرٌ

এক শক্তিশালী জিন (ইফরিত) বলল, আপনি আপনার স্থান থেকে ওঠার পূর্বে আমি তা এনে দেবো। আর এ ব্যাপারে আমি অবশ্যই ক্ষমতাবান ও বিশ্বস্ত। (সূরা আন-নামল, ৩৯)

ইফরিত বলেছিল, আপনি এই স্থান থেকে ওঠার আগেই আমি তা এনে দেবো। অপর জিন, যার কিতাবের জ্ঞান ছিল, সে বলেছিল চোখের পলক ফেলার আগেই আমি তা এনে দেবো। সুলাইমান ﷺ এই জিনকেই কাজের দায়িত্ব দিলেন।

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ

কিতাবের জ্ঞান যার ছিল, সে বলল, আপনার চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দেবো! (সূরা আন-নামল, ৪০)

বিলকিসের পুরো ব্যাপারটা সমাপ্ত হবার পর সুলাইমান ﷺ বলেছিলেন :

وَأَوْتَيْنَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ

আমাদেরকে ইতোপূর্বেই প্রকৃত জ্ঞান দান করা হয়েছে এবং আমরা আঙ্গাভহও হয়ে গেছি। (সূরা আন-নামল, ৪২)

ইলমের সংজ্ঞা

এবার তাকানো যাক ইলম শব্দটির দিকে। ইলমের সংজ্ঞা কী?

জ্ঞান বা ইলম হলো কোনো কিছুর প্রকৃত বাস্তবতাকে নিশ্চয়তার সাথে অনুধাবন করা। ই'লাম-অবগত হোন, বলার মাধ্যমে উসুল আস-সালাসার লেখক শিক্ষণীয় ও অভ্যস্ত গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানের প্রতি ইঙ্গিত করছেন এবং এর জন্য আপনাকে প্রস্তুত করছেন। কোনো জরুরি বিষয়ে জানানোর জন্য ই'লাম (اعلم)-জেনে রাখুন, অবগত হোন) শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আর এখানে লেখক কথা বলছেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে জরুরি বিষয়-তাওহিদের জ্ঞান নিয়ে। তিনি ইসলামের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতির বিষয়ে আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছেন, আর যেহেতু এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাই এখানে ই'লাম শব্দের দ্বারা তিনি বিশেষভাবে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন।

মানুষ ছাড়া অন্য কিছুকে কি শেখানো সম্ভব?

ই'লাম শব্দটি কি শুধু মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? নাকি মানুষ ছাড়া অন্য কিছুর ক্ষেত্রেও শব্দটি ব্যবহার করা যাবে? আসলে এটি মূলত একটি ভাষাতাত্ত্বিক প্রশ্ন। ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণের মতো বিষয়ে আগ্রহী ব্যক্তিরাই কেবল এ আলোচনা উপভোগ করবে। তারপরও আমি এ ব্যাপারে কিছু কথা বলতে চাই, কারণ এ ব্যাপারে কিছু সহিহ হাদিস আছে যেগুলোর মাধ্যমে আপনারা বিষয়টি সহজে বুঝতে পারবেন, ইন শা আল্লাহ।

ভাষাবিদগণ বলেন, সাধারণত ই'লাম শব্দটি এমন কিছুর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় যা অনুধাবন করার ক্ষমতা রাখে। এ কারণে একটি দেয়ালকে লক্ষ্য করে ই'লাম বলা যায় না। তবে কিছু আলিম বিষয়টির আরও গভীরে গিয়ে বলেছেন যে, হ্যাঁ, কখনো কখনো হয়তো দেয়াল, পাথর কিংবা গাছও অনুধাবন করতে পারে, শিখতে পারে। এমন হলে আপনি তাদেরও জ্ঞান অর্জনের আহ্বান জানাতে পারেন এবং শিক্ষাদান করতে পারেন। অর্থাৎ অনুধাবন করতে সক্ষম এমন লক্ষণবিশিষ্ট যেকোনো বস্তুকে বা জীবকে ই'লাম বলা যায় এবং শিক্ষা দেওয়া যায়।

এ প্রসঙ্গে মুসা ﷺ-এর কাছ থেকে পাথরের দৌড়ে পালানোর হাদিসটি উল্লেখযোগ্য। অনেকে হাদিসটিকে যইফ মনে করেন, কিন্তু আসলে হাদিসটি সহিহ বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে।

মুসা ﷺ ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী, লজ্জাশীল ও শালীন। তিনি সব সময় নিজের শরীর ঢেকে রাখতেন। তাকে কেউ কখনো অনাবৃত অবস্থায় দেখিনি। কিন্তু বনী ইসরাইলের অন্যান্য সবাই একসাথে গোসল করত! এদের মধ্যে কিছু লোক বলতে শুরু করল, নিশ্চয় মুসার কোনো শারীরিক ত্রুটি বা অসুখ আছে, তাই সে নিজে ঢেকে রাখছে। হয়তো তাঁর কুষ্ঠ আছে, অথবা হার্নিয়া-আরবিতে একে বলা হয় উদ্বরা (أضرة)-আছে, বা অন্য কোনো শারীরিক ত্রুটি

আছে, তাই মুসা নিজেকে ঢেকে রাখে।

আল্লাহ ﷻ মুসা ﷺ-এর বিরুদ্ধে এ অপবাদের খণ্ডন করতে চাইলেন। একদিন মুসা ﷺ নির্জনে তাঁর কাপড় খুলে পাথরের ওপর রেখে গোসল করতে গেলেন। গোসল শেষে যখন কাপড় নিতে ফেরত আসলেন, যে পাথরের ওপর তাঁর কাপড় রাখা ছিল সেটা ছুঁতে শুরু করল। মুসা ﷺ তাঁর লাঠি নিয়ে পাথরের পেছনে পেছনে ছুঁতে শুরু করলেন এবং বলতে থাকলেন,

تَوْبِي حَجَرُ تَوْبِي حَجَرُ

হে পাথর, আমার জামা; হে পাথর, আমার জামা।

অর্থাৎ তিনি বলছিলেন, আমার পোশাক ফিরিয়ে দাও। আমার পোশাক ফিরিয়ে দাও।

পাথরকে তাড়া করতে গিয়ে এক সময় মুসা ﷺ বনী ইসরাইলের একদল লোকের সামনে চলে আসলেন। তারা মুসা ﷺ-কে অনাবৃত অবস্থায় দেখতে পেল এবং দেখল তাঁর কোনো শারীরিক ত্রুটি নেই। কোনো ব্যাধি নেই। তারা যে ভুল ছিল এবং মুসা ﷺ-এর ব্যাপারে তাদের কথা যে মিথ্যে অপবাদ ছিল, সেটা প্রমাণ হয়ে গেল। মিথ্যা অপবাদ থেকে মুসা ﷺ অব্যাহতি পেলেন। এবার পাথরটি থামল। মুসা ﷺ তার কাপড় নিলেন। তারপর লাঠি দিয়ে পাথরটিকে মারতে শুরু করলেন।^[৩৮]

এই বিষয়টিই আমাদের আলোচনার জন্য প্রাসঙ্গিক। তিনি পাথরটিকে মারছিলেন, পাথরের সাথে কথা বলছিলেন। কেন?

তিনি এটা করেছিলেন কেননা পাথরটির মাঝে জ্ঞান ও বোধশক্তির লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। তাই তিনি সেই দৃশ্যমান লক্ষণ অনুযায়ী পাথরের সাথে আচরণ করছিলেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ﷻ এ ঘটনাটির বর্ণনা দেন এভাবে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَأَ اللَّهُ مِنَّا قَالُوا وَكَانَ اللَّهُ وَجِيبًا

হে মুমিনগণ, মুসাকে যারা কষ্ট দিয়েছে, তোমরা তাদের মতো হোয়ো না; ওরা যা রটনা করেছিল আল্লাহ তা থেকে তাকে নির্দোষ প্রমাণিত করেছেন। আর আল্লাহর নিকট সে মর্যাদাবান। (সূরা আল-আহযাব, ৬৯)

ঘটনাটির মূল পয়েন্ট হচ্ছে—মুসা ﷺ পাথরটিকে মেরেছিলেন, মারার মাধ্যমে পাথরকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। শেখানোর জন্য মারার ব্যাপারটা হয়তো আমাদের কাছে সেকেলে মনে হতে পারে, কিন্তু শিক্ষা দেয়া ও শাসন করার সাথে মারা বা শাস্তির ব্যাপারটা জড়িত। মুসা ﷺ শেখানোর জন্য পাথরকে শুধু মারেনই-নি, বরং পাথরের সাথে কথাও বলেছিলেন।

তিনি বলছিলেন,

تَوْبِي حَبْرُ تَوْبِي حَبْرُ

হে পাথর, আমার পোশাক দাও।

যখন পাথরটির মাঝে স্বাভাবিক প্রকৃতি-বিরোধী আচরণ প্রকাশ পেল, যখন পাথরটির মধ্যে বোধশক্তির লক্ষণ প্রকাশ পেল, তখন তিনি সেটাকে তার মতো করে শিক্ষা দিলেন। এ কারণে ভাষাবিদ্যায় পারদর্শী আলিমগণের মতে, 'ই'লাম (জেনে রাখো) কথাটি মানবজাতি ছাড়া অন্যান্যদের ওপরও প্রয়োগ করা যেতে পারে। আর তাদের বক্তব্যের দলিল হিসেবে তারা এই হাদিসটিকে ব্যবহার করেন।

বিষয়টি আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য আরেকটি হাদিসের কথা বলা যেতে পারে। মুসতাদরাফ আল-হাকিম, সুনান আদ-দারিমি ও বায়হাকিত্তে হাদিসটি আছে। ইবনু কাসির এবং আলবানি رحمهما الله হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। এই হাদিসে এক বেদুইনের ঘটনা উঠে এসেছে। একবার এক বেদুইন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে শাহাদাহ দেয়ার জন্য এল। বেদুইনটি রাস্তা দিয়ে যাবার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ইসলাম সম্পর্কে জানান। এই বেদুইন লোকটি তখন ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল? কিন্তু বেদুইন এত সহজে সাক্ষ্য দিতে রাজি ছিল না। সে বলল, আপনি আমাকে সাক্ষ্য দিতে বলছেন, কিন্তু আপনার কথার পক্ষে কে সাক্ষ্য দেবে? আপনি এমন কাউকে নিয়ে আসুন যে সাক্ষ্য দেবে যে আপনি সত্য বলছেন।

আসলে এই বেদুইন কোনো মুজিয়া দেখতে চাচ্ছিলেন, এমন কোনো কিছু দেখতে চাচ্ছিলেন যার দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা সত্য বলে প্রমাণিত হবে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ দূরের এক গাছকে লক্ষ্য করে ডাকলেন। গাছটি মাটির ওপর শিকড় হ্যাঁচড়ে এগিয়ে আসতে শুরু করল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে সালাম দিয়ে বলল,

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এখানে গাছের সাথে কথোপকথন করেছেন। যা হোক, সেই বেদুইনের কী হলো? বেদুইন ইসলাম কবুল করে নিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, আমার গোত্রের লোকেরা যদি ইসলাম গ্রহণ করে তবে আমি তাদের সাথে সেখানে থেকে যাব এবং তাদের ইসলাম সম্পর্কে শেখাব, অন্যথায় আমি আপনার কাছে ফিরে আসব।

সূতরাং সাধারণত গাছকে শেখানো যায় না। কিন্তু এই হাদিসে বর্ণিত গাছটির মধ্যে জ্ঞান বা বোধশক্তির লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ সেটিকে শাহাদাহ শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং গাছটি তিনবার তা উচ্চারণ করেছিল।^[১১]

মাঝে মাঝে মানুষের চেয়ে পাথরকে শেখানো সহজ হয়। কিছু মানুষের হৃদয় তালাবদ্ধ থাকে। এদের অবস্থা উপুড় করে রাখা গ্রাসের মতো। উপুড় করে রাখা গ্রাসের ওপর যতই পানি ঢালুন না কেন, পানি এর ভেতরে ঢুকবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং মুসা ؑ-এর ঘটনায় আমরা দেখেছি যে, জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানুষের তুলনায় গাছ এবং পাথর অধিকমাত্রায় সংবেদনশীল।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত একটি হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, মক্কাতে থাকাকালীন প্রথম ওয়াহি নাযিলের আগে থেকেই তিনি মক্কার একটি পাথরকে চিনতেন যেটা প্রতিদিন তাঁকে সালাম দিত। পাথরটি বলত, ‘আসসালামু আলাইকুম, হে আল্লাহর নবি।’ পরবর্তী সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবি ؓ-দের সেই পাথরের জায়গাটি দেখাতেন। একইভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন প্রাকৃতিক কাজ সম্পন্ন করতে যেতেন তখন গাছেরা তাঁকে আড়াল করে দিত, যাতে কেউ তাঁকে দেখতে না পায়।

তাই ভাষাবিদ আলিমদের মতে, মানুষ ব্যতীত অন্য কিছু থেকে যদি বোঝার কিংবা অনুধাবন করার লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহলে তাদের উদ্দেশ্য করে ই’লাম (জেনে রাখো) বলা যেতে পারে এবং শেখানো যেতে পারে। তবে সাধারণভাবে, ই’লাম এবং জ্ঞান, এই শব্দগুলো কোনো পাথর কিংবা জড়বস্তুর জন্য না; বরং বোধশক্তিসম্পন্ন এবং অনুধাবন করতে সক্ষম মানবজাতির বেলাতে প্রয়োগ করা হবে। কিন্তু শেখার ক্ষমতা কিংবা বোধশক্তির লক্ষণ প্রকাশিত হলে, সেটা প্রাণী কিংবা জড় যা-ই হোক না কেন, তাদের শিক্ষাদান করা যেতে পারে এবং তাদের ক্ষেত্রে ই’লাম শব্দেরও প্রয়োগ করা যেতে পারে।

নিজের চেয়ে অধিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে কি ই’লাম বলা যাবে?

আরেকটা প্রশ্ন আসতে পারে, নিজের চেয়ে অধিক ইলমসম্পন্ন কোনো ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে ই’লাম বলা যাবে কি না? আপনি কি কোনো আলিমকে ই’লাম বলতে পারবেন? অবশ্যই পারবেন। মনে করুন একজন আলিম আসরের ওয়াক্ত সম্পর্কে জানেন, কিন্তু কোনো কারণে তিনি হয়তো খেয়াল করেননি যে আসরের সময় হয়ে গেছে। আপনি তাকে জানিয়ে দিতে পারেন যে, আসরের সালাতের সময় হয়েছে। সূতরাং এটা হতে পারে যে, অপেক্ষাকৃত অল্প ইলমসম্পন্ন ব্যক্তি তার চেয়ে অধিক জ্ঞানী ব্যক্তিকে কিছু শেখালেন কিংবা তার উদ্দেশ্যে ই’লাম বললেন। প্রায়শই দেখা যায় যে, একটা সহজ বিষয় কোনো জ্ঞানীর চোখ এড়িয়ে গেছে, অথচ তার চেয়ে কম জ্ঞানসম্পন্ন এক ব্যক্তি তা ধরতে পেরেছে।

ইলমের স্তর

এবার আমরা আলোচনা করব জ্ঞানের বিভিন্ন স্তর নিয়ে। ইবনুল কাইয়িম رحمہ اللہ যিফতাহ দারিস সামাদাহ এহে বলেছেন ইলমের ধাপ ছয়টি। আর এগুলো হচ্ছে জ্ঞানার্জনের সিঁড়ি। ইবনুল কাইয়িম رحمہ اللہ বলেছেন,

وللعلم ست مراتب اولها حسن السؤال الثانية حسن الانصات والاستماع الثالثة حسن الفهم الرابعة الحفظ الخامسة التعليم السادسة وهي ثمرته وهي العمل به

ইলম অর্জনের ছয়টি ধাপ আছে :

১. উপযুক্ত প্রশ্ন করা (حسن السؤال)
২. মনযোগ-সহকারে শোনা ও চূপ থাকা (حسن الإنصات والاستماع)
৩. উত্তমভাবে অনুধাবন (حسن الفهم)
৪. মুখস্থ করা (الحفظ)
৫. অপরকে শিক্ষা দেয়া (التعليم)
৬. অর্জিত ইলমের ওপর আমল করা (العمل به)^(১০০)

ইলম অর্জনের প্রথম ধাপ হলো, উপযুক্ত প্রশ্ন করা এবং সঠিক উপায়ে জ্ঞান অন্বেষণ করা। কিছু লোক জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয় কারণ তারা সঠিক প্রশ্ন করা এবং ইলমের অনুসন্ধানের বিষয়টি আয়ত্ত্ব করে না। কেউ কেউ কোনো প্রশ্নই করে না। কিছু লোকের মনে প্রশ্ন এলেও তারা প্রশ্ন করেন না। আবার অনেকে এমন বিষয়ে প্রশ্ন করেন যেগুলোর চেয়ে প্রশ্ন করা কিংবা জানতে চাওয়ার মতো আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ, মৌলিক বিষয় আছে। দ্বীনের জন্য অত্যন্ত জরুরি বিষয়গুলো বাদ দিয়ে কিছু মানুষ পড়ে থাকেন কেবল অহেতুক বিষয়গুলোর পেছনে। যাদের ইলম নেই, কীভাবে জ্ঞানার্জন করতে হবে এই নূনতম মৌলিক জ্ঞানটুকু যারা রাখেন না এবং নিজে নিজেই দ্বীন শিখতে যান, তাদের অনেকের মধ্যে এ ধরনের সমস্যাগুলো দেখা যায়। তাই সালাফদের কেউ কেউ বলতেন, ‘প্রশ্ন করার ধরন এবং জ্ঞান অন্বেষণের পদ্ধতিই হচ্ছে জ্ঞানের অর্ধেক।’^(১০১) অর্থাৎ সঠিকভাবে প্রশ্ন করা এবং ইলম অন্বেষণ করা হলো জ্ঞানের অর্ধেক। তারা যথার্থই বলেছেন। ধরুন কেউ সবেমাত্র দ্বীন সম্পর্কে ইলম অর্জন শুরু করেছে—শুরুতেই যদি সে উত্তরাধিকার আইন (আল-ফারাইদ) বা এ-জাতীয় কিছু নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, অথচ সে ফিকহত ত্বহারাহ—পবিত্র হওয়ার—নিয়মটুকু পর্যন্ত জানে না, তবে কি

১০০ যিফতাহ দারিস সামাদাহ : ১/১৬৯

১০১ এ মর্বে উমার رضي الله عنه-এর সূত্রে একটি হাদিসও বর্ণিত হয়েছে। রাসুল ﷺ বলেছেন، وَعَسَى السُّؤَالُ يَنْفُذَ وَأَمَّا مَرْبَعُ الْإِلْمِ অর্থাৎ ‘সুন্দরভাবে প্রশ্ন করা হলো ইলমের অর্ধেক।’ (মুসনাদুশ শিহাব : ৩৩, মাজমাউয যাওয়ায়িদ : ৭২৭, শুয়াবুল ইমান : ৬৫৬৮)

সেটা গ্রহণযোগ্য হবে? আরও বাস্তব উদাহরণও আছে। অনেকে শুরুতেই আকিদাতুত তহাবি পড়া শুরু করেন, বোঝার চেষ্টা করেন। অথচ এটা এতটাই কঠিন একটি কিতাব, যা বুঝতে গিয়ে আলিমরাও হিমশিম খান।

জ্ঞান অর্জনের দ্বিতীয় ধাপ হলো, শোনা এবং চুপ থাকা। বলা হয় যে, আলী ইবনু আবু তালিব রাঃ বলেছেন,

إِذَا جَالَسْتَ الْعُلَمَاءَ فَكُنْ عَلَى أَنْ تَسْمَعَ أَخْرَصَ مِنْكَ عَلَى أَنْ تَقُولَ

‘তোমরা যখন কোনো আলিমের কাছে বসবে তখন বলার চেয়ে শোনার জন্য বেশি আগ্রহী হবে। কথা না বলে মনোযোগ দিয়ে শুনবে।’^{১৩২}

জ্ঞান অর্জনের তৃতীয় ধাপ হলো, অনুধাবন। এটা স্পষ্ট বিষয়।

চতুর্থ ধাপ হলো, হিফয অর্থাৎ মুখস্থ করা। দ্বীনি ইলম অর্জনে এমন অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলো আপনাকে মুখস্থ করতে হবে।

পঞ্চম ধাপ হলো, তালিম। শিক্ষা দেয়া। জ্ঞান অর্জনের জন্য আপনাকে শেখাতে হবে।

ষষ্ঠ ধাপ হলো, জ্ঞানার্জনের ফলাফল। আর ইলমের ফলাফল হলো অর্জিত ইলমের ওপর আমল করা, অর্জিত ইলমের সীমারেখা মেনে চলা ও এর হক আদায় করা। আলী রাঃ বলতেন, ইলম আমলকে ডাকে, যদি আমলের জবাব আসে তবে ইলম স্থায়ী হয়, না হলে মুছে যায়। ইমাম শাবি রাঃ বলেছেন,

كُنَّا نَسْتَعِينُ عَلَى حِفْظِ الْحَدِيثِ بِالْعَمَلِ بِهِ

‘ইলমের ওপর আমল করার দ্বারা আমাদের জন্য ইলম মুখস্থ করা সহজ হতো।’^{১৩৩}

ফুদাইল ইবনু আযাদ, মুহাম্মাদ ইবনু নাদর, সুফিয়ান ইবনু উইয়াইনাহ, উমার ইবনু আলা রাঃ এবং অন্যান্যদের থেকেও এ ধরনের উক্তি আছে।

আল খাল্লাল রাঃ তাঁর ব্যাকরণ শেখার অভিজ্ঞতা নিয়ে বলেছেন, আমি ব্যাকরণ শিখতে যাবার পর প্রথম বছর চুপ ছিলাম (انصت)। পরের বছর মনোযোগ দিয়ে ব্যাকরণ নিরীক্ষণ করলাম (نظرت)। তৃতীয় বছর আমি তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলাম (تدبرت)। আর চতুর্থ বছরে গিয়ে আমি আমার শাইখকে প্রশ্ন করতে শুরু করলাম (سألت)। অর্থাৎ প্রশ্ন করতেই তাঁর চার বছর লেগে গিয়েছিল।

আমাদের এমন করার দরকার নেই। কিন্তু এ কথাগুলোর উদ্দেশ্য হলো, সালাফ ও

৩২ ইবনু আবদিল বার রাঃ, জামিউ বায়য়নিল ইলম : ২/১৪৮

৩৩ ইবনু আবদিল বার রাঃ, জামিউ বায়য়নিল ইলম : ২/৩৬৮

আলিমগণের এ ঘটনাগুলো থেকে আমরা যেন বুঝতে পারি যে, জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে তার কতটা ধৈর্যশীল ছিলেন। জ্ঞানার্জন মূলত একটি নিয়মতান্ত্রিক, কাঠামোবদ্ধ প্রক্রিয়া। কোনো বিক্ষিপ্ত, এলোমেলো ব্যাপার না।

ইলমের মর্যাদা

ইলম অর্জনের সম্মান সম্পর্কে জানুন, অনুধাবন করুন। ইলম অর্জনের সম্মান সম্পর্কে জানা, আপনাকে উৎসাহিত করবে ইলম অর্জন অব্যাহত রাখতে। আনাস ইবনু মালিক রাঃ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ইলম অর্জন করা আবশ্যিক।^[৩৪]

সনদ-সংক্রান্ত কিছু কারণে অনেক মুহাদ্দিস এ হাদিসটিকে যইফ বলেছেন। কিন্তু অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ-যেমন : আল মিযিয়া, আস-সুয়ুতি এবং আলবানি রাঃ একে সহিহ বলেছেন, আল্লাহ সঃ তাদের সকলের ওপর রহম করুন।

ইমাম আহমাদ রাঃ বলতেন, দ্বীন পালনের জন্য যা কিছু অপরিহার্য তা সম্পর্কে জানা ব্যক্তির জন্য আবশ্যিক। যেমন : সালাত ও সিয়াম সম্পর্কে আপনাকে জানতে হবে। যেহেতু সালাত ও সিয়াম আপনার ওপর ফরয, তাই সালাত ও সিয়াম সম্পর্কে জানাও আপনার জন্য ফরয। কিন্তু ইলম ও ইলম অর্জনের মর্যাদা আরও ব্যাপক। আর ঠিক এই মুহূর্তে আপনি এ মর্যাদাপূর্ণ কাজটি করছেন। নিচের আয়াতটির দিকে লক্ষ করুন। এ আয়াতে আল্লাহ সঃ বলছেন যে, আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে আল্লাহ ছাড়া আর কারও উপাস্য হবার অধিকার নেই। মালাইকারাও অর্থাৎ ফিরিশতারাও এই সাক্ষ্য দেন। তারপর আল্লাহ সঃ তৃতীয় আরেকটি শ্রেণির কথা জানিয়েছেন যারা এ সত্যের সাক্ষ্য দেয়। আর এই শ্রেণি হলো তাঁরা, যাদের ইলম আছে। আল্লাহ সঃ বলেছেন :

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। ফিরিশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা আলি ইমরান, ১৮)

এ আয়াতের ব্যাপারে ইমাম আল-কুরতুবি রাঃ বলেছেন, ‘মানুষের মধ্যে যদি আলিমদের চেয়ে সম্মানিত কেউ থাকত, তাহলে আল্লাহ সঃ তাঁর নাম এবং তাঁর মালাইকাদের নামের

সাথে সাথে তাদের কথাও বলতেন।^{১০৮}

আল্লাহ ﷻ কুরআনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেছেন :

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

বলুন, হে আমার রব, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন। (সূরা আত-ত্বহা, ১১৪)

এ আয়াতে আল্লাহ ﷻ তাঁর রাসূলকে আরও বেশি ইলম প্রার্থনা করার নির্দেশ দিচ্ছেন। যদি ইলমের চেয়ে অধিক সম্মানিত কিছু চাওয়ার মতো থাকত, তাহলে আল্লাহ ﷻ তাঁর রাসূলকে সেটার জন্যই দুআ করতে শেখাতেন। কিন্তু আল্লাহ ﷻ তাঁর রাসূলকে সম্পদ, সম্মান, খ্যাতি কিংবা অন্য কিছু চাইতে বলেননি; বরং আল্লাহ ﷻ ইলম বৃদ্ধির জন্য দুআ শিখিয়েছেন।

আল্লাহ ﷻ কুরআনে বলেছেন :

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, ক্ষমাকারী। (সূরা আল-ফাতির, ২৮)

মুয়াউইয়া ইবনু আবি সুফিয়ান রাঃ রাসূলুল্লাহ সঃ-এর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন,

مَنْ يُرِذُ اللَّهَ بِهِ خَيْرًا يُفْقَهُهُ فِي الدِّينِ

আল্লাহ তাআলা যার ভালো চান, তাকে দীনের গভীর বুঝ দান করেন।^{১০৯}

ইলম অর্জনের ব্যাপারে নিজের ভেতরে গাফলতি অনুভব করলে, অলসতা বোধ করলে, এই হাদিসটি স্মরণ করবেন। এই মুহূর্তে আপনি যে এই বইটি পড়ছেন ইন শা আল্লাহ এটি আপনার প্রতি আল্লাহ সঃ-এর ভালোবাসা ও আল্লাহ সঃ যে আপনার জন্য ভালো কিছু চান তার লক্ষণ।

সহিহ মুসলিমে বর্ণিত একটি হাদিসে আছে, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন,

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

‘যে ব্যক্তি দীনের ইলম অর্জনের জন্য কোনো পথ অনুসন্ধান করে আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামে প্রবেশের পথকে সহজ করে দেন।’^{১১০}

৩৫ তাফসিরুল কুরআনে ওপরেও আয়াতের আলোচনা।

৩৬ সহিহুল বুখারি : ৭১; সহিহ মুসলিম : ২৪৩৬

৩৭ সহিহ মুসলিম : ৭০২৮

মনে রাখবেন এখানে ইলম বলতে ধীন ইসলামের জ্ঞানকে বোঝানো হচ্ছে। আমরা যখন 'ইলম' বলছি আমরা তখন ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞানকেই বোঝাইছি।

তালিবুল ইলমদের জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ হাদিস এসেছে ইবনু মাজাহ, আবু দাউদ এবং তিরমিযিতে। আবু দারদা রাঃ থেকে বর্ণিত এই হাদিস থেকে বোঝা যায় ইলম কতটা মূল্যবান। একজন ইলম অন্বেষণকারী হওয়া কতটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বোঝার চেষ্টা করুন। এই হাদিসে আবু দারদা রাঃ বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন,

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالَمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحَيَّاتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَبْطِ زَاوِيَةٍ

যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের পথসমূহের মধ্যে কোনো একটি পথে পৌঁছে দেন।

হাদিসের এ অংশটি সহিহ মুসলিমে এসেছে এবং একটু আগে আমরা এটা উল্লেখ করেছি। এবার বাকি অংশটুকু শেখাল করুন। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন,

وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ

'ইলম অন্বেষণকারীদের কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ফিরিশতাগণ তাদের প্রতি নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন।'

যখন আপনি ইলম অর্জনে মনোযোগী হবেন ফিরিশতারা আপনার প্রতি তাদের ডানা বিছিয়ে দেবেন। তারা আপনাকে ভালোবাসবেন, সম্মান ও শ্রদ্ধা করবেন। তারা আপনার জন্য নিচে নেমে আসবেন, তাদের ডানা আপনার ওপর ছড়িয়ে দেবেন। নিজেদের বিনম্র করবেন আপনার জন্য। আপনাকে সুরক্ষিত রাখবেন ও আপনাকে পাহারা দেবেন। কেন? কারণ, আপনি ইসলাম সম্পর্কে জানার চেষ্টা করছেন, ইলম অর্জনের চেষ্টা করছেন।

তারপর রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন,

وَإِنَّ الْعَالَمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحَيَّاتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ

অর্থাৎ, আসমানসমূহ ও জমিনের অধিবাসীরা একজন তালিবুল ইলম, একজন ইলম অন্বেষণকারী, একজন আলিমের জন্য আল্লাহ সঃ-এর নিকট ইস্তিগফার ও দুআ প্রার্থনা

করে। সুতরাং এমন মনে করা উচিত হবে না যে, এখানে কেবল মানুষ ও জিনদের ইস্তিগফার করার কথা বলা হচ্ছে। বরং এখানে আসমান ও জমিনের অধিবাসীদের কথা বলা হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

وَالْحَيَّاتَانِ فِي جَوْفِ النَّاءِ

অর্থাৎ সমুদ্রের মাছও তালিবুল ইলমের জন্য ইস্তিগফার করে। আপনি কি চান না সবাই আপনার জন্য দুআ করুক? তাহলে যেখানে যে অবস্থায় থাকুন না কেন, জ্ঞান অর্জনের চেষ্টায় অবিচল থাকুন।

হাদিসের পরবর্তী অংশে বলা হচ্ছে,

فَضَّلَ الْعَالِمُ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَذْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ

অর্থাৎ, একজন নফল ইবাদতগুহারের ওপর একজন আলিমের শ্রেষ্ঠত্ব হলো রাতের আকাশে তারকারাজির ওপর পূর্ণিমার চাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের মতন।

রাতের আকাশে অন্যান্য সব তারার তুলনায় চাঁদ যে কতটা উজ্জ্বল সেটা আমরা সবাই জানি। রাতের আকাশজুড়ে থাকে চাঁদের আলোকিত আভা ও উজ্জ্বলতা। পুরো আকাশজুড়ে তার আধিপত্য। চাঁদের পাশে তারাগুলোকে মনে হয় ছোট ছোট বিন্দুর মতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ হাদিসে এভাবেই একজন আবিদ ও আলিম ব্যক্তির তুলনা করেছেন। আবিদ হলেন রাতের আকাশে এক বিন্দু তারার মতো, অন্যদিকে তার তুলনায় একজন আলিম হলেন চাঁদের মতো।

সুনানুত তিরমিযির আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, আবু উমামাহ আল বাহিলী ؓ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

فَضَّلَ الْعَالِمُ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ أَدْنَاكُمُ

একজন আলিমের মর্যাদা একজন আবিদের ওপর তেমন, যেমন তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে কম মর্যাদাবান ব্যক্তির তুলনায় আমার মর্যাদা।^{১৫৫}

আমরা জানি যেকোনো আলিম বা অন্য যেকোনো মানুষের চেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মর্যাদা অনেক, অনেক বেশি। সেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ আলিমদের মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে এভাবে নিজের সাথে সংযুক্ত করে উদাহরণ দিয়েছেন। আল্লাহ ﷻ-এর দ্বীনের পথের একজন শিক্ষার্থী, একজন জ্ঞান অন্বেষণকারীর জন্য এরচেয়ে বড় সম্মান আর কী হতে পারে? ইলম অর্জনের রাস্তায় দৃঢ় থাকতে এর চেয়ে বড় অনুপ্রেরণা আর কী হতে পারে?

আর তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

وَالْأَنْبِيَاءُ زُرَّتْهُ الْعُلَمَاءُ

আর নিশ্চয় আলিমরা হলেন নবিদের ওয়ারিশ।

আপনি কি নবিদের উত্তরসূরি হতে চান? তাহলে দ্বীন সম্পর্কে জানুন, পড়ুন। এ পথ সম্মানের ওপর সম্মানের, মর্যাদার ওপর মর্যাদার পথ। চিন্তা করে দেখুন নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর উত্তরসূরি বলে অভিহিত হওয়া কতটা সম্মানের!

হাদিসের পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে :

وَالْأَنْبِيَاءُ لَمْ يَزِرْتُوا دِينًا وَلَا دِرْهَمًا وَزَرْتُمُ الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ

নবিগণ উত্তরাধিকারস্বরূপ দিনার-দিরহাম রেখে যান না। তারা টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ রেখে যান না। উত্তরাধিকারসূত্রে তারা রেখে যান ইলম। সুতরাং যে এই ইলম অর্জন করেছে নিঃসন্দেহে সে ব্যাপকভাবে লাভবান হয়েছে, বিপুল বিত্তের অধিকারী হয়েছে। মানুষের মধ্যে অনেকে প্রচুর টাকার মালিক হতে চায়—তারা বিল গেটস, ওয়ারেন বাফেট কিংবা ওয়ালিড বিন তালালদের মতো বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের মালিক হতে চায়। অনেকে পদমর্যাদা আর ক্ষমতা চায়। রাজা-বাদশাহ, প্রধানমন্ত্রী-প্রেসিডেন্ট অথবা এমন কোনো বড় পদমর্যাদার অধিকারী তারা হতে চায়, যাতে লোকেরা তাদের বাহবা দেয়, সম্মান করে। অনেকে অন্য কারও পোশাক আর স্টাইল ফলো করে। এভাবে সবাই কিছু না কিছুকে নিজের উদ্দেশ্য বানিয়ে নেয়। সেগুলোর পেছনে ছুটে বেড়ায়। কিন্তু যা আসলেই মূল্যবান তা হলো, নবি-রাসূল আলাইহিস্লাম সালামের রেখে যাওয়া সম্পদ, আর এ সম্পদ থেকে খানিকটা নিজের করে নেয়া। কিন্তু আজ এটাই মানুষের কাছে সবচেয়ে মূল্যহীন। যা সবচেয়ে মূল্যবান সেটার দিকে মানুষের মনোযোগ সবচেয়ে কম। মানুষের সব চিন্তা, প্রচেষ্টা, শ্রম হলো রাজা আর নেতাদের মতো হবার দিকে। সামাজিক মর্যাদা, প্রতিপত্তি আর সম্পদ অর্জনের জন্য মানুষ উদয়াস্ত ছুটে চলে, কত কিছুই না করে! কিন্তু তাদের কাছে নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর রেখে যাওয়া সম্পদ উপেক্ষিত! কয়জন মানুষ আজ এ সম্পদ অর্জনের চেষ্টা করে? কয়জন তাদের সম্মানকে এ সম্পদ অর্জনের শিক্ষা দেয়?

আবুল ওয়াফা' ইবনু আকিল বলেছেন, তারুণ্যে আল্লাহ ﷻ আমাকে হেফযত করেছেন। অল্প বয়সে আমার সমস্ত ভালোবাসা কেবল জ্ঞান অর্জনের জন্যই বরাদ্দ ছিল। যারা খেলাধুলা করে বেড়াত আমি তাদের সাথে মিশতাম না। নির্বোধ প্রকৃতির কারও সাথে কখনো আমি মিশিনি। আমি কেবল ইলম অন্বেষণকারী, তালিবুল ইলমদের সাথে সময় কাটাতাম। এখন আমার বয়স আশি পেরিয়েছে, কিন্তু বিশ বছর বয়সে ইলম অর্জনের প্রতি আমার যে পিপাসা ও ভালোবাসা ছিল, আজ তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

কথাগুলো একটু চিন্তা করে দেখুন।

মুতারিফ বলেছেন,

فَضْلُ الْعِلْمِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ

আমি ইবাদতের চাইতে ইলম অর্জন করতে বেশি ভালোবাসি, আর মনে করি এ দুয়ের মধ্যে এটাই উত্তম। ইবাদত করার চেয়ে জ্ঞান অর্জন করা আমার অধিক পছন্দনীয়।^{৯৯}

শুধু তিনি নন, আরও অনেক আলিম একই ধরনের কথা বলেছেন।

ইয়াহইয়া ইবনু আবি কাসির বলেছেন,

لَا يُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْجِسْمِ

‘আরামের সাথে সত্যিকারের ইলম আসে না।’^{১০০}

আপনি যদি আসলেই ইলম অর্জন করতে চান, আপনাকে আরাম ছাড়তে হবে। নিজের অবসর ও ঘুম থেকে কিছু সময় বের করে ইলম অর্জনের জন্য বরাদ্দ করতে হবে। পাশাপাশি মনে রাখবেন, ফেইসবুক আর টুইটারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটিয়ে আপনি কোনোদিন সত্যিকারের জ্ঞানের অধিকারী হতে পারবেন না। ফেসবুক, টুইটারের পেছনে অনেক ভাইয়েরা প্রচুর সময় ব্যয় করেন বলে আমি শুনেছি। বেশি থেকে বেশি হলে দৈনিক পনেরো থেকে বিশ মিনিট সময় এগুলোর পেছনে ব্যয় করতে পারেন।

ইবনু আব্বাস রাঃ বলেছেন, কখনো কখনো রাতের বেলায় ইবাদতের চেয়েও আমার কাছে ইলম অর্জন করাই বেশি পছন্দনীয় হয়।

আয যুহরি রাঃ বলেছেন :

مَا عُيِدَ اللَّهُ بِمِثْلِ الْعِلْمِ

‘ইলম অর্জনের সমতুল্য আর কোনো ইবাদত নেই।’^{১০১}

এখানে ইলম অর্জন বলতে বোঝানো হচ্ছে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা, মুবাহ্ব করা, পড়া। শুধু তাওহিদ না, দ্বীনের সব বিষয়ের ইলমই গুরুত্বপূর্ণ। তবে আমরা বিশেষ করে তাওহিদের কথা বলেছি। কারণ, তাওহিদ হলো সব নীতির মূলনীতি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক জ্ঞান। তাওহিদের জ্ঞান হলো ওই জ্ঞান যা আমাদের জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাবে, ইন শা আল্লাহ।

৯৯ আল-আদাব লিল বাইহাকি, বর্ণনা নং : ৮৩০

১০০ সহিহ মুসলিম : ১৪২১

১০১ বাইহাকি, শুয়াবুল ইমান : ৪৬৯৭

ইমাম শাফে'ঈ ﷺ বলেছেন,

طَلَبُ الْعِلْمِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ

'ইলম অর্জন করা নফল নামায পড়ার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'।^{১৭৭}

এ কথার সঠিক অর্থ বুঝতে হলে আগে আপনাকে বুঝতে হবে তাদের জীবনযাপন-পদ্ধতি, রুটিন কেমন ছিল। তাদের লাইফস্টাইল ছিল পরিপূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ। তাদের পুরো সময়টাই ছিল আল্লাহ ﷻ-এর জন্য বরাদ্দ। সুতরাং প্রায়ই তাদের সিদ্ধান্ত নিতে হতো যে, আজ কি আমি রাত জেগে নামাজ পড়ব? নাকি ছাত্রদের পড়াব? নাকি এই বইটা লেখার কাজে হাত দেবো, নাকি পরদিন সকালের ব্রাসের জন্য প্রস্তুতি নেব?

একটা করতে গেলে আরেকটা ছাড়তে হচ্ছে। সুতরাং আশ- শাফে'ঈ ﷺ-এর কথার অর্থ হলো, এ রকম অবস্থায় ইলম অর্জন নফল সালাতের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমাদের কথা আলাদা। আমরা প্রতিদিন প্রচুর সময় নষ্ট করি। আর বিশ্বাস করুন, আমরা যেভাবে জীবনযাপন করি, তাতে আমরা ইবাদত আর ইলম অর্জন দুটোই করতে পারি। কারণ, আমাদের অনেক বাড়তি সময় থাকে। তাঁরা যেভাবে সময়ের মূল্য দিয়েছেন আমরা তার ধারেকাছেও পৌঁছতে পারিনি। কীভাবে তারা ইলমকে গুরুত্ব দিয়েছেন, ইলম শেখার জন্য দূরদূরান্তে সফর করেছেন, এর পেছনে ছুটে বেড়িয়েছেন—তার কিছু দৃষ্টান্ত নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করব।

সালাফদের সময়ের আলিম :

জাবির এবং আবু আইয়ূব ﷺ

আহমাদ এবং আবু ইয়াল্লা ﷺ বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবি জাবির ﷺ একটি হাদিস সংগ্রহ করার জন্য মদীনা থেকে আশ-শামে (অর্থাৎ সিরিয়াতে) আবদুল্লাহ ইবনু উনাইসের কাছে গিয়েছিলেন। মানচিত্র খুলে দেখুন কোথায় মদীনা আর কোথায় সিরিয়া। একটি হাদিসের জন্য তিনি মদীনা থেকে সিরিয়া গিয়েছিলেন। ইলম সম্পর্কিত একটি অত্যন্ত চমৎকার বই হলো ইবনু আদিল বার ﷺ-এর জামি'য়ু বায়ানিল ইলম। এ বইতে ইবনু আদিল বার ﷺ ইলমের মর্যাদা নিয়ে আলোচনায় সাহাবি আবু আইয়ূব ﷺ-এর একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। আবু আইয়ূব ﷺ তখন মদীনাতে বসবাস করছিলেন। একদিন তিনি তার জিনিসপত্র গুছিয়ে মিসরের দিকে রওনা দিলেন উকবা ইবনু নাকি ﷺ-এর সাথে দেখা করার জন্য। মিসরে পৌঁছানোর পর তিনি মিসরের আমির, মুসলিমা ইবনু মাখলাদ আল আনসারির সাথে দেখা করলেন। মুসলিমা তাকে অভ্যর্থনা জানালেন, আলিঙ্গন করলেন,

তারপর মিসরে আসার কারণ জানতে চাইলেন। আবু আইয়ূব রাঃ বললেন, ‘আমি এখানে রাসূলুল্লাহ সঃ-এর একটি হাদিসের জন্য এসেছি, যেটা আমি আর উকবাহ ইবনু নাফি ছাড়া আর কেউ সরাসরি শোনেনি। আমার সাথে এমন কোনো লোককে দিন যে আমাকে উকবাহর ঘর চিনিয়ে দিতে পারবে। তারপর আবু আইয়ূব রাঃ উকবাহ রাঃ-এর বাড়ি গেলেন। দরজা খুলে উকবাহ রাঃ তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। আবু আইয়ূব রাঃ-এর কাছে জানতে চাইলেন মদীনা থেকে মিসর আসার কারণ। আবু আইয়ূব রাঃ বললেন, ‘রাসূলুল্লাহ সঃ-এর কাছ থেকে আমি এমন একটি হাদিস শুনেছিলাম, যেটা তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ সরাসরি শোনেনি। হাদিসটি ছিল কোনো মুসলিমের দোষ গোপন করার ব্যাপারে। হাদিসটি কী ছিল উকবাহ? তুমি কি হাদিসটি আমাকে একটু শোনাবে?’

উকবাহ রাঃ বললেন, হ্যাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ সঃ-এর কাছ থেকে হাদিসটি শুনেছি। তিনি সঃ বলেছেন,

مَنْ سَتَرَ مُؤْمِنًا فِي الدُّنْيَا عَلَى خِزْيِهِ ، سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

‘যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোনো মুসলিমের দোষ বা লজ্জাকর বিষয় লুকিয়ে রাখবে, মহান আল্লাহ শেষ বিচারের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন।’^(১০০)

আবু আইয়ূব রাঃ শুনে বললেন, তুমি ঠিক বলেছ।

তারপর কী হলো? তিনি কি উকবাহ রাঃ-এর বাড়িতে চা বা কফি খাওয়ার জন্য কিছুক্ষণ বসলেন? নিঃসন্দেহে উকবাহ রাঃ তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু ইবনু আব্বাস বার বার্না করেছেন,

ما حل رحله وما جلس

আবু আইয়ূব রাঃ তার মালপত্র খুললেন না। বসলেনও না। কথা শেষ করে উঠের পিঠে চড়ে মদীনার দিকে রওনা দিলেন। তিনি মদীনা থেকে মিসর গিয়েছিলেন কেবল একটি হাদিস শোনার জন্য। তাও এটি তার অজানা কোনো হাদিস ছিল না; বরং এটি ছিল এমন একটা হাদিস যেটা তিনি আর উকবাহ রাঃ ছাড়া, আর কেউ সরাসরি রাসূলুল্লাহ সঃ-এর কাছ থেকে শোনেনি। আবু আইয়ূব রাঃ এই হাদিসটি আরেকবার উকবাহ রাঃ-এর মুখ থেকে শোনার সম্মানটুকু ছাড়তে চাননি। মুহাম্মাদ সঃ-এর উচ্চারিত যে শব্দগুলো শুধু তারা দুজন সরাসরি শোনার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন সেটা আবার উকবাহ রাঃ-এর মুখে উচ্চারিত হতে দেখার সুযোগ তিনি ছাড়তে চাননি। আর আজ আমরা মানুষকে বলি, যান কিছু খাবার গরম করে নিন, হাতে কফির মগ নিয়ে আয়েশ করে বিছানায় হেলান দিয়ে ইউটিউবে ক্লিক করে ইসলাম সম্পর্কে কিছু বিষয় জেনে নিন। আপনাকে বাসার আরাম-আয়েশ কিছুই ছাড়তে

হবে না। অথচ মানুষ আজ এতটুকুও করতে চায় না। মানুষ এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

মুহাম্মাদ বিন হাসান আশ-শাইবানি ও আসাদ ইবনুল ফুরাত ۞

আরেকটি উদাহরণ দেখুন। মুহাম্মাদ বিন হাসান আশ-শাইবানি ۞ ছিলেন এমন একজন মানুষ যিনি বলতে গেলে ঘুমাতেন-ই না। ছিলেন ইমাম আবু হানিফা ۞-এর সেরা ছাত্রদের একজন। তিনি খুব অল্প ঘুমাতেন যাতে ইলম অর্জনের জন্য বেশি সময় পাওয়া যায়। ঘুমানোর সময়টুকু তিনি ইলমের পেছনে ব্যয় করতেন। তারাও কিন্তু আমাদের মতো রক্ত-মাংসের মানুষ ছিলেন, আমাদের মতো তারাও ক্লান্তি অনুভব করতেন। কিন্তু তারা আন্তরিক ছিলেন। তাঁরা জীবনের একটি লক্ষ্য স্থির করেছিলেন, আর সে লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রতি নিবেদিত ছিলেন। সে লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাঁরা সাধ্যমতো সর্বোচ্চ চেষ্টা করতেন। এ কারণেই তারা এত বড় মাপের মানুষ হতে পেরেছিলেন। মুহাম্মাদ ইবনু হাসান আশ-শাইবানি ۞ রাতের বেলায় একটি বালতিতে বরফ-ঠান্ডা পানি রাখতেন। যখন ঘুম আসত, সেই পানি দিয়ে চোখ-মুখ মুছতেন আর বলতেন, উষ্ণতা তন্দ্রা আনে আর ঠান্ডা পানি ঘুমকে দূর করে দেয়।

আরেকটি উদাহরণ দেখা যাক। আসাদ ইবনুল ফুরাত ۞ ছিলেন স্পেনের একজন বিখ্যাত আলিম। তিনি স্পেনে বসবাস করতেন এবং কিছুদিন উত্তর আফ্রিকার দিকেও ছিলেন। আসাদ ইবনুল ফুরাত ۞ স্পেন থেকে মদীনাতে গিয়েছিলেন ইমাম মালিক ۞-এর কাছে থেকে শেখার জন্য। তিনি সরাসরি ইমাম মালিক ۞-এর কাছে তাঁর মাযহাব নিয়ে পড়াশুনা করেছিলেন। ইমাম মালিক ۞-এর কাছে পড়া শেষ হলে তিনি গেলেন ইরাকে। দেখুন প্রথমে স্পেন থেকে মদীনা, তারপর মদীনা থেকে ইরাক। ইরাকে তিনি ইমাম আবু হানিফা ۞-এর কাছে শিখতে গেলেন, তারপর গেলেন মুহাম্মাদ বিন হাসান আশ-শাইবানি ۞-এর কাছে। মুহাম্মাদ ইবনু হাসান আশ-শাইবানি ۞, যার কথা আমরা মাত্র আলোচনা করেছি, যিনি রাতে ঘুম তাড়ানোর জন্য বরফ-ঠান্ডা পানি দিয়ে চোখ মুছতেন।

যখন আসাদ ইবনুল ফুরাত ۞ ইরাকে মুহাম্মাদ বিন হাসান আশ-শাইবানি ۞-এর কাছে শেখার জন্য আসলেন, তিনি সাধারণত যে মাসজিদে দারস দিতেন তাকে সেটা দেখিয়ে দেয়া হলো। মাসজিদে গিয়ে দেখলেন অনেক ভিড়। ভিড় হওয়াটাই স্বাভাবিক। মুহাম্মাদ বিন হাসান আশ-শাইবানি ۞ ছিলেন তাঁর সময়ের একজন ইমাম। আসাদ ইবনুল ফুরাত ۞ ভিড় কমার অপেক্ষা করলেন। আস্তে আস্তে ভিড় কিছুটা কমল। তবে ইমাম মুহাম্মাদ ۞-এর আশেপাশে তখনো বেশ কিছু ঘনিষ্ঠ ছাত্র। তাদের ভিড় ঠেলে আসাদ ইবনুল ফুরাত ۞ মুহাম্মাদ বিন হাসান আশ-শাইবানি ۞-এর কাছে গিয়ে বললেন,

‘ইমাম, আমি একজন বিদেশি, আমার কাছে খুব বেশি টাকাও নেই। ইরাকে বেশিদিন আমি থাকতে পারব না। আমাকে স্পেনে ফিরে যেতে হবে। এই অল্প সময়ে কিভাবে আমি আপনার কাছে থেকে আপনার সব জ্ঞান আহরণ করতে পারি?’

মুহাম্মাদ ইবনু হাসান আশ-শাইবানি রহিমুল্লাহ বললেন, সকালে অন্য সবার সাথে হালাকায় বসবেন। আর রাতে আমার বাসায় আসবেন। আমি আপনাকে শেখাব। আসাদ ইবনুল ফুরাত রহিমুল্লাহ তার কথামতো কাজ শুরু করে দিলেন। সকালে অন্যান্য ছাত্রদের সাথে মাসজিদে হালাকায় বসেন, আর রাতে ইমাম মুহাম্মাদ রহিমুল্লাহ-এর ঘরে গিয়ে তার কাছ থেকে শেখেন। রাতে পড়ানোর সময় ঘুম এলে মুহাম্মাদ বিন হাসান আশ-শাইবানি রহিমুল্লাহ নিজের মুখে পানি দেন, কিন্তু আসাদ তো আর নিজের মুখে পানি দেন না। ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে যায়, ঝিমুনি আসে। তখন ইমাম মুহাম্মাদ রহিমুল্লাহ ছাত্রের মুখেও পানি ছিটিয়ে দেন। গভীর রাত, সবাই ঘুমিয়ে গেছে, ইমাম মুহাম্মাদ বরফ-ঠান্ডা পানি ছিটিয়ে দিচ্ছেন আসাদ ইবনুল ফুরাতের মুখে, আর তারা দুজনে বলে যাচ্ছেন 'কলান্নাহ... আল্লাহ বলেছেন, 'কলার রাসূল... রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন'—এভাবে চলত ফজরের আগ পর্যন্ত।

একজন মানুষের আয়ু যদি হয় ৬০ বছর আর সে যদি দৈনিক ৮ ঘণ্টা করে ঘুমায়, তাহলে হিসাব করে দেখুন তার জীবনের এক-তৃতীয়াংশ কাটবে ঘুমে। অর্থাৎ জীবনের প্রায় ২০ বছর সে ঘুমিয়ে কাটাচ্ছে। আর অধিকাংশ মানুষ তো দৈনিক ৮ ঘণ্টার চেয়েও বেশি ঘুমাতে অভ্যস্ত। যদি আপনার পক্ষে সম্ভব হয় আপনি ইমাম মুহাম্মাদ রহিমুল্লাহ-এর মতো করে পড়তে পারেন, কিন্তু আমরা মানুষকে এভাবে পড়তে বলছি না। যে সময়গুলো আমরা অলস বসে থাকি, কিংবা গুনাহর পেছনে নষ্ট করি—কেবল দিনের সেই সময়টুকু যদি আমরা আন্তরিকভাবে ইলম অর্জনের জন্য ব্যয় করি, তাহলেও সেটা যথেষ্ট।

যাই হোক, আসাদ ইবনুল ফুরাত রহিমুল্লাহ এক সময় স্পেনে ফিরে গেলেন। ফিরে গিয়ে তিনি কী করলেন? তিনি কি পায়ের ওপর পা তুলে বলেন, আমি ইমাম মালিক, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মুহাম্মাদ রহিমুল্লাহ এবং আরও অনেকের কাছে পড়েছি? তিনি কি একটু বিশ্রামের কিংবা অবসর জীবনযাপন শুরু করলেন? না। তিনি স্পেন এবং উত্তর আফ্রিকাজুড়ে ইমাম মালিকের *মুয়াত্তা* কিভাবে শেখাতে শুরু করলেন। তারপর তিনি সুকলিয়াহ বা সিসিলি জয়ের জিহাদে शामिल হলেন এবং যুদ্ধে নিহত হলেন। এই ছিল তাঁর জীবন। আসাদ ইবনুল ফুরাত, একজন ইমাম, আল্লাহ স্বত্ব তার ওপর রাহমাহ বর্ষণ করুন।

আসাদ ইবনুল ফুরাত, মুহাম্মাদ ইবনু হাসান আশ-শাইবানি কিংবা আবু হানিফা রহিমুল্লাহ সময়ের মূল্য বুঝতেন। সময়ের মূল্য বোঝার কারণেই তারা মহিরুহে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁদের কাছে সময় ছিল অত্যন্ত মূল্যবান এবং তাদের কাছে ইলমচর্চা ছিল পবিত্র ও মূল্যবান। আর এ কারণেই তারা এত বড়মাপের আলিম হতে পেরেছিলেন।

সাইদ ইবনু মুসাইয়্যিব, আর-রাযি ও আল-বুখারি রহিমুল্লাহ

সাইদ ইবনু মুসাইয়্যিব রহিমুল্লাহ বলতেন, দিন-রাত সফর করে আমি একটি হাদিস সংগ্রহ করতাম। একটি হাদিস খুঁজে বের করার জন্য সাইদ ইবনু মুসাইয়্যিব রহিমুল্লাহ দিন-রাত পথ চলতেন। অথচ

আজ কয়েক ক্লিকের মধ্যে, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আমরা সেটা খুঁজে পাচ্ছি। আর-রাযি র বলেছেন, 'ইলম অর্জনের জন্য আমি এক হাজার ফারসাখেরও (فرسخ) বেশি দূরত্ব ভ্রমণ করেছি। তারপর হিসাব করা বন্ধ করে দিয়েছি।' এক হাজার ফারসাখ হচ্ছে ৫,০০০ কিলোমিটার অথবা ৩,১০৬ মাইল। এক হাজার ফারসাখ পর্যন্ত তিনি হিসাব রেখেছিলেন, তারপর গোনা বন্ধ করে দিয়েছেন। ইলমের জন্য তিনি আরও কত পথ ভ্রমণ করেছেন তার হিসাব নেই।

ঘুমানোর সময় বই বা হাদিস সংকলনের জন্য কোনো কিছু যদি মাথায় আসত ইমাম বুখারি র তৎক্ষণাৎ উঠে সেটা লিখে রাখতেন। এভাবে যখনই তার কিছু মনে পড়ত তিনি ঘুম থেকে উঠে সেটা লিখে রাখতেন। ইবনু কাসির র তার বিখ্যাত বই আত-তারীখে উল্লেখ করেছেন, আল-বুখারি এভাবে গড়ে প্রতি রাতে বিশবার ঘুম থেকে উঠতেন।

এই মানুষগুলো ইলমের প্রকৃত মূল্য বুঝতেন এবং এটাই 'ই'লাম'। এভাবেই ই'লাম অর্থাৎ ইলম অর্জন করতে হয়। আমাদের মতো নরম গদির ওপর আধশোয়া অবস্থায় তাঁরা এই জ্ঞান অর্জন করেননি। ছয় লক্ষের চেয়েও বেশি হাদিস থেকে বাছাই করে ইমাম বুখারি একটি হাদিসের কিতাব সংকলন করেছিলেন। যেটাকে আমরা আজ সহিহ বুখারি নামে চিনি। যেসব হাদিস পুনরাবৃত্তি হয়েছে সেগুলো না ধরলে সহিহ বুখারিতে হাদিস আছে মোট ২,৬০২টি। আর যেসব হাদিস পুনরাবৃত্তি হয়েছে সেগুলোসহ হিসাব করলে বুখারিতে মোট ৭,৫৯৩টি হাদিস আছে। ইবনু হাজার র -এর মতে সংখ্যাটা ৭,৩৯৭। যদি এগুলোর সাথে তালিকাত আল-মুতাআবা'আত (تعليقات المتابعات) হাদিসগুলোর সংখ্যা যোগ করা হয় তাহলে, ইমাম বুখারি সব মিলিয়ে তার সংকলনে মোট ৯,০৮২টি হাদিস এনেছেন। আর এই প্রতিটি হাদিস তাঁর সংকলনে লেখার আগে তিনি দুই রাকাত করে ইস্তিখারার সালাত আদায় করতেন।

কষ্ট ছাড়া, কঠোর প্রচেষ্টা ছাড়া জ্ঞানার্জন সম্ভব না। আপন যদি ইলম অর্জন করতে চান, তাহলে আপনার ঘুম, বিশ্রাম আর সোশাল মিডিয়াতে কাটানো সময় থেকে কিছুটা করে সময় বের করে নিয়ে সেটাকে ইলম অর্জনের পেছনে ব্যয় করতে হবে।

এ ঘটনাগুলো বলার উদ্দেশ্য হলো উসুল আস-সালাসা বইটির লেখক 'ই'লাম' দ্বারা কী বুঝিয়েছেন, সেটা অনুধাবন করা। যখন তিনি 'ই'লাম' বলছেন, তখন চাচ্ছেন যেন আপনি ইলম অর্জন করেন। তিনি চাচ্ছেন আপনি এই ইলমকে সম্মান করুন। তিনি জানিয়ে দিচ্ছেন, আমরা গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ শুরু করতে যাচ্ছি, খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে আমি আপনাদের শেখাতে যাচ্ছি। তাই প্রয়োজনীয় ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হোন। আর ইলম অর্জনের জন্য ত্যাগ স্বীকারের অর্থ কী হতে পারে, সেটা বোঝানোর জন্য আমরা ওপরের দৃষ্টান্তগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম। আমি জানি, ইলমের জন্য এই মহান ব্যক্তির যােভাবে ত্যাগ স্বীকার করেছেন, আমরা কখনোই সেভাবে আত্মত্যাগ করতে পারব না। তবুও কেন আমরা এই

উদাহরণগুলো, এই দৃষ্টান্তগুলো তুলে ধরছি? আমরা এ উদাহরণগুলো তুলে ধরছি কারণ তাঁরা যতটুকু করেছেন, আপনি যদি সেটার শুধু পাঁচ পার্সেন্ট অথবা দশ পার্সেন্ট করেন, তাহলেও ইন শা আল্লাহ আপনি ভালো একটি অবস্থানে পৌঁছে যাবেন। অন্যদিকে আমাদের চারপাশে যারা গুনাহর পেছনে অথবা অযথা কাজে সময় নষ্ট করছে, তাদের দিকে তাকালে আমরা আর এগোতেই পারব না। এ ধরনের মানুষেরা কখনো ইলমের কোনো পর্যায়েই পৌঁছাতে পারবে না। তাই আমরা এ মহান দৃষ্টান্তগুলো তুলে ধরছি যাতে করে অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে আপনি তাদের সামনে রাখতে পারেন। তারা যা করেছেন তার পাঁচ পার্সেন্ট অথবা পঞ্চাশ পার্সেন্ট করার লক্ষ্য সামনে রাখতে পারেন। যদি এতটুকুও করেন ইন শা আল্লাহ আপনি উত্তম অবস্থানে থাকবেন।

ইমাম নাওয়াউয়ী, লিসানুদ দ্বীন, ইবনুল বাতীব ৷ ও মুয়ায ইবনু জাবাল ৷

ইমাম নাওয়াউয়ী ৷-এর দিকে তাকান। বইয়ের পর বই লিখে গেছেন। তার ব্যাপারে যে বিষয়টা আমার কাছে সবচেয়ে বিস্ময়কর মনে হয় সেটা হলো, তিনি মারা যান মাত্র ৪৪ বছর বয়সে। এখন আমার যা বয়স তাঁর চেয়ে কয়েক বছর বেশি। উনি কখন বই লেখা শুরু করেছেন জানেন? তার বয়স ত্রিশ পার হবার পর। আজকাল লোকে লাফ দিয়ে লেকচার দিতে দাঁড়িয়ে যায়, খুতবাহ দিতে দাঁড়িয়ে যায়। অথচ ইমাম নাওয়াউয়ী ৷ তার বয়স ত্রিশ হবার আগে লেখাই শুরু করেননি। আর তিনি মারা গেছেন ৪৪ বছর বয়সে।

এই অল্প সময়ে তিনি শারহ মুসলিম (شرح مسلم), রিয়াদুস সালেহিন (رياض الصالحين), আল-আযকার (الأذكار), আল-মাজমু (المجموع), মিনহাজ ফিল ফিকহ (منهج في الفقه), আত-তিবইয়ান ফি আদাবি হামালাতিল কুরআন (التيبان في آداب حلة القرآن), আল-ইদাহ (البيان), মিনহাজুত তালিবিন (منهج الطالبين), বুস্তানুল আরিফীন (بستان العارفين), মিনহাজুত তালিবিন (روضة الطالبين), তাহযিবুল আসমা ওয়াল লুগাত (تهذيب الأسماء و اللغات) এবং আত-তাকরীব (التقريب) নামে ইবনু সালাহ ৷-এর হাদিসশাস্ত্র সম্পর্কে কিতাবের সারসংক্ষেপ লিখেছেন। তিনি চল্লিশটি হাদিসের সংকলন করেছেন, যা আল-আরবাউন (চল্লিশ হাদিস) নামে প্রসিদ্ধ। এমন কোনো তালিবুল ইলম পাওয়া যাবে না যার কাছে ইমাম নাওয়াউয়ী ৷-এর চল্লিশ হাদিস বইটি নেই। এমন কোনো তালিবুল ইলম পাওয়া যাবে না, যে পড়াশুনার সময় দিনে অন্তত দশবার 'ইমাম নাওয়াউয়ী ৷' উচ্চারণ করছে না। তিনি উসুলুল ফিকহের ওপর যাওয়ায়িদুর রাওদাহ (زوائد الروضة) নামে একটি বই লিখেছিলেন। তিনি সহিহ আল-বুখারির শরাহ বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ লেখা শুরু করেছিলেন, কিন্তু শেষ করতে পারেননি। তার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। এটি শেষ হলে সহিহ বুখারির ওপর ইবনু হাজার ৷-এর বইয়ের মতোই অনবদ্য একটি বই হতো।

ইমাম নাওয়াউয়ী ৷ বলেছেন, 'জীবনের এমন দুটি বছর কাটিয়েছি যখন এক মুহূর্তের জন্যও

আম্মর পিঠ মাটি কিংবা বিছানা স্পর্শ করেনি।' টানা দু-বছরে এক মুহূর্তের জন্য তিনি বিছানা কিংবা মাটিতে শোননি। তাকে প্রশ্ন করা হলো, তাহলে আপনি ঘুমাতেন কীভাবে? ইমাম আন-নাওয়াউয়ী রহ বললেন, 'যখন ক্লান্ত হয়ে পড়তাম, আমার বইগুলোর ওপর ঝুঁকে, ওগুলোর ওপর ভর দিয়ে অল্প একটু ঘুমিয়ে নিতাম।' একটু চিন্তা করুন ব্যাপারটা।

মানুষের জীবনের বিভিন্ন লক্ষ্য থাকে। আজকালকার কিছু বাচ্চা ছেলে-ছোকরাকে দেখবেন ইমাম নাওয়াউয়ী রহ-এর সমালোচনা করতে। কিন্তু এ লোকগুলোর লক্ষ্য আর ইমাম নাওয়াউয়ী রহ-এর লক্ষ্য আলাদা। কারও লক্ষ্য থাকে ফিরদাউস, কারও লক্ষ্য থাকে আল-আরাফ, আবার কেউ হয়তো জাম্মাতের দরজার সামনের জায়গাটুকু পেলেই সন্তুষ্ট। ৪৪ বছর বয়সে ইমাম নাওয়াউয়ী রহ যা করেছেন, অনেক সময় লক্ষ লক্ষ মানুষ মিলেও তা করতে পারে না।

আরেকটি উদাহরণ দেখা যাক। লিসানুদ দীন ইবনুল খাতীব ছিলেন স্পেনের একজন আলিম। ১৩৪০ হিজরির দিকে একজন আলিম ও নেতা হিসেবে তিনি স্পেনে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তার ডাকা হতো যুল-উমরাইন অর্থাৎ দুই জীবনের অধিকারী ব্যক্তি। তাকে এমন উপাধি দেয়ার কারণ কী ছিল? কারণ, দিনের বেলায় তিনি ব্যস্ত থাকতেন রাষ্ট্রের কাজ, মোকদ্দমা-সালিশ এগুলোর সমাধান নিয়ে। আর তাঁর রাত কাটত বই নিয়ে। তিনি আসলেই দুটি পৃথক জীবনযাপন করতেন। তিনি ঘুমের থেকে সময় বের করে নিয়েছিলেন যাতে করে তিনি দুটি জীবনের অধিকারী হতে পারেন।

আমি আবারও বলছি, আমরা এই মহান ব্যক্তিদের উদাহরণ দিচ্ছি যাতে আমরা যেন কিছুটা হলেও উনাদের মতো হতে পারি, হবার চেষ্টা করতে পারি। ইলমের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও অবস্থার উন্নতি করতে পারি। এ উদাহরণগুলো দেয়ার এটাই উদ্দেশ্য। আমি বলব, আপনি পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুমান, দৈনিক ৮ ঘণ্টা ঘুমান। বইয়ের ওপর ঝুঁকে, হেলান দিয়ে ঘুমানোর দরকার নেই। নরম মোলায়েম, পাবির পালক ভর্তি ম্যাট্রেসের ওপরেই ঘুমান। কিন্তু গল্প-গুজব করে কিংবা ফেইসবুকে, ইউটিউবে স্ক্রল করে যে সময়টা নষ্ট করছেন, সে সময়টাকে ইলম অর্জনের জন্য ব্যবহার করুন।

মুয়ায ইবনু জাবাল রহ বেঁচে ছিলেন মাত্র ৩৫ বছর। তিনি ছিলেন ইয়েমেনবাসীর কাছে পিতৃতুল্য, কারণ তাঁর মাধ্যমেই ইয়ামেনের অধিবাসীরা ইসলামের শিক্ষা পেয়েছিলেন। আজ মুয়ায রহ কবরে থেকেও ইয়েমেনের সব মুসলিমের পক্ষ থেকে প্রতিদান পাচ্ছেন। আন-নাওয়াউয়ী রহ আর মুয়ায রহ যে ক্লাসিক-কন্সট অতিক্রম করেছিলেন, তা শেষ হয়ে গেছে। আজ তাঁরা কবরে শায়িত। নির্যুঁয়, ক্লান্ত রাতগুলো চলে গেছে, কিন্তু তাঁদের কাজ এবং কাজের পুরস্কার রয়ে গেছে। তা এখনো চলছে।

ইমাম আহমাদ রহ কী পরিমাণ পরিশ্রম আর কষ্ট করতেন, সেটা দেখে তাঁর আশেপাশের মানুষরা প্রশ্ন করত, আপনি বিশ্রাম নেবেন কখন? ইমাম আহমাদ রহ বলতেন, 'কবরে'।

আমি তো কল্পনা করি যে ইমাম নাওয়াউদী রহিমুল্লাহ কবরে হাসিমুখে শুয়ে আছেন। আমরা যতবার তার নামের সাথে রহিমুল্লাহ বলছি তিনি পুরস্কার পাচ্ছেন। যতদিন তার বইগুলো পড়া হবে, তিনি পুরস্কৃত হতে থাকবেন। তার রেখে যাওয়া ইলম হলো সাদাকা জারিয়াহ—এমন দান যা চলতেই থাকে। তিনি কবরে শুয়ে আছেন, কিন্তু তাঁর পুরস্কার বেড়ে চলেছে।

আল বদর ইবনু জামাআহ বলেছেন, ‘আমি যখন ইমাম নাওয়াউদী রহিমুল্লাহ-কে দেখতে গেলাম, বসার কোনো জায়গা পেলাম না। তারপর তিনি চারপাশের কিছু বই সরিয়ে আমার জন্য বসার জায়গা করে দিলেন। আর যখন আমি বসলাম তখনো তিনি বইয়ের মধ্যে ডুবে ছিলেন, ইলমের সন্ধানে। তিনি বইগুলো থেকে এমনভাবে জ্ঞান অন্বেষণ করে চলছিলেন যেভাবে একজন মা তার হারানো সন্তানকে খুঁজে বেড়ায়।’

হাসান আল বাসরি রহিমুল্লাহ বলেছেন, ‘দুই ব্যক্তি কখনোই তৃপ্ত হয় না। প্রথম ব্যক্তি হলো ইলম অন্বেষণকারী আর দ্বিতীয় হলো সম্পদ অন্বেষণকারী। এ দু-ধরনের ব্যক্তি কখনোই পূর্ণিতৃপ্ত হয় না। বরং সময়ের সাথে তাদের চাহিদা বাড়তেই থাকে।

এভাবেই পূর্ববর্তীরা ইলম নামক গুণধনের অন্বেষণে ধৈর্য ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ইলম হলো এমন এক সম্পদ, যা সাধনা ছাড়া অর্জন করা সম্ভব না।

ই‘লাম রাহিমাকাল্লাহ—অবগত হোন, আল্লাহ স্বত্ব আপনার ওপর রহম করুন।

সুলাইমান ইবনু আবদিল মালিক এবং আতা ইবনু আবি রাবাহ রহিমুল্লাহ

বনু উমাইয়্যার বিখ্যাত খলিফাহ, সুলাইমান ইবনু আব্দিল মালিক হজ করতে গেলেন। সাথে দুই ছেলে। হজের বিভিন্ন আহকাম সম্পর্কে তার কিছু প্রশ্ন ছিল, তাই সবাই তাকে বলল আতা ইবনু আবি রাবাহের কাছে যান। আতা ইবনু আবি রাবাহ রহিমুল্লাহ ছিলেন একজন তাবিরি, যিনি ১১৪ হিজরিতে মারা যান। তিনি ছিলেন একজন মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস। তাঁর চোখে সমস্যা ছিল, এক চোখে দেখতেন না। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাটতেন, গায়ের রং ছিল কালো। মূর্খ লোকেরা যেসব বিষয় নিয়ে মানুষকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে, তাঁর মধ্যে সবগুলোই ছিল। কিন্তু মুসলিম উম্মাহর খলিফাহর যখন হজ নিয়ে কিছু প্রশ্নের উত্তর জানা দরকার হলো, তখন সবাই তাকে এই ব্যক্তির কাছে যেতে বলল।

খলিফাহ তাকে কাবার কাছে নামাজে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেলেন। দুই ছেলেকে নিয়ে পেছনে দাঁড়িয়ে খলিফাহ তাঁর নামায শেষ হবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। যখন তার নামায শেষ হলো, খলিফাহ বললেন, হে আতা, আমার একটি প্রশ্ন আছে। দৃশ্যটি কল্পনা করুন—একজন সাবেক দাস, খলিফাহর দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছেন, যেন তারা অশস্ত্র এবং তিনিই সম্মানিত। এ অবস্থায় খলিফাহ তাকে প্রশ্ন করছেন। তিনি পেছনে ফিরেও তাকালেন না। খলিফাহর কাছে তাঁর চাইবার কিছু নেই, কিন্তু খলিফাহ নিজ প্রয়োজনে তার

কাছে এসেছেন। খলিফাহর এমন এক ব্যক্তিকে প্রয়োজন, অস্ত্র লোকেরা যাকে সবদিক দিয়ে তুচ্ছ মনে করে। যখন খলিফাহ সুলাইমান বুঝতে পারলেন আতা কতটা সম্মানিত এবং খলিফাহ হওয়ার পরও, ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আতার তুলনায় তিনি কতটা ক্ষুদ্র—তখন তিনি তার দুই ছেলেকে বললেন,

يا أولادى لا تنيا فى طلب العلم

ইলম অর্জনে কখনো অলসতা কোরো না, কারণ আতার সামনে আমাদের কতটা ক্ষুদ্র হয়ে দাঁড়াতে হয়েছে, আমি কখনোই তা ভুলতে পারব না।

কোনো ব্যক্তির কাছে এসে খলিফাহ প্রশ্ন করছেন—এটাই একটা বিরাটা ব্যাপার। তার ওপর চিন্তা করুন যাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে তিনি হলেন একজন কালো, খোঁড়া, মুক্তিপ্রাপ্ত দাস—যে এক চোখে দেখে না। যাকে সবাই তুচ্ছতাইল্য করে। অথচ এ ব্যক্তির কারণে খলিফাহ তার ছেলদের বলতে বাধ্য হলেন, তারা যেন কখনো ইলমের অন্বেষণ ছেড়ে না দেয়।

রিয়ক সব সময়ই নিশ্চিত। কিন্তু ইলম না। একজন খলিফাহর অনেক রিয়ক আছে, কিন্তু ইলম নেই। তাই আমরা ইলমের অন্বেষণ করি, আর আল্লাহ ﷻ সব সময় আমাদের রিয়কের নিশ্চয়তা দেন।

আল-কাসায়ি ও খলিফাহ হারুনর রশিদের ছেলেরা

খলিফাহ হারুন আর-রশিদের ছিল দুই ছেলে। আল-আমিন ও আল-মামুন। এ দুজনকে পড়ানোর জন্য সে সময়ের প্রসিদ্ধ একজন আলিমকে তিনি এনেছিলেন। তার নাম ছিল আল-কাসায়ি। যখন আল-কাসায়ি দরজার কাছে আসতেন, খলিফাহর দু-ছেলে দরজা খুলে, তাঁর জুতো হাতে নিয়ে তাঁকে ভেতরে স্বাগত জানাত। হারুন আর-রশিদ হয় ব্যাপারটা দেখেছিলেন বা এটা সম্পর্কে শুনেছিলেন। একদিন তিনি আল-কাসায়িকে তার প্রাসাদকক্ষে ডেকে প্রশ্ন করলেন, লোকেদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত কে?

কাসায়ি জবাব দিলেন, আপনি, হারুন আর-রশিদ। আপনি খলিফাহ, আপনিই এখানে সবচেয়ে সম্মানিত।

তখন হারুন আর-রশিদ বললেন, ‘না, বরং ওই ব্যক্তিই সর্বাধিক সম্মানিত যার জন্য দরজা খুলতে নেতৃত্বের উত্তরাধিকারীরা ছুটে যায় এবং তার জুতো হাতে তুলে নেয়।’

তাই আমাদের ইলম এবং ইলম অর্জনের মহান মিশনের গুরুত্ব বোঝা দরকার।

আশ-শাফে'ঈ ও ইবনুল জাওযী

ইমাম শাফে'ঈ রহিমুল্লাহ-এর কাছে জানতে চাওয়া হলো, কীভাবে তিনি ইলম অর্জন করেছেন। জবাবে তিনি বললেন, আমি ইলমের পেছনে ছুটেছি যেভাবে একজন মা তার হারানো ছেলেকে খোঁজে। সন্তান হারিয়ে গেলে একজন মায়ের কী অবস্থা হয়? সেই মা তখন পঙ্গলের মতো, খ্যাপার মতো তার হারানো ছেলেকে খুঁজে ফেরে। ইমাম শাফে'ঈ রহিমুল্লাহ বলেছিলেন, তিনি এই মায়ের মতোই ইলমের পেছনে ছুটে বেড়িয়েছেন।

ইবনুল জাওযী রহিমুল্লাহ বলেছেন, অনেক বছর আমি 'হারিসাহ' খাবার ইচ্ছে চেপে রেখেছিলাম। হারিসাহ হলো এক ধরনের মিষ্টি, এটা আজও আরবে খুবই বিখ্যাত ও জনপ্রিয়। ইবনুল জাওযী হারিসাহ খাবার ইচ্ছে অনেক দিন মনের ভেতরে চেপে রেখেছিলেন, কারণ মাসজিদের পাশের হারিসাহ বিক্রেতা প্রতিদিন ঠিক ওই সময়ে আসত, যখন তার ক্লাস চলত। ইচ্ছা থাকলেও তিনি হারিসাহ খেতে যেতে পারতেন না, কারণ তিনি মিষ্টির জন্য ক্লাস মিস করতে চাইতেন না। তাঁর মনে হারিসাহ খাবার লোভ ছিল, কিন্তু তিনি ইলমের-জ্ঞানার্জনের-সম্মান ও পুরস্কার আরও বেশি করে চাইতেন। প্রকৃত জ্ঞানার্জন হলো সাধনার বিষয়। এটা এমন কিছু না যা আপনি দেখিয়ে বেড়াবেন। এটা এমন কিছু না যেটা আপনি কেবল হঠাৎ কখনো হাতে সময় পেয়ে গেলে করবেন। এটা এমন কিছু না যে আপনার আর কোনো কিছু করার না থাকলেই আপনি হালাকায় যাচ্ছেন বা জ্ঞানার্জনে সময় দিচ্ছেন।

রাহিমাকাল্লাহ :

রাহিমাকাল্লাহ-আল্লাহ স্বত্ব আপনার ওপর রাহমাহ বর্ষণ করুন। ই'লাম রাহিমাকাল্লাহ বাক্যের দ্বিতীয় শব্দ-রাহিমাকাল্লাহ-দ্বারা লেখক বোঝাচ্ছেন, আল্লাহ স্বত্ব আপনার ওপর রাহমাহ বর্ষণ করুন, যাতে করে আপনি অর্জন করতে পারেন যা আপনি খুঁজছেন। আল্লাহ স্বত্ব আপনাকে রাহমাহ দান করুন-যা কিছু আপনার জন্য ভালো তা অর্জন করার এবং যা কিছু ক্ষতিকর তা থেকে দূরে থাকার। এই হলো রাহিমাকাল্লাহর অর্থ। রাহিমাকাল্লাহ দ্বারা বোঝানো হয়-আল্লাহ স্বত্ব যেন আপনার অতীতকে ক্ষমা করে দেন এবং ভবিষ্যতে আপনাকে হিদায়াত ও হেফাযত করেন। এ সবকিছু রাহিমাকাল্লাহর অর্থের অন্তর্ভুক্ত।

যদি আপনি রাহিমাকাল্লাহ ও গাফারলাক একত্র করেন, তাহলে প্রতিটির আলাদা অর্থ হবে। মাগফিরাহ হলো ক্ষমা। আর রাহমাহ হলো দয়। একত্রীভূত অবস্থায়, মাগফিরাহ দ্বারা আগের গুনাহর জন্য ক্ষমা এবং রাহমাহ দ্বারা পরবর্তী গুনাহ, সেগুলোর ফলাফল এবং শাস্তি থেকে নিরাপত্তাকে বোঝাবে। অর্থাৎ দুটোকে একত্র করা হলে শব্দ দুটো ভিন্ন অর্থকে নির্দেশ করবে। কিন্তু যদি মাগফিরাহ অথবা রাহমাহর কথা আলাদা করে উল্লেখ করা হয়, তাহলে একটি উল্লেখ করলে অপরটির অর্থও প্রকাশ পাবে। সুতরাং যদি শুধু মাগফিরাহর কথা উল্লেখ করা

হয়, তাহলে সেটা মাগফিরাহর পাশাপাশি রাহমাহর অর্থও প্রকাশ করবে। একইভাবে যদি শুধু রাহমাহ উল্লেখ করা হয়, তবে তার মাধ্যমে মাগফিরাহর অর্থও প্রকাশ পাবে। অর্থাৎ এ দুটোর যেকোনো একটি শব্দকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হলে, উল্লেখিত শব্দটি অন্যটির অর্থকেও ধারণ করবে। কাজেই কোনো বাক্যে শুধু মাগফিরাহ বলা হলে তা দ্বারা রাহমাহকেও বোঝানো হচ্ছে। কোনো বাক্যে শুধু রাহমাহ বলা হলে তা দ্বারা মাগফিরাহকেও বোঝানো হচ্ছে।

এ ক্ষেত্রে নিয়মটি কোনো বাক্যে ইসলাম ও ঈমান একসাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিয়মটির অনুরূপ। ইসলামের তিনটি পর্যায় আছে—ইসলাম, ঈমান এবং ইহসান। আল্লাহ ﷻ কুরআনে বলেছেন :

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ.....

নিশ্চয় আল্লাহর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধীন হলো ইসলাম। (সূরা আলি ইমরান, ১৯)

এখানে ঈমানের উল্লেখ ছাড়াই শুধু ইসলামের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এখানে ইসলাম শব্দটি দ্বারা ঈমান ও ইহসানের অর্থও প্রকাশ পাচ্ছে। যখন কোনো বাক্যে এভাবে শুধু ‘ইসলাম’ ব্যবহৃত হয় তখন তার মধ্যে ঈমান অর্থটিও অন্তর্ভুক্ত থাকে। অন্য একটি আয়াতে শুধু ঈমানের কথা বলা হয়েছে :

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا

বেদুইনরা বলে, ‘আমরা ঈমান আনলাম’...। (সূরা হজুরাত, ১৪)

যেহেতু এখানে শুধু ঈমান শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে তাই এখানে ঈমান শব্দটির মধ্যে ইসলাম ও ইহসান অর্থ দুটিও অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, যদি কোনো বাক্যে কেবল একটি ব্যবহার করা হয়, তাহলে উল্লেখিত শব্দটি অন্যটির অর্থকেও ধারণ করবে। আবার যখন কোনো বাক্যে ইসলাম ও ঈমান একসাথে ব্যবহৃত হয় তখন তারা ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে।

এই একই নিয়ম মাগফিরাহ ও রাহমাহর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

একজন কাফিরকে উদ্দেশ্য করে কি রাহিমাকাল্লাহ বলা যাবে?

লেখক এখানে রাহিমাকাল্লাহ বলেছেন, কারণ তিনি শেখানোর চেষ্টা করছেন। যখন আপনি কোনো কাফিরকে—সেটা হতে পারে কোনো কাফির আত্মীয় অথবা যেকোনো কাফির—ইসলামের দিকে আহ্বান করবেন, তখন আপনি কি তাকে উদ্দেশ্য করে বলতে পারবেন—আল্লাহ ﷻ আপনার ওপর রাহমাহ বর্ষণ করুন?

আমি ব্যাপারটা স্পষ্ট করে বলছি—প্রথম পয়েন্ট হলো, এ ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই যে, কাফির অবস্থায় মারা যাওয়া ব্যক্তির জন্য দুআ করা যাবে না। আপনি এমন

ব্যক্তির জন্য দুআ করতে পারবেন না। আপনি বলতে পারবেন না যে—আল্লাহ ﷻ তার ওপর রহম করুন। *আল-মাজমুর* পঞ্চম খণ্ডে, ইমাম নাওয়াউদী ﷺ বলেছেন, এ ব্যাপারে ইজমা আছে। অর্থাৎ এ ব্যাপারে ঐকমত্য আছে। *আল-ফাতাওয়া*র ১২তম খণ্ডে ইবনু তাইমিয়াহ ﷺ বলেছেন, ইজমা আছে যে মৃত কাফিরের জন্য দুআ করা নিষিদ্ধ।

তবে জীবিত কাফিরের বেলায় ব্যাপারটা কেমন, তা নিয়ে কিছু কথা বলা দরকার। আমি বিষয়টি পরিষ্কার করছি, কারণ কোনো কোনো মর্ডানিস্ট কিংবা জাহিল পূর্ববর্তীদের বইয়ে লেখা কিছু মন্তব্য দেখিয়ে বলা শুরু করে—‘দেখো, অমুক অমুক আলিম বলেছেন যে, জীবিত কাফিরের জন্য রাহমাহর দুআ করা জায়েজ।’ আর যে হারে এদের অবনতি হচ্ছে, কিছুদিনের মধ্যেই এরা হয়তো মৃত কোনো কাফিরের ক্ষেত্রেও একই কথা চালিয়ে দিতে পারে। আর এ জন্যই আলিমদের কাছ থেকে, শুয়ুখের কাছ থেকে ইলম শিক্ষা করা জরুরি। যেমন, অনেক সময় আপনি বইতে মাকরুহ শব্দটি দেখবেন। মাকরুহ অর্থ অপছন্দনীয়। কিন্তু অনেক শাইখ, যে বস্ত্র বা কাজকে হারাম গণ্য করতেন সেগুলোর ক্ষেত্রে মাকরুহ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ তাঁরা মাকরুহ শব্দটি ব্যবহার করেছেন হারাম অর্থে। যেসব আলিম এ নীতিটি গ্রহণ করেছেন তাঁদের বই পড়ার সময় যদি এ ব্যাপারটা আপনাকে জানিয়ে দেয়া না হয়, তাহলে আপনি নিজে থেকে কীভাবে বুঝবেন? আপনি বই পড়তে গিয়ে দেখলেন লেখা আছে, যিনা-ব্যভিচার অপছন্দীয় বা মাকরুহ। মদ হলো মাকরুহ। আপনার অবস্থা কী হবে? যদি আপনি শেকড় সম্বন্ধে অন্তঃ হন, অর্থাৎ ওই শাইখ—মাকরুহ বা অপছন্দনীয় শব্দটি হারাম অর্থে ব্যবহার করেন—এই নীতি সম্পর্কে না জানেন, তাহলে ব্যাপারটা সঠিকভাবে বুঝতে পারবেন না।

একটা ব্যাপার নিশ্চিত, যখন আপনি একজন কাফিরের জন্য রাহমাহর দুআ করছেন তখন এটাকে এভাবে বুঝতে হবে যে, এ ক্ষেত্রে রাহমাহ অর্থ হলো আল্লাহ ﷻ যেন তাকে হিদায়াত করেন। আল্লাহ ﷻ যেন তাকে পথ দেখান। *ফাতহুল বারি*র ১১তম খণ্ডে হাফিয ইবনু হাজার ﷺ এটা উল্লেখ করেছেন। এখানে আমি ইবনু হাজার ﷺ-এর উল্লেখ করা সারমর্মের কথা বলছি এবং এ ব্যাপারে এটাই শ্রেষ্ঠ সারমর্ম। তিনি তার সারমর্মে বলেছেন, ‘আপনি একজন কাফিরের হিদায়াতের জন্য দুআ করতে পারেন। আর যদি আপনি তার জন্য রাহমাহর দুআ করেন তবে অবশ্যই আপনার দুআর পেছনে নিয়ত হতে হবে যে, এ ক্ষেত্রে রাহমাহ অর্থ হিদায়াহ। কাজেই আপনি যদি কোনো জীবিত কাফিরকে উদ্দেশ্য করে রাহিমাকাল্লাহ বলেন, তাহলে তা শতভাগ এই নিয়্যাতেই হতে হবে যে—আল্লাহ ﷻ তার ওপর হিদায়াতের রাহমাহ করুন। এ ছাড়া অন্য কোনো অর্থে, অন্য কোনো নিয়্যাতে কোনো জীবিত কাফিরকে উদ্দেশ্য করে, আল্লাহ ﷻ আপনার ওপর রাহমাহ করুন—এ কথা বলা যাবে না।

তবে উত্তম হলো সরাসরি ও স্পষ্টভাবে বলা যে, আল্লাহ ﷻ তাকে অথবা তাঁদের হিদায়াত করুন। তবুও যদি আপনি এ ক্ষেত্রে অনুত্তম অবস্থান গ্রহণ করে, দুআতে রাহমাহ শব্দটি

ব্যবহার করেন, তাহলে অবশ্যই আপনাকে এ নিয়্যাতে দুআ করতে হবে যে এখানে রাহমাহ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হিদায়াহ।

সহিহ আল-বুখারির ব্যাখ্যাগ্রন্থ উমদাতুল কারিতে বাদরুদ্দিন আল-আইনি রাহমতুল্লাহি (হে আল্লাহ, আমার কণ্ঠকে ক্ষমা করো, তারা তো অজ্ঞ!) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ দুআর ব্যাপারে বলেছেন, যখন তার কণ্ঠ কাফির ছিল, তাঁর ক্ষতি করছিল ও তাঁর ওপর অত্যাচার চালাচ্ছিল, তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য আল্লাহ স্ব-এর কাছে দুআ করেছিলেন, আল্লাহ স্ব যেন তাদের ক্ষমা করে দেন। বাদরুদ্দিন আল-আইনি রাহমতুল্লাহি বলেছেন, এ ক্ষেত্রে এ দুআর অর্থ হলো, আল্লাহ স্ব যেন তাদের ইসলামে প্রবেশের হিদায়াহ দেন, যাতে করে তাঁরা ক্ষমা পায়। তাই আলিমগণ ঠিক কী বোঝাচ্ছেন, সেটা সঠিকভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন।

লেখক কেন শুরুতে ই'লাম রাহিমাকাল্লাহ বললেন?

এবার আসা যাক, লেখক কেন শুরুতে ই'লাম রাহিমাকাল্লাহ বললেন সে আলোচনায়। হিকমাহ ও গভীর জ্ঞানসম্পন্ন আলিমগণ এ ধরনের কথা দিয়ে বক্তব্য শুরু করতেন। এ কথার মাধ্যমে লেখক ওই ব্যক্তির জন্য দুআ করছেন, যে তাঁর কথা শুনেছে ও তাঁর কাছ থেকে শিখছে। যে ভবিষ্যতে বইটি পড়তে পারে তিনি তার জন্যও দুআ করছেন। এখানে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা নিহিত আছে। মানুষের কাছে কোনো বার্তা পৌঁছে দেয়ার সময় দয়ালু ও সহানুভূতিশীল হওয়া আবশ্যিক। যাদের তিনি শিক্ষা দিচ্ছেন, একজন দা'ঈর জন্য তাদের এটা বোঝানো অপরিহার্য যে তিনি তাদের জন্য হিদায়াহ কামনা করেন। দাওয়াহ করার সময় মানুষকে বোঝাতে হবে যে আপনি তাদের অন্ধকার থেকে উজ্জ্বল আলোর দিকে নিয়ে আসতে চান।

একজন দা'ঈ তার হাসির মাধ্যমে মন জয় করেন। এটা হলো অন্তরের চাবি। আপনার দাওয়াহর মধ্যে রাহমাহ থাকতে হবে। এটা হতে পারে হাসির মাধ্যমে অথবা প্রশংসা, কোনো শব্দে, অথবা কারও পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়ার মাধ্যমে। আজ অনেককে দেখলে মনে হয় দাঁত যেন সতরের অংশ। অনেকের আচরণ এমন যে, দাঁত ঢেকে রাখা যেন পর্দার অংশ। কথাটা হাসির না, আসলেই কিছু মানুষ এমন। দাওয়াহ হয় হিকমাহ, ভদ্রতা ও নম্রতার মাধ্যমে। আপনি চাবি ছাড়া তো ঢুকতে পারবেন না। রাহমাহ হলো মানুষের মন জয় করার চাবি।

নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ স্ব বলেছেন :

وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

আর আপনি যদি রুক্ষ ও কঠোরচিহ্ন হতেন, তাহলে তারা আপনার আশপাশ হতে সরে পড়ত। (সূরা আলি ইমরান, ১৫৯)

যদি খোদ নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর জন্য এ কথা প্রযোজ্য হয়, তাহলে চিন্তা করুন অন্য কারও ক্ষেত্রে কী হতে পারে। নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ক্ষেত্রে আল্লাহ ﷻ যা বলেছেন একজন দা'ঈকে তা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে এবং দাওয়াহর ক্ষেত্রে নবি ﷺ-এর মতো হতে হবে।

فَإِذَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছেন—সে তোমাদের কল্যাণকামী, মুমিনদের প্রতি করুণাসিক্ত, বড়ই দয়ালু। (সূরা আত-তাওবা, ১২৮)

আল্লাহ ﷻ বলছেন, তোমাদের কাছে একজন রাসূল এসেছেন—মুহাম্মাদ ﷺ। তিনি এসেছেন তোমাদের মধ্য থেকে, তোমরা তাঁকে ভালোমতো চেনো। তোমাদের যা কিছু কষ্ট দেয় তা তাঁর নিকট খুবই কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী। তিনি তোমাদের নিয়ে উৎকণ্ঠিত, তিনি চিন্তিত। তিনি চান তোমরা হিদায়াত পাও এবং তাওবাহ করো। তিনি তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চান। মুমিনদের প্রতি তিনি করুণাসিক্ত, বড়ই দয়ালু।

আল্লাহ ﷻ তাঁর নবির ব্যাপারে বলছেন—তিনি হলেন এমন একজন ব্যক্তি যে তোমাদের প্রতি দয়ালু, সহানুভূতিশীল, যে তোমাদের ব্যাপারে চিন্তিত, যে তোমাদের পরিণতি নিয়ে দুশ্চিন্তা করে, যে তোমাদের দিতে চায় সর্বোত্তমটাই।

উসুল আস-সালাস লেখক যখন রাহিমাকান্নাহ বলছেন—তখন তিনি এমন এক সময়ের মানুষদের উদ্দেশ্য করে বলছেন যখন মানুষ ছিল অজ্ঞতা, বিদআহ ও শিরকে নিমজ্জিত। কবরপূজা ছিল ব্যাপকভাবে প্রচলিত। কবরপূজা করাই ছিল নিয়ম, এর বিপরীতে সঠিক পথে থাকাটা ছিল নিয়মের ব্যতিক্রম।

সে-ই ব্যক্তিই জ্ঞানী, যিনি হিকমাহসম্পন্ন এবং যিনি জানেন যে সত্য কিছুটা কঠিন। সত্য তেতো এবং অনেক সময় হজম করা কঠিন—বিশেষ করে যখন কারও দাদা, পরদাদারা যে বিষয়ের ওপর ছিল, সত্য সেটার বিরুদ্ধে যায়। যেহেতু সত্য শক্ত এবং গ্রহণ করা কঠিন, তাই একজন দা'ঈকে এগোতে হতে হয় হিকমাহর সাথে। তাই কঠিন আচরণের সাথে কঠিন দাওয়াহ করবেন না। আপনি কি দুটো কাঠিন্যকে এক করতে চান? দাওয়াহর কাঠিন্যের সাথে নিজের আচরণের কাঠিন্য মেলাবেন না। কিছু লোক আছে কয়েকটা হাদিস পড়েই মানুষকে কাফির-খারিজিসহ মাথায় যা কিছু আসে বলা শুরু করে দেয়।

হুসাইন আল-কারাবিসি ছিলেন গ্রিকদর্শন চর্চা করা একজন বিদ্যাতি। ফালসাফা বা গ্রিকদর্শন চর্চাকারীদের বৈশিষ্ট্য ছিল, তারা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সবকিছুর ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করত। তারীখ বাগদাদে বর্ণিত আছে, ইমাম শাফে'ঈ رحمه الله যখন বাগদাদে গেলেন আল-কারাবিসি সেটা জানতে পারলেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন আশ-শাফে'ঈ رحمه الله-কে দেখতে আসছিল।

আল-কারাবিসি তার বন্ধুদের বললেন, চলো আমরাও গিয়ে শাফে'ঈকে দেখে আসি। ত্রিকদর্শন চর্চাকারীরা খুব বাকপটু হতো। তাদের কথা হতো সুন্দর ও কৌশলী। কুরআন ও হাদিসের ইলম ছিল না, তাই তারা তাদের কথার জাদু ব্যবহার করত। তো আল-কারাবিসি বললেন, চলো শাফে'ঈর কাছে গিয়ে তাকে নিয়ে কিছুটা মজা করা যাক। আল-কারাবিসি শাফে'ঈ ৷-এর কাছে গেলেন এবং স্বভাবসুলভ চাঁছাছোলা ভঙ্গিতে বিভিন্ন প্রশ্ন করা শুরু করলেন। আশ-শাফে'ঈ ৷ কিন্তু জানেন তারা কেন এসেছে, কী করার চেষ্টা করছে। তিনি এটাও জানেন যে চারপাশে অনেক লোকজন আছে, তিনি চাইলেই এদের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে পারেন। এ অবস্থায় ইমাম শাফে'ঈ ৷ কয়েকজন ছাত্রকে তাদের বের করে দেয়ার জন্য বলতে পারতেন, তিনি লোকজনকে তাদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতে পারতেন। কিন্তু তিনি চুপচাপ তাদের প্রশ্ন শুনলেন। তারপর ধৈর্য ধরে তাদের প্রশ্নের উত্তর দেয়া শুরু করলেন। আয়াতের পর আয়াত, হাদিসের পর হাদিস, একটির পর একটি সালাফদের উদ্ধৃতি দিতে থাকলেন। যতক্ষণ না ইলম ও আদাবের দ্বারা তিনি তাদের অভিভূত করে ফেললেন।

জানেন সবশেষে এই দর্শনবিদ, এই বিদ্যাতি, এই বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাখ্যাকারীরা কি বলল? তারা বলল, আমরা বিদআহ ত্যাগ করলাম এবং আশ-শাফে'ঈ ৷-কে অনুসরণ করলাম। তারা গিয়েছিল ইমাম শাফে'ঈ ৷-কে নিয়ে মজা করার জন্য। তিনি চাইলে তাদের নিয়ে যা ইচ্ছে তা-ই করতে পারতেন। কিন্তু তিনি ধৈর্য ধরলেন করলেন এবং আল্লাহ ৷ তাঁর মাধ্যমে এমন কিছু মানুষকে হিদায়াত করলেন, যারা পরে সে সময়ের শ্রেষ্ঠ ইমামদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

এই হলো রাহমাহর ফলাফল। আশ-শাফে'ঈ ৷-এর কাছে অন্তরের চাবি ছিল এবং বার্তা পৌঁছে দেয়ার হিকমাহ ছিল। আল্লাহ ৷ বলেছেন :

وَلَوْ كُنَّا فَاعِلِينَ حُكْمًا وَعِلْمًا.....

আমি লৃতকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান এবং তাঁকে ওই জনপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম, যারা নোংরা কাজে লিপ্ত ছিল। তারা মন্দ ও ন্যাফরমান সম্প্রদায় ছিল। (সূরা আল-আশ্বিয়া, ৭৪)

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا.....

যখন মুসা যৌবনে পদার্পণ করলেন এবং পরিণত হয়ে গেলেন, তখন আমি তাঁকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম। এমনভাবে আমি সংকর্মশীলদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। (সূরা আল-কাসাস, ১৪)

ইলমের মতোই হিকমাহ থাকাও অপরিহার্য, আর 'রাহিমাকাল্লাহ' এর মাধ্যমে সেটাই প্রকাশ পাচ্ছে। এই বাক্যে রাহিমাকাল্লাহ শব্দটির ব্যবহার ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহাব ৷-এর হিকমাহর অংশ। এভাবেই আয়ত্তে আনা যায় মানুষের মন ও মস্তিষ্ককে। এ থেকে

শিক্ষা গ্রহণ করুন, নিজেকে বিনীত করুন। যদি কারও সাথে দ্বিমতও পোষণ করেন তবুও তো তারা মুসলিম-আল্লাহ ﷻ তাদের ওপর রাহমাহ বর্ষণ করুন। নিজের জানা তাদের প্রতি অবনত করুন। জানেন এখানে কোন ব্যক্তি রাহিমাকাল্লাহ বলছেন? জানেন কোন ব্যক্তি রাহমাহর জন্য দুআ করছেন? ওই মানুষটি, যার ব্যাপারে দুই শ বছরের বেশি সময় ধরে অপবাদ দেয়া হয়েছে, কটু কথা বলা হয়েছে। আজও তা চলছে। কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণকে পুনরুজ্জীবিত করার কারণে তাঁর জীবদ্দশায় শুরু হওয়া ঝড়ের ধুলো আজও মেটেনি। আজও মানুষ তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ দিয়ে যাচ্ছে, তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলছে। এবার চিন্তা করুন, যে আক্রমণ আজও চলছে, তাঁর জীবদ্দশায় সেগুলোর মাত্রা কতটা তীব্র ছিল। অথচ এতকিছুর পর, বিরোধিতাকারীরা তাঁর লেখা চিঠি ও লিফলেটগুলো পড়বে এটা জানার পরও তিনি বলছেন-রাহিমাকাল্লাহ। আল্লাহ ﷻ আপনার ওপর রাহমাহ বর্ষণ করুন।

একজন দা'ঈর আচরণে সঠিক আদাব এবং মুখে হাসি থাকা প্রয়োজন। নিজ আচরণের মাধ্যমে তাকে মানুষের জন্য প্রশান্তির উৎসে পরিণত হতে হবে। যেন তার সাথে কথা বলা, মতবিনিময় করা মানুষের জন্য সহজ হয়। এমন ব্যক্তিই প্রকৃত দা'ঈ এবং এগুলোই প্রকৃত দা'ঈর বৈশিষ্ট্য। এক টুকরো হাসিই হয়তো কারও অন্তরকে আপনার বক্তব্যের প্রতি উন্মুক্ত করে দেবে। রাহিমাকাল্লাহ দ্বারা বোঝানো হচ্ছে-আমি আপনার কল্যাণের ব্যাপারে চিন্তিত এবং আমি চাই আপনারা এ বিষয়গুলো জানুন। সহিহ মুসলিমে আছে,

لَا تَحْفِرَنَّ مِنَ الْمَغْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنَّ ثَلَاثَ أَخَاكَ يَرْجُوهُ ظَلَمٌ

কোনো ভালো কাজকেই তুচ্ছ মনে করো না, যদিও তা তোমার ভাইয়ের সাথে সহাস্য বদনে সাক্ষাৎ হয়।^{৪৪}

সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমে আছে, জারির ইবনু আবিল্লাহ ﷺ বলেছেন,

وَلَا رَأْيَ إِلَّا تَبَسُّمٌ فِي رَجُلٍ

‘আমি কখনোই তাঁকে মুচকি হাসিবিহীন অবস্থায় দেখিনি।’^{৪৫}

এই ছিলেন নবি মুহাম্মাদ ﷺ, যার অনুসরণ আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তিনি হাসিমুখে বলুন, কিংবা ভ্রুকুটির সাথে কথা বলুন, তাঁর প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা তিনি মিষ্টি ভাষায় প্রকাশ করুন কিংবা রুক্ষ ভাষায়-আমরা বাধ্য তার অনুসরণ করতে। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কিন্তু আমার বা আপনার অনুসরণ কারও জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়নি। তাই হিকমাহ, উত্তম আচরণ ও কোমলতার সাথে এমনভাবে এ দাওয়াহ পৌঁছে দিন যা অন্তরে স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রশান্তি আনে।

সুনানুত তিরমিযিতে আছে, আবদুল্লাহ ইবনু আল-হারিস রাঃ বলেছেন,

مَا زَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ نَبَسًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

‘আমি নবি মুহাম্মাদ সঃ-এর চেয়ে অধিক মুচকি হাসতে আর কাউকে দেখিনি।’^(১)

চিন্তা করে দেখুন, রাসূলুল্লাহ সঃ-এর ব্যাপারে একজন সাহাবি এ কথা বলছেন। হাসিমুখে অথবা সদয় ভাষায় একজন মুসলিম ভাইকে অভ্যর্থনা জানানো, পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়া, একটি আলিঙ্গন-এসবই হলো অন্তর খোলার চাবি। সত্যিকারের মুচকি হাসি তড়াতাড়ি আসে, আর ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। আর যেগুলো নকল সেগুলো আসতে অনেক সময় নেয়, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে হারিয়ে যায়।

মুনাফিকের একটি নিদর্শন ও বৈশিষ্ট্য হলো, মুমিনদের প্রতি ধারালো জিহ্বা ও ফ্রুকুটি আর কাফিরদের প্রতি এর বিপরীত।

سَلَفُوكُمْ بِاللَّيْنَةِ جَدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ.....

...অতঃপর যখন বিপদ টলে যায় তখন তারা ধন-সম্পদ লাভের আশায় তোমাদের সাথে বাকচাতুরিতে অবতীর্ণ হয়। (সূরা আল-আহযাব, ১৯)

তারা তাদের জিবে ধার দেয় আর তা মুমিনদের দিকে বাড়িয়ে দেয়।

আল্লাহ সঃ মুমিনদের বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে বলেছেন :

أَيَّدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَاءُ بَيْنَهُمْ

মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং যারা তাঁর সাথে আছে তাঁরা অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর, আর নিজেদের মধ্যে দয়ালু। (সূরা আল-ফাতাহ, ২৯)

আর মুনাফিকদের স্বভাব হলো এর বিপরীত।

একজন দাঈ হলেন একজন ডাক্তার। তাকে মোকাবেলা করতে হয় মন ও আত্মার সমস্যাগুলোর সাথে। আধ্যাত্মিকভাবে, শারীরিকভাবে না। একজন দাঈ বুক চিড়ে হৃৎপিণ্ড নিয়ে চাপাচাপি শুরু করে দেন না। তিনি মানুষের অন্তরের সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেন আধ্যাত্মিকভাবে। তাই দাওয়াহ করতে হলে আপনার জানতে হবে কীভাবে সঠিক উপায়ে মানুষের অন্তর খুলতে হয়। বার্তা পৌঁছে দেয়ার জন্য আগে আপনাকে চাবি খুঁজে বের করতে হবে। যেমনটা আগে বলেছি, এ দাওয়াহ গ্রহণ করা মানুষের জন্য কঠিন, তাই এর সাথে নিজের রুক্ষতাকে মেশাবেন না। আপনার দাওয়াহ মানুষকে নিয়ে আর অনেক সময় মানুষের মনজয়ের জন্য তাদের প্রশংসা করতে হয়।

সালাতের শেষে, নামাযের শেষে আমরা যে দুআ পড়ি, রাসূলুল্লাহ ﷺ সেটা মুয়ায ইবনু জাবাল রূ-কে শিখিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কি হঠাৎ মুয়াযের কাছে এসে বলেছিলেন, সালাতের পর এই দুআ পড়বে? তিনি মুয়াযের কাছে আসলেন এবং বললেন :

إِنِّي أُحِبُّكَ يَا مُعَاذَ

আমি তোমাকে ভালোবাসি, মুয়ায!

আপনি কি চিন্তা করতে পারেন এ কথার পর মুয়ায রূ-এর অন্তরের কী অবস্থা হয়েছিল? আর এ কথা বলার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে দুআ শিখিয়েছিলেন।

فَلَا تَدْعُ أَنْ تَقُولَ دُبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

মুয়ায, তুমি প্রত্যেক সালাতের পর এই দুআটি পড়তে ছেড়ে না— ‘হে আল্লাহ, তুমি আমাকে তোমার যিকির, কৃতজ্ঞতা এবং উত্তমভাবে তোমার ইবাদত করার তাওফিক দাও।’^[১৭]

একইভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ইবনু উমার রূ-কে কিয়ামুল লাইল বা তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতে বললেন, তখন তিনি প্রথমে ইবনু উমার রূ-এর প্রশংসা করলেন, তারপর তাকে তাহাজ্জুদের সালাত আদায়ের কথা বললেন। নবি ﷺ প্রথমে প্রশংসা করলেন আর তারপর আমলের জন্য উৎসাহিত করলেন। আর এটাই হলো হিকমাহসম্পন্ন, সংকর্মশীল এবং সফল দা’ঈদের বৈশিষ্ট্য।

চারটি বুনিয়াদি বিষয় :

ই'লাম রাহিমাকাল্লাহর পর লেখক বলেছেন,

أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا تَعَلُّمُ أَرْبَعِ مَسَائِلَ: الْأُولَى : أَلْعِلْمُ. وَهُوَ مَعْرِفَةُ اللَّهِ، وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ، وَمَعْرِفَةُ دِينِ
الْإِسْلَامِ بِالْأَدِلَّةِ.. الثَّانِيَّةُ: أَلْعَمَلُ بِهِ. الثَّالِثَةُ : الدَّعْوَةُ إِلَيْهِ. الرَّابِعَةُ : الصَّبْرُ عَلَى الْأَذَى فِيهِ.

‘চারটি বিষয়ে জানা আমাদের জন্য আবশ্যিক।

১. ইলম। আর তা হলো, দলিল-সহকারে আল্লাহ ﷻ -কে, তাঁর নবি ﷺ এবং দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা।
২. সেগুলোর ওপর আমল করা।
৩. দাওয়াহ, অর্থাৎ সেদিকে মানুষকে আহ্বান করা।
৪. এসব করতে গিয়ে যে দুঃখ-কষ্ট আসে, তার ব্যাপারে ধৈর্যধারণ বা সবর করা।’

লেখক বলছেন চারটি বিষয়ে জানা আবশ্যিক। লেখক এখানে আরবি يَجِبُ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ এ চারটি বিষয়ে জানা বাধ্যতামূলক।

ওয়াজিবের সংজ্ঞা কী?

কোনো কিছু ওয়াজিব হবার অর্থ হলো, ওই কাজটি করার ব্যাপারে শক্ত নির্দেশ থাকা। কাজটি করার কারণে পুরস্কার, আর উপযুক্ত ওয়র ছাড়া ছেড়ে দেবার কারণে শাস্তির প্রতিশ্রুতি থাকা। এই হলো ওয়াজিবের সংজ্ঞা।

ওয়াজিব আর ফরয কি আলাদা?

ওয়াজিব আর ফরয কি একই নাকি আলাদা? যেটা ওয়াজিব সেটা কি ফরয? যেটা ফরয সেটা কি ওয়াজিব? এ দুটো এক, নাকি দুটো আলাদা ক্যাটাগরি? উসুলুল ফিকহের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে।

কথাটি ভালোভাবে শুনুন এবং মনে রাখুন, আমি এ কথাটা বারবার আপনাদের মনে করিয়ে দেবো। আবু হানিফা রহ ওয়াজিব বলতে যা বুঝিয়েছেন লেখক এখানে 'ওয়াজিব' বলতে সেটা বোঝাননি। লেখক ওয়াজিব বলতে বুঝিয়েছেন—বাধ্যতামূলক। ফরয। এ চারটি বিষয়ে জানা আপনার জন্য ফরয। যদিও তিনি এখানে 'ওয়াজিব' শব্দটি ব্যবহার করেছেন কিন্তু তিনি বুঝিয়েছেন ফরয। বাংলা বা ইংলিশ ব্যাপারটা হয়তো অতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে না, কারণ ইংলিশে ওয়াজিব ও ফরয দুটোর অনুবাদ করা হয় obligatory, বাংলায়ও দুটোকেই 'বাধ্যতামূলক' অনুবাদ করা যায়। কিন্তু যদি ফিকহের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয়, যদি উসুলুল ফিকহের বইগুলোতে তাকান, তাহলে দেখবেন, ওয়াজিব আর ফরয কি একই, নাকি আলাদা—এ ব্যাপারে একটা মতপার্থক্য আছে।

ইমাম শাফে'ঈ, মালিক এবং ইমাম আহমাদ রহ-এর একটি মত অনুযায়ী, ওয়াজিব এবং ফরয এক ও অভিন্ন—দুটোর মাধ্যমেই এমন কিছুকে বোঝানো হয় যা করা বাধ্যতামূলক। পার্থক্য কেবল শাস্তিক।

দ্বিতীয় মতটি হলো ইমাম আবু হানিফার রহ-এর। তার মত হলো, ওয়াজিব হলো আবশ্যিকতা বা বাধ্যবাধকতার দিক থেকে ফরযের চেয়ে একটু নিচের স্তরের। তার মতে যদিও ওয়াজিব এবং ফরয দুটোই পালন করা আবশ্যিক, তবে গুরুত্ব বা আবশ্যিকতার দিক দিয়ে ওয়াজিব হলো ফরযের চেয়ে কিছুটা নিচের স্তরের।

এই হলো দুটি মত। এবার আসুন দুপক্ষের দলিল ও প্রমাণগুলোর দিকে তাকানো যাক।

যারা ওয়াজিব ও ফরযকে সমার্থক মনে করেন, তাঁদের দলিল

যারা মনে করেন ওয়াজিব ও ফরয সমার্থক তারা প্রমাণ হিসাবে সহিহুল বুখারির নিচের হাদিসটি উপস্থাপন করেন :

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ

নাজদের এক বেদুইন চিৎকার করতে করতে রাসূলুল্লাহ স-এর কাছে এল। আরেকটি বর্ণনায় আছে লোকটি অশুটস্বরে কথা বলতে বলতে এসেছিল। এ সময় লোকটির মাথা ছিল অনাবৃত। বেদুইনটি রাসূলুল্লাহ স-কে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করল। রাসূলুল্লাহ স

তার প্রশ্নের জবাব দিলেন এবং স্বীনের বাধ্যতামূলক দায়িত্বগুলো তাকে জানানলেন। তারপর বেদুইনটি প্রশ্ন করল,

هَلْ عَلَى غَيْرِهِ؟

আপনি আমাকে যা জানিয়েছেন এ ছাড়া কি অন্য কোনো আবশ্যিক কাজ আছে? যেসব কাজ আপনি ফরয বলেছেন এর বাইরে কি আর কিছু আছে যা আমাকে করতে হবে?

নবি ﷺ জবাবে বললেন,

لا، إلا أَنْ تَطَّوَّعَ

না, এগুলো ছাড়া আর কিছু তোমাকে করতে হবে না। তবে তুমি বাড়তি পুরস্কারের জন্য স্বেচ্ছায় বাড়তি আমল করতে পারো।^(৯৬)

যারা ওয়াজিব ও ফরয সমার্থক হবার ব্যাপারে এ হাদিসটিতে পেশ করেন তাদের পয়েন্ট হলো :

لَمْ يَجْعَلْ بَيْنَ الْفَرَضِ وَالَّتَطَوُّعِ وَاسِطَةً، بَلِ الْخَارِجُ عَنِ الْفَرَضِ دَاخِلٌ فِي التَّطَوُّعِ

রাসূলুল্লাহ ﷺ এখানে ফরয ও সুন্নাহ আমল ছাড়া মধ্যবর্তী কোনো ক্যাটাগরির কথা বলেননি। কোনগুলো ফরয, তথা বাধ্যতামূলক তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। কোনগুলো ঐচ্ছিক আমল তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এ দুটোর মধ্যবর্তী কোনো ক্যাটাগরির কথা তিনি বলেননি। যদি ওয়াজিব ফরয থেকে আলাদা একটি শ্রেণি হতো, তাহলে তিনি বলতেন, এগুলো হলো বাধ্যতামূলক আমল, এগুলো হলো ওয়াজিব আর তারপর আমি তোমাকে তা'ওয়ায়া' বা সুন্নাহ আমল সম্পর্কে বলব। কিন্তু তিনি এমনটি বলেননি। নবি ﷺ প্রথমে বাধ্যতামূলক বিষয়গুলো সম্পর্কে জানিয়েছেন আর তারপর বলেছেন, এগুলো ছাড়া অন্যান্য যেসব আমল আছে সেগুলো হলো সুন্নাহ। ফরয ও সুন্নতের মাঝামাঝি কিছু বিষয় আছে যেগুলো হলো ওয়াজিব—এমন কিছু নবি মুহাম্মাদ ﷺ বলেননি।

ওয়াজিব ও ফরয একই হবার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রমাণ হলো, আল্লাহ ﷻ কুরআনে বলেছেন,

فَمَنْ قَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ.....

এই মাসসমূহে যে নিজের ওপর হজ্জ আরোপ করে নিল। (সূরা বাকারাহ, ১৯৭)

এই আয়াতে ফরয ব্যবহৃত হয়েছে ওয়াজিবের কনটেক্সটে, যে কারণে তাঁরা বলেছেন যে এ

দুটো একই।^(১১)

তৃতীয় প্রমাণ হলো এই সহিহ হাদিস :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ

‘রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন...’

এখানে রাসূলুন্নাহ ﷺ বলেছেন ‘আল্লাহ বলেছেন’, যখনই কোনো হাদিস শুনবেন যেখানে রাসূলুন্নাহ ﷺ ‘আল্লাহ বলেছেন’ এ কথাটি বলেছেন—বুঝে নেবেন এটি একটি হাদিসে কুদসি। এরপর হাদিসে বলা হচ্ছে :

وَمَا تَقْرَبُ إِلَيَّ عَبْدِي شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ

‘আমি যা ফরয করেছি শুধু সেগুলো আদায় করার মাধ্যমে কোনো বান্দা আমার নৈকট্য অর্জন করতে পারে না...।’

যদি ওয়াজিব পৃথক কোনো ক্যাটাগরি হতো, তাহলে এখানে তিনি ওয়াজিবের কথাও উল্লেখ করতেন। প্রথমে ফরয এবং তারপর ওয়াজিবের কথা উল্লেখ করা হতো। কিন্তু এখানে ফরযের পর ওয়াজিব হিসাবে অন্য কোনো শ্রেণির কথা উল্লেখ করা হয়নি। প্রথমে ফরয উল্লেখ করা হয়েছে তারপর নফল বা ঐচ্ছিক আমলগুলোর ব্যাপারে বলা হয়েছে। মানবখানে আর কোনো ক্যাটাগরির কথা বলা হয়নি। এ প্রমাণটি প্রথম প্রমাণটির অনুরূপ।

চতুর্থ প্রমাণ হলো, বলা হয় যে যদি কেউ ফব্বয় বা ওয়াজিব ত্যাগ করে তবে সেটা নিন্দনীয়। ফব্বয় ও ওয়াজিব, দুটোই ছেড়ে দেয়া নিন্দনীয়। সুতরাং দুটোর আলাদা অর্থ আছে বা এ দুটো পৃথক ক্যাটাগরি এমন বলার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ, শেষ পর্যন্ত ফলাফল একই হচ্ছে। সবাই এ ব্যাপারে একমত যে—এগুলো ছেড়ে দেয়া নিন্দনীয় এবং গুনাহের কাজ। তাহলে যা করা বাধ্যতামূলক এবং ছেড়ে দেয়া নিন্দনীয় ও গুনাহ, সেটাকে কেন আলাদা আরেকটি ক্যাটাগরিতে ফেলতে হবে?

তাই তাঁদের মত হলো, ওয়াজিব ফরয থেকে আলাদা বা ফরয ওয়াজিব থেকে আলাদা, এমন বাড়তি কথা বলার কোনো প্রয়োজন নেই।

সূত্রাং যারা এ মতের পক্ষে, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদিসকে দলিল হিসাবে উপস্থাপন করে বলছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরযের কথা বলার পর সরাসরি তাভাওয়া' বা ঐচ্ছিক

৪৯ তাকসির ইবনু কাসিরে এসেছে: أَوْجِبَ يَاحِرَامُهُ عَجَا: فَنُزِّلَ فِيهِ الْخُفَّ أَيُ: এই মাসসনুহে যে নিজের ওপর হজ্জ আরাধ্য করে নিল' এর অর্থ হলো, 'হজ্জের ইহরাম বাঁধার মাধ্যমে যে নিজের ওপর হজ্জকে আবশ্য্যক করে নিল।' ইবনু জারির **بَدَأَ** বলেন, **أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرَّدَّ مِنَ الْفَرْضِ هَاهُنَا الْإِجَابُ وَالْإِزَامُ** 'যদিহিহগণের ঐকমত্যে এখানে 'ফরয' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 'ওযাক্জিব' বোঝানো এবং শুদ্ধস্বারাওপ করা'।

আমলের কথা বলেছেন, মাঝখানে ওয়াজিব হিসাবে আলাদা কোনো ক্যাটাগরির কথা বলেননি। অতএব ফরয আর ওয়াজিব আলাদা কিছু না।

যারা ওয়াজিব ও ফরযকে আলাদা মনে করেন, তাঁদের দলিল :

অন্যদিকে আহনাফ বা হানাফি মাযহাবের অনুসারীগণ এবং ইমাম আহমাদ রহিমুল্লাহ-এর একটি মত অনুযায়ী ওয়াজিব হলো ফরয থেকে আলাদা একটি ক্যাটাগরি। ফরয একটি শ্রেণি, আর ওয়াজিব একটি আলাদা শ্রেণি। তাদের মতে ফরয হলো ওইসব কাজ যেগুলো অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও সাব্যস্ত এবং যেগুলো অপদায়ের স্থাপারে সবচেয়ে বেশি জোর দেয়া হয়েছে। ওয়াজিব হলো ঠিক এর পরের শ্রেণিটি।

তাদের মতের পক্ষে উপস্থাপিত প্রমাণটি যতটা না নস-ভিত্তিক তার চেয়ে বেশি ভাষাতাত্ত্বিক। যারা আরবি ভাষা শেখেন তারা জানেন যে, অনেক সময় কোনো শব্দের শাব্দিক বা আক্ষরিক অর্থের সাথে ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে ব্যবহৃত অর্থের পার্থক্য হয়।

একটা উদাহরণ দিলে সহজে বুঝতে পারবেন। ইসলাম শব্দটি দেখুন। আরবি অভিধান অনুযায়ী ইসলাম শব্দের, এর মূলের অর্থ কী? ভাষাতাত্ত্বিক বা লিঙ্গুইস্টিক দিক থেকে ইসলাম শব্দটির সংজ্ঞা কী? দেখবেন এর অর্থ দেয়া আছে—সমর্পণ, আনুগত্য করা, বিনীত হওয়া। যে সমর্পণ করে শাব্দিকভাবে আপনি তাকে মুসলিম বলতে পারেন। যে বিনীত, যে নির্দেশের আনুগত্য করে—আপনি তাকে শাব্দিকভাবে মুসলিম বলতে পারেন। ইসলাম যে মূল থেকে এসেছে সেটা অনুযায়ী এই হলো ইসলামের শাব্দিক সংজ্ঞা। কিন্তু যখন দ্বীনের প্রেক্ষাপট থেকে দেখবেন, তখন সংজ্ঞাটি ভিন্ন হবে। যেমন : দ্বীনের দৃষ্টিকোণ থেকে,

الاسْلَامُ لِلَّهِ بِالْتَّوَجُّدِ، وَالْإِقْيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ، وَالْخُلُوصُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ

তাওহিদের সাথে আল্লাহ স্বত্ব-এর কাছে আত্মসমর্পণ করা, সম্পূর্ণভাবে বশ্যতা স্বীকার করে তাঁর আনুগত্যে প্রবেশ করা, শিরক ও মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করাই হলো ইসলাম।

হ্যাঁ, এই অর্থের মধ্যে মূল শব্দের কিছু অর্থ এসেছে, কিন্তু দ্বীনের বা শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামকে বুঝতে হলে এই সম্পূর্ণ সংজ্ঞাকে গ্রহণ করতে হবে। তাই ফরয ও ওয়াজিবের শাব্দিক অর্থের মধ্যে যে হালকা পার্থক্য আছে তার ওপর ভিত্তি করে হানাফি মাযহাবের অনুসারীরা এ দুটোকে দুটো আলাদা শ্রেণি মনে করেন।

আবু যাইদ আদ-দাবুসি বলেছেন, শাব্দিকভাবে ফরয অর্থ হলো কোনো কিছু পরিমাপ করা, অথবা এমন কিছু যা সুনির্দিষ্ট। যদি কোনো কিছু সুনির্দিষ্ট হয় তবে সেটা ফরয। ফরয হলো এমন কিছু যা পরিমাপ করা হয়, যা সুনির্দিষ্ট। অন্যদিকে ওয়াজিব দ্বারা বোঝানো হয় সুকূত (مقروط) বা পতিত হওয়া। এই আয়াতে আল্লাহ স্বত্ব আক্ষরিক অর্থে এটা ব্যবহার করেছেন :

فَإِذَا رَجَبْتَ جُنُوبَهَا.....

এরপর যখন তারা কাত হয়ে পড়ে যায়...। (সূরা আল-হজ্জ, ৩৬)

আরবিতে বলা হয় :

رجبة الحائط

দেয়ালটা পড়ে গেল।

আবু যাইদ আদ-দাব্বুসি বলছেন, যা কিছু দৃঢ়, যা কিছু পক্ষ দৃঢ়, অকাটা প্রমাণ আছে, আমরা সেটাকে ফরয ধরে নেব। আর অন্যান্য দায়িত্ব বা কাজ, যেগুলো বাধ্যতামূলক, কিন্তু সেগুলোর বাধ্যতামূলক হবার প্রমাণ তুলনামূলকভাবে কম শক্তিশালী, আমরা সেগুলোকে ওয়াজিব হিসাবে গ্রহণ করব। তাঁরা এ পার্থক্যটুকু করেছেন কারণ সুকূত অর্থ—ফেলে দেওয়া, পতিত হওয়া। এ কারণে তারা এটাকে আলাদা একটি ক্যাটাগরি ধরেছেন। তো এভাবে তারা ফরয ও ওয়াজিবের মধ্যে পার্থক্য করেছেন।

সুতরাং আমরা দেখলান, হানাফি মাযহাবের অনুসারীদের মতে ফরয ও ওয়াজিব দুটো আলাদা ক্যাটাগরি। তবে কোনগুলো ফরয আর কোনগুলো ওয়াজিব—এই শ্রেণিবিভাগ কীভাবে করা হবে—এই ব্যাপারে আবার তাদের মধ্যে কিছু মতপার্থক্য আছে।

হানাফিদের মধ্যে এক দল বলেছেন কাত'ঈ (نطعى) দলিলের মাধ্যমে যা সাব্যস্ত বা প্রমাণিত সেটা ফরয। কাত'ঈ হলো এমন দলিল যা অভ্যস্ত শব্দ, সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট—যেমন কুরআনের কোনো আয়াত বা কোনো সহিহ দ্ব্যুতওয়ারতির হাদিস যার অর্থ পরিষ্কার। যদি কোনো নির্দেশ এ ধরনের দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয়, তাহলে সেটা ফরয। কিন্তু যদি কোনো বাধ্যতামূলক কাজের ক্ষেত্রে প্রমাণ কাত'ঈ না হয় বা এতটা শক্ত না হয়, তবে সেটাকে আবশ্যক মনে করা হবে তবে ফরয না, ওয়াজিব ধরা হবে। সুতরাং যেগুলো যদি দলিলের দ্বারা সাব্যস্ত সেগুলো হলো ওয়াজিব। এখানে যদি অর্থ এমন হাদিস যা সহিহ কিন্তু একাধিক বর্ণনাসূত্র দ্বারা সাব্যস্ত বা দ্ব্যুতওয়ারতির না।

সুস্পষ্ট বা কাত'ঈ দলিল দ্বারা সাব্যস্ত নির্দেশের একটি উদাহরণ হলো এই আয়াত :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

‘তোমরা সালাত কায়েম করো।’ (সূরা বাকারাহ, ৪৩)

এই আয়াতের ব্যাপারে কোনো মতপার্থক্য নেই। এটি একটি স্পষ্ট নির্দেশ যার অর্থ পরিষ্কার। একই সাথে এটি কুরআনের একটি আয়াত তাই এখানে সনদ নিয়ে মতপার্থক্যের অবকাশ নেই। সুতরাং সালাত আদায় করা হলো ফরয। কিন্তু যারা ওয়াজিব ও ফরযের মধ্যে পার্থক্য

করেন তাদের মতে সালাতের প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব, ফরয না। কারণ, নামাযের প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা পরার দলিল হলো এই হাদিসটি :

لا صلا : إلا ب فاتحة الكتاب

ফাতিহা ছাড়া কোনো সালাত নেই।

তাদের মতে যদিও এ হাদিসটি সহিহ কিন্তু প্রমাণ হিসেবে এটি যম্মি। অর্থাৎ এটা সালাত ফরয হবার দলিলের মতো অতটা শক্ত দলিল না। তাই নামাযের প্রতি রাকাতে ফাতিহা পড়া হলো ওয়াজিব, ফরয না।

আবার হানাফিদের মধ্যে দ্বিতীয় একটি দলের (আল-আস্কারি) মত হলো—যা আল্লাহ ﷻ-এর পক্ষ থেকে তা হলো ফরয। আর ওয়াজিব হলো যা আল্লাহ ﷻ-এর পক্ষ থেকে এবং নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর পক্ষ থেকে। এ ছাড়া যেসব বিষয়ের দলিল নিয়ে মতপার্থক্য আছে এবং যেসব বিষয় নিয়ে অর্থাৎ কুরআনে বর্ণিত অর্থ নিয়ে (কুরআনের আয়াতের অর্থ নিয়ে) মতপার্থক্য আছে—সেগুলো হলো ওয়াজিব। আর যদি দলিল শক্ত হয়, অর্থ সুস্পষ্ট হয়, তাহলে সেটা ফরয।

তৃতীয় আরেকটি মত হলো আল্লাহ ﷻ-এর পক্ষ থেকে আসা যেকোনো সরাসরি নির্দেশ হলো ফরয, আর রাসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে যেকোনো সরাসরি নির্দেশ হলো ওয়াজিব। দুটোই পালন করা বাধ্যতামূলক, তবে একটি আল্লাহ ﷻ-এর পক্ষ থেকে আরেকটি রাসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে। আল-ইশ্রা'ঈনি-যিনি হানাফি আলিমদের একজন—বলেছেন, ফরয হলো এমন কিছু যার ফরয হবার ব্যাপারে ইজমা আছে, কোনো মতপার্থক্য নেই। আর ওয়াজিব হলো এমন কিছু যার ফরয হবার ব্যাপারে মতপার্থক্য আছে।

সুতরাং কোনটা ফরয আর কোনটা ওয়াজিব এ নিয়ে আহনাফের মধ্যেও মতপার্থক্য আছে।

এ মতপার্থক্যের ফল কী?

এ মতপার্থক্যের ফল হলো, হানাফিদের মতে যে ব্যক্তি কোনো ফরযকে অস্বীকার করে সে কুফর করেছে। সে এমন কিছু অস্বীকার করেছে যা সন্দেহাতীতভাবে সত্য হিসেবে প্রমাণিত। কিন্তু যে কোনো ওয়াজিব অস্বীকার করে সে কুফর করেনি, কারণ ওয়াজিবের দলিল ফরযের মতো অতটা শক্ত না। কাজেই যে হজের সময় আরাফার ময়দানে অবস্থান অথবা মহিলাদের জন্য হিজাব করার বিধান অস্বীকার করবে সে কুফর করেছে। কারণ, এগুলো হলো ফরয। অন্যদিকে যেহেতু তাদের মতে বিতরের নামায বা হজের সময় সাফা-মারওয়ার মধ্যে সা'ই করা বা দৌড়ানো হলো ওয়াজিব, তাই কেউ যদি এগুলোকে অস্বীকার করে তাহলে সেটা কুফর হিসেবে গণ্য হবে না। যেহেতু এগুলোর আবশ্যিক হবার ব্যাপারে

প্রমাণ ফরযের মতো অতটা শক্ত না। অর্থাৎ তাদের মতানুযায়ী ওয়াজিব অস্বীকার করা কুফর না।^[১০] আর কেউ যদি ওয়াজিব কাজ ছেড়ে দেয় কিন্তু সেটার ওয়াজিব হওয়াকে স্বীকার করে, তবে সেটা হলো ফিসক।

সুতরাং হানাফিদের মত হলো ওয়াজিব অস্বীকার করা কুফর না, তবে ফরয অস্বীকার করা কুফর। কারণ, ফরয সন্দেহাভীতভাবে প্রমাণিত। ওয়াজিব যদিও বাধ্যতামূলক কিন্তু ওয়াজিবের প্রমাণ ফরযের তুলনায় অপেক্ষাকৃতভাবে কম শক্তিশালী। এটা হলো ওয়াজিব ও ফরয বিষয়ে মতপার্থক্যের প্রথম ফলাফল।

দ্বিতীয় ফল হলো, হানাফিদের মতে ওয়াজিবের তুলনায় ফরয পালন করার পুরস্কার বেশি, যেহেতু ফরয ওয়াজিবের চেয়ে উচ্চতর পর্যায়ের।

তৃতীয় ফলাফলটা উদাহরণ দিয়ে বোঝা সহজ হবে। অধিকাংশ আলিমের-অর্থাৎ যারা প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত-তাদের মত হলো সুজ্জদুত তিলাওয়াহ, অর্থাৎ তিলাওয়াতের সময় সিজদাহর কোনো আয়াত এলে সিজদাহ করা হলো সুন্নাহ। ওয়াজিব বা ফরয না। কারণ, এক জুমুআয় উমার ইবনুল খাত্তাব রাঃ মিস্বারে দাঁড়িয়ে সূরা আন-নাহল পড়ছিলেন। যখন সূরা আন-নাহলের সিজদাহর আয়াতে পৌঁছালেন তিনি মিস্বার থেকে নেমে সিজদাহ করলেন। পরের জুমুআয়, তিনি সূরা আস-সাজদাহ পড়লেন। সূরা আস-সাজদাহতেও একটি সিজদাহর আয়াত আছে। যখন সেই সিজদাহর আয়াতে পৌঁছালেন তিনি বললেন, হে লোকসকল, আমরা সিজদার আয়াতসমূহ অতিক্রম করি, এ সময় যে সিজদাহ করে সে ঠিক, আর যে সিজদাহ করে না সেও ঠিক। আর তারপর উমার ইবনুল খাত্তাব রাঃ সিজদাহ করলেন না। তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ ইবনু উমার রাঃ এ বর্ণনার পর একটি মন্তব্য যোগ করেছেন-আম্নাহ রাঃ তোমাদের ওপর তিলাওয়াতের সিজদাহ ফরয করেননি।

কোনো কিছু যদি ফরয না হয়, তাহলে সেটা কী? অধিকাংশ আলিমের মতে যদি কোনো কিছু ফরয না হয়, অর্থাৎ বাধ্যতামূলক না হয়, তাহলে সেটা সুন্নাহ। যেহেতু তাদের মতে ফরয আর ওয়াজিব একই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে হানাফিদের মত হলো, যেহেতু সেটা ফরয না তাই সেটা ওয়াজিব গণ্য হবে। যেহেতু তাঁরা ফরয আর ওয়াজিবকে দুটো আলাদা শ্রেণি বিবেচনা করেন। ফরযের পরে আসে ওয়াজিব আর তারপর আসে সুন্নাহ। তারা এটাকে তাদের দ্বিতীয়

১০ 'ওয়াজিব অস্বীকার কুফর না' - এটা দ্বারা এটা উদ্দেশ্য না যে, ওয়াজিব বিধান অস্বীকার করা কুফর না। বরং এর দ্বারা আহনাফের উদ্দেশ্য হয়, ওয়াজিবের উজ্জ্বল বা আবশ্যিকতা অস্বীকার করা কুফর না। যেমন কুরবানির বিধান আহনাফের নিকট ওয়াজিব, কিন্তু হানাফিদের নিকট সুন্নাহ। হানাফিরা এর উজ্জ্বলতা তথা ওয়াজিব হবার বিষয়টি অস্বীকার করেন, কিন্তু বিধানটি অস্বীকার করেন না। তাঁরা একে সুন্নাহ গণ্য করেন। কিন্তু কেউ যদি সন্ধাগতভাবে ওই বিধানটিকেই অস্বীকার করে, তাহলে অবশ্যই তা কুফর বলে গণ্য হবে। কারণ আহনাফসহ আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত সমস্ত ইমামগণের সর্বসম্মত মত হল, যক্ষরিয়াতুম মিনাদ ধীন তথা ধীনের অভাবশাকীয কোন বিধান অস্বীকার করা কুফর। সেটা হতে পারে ফরয, হতে পারে ওয়াজিব, অথবা হতে পারে কোন প্রমাণিত সুন্নাহ। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে আনওয়ার শাহ কান্দাহরী রাঃ এর 'ইকফালুল মুল্লহিন' গ্রন্থটি অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

শ্রেণিতে স্থান দিয়েছেন—অর্থাৎ ওয়াজিব গণ্য করেছেন। আর জুমহুর উলামা এটাকে তাদের দ্বিতীয় শ্রেণিতে স্থান দিলেও তাঁদের জুমহুর উলামার মত হলো ফরযের পর দ্বিতীয় শ্রেণি হলো সুন্নাহ। সুতরাং হানাফি মাযহাবের অনুসারীদের মত অনুযায়ী তিলাওয়াতের সিজদাহ হলো ওয়াজিব, আর জুমহুর উলামার মত হলো এটা সুন্নাহ। অর্থাৎ ফরয ও ওয়াজিবকে দুটো পৃথক শ্রেণি গণ্য করার কারণে পার্থক্য হচ্ছে শ্রেণিবিভাগের ক্ষেত্রে। প্রথম দল যেহেতু ফরয ও ওয়াজিবকে একই মনে করেন তাই তারা বলেন, ইবনু উমার রাঃ বলেছেন এটা ফরয না, তার অর্থ এটা ওয়াজিবও না; কারণ এ দুটো একই। তাই তিলাওয়াতের সিজদাহ হলো সুন্নাহ। আর হানাফিরা মনে করেন এটা ফরয না, তবে সুন্নাহও না; বরং ওয়াজিব।

কুরবানির ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই রকম। হানাফি আলিমগণের মত হলো কুরবানি করা ওয়াজিব, আর অন্যান্য ইমামগণের মত হলো কুরবানি করা সুন্নাহ। একইভাবে হানাফি আলিমগণের মতে ইশা ও ফজরের মধ্যবর্তী সময়ে বিতরের নামায পড়া ওয়াজিব। তাদের মতে বিতরের নামায না পড়া গুনাহর কাজ এবং যে বিতরের নামায পড়ে না সে ফাসিক হিসাবে গণ্য হবে। জুমহুরের মত হলো বিতরের নামায হলো সুন্নাহ।

এই পুরো মতপার্থক্যের উপসংহার অত্যন্ত সোজা এবং পরিষ্কার। যদি এক লাইনে উত্তর চান, তাহলে এ ব্যাপারে অধিকতর উপযুক্ত মত হলো—ফরয আর ওয়াজিব এক ও অভিন্ন। অধিকাংশ আলিম এ মতটি গ্রহণ করেছেন এবং এ ক্ষেত্রে তারা নস-ভিত্তিক প্রমাণ—যেমন হাদিস—উপস্থাপন করেছেন। অন্যদিকে যারা এ দুটো পৃথক হবার মত গ্রহণ করেছেন তারা ভাষাতাত্ত্বিক সংজ্ঞার আলোকে এ অবস্থান নিয়েছেন। এ দু-ধরনের প্রমাণের মধ্যে তুলনা করলে প্রথম মতের পক্ষে পাল্লা ভারী হবে। দ্বিতীয়ত, প্রথম মত অধিকতর সঠিক কারণ ফরয ও ওয়াজিব এই অর্থে এক যে, এগুলো করা বাধ্যতামূলক এবং উপযুক্ত ওয়র ছাড়া এগুলো ছেড়ে দেয়া গুনাহ। সুতরাং সংজ্ঞার দিক থেকে দুটো প্রায় একই, যার কারণে প্রথম অবস্থানকে অধিকতর শক্ত মনে হয়।

ইসলামি জ্ঞানের শাখাগুলো পরস্পর সংযুক্ত :

লক্ষ করুন, তাওহিদ নিয়ে শেখার সময় আমরা তাওহিদের পাশাপাশি এ রকম বিষয় নিয়েও শিখছি। এই আলোচনাগুলো তাওহিদের বইগুলোতে নেই, উসুলুল ফিকহের বইয়ে আছে। কারণ, এগুলো হলো উসুলের আলোচনা। কিন্তু আমরা এ আলোচনা আনছি যাতে করে লেখক (مُؤَلِّف) বলে কী বুঝিয়েছেন সেটা আমরা বুঝতে পারি। ইয়াজিব বলতে লেখক কি ফরয বুঝিয়েছেন, নাকি আবু হানিফা রাঃ যেমনটা বলেছেন সে রকম ফরযের চেয়ে একটু নিচের একটি শ্রেণি বুঝিয়েছেন? এ প্রশ্নগুলোর উত্তর পাবার জন্য এবং লেখক এখানে কী বোঝাচ্ছেন তা বোঝার জন্য আমরা উসুলের সাহায্য নিচ্ছি। অর্থাৎ তাওহিদ ও আকিদাহর বিষয়কে বোঝার জন্য আমাদের উসুলের সাহায্য নিতে হচ্ছে। একইভাবে কখনো কখনো

আমরু হাদিস নিয়ে আলোচনা করব। এমন অনেক হাদিস আছে যেগুলো ব্যাপকভাবে পরিচিত কিন্তু কিছু কিছু আলিম সেগুলোকে যইফ মনে করেন। সামনের আলোচনাগুলোতে যখন এমন কোনো হাদিস আসবে তখন আমরা ওই হাদিসটি কেন যইফ বা কেন সহিহ, সেটা নিয়েও আলোচনা করব। এটাকে বলা হয় মুস্তালাহ (مصطلح)। যদিও আমাদের মূল আলোচনা তাওহিদ নিয়ে, কিন্তু আমরা এখানে মুস্তালাহ এবং হাদিস নিয়েও আলোচনা করব। আর তারপর আমাদের আলোচনার বড় একটা অংশজুড়ে থাকবে তাফসির। এ ছাড়া অন্যান্য আরও বিষয়ও আমাদের আলোচনায় আসবে।

কখনো কখনো নাম্বর পরিভাষাগুলো ভেঙে ভেঙে আলোচনা করতে হয়। যেমনটা প্রথমদিকে আমরা ‘আর-রাহমান’ ও ‘আর-রাহীম’ নিয়ে করেছি। তাই যদিও আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো তাওহিদ, কিন্তু ইসলামে ইলমের শাখাগুলো পরস্পর সংযুক্ত। আর এটা হলো ইসলামি জ্ঞানের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য।

লেখক ওয়াজিব বলতে কী বুঝিয়েছেন?

ওয়াজিব ও ফরযের বিষয়টি আমরা কেন আনলাম? কারণ, এখানে লেখক বলছেন— ইয়াজিবু—আপনাকে অবশ্যই চারটি বিষয় জানতে হবে। আমরা জানি ইমাম আবু হানিফা রহিমুল্লাহ ওয়াজিবকে ফরযের চেয়ে কিছুটা নিচের ক্যাটাগরি ধরেছেন—এখানে লেখকও কি এই অর্থে ওয়াজিব বলেছেন? না, এখানে তিনি ওয়াজিব বলতে ফরয বুঝিয়েছেন। এখানে ইয়াজিব শব্দটির বদলে ইয়াক্বাদু (يفرض) বসালেও একই অর্থ হবে। এখানে তিনি অন্য তিন ইমামের মত অনুযায়ী ওয়াজিব বলতে ফরযকেই বোঝিয়েছেন। তিনি বলছেন, আমাদের জন্য এ ৪টি বিষয় সম্পর্কে জানা বাধ্যতামূলক। এগুলো জানা ফরয। নারী, পুরুষ, দাস, মুক্ত—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহয় বিশ্বাসী প্রত্যেক মুসলিমকে ৪টি বিষয় সম্পর্কে জানতেই হবে। এ বিষয়গুলো সম্পূর্ণ ও গভীরভাবে অনুধাবন করা, আত্মস্থ করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরয।

আল্লাহ স্ব-এর সাথে সম্পর্কিত জ্ঞান :

আল্লাহ স্ব-এর ব্যাপারে জ্ঞানের তিনটি ধরন আছে :

১. ই'তিকাদ
২. ফি'ইল এবং
৩. তারকা^{৫১}

৫১ এটি একটি পরিভাষাগত ব্যাপার। এখানে ই'তিকাদ দ্বারা বোঝানো হচ্ছে বিশুদ্ধ আকিদাহ, ফি'ইল দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহ স্ব-এর আদেশসমূহ সুমোহসনাত উপায়ে আমল করা এবং তারক দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ স্ব-এর নিষেধকৃত বিষয়সমূহ বর্জন করা।

আল্লাহ ﷻ-এর ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ যেসব বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন তা হলো বিশ্বাস, কাজ এবং ত্যাগ করা। কিছু বিষয় আছে যেগুলোর ওপর আপনার বিশ্বাস আনতে হবে। কিছু বিষয় আছে যেগুলোর ওপর আপনার অমল করতে হবে। আর কিছু বিষয় এমন আছে যেগুলো ত্যাগ করতে হবে, যেগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে। আল্লাহ ﷻ-এর ব্যাপারে আপনার জ্ঞান হয় 'ইলম আইনি' (অর্থাৎ ফারযুল আইন) অথবা ইলম কিফায়ী। অর্থাৎ এ তিন ধরনের জ্ঞান অনুযায়ী আল্লাহ ﷻ-এর প্রতি আপনার আচরণ হয় ফারযুল আইন হবে অথবা ফারযুল কিফায়াহ হবে।

ফারযুল আইন :

ফারযুল আইন হলো এমন কিছু যা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায, রমযান মাসের রোযা—এগুলো ফারযুল আইন। প্রত্যেক মুসলিমকে এগুলো পালন করতেই হবে।

ফারযুল কিফায়াহ :

ফরযের অন্য শ্রেণিটি অন্যটি হলো ফারযুল কিফায়াহ বা সামষ্টিক দায়িত্ব। এটি হলো এমন ফরয, যা যথেষ্ট-সংখ্যক মানুষ পালন করলে বাকিদের ওপর আর তা পালন করার বাধ্যবাধকতা থাকে না। এ দায়িত্বগুলো পালন করা সামষ্টিকভাবে মুসলিমদের জন্য বাধ্যতামূলক, কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বাধ্যতামূলক না। অর্থাৎ ফারযুল কিফায়াহ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ফরয না, বরং সামগ্রিকভাবে মুসলিম উম্মাহর ওপর ফরয। যেমন : মৃত ব্যক্তিকে কবর দেয়া। অথবা ধরুন কোনো সমুদ্রের পাড়ে আমরা ১০ জন দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় আমরা দেখতে পেলাম একজন মানুষ পানিতে ডুবে যাচ্ছে। আমাদের সামর্থ্য আছে তাকে বাঁচানোর। এ অবস্থায় মানুষটিকে উদ্ধার করা আমাদের সবার ওপর দায়িত্ব, কিন্তু যদি আমাদের মধ্যে থেকে দুজন গিয়ে তাকে উদ্ধার করে, তাহলে সেটাই যথেষ্ট। এতেই সবার পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালিত হয়ে যাবে। তবে ওই দুজন সক্ষম ব্যক্তি তাকে উদ্ধার করতে না গেলে আমাদের দশজনেরই গুনাহ হবে। এটা হলো ফারযুল কিফায়াহ। এটা আলাদা আলাদাভাবে আবদুল্লাহ, উমার, মুহাম্মাদ কিংবা অন্য কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে চাওয়া হচ্ছে না। বরং চাওয়া হচ্ছে যে সামগ্রিকভাবে কাজটা পালন করতে হবে। অন্যদিকে ফারযুল আইন পালন করা প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব। যদি একদল মুসলিম আসরের নামায আদায় করে, তাহলে বাকি মুসলিমরা কিন্তু আসরের নামায পড়ার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাচ্ছে না। প্রত্যেক মুসলিমকেই আসরের নামায পড়তে হবে।

সামষ্টিক কর্তব্য বা ফারযুল কিফায়াহর ক্ষেত্রে কিছু লোক পালন করলে বাকি সবার জন্য যথেষ্ট হবে। অন্যদিকে যদি কেউই কর্তব্য পালন না করে তবে সকলেই গুনাহগার হবে। ফারযুল

কিফায়াহর ক্ষেত্রে দায়িত্বগুলো সম্পূর্ণভাবে পালন করতে হবে। নিজ অক্ষমতার কারণে কেউ দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করতে না পারলে, তার এবং আমাদের দায়িত্ব হবে অন্যান্যদের এ কাজের জন্য উদ্বুদ্ধ করা। যাতে করে আমাদের সবার গুনাহর ভাগীদার হতে না হয়। একটু আগের উদাহরণটির কথা চিন্তা করুন। সমুদ্রপাড়ে আমরা দশজন আছি। একজন মানুষ ডুবে যাচ্ছে। ধরুন আমরা কেউই সাঁতার পারি না। আমরা তাকে উদ্ধার করতে পারছি না। এ অবস্থায় আমাদের দায়িত্ব হবে সাঁতার পারে এমন কাউকে খুঁজে বের করা এবং তাকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করা, যাতে আমরা সবাইকে গুনাহ থেকে রক্ষা করতে পারি।

ইলম, আমল, বিরত থাকা ও বিশ্বাসের ব্যাপারে ফারযুল আইন :

আল্লাহ ﷻ-এর সাথে সম্পর্কিত জ্ঞানের ব্যাপারে ফারযুল আইন

এখন দেখা যাক ইলমের ক্ষেত্রে কোনগুলো ফারযুল আইন। ইলমের ক্ষেত্রে ফারযুল আইন হলো ওই জ্ঞান যা ছাড়া দীন সম্পূর্ণ হয় না এবং দীন পালন করা যায় না। যে জ্ঞান ছাড়া দীন পূর্ণ হয় না এবং দীন পালন করা যায় না, সেই জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরয। এটা হতে পারে আকিদাহ, আমল অথবা কোনো কথার ব্যাপারে জ্ঞান। যে জ্ঞান না থাকলে দ্বীনের আবশ্যিক বিষয়ে, আপনায় বিশ্বাস, আমল কিংবা কথা অসম্পূর্ণ থাকবে—সেই জ্ঞান অর্জন করা বাধ্যতামূলক, ফারযুল আইন। ব্যক্তিগতভাবে এ জ্ঞান খুঁজে বের করতে ও শিখতে আপনি বাধ্য। এখানে লেখক বলেছেন : **يُجِبُ عَلَيْنَا** তার এ বক্তব্যের অর্থ হলো, আপনাকে করতেই হবে, জানতেই হবে। এটা ফারযুল আইন।

প্রত্যেক ব্যক্তিকে অবশ্যই এ ব্যাপারগুলো জানতে হবে। এখানে কোনো ছাড় নেই। এগুলো জানা প্রত্যেকের ওপর ফারযুল আইন। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়—কিছু জ্ঞান এমন আছে ব্যক্তিভেদে যেগুলো সম্পর্কে জানার আবশ্যিকতার তারতম্য হয়। অর্থাৎ এগুলো জানা কিছু মানুষের জন্য আবশ্যিক, আবার কিছু মানুষের জন্য আবশ্যিক না। কারণ, মানুষের মধ্যেও তারতম্য আছে। তবে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ জ্ঞান অর্জন করা, কিছু নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে জানা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক। এগুলোর বাইরে আরও অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞান আছে যেগুলোর ব্যাপারে পার্থক্য আছে। ইবনু আব্দিল বার **رحمته** তাঁর **জামি'য়ু বায়া'নিল ইলম** কিতাবে এবং ইবনু কুদামা **رحمته** ও অন্যান্য আলিমগণ এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

আমি এটা নিয়ে আরেকটু বিস্তারিত আলোচনা করছি, যাতে করে আপনাদের জন্য বোঝা সহজ হয়। আলিমগণ বলেছেন, এ ব্যাপারে ইজমা আছে যে কিছু জ্ঞান অর্জন করা ফারযুল আইন আর কিছু জ্ঞান হলো ফারযুল কিফায়াহ। অর্থাৎ জ্ঞান দু-ধরনের। সব জ্ঞান অর্জন ফারযুল আইন না আর সব জ্ঞান ফারযুল কিফায়াহ না, এই ব্যাপারে ইজমা আছে।

পবিত্রতা অর্জন, ওযু, তাহায়াহ এবং নামায—আপনাকে অবশ্যই এ আমলগুলো সম্পর্কে

জ্ঞান রাখতে হবে। যদি রমাদ্বান পর্যন্ত আপনার হায়াত থাকে, যদি আপনি রমাদ্বান মাসে বেঁচে থাকেন তবে আপনাকে অবশ্যই রমাদ্বান সম্পর্কে, রোযা ভঙ্গের কারণ সম্পর্কে, ফজরের আগ থেকে মাগরিব পর্যন্ত কী কী করতে হবে—এগুলো জানতে হবে। এগুলো জানা আপনার জন্য বাধ্যতামূলক। একইভাবে একজন নারীর জন্য মাসিক চক্রের (menstrual cycle) সাথে সম্পর্কিত শারীয়াহর নিয়মগুলো জানা ফারযুল আইন, কারণ এর ওপর তার নামায ও রোযা কবুল হবার বিষয়টি নির্ভর করে। কখন নামায পড়তে পারবেন, কখন পারবেন না, কীভাবে পবিত্রতা অর্জিত হয়—এগুলো একজন নারীকে জানতে হবে। আবার একজন পুরুষের জন্য মাসিক চক্র সম্পর্কিত নিয়মকানুন, আহকাম জানা আবশ্যিক না। তবে যদি তার স্ত্রীর এ ব্যাপারে জানার আর কোনো উপায় না থাকে, তিনিই তার স্ত্রীর জানার একমাত্র মাধ্যম হন, সে ক্ষেত্রে এ বিষয়ে জানা সেই পুরুষের ওপর আবশ্যিক। যেহেতু তিনি তার স্ত্রীর অভিভাবক। এমন ক্ষেত্রে হয় তিনি নিজে জেনে তার স্ত্রীকে জানাবেন অথবা তার স্ত্রীকে ইলমসম্পন্ন এমন কারও কাছে নিয়ে যাবেন যিনি তার স্ত্রীকে বিষয়গুলো জানাতে পারবেন। সাধারণত একজন পুরুষের এ বিষয়গুলো জানার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এমন ক্ষেত্রে ওই পুরুষকে এসব বিষয়ে জানতে হবে। তার জন্য ফারযুল আইন হলো, সে নিজে এটা জেনে তাদের জানাবে অথবা তাদের এমন কোথাও নিয়ে যাবে যেখানে তারা এটা জানতে পারবে। অথবা সে তাদের এ বিষয়ে জানার উদ্দেশ্যে কোথাও যাবার অনুমতি দেবে। বুঝতে পারছেন কীভাবে আবশ্যিকতার ক্ষেত্রে পার্থক্য হয়?

একইভাবে যদি আপনার সম্পদ থাকে, তাহলে আপনার যাকাতের হুকুম-আহকাম জানতে হবে। যদি আপনার সম্পদ না থাকে, তাহলে যাকাত সম্পর্কে জানা আপনার জন্য আবশ্যিক না। হ্যাঁ, আপনি যদি জেনে রাখেন তাহলে সেটা উত্তম। কিন্তু আমরা এখানে আলোচনা করছি কোনটা ফারযুল আইন, সেটা নিয়ে। যদি সক্ষমতা ও সামর্থ্য থাকে, তাহলে আপনাকে হজ সম্পর্কে জানতে হবে। যদি আপনার সক্ষমতা না থাকে, তাহলে কতটুকু সম্পদ ও শারীরিক সক্ষমতা না থাকলে হজ ফরয না, শুধু এটুকু জানলেই আপনার চলছে।

বিরত থাকার ক্ষেত্রে ফারযুল আইন

একইভাবে কোন কোন বিষয় পরিত্যাগ করা আবশ্যিক, এ সম্পর্কিত জ্ঞানের ক্ষেত্রেও ফারযুল আইন আছে। একজন অন্ধ ব্যক্তির এটা জানার দরকার নেই যে কোন কোন জিনিসের দিকে তাকানো হারাম। কী কী শোনা হারাম, সেটা একজন বধির ব্যক্তির জানার দরকার নেই। কিন্তু আপনি-আমি, যাদের দৃষ্টিশক্তি আছে, শ্রবণশক্তি আছে, তাদের জন্য ব্যাপারটা আলাদা। যেহেতু আমাদের শ্রবণশক্তি আছে, তাই কী শোনা হারাম সেটা আমাদের জানতে হবে। কী কী শোনা হারাম সেটা জানা প্রত্যেক শ্রবণশক্তিসম্পন্ন মুসলিমের জন্য ফারযুল আইন। যিনা হারাম, এটা জানা প্রত্যেকে মুসলিমের ওপর ফারযুল আইন। সুদ, মদ, শূকরের গোশত, যুলুম—এগুলো হারাম এটা জানা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফারযুল আইন। আরেকজন

মুসলিমকে হত্যা করা কিংবা অজাচার হারাম এটা জানা প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফারযুল আইন। প্রতিটি মুসলিমের এ বিষয়গুলোতে পতিত হবার আশঙ্কা আছে, তাই এগুলো সম্পর্কে জানা ফারযুল আইন। যাতে করে তারা এগুলো এড়িয়ে যেতে পারে।

বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ফারযুল আইন

কোন বিষয়গুলোতে বিশ্বাস করা ফারযুল আইন তার সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হলো, আমরা এখানে যা যা নিয়ে আলোচনা করছি। এ চারটি বিষয় নিয়ে জানা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফারযুল আইন। ঈমানের বিষয়গুলো, আল্লাহ, ফেরেশতাগণ, আসমানি কিতাব, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, জাহ্নাত ও জাহান্নাম—এ বিষয়গুলোর ওপর সবাইকে ঈমান আনতে হবে। বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতেই হবে। আপনি বাধ্য এগুলো জানতে। যদি কোনো ব্যক্তির মধ্যে ইসলামের কোনো বিষয় নিয়ে সন্দেহ থাকে, তাহলে তাকে ইসলামের ওই বিষয়গুলো জানতে হবে যেগুলো সন্দেহ দূর করে। কারণ, ইসলামে বিশ্বাসের একটি অংশ হলো কোনো সন্দেহ ছাড়াই ইসলামের ওপর বিশ্বাস আনা। যদি কেউ এমন কোনো দেশে থাকে যেখানে ব্যাপকভাবে বড় ধরনের বিদআহ প্রচলিত, তাহলে সেই বিদআহর ব্যাপারে তাকে অবশ্যই জানতে হবে। যাতে করে সে ওই বিদআহ এড়িয়ে চলতে পারে এবং নিজেকে এ থেকে রক্ষা করতে পারে।

সুতরাং জানার ব্যাপারে ফারযুল আইন হলো ওই পরিমাণ জ্ঞান অর্জন করা যা ছাড়া ব্যক্তির ঈমান, ইবাদত, আমল এবং কথা সঠিক ও শারীয়াহ-সম্মত হবে না। যদি এমন কোনো বিষয় আপনার জানা না থাকে, তাহলে সেটা জানা আপনার জন্য ফারযুল আইন।

চারটি আবশ্যিক বিষয়

লেখক বলছেন,

أربع مسائل

এমন চারটি বিষয় আছে যেগুলো জানা আপনার জন্য ফরয। ফরয বলতে এখানে তিনি ফারযুল আইন বোঝাচ্ছেন। এ বিষয়গুলোর আলোচনা দিয়ে লেখক তার পুস্তিকা শুরু করেছেন। এ চারটি বিষয় হলো আপনার সম্পূর্ণ দ্বীন। আর এগুলোর অসাধারণ উপকারিতার কারণেই এগুলোর সম্পর্কে গভীর মনোযোগ দেয়া উচিত।

লেখক তার পুস্তিকাতে প্রথমে এ চারটি বুনিয়াদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। তারপর তিনটি মূলনীতির ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। এখন আমরা এ চারটি বুনিয়াদি বিষয়ের আলোচনা করব।

এ চারটি বিষয়ের প্রথম হলো ইলম। আর এ ইলমের তিনটি অংশ আছে। লেখক বলছেন,

مَعْرِفَةُ اللَّهِ وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ بِالْأَدِلَّةِ

দলিল-প্রমাণসহকারে আল্লাহ ﷻ-এর পরিচয় লাভ করা, তাঁর নবির পরিচয় লাভ করা এবং দ্বীনুল ইসলামের পরিচয় লাভ করা।

সুতরাং এখানে বেশ কিছু বিষয়ের আলোচনা আছে। মনোযোগ না দিলে এখানে খেঁই হারিয়ে ফেলার একটা সম্ভাবনা থাকে। এ জন্য সবচেয়ে ভালো হয় যদি আপনারা মূল পুস্তিকা একবার পড়ে নেন। তাহলে লেখক কীভাবে বিভিন্নভাবে বইকে সাজিয়েছেন তা নিয়ে একটা ধারণা পাবেন। আপনি এটাও বুঝতে পারবেন যে, লেখক কিছু কিছু কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন। এ কারণে কিছু বিষয়ের ব্যাপারে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব আর অন্যান্য কিছু ক্ষেত্রে আমরা বিস্তারিত আলোচনায় যাব না। কোনো বই ব্যাখ্যা করার সময় বা কোনো বই পড়ে লেখকের বক্তব্য বোঝার জন্য লেখকের তৈরি করা কাঠামো ও বিন্যাস অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা ভালো, এতে করে সম্পূর্ণ ফায়দা নেয়া সম্ভব হয়।

চারটি বুনিয়াদি বিষয়ের মধ্যে তিনি প্রথমে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলছেন তা হলো ইলম। তারপর তিনি উল্লেখ করেছেন যে এই ইলম হলো আল্লাহ ﷻ-এর ব্যাপারে জ্ঞান, নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ব্যাপারে জ্ঞান এবং দ্বীনের ব্যাপারে জ্ঞান। ইলমকে তিনি এ তিনটি অংশে সংজ্ঞায়িত করেছেন। আর উসুল আস-সালাসাহর মূল আলোচ্য বিষয়, অর্থাৎ তিনটি মূলনীতিও এ তিনটি বিষয় নিয়েই।

মাসআলার সংজ্ঞা :

লেখক বলছেন, এখানে চারটি বিষয় আছে। আরবিতে বললে, চারটি মাসআলা আছে। অর্থাৎ চারটি ইস্যু, চারটি বিষয়, চারটি জিনিস আছে। আরবিতে মাসআলার সংজ্ঞা হলো, এমন কিছু যার জন্য দলিল বা প্রমাণ খোঁজা হয়।

السَّأَلَةُ هِيَ مَا يَبْحَثُ عَنْ بَرَاهِنِهَا أَوْ دَلِيلِهَا

লেখক এখানে চারটি মাসায়িলের কথা বলেছেন। প্রথমটি হলো ইলম। দ্বিতীয়টি আমল। তৃতীয় মাসআলা হলো দাওয়াহ, চতুর্থটি হলো সবার। এই হলো ওই চারটি বুনিয়াদি বিষয় যেগুলোর ব্যাপারে লেখক বলছেন, এগুলো খোঁজা, অনুসরণ করা এবং যুক্তি-প্রমাণসহ এগুলোর ব্যাপারে জানা আবশ্যিক।

‘ইলম’ এর সংজ্ঞার আলোচনায় আমরা বলেছিলাম—জ্ঞান বা ইলম হলো কোনো কিছুর প্রকৃত বাস্তবতা সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জানা। এখানে লেখক জ্ঞানকে একটু অন্যভাবে সংজ্ঞায়িত

করেছেন। তিনি বলছেন, জ্ঞান হলো আল্লাহ ﷻ, তাঁর রাসূল ﷺ এবং তাঁর দ্বীনের ব্যাপারে জানা।

তাহলে আসুন এ বিষয়টি আলোচনা করা যাক।

প্রথম বুনিয়াদি বিষয়—ইলম :

আল্লাহ ﷻ-কে জানা

ইলমের প্রথম অংশ হলো আল্লাহ ﷻ-কে জানা। আল্লাহ ﷻ সম্পর্কে জানার অর্থ হলো সর্বশক্তিমান ও মহিমাষিত আল্লাহ ﷻ-এর ব্যাপারে জানা এবং তাঁর ব্যাপারে সচেতন হওয়া। এ জ্ঞান ও সচেতনার কারণেই ব্যক্তি আল্লাহ ﷻ-এর নির্দেশ মেনে নেয়। যা কিছু আপনাকে আল্লাহ ﷻ-এর প্রতি আত্মসমর্পণে, তাঁর নাযিলকৃত আইন, বিধিবিধান ও হুকুম মেনে নিতে এবং এগুলোর আনুগত্য করতে উদ্বুদ্ধ করে, বাধ্য করে—তা এই জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। এ হলো স্বীয় প্রতিপালকের ব্যাপারে জ্ঞান যা অর্জিত হয় আল্লাহ ﷻ-এর নিদর্শন ও কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে। এগুলোই এ জ্ঞানের উৎস। এ জ্ঞান অর্জিত হয় কুরআন, হাদিস এবং সৃষ্টিসমূহের মাঝে থাকা আল্লাহ ﷻ-এর নিদর্শনগুলো থেকে।

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

সুনিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য জমিনে অনেক নিদর্শন রয়েছে। আর (নিদর্শন আছে) তোমাদের মাঝেও, তবুও তোমরা কি অনুধাবন করবে না? (সূরা আয-যারিয়াত, ২০-২১)

আল্লাহ ﷻ বলছেন, ‘তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না?’

তো এগুলো হলো চিহ্ন ও নিদর্শন যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ-কে জানা যায়। আমরা এগুলো পাই কুরআনে, হাদিসে এবং আল্লাহ ﷻ-এর সৃষ্টিজগৎ থেকে।

মা'রিফাতুল্লাহ

আলিমদের মধ্যে কেউ কেউ এ জ্ঞানকে দুভাগে ভাগ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, মা'রিফাতুল্লাহ দু-ধরনের হয়ে থাকে। আল্লাহ ﷻ-এর ব্যাপারে জ্ঞান এবং তাঁর নির্ধারিত হালাল ও হারামের ব্যাপারে জ্ঞান।

আল্লাহ ﷻ-এর ব্যাপারে জানার অর্থ তাঁর গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে জানা। আল্লাহ ﷻ-কে জানার অর্থ আপনার ওপর আল্লাহ ﷻ-এর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়া। মা'রিফাতুল্লাহর অর্থ হলো এটা জানা যে সৃষ্টিজগতের ওপর আল্লাহ ﷻ-এর জ্ঞান সর্বোচ্চ,

সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁকে জানার অর্থ তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে অবহিত হওয়া। তাঁকে জানার অর্থ ওই ক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যার মাধ্যমে এ মহাবিশ্বের অস্তিত্ব বজায় থাকে। এ সবই আল্লাহকে জানার অংশ, মা'রিফাতুল্লাহর অংশ। আল্লাহ ﷻ-কে জানার অর্থ তাঁর পবিত্র নামসমূহ সম্পর্কে জানা, সেগুলো সম্পর্কে চিন্তা করা, সেগুলোর অর্থ অনুধাবন করা এবং সেগুলোর যা আবশ্যক করে তা মেনে চলা। যে জ্ঞান অন্তরে আল্লাহ ﷻ-এর ভয় সৃষ্টি করে তা হলো মা'রিফাতুল্লাহ। আল্লাহ ﷻ-এর সম্মান সম্পর্কে অবগত হওয়া, তাঁর প্রশংসা করা মা'রিফাতুল্লাহ।

লেখক এভাবেই মা'রিফাতুল্লাহকে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

মহান আলিম ও ইমাম, আশ-শা'বি رحمته الله-কে উদ্দেশ্য করে এক লোক বলেছিল,

أيها العالم

অর্থাৎ, হে আলিম। লোকটির বলার উদ্দেশ্য ছিল, হে শায়খ। কিন্তু তা না বলে সে বলেছিল 'হে আলিম'। তখন আশ-শা'বি رحمته الله বলেছিলেন, 'আল-আলিম হলো সে যে আল্লাহকে ভয় করে।' ^[১০১] ইলম হলো আল্লাহ ﷻ-এর ব্যাপারে জ্ঞান যা অন্তরে আল্লাহ ﷻ-এর ভয় সৃষ্টি করে। মা'রিফাতুল্লাহ যেমন অন্তরে আল্লাহ ﷻ-এর ভয় সৃষ্টি করে তেমনি সৃষ্টি করে আল্লাহ ﷻ-এর প্রতি ভালোবাসাও। অনেক মানুষ এ জ্ঞানের ব্যাপারে অনবহিত ও অমনোযোগী। অথচ এ জ্ঞানই দুনিয়াতে এবং আনিসরাতে ব্যক্তির জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। দুই জীবনেই এই জ্ঞানের ফলাফল উত্তম।

সালাফদের মধ্যে কেউ কেউ বলতেন :

ما عصى الله إلا جاهل

কেবল জাহিলরাই, মুর্খরাই আল্লাহ ﷻ-এর অবাধ্য হয়। ^[১০২]

এখানে তাঁরা কোন ধরনের মুর্খতার কথা বলছেন? তাঁরা কিন্তু হালাল ও হারামের ব্যাপারে অজ্ঞতার কথা বলছেন না। হুকুম-আহকাম, বিধিনিষেধের ব্যাপারে অজ্ঞতার কথা বলছেন না। এখানে তাঁরা মা'রিফাতুল্লাহর ব্যাপারে অজ্ঞতার কথা বলছেন। আল্লাহ ﷻ-এর ব্যাপারে, আল্লাহ ﷻ-এর নির্ধারিত পুরস্কার আর শাস্তির ব্যাপারে অজ্ঞতার ব্যাপারে বলছেন। ওই অজ্ঞতা যার কারণে আপনি আল্লাহ ﷻ-এর জমিনকে ব্যবহার করছেন পাপ করার জন্য। আল্লাহ ﷻ-এর দেয়া শক্তি আর ক্ষমতাকে পাপের জন্য কাজে লাগাচ্ছেন। সালাফরা যখন বলতেন কেবল মুর্খরাই পাপ করে-তখন তাঁরা এ ধরনের মুর্খতা ও অজ্ঞতাকে বোঝাতেন।

হালাল ও হারামের ব্যাপারে জ্ঞান

মা'রিফাতুল্লাহর অন্য অংশটি হলো হালাল ও হারামের ব্যাপারে জানা। আল্লাহকে জানার অর্থ হলো তাঁর নির্ধারিত হালাল ও হারাম সম্পর্কে জানা। মাজমু আল ফাতাওয়ার তৃতীয় খণ্ডে, ৩৩৩ পৃষ্ঠার পর থেকে ইবনু তাইমিয়াহ رحمہ اللہ এ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এ জ্ঞানের ব্যাপারে মানুষের মধ্যে চারটি শ্রেণি দেখা যায়।

প্রথম শ্রেণিতে হলো ওই ব্যক্তি যে আল্লাহ ﷻ-এর ব্যাপারে এবং তাঁর নির্ধারিত হারাম ও হালালের ব্যাপারে জ্ঞান রাখে, আর এটাই শ্রেষ্ঠ শ্রেণি। আমাদের সবার উচিত এ অবস্থানে পৌঁছার চেষ্টা করা। দ্বিতীয় হলো ওই ব্যক্তি যে আল্লাহ ﷻ-কে চেনে কিন্তু আল্লাহ ﷻ-এর আহকামের ব্যাপারে অজ্ঞ। তৃতীয় হলো ওই ব্যক্তি যে আল্লাহ ﷻ-এর আহকামের ব্যাপারে জ্ঞান রাখে কিন্তু আল্লাহ ﷻ-কে জানার ব্যাপারে, মা'রিফাতুল্লাহর ব্যাপারে অজ্ঞ। আর চতুর্থ হলো ওই ব্যক্তি যে আল্লাহ ﷻ-কেও চেনে না, তাঁর আহকামগুলো সম্পর্কেও অজ্ঞ। সর্বোত্তম হলো প্রথম শ্রেণি, সর্বনিকৃষ্ট হলো চতুর্থ শ্রেণি।

এখন চিন্তা করে বের করুন আপনি কোন শ্রেণিতে পড়েন। নিজের দুর্বলতা ও সবলতার জায়গাগুলো নিয়ে কাজ করুন, কারণ এভাবেই আপনি মা'রিফাতুল্লাহ অর্জন করতে পারবেন।

মা'রিফাতুল্লাহর গুরুত্ব

আল্লাহ ﷻ-এর ব্যাপারে জ্ঞান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মা'রিফাতুল্লাহ বিশাল একটি ব্যাপার এবং একে গুরুত্বের সাথে নেয়া আনশ্যক। আল্লাহকে জানা এবং তাঁর ইবাদত করা মানুষের ফিতরাহ বা স্বাভাবিক প্রবণতা। কেবল যাদের ফিতরাহ কলুষিত হয়ে গেছে তারাই আল্লাহ ﷻ-কে চেনে না এবং আল্লাহ ﷻ-এর ইবাদত করতে চায় না। অর্থাৎ তাদের ফিতরাহের মধ্যে কোনো অসম্পূর্ণতা, কোনো ত্রুটি দেখা দিয়েছে যার কারণে সঠিক ফিতরাহ থেকে তারা সরে গেছে।

আল্লাহ ﷻ পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু। এটা আপনাকে জানতে হবে, এটা মা'রিফাতুল্লাহ। আপনার শাহ রগের চেয়েও আল্লাহ ﷻ আপনার নিকটবর্তী, এটা জানতে হবে। এটা মা'রিফাতুল্লাহ।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلْمَا مَا نُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

আর অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তাও আমি জানি। আর আমি তার গলার ধমনি হতেও অধিক কাছে। (সূরা আল-কাফ, ১৬)

তব্ব হৃদয়কে তিনিই জোড়া লাগান। যখন বিপদে পড়েন, তখন তিনিই আপনার ডাকে সাড়া দেন। নির্ধারিতকে বিজয় দেন। তিনিই আপনার প্রতি আপনার মায়ের চেয়েও অধিক

দয়াশীল। এগুলো জানা মা'রিফাতুল্লাহ। যখন আপনি জানবেন ও অনুধাবন করবেন আল্লাহ ﷻ কতটা দয়াশীল, যখন আপনি উপলব্ধি করবেন আপনার নিজের মায়ের চেয়েও আল্লাহ ﷻ আপনার প্রতি অধিক দয়াশীল, তখন সেটা মা'রিফাতুল্লাহর অংশ। মা'রিফাতুল্লাহ হলো এই জ্ঞান যে, তিনি এবং একমাত্র তিনিই আপনার কল্যাণ বা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখেন। সমগ্র বিশ্ব একত্র হয়ে আপনার বিরুদ্ধে জড়ো হলেও, আল্লাহ ﷻ যদি না চান, তাহলে তারা সবাই মিলে আপনার অণুপরিমাণ ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না। মা'রিফাতুল্লাহ হলো এটা জানা যে, তিনিই আল্লাহ, যার প্রতি দু'আর হাত তোলার পর তিনি আপনাকে খালি হাতে ফেরান না। যখন সবাই ঘুমন্ত তখনো যে সত্তা ক্রন্দনরত মানুষের কান্না শোনেন—তিনিই আল্লাহ। ধরুন আপনার বাসায় কেউ একজন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। আল্লাহ ﷻ-এর কাছে দু'আ করার সময় আপনি কাঁদছেন, সেটা সে শুনতে পাচ্ছে না। কিন্তু সাত আসমানের ওপর থেকে আল্লাহ ﷻ সে কান্না শুনতে পান। এটা জানা হলো মা'রিফাতুল্লাহ। মা'রিফাতুল্লাহ ছাড়া, আল্লাহ ﷻ-কে জানা ছাড়া সঠিকভাবে, পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ ﷻ-এর ইবাদত করা সম্ভব না। আপনি এ ব্যাপারে যত জানবেন আপনি তত বেশি ইবাদত করবেন। আপনার অন্তরে আল্লাহ ﷻ-এর ভয় তত বাড়বে। আপনি আল্লাহ ﷻ-এর ওপর তত বেশি ভরসা করতে পারবেন, তত বেশি আশাবাদী হবেন। আল্লাহ ﷻ-কে জানা হলো সকল জ্ঞানের মূলনীতি, কারণ এ জ্ঞানের মাধ্যমে আপনি আপনার অস্তিত্বের কারণ সম্পর্কে জানতে পারবেন। আল্লাহ ﷻ-কে জানা, তাঁর গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে জানা, তিনিই সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক, মহাবিশ্বের নিয়ন্ত্রণকারী, ইবাদতের যোগ্য একমাত্র সত্তা—এটা জানা হলো মা'রিফাতুল্লাহ। যা কিছু আল্লাহ ﷻ-এর জন্য না, এমন সব ইবাদত বাতিল—এটা জানা মা'রিফাতুল্লাহ। মা'রিফাতুল্লাহ সম্পর্কে আপনি যত বেশি জানবেন আপনার ঈমান তত দৃঢ় হবে।

এগুলো হলো মা'রিফাতুল্লাহর ফল, মা'রিফাতুল্লাহর দাবি। আল্লাহ ﷻ সম্পর্কে জ্ঞান মানুষকে আল্লাহ ﷻ-এর প্রতি ভালোবাসা ও তাঁর ওপর আশার কারণে তাঁর নির্ধারিত দায়িত্বগুলো পালনে এবং মন্দ কাজ ত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করে। এটা হলো মা'রিফাতুল্লাহর চূড়ান্ত পর্যায়।

আল্লাহ ﷻ-এর ব্যাপারে জ্ঞান হলো সর্বোচ্চ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান

এই হাদিসটি শুনুন, বিষয়টি কতটা গুরুত্বপূর্ণ, কতটা শক্তিশালী, কতটা ভয়ানক অনুভব করুন। আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বসলেন এবং বললেন, যখন নূহ রَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-এর মৃত্যুর সময় এল, তিনি তাঁর দু-ছেলেকে সতর্ক করলেন। তিনি বললেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের সংক্ষিপ্ত কিছু উপদেশ দেবো।

أَمْرُكُنَا بِأَنْتَيْنِ، وَأَنْتَاهَا عَنْ ائْتَيْنِ

আমি তোমাদের দুটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি আর দুটি বিষয় থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে সতর্ক করছি।

লক্ষ করুন, নূহ عليه السلام তাঁর সন্তানদের মৃত্যুর আগে শেষবারের মতো কী উপদেশ দিচ্ছেন।

أَمَّا كُنَّا عَنِ الْيَزِيدِ وَالْكَبِيرِ

আমি তোমাদের সতর্ক করছি আল্লাহর সাথে শরীক করা আর অহংকারের ব্যাপারে।

وَأَمْرُكُنَا بِإِلَهِ إِلَّا اللَّهُ،

আর আমি তোমাদের আদেশ করছি যে, তোমরা জানবে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।

অর্থাৎ নূহ عليه السلام চাচ্ছেন তাঁর ছেলেরা যেন মা'রিফাতুল্লাহ জানে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হলো মা'রিফাতুল্লাহ।

তারপর তিনি কী বলছেন লক্ষ করুন, এ জন্যই আমি এ হাদিসটি উল্লেখ করলাম।

فَإِنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِنَّ لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ، وَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي الْكَفَّةِ الْأُخْرَى، كَانَتْ أَرْجَحَ

তিনি বললেন, যদি সাত আসমান আর সাত জমিনকে এবং এদের মাঝে যা কিছু আছে, সবকিছুকে একত্র করে এক পাল্লায় রাখা হয় আর অন্য পাল্লায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' রাখা হয়—তাহলে দ্বিতীয় পাল্লা প্রথম পাল্লার চেয়ে ভারী হবে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ—শুধু এ শব্দগুলো যদি এক পাল্লায় রাখা হয়, তবে তার ওজন সাত আসমান ও সাত জমিন এবং এর মধ্যবর্তী সবকিছুর সম্মিলিত ওজনের চেয়ে বেশি হবে। মা'রিফাতুল্লাহ এমনই গুরুতর, এমনই ব্যাপক ও বিশাল।

তারপর হাদিসে বলা হয়েছে :

وَلَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا خَلْفَةً فَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهَا لَفَضَّتْهَا أَوْ لَقَضَّتْهَا

যদি আসমানসমূহ ও জমিন একটি আংটির আকৃতিতে হতো আর এর ওপর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ রাখা হতো, তাহলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ একে ডেঙে ফেলত। একে ধ্বংস করে ফেলত।

অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মা'রিফাতুল্লাহ কতটা ভারী, কতটা শক্তিশালী।

তারপর নূহ عليه السلام তাদের আরেকটি কাজের আদেশ করলেন :

وَأَمْرُكُنَا بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فَإِنَّهَا صَلَاحٌ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ

আমি তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছি সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি বলার। কারণ, এটা হলো

সকল সৃষ্টির সালাত, এরই মাধ্যমে সবকিছু নিজ নিজ রিয়ক লাভ করে।^[১০১]

এ হাদিস থেকে আপনারা বুঝতে পারছেন মা'রিফাতুল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ—কতটা ভারী, শক্তিশালী, গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য। মৃত্যুশয্যাও একজন নবি বিশেষভাবে তাঁর ছেলেদের বলছেন, তোমাদের এটা জানতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে, বিশ্বাস করতে হবে, অনুধাবন করতে হবে।

হত্যা, মদ্যপান অথবা অন্য কোনো কবিরা গুনাহকারী যদি আল্লাহ ﷻ-এর নিয়ামতে হৃদয়ে তাঁর ভয় অনুভব করে, যদি গুনাহর পর হিদায়াত পেয়ে আল্লাহ ﷻ-এর প্রতি সে সিজদাবনত হয় এবং মা'রিফাতুল্লাহ অর্জন করে—তাহলে সে স্বীকার করবে, আল্লাহ ﷻ-এর আনুগত্যে ফিরে আসার পর সালাত, তাসবিহ আর দূআর মধ্যে সে যে আনন্দ পেয়েছে তার সাথে আগের গুনাহ কিংবা অন্য কোনো পার্শ্ব সুখের তুলনা হয় না। পাপাচারের জীবন ত্যাগ করে ইসলামে আসার পর আগের জীবনে পাপের মাধ্যমে পাওয়া সুখের সাথে ইবাদত ও মা'রিফাতুল্লাহর তুলনা করে—সে বলবে এ আনন্দের সাথে অন্য কিছুর তুলনা হয় না। যদি তার মধ্যে আদল-ইনসাফ থাকে, তাহলে সে এটা স্বীকার করবে। যদি কেউ সত্যিকারভাবে মা'রিফাতুল্লাহর জ্ঞান অর্জন করে, তাহলে সব পার্শ্ব আনন্দের চেয়ে আল্লাহ ﷻ-এর সামনে সিজদাবনত হওয়া তার কাছে বেশি প্রিয় হবে।

আল্লাহ ﷻ-এর ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন করলে ব্যক্তি ওই মুহূর্তগুলোর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করবে যখন সে সালাত, দূয়া, রুকু, সিজদাহ, যিকির অথবা অন্যান্য ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ-এর নৈকট্য লাভ করে। অন্যদিকে মা'রিফাতুল্লাহর জ্ঞানের অভাব আপনাকে ওই মানুষদের মতো বানাবে যারা সালাত শেষ হবার জন্য মুখিয়ে থাকে। যারা অস্থির হয়ে অপেক্ষা করে ইবাদত শেষ হবার জন্য। যারা কখনো কুরআন ছুঁয়েও দেখে না। প্রতিদিন কুরআন খুলে দেখার, সেখান থেকে তিলাওয়াত করার আগ্রহও তাদের থাকে না। যে সত্যিকার অর্থে মা'রিফাতুল্লাহর জ্ঞান অর্জন করে, সে এই আয়াতের কথা স্মরণ করবে :

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ

সেদিন পায়ের গোছা উন্মোচন করা হবে। আর তাদের সিজদাহ করার জন্য আহ্বান জানানো হবে, কিন্তু তারা সক্ষম হবে না। (সূরা আল-ক্বালাম, ৪২)

যে আল্লাহ ﷻ-কে চেনে, যার মা'রিফাতুল্লাহর জ্ঞান আছে, দুনিয়াতে সে স্বেচ্ছায়, আল্লাহ ﷻ-এর প্রতি আত্মসমর্পণ করে। আল্লাহ ﷻ-এর নির্দেশ অনুযায়ী দুনিয়াতে সে রুকু আর সিজদাহ করে যাতে করে যেদিন আল্লাহ ﷻ মানুষের মধ্যে বিচার করার জন্য অবতরণ করবেন এমন ব্যক্তি সেইদিনও আল্লাহ ﷻ-এর সম্মানে সে রুকু ও সিজদাহ করতে পারে।

আল্লাহ ﷻ-এর ব্যাপারে জ্ঞান কবরে প্রবেশ করার আগে আপনার কবরকে আলোকিত করবে। আপনি কি আলোকিত, উজ্জ্বল কবরে প্রবেশ করতে চান না? আপনি প্রবেশ করার আগেই মা'রিফাতুল্লাহর জ্ঞান আপনার কবরকে উজ্জ্বল করবে, আলোকিত করবে। আর তাই আমরা এ নিয়ে শিখছি, যাতে করে যখন আমাদের কবরে শায়িত করা হবে আমরা যেন একটি আলোকিত, উজ্জ্বল কবরে জায়গা পাই। মা'রিফাতুল্লাহর ফল হলো আল্লাহ ﷻ-এর সাথে দেখা হবার আগে আল্লাহ ﷻ-কে সন্তুষ্ট করা। আপনি কি আল্লাহ ﷻ-এর সাথে দেখা হবার আগেই, আল্লাহ ﷻ-কে সন্তুষ্ট করতে চান না? নিশ্চয় আপনি চান যখন আপনি আল্লাহ ﷻ-এর সামনে দাঁড়াবেন তিনি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হোন। মা'রিফাতুল্লাহ এ সন্তুষ্ট অর্জনের জন্যই। লোকেরা আপনার ওপর সালাত (জানাযা) আদায় করার আগে, নিজের সালাত আদায় করা ও নিজের দায়িত্ব পালন করা হলো মা'রিফাতুল্লাহ। আর এ ব্যাপারে জ্ঞানের অভাবের কারণেই মানুষ গুনাহ করে থাকে।

মা'রিফাতুল্লাহর ব্যাপারে অজ্ঞতা

আল্লাহ ﷻ কুরআনে বলেছেন :

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِمَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

নিশ্চয় তাওবা কবুল করা আল্লাহর জিন্মায় তাদের জন্য, যারা অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করে। তারপর শীঘ্রই তাওবা করে। অতঃপর আল্লাহ এদের তাওবা কবুল করবেন আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা আন-নিসা, ১৭)

এখানে অজ্ঞতা বলতে হারাম ও হালাল সম্পর্কে অজ্ঞতাকে বোঝানো হচ্ছে না। একজন মানুষ কোনো একটা হারাম কাজ করছে আর সে জানে না যে এটা হারাম—এমন খুব কমই হয়। যে হত্যা করে, হত্যা করা হারাম জেনেই করে। যারা যিনা করে তারা সবাই জানে যে যিনা হারাম। ব্যভিচার করতে উদ্যত ব্যক্তি জানে সে একটি হারাম করতে যাচ্ছে। যিনা হারাম এটা জানে না এমন লোক যদি থেকেও থাকে, তবে সেটা দুর্লভ ব্যতিক্রম। কুরআনে ব্যতিক্রমের কথা বলা হচ্ছে না।

এখানে যে অজ্ঞতার কথা বলা হচ্ছে তা হলো আল্লাহ ﷻ-এর ব্যাপারে অজ্ঞতা, মা'রিফাতুল্লাহর ক্ষেত্রে অজ্ঞতা। আর তাই তাওহিদ সম্পর্কে জানা আবশ্যিক। এ কারণেই আমরা তাওহিদের ব্যাপারে শিখি। কেউ কেউ সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ ﷻ-এর ব্যাপারে অজ্ঞ থাকে, আবার অনেকে গুনাহ করে সাময়িক বোকামিপূর্ণ অজ্ঞতার কারণে। আবারও বলি, কিছু মানুষ মা'রিফাতুল্লাহর ব্যাপারে পুরোপুরি অজ্ঞ। এরা হলো দুশ্চরিত্র, পাপিষ্ঠ ব্যক্তি যাদের সারা জীবন কাটে পাপ আর হারামের মধ্যে। আর কিছু মানুষ আছে যারা সাময়িক বোকামিপূর্ণ

অজ্ঞতায় পড়ে গুনাহ করে ফেলে। আর এ দ্বিতীয় ধরনের মানুষের মধ্যে অনেকেই ইন শা আল্লাহ তাওবাহ করে আবার ফিরে আসে।

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ : أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ : أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَقُولُونَ : كُلُّ ذَنْبٍ أَصَابَهُ عَبْدٌ فَهُوَ بِجَهَالَةٍ عِنْدًا كَانَ أَوْ غَيْرُهُ

আবুল আলিয়াহ বলেছেন—সাহাবি رضي الله عنه-দের মধ্যে এ কথাটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল যে, প্রত্যেক গুনাহ যাতে ব্যক্তি লিপ্ত হয় বা পতিত হয়, তা হয় অজ্ঞতার কারণে—গুনাহটি ইচ্ছাকৃত হোক বা না হোক।^(১১১)

কিসের ব্যাপারে অজ্ঞতা, হে সাহাবিগণ?

মা'রিফাতুল্লাহর ব্যাপারে অজ্ঞতা।

বুঝতে পারছেন এ ধরনের তাওহিদ কতটা অপরিহার্য? এমন অনেকে আছে যারা তাওহিদ শেখানোর সময় কেবল বইয়ের পাতা উলটে যায়। কিন্তু তাওহিদ এমনভাবে শেখাতে হয় যাতে করে আপনি তাওহিদের ওপর আমল করতে আকৃষ্ট হন। আর এ ধরনের তাওহিদ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে নিজেকে সংশোধন করতে।

মা'রিফাতুল্লাহর জ্ঞান জার্নাতে যাবার আগে এ দুনিয়াতে আপনার জন্য জাম্মাতের আবহ সৃষ্টি করবে। ইবনু তাইমিয়াহ رحمته الله একটি বিখ্যাত উক্তি আছে। আমি ইবনু তাইমিয়াহ رحمته الله-এর মাজমু আল ফাতাওয়া শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চার থেকে পাঁচবার পড়েছি, তবুও ইবনু তাইমিয়াহ رحمته الله-এর উক্তিগুলোর মধ্য থেকে এটি আমার সবচেয়ে প্রিয় উক্তিগুলোর একটি।

ইবনু তাইমিয়াহ رحمته الله বলেছেন,

إِنَّ فِي الدُّنْيَا جَنَّةً مَنْ لَمْ يَدْخُلْهَا لَا يَدْخُلْ جَنَّةَ الْآخِرَةِ

দুনিয়ার জীবনেও একটি জাম্মাত আছে। যে এই জাম্মাতে প্রবেশ করেনি, সে পরকালীন জাম্মাতেও প্রবেশ করবে না।^(১১২)

ইবনু তাইমিয়াহ, দুনিয়াতে এ কোন জাম্মাতের কথা আপনি বলছেন? যখন আপনি এ জীবনে মোট সাতবার বন্দী হয়েছিলেন? বছরের পর বছর জেলে কাটিয়েছিলেন, আর এমন দারিদ্র্যের মাঝে জীবন কাটিয়েছিলেন যে পরার জন্য একটার বেশি কাপড় আপনার ছিল না? আপনি তো দুনিয়াতে ছিলেন নির্ধারিত ও নিগৃহীত। আপনি এ কোন জাম্মাতের কথা বলছেন? দুনিয়ার কোন জাম্মাতী বাগানের কথা আপনি বলছেন, যেখানে প্রবেশ না করতে পারলে কেউ আখিরাতের জাম্মাতে প্রবেশ করতে পারবে না?

১১১ তাফসির ইবনু কাসির, উপরোক্ত অধ্যায়ের তাফসির দ্বিতীয়

১১২ আল ওয়াবিলুস সাইয়িয মিনাল কালামিত তাইমিয়াহ: ১/৫৭

এখানে ইবনু তাইমিয়াহ رحمہ اللہ তা-ই বুঝিয়েছেন যেটা সালাফদের অনেকের কথায়ও উঠে এসেছে :

إِنَّهُ لَيَمُرُّ بِالْقَلْبِ أَوْفَاتٌ أَقْوَلُ : إِنْ كَانَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي مِثْلِ هَذَا، إِنَّهُمْ لَفِي عَيْشٍ طَيِّبٍ

দুনিয়াতে মাঝে মাঝে আমাদের অন্তর এমন অবস্থার মধ্যে দিয়ে যায় যে আমরা বলি, যদি জান্নাতের অধিবাসীদের অন্তর এই অবস্থায় থাকে, যদি তাদের অন্তর এমন অনুভূতি হয়, তাহলে বলা যায় যে তারা ভালো অবস্থায় আছে।

মাদারিজ আস-সালিকিনের প্রথম খণ্ডে, সম্ভবত পৃষ্ঠা চার শ আশি বা এর কাছাকাছি কোথাও এ উদ্ধৃতিটি পাবেন।^(১)

এটাই হলো মা'রিফাতুল্লাহ। মা'রিফাতুল্লাহ জান্নাতে যাবার আগেই আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যায়।

নবি মুহাম্মাদ ﷺ-কে জানা :

ইলমের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মা'রিফাতুল্লাহর পর লেখক বলেছেন,

مَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থাৎ ইলমের আরেকটি অংশ হলো আপনাকে অবশ্যই নবি মুহাম্মাদ ﷺ-কে চিনতে হবে, তাঁর সম্পর্কে জানতে হবে। নবি ﷺ-কে চেনা হলো ইলম। এটি সেই জ্ঞান যার কারণে ব্যক্তি ওইসব কিছু মেনে নেয় যা রাসূলুল্লাহ ﷺ এনেছেন এবং আমাদের জানিয়েছেন।

নবি মুহাম্মাদ ﷺ-কে এবং তিনি যা কিছু জানিয়েছেন তার সবকিছুই সত্য বলে স্বীকার করতে হবে এবং সত্যায়ন করতে হবে। নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ব্যাপারে জানার অর্থ সব আদেশের অনুসরণ করা। ওইসব কিছু এড়িয়ে চলা যেগুলোর ব্যাপারে তিনি ﷺ আমাদের নিষেধ করেছেন। যা কিছুর ব্যাপারে তিনি আমাদের অনুৎসাহিত করেছেন সেগুলো ত্যাগ করা। যে নাযিলকৃত আইনসহ তিনি প্রেরিত হয়েছেন, সেই আইন দিয়েই আপনাকে বিচার করতে হবে এবং আল্লাহ ﷻ-এর যেকোনো বিচার ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যেকোনো নির্দেশের ব্যাপারে আপনাকে পরিপূর্ণভাবে সম্মত হতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহ ﷻ ও রাসূল ﷺ-কে শুধু মেনে চললে হবে না; বরং তাঁদের পক্ষ থেকে যা কিছু নির্ধারিত হয়েছে তা নিয়ে সম্পূর্ণভাবে সম্মত হতে হবে। নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ব্যাপারে জ্ঞানের অর্থ হলো এ সত্য জানা যে তিনি আল্লাহ ﷻ-এর গোলাম এবং আল্লাহ ﷻ-এর রাসূল। নবি মুহাম্মাদ ﷺ-কে চেনার অর্থ হলো, এ মানুষটির প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্যে অন্তর পরিপূর্ণ হওয়া। আপনি তাকে যত

ভালোবাসবেন ততই সত্যিকারভাবে তাঁর অনুসরণ করবেন।

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

বলে দাও, 'যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো তবে আমার অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করবেন, বস্তুত আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। (সূরা আলি ইমরান, ৩১)

আল্লাহ ﷻ আপনাকে ভালোবাসার একটি পূর্বশর্ত হলো নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করা। নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর আনা মেসেজের ওপর আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে। মেনে চলতে হবে তাঁর দেয়া নির্দেশ, অনুসরণ করতে হবে তাঁর আনা হেদায়েতের। কেন? কারণ, আল্লাহ ﷻ-এর নাবিলকৃত শারীয়াহকে জানা এবং হেদায়েত পাওয়ার একমাত্র মাধ্যম হলো মুহাম্মাদ ﷺ-কে চেনা। যেসব বিধিবিধান, হুকুম-আহকাম অনুযায়ী জীবনযাপন করতে হবে, আমরা তা পেয়েছি নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর মাধ্যমে। তাই নবি মুহাম্মাদ ﷺ-কে চিনতে হবে, তাঁর ﷺ ব্যাপারে জানতে হবে। ইলম অর্জনের জন্য নবি মুহাম্মাদ ﷺ-কে চেনা আবশ্যিক। আর তাই লেখক এ বিষয়টিকে ইলমের সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

এককথায় নবি ﷺ-এর ব্যাপারে জানা হলো-ওইসব জ্ঞান অর্জন ও উপলব্ধি করা যার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যে হেদায়েতসহ পাঠানো হয়েছিল, আপনি তা গ্রহণ করতে পারেন। নবিকে চেনার অর্থ তাঁর ওপর ঈমান আনা, তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা।

আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনো দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়। (সূরা আন-নিসা, ৬৫)

আল্লাহ ﷻ কি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে শুধু পারস্পরিক মতবিরোধের ক্ষেত্রে বিচারক হিসাবে গ্রহণ করার কথা বলেছেন? না, আল্লাহ ﷻ আরও বলেছেন :

‘তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনো দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়।’

সম্পূর্ণ সমর্পণের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যেকোনো নির্দেশ গ্রহণ করে নিতে আপনি বাধ্য। তাঁর নির্দেশ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ব্যাপারে আপনার অন্তরে থাকবে হবে শতভাগ সন্তুষ্টি।

আল্লাহ ﷻ বলেন :

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

মুমিনদের যখন তাদের মাঝে ফয়সালা করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে ডাকা হয়, তখন মুমিনদের জবাব তো এই হয় যে, তারা বলে, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম, আর তারাই সফলকাম। (সূরা আন-নূর, ৫১)

যখন আপনি মানুষকে বলেন, ‘এই হলো কুরআনের বক্তব্য, এই হলো হাদিসের দলিল, দেখো এ ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ এমন বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ব্যাপারে এটি বলেছেন’—কিছু মানুষ বলবে, ‘না! এসব কথা আমাদের জন্য প্রযোজ্য না।’ অথবা তারা বলবে, ‘ওসব কথা আমাদের নিয়ে না, এগুলো নিয়ে আমাদের চিন্তা করার দরকার নেই।’ কিংবা তারা বলবে, ‘আসলে এ কথাগুলোর অর্থ এ রকম না এগুলোর অর্থ অন্য কিছু।’ এভাবে আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাসূলের কথাকে এড়িয়ে যাবার জন্য তারা লক্ষ লক্ষ অভ্যুহাত বের করবে। কিন্তু আল্লাহ ﷻ বলেছেন, মুমিন হলো তাঁরাই যারা বলে :

‘আমরা শুনলাম এবং মানলাম।’

আল্লাহ ﷻ বলছেন, আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাসূলের কথা বলা হলে যারা বলে ‘আমরা শুনলাম এবং মানলাম’ তাঁরাই সফল। সফল হবার অর্থ হলো তাদের জাম্বাত দান করা হবে ইন শা আল্লাহ।

আল্লাহ ﷻ কুরআনে বলেছেন :

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

কাজেই যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, তাদের ওপর ফিতনাহ নেমে আসবে কিংবা তাদের ওপর নেমে আসবে ভয়াবহ শাস্তি। (সূরা আন নূর, ৬৩)

আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ

ওই ফিতনার ব্যাপারে সতর্ক হও, নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর আদেশের অবাধ্য হলে যা তোমাদের ওপর আপত্তি হবে।

কোন ফিতনা? কী ধরনের ফিতনা? ইমামদের অনেকে এ আয়াতের তাফসিরে বলেছেন, এখানে ফিতনাহ অর্থ হলো শিরক। নবিজি ﷺ-এর অবাধ্য হওয়া আপনাকে শিরকের দিকে নিয়ে যাবে। নবিজি ﷺ-এর কাছ থেকে আসা কোনো কিছু যদি আপনি অস্বীকার করেন,

যদি নবির সুন্নাহ বাদ দিয়ে মানুষের যুক্তিভিত্তিক ব্যাখ্যা, মানবিক দর্শন, আদর্শ কিংবা বুলির ওপর ভরসা করেন, যদি অবহেলা করেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহকে, যদি একে কাটছাঁট করেন, তাহলে এ কাজ আপনাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত আপনি শিরকে পতিত হবেন।

ইসলামকে জানা :

লেখক বলেছেন,

وَمَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ بِالْأَدِلَّةِ

ইলম বা জ্ঞানের তৃতীয় অংশটি হলো ইসলাম সম্পর্কে জানা। অর্থাৎ ইলম হলো আল্লাহ ﷻ-কে জানা, নবি মুহাম্মাদ ﷺ-কে জানা এবং ইসলামকে জানা।

ইসলামের সংজ্ঞা

শাস্তিক ভাবে ইসলাম শব্দের অর্থ আত্মসমর্পণ করা। কিন্তু শারীয়াহর দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম অর্থ :

الْإِسْلَامُ لِلَّهِ بِالْتَّوْحِيدِ، وَالْإِتْقَانُ لَهُ بِالطَّاعَةِ، وَالْخُلُوصُ مِنَ الْبِرِّكَ وَأَهْلِهِ

তাওহিদের সাথে আল্লাহ ﷻ-এর প্রতি পূর্ণ সমর্পণ, পূর্ণ আনুগত্যের সাথে তাঁর দাসত্ব স্বীকার করে নেয়া, শিরক এবং মুশরিকদের প্রত্যাখ্যান করা এবং তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা হলো ইসলাম।

এগুলো ইসলামের শর্ত এবং সীমারেখা। এটি হলো ইসলামে বিশ্বাস করার সংজ্ঞা।

আল্লাহ ﷻ-এর কাছে গ্রহণযোগ্য একমাত্র ধীন হলো ইসলাম

কুরআনের অনেক আয়াতে পূর্ববর্তী রাসূল আলাইহিমুস সালাম এবং আল্লাহ ﷻ-এর শারীয়াহর প্রতি তাঁদের সমর্পিত হবার কথা এসেছে। আল্লাহ ﷻ-এর প্রতি তাঁদের এ সমর্পণকে বোঝানোর জন্য কুরআনে 'ইসলাম' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

ইব্রাহীম ؑ-এর ব্যাপারে বলা হয়েছে :

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ
الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

‘হে আমাদের রব, আমাদের মুসলিম বানান এবং আমাদের বংশধরের মধ্য থেকে আপনায় অনুগত জাতি বানান। আর আমাদেরকে আমাদের ইবাদতের বিধিবিধান দেখিয়ে দিন এবং আমাদের ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’। (সূরা আল-বাকারাহ, ১২৮)

উসুল আস-সালাসাহর লেখক বলছেন, আপনার অবশ্যই ইসলামকে জানতে হবে। আর এ ইসলাম হলো মুহাম্মাদ ﷺ-এর দীন। মুসা, ঈসা এবং ইব্রাহীম আলাইহিমুস সালামের দীন। পার্থক্য হলো, মুহাম্মাদ ﷺ-এর আগমনের পর তাঁর ওপর নাযিলকৃত বিধিবিধান, হুকুম ও নীতিগুলোর দ্বারা আগের সকল শারীয়াহকে রহিত করে দেয়া হয়েছে। মুসা ﷺ-এর সময়কার ইহুদিরা ছিল মুসলিম। ঈসা ﷺ-এর সময়কার খ্রিষ্টানরা ছিল মুসলিম। তাঁরা নিজেদের সমর্পণ করেছিল ঈসা ﷺ-এর শিক্ষার প্রতি। মনে রাখবেন, আমরা এখানে তাঁদের কথা বলছি যারা মুসা এবং ঈসা আলাইহিমুস সালামের সময় পরিপূর্ণভাবে তাঁদের অনুসরণ করেছিলেন। অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছিলেন, আমরা তাঁদের কথা বলছি। বর্তমানের ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা যদি আসলেই মুসা ও ঈসা আলাইহিমুস সালামের প্রকৃত অনুসারী হতো তবে তারা কুরআনের অনুসরণ করত এবং সেসব মেনে চলত যা মুহাম্মাদ ﷺ তাদের অনুসরণ করতে বলেছেন। সত্যিকারভাবে নিজেদের ধর্মে বিশ্বাসী হলে তারা নবিজি ﷺ-এর আনীত বার্তা ও দ্বীনের অনুসরণ করত। এটি স্পষ্ট সত্য এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই।

মর্ডানিস্ট^(১১) এবং যারা ইন্টারফেইথ বা আন্তঃধর্মীয় সংহতি^(১২) ইত্যাদির কথা বলে-উম্মাহর জন্য ক্যাপারস্বরূপ এসব গোমরাহ লোকেরা বলে, আল্লাহ ﷻ নাকি কুরআনে বর্তমানের

১৮ ইসলামি মর্ডানিজম/ ইসলামি মর্ডানিস্ট - একটি ব্যতিল ফিরকা। মর্ডানিস্টরা পশ্চিমা সভ্যতা ও সেকুলার হিউম্যানিস্ট বিশ্বব্যবহার আলোকে ইসলাম ও শরীয়াহকে পুনঃসংজ্ঞায়িত ও পরিবর্তন করার চেষ্টা করে। মানদণ্ড হিসেবে মর্ডানিস্টরা গ্রহণ করে উদারনৈতিক পশ্চিমা দর্শনকে (liberalism)। ইসলামের যা কিছু এই দর্শনের সাথে সাংঘর্ষিক মর্ডানিস্টরা সেগুলো এমনভাবে ব্যাখ্যা করে যাতে করে সেগুলো উদারনৈতিক পশ্চিমা বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। মর্ডানিস্টরা মনে করে আমরা এক ব্যতিক্রমধর্মী সময় বাস করছি এবং আমাদের উচিত ইসলামকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করা। একারণে তাঁরা সালাক আস-সালাহিনসহ উম্মাহর পূর্ববর্তী ইমান ও আলিমগণের ঐক্যমত, ব্যাখ্যা ও ইলমি শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করে। তারা দাবি করে শরীয়াহর অনেক কিছুর ব্যাপারে পূর্ববর্তীদের অবস্থান ভুল ছিল, অথবা তাঁদের দেয়া স্মারকগুলো শুধু ওই সময়কালের জন্য প্রযোজ্য ছিল। মর্ডানিস্টদের অনেক সময় ‘নব্য মু’আযিলা’ বলা হয়, কারণ তাদের মানহাজ তথা মর্ডানিস্টদের মানহাজের সাদৃশ্য বিদ্যমান। মর্ডানিস্ট ইসলাম হল আধুনিক সময়ে আমেরিকার প্রচারিত ও সমর্থিত ‘মডারেট ইসলাম’ (Civil Democratic Islam) আদর্শিক পূর্বসূরী।

১৯ ইন্টারফেইথ বা ইন্টারফেইথ ডায়ালগ : আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি বা সংলাপ। এ-জাতীয় কার্যকলাপকে ঘিরে বিভিন্ন ধরনের মুখস্থ বুলি প্রচলিত থাকলেও আদতে আন্তঃধর্মীয় সমাবেশ, সম্প্রীতি ও সংলাপের মূল উদ্দেশ্য হলো, ‘সকল ধর্ম সমান’, ‘সকল ধর্ম সঠিক’, ‘সকল পথই একই গন্তব্যে পৌঁছে দেয়’, ‘সকল ধর্ম এক’-এমন একটি দর্শনের প্রচার। এটি নির্জলা কুফর ও শিরক এবং বর্তমানের ইন্টারফেইথ আন্দোলন মূলত ফ্রিম্যাসনিক ‘এক ধর্ম, এক বিশ্ব’ এজেন্ডার বাস্তবায়ন। আল্লাহ ﷻ হাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, ইসলাম হাড়া আর কোনো সঠিক ধর্ম নেই। ঈমান ও কুফর, তাওহিদ ও শিরক, মুসলিম ও কাফির কখনো সমান হতে পারে না। অসিবিদের মতে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি বা সংলাপের এ আহ্বান হলো মূলত রিন্দার আহ্বান। এ ব্যাপারে আরও জানতে দেখুন - <https://islamqa.info/en/10213> এবং লাজনাহ আদ দাঈয়াহর ফাতওয়া নম্বর ১৭, ৩০০

ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের প্রশংসা করেছেন। নিজেদের খেয়ালখুশিকে জায়েজ করার জন্য তারা আল্লাহ ﷻ-এর আয়াতের অর্থ বিকৃত করে।

আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, যারা ইহুদি হয়েছে এবং খ্রিষ্টান ও সাব্বিঈন—যারাই আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে ও সং কাজ করে, তাদের জন্য পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। (সূরা আল বাকারাহ, ৬২)

এই আয়াত দেখিয়ে এরা বলে, দেখো! আমরা সবাই ভাই ভাই ! দেখো, আল্লাহ ﷻ বলছেন ইহুদি-খ্রিষ্টানরাও আমাদের সাথে জান্নাতে যাবে।

অথচ এ আয়াতে ওইসব লোকেদের কথা বলে হচ্ছে যারা তাঁদের সময়ে হকের ওপর ছিলেন। যারা মুসা ﷺ-এর সময়ে হকপন্থী ছিলেন, যারা ঈসা ﷺ-এর সময়ে হকপন্থী ছিলেন—এ আয়াতে সেইসব মানুষের কথা বলা হচ্ছে। বর্তমানে মুহাম্মাদ ﷺ-এর নুবুওয়াতের পরে, যদি মুসা ও ঈসা আলাইহিমুস সালামের সত্যিকারের কোনো অনুসারী থেকে থাকে, যদি আসলেই তারা মুসা ও ঈসা আলাইহিমুস সালামের অনুসারী হয়ে থাকে তবে তারা নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করবে।

বাস্তবতা হলো, আমরা মুসলিমরাই হলাম মুসা ও ঈসা আলাইহিমুস সালামের প্রকৃত অনুসারী। কারণ, তাঁদের নুবুওয়াতের একটি পূর্বশর্ত হিসেবে আল্লাহ ﷻ-এর কাছে তাঁরা শপথ করেছিলেন যে, তাঁদের জীবদ্দশায় মুহাম্মাদ ﷺ-এর আগমন ঘটলে তাঁর ওপর তাঁরা ঈমান আনবেন এবং তাঁর অনুসরণ করবেন। এটি ছিল তাঁদের নবি হবার শর্ত। তাঁদের জীবদ্দশায় মুহাম্মাদ ﷺ প্রেরিত হলে তাঁরা নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর অনুসরণে বাধ্য থাকবেন—এটি ছিল তাঁদের ওপরই শর্ত। তাহলে চিন্তা করুন তাঁদের উম্মাহর জন্য অবস্থাটি কী রকম! তাঁদের দুজনের হাজারো বছর পর আজ তাঁদের উম্মাহও নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর আদেশ ও নিষেধের অনুসরণে বাধ্য।

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَضُكُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَفَرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ

আর স্মরণ করো, যখন আল্লাহ নবীদের অঙ্গীকার নিয়েছেন, আমি তোমাদের যে কিতাব ও হিকমাহ দিয়েছি অতঃপর তোমাদের সাথে যা আছে তা সত্যায়নকারীরূপে একজন রাসূল তোমাদের কাছে আসবে—তখন অবশ্যই তোমরা তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে। তিনি বললেন, ‘তোমরা কি স্বীকার করেছ এবং এর ওপর আমার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছ?’ তারা বলল, ‘আমরা স্বীকার করলাম।’ আল্লাহ বললেন, ‘তবে তোমরা সাক্ষী থাকো এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম।’ (সূরা আলি ইমরান, ৮১)

প্রত্যেক রাসূল আলাইহিস্লাম সালামকে এ শপথ করতে হয়েছে যে, মুহাম্মাদ ﷺ এলে তাঁর অনুসরণ করতে হবে। এটি রাসূলদের জীবদ্দশাতেই তাঁদের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল। তাহলে আজকে ব্যাপারটা কেমন হবার কথা? আজকের খ্রিষ্টান এবং ইহুদিরা মুসলিম না। মুসলিম হলো তাঁরাই যারা আল্লাহ ﷻ এবং নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর বিশ্বাস করে। আমরা বিশ্বাস করি, মুসা ও ঈসা আলাইহিস্লাম সালামের ওপর বিশ্বাসের অংশ হলো। এই বিশ্বাস যে, মুহাম্মাদ ﷺ প্রেরিত হলে তাঁর ﷺ অনুসরণ করার এবং তাঁর শারীয়াহকে গ্রহণ করার ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ তাঁদের কাছ থেকে শপথ নিয়েছেন। এবং আমরা বিশ্বাস করি এই সত্য তাঁদের উম্মাহকে এই মহান রাসূলগণ জানিয়েছেন।

আল্লাহ ﷻ কুরআনে বলেছেন :

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

নিশ্চয় আল্লাহর নিকট একমাত্র ধীন হলো ইসলাম। (সূরা আলি ইমরান, ১৯)

আর যারা ইন্টারফেইথে বিশ্বাস করে এ আয়াত হলো তাদের জন্য :

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধীন গ্রহণ করতে চাইবে কস্কনো তার সেই ধীন কবুল করা হবে না এবং আখেরাতে সে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা আলি ইমরান, ৮৫)

ইসলাম হলো সেই ধর্ম যা আল্লাহ ﷻ এ উম্মাহর জন্য নির্ধারিত করেছেন এবং এটিই এ উম্মাহর জন্য সব সম্মানের চেয়ে বড় সম্মান।

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নিয়ামাত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ধীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে। (সূরা আল যায়ইদা, ৩)

এ থেকে বোঝা যায় যে, ইসলামেই বিশ্বাস করতে হবে। আল্লাহ ﷻ-এর মনোনীত একমাত্র দ্বীন, আল্লাহ ﷻ-এর কাছে গ্রহণযোগ্য একমাত্র দ্বীন হলো ইসলাম—এটি বিশ্বাস করা বাধ্যতামূলক।

ইসলামে আমলের ভিত্তি

ইসলামকে জানার অর্থ হলো, বিশ্বাসী হিসেবে যেসব কাজ করা আবশ্যিক সেগুলো সম্পর্কে জানা :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحُجَّجِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

ইবনু উমার রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, ইসলামের মূল ভিত্তি পাঁচটি। এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সঃ আল্লাহর রাসূল। সালাত কয়েম করা, যাকাত প্রদান করা, হজ্জ আদায় করা এবং রমাদ্বান মাসে সিয়াম পালন করা।^(১০)

এগুলোই ইসলামের অন্তর্ভুক্ত সব কাজ না, তবে এগুলো হলো ইসলামে আমলের মূলনীতি। ইসলামে আমলসমূহের ভিত্তিস্বরূপ মূলনীতিগুলো সম্পর্কে জানা, সেগুলোর প্রতি আত্মসমর্পণ এবং অনুসরণ করাও ইসলামকে জানার অংশ।

আমরা এ আলোচনায় ইলম ও ইলমের সংজ্ঞা সম্পর্কে জানলাম। আমরা জানলাম যে, ইলম হলো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর দ্বীন সম্পর্কে জানা। আমরা সংক্ষিপ্ত ভাবে এখানে বিষয়গুলো আলোচনা করলাম কারণ, তিনটি মূলনীতির আলোচনায় এ বিষয়গুলো আবারও আসবে। কারণ, কবরে এ তিনটি বিষয় নিয়েই আপনাকে প্রশ্ন করা হবে। এখানকার সংক্ষিপ্ত এই আলোচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল ইলমের সংজ্ঞা আপনাদের সামনে স্পষ্ট করা।

ইলমের সংজ্ঞার ক্রমধারা :

উসুল আস-সালাসাহর লেখক ইলমের সংজ্ঞা দিয়েছেন নিম্নোক্ত ক্রমধারায়—প্রথমে আল্লাহ ﷻ-কে জানা, তারপর নবি মুহাম্মাদ ﷺ-কে জানা এবং তারপর দীন ইসলামকে জানা। আদ-দুরারসহ (الضرر) অন্যান্য বইতে দেখবেন এ ধারাটা ভিন্নভাবে এসেছে। এসব বইতে প্রথমে আল্লাহ ﷻ-কে, তারপর দীন ইসলাম এবং তারপর মুহাম্মাদ ﷺ কে জানার কথা বলা হয়েছে। এ পার্থক্য কেন? এর দুটো কারণ আছে। প্রথম কারণ হলো, দীন ইসলাম আর নবি মুহাম্মাদ ﷺ পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। কাজেই এ দুটোর মধ্যে কোনটিকে আগে বলা হচ্ছে সেটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ না।

দ্বিতীয় কারণ হলো, লেখক এখানে ওয়া (و) ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন,

مَعْرِفَةُ اللَّهِ ، وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ بِالْأَوَّلِيَّةِ

আরবিতে ‘ওয়া’ অর্থ হলো ‘এবং’। যদিও অধিকাংশ সময় ওয়া ব্যবহার করা হলে সেটার দ্বারা সিকোয়েন্স বোঝায় কিন্তু সব ক্ষেত্রে ওয়া দ্বারা ক্রমধারা বা সিকোয়েন্স বোঝাবে, এটা আবশ্যিক না।

আল্লাহ ﷻ, নবি মুহাম্মাদ ﷺ ও দীন ইসলাম সম্পর্কে দলিলসহ জানা :

লেখক বলেছেন, আল্লাহ, নবি ও দীন ইসলাম, এ তিনটি বিষয়ে আপনাকে জানতে হবে—বিল আদিল্লাহ—দলিলসহ।

আদিল্লাহ বা দলিল-প্রমাণের এর শাব্দিক অর্থ হলো এমন কিছু যা অস্ব্ষিত বস্ত বা লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায়। তবে আমরা আগেও বলেছি লুগাউই বা শাব্দিক/ভাষাতাত্ত্বিক অর্থের পাশাপাশি পরিভাষাগুলোর ইস্তিলাহি বা শার’ঈ অর্থও থাকে। আদিল্লাহ বা দলিলের শার’ঈ

অর্থ হলো, নসভিভিক (textual proof) ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ। নসভিভিক প্রমাণ বলতে বোঝানো হয় কুরআন-সুন্নাহ এবং এ দুটোর ওপর ভিত্তি করে পাওয়া ইজমা ও কিয়াস। কাজেই দলিল বা প্রমাণের একটি হলো নসভিভিক প্রমাণ। পাশাপাশি উপযুক্ত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণের মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ, তাঁর রাসূল ﷺ ও তাঁর দ্বীনকে চেনাও দলিলের অংশ। কুরআনে আল্লাহ ﷻ অনেকবার তাঁর সৃষ্টিসমূহ পর্যবেক্ষণ এবং সেগুলো নিয়ে চিন্তা করতে বলেছেন। এটি বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণের উদাহরণ।

وَمِنْ آيَاتِهِ

এবং তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে...

শুধু এ কথাটি কুরআনে এগারো বার এসেছে। আল্লাহ ﷻ-এর আয়াত, প্রমাণ, নিদর্শনসমূহ এবং সৃষ্টির জন্য শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হলো আকাশ, জমিন, সমুদ্র এবং দিন ও রাত্রির আবর্তন। কুরআনে এগুলোর দিকে তাকানো, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করার কথা এসেছে।

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَخْبَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَضَرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

নিশ্চয়ই আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টির মধ্যে, রাত ও দিনের বিবর্তনের মধ্যে, লোকের উপকারী দ্রব্যাদিসহ সমুদ্রে চলাচলকারী জলযানের মধ্যে এবং আকাশ হতে আল্লাহর বর্ষিত সেই পানির মধ্যে যদ্বারা তিনি পৃথিবীকে মরে যাওয়ার পর আবার জীবিত করেন এবং তাতে সকল প্রকার জীব-জন্তুর বিস্তারণে এবং বাতাসের গতি পরিবর্তনের মধ্যে এবং আকাশ ও ভূমণ্ডলের মধ্যস্থলে নিয়ন্ত্রিত মেঘপুঞ্জের মধ্যে বিবেকসম্পন্ন লোকদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে। (সূরা আল-বাকারাহ, ১৬৪)

পাশাপাশি আল্লাহ ﷻ-এর ইচ্ছায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য সংঘটিত মু'জিযাগুলোও দলিলের অন্তর্ভুক্ত। এসব মু'জিযার মধ্যে আছে তাঁর ﷺ হাতের আঙুলের মাঝ থেকে পানির প্রবাহ, বিভিন্ন জড় বস্তুর সাথে কথোপকথন, পাথর কর্তৃক তাঁকে সালাম দেয়া ইত্যাদি। এ ছাড়া কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষকে ঋইবের এমন অনেক খবর জানিয়েছেন, যেগুলো কেবল আল্লাহ ﷻ-এর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া ওহির মাধ্যমেই জানা সম্ভব। এসব ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে অনেকগুলো হব্ব তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী সংঘটিত হয়েছে, আর বাকিগুলোর ব্যাপারে আমরা অপেক্ষমাণ। এগুলোও প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত।

তাওহিদের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে বিশ্বাস হতে হবে দৃঢ় ও নিশ্চিত। এমন বিশ্বাস যাতে কোনো সন্দেহ থাকবে না। সাধারণত প্রমাণের মাধ্যমেই এমন অবস্থায় পৌঁছানো যায়। তাই লেখক বলেছেন, দলিল জানতে হবে।

আকিদাহর ক্ষেত্রে তাকলিদ :

প্রশ্ন হলো, আকিদাহর ক্ষেত্রে কি কোনো শাইখ, আলিম বা জ্ঞানী ব্যক্তির তাকলিদ বা অন্ধ অনুসরণ করা জাযিয়? নাকি প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য প্রমাণ জানা আবশ্যিক? প্রমাণ জানা কি ঈমানের পূর্বশর্ত? প্রমাণ না জানলে আপনার ঈমান কি গৃহীত হবে?

ধরুন দুজন ব্যক্তির মধ্যে একজন জ্ঞানী, অন্যজন অজ্ঞ। তারা শাহাদাহ গ্রহণ করেছেন। তারা তাওহিদের ওপর পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস রাখেন এবং তাদের মনে এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তারা প্রমাণ জানেন না। দলিল সম্পর্কে জানেন না। তাদের কাছে দলিল জানতে চাইলে তারা বলতে পারবেন না। তাদের ঈমান কি গৃহীত হবে?

صِدْقَةُ إِيْمَانٍ التَّقْلِيدِ فِي الْعَقَائِدِ

শিরোনামের অধীনে আলিমগণ এ বিষয়ে আলোচনা করেছে। মুকাল্লিদ হলো অনুসরণকারী। মুকাল্লিদের ঈমান কী সঠিক?

লেখক বলেছেন কিছু বিষয়ের ব্যাপারে দলিল-প্রমাণ জানতে হবে। প্রশ্ন হলো, এগুলো জানা কি বাধ্যতামূলক নাকি এগুলো জানা উত্তম? দলিল-প্রমাণ না জানলে কি আপনার ঈমান কবুল হবে? এ বিষয়গুলো নিয়ে আলিমগণ আলোচনা করেছেন। অনেকে মনে করেন এ প্রশ্নের উত্তর খুব সহজ। কিন্তু আসলে বিষয়টি অতটা সহজ না। কারণ, এ নিয়ে দু-ধরনের দ্বন্দ্ব হয়ে থাকে।

প্রথম ও মূল দ্বন্দ্ব হলো মু'তামিল।^{১১} ফিরকা এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ—অর্থাৎ আমাদের মধ্যে। মু'তামিলাদের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, তারা এমন সব লোকের ঈমান প্রত্যাখ্যান করে যারা আকিদাহর ব্যাপারে দলিল-প্রমাণগুলো জানে না। অনেকে বলে থাকেন আশা'ইরাহ বা আশআরিরাও এ ক্ষেত্রে মু'তামিলাদের অনুরূপ বলে। তবে আল-কুশাইরিসহ আশআরিদের অন্যান্য আলিমগণ বলেছেন যে, আবুল হাসান আল-আশআরি رحمته এমন কোনো কথা বলেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন মুকাল্লিদের ঈমান গ্রহণযোগ্য। আবুল হাসান আল-আশআরি رحمته হলেন আশআরিদের জনক তবে আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি পরবর্তীকালে আশআরি আকিদাহ থেকে ফিরে এসেছিলেন। যা হোক আকিদাহর ব্যাপারে

১১ মু'তামিলা ফিরকার প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে ওয়াসিল ইবনু আতা ও আমর ইবনু উবাইদ। এই ফিরকার উদ্ভব দ্বিতীয় হিজরি শতাব্দীতে। তাদের বাড়িল আকিদার কারণে হাসান আল-বাসরি رحمته কুফার মাসজিদে ধীরে হালকা থেকে তাদের বের করে দিয়ে ছিলেন, এবং বলেছিলেন 'দূর হও আমাদের থেকে' (ই'তামিল আরা) সেই থেকেই তাদের নাম হয় মু'তামিলা। এরা আকল বা বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলকে নকল তথা ওয়াহির ওপর প্রাধান্য দেয়। এদের প্রথম বিদআহ ছিল ঈমান-সংক্রান্ত। তারা বলে, কবিরী স্তন্যাহগার মুমিনও নয়, কামিরও নয়; সে দুই স্তরের মধ্যবর্তী স্তরে (بين منزلتين)। তারা তাকদির অধীকার করার ক্ষেত্রে মাযাহ জুহানি ও গায়লানের সাথে ঐকমত্য পোষণ করে। এরপর তারা আল্লাহ سبحانه -এর সিফাত অধীকার করে। আর তারা সাহাবিদের رحمهم সমালোচনাকে বৈধ মনে করে। এ ছাড়াও ইসলামের অনেক মৌলিক বিষয়ে তারা আহলুস সুন্নাহর সাথে দ্বিমত পোষণ করে।

তাকলিদের প্রথমে প্রথম দ্বন্দ্ব হলো আহলুস সুন্নাহ ও মু'তাজিলাদের মধ্যে।

দ্বিতীয় মতপার্থক্য হলো আহলুস সুন্নাহর নিজদের মধ্যে। এ ব্যাপারে মোট তিনটি মত আছে।

প্রথম মত—দলিল জানতে হবে

প্রথম মত হলো, আপনাকে অবশ্যই আকিদাহর বিষয়গুলোর ব্যাপারে প্রমাণ জানতে হবে। আকিদাহর বিষয়গুলোর ব্যাপারে দলিল না জানলে আপনার ঈমান প্রত্যাখ্যাত। আর-রাযি, আবুল-হাসান আল-আমিদি এবং মু'তাজিলাদের অধিকাংশই এমন কথা বলেছেন। আবুল মুযাফফর আস-সাময়ানি বলেছেন, ফকিহদের কেউ কেউ এবং ফালাসিফারা বলেছেন আকিদাহর ব্যাপারে এক অনুসরণ সাধারণ মানুষের জন্যও জায়েজ না। এ ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা-কিয়াস এবং অন্যান্য উৎস থেকে আসা প্রমাণ জানতেই হবে। মু'তাজিলারা এ ব্যাপারে মানবীয় বুদ্ধিবৃত্তি বা আকলের ওপর খুব বেশি ভরসা করত।

দ্বিতীয় মত—দলিল জানা বাধ্যতামূলক না

দ্বিতীয় মতটি হলো এ ব্যাপারে প্রমাণ জানা বাধ্যতামূলক না। কোনো আলিমের কথার অনুসরণ ও অনুকরণ অর্থাৎ তাকলিদ করা যথেষ্ট। ঈমান দৃঢ় হলে এবং মনে কোনো সন্দেহ না থাকলে এতেই ঈমান গৃহীত হবে। তবে অন্তরে কোনো সন্দেহ থাকতে পারবে না—এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এটা হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের অধিকাংশ আলিমের মত।

সুতরাং প্রথম মতটি হলো, ঈমান থাকার জন্য আকিদাহর বিষয়গুলোর ব্যাপারে প্রমাণ জানা আবশ্যিক। মূলত এটা হলো মু'তাজিলাদের অবস্থান। দ্বিতীয় অবস্থান হলো, অন্তরে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব, সন্দেহ-সংশয় না থাকলে এবং ব্যক্তি সত্যের অনুসারী হলে এসব ব্যাপারে দলিল-প্রমাণ জানা আবশ্যিক না।

তৃতীয় মত—দলিল প্রমাণ জানার চেষ্টা করা হারাম

তৃতীয় মতটি হলো দলিল-প্রমাণ খোঁজা হারাম। কারণ, এ ব্যাপারে যোগ্য না হলে দলিল খুঁজতে গিয়ে আপনি বিপথগামী হয়ে যেতে পারেন। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহ—এর কিছু অনুসারী এ মত রাখতেন বলে বলা হয়ে থাকে। তবে আমি এ মতটি বাদ দেবো, কারণ আমার মতে এ কথাটি আউট অফ কন্টেক্সট নেয়া হয়েছে। মূলত এ কথাটি ওইসব দুর্লভ লোকদের জন্য বলা যারা অজ্ঞভাবে প্রমাণ খোঁজা শুরু করে এবং এর ফলে বিপথগামী হয়। এ কথাটি এমন লোকদের জন্য প্রযোজ্য যারা প্রমাণ বোঝার ক্ষেত্রে একেবারেই অক্ষম এবং তারা যদি প্রমাণ দেখে, তাহলে সেটা সঠিকভাবে না বুঝে বরং তাদের গোমরাহ হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে। তাই এ ধরনের লোকের জন্য একজন আলিমের কাছে যাওয়া আবশ্যিক। কাজেই আমরা এ তৃতীয় মতটি বাদ দেবো, কারণ এখানে বিশেষ অবস্থার কথা বলা হচ্ছে।

প্রথম দুটি মতের সারসংক্ষেপ :

প্রথম দুটি মতের সারসংক্ষেপ হলো, কোনো ব্যক্তির দলিল খোঁজার ও অনুধাবন করার যোগ্যতা থাকলে তাঁর উচিত আকিদাহ ও অন্যান্য বিষয়ে দলিল খোঁজা। আর এ জন্যই আমরা এত বিস্তারিত আলোচনা করছি। দলিল অনুধাবন ও তা সঠিকভাবে আত্মাহ করা যার পক্ষে সম্ভব না, এমন ব্যক্তির জন্য প্রমাণ জানার প্রয়োজন নেই, যতক্ষণ সে ঈমানের ওপর দৃঢ় আছে এবং তার মনে কোনো সংশয়-সন্দেহ নেই। তবে উভয় ক্ষেত্রেই প্রমাণ ছাড়া ঈমান আনা ব্যক্তিকে মুমিন গণ্য করা হবে। সে ইলমসম্পন্ন হোক বা না হোক। আর যারা মনে করেন মানুষকে প্রমাণ জানতেই হবে তারা প্রমাণ জানাকে ঈমান আনার পর প্রথম দায়িত্ব সাব্যস্ত করেন। মু'তযিলারা বলত,

أول واجب هو النظر والاستدلال

‘ব্যক্তির ওপর প্রথম দায়িত্ব হলো প্রমাণ ও যুক্তি খোঁজা।’

এ কথার সবচেয়ে সোজা জবাব হলো, প্রমাণ খোঁজা হয় লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য। যদি কেউ অনুসরণ ও অনুকরণের মাধ্যমে সঠিক দিকনির্দেশনা পেয়ে যায়, তবে সে লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে।

এ ব্যাপার আস-সাফারানির একটি ভাষ্য আছে, যার মাধ্যমে পুরো বিষয়টির সারাংশ ফুটে ওঠে। তিনি বলেছেন, ‘সত্য কথা হলো, কেউ মুকাল্লিদের ঈমানের বৈধতার স্বীকৃতি দেয়াকে এড়িয়ে যেতে পারে না। মুকালিদ বা অনুসারী হলো এমন ব্যক্তি, যে অন্য কারও অনুকরণ করে। অর্থাৎ যে তাকলিদ করে। তাকলিদ করা হয় সঠিক পথে পৌঁছানোর জন্য। আর মুকাল্লিদ সঠিক পথে পৌঁছানোর জন্য একটি পথ বেছে নিয়েছে।’ এখানে তার কথার অর্থ হলো, প্রমাণ ব্যবহারের উদ্দেশ্য সঠিক পথে পৌঁছানো। যদি কেউ তাকলিদের মাধ্যমে সঠিক পথে পৌঁছে যায়, তাহলে সে তো মূল লক্ষ্য অর্জন করেছে। এ কথার সাথে ইমাম নাওয়াউয়ী রহ ও একমত পোষণ করেছেন এবং মুসলিমের শরাহতে অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।

শাইখ আলী আল-খুদাইর^{১২৭} বলেছেন, ‘আকিদাহর ব্যাপারে তাকলিদ করা জায়েজ, যতক্ষণ পর্যন্ত যা অনুসরণ করার কথা, সে ব্যাপারে আপনি দৃঢ় থাকবেন এবং দলিল না জানা সত্ত্বেও আপনার মধ্যে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকবে না। আল্লাহ স্ব জামিরাতুল আরবের জেলখানা থেকে শাইখ আলী আল-খুদাইরের মুক্তি ত্বরান্বিত করুন। শাইখ নঈসির আল-ফাহদের গ্রেফতারের

১২৭ আলী বিন খুদাইর বিন ফাহদ আল-খুদাইর। ১৩৭৪ হিজরিতে রিয়াদে জন্মগ্রহণ করেন। কাসিমে অবস্থিত জামিয়াতুল ইমাম থেকে ১৪০৩ হিজরিতে উসুল আদ-দ্বীনে ডিগ্রি নিয়ে বের হন। শাইখের শিক্ষকদের মধ্যে আছেন আলী বিন আব্দুল্লাহ আল-উরদুনি, মুহাম্মাদ বিন মুহাইযি, আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু ইব্রাহীম আহলুশ শাইখ, মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল মানসুর, মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমিন রহ - সহ আরো অনেকে। এছাড়া শাইখ আলী হলেন আল্লামা হাম্বুদ বিন উকলা আশ-শুয়াইবি রহ এর প্রধান ও সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ছাত্র। মুসলিম বিশ্বের ওপর আমেরিকার আশ্রাসনের বিরুদ্ধে যতওয়া দেয়ার কারণে শাইখ নাসির আল-ফাহদ ও শাইখ আহমাদ আল খালিদির সাথে শাইখ আলী আল-খুদাইরকে গ্রেফতার করা হয়। আল্লাহ স্ব তাঁদের সত্যের ওপর অটল রাখুন ও তাঁদের কল্যাণময় মুক্তি ত্বরান্বিত করুন।

দিন একই কারণে যাদের প্রেরণ করা হয়েছিল তিনি তাঁদের অন্যতম। শাইব ইবনু উসাইমিন রহ-ও একই উপসংহার ব্যক্ত করেছেন যে—যদি কারও মধ্যে কোনো সন্দেহ না থাকে, তাহলে আকিদাহর ব্যাপারে তাকলিদ জায়েজ।

আকিদাহর ক্ষেত্রে তাকলিদ জায়েজ হবার প্রমাণ :

তাকলিদ জায়েজ হবার দলিলগুলো কী কী? প্রথম দলিল হলো, আল্লাহ স্ব মানুষকে বলেছেন আহলুল ইলম বা জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের শরণাপন্ন হতে। কোনো কিছু না জানলে, আল্লাহ স্ব জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে প্রশ্ন করতে বলেছেন। আল্লাহ স্ব কুরআনে বলেছেন :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

আর আমি তোমার পূর্বে কেবল পুরুষদেরই রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছি, যাদের প্রতি আমি ওয়াহি পাঠিয়েছি। সুতরাং জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা করো, যদি তোমরা না জানো। (সূরা আন-নাহল, ৪৩)

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

তোমরা যদি না জানো তবে (অবতীর্ণ) কিতাবের জ্ঞান যাদের আছে তাদের জিজ্ঞেস করো। (সূরা আল-আন্সিয়া, ৭)

জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের জিজ্ঞেস করুন।

কী জিজ্ঞেস করবেন?

কী জিজ্ঞেস করতে হবে আল্লাহ স্ব সেটা এখানে বলে দেননি। একে আরবিতে বলা হয় হাযফ ফিল-মুতায়াল্লাক (حذف في المتعلق)। ইসলামের মৌলিক বিষয় অর্থাৎ তাওহিদ নিয়ে, নাকি সাধারণ ফিকহি বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করতে হবে সেটা আল্লাহ স্ব নির্দিষ্ট করে দেননি। সুতরাং উত্তর হলো সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ তাওহিদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে—যেমন আমরা যেসব বিষয়ে আলোচনা করছি অথবা যাকাত, হজ্জ, সালাতের আহকাম বা এ রকম ফিকহি বিষয়ে—সকল ক্ষেত্রে জ্ঞানসম্পন্নদের প্রশ্ন করতে বলা হচ্ছে। এটা হলো প্রথম দলিল।

দ্বিতীয় প্রমাণ হলো, আল্লাহ স্ব কুরআনে বলেছেন :

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

আর মুমিনদের জন্য সংগত নয় যে, তারা সকলে একসঙ্গে অভিযানে বের হবে। অতঃপর তাদের প্রতিটি দল থেকে কিছু লোক কেন বের হয় না, যাতে তারা ঘিণের গভীর জ্ঞান

আহরণ করতে পারে এবং আপন সম্প্রদায় যখন তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, তখন তাদের সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা (গুনাহ থেকে) বেঁচে থাকে। (সূরা আত-তাওবাহ, ১২২)

এর অর্থ হলো ইলমসম্পন্ন একদল মানুষকে পেছনে থেকে যেতে হবে এবং অন্যান্যরা ফিরে এলে এ দলটি তাদের সতর্ক করবে, যাতে তারা ভালো ও মন্দের ব্যাপারে অবগত হতে পারে এবং পার্থক্য জানতে পারে। অর্থাৎ একদল লোক পেছনে থেকে যাবে এবং দ্বীনের শিক্ষা দেবে। লক্ষ্য করুন, এখানে শুধু সতর্ক করার কথা বলা হয়েছে। যারা পেছনে থেকে যাবেন, তাদের মধ্য থেকে শিক্ষকরা শিক্ষা দেবেন আর অন্যরা অনুসরণ করবে। অর্থাৎ এ আয়াত অনুযায়ী সতর্ক করাই যথেষ্ট। আগের আয়াতের মতো এ আয়াতেও প্রমাণের কথা বলা হয়নি।

তৃতীয় প্রমাণ হলো, আল্লাহ ﷻ নবি মুহাম্মাদ ﷺ-কে বলেছেন :

فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يُفَرِّمُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُ مِّنَ الْمُنْتَرِينَ

সুতরাং আমি তোমার নিকট যা নাযিল করেছি, তা নিয়ে তুমি যদি সন্দেহে থাকো, তাহলে যারা তোমার পূর্ব থেকেই কিতাব পাঠ করছে তাদের জিজ্ঞাসা করো। অবশ্যই তোমার নিকট তোমার রবের পক্ষ থেকে সত্য এসেছে। সুতরাং তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হোয়ো না। (সূরা ইউনুস, ৯৪)

অর্থাৎ, হে মুহাম্মাদ ﷺ যদি আপনি সন্দেহান হন, তাহলে লোকদের জিজ্ঞেস করুন। আর আমরা জানি নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর মধ্যে কোনো সন্দেহ ছিল না। সুতরাং যেহেতু তাঁকেই প্রমাণ করতে বলা বলা হচ্ছে, সাধারণ মানুষ তাই প্রমাণ করতে ও অনুসরণ করতে পারবে।

এ সবগুলো আয়াতে শুধু প্রমাণ করার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু প্রমাণ জানতে হবে—এমন কিছু বলা হয়নি। এখানে বলা হয়নি আপনাকে প্রমাণ জানতে, মুখস্থ করতে অথবা খুঁজে বের করতে হবে।

চতুর্থ প্রমাণ হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই হাদিস :

فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ غَضَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ

সুতরাং যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর স্বীকৃতি দিলো, সে আমার থেকে তার জান-মালকে নিরাপদ করে নিল।^{১০১}

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছেন, যে ব্যক্তি বলবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ তার সম্পদ

ও রক্ত সংরক্ষিত হয়ে যাবে। যদি কেউ এগুলোর ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করে তবে আল্লাহ ﷻ তাকে পাকড়াও করবেন এবং তাকে জবাবদিহি করতে হবে। কেন এ ব্যক্তির রক্ত ও সম্পদকে সংরক্ষিত ও পবিত্র গণ্য করা হলো? কারণ, সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলেছে। রাসূলুল্লাহ কী এখানে প্রমাণসহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলার কথা বলেছেন? তিনি কেবল ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলার কথা বলেছেন। যদি প্রমাণ জানা বাধ্যতামূলক হতো, তাহলে তিনি ﷻ প্রমাণের কথা উল্লেখ করতেন এবং হাদিসে এর উল্লেখ থাকত।

পরবর্তী প্রমাণটির ওপর শাইখ ইবনু উসাইমিন ﷻ জোর দিয়েছেন। অস্ত্র এবং সাধারণ মানুষ ইজতিহাদ করতে পারে না। পরিপূর্ণভাবে দলিল অনুধাবন ও মুখস্ত করা এবং প্রেক্ষাপট অনুযায়ী সঠিকভাবে দলিলের প্রয়োগ তারা করতে পারে না। সুতরাং যখন আপনি তাদের বলবেন দলিল জানতে, আপনি তাদের এমন কিছু করতে বলছেন তা তাদের সাধ্যের বাইরে। আর আল্লাহ ﷻ কুরআনে বলেছেন :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

আল্লাহ কোনো ব্যক্তির ওপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু আরোপ করেন না। (সূরা আল-বাকারাহ, ২৮৬)

যেটা বাধ্যতামূলক এবং মূল উদ্দেশ্য তা হলো, কোনো ধরনের সন্দেহ ছাড়া দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা। সেটা দলিলের মাধ্যমে হোক বা অনুসরণের মাধ্যমে। অধিকাংশ ফুকাহা বলেছেন, সাধারণ মানুষকে আপনি ফিকহের বিষয়ে দলিল জানতে বাধ্য করতে পারেন না, কারণ এটা তাদের জন্য অত্যন্ত দুঃসাধ্য। সুতরাং আমরা আকিদাহর ব্যাপারেও তাদের দলিল জানতে বাধ্য করতে পারি না, কারণ সেটা আরও দুঃসাধ্য।

হাদিস থেকে আরও একটি প্রমাণ পাওয়া যায়।

দিমাম ইবনু সালাবাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলেন। দরজার কাছে উট বেঁধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, ‘আমি আপনার সাথে সহজ-সরল কিছু কথা বলব।’ দিমামা ছিলেন একজন বেদুইন। মানুষ হিসেবে তারা কিছুটা ভিন্ন ধাঁচের। এখানে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলার চেষ্টা করছেন যে, আমার কথা বলার ধরন একটু ভিন্ন। দিমাম প্রশ্ন করলেন, তোমাদের মধ্যে ইবনু আকিল মুত্তালিব কে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি ইবনু আকিল মুত্তালিব। দিমাম বললেন, তুমিই কি মুহাম্মাদ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমিই মুহাম্মাদ। দিমাম তখন বললেন, আমি তোমাকে সোজাসাপ্টা কিছু কথা বলব। আমি এগুলো ব্যক্তিগতভাবে নেব না, তুমিও এগুলো ব্যক্তিগতভাবে নিয়ো না।

তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহ ﷻ-এর একত্ব নিয়ে প্রশ্ন করা শুরু করলেন। জিজ্ঞেস

করলেন, তোমাকে কি আল্লাহ পাঠিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন হ্যাঁ, আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর একত্বের শিক্ষাসহ। তারপর দিমাম পাঁচটি ফরযের ব্যাপারে প্রশ্ন করলেন। আল্লাহর কসম দিয়ে দিমাম প্রশ্ন করলেন আল্লাহ কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এগুলো জানানোর জন্য পাঠিয়েছেন কি না। প্রশ্নোত্তরের পর তিনি ঈমান এনে হাত তুলে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি এসবের সাথে কিছু সংযোজন করব না, এ থেকে কিছু অপসারণও করব না। আপনি যা কিছু বললেন সবকিছু আমি বিশ্বাস করব। দেখুন, দিমাম তাওহিদ, শাহাদাহ, ফরয এবং দ্বীনের পাঁচটি স্তম্ভ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন এবং তিনি মুহাম্মাদ ﷺ-কে সত্যবাদী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তারপর কোনো সন্দেহ ছাড়া তিনি ঈমান গ্রহণ করলেন এবং চলে গেলেন।^[১৩১]

সহিহ মুসলিমের শরহতে ইমাম নাওয়াউয়ী رحمه الله এ হাদিসটি নিয়ে মন্তব্য করেছেন, ইমামরা যখন বলেন যে, সাধারণ লোকদের মধ্যে যারা তাকলিদ করে তাদের মুমিন হবার জন্য প্রমাণ জানা শর্ত না—এটা তার প্রমাণ। আন-নাওয়াউয়ী رحمه الله মু'তামিলাদের বিপরীতে বলেছেন, কোনো সন্দেহ বা দ্বিধা ছাড়া দৃঢ় বিশ্বাস থাকাই যথেষ্ট এবং এই হাদিস থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। কীভাবে এই হাদিস থেকে এর পাওয়া যায়? কারণ, দিমাম رحمه الله কোনো প্রমাণ ছাড়া ঈমান এনেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঈমান অনুমোদন করেছিলেন। তাদের কথোপকথনে প্রমাণের ব্যাপারে কোনো আলোচনা হয়নি। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়নি যে, তুমি কি এই প্রমাণটা সম্পর্কে জানো, ওই মু'জিয়া সম্পর্কে জানো? সুতরাং এটা হলো দলিল যে, ঈমান আনার জন্য প্রমাণ জানা আবশ্যিক না।

পরবর্তী প্রমাণ হলো, সাহাবি رحمه الله অনারবদের ভূখণ্ডে প্রবেশ করার পর যেসব লোক ঈমান আনল, সাহাবি رحمه الله গণ তাঁদের ঈমানের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছিলেন। বেদুইন কিংবা অনারবদের কাউকে মু'তামিলাদের কথামতো বসে বসে প্রমাণ বলতে বাধ্য করা হয়নি। কারও পরীক্ষা নেয়া হয়নি। কাউকে প্রশ্ন করা হয়নি কোন দলিলের ভিত্তিতে তুমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বললে?

এ ব্যাপারে আলিমদের কিছু বক্তব্য দেখুন।

ইমাম নাওয়াউয়ী رحمه الله বলেছেন, যে সত্যিকার ভাবে বিশ্বাস করে শাহাদাহ উচ্চারণ করবে, সে মুমিন—যদি সে মুকাল্লিদও হয়। অনেকের ক্ষেত্রেই রাসূলুল্লাহ ﷺ শাহাদাতের উচ্চারণকে যথেষ্ট মনে করেছেন এবং তাদের কাছ থেকে তাওহিদ ও আকিদাহর প্রমাণ জানতে চাননি। আর এ ব্যাপারে যে হাদিসগুলো আছে সেগুলো সহিহ এবং মুতওয়াজ্জির। এটা হলো আন-নাওয়াউয়ী رحمه الله-এর বক্তব্য।

ইবনু আকিল رحمه الله বলেছেন, দলিল জানা মূল উদ্দেশ্য না। দলিল জানা হলো দৃঢ় বিশ্বাসে পৌঁছানোর উপায়। যদি দলিল ছাড়া এটা অর্জিত হয়, তাহলে সেটাই যথেষ্ট।

আল ফাসলের চতুর্থ খণ্ডে, পৃষ্ঠা ৩৫-এর আশেপাশে ইবনু হায়ম رحمہ اللہ বলেছেন, মু'তামিলারা ছাড়া অন্য সবাই বলেছে যে, কেউ যদি অন্তরে সত্যিকারের বিশ্বাস রাখে, সেটা মুখে উচ্চারণ করে, অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলে, মুহাম্মাদ رحمہ اللہ যা কিছু নিয়ে এসেছেন তার সবকিছুর সত্যায়ন করে এবং এ ছাড়া অন্য সকল কিছুকে অস্বীকার করে, তাহলে সে একজন বিশ্বাসী—যদিও সে মুকাল্লিদ হয়। দলিল জানা এখানে কোনো পূর্বশর্ত না।

ইবনু কুদামা رحمہ اللہ উসুল নিয়ে লেখা তার বইয়ে (রাওদাতুন নাঈর) বলেছেন, মুকাল্লিদের ঈমান ঠিক আছে। রাওদাতুন নাঈর নিয়ে মন্তব্য করার সময় সমকালীন আলিমদের মধ্যে শানকিতি رحمہ اللہ এ মত গ্রহণ করেছেন। যেমনটা কিছুক্ষণ আগে বললাম—আস সাফারিনি বলেছেন, সত্য কথা হলো কেউ মুকাল্লিদের ঈমানের বৈধ হওয়াকে এড়িয়ে যেতে পারে না। এ ছাড়া শাইখ আলী আল-খুদাইর ও শাইখ ইবনু উসাইমিন رحمہ اللہ-সহ অন্যান্যরা কী বলেছেন সেটাও এরই মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় বুনিয়াদি বিষয় : ইলমের ওপর আমল করা :

চারটি বুনিয়াদি বিষয়ের দ্বিতীয়টি হলো—ইলমের ওপর আমল করা।

المسألة الثانية : العمل به

আমলের শ্রেণিবিভাগ :

এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রথমে দেখতে হবে ইসলামে কীভাবে কাজ বা আমলের শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণি হলো এমন আমল যেগুলোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে—অর্থাৎ ওয়াজিব, ফরয। তার পরের শ্রেণি হলো এমন কাজ যা করা বাধ্যতামূলক না, কিন্তু করলে তার জন্য আপনি পুরস্কৃত হবেন। এগুলো হলো সুন্নাহ, মুস্তাহাব। তার পর হলো মাকরুহ অর্থাৎ অপছন্দনীয় আমল, আর তারপর হারাম আমল।

হারাম থেকে বিরত থাকার কারণে কি মানুষ পুরস্কৃত হবে?

হারাম কাজ ও যেসব কাজ শিরক সেগুলোর ব্যাপারেও ইলমের ওপর আমল করার বিষয়টি প্রযোজ্য। এসব ব্যাপারে ইলম প্রয়োগের অর্থ হলো এগুলো ত্যাগ করা ও এগুলো থেকে দূরে থাকা। পাপ ও শিরক ত্যাগ করা ইলম অনুযায়ী আমল করার অন্তর্ভুক্ত। হারাম কাজের ক্ষেত্রে ইলম অনুযায়ী আমল করলে, অর্থাৎ শিরক ও পাপ বর্জন করলে কি ব্যক্তি পুরস্কৃত হবে? এর উত্তর দু-রকম হতে পারে। যদি সে আল্লাহ ﷻ-এর জন্য এগুলো ত্যাগ করে, তাহলে এ ক্ষেত্রে অবস্থা হলো বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত এ হাদিসের ব্যক্তির মতো—যে

ব্যক্তি কোনো পাপ কাজের কথা চিন্তা করে অথবা করার ইচ্ছা করে, যদি সে ওই পাপ কাজটি করে তাহলে একে তার আমলনামায় একটি গুনাহ হিসাবে লেখা হবে। যদি সে কেবল গুনাহর কথা চিন্তা করে ও ইচ্ছা করে—তবে সেটা লেখা হবে না। একই হাদিসের অন্য একটি বর্ণনা অনুযায়ী, আল্লাহ ﷻ-এর পক্ষ থেকে পুরস্কারের আশায় সেই পাপ কাজটি করা থেকে বিরত থাকলে সে এর জন্য পুরস্কৃত হবে।^[১১]

এটা হলো প্রথম অবস্থা। পাপ কাজ করার ইচ্ছা সত্ত্বেও আল্লাহ ﷻ-এর জন্য তা থেকে বিরত থাকলে ব্যক্তি পুরস্কৃত হবে।

আর পাপ কাজের ইচ্ছা হবার পর, অলসতা বা অক্ষমতার কারণে যদি কেউ সেই পাপ থেকে বিরত থাকে—তবে সে ক্ষেত্রে সে পুরস্কার পাবে না। যেমন : দোস্তরা তাকে নিতে না আসার কারণে সেদিন ছেলেটির বারে যাওয়া হলো না। আর তারপর সে বলল, আলহামদুলিল্লাহ, আমি তো আজকে পুরস্কার পাচ্ছি। না, এ ক্ষেত্রে সে পুরস্কার পাবে না। কারণ, পাপ কাজ থেকে সে আল্লাহ ﷻ-এর জন্য বিরত হয়নি, তার বারে যাওয়া হয়নি দোস্তরা গাড়ি নিয়ে না আসার কারণে। কেউ কোনো মেয়েকে প্রস্তাব দেয়ার পর মেয়েটি তা প্রত্যাখ্যান করল। আর তারপর সেই লোক বলল, আলহামদুলিল্লাহ, আমি যিনা করিনি তাই পুরস্কার পাব। না, সে এ ক্ষেত্রে পুরস্কার পাবে না, কারণ তার জন্য সম্ভব হচ্ছে না বলে সে যিনা থেকে বিরত থেকেছে। যদি এমন হতো যে পাপ করার সব সুযোগ তার সামনে থাকার পরও সে বলল, আমি আল্লাহ ﷻ-এর জন্য এ পাপ করা থেকে বিরত থাকলাম—তাহলে সে পুরস্কার পাবে। পাপের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ ﷻ-এর জন্য সেটা বর্জন করলে আপনি পুরস্কৃত হবেন। সুযোগ না থাকার কারণে পাপ করলেন না, এ ক্ষেত্রে আপনি কোনো পুরস্কার পাবেন না। সুতরাং ইলমের ওপর আমল করার ব্যাপারটি হারামের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

ইলম প্রয়োগের অপরিহার্যতা :

লেখক তাঁর আলোচনাতে প্রথমে ইলমের আর তারপর ইলমের ওপর আমল করার কথা এনেছেন। কারণ, ইলমের দ্বারা নিয়ত এবং কর্মপদ্ধতি বিস্তৃত হবার মাধ্যমে আমল সঠিক হয়। এখন আসুন ইলম অনুযায়ী আমল করার ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে মনোযোগ দেয়া যাক।

সালাফদের সাথে আমাদের বর্তমান যুগের মানুষদের একটা বড় পার্থক্য হলো—ইলম অনুযায়ী আমল করা।

আল্লাহ ﷻ কুরআনে বলেছেন :

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

তোমরা কি মানুষকে সংকর্ষের নির্দেশ দেবে এবং নিজদের কথা ভুলে যাবে, অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করো, তবে কি তোমরা বোঝো না? (সূরা বাকারাহ, ৪৪)

প্রশ্নের মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ এখানে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করেছেন। তোমরা মানুষকে যা করতে বলো, নিজেরা সেটা করো না? যা আপনি জানেন, প্রচার করেন—সেটা অনুযায়ী আমল না করার ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ তিরস্কার করেছেন। এ আয়াতটি নাযিল করা হয়েছিল বনি ইসরাইলের আলিমদের ব্যাপারে। তবে এ আয়াতটি প্রযোজ্য উম্মাতে মুহাম্মাদির আলিম, সাধারণ মানুষ এবং অন্যান্য সকলের ক্ষেত্রেও।

ইবনু আব্বাস র. বলেছেন, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে থেকে যারা মুসলিম হয়ে গিয়েছিল তাদের মদীনার ইহুদিরা ইসলামের ওপর থাকতে বলত। অর্থাৎ মুহাম্মাদ ﷺ-এর শিক্ষার ওপর থাকতে বলত, কারণ তিনি সত্য বলছেন। কিন্তু তারা নিজেরা ঈমান আনতো না। যা প্রচার করত সেটা অনুযায়ী তারা আমল করত না। তাই তাদের ব্যাপারে এই আয়াত নাযিল হয়।

ইবনু জারির আত-তাবারি র. বলেছেন, বনি ইসরাইলের আলিমরা সাধারণ ইহুদিদের বলত আল্লাহ ﷻ-এর আদেশ মেনে চলতে ও সং কাজ করতে। কিন্তু নিজেরা পাপ করত। এ আয়াত তাদের জন্য তিরস্কার। কিন্তু এখানে কেন তিরস্কার করা হচ্ছে? ভালো কাজ করতে বলার কারণে কিন্তু তাদের তিরস্কার করা হচ্ছে না। তিরস্কার করা হচ্ছে, কারণ তারা নিজেরা ভালো কাজ করত না। বিষয়টি লক্ষ করুন, আমি চাই না কেউ ভাবুক যে, তালিবুল ইলমদের দায়িত্ব অনেক বেশি, তাদের অনেক সতর্ক থাকতে হয়, এর চেয়ে বরং অস্ত্র থাকা সোজা আর নিরাপদ। তাই আমি ইলম শেখাই বন্ধ করে দেবো।

এ ব্যাপারে সঠিক মত হলো, সং কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করা, আর নিজের বেলায় এর বাস্তবায়ন—এ দুটো আলাদা জিনিস। সং কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ হলো এক দিক, আর নিজের বেলায় এর বাস্তবায়ন হলো আরেকটি আলাদা দিক। দুটো করাই বাধ্যতামূলক। তাই কোনো একটি ছুটে গেলে অন্যটি ছেড়ে দেয়া যাবে না। এ ক্ষেত্রে আরেকটি মত থাকলেও এটাই হলো সঠিক মত। সং কাজের আদেশ ও অসং কাজে নিষেধ করা আমাদের দায়িত্ব। আবার আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে এবং কাছের মানুষদের মধ্যে এর বাস্তবায়নও আমাদের দায়িত্ব। কোনো কারণে একটির ক্ষেত্রে কমতি হলে, অন্যটি বন্ধ করে দেয়া যাবে না। যদিও অনেকে বলেছেন, কেউ নিজে কোনো গুনাহতে লিপ্ত থাকলে তার উচিত না অন্যদের সেই গুনাহ করতে মানা করা। কিন্তু দুটি মতের মধ্যে এ মতটি দুর্বল।

আমরা যে আয়াতটির কথা বললাম, মূলত এখানে বলা হচ্ছে—তোমরা সং কাজের আদেশ করছ, এটা সঠিক। কাজেই তোমরা নিজেরাও এ উপদেশের অনুসরণ করো। এখানে বলা হচ্ছে না যে, যদি নিজে না করো তাহলে সেটা বলাও বন্ধ করো। বরং বলা হচ্ছে—তোমরা সত্য বলছ, নিজেরাও সেই সত্যের অনুসরণ করো। মানুষকে যে মন্দ থেকে বেঁচে থাকতে

বলছ নিজেস্বাও সেগুলে থেকে বিমত হও। নিজেদের সংশোধন করার কাজও করো। সং কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করার কারণে এখানে তিরস্কার করা হচ্ছে না। বরং বলা হচ্ছে যা বলছ, যা শেখাচ্ছ নিজেও সেটার অনুসরণ করো।

সূরা হুদে আমরা পাচ্ছি যে শু 'আইব বলছেন :

وَمَا أَرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنَّ أَرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

'যে কাজ থেকে আমি তোমাদের নিষেধ করছি, তোমাদের বিরোধিতা করে সে কাজটি আমি করতে চাই না। আমি আমার সাধ্যমতো সংশোধন চাই। আল্লাহর সহায়তা ছাড়া আমার কোনো তাওফিক নেই। আমি তাঁরই ওপর তাওয়াক্কুল করেছি এবং তাঁরই কাছে ফিরে যাই।' (সূরা হুদ, ৮৮)

যে ব্যক্তির আমল তার ইলমের সাথে মেলে না :

বুখারি ও মুসলিমে একটি হাদিস আছে, হাদিসটি মনোযোগ দিয়ে শুনুন। উসামা বিন যাইদ বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ বলছেন,

يَجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيلْقَىٰ فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَثْنَابُهُ فِي النَّارِ فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ أَيْ فُلَانٌ مَا سَأَلْنَاكَ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ أَمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ

(ভাবানুবাদ) একজন ব্যক্তিকে এনে জাহান্নামে রাখা হবে। আরেক বর্ণনাতে আছে, এই ব্যক্তি হলো জাহান্নামে প্রবেশ করানো প্রথম ব্যক্তি। জাহান্নামের আগুনের ভেতর চক্রাকারে সে ঘুরতে থাকবে। যেভাবে গাধা বা গরু ঘানি টানতে থাকে। তার চারপাশে জাহান্নামের বাসিন্দারা এসে জড়ো হবে আর বলবে, হে অমুক, হে শাইখ, হে আলিম-আপনিই না আমাদের সং কাজের আদেশ আর অসং কাজে নিষেধ করতেন? আমাদের সামনে সুন্দর খুতবা দিতেন, টিডি চ্যানেলে আসতেন আর বলতেন কী কী করা উচিত? আপনি না টুইট করতেন, ফেইসবুক স্ট্যাটাস দিতেন, আপনার বিভিন্ন ভিডিও না আমরা ইউটিউবে দেখতাম? আপনিই না আমাদের শেখাতেন কী করা উচিত আর কী বর্জন করা উচিত? আপনি এখানে কী করছেন?

এ ব্যক্তিকে জাহান্নামে দেখতে পেয়ে জাহান্নামের বাসিন্দারা অবাক হবে, বিস্মিত হবে। কারণ, দুনিয়াতে সে ছিল একজন শাইখ, একজন আলিম। তারা অবাক হবে কারণ এই ব্যক্তিকে

দুনিয়াতে ধার্মিক, দীনদার ও ন্যায়পরায়ণ মনে করা হতো। প্রশ্নের জবাবে স্নেহকটি বলবে, আমি অন্যদের সং কাজের আদেশ দিতাম কিন্তু নিজে করতাম না। অন্যদের অসং কাজে নিষেধ করতাম কিন্তু নিজে বিমত থাকতাম না।^(১১)

সহিহ তারখিব ওয়াত তারখিবে লেখক বলেছেন, এ হলো এমন এক ব্যক্তি যার আমল তার ইলমের সাথে মিলত না। সে তার ইলমের ওপর আমল করত না।

ব্যক্তি তার ইলমের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে :

তিরমিযি ও দারিমিতে একটি সহিহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে :

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عَمَلِهِ فِيمَا أَمَّنَهُ وَعَنْ عَلَيْهِ مَا فَعَلَ بِهِ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَثَرٍ أَكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ

চারটি বিষয়ে প্রশ্নের জবাব দেয়া ছাড়া কিয়ামতের দিন কেউ এক পা-ও অগ্রসর হতে পারবে না। যে বিষয়টির ব্যাপারে সে প্রথমে জিজ্ঞাসিত হবে তা হলো কীভাবে সে তার জীবন কাটিয়েছে। দ্বিতীয় প্রশ্ন হবে তার ইলমের ব্যাপারে। সে কি অর্জিত জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছে ও জ্ঞান অনুযায়ী আমল করেছে? বিশেষ করে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করার ব্যাপারে মানুষকে প্রশ্ন করা হবে। তৃতীয় প্রশ্ন হবে তার সম্পদ নিয়ে। কীভাবে সে সম্পদ অর্জন করেছে এবং কীভাবে খরচ করেছে। চতুর্থ প্রশ্ন হবে কীভাবে সে তার যৌবন কাটিয়েছে।^(১২)

এই চারটি বিষয়ে প্রশ্নের জবাব দেয়া ছাড়া কেউ এক পা-ও অগ্রসর হতে পারবে না। আমরা এখানে হাদিসটি উল্লেখ করলাম কারণ এ হাদিস থেকে জানা যাচ্ছে যে, বিচারের দিনে অর্জিত জ্ঞানের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে। অর্জিত জ্ঞানের ওপর আমল করা হয়েছে কি না—এ প্রশ্নের উত্তর দিতেই হবে। ইলম মস্তিষ্কে মজুদ করে রাখার জিনিস না। ইলম হলো আমলের জন্য।

ব্যক্তি নিজে যা করে না, তা বলা :

তাবারানির মু'জামুল কাবিরে একটি হাদিস আছে, মুনিযিরি ﷺ হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

مَثَلُ الْعَالِمِ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ كَمَثَلِ السِّرَاجِ يُضِيءُ لِلنَّاسِ وَيُخْرِقُ نَفْسَهُ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ইলমসম্পন্ন ব্যক্তি অপরকে শিক্ষা দেয় কিন্তু নিজে সেই ইলম বাস্তবায়ন করতে ভুলে যায়, তার অবস্থা হলো মোমবাতি বা প্রদীপের মতো। সে অন্যকে

আলো দেয়, কিন্তু নিজে স্বলে যায়।^[১০০]

এটা হলো নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর দেয়া উদাহরণ। মুসনাদে আহমাদ, সহিহ আত-তারখিব ওয়াত তারখিব, ইবনু হিব্বান এবং আল-বায়হাকিতে বর্ণিত একটি হাদিসে আছে :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى قَوْمٍ تُفَرِّضُ شِفَاهَهُمْ بِتَقَارِيضٍ مِنْ نَارٍ قَالَ قُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ قَالُوا خُطَبَاءُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا كَانُوا يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ

ইসরা ওয়াল মি'রাজের রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন কিছু লোককে দেখলেন যাদের ঠোঁট ও জিহ্বাগুলো আগুনের ছুরি দিয়ে কাটা হচ্ছিল। প্রতিবার কাটার পর এগুলো আবার আগের অবস্থায় ফেরত যাচ্ছিল। আবার সেগুলো কাটা হচ্ছিল। এভাবে চলতে থাকছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশে ছিলেন জিবরিল ؑ। রাসূলুল্লাহ প্রশ্ন করলেন, জিবরিল, এরা কারা? কেন তারা এভাবে কষ্ট পাচ্ছে? জিবরিল ؑ জবাব দিলেন, এরা হলো আপনার উম্মাহর বক্তারা। তারা যা বলত, নিজেরা তা করত না।^[১০১]

অনুপকারী ইলম :

সহিহ মুসলিমে এসেছে রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ ﷻ-এর কাছে আশ্রয় চেয়ে দুআ করতেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَتَّعِبُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا

হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাইছি অনুপকারী ইলম থেকে, আল্লাহর ভয়হীন অন্তর থেকে, অতৃপ্ত নফস থেকে এবং এমন দুআ থেকে যার উত্তর দেয়া হয় না।^[১০২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছেন, 'আমি অনুপকারী জ্ঞান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই।'

যদি এই পুরো আলোচনা থেকে একটি মাত্র জিনিস মনে রাখেন, তাহলে এই হাদিসটি মনে রাখুন। আল্লাহর কসম! সত্যিকারভাবে এ হাদিসের অর্থ অনুধাবন করলে আপনি নিদারুণ মনোবেদনা অনুভব করবেন। তীর অন্তর্খালায় ভুগবেন যদি আপনি আসলেই হাদিসের মর্ম উপলব্ধি করতে পারেন। একটু নিজের সাথে সং হয়ে প্রশ্ন করুন, আমরা কয়জন এ দুআ করি?

৬৮ তারারানি, মু'জামুল কাবির: ১৬৮১

৬৯ মুসনাদু আহমাদ: ১২২৩২; মুসনাদু আবু ইয়াল্লা: ৩৯৯৬

৭০ সহিহ মুসলিম: ৭০৮১

যারা এ হালাকাগুলোতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করে, আমি তাদের উত্তমদের মধ্যে উত্তম মনে করি, ইন শা আল্লাহ। আমরা এখানে এমন জ্ঞানের কথা আলোচনা করি যা দুনিয়াবি প্রাপ্তির জন্য না। এখানে অর্থের লেনদেন হয় না, আমরা জনপ্রিয়তা কিংবা কোনো প্রতিযোগিতার খাতিরে এগুলাে করি না। মেয়েদের সাথে কথা বলতে বা বিপরীত লিঙ্গের কারও সাথে মেলামেশা করতে কেউ এখানে আসে না। আল ওয়ালা ওয়াল বারার ক্ষেত্রে চরম পর্যায়ের ক্রটি নিয়ে আজ অনেকে প্রেমের ফিকহ বা এ-জাতীয় নামের আড়ালে নারী-পুরুষের মিলন-সংক্রান্ত কৌতুক শোনায, কিন্তু এখানে সেটা হয় না। কেউ এখানে এসবের জন্য আসে না।

এখানে তাঁরাই আসে যারা নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর অনুসারী এবং অন্য সব রাসূল আলাইহিস সালামের মানহাজ অনুযায়ী তাওহিদের হেদায়তের ওপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠা। আর তাঁরাই হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর বাহক। এমন মানুষেরাই উম্মাহকে পুনর্জীবিত করে, উম্মাহকে টেনে তোলে পরাজয় ও অন্ধকারের গহ্বর থেকে এবং স্বভাবতই এমন মানুষেরা পূর্ববর্তী ও রাসূল আলাইহিস সালামের মতো পরীক্ষিত হন। এটাই তাওহিদ, এটাই ইসলাম। হয় এভাবে গ্রহণ করবে, অন্যথায় তুমি যেতে পারো। এভাবেই আমরা তাওহিদের শিক্ষা দিই।

কাজেই ইন শা আল্লাহ আপনারা হলেন ওইসব হাতে গোনা মানুষদের অন্তর্ভুক্ত যারা গুরুত্বের সাথে এই দ্বীন ও তাওহিদ শেখো। অথচ হাতেগোনা এ কয়েকজনের মধ্যেই বা ক'জন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ দুআ করেন? 'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি এমন জ্ঞান থেকে যা উপকারে আসে না?' আমি জানি যারা এখানে আমাদের সাথে ক্লাস করেন এবং যারা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ক্লাসগুলো দেখেন তাদের অনেকেই উদ্দেশ্য হলো ইলমসম্পন্ন হওয়া। তাদের অনেকে দুআ করেন এবং বলেন :

'হে আমার রব, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।' (সূরা আত-ত্বাহা, ১১৪)

কিন্তু আমরা কয়জন অনুপকারী জ্ঞান থেকে আল্লাহ ﷻ-এর কাছে আশ্রয় চাই? নিজের সাথে সং হয়ে জবাব দিন। অনুপকারী ইলম বলতে ওই ইলমকে বোঝানো হয় যা প্রয়োগ করা হয় না। আমার ভয় হয়, যদি আমরা এ নিয়ে একটি জরিপ করি, তাহলে সঁটার ফলাফল আমাদের হতাশ করবে। আসুন নিজেদের প্রতি সং হয়ে এ প্রশ্নের জবাব দিই। শেষ কবে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে, আল্লাহ ﷻ-এর সামনে বৃষ্টিভেজা কম্পমান পাখির মতো আমরা দুআ করেছি, ভিক্ষা চেয়েছি-আল্লাহ ﷻ যেন আমাদের এমন ইলম থেকে হেফাযত করেন, যা উপকারে আসে না?

এটাই হলো খালাফদের সাথে সেই সালাফদের পার্থক্য যারা উম্মাহর ইতিহাস গড়েছেন। এটাই পরবর্তীদের সাথে পূর্ববর্তীদের পার্থক্য। উম্মাহকে টেনে তোলার জন্য যে কারিকুলাম দরকার সেটা আমাদের সামনে আছে। নতুন কিছু প্রয়োজন আমাদের নেই। তথাকথিত মুফাক্কিরদের ও চিন্তাবিদদের লম্বা লম্বা কথার আমাদের প্রয়োজন নেই, ওইসব লোকদের প্রয়োজন নেই যারা ইসলামকে বদলে দিতে চায়। উম্মাহর পুনর্জাগরণের কারিকুলাম আমাদের

সামনেই আছে। দিকনির্দেশনা আমাদের কাছেই আছে এবং এটা অপরিবর্তিতভাবে আমাদের সামনে আছে চৌদ্দ শ বছরের বেশি সময় ধরে। সমস্যা হলো প্রয়োগে, বাস্তবায়নে।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দুআ করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সফল হয়েছিল সাহাবি রাসূলুল্লাহ ﷺ-দের ইলমের প্রয়োগ করাতে। কাগজে ছাপানো যেসব আয়াত ও হাদিস আমরা পড়ি, সাহাবি রাসূলুল্লাহ ﷺ-দের অন্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ সেগুলো গেঁথে দিয়েছিলেন। এই ইলমকে তিনি এমন এক দিকনির্দেশনায় পরিণত করেছিলেন যার ওপর সাহাবি রাসূলুল্লাহ ﷺ-গণ আমল করেছিলেন এবং এটি তাঁদের জন্য একটি সম্পূর্ণ জীবনব্যবস্থায় পরিণত হয়েছিল। এটাই হলো তাদের সাফল্যের রহস্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ কীভাবে বিশ্বস্ত, মরুভূমির বুকে পরস্পর যুদ্ধরত, ধ্বংসাত্মক (anarchists) বেদুইনদের পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে সফল জাতিতে পরিণত করেছিলেন? প্রায় চোখের পলকে, বিদ্যুৎ চমকের মতো এ জাতি সুপার পাওয়ারে পরিণত হয়েছিল। ইতিহাসে এমন নজির আর নেই। কীভাবে? এই সেই গোপন চাবিকাঠি।

১৩ বছর ধরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বাস্তব ছিলেন সাহাবি রাসূলুল্লাহ ﷺ-দের অন্তরে এই তাওহিদ ও আকিদাহ গেঁথে দেয়ার কাজে। কাগজ, সিডি, ইউটিউব কিংবা ইন্টারনেটে না, তিনি তাঁদের অন্তরে এই ইলম বসিয়ে দিচ্ছিলেন। সবচেয়ে প্রাথমিক পর্যায়ের তালিবুল ইলমের কাছেও আজ যত বই থাকে, উম্মাহকে পুনরুজ্জীবিত করা অনেক আলিমের কাছে এত বই ছিল না। যেমন : মাকতাবাতুশ শামিলাহ নামে একটা সফটওয়্যার আছে, ডাউনলোড করা যায়। এতে হাজার হাজার খণ্ড বই আছে। যদিও আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে এখনো এটা তেমন একটা দেখার সুযোগ পাইনি। যে ইলম পূর্ববর্তীদের ছিল সেটা আজ আমাদের হাতের কাছে। এই ইলমের বিন্যাস, পরিমাণ, ইচ্ছেমতো কাগজে কিংবা সিডিতে নিতে পারা, ইচ্ছেমতো এর মধ্য থেকে যেকোনো একটা তথ্য খুঁজে বের করতে পারা—সব মিলিয়ে যেদিক থেকেই দেখুন না কেন ইতিহাসবিখ্যাত আলিমদের চেয়েও বেশি ইলম এখন আমাদের হাতের নাগালে।

কুরআনে আল্লাহ ﷻ ইয়াকুব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যাপারে বলেছেন :

وَأَنَّا لَدُوْهُ عِلْمٍ لَّنَا وَعَلَّمْنَا ۚ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ

আর সে ছিল জ্ঞানী, কারণ আমি তাকে শিখিয়েছিলাম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।
(সূরা ইউসুফ, ৬৮)

কাতাদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এ আয়াতের অর্থ হলো তাঁকে জ্ঞান প্রয়োগ করার সক্ষমতা দান করা হয়েছিল। আমরা যা শিখিয়েছিলাম সেটা প্রয়োগ করার যোগ্যতা তাঁকে দেয়া হয়েছিল।

سئل سفيان الثوري: طلب العلم أحب إليك يا أبا عبد الله أو العمل. فقال : إنما يراد العلم

للعمل، لا تدع طلب العلم للعمل، ولا تدع العمل لطلب العلم

সুফিয়ান আস-সাওরি رحمته-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনি কি ইলম অর্জন করতে পছন্দ করেন নাকি অর্জিত ইলম প্রয়োগ করতে? জবাবে তিনি বলেছিলেন, ইলম তো অন্বেষণ করা হয় আমলের জন্য। তাই কখনো আমল করার জন্য ইলম অর্জন ছেড়ে দিয়ে না, আর ইলম অর্জনের জন্য আমল করা ছেড়ে দিয়ে না।^[১১]

সুফিয়ান আস-সাওরি رحمته এখানে কী বলতে চাচ্ছেন? মূলত তিনি বলছেন, ইলম ও ইলমের প্রয়োগ পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। একটিকে অপরটি থেকে আলাদা করা যায় না।

ইমাম আহমাদ رحمته তাঁর ছাত্রদের একবার বলেছিলেন, কোনো হাদিসের ওপর আমল করার আগে আমি সেটা বর্ণনা করিনি। একবার একটি হাদিসে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু তীবার কাছে হিজামা করানোর জন্য গিয়েছিলেন এবং এ জন্য তাকে এক দিনার দিয়েছিলেন। তারপর আমিও একজনের কাছে গিয়ে হিজামা করলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ যা দাম দিয়েছিলেন সেই দামই দিলাম, যাতে করে আমি হুবহু সূন্যাহর অনুসরণ করতে পারি। ইমাম আহমাদ رحمته এখানে বলছেন, এমন কোনো হাদিস তিনি বর্ণনা করেননি যেটার ওপর তিনি আগে আমল করেননি! মুসনাদু আহমাদে প্রায় ৪০ হাজার হাদিস আছে। আর ১০ লক্ষেরও বেশি তাঁর হাদিস মুখস্থ ছিল। তিনি এ সবগুলোর ওপর আমল করেছিলেন? এটা কি আদৌ সত্য হতে পারে? নিশ্চয় ইমাম আহমাদ رحمته কখনো এমন দাবি করবেন না যা তিনি করেননি। ইব্রাহীম আল-হারবি رحمته বলেছেন, আমি ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল رحمته-এর সাথে ছিলাম। আমি ছিলাম তার সাথি। বিশ বছর ধরে, শীত-গ্রীষ্ম, দিন-রাতনির্বিশেষে আমি এমন কোনো দিন পাইনি যেই দিন ইমাম আহমাদ رحمته বিগত দিনের চেয়ে বেশি আমল করেননি। বিশ বছর ধরে দিন-রাত, প্রতিদিন তিনি আগের দিনের চেয়ে বেশি আমল করছিলেন, ইলমের প্রয়োগ করছিলেন।

ইলমমুখী হবার পর অর্জিত ইলমের প্রভাব সালাফদের মধ্যে প্রকাশ পেত। সেই ইলম প্রকাশ পেত তাঁদের নম্রতা, বিনয়, কথা ও আমলের মধ্য দিয়ে। এভাবে ইলম তাঁদের প্রভাবিত করত। অথচ আজ এমন অনেক তালিবুল ইলম হবার দাবিদার আছে যারা কিছুদিন আগেও বারে ছিল, আর এখন উম্মাহর মহিক্‌হদের বিরুদ্ধে তারা মুখের লাগাম খুলে দেয়। এমন সব মানুষদের আক্রমণ করে আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর বেদমতে যাদের জুতাতে লেগে থাকা ধুলোর সমানও তারা হতে পারবে না। কিছুদিন আগে তুমি বারে সময় কাটাতে, এখন হঠাৎ অলিবুল ইলম হয়ে তুমি মহিক্‌হদের খণ্ডন করা শুরু করে দিয়েছ? এখানে আমি শুধু বাতিল মুরজিআদের কথা বলছি না। বরং ওইসব লোকদের কথাও বলছি যারা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় মর্ডানিস্টদের সাথে এক হয়ে তাওহিদের সত্যিকারের অনুসারীদের বিরুদ্ধে কথা

বলে। দুই দিন আগে যে রূপ করত সে এখন উম্মাহর মহিরুহদের কথা খণ্ডন করতে চায়। বার ও ক্লাবে সময় কাটানো লোক এখন আলিম আর যারা তাদের জীবন ও সম্পদ আল্লাহ ﷻ-এর রাস্তায় উজাড় করে দিয়েছেন ও দিচ্ছেন তাঁদের আক্রমণ করে, অপবাদ দেয়—তাদের বিধাক্ত গোশত চাবায়। কেন?

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ

পূর্ববর্তীরা এমন মানুষ ছিলেন যে ইলম অর্জন করার শুরু করামাত্র সেটা তাদের মধ্যে প্রকাশ পেত। তাদের খুশু, বিনয়, নম্রতা, কথা ও কাজের মাঝে সেটা প্রকাশ পেত। আদবের ব্যাপারে না জানার কারণে কি কারও মধ্যে আদব ও ভদ্রতার অভাব হয়? আপনি কি মনে করেন, এমন লোকেরা তাদের সীমালঙ্ঘন, হাতের কামাই আর অপবাদের বাস্তবতা সম্পর্কে জানে না? তারা জানে। কিন্তু এটা হলো অনুপকারী জ্ঞানের ফসল। নইলে কেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার দুআতে এ ব্যাপারে জোর দেবেন?

এমন অনেকে আছে যা তিরের বেগে আল ওয়ালা ওয়ালা বারার বই পড়ে শেষ করে ফেলে। ধারালো তিরের মতো ঢুকে বের হয়ে যায়, কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত জীবনে এর কোনো বাস্তবায়ন থাকে না। ইলম লা ইয়ানফা—এমন ইলম যা উপকারে আসে না।

আল জামি লি আহকামিল কুরআনে একটি বর্ণনা আছে। আবু উসমান আল-হায়মীরি নামে একজন আলিম হালাকা শুরু করার জন্য দসলেন। ভূমিকাস্বরূপ কিছু কথা বলার পর নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। চুপ করে আছেন তো আছেন। একসময় আবুল আব্বাস প্রশ্ন করলেন, শাইখ কী হয়েছে? হালাকা কখন শুরু হবে? শাইখ তাঁর মাথা তুলে কাঁদতে শুরু করলেন আর বললেন,

وَعَبَّرْتُ نَفْسِي بِأَمْرِ النَّاسِ بِالتَّقِي طَبِيبٌ يُدَاوِي وَالطَّبِيبُ مَرِيضٌ

একজন তাকওয়াবিহীন লোক (এখানে তিনি নিজেকে বোঝাচ্ছেন), মানুষকে তাকওয়ার আদেশ দিচ্ছে। যেন একজন ডাক্তার চিকিৎসা দিচ্ছে, অথচ সে নিজেই রোগী।^{১৭৭}

উপস্থিত সবাই কাঁদতে শুরু করল। ইলমের ওপর আমল করা, অর্জিত ইলম প্রয়োগ করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তারা জানতেন।

বিখ্যাত কবি আবুল আসওয়াদ আদ-দুআলির এ ব্যাপারে একটি কবিতা আছে,

يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ الْمُعَلِّمُ غَيْرُهُ هَلَّا لِيَتَفَسِكَ كَانَ ذَا التَّعْلِيمِ

হে অন্যকে শিক্ষা প্রদানে নিয়োজিত ব্যক্তি, তোমার কি উচিত না নিজেকে শিক্ষা দেয়া?

فَأَبْدَأُ بِنَفْسِكَ فَأَنْهَاهَا عَنْ غِيَّهَا فَإِذَا انْتَهَتْ عَنْهُ فَأَنْتَ حَكِيمٌ

নিজেকে দিয়ে শুরু করো, তাকে বিরত করো, যদি নিজেকে বিরত করায় সফল হও তাহলেই তুমি প্রজ্ঞাবান।

فَهُنَاكَ يَقْبَلُ مَا تَقُولُ وَيَقْتَدِي بِالْقَوْلِ مِنْكَ وَيَنْفَعُ التَّعْلِيمُ

আর তখন তোমার কথা গৃহীত হবে, তা অনুসৃত হবে এবং তোমার দেয়া শিক্ষা উপকারী হবে।

لَا تَنْهَ عَنْ خُلُقِي وَتَأْتِي مِثْلَهُ عَارُ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيمٌ

যে কাজে তুমি অন্যকে মানা করো, কেন নিজে তা-ই করো? শিক তোমার জন্য, যদি এমন করো।^{১৩০}

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ

হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাইছি অনুপকারী ইলম থেকে।

এ দুআর অর্থ এখন বুঝতে পেরেছেন? কথার ফুলঝুরি আর ইলম আজ সহজলভ্য, কিন্তু ইলম অনুযায়ী আমল দুর্লভ। এসব বলে আমি আপনাদের ইলম অর্জন করা থেকে ভয় দেখিয়ে দূরে সরিয়ে দিতে চাইছি না। বরং এর মাধ্যমে আপনাদের অনুপ্রাণিত করতে চাইছি অর্জিত ইলমের ওপর আমল করার জন্য। মানুষকে যে কাজ থেকে বিরত থাকতে বলছেন, নিজেও তা থেকে বিরত হোন। মানুষকে যে কাজ করতে বলছেন, নিজেও সেটা করুন।

অপ্রয়োজনীয় ইলম :

ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম যে বিষয়টি মনে রাখতে হবে তা হলো, ইলম অর্জনের উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহ ﷻ-এর ইবাদত করা। আশ-শাতিবি রাঃ বলেছেন, ‘যে ইলম আমলের ক্ষেত্রে কোনো উপকারী ভূমিকা রাখে না, সেই ইলম প্রশংসনীয় হবার পক্ষে শারীয়াহ থেকে কিছু পাওয়া যায় না।

সব সময় মনে রাখবেন আমল দুই ধরনের—বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ। কিছু কিছু মানুষ অন্তরের আমলকে আমলই মনে করে না, আসলে এ-ও কিন্তু আমল। ঈমান হলো অন্তরের একটি আমল, যা ইলমের ফলস্বরূপ উৎসারিত হয়। ইলমের ওপর আমল অভ্যন্তরীণ কিংবা বাহ্যিক, দুভাবেই হতে পারে। যেনন : আল্লাহ ﷻ-এর নাম, সত্তা ও সিফাত সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে আমরা কী পাই? আসলে এতে অনেক উপকার আছে, যার মধ্যে আছে একটি অন্তরের আমলও—সত্য, সুদৃঢ় ও মজবুত ঈমান (তাসদিক)। ইলম অর্জনের আরও একটি উদ্দেশ্য হলো, বাহ্যিক আমল। আমরা সবাই এ বিষয়ে জানি তাই বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন এখানে নেই। সালাত, যিকির, হজ, ওযু, তাহারাতি ইত্যাদি বাহ্যিক আমলের কিছু উদাহরণ।

ইলম ও আমলের পার্থক্য :

ইলম ও আমল সম্পূর্ণ আলাদা দুটো বিষয়। এগুলো আলাদা বলেই আপনার ইলম আছে মানেই যে আপনি আমলদার, ব্যাপারটা এমন না।

পরিব্র কুরআনে আল্লাহ ﷻ বলেন :

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ

يَعْلَمُونَ

‘আমি যাদের কিতাব দান করেছি, তারা তাকে এমনভাবে চেনে, যেমন চেনে আপন পুত্র ও সন্তানদের। আর নিশ্চয়ই তাদের একটি সম্প্রদায় জেনেশুনে সত্যকে গোপন করে (অর্থাৎ তাওরাত ও ইঞ্জিলে বর্ণিত মুহাম্মাদ ﷺ-এর গুণাবলিসমূহ অস্বীকার করে)।’ (সূরা আল-বাকারাহ, ১৪৬)

এই আয়াতে আল্লাহ ﷻ ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের কথা বলছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তারা আল্লাহ ﷻ-এর প্রেরিত রাসূল হিসেবে চিনতে পেরেছিল। আল্লাহ ﷻ স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, যে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যাপারে তারা জানত। তাদের ইলম ছিল। কিন্তু তারা কি ইলমের ওপর আমল করেছিল? না, ইলম থাকা সত্ত্বেও তারা এর ওপর আমল করেনি। এ থেকেই বোঝা যায় যে, ইলম ও আমল আসলে দুটো ভিন্ন জিনিস। ইলম থাকা সত্ত্বেও অনেকে হয়তো এর ওপর আমল না-ও করতে পারে। ইলম ও আমলের এই ভিন্নতার বিষয়টি আমাদের সবারই তাই মাথায় রাখতে হবে।

সূরা আল-বাকারাহর এ আয়াতে যেমন ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের ইলমের অধিকারী হবার ব্যাপারটি জানানো হয়েছে, তেমনিভাবে কুরআনের অন্যান্য আয়াতে ইলমের ওপর আমল না করার কারণে তাদের কঠোরভাবে তিরস্কারও করা হয়েছে। ইলম থাকা সত্ত্বেও একে আমলে পরিণত না করা একটি নেতিবাচক দিক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। মোদ্দাকথা হলো, ইলম ও আমল ভিন্ন; বইয়ের পাতা, মেমরি কার্ড কিংবা স্মৃতিতে মজুদ হবার জন্য ইসলাম আসেনি, ইসলাম এসেছে আমলের জন্য।

ইলম নাযিলের উদ্দেশ্য আমল :

কুরআনে আল্লাহ ﷻ বলেন :

الرَّ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

‘আলিফ-লাম-রা (এগুলো কুরআনের মুজিযাসমূহের একটি এবং একমাত্র আল্লাহ ﷻ এর অর্থ জানেন); এটি এমন এক গ্রন্থ, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষদের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন, পরাক্রান্ত ও প্রশংসার যোগ্য সেই পালনকর্তার দিকে তাঁরই নির্দেশে।’ (সূরা ইব্রাহীম, ১)

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহ বলছেন, আমি আপনার ওপর কিতাব নাযিল করেছি। কেন আল্লাহ এই কিতাব নাযিল করলেন? যেন এর সাহায্যে আপনি মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে

আলোর দিকে নিয়ে আসতে পারেন। যাতে মানবজাতিকে আপনার অন্ধকার থেকে মুক্ত করতে পারেন এই কিতাবের ওপর আমল করার মাধ্যমে।

আল্লাহ ﷻ আরও বলেন :

الرَّ كِتَابٌ أُخْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۝ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ

‘আলিফ, লা-ম, রা; এটি এমন এক কিতাব, যার আয়াতসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত ও বিশদভাবে বর্ণিত, এক মহাজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ সত্তার পক্ষ হতে। (বলো), যেন তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত না করো। নিশ্চয়ই আমি (মুহাম্মাদ ﷺ) তোমাদের প্রতি তাঁর পক্ষ হতে একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা।’ (সূরা হুদ, ১-২)

এখানে প্রথম আয়াতে আল্লাহ ﷻ বলছেন, এ কিতাব নাযিল করা হয়েছে বিশদ বর্ণনাসহ। কেন বিশদ বর্ণনাসহ এ কিতাব নাযিল করা হলো? ঠিক পরের আয়াতটি লক্ষ করুন। আল্লাহ ﷻ বলছেন :

‘যেন তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত না করো।’

এখানে ইবাদত অর্থাৎ আমলের কথা বলা হয়েছে। এই কিতাব নাযিলের উদ্দেশ্য হলো যেন এর ওপর আমল করা হয়। কীভাবে এই কিতাবের ওপর আমল করবেন? এক আল্লাহ ﷻ-এর ইবাদতের মাধ্যমে।

আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

‘(হে মুহাম্মাদ) আমি আপনার পূর্বে এমন কোনো রাসূল পাঠাইনি, যাকে এ কথা বলিনি যে, আমি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই; সুতরাং তোমরা সবাই আমারই ইবাদত করো।’ (সূরা আল-আশ্বিয়া, ২৫)

অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ, আমি আপনার আগে যে রাসূলই পাঠিয়েছি, তাকে এ কথাই জানিয়েছি যে, মানুষকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ শিক্ষা দাও। লক্ষ করুন, আয়াতের একেবারে শেষাংশে কী বলা হয়েছে,

فَاعْبُدُونِ

ইবাদত করো

অর্থাৎ প্রত্যেক রাসূলকে দলিলসহ, ওয়াহিসহ পাঠানো হয়েছিল এবং তাঁরা তা প্রচার করেছিলেন যাতে করে সবাই আল্লাহ ﷻ-এর ইবাদত করে।

আল্লাহ ﷻ বলেন :

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

‘নিশ্চয়ই (হে মুহাম্মাদ) আমি আপনার প্রতি সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানুষের মধ্যে ফয়সালা করেন, যা আল্লাহ আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করান। আপনি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষ থেকে বিতর্ককারী হবেন না।’ (সূরা আন-নিসা, ১০৫)

আল্লাহ বলছেন, হে মুহাম্মাদ, আমি আপনার ওপর কিতাব নাযিল করেছি,

‘যাতে আপনি মানুষের মধ্যে ফয়সালা করেন, যা আল্লাহ ﷻ আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করান।’

এ কিতাব নাযিল করা হয়েছে যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ ﷻ-এর নির্ধারিত শরীয়াহ অনুযায়ী মানুষের মাঝে বিচার-ফয়সালা করেন। এই আয়াতের অনুরূপ আরেকটি আয়াত হলো :

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ

‘নিশ্চয়ই (হে মুহাম্মাদ) আমি আপনার প্রতি এই কিতাব যথার্থরূপে নাযিল করেছি। অতএব আপনি নিষ্ঠার সাথে এক আল্লাহর ইবাদত করুন।’ (সূরা আয-যুমার, ২)

আগের আয়াতে বলা হয়েছিল,

لِتَحْكُمَ

অর্থাৎ, এর ওপর আমল করুন মানুষের মাঝে বিচার-ফয়সালা করার মাধ্যমে।

আর এই আয়াতে বলা হচ্ছে,

فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ

অর্থাৎ, নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ ﷻ-এর আদেশ পালনের মাধ্যমে এর ওপর আমল করুন, ইবাদত করুন।

সূতরাং আল্লাহ ﷻ-এর পক্ষ থেকে, ইলম নাযিল করা হয়েছে তা বাস্তবায়নের জন্য। ইলম অনুযায়ী আমলের জন্য। আর যে ইলম আমলের ক্ষেত্রে উপকারী ভূমিকা রাখে না, শারীয়াহতে তা অপ্রশংসনীয়।

ইলমের ওপর আমল না করার পরিণাম :

ইলম যদি দেহ হয় তবে আমল হলো তার অন্তরাষ্ট্র। আমল ছাড়া ইলম প্রাণহীন মৃতদেহের মতো। যে ব্যক্তি ইলম অনুযায়ী আমল করে না, সে যেন ইতোমধ্যেই মৃতদেহে

পরিণত হয়েছে। এ ধরনের ইলম ব্যক্তির বিরুদ্ধে একদিন সাক্ষ্য দেবে। মালিক ইবনু দিনার রাঃ বলেন, অর্জিত ইলমের ওপর আমল না করলে মসৃণ পাথরের ওপর গড়িয়ে পড়া পানির মতো ইলম তার অন্তর থেকে ধুয়ে যায়। কখনো ঝরনা দেখে থাকলে দেখবেন ঝরনার নিচের পাথর থেকে ক্রমাগত পানি ঝরে পড়ছে। যে ব্যক্তি ইলম অনুযায়ী আমল করে না, ইলম এভাবেই তার কাছ থেকে ঝরে পড়ে। এমন কত ইলমওয়াল্লা আছেন যারা মানুষকে আল্লাহ স্বঃ-এর কথা স্মরণ করিয়ে দিলেও নিজেরাই এ ব্যাপারে গাফেল? তাকওয়া (আল্লাহ স্বঃ-এর ভয়) বাণী প্রচারকারীদের মধ্যে এমন কতজন আছেন যারা নিজেরাই তাকওয়াহীন ও বেপরোয়া? মানুষকে আল্লাহ স্বঃ-এর নৈকট্য অর্জনের দিকে ডাকা কতজনই তো নিজেরাই আল্লাহ স্বঃ-এর কাছ থেকে সবচেয়ে দূরে। মনে রাখবেন, সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে আল্লাহ স্বঃ-এর সামনে সাক্ষ্য দেবে তাদের হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ স্বঃ বলেছেন :

النُّيُومُ نَحْنُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَنُكَلِّمُنَا أَيْدِيَهُمْ وَنَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

‘আজ আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দেবো, তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।’ (সূরা ইয়াসিন, ৬৫)

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ স্বঃ বলেছেন :

وَقَالُوا لَوْلَا دِهِم لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهَ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ

‘তারা তাদের ত্বকে বলবে, তোমরা আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলে কেন? তারা বলবে, যে আল্লাহ সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি আমাদেরও বাকশক্তি দিয়েছেন।...’ (সূরা ফুসসিলাত, ২১)

মানুষ আল্লাহ স্বঃ-কে বলবে, আমি সাক্ষী উপস্থিত করতে চাই। আল্লাহ স্বঃ বলবেন, নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে কি তুমি সাক্ষী হিসেবে মেনে নেবে? সে বলবে, হ্যাঁ। তখন নিজ দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে থাকবে। সে বলবে, কেন তোমরা আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ, আমি তো তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণের চেষ্টা করতাম?

কিন্তু যাদের ইলম আছে তাদের অবস্থা হবে আরও ভয়াবহ। আলিম ও দাঈদের বেলায় অতিরিক্ত সাক্ষী হিসেবে যুক্ত হবে তাদের শেখা প্রতিটি আয়াত ও হাদিস। সহিহ মুসলিমে আছে, রাসূলুল্লাহ স্বঃ বলেছেন,

وَالْفَرَّانُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ

কুরআন তোমাদের পক্ষে বা বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে।^[১৭]

আপনার শেখা হাদিস কিংবা আয়াতগুলো কি আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে নাকি বিপক্ষে? এগুলো কি আপনার নাজাতের কারণ হবে নাকি আপনাকে জাহান্নামে পৌঁছে দেবে? আপনার ইলম কি আপনার শাস্তি বা আযাবের কারণ হবে? মানুষের শেখা হাদিস ও আয়াত কিয়ামতের দিন তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে—এ কথা শুনলে কার না ভয় লাগে!

ইমাম ইবনুল কাইয়িম رحمہ اللہ বলেন,

لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله سبحانه وتعالى أحبار أهل الكتاب، ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم المنافقين

‘আমল ছাড়া ইলম যদি কল্যাণময় হতো, তবে আল্লাহ ﷻ আহলুল কিতাবের (ইহুদি ও খ্রিষ্টান) ধর্মযাজকদের ভৎসনা করতেন না। আর যদি সত্যতা ও নিষ্ঠা ছাড়াই কোনো আমল কারও জন্য উপকারে আসত, তবে আল্লাহ ﷻ মুনাফিকদের নিন্দা ও ভয় প্রদর্শন করতেন না।’^[১৭]

আমল ছাড়া ইলম হলো মধুবিহীন মৌচাকের মতো। ইলম হলো সম্পদ। বাস্তব জ্ঞানসম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তি জানে, সম্পদ থেকে লাভবান হবার উপায় হলো তা খরচ বা বিনিয়োগ করা। জমিয়ে রাখা টাকা থেকে কেউ কোনো উপকার পায় না। ইলমের ব্যাপারটাও একই রকম। ইলম ঠিক ততটুকু আপনার কাজে দেবে, যতটুকু আমল আপনি করবেন। আপনি ব্যয়-ই না করেন, তাহলে মজুদ করে রাখা সম্পদের মূল্য কী? ইলমের বেলাতেও তা-ই। আয-যুহরি رحمہ اللہ বলেছেন, ওই আলিমের কথা গ্রহণ করবে না, যে নিজে যা বলে তার ওপর আমল করে না। আর ওই ব্যক্তির কথাও শুনো না, যে ইলম ছাড়া কথা বলে (অর্থাৎ এমন কোনো অজ্ঞ ব্যক্তি, যে হয়তো কখনো কখনো সত্য বলে কিংবা ভালো কাজ করে)। যে ইলম কোনো সুফল বয়ে আনে না, অন্তর ও আমলের ওপর কোনো প্রভাব ফেলে না, সেই ইলম একদিন আপনার বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দেবে।

জবাবদিহিতার ভয়ে ইলম অন্বেষণ পরিত্যাগ করা অনুচিত :

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্পষ্ট করা দরকার। অনেকে ভাবেন, এই তাওহিদের দারস আসলে আমার জন্য না। আমি যত বেশি জ্ঞান অর্জন করব, ততই তা আমার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে; তার চেয়ে আমি বরং বাদ দিই, আর না আগাই।

ওপরের আলোচনাগুলো পড়ার সময় অনেকের মাথায় হয়তো এমন চিন্তা এসেছে।

এ ব্যাপারে প্রথম কথা হলো, নির্দিষ্ট পরিমাণ ইলম অর্জন করা ফারযুল আইন। প্রত্যেককে ফারযুল আইন ইলম অর্জন করতে হবে, নইলে সে গুনাহগার হবে। আর আমরা এখানে

মূলত এমনসব বিষয় নিয়েই কথা বলব, যেগুলো জানা আপনাদের জন্য ফরয। যেমন, লেখক বলেছেন :

إِغْلَمْ رَحِمَكُ اللهُ، أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا تَعْلُمُ أَرْبَعِ مَسَائِلٍ

‘অবগত হোন—আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন। চারটি বিষয়ে জানা আমাদের জন্য আবশ্যিক।’

এ বিষয়গুলো নিয়ে ইতোমধ্যে আমরা আলোচনা করেছি। মুসলিম উম্মাহ অজ্ঞতার এমন এক স্তরে পৌঁছেছে যে, আজ আমরা মনে করছি, আমাদের আলোচ্য এ বিষয়গুলো নিয়ে জানাটা হলো বাড়তি অর্জন। বিশেষ কোনো কৃতিত্বের ব্যাপার। কিন্তু বাস্তবতা হলো এগুলো জানা আমাদের কর্তব্য, না জানলে বরং আমরা গুনাহগার হব।

এবার ফারযুল আইন না, এমন ইলমের আলোচনায় আসা যাক। অনেকে হয়তো ভাবেন, তাওহিদের এই দারসগুলো থেকে তারা কেবল ফরয অংশটুকু শিখে ক্ষান্ত দেবেন। এর উত্তরে কেবল একটি কথাই বলব, আপনারা তালিবুল ইলম হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পরিবারের জন্য বরাদ্দ সময় থেকে মূল্যবান কিছু সময় বের করে ইলম অর্জনের পেছনে ব্যয় করছেন; অনেকের অগ্রগতি হচ্ছে, অনেকে অতটা এগোতে পারছেন না কিন্তু চেষ্টা করছেন—এতকিছু কেন করছেন? মূলত জামাতের সর্বোচ্চ স্তর পাওয়াটাই তো উদ্দেশ্য, তাই না? সিদ্দিকিনের স্তরে পৌঁছানোর অন্যতম মাধ্যম হলো ইলম। একজন আলিম আর একজন শহিদদের মধ্যে কে উত্তম—এ নিয়ে বড় বড় অনেক আলিম আলোচনা করেছেন। অবাক হবেন না। ইবনু মাসউদ রাঃ, ইবনুল মুবারাক রাঃ—সহ আরও অনেকে এ ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন। আলিম ও শহিদের মধ্যে কে বেশি জ্ঞানী তা নিয়ে ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাঃ তাঁর *মিকতাহ দারিস সায়াদাহ* গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই মুহূর্তে আমি সেই আলোচনায় যেতে চাচ্ছি না। বর্তমানে উম্মাহর বুকের মাত্রার কথা বিবেচনায় আমার মনে হয় এ নিয়ে এখানে আলোচনা না করাই ভালো, কারণ এ থেকে বিতর্কের সূত্রপাত হতে পারে। তবে এমন একটি প্রশ্ন নিয়ে যে আদৌ আলোচনা করা হচ্ছে, এটাই আখিরাতে আলিমদের উচ্চ মর্যাদার প্রমাণ। তারপরও কি আপনি ইলম অর্জন বন্ধ করে দেবেন—কারণ কিছু মূর্খ বলে, ‘কিছু না জানাই বরং ভালো!’ এই মূর্খদের কথা শুনে আপনি জ্ঞানার্জন বাদ দিয়ে দেবেন? এটা তো একেবারেই অযৌক্তিক!

কাজেই, প্রথমত আমরা এখানে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছি তার অধিকাংশ ফরয ইলমের মধ্যে পড়ে। দ্বিতীয়ত এখানে ফারযুল আইন ইলমের বাইরে কিছু থেকে থাকলে সেটাও আপনার জানা উচিত, কারণ আপনি-আমি, আমরা সবাই জামাতের সর্বোচ্চ স্তরে, জামাতুল ফিরদাউসে পৌঁছাতে চাই। এটাই তো আমাদের লক্ষ্য। দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলো (তাওহিদ ও এর বাইরে অন্যান্য ফারযুল আইন ইলমের বিষয়সমূহ) নিয়ে অধ্যয়নের মাধ্যমে ব্যক্তি জামাতের পথে এক ধাপ অগ্রসর হয়। হয়তো এর ফলে সে স্থান করে নিতে পারে জামাতের

প্রাথমিক স্তরে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সর্বোচ্চ জাম্নাতে—জাম্নাতুল ফিরদাউসে—যাবার আশা রাখতে শিখিয়েছেন। আল্লাহ ﷻ যাকে ইলম থেকে বঞ্চিত করেন, অজ্ঞতা তাকে লাক্ষিত করে; আল্লাহ ﷻ-এর পক্ষ থেকে এটি একটি শাস্তি। ইলম তার দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াবার পরও মুখ ফিরিয়ে নেয়া ব্যক্তির শাস্তির চেয়েও এই শাস্তি গুরুতর। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট অবস্থা হলো ওই ব্যক্তির, যাকে ইলম দান করা হয়েছে কিন্তু সে ওই ইলমের ওপর আমল করে না।

এ ছাড়া ফারযুল আইনের বাড়তি ইলম কেবল জাম্নাতুল ফিরদাউস লাভের পাথেয়ই না; বরং দুনিয়াতেও এর বহু ফায়দা আছে। এই ইলম দুনিয়ার জীবনেও পরম প্রশান্তি ও বারাকাহর কারণ হতে পারে। ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ রহিমুল্লাহ এ দুনিয়াতে ছিলেন নিঃস্ব। তিনি এমন সময়ও পার করেছেন যখন তাঁর পরনের জন্য ছিল কেবল একটি জামা। তাঁর রাতগুলো কাটত মাসজিদুল আমাওয়িতে। তাঁর জীবনের লম্বা একটি অংশ কেটেছে কারাগারে যাওয়া-আসার মধ্যে। অথচ এ মানুষটিই বলতেন, ‘আমাদের অন্তর বিভিন্ন পর্যায়ে মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে। আমি যা অনুভব করছি জাম্নাতিরাও যদি তা অনুভব করত তবে নিজেদের সত্যিকারের সৌভাগ্যবান মনে করত।’ অথচ বাস্তবিকভাবে, পার্থিব বিচারে তাঁর জীবন ছিল দুঃখ-কষ্টে পরিপূর্ণ। তিনি আরও বলতেন, ‘জাম্নাতিদের জীবন যদি আমার এই জীবনের মতো সুখের হয়, তবে তো এমন জীবনই উত্তম, আমি তো এর-ই প্রত্যাশা করি।’ দুনিয়ার জীবনে যার বলার মতো কিছুই ছিল না এমন একজন মানুষ এ কথা বলছেন। তিনি বলছেন—যে ব্যক্তি দুনিয়ার জাম্নাতে প্রবেশ করেনি, সে কখনো পরকালীন জাম্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না।

আবার সালাফদের কেউ কেউ বলতেন যে, হৃদয়ের এ প্রশান্তির কথা যদি রাজা, বাদশাহ ও শাসকরা জানত, তাহলে তা ছিনিয়ে নেবার জন্য আমাদের সাথে যুদ্ধ করত।

অথচ তাঁদের অধিকাংশেরই জীবন কেটেছে কারাগার, পরীক্ষা আর নানা ধরনের জটিলতায়। কী সেই জিনিস যা পার্থিব বিচারে নিঃস্ব এই মানুষগুলোর অন্তরে এমন প্রশান্তি ঢেলে দিয়েছিল? তাঁরা আল্লাহ ﷻ-এর দেয়া ইলমের ওপর আমল করেছিলেন, আর এটাই তাঁদের জীবনে এনে দিয়েছিল সর্বোচ্চ প্রশান্তি। এটাই হলো ইলম অর্জনের ওই ফসল যা দুনিয়াতেই পাওয়া যায়, আর পুরস্কার হিসেবে পরকালে জাম্নাত তো আছেই ইন শা আল্লাহ। কাজেই আমরা কেউ-ই এ কথা বলতে পারি না যে, ইলম আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে পারে তাই আমি আর ইলম অর্জন করব না।

আমরা কি জাম্নাতুল ফিরদাউস চাই না? আমরা দুনিয়ার জীবনে প্রশান্তি চাই না? এগুলো তো ইলম অর্জনের মাধ্যমেই সম্ভব।

ইলমসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য বিচারের মাপকাঠি ভিন্ন :

নিঃসন্দেহে আপনার ইলম যত বেশি হবে, ইলমের প্রয়োগ, অর্থাৎ আমলও তত বেশি হতে হবে। কারণ, সাধারণের মাপকাঠিতে দুনিয়া কিংবা আখিরাতে, আপনাকে বিচার

করা হবে না। আমাদের ধর্মে পুরোহিতত্ব নেই। কে জামাতের কোন স্তরে যাবে, তা নির্ধারিত হবে ব্যক্তির ইলম ও আমল দ্বারা। আপনার ইলম ও আমল নির্ধারণ করে দেবে আপনি জামাতের কোন স্তরে থাকবেন। একদিকে যেমন ইলম ও আমলের কারণে আপনি অধিক মর্যাদা পাবেন, তেমনি গুনাহের জন্য আপনার শাস্তির মাত্রাও হবে সাধারণের চেয়ে কঠিন।

আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَلَوْلَا أَنْ تَبْتَئِنَّكَ لَفَظْتَ كَذْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ○ إِذَا لَدَفْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا

‘আমি আপনাকে দৃঢ়পদ না রাখলে আপনি তাদের প্রতি কিছুটা ঝুঁকেই পড়তেন। তখন আমি অবশ্যই আপনাকে ইহজীবনে ও পরকালীন জীবনে দ্বিগুণ শাস্তি আদায়ন করাতাম। এ সময় আপনি আমার মোকাবিলায় কোনোই সাহায্যকারী পেতেন না।’ (সূরা আল-ইসরা, ৭৪-৭৫)

রাসূল ﷺ-কে আল্লাহ ﷻ বলছেন, আমি আপনাকে দৃঢ়পদ না রাখলে আপনি তাদের প্রতি কিছুটা হলেও ঝুঁকে পড়তেন। আল-কুশাইরি, আশ-শানকিতি ﷺ-সহ অন্যান্যদের মত হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের প্রতি ঝুঁকে যাননি; কেননা আল্লাহ এখানে ‘যদি’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

দেখুন তারপর আল্লাহ ﷻ কী বলছেন :

‘তখন আমি অবশ্যই আপনাকে ইহজীবনে ও পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তি আদায়ন করাতাম। এ সময় আপনি আমার মোকাবিলায় কোনো সাহায্যকারী পেতেন না।’

এ কথাগুলো কাকে বলা হচ্ছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে। রাসূলুল্লাহ কাকিরদের প্রতি ঝুঁকে পড়েননি, তবুও কেন আল্লাহ তাঁর প্রিয় মুহাম্মাদ ﷺ-কে এ কথা বলেছেন? কেন আল্লাহ ﷻ সেই ব্যক্তির জন্য দ্বিগুণ শাস্তির কথা বলছেন যিনি দুনিয়ার বুকে চলা সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ—যিনি সমগ্র মানবজাতি ও মানবতার মাঝে সর্বোত্তম? এই আয়াতের আলোচনায় ইবনু আব্বাস ﷺ বলেছেন, তিনি যদি ঝুঁকে পড়তেন (যদিও তিনি তা করেননি), তাহলে তাঁকে এ দুনিয়াতে এবং আখিরাতে দ্বিগুণ পরিমাণ শাস্তি পেতে হতো।

কেন আল্লাহ তাঁর হুদীবকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়ার কথা বলছেন? আন-নাসাফি ﷺ বলেন, তিনি মহান সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী, তাই কোনো দোষের ক্ষেত্রে তার শাস্তির মাত্রাও অত্যন্ত তীব্র। দুনিয়াতে এবং আখিরাতে। পরকালীন জীবনে রাসূলুল্লাহ ﷺ আল-ওয়াসিলাহর মালিক যার মর্যাদা জামাতুল ফিরদাউসের চেয়েও বেশি। এটি জামাতের সর্বাধিক মর্যাদার স্থান। কিন্তু এর দাম চড়া। একইভাবে রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর সহধর্মিণী, উম্মুহাতুল মুমিনিন ﷺ, দৃঢ়পদ ও যৈরশীলা নাস্তিদের প্রতিও আল্লাহ ﷻ অনুরূপ কথা বলেছেন। একবার এক

ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রসন্ন করেছিল, তিনি কাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন, উত্তরে তিনি বলেছিলেন, আ'ইশা। কিন্তু আ'ইশা ﷺ-সহ সকল উম্মাহাতুল মুমিনিনকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى
الْوَعْدِ

‘হে নবিপত্নীগণ, তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকাশ্য অশ্লীল কাজ করলে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে। এটা আল্লাহর জন্য সহজ।’ (সূরা আল-আহযাব, ৩০)

তাদের বেলায় শাস্তি দ্বিগুণ হবার কারণ কী? পরের আয়াতেই আল্লাহ ﷻ বলছেন :

وَمَن يَفْعَلْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وِتْعَةً صَالِحًا تُؤْتِنَهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا

‘তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হবে এবং সংকল্প করবে, আমি তাকে দুবার পুরস্কার দেবো এবং তার জন্য আমি রিয়কান কারিমা (সম্মানজনক রিয়ক) প্রস্তুত করে রেখেছি।’ (সূরা আল-আহযাব, ৩১)

অর্থাৎ নবি-পত্নীরা বিশেষ মর্যাদার অধিকারিণী। তাঁদের জন্য যেমন দ্বিগুণ পুরস্কারের ব্যবস্থা, তেমনি গুনাহর ক্ষেত্রে তাঁদের শাস্তিও দ্বিগুণ।

দেখুন, আল্লাহ ﷻ তাঁর প্রিয় রাসূল ﷺ-কে, তাঁর হাবিবকে বলছেন, আপনি যদি কুফরার ও জালিমদের প্রতি ঝুঁকে পড়তেন তবে আপনাকে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়স্থানেই দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হতো। তারপর রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ-এর স্ত্রীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন, প্রকাশ্য অশ্লীল কাজ করলে তোমাদের দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে।

কাজেই যারা তালিবুল ইলম তাদের হিসেবটাও বাকি দশজনের মতো না। একজন তালিবুল ইলম যদি ইলমের ওপর আমল না করেন, তবে সাধারণ মানুষের তুলনায় তাকে বেশি শাস্তি ভোগ করতে হবে। গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়লে আপনাকে চড়া মূল্য দিতে হবে। আপনারা অন্যদের মতো নন, আর এ কারণে আল্লাহ ﷻ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীদের বলেছেন :

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ

‘...তোমরা অন্য নারীদের মতো নও।’ (সূরা আল-আহযাব, ৩২)

অপনারা তালিবুল ইলম, অন্য সাধারণ মানুষদের মতো নন। আপনাদের সম্মান ও মর্যাদা যেমন বেশি, আপনাদের শাস্তিও তেমন কঠিন। ইবনু মাসউদ ؓ আহলুল কুরআনের (কুরআন-শিক্ষার্থী) জন্য কী মানদণ্ড নির্ধারণ করেছিলেন দেখুন। তিনি বলেছেন, তাঁদের অবশ্যই দিনে সাওম ও রাতে তাহাজ্জুদ আদায় করতে হবে; যখন সবাই সময় কাটাতে

আনন্দে, তখন আল্লাহ ﷻ-এর স্মরণে তাঁরা স্মৃতি থাকবে। অন্যরা যখন অনর্থক কথায় লিপ্ত, তাঁরা তখন নিশ্চুপ থাকবেন; তাঁরা চিংকার-চৈচামেটি ও উচ্চৈঃস্বরে কথা বলবেন না, সব সময় তাঁদের খুশি বজায় রাখতে হবে। কুরআন-শিক্ষার্থীদের জন্য ইবনু মাসউদ রহীম-এর এই মানদণ্ড নির্ধারণের কারণ কী? কারণ, তাঁরা হলেন বিশিষ্ট ব্যক্তি, দুনিয়ার বুকে জীবন্ত কুরআন। কুরআন-শিক্ষার্থীরা কুরআনের ধারক, তাঁরাই কুরআনকে উচ্চে তুলে ধরেন। আর তাই তাঁদের জন্য মাপকাঠিও এমন উঁচু। অন্যরা অপ্রয়োজনীয় কথা বলতে পারে এবং খুব সম্ভবত তাতে কোনো গুনাহও নেই (নিছক বেহুদা কথা বললেই গুনাহ হয়েছে বলা যাবে না), কিন্তু তালিবুল ইলমদের অবস্থান অন্যদের মতো না। আর এ কারণেই সালাফদের আলিমগণের অবস্থান এত উঁচুতে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে—সকাল, সন্ধ্যা, রাত, সপ্তাহ, মাস ও বছরজুড়ে, অন্তরে ও বাহ্যিকভাবে, প্রতিটি ক্ষেত্রে, আল্লাহ ﷻ ও মাখলুকের সাথে মুয়ামালাতে—তাঁরা নিজেদের ইলমের ওপর আমল করেছেন।

এতক্ষণ আমরা যা আলোচনা করলাম, এই পুরো ব্যাপারটি নিয়ে আল-খাতীব আল-বাগদাদি রহীম-এর লেখা একটি ছোট পুস্তিকা রয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, শাইখ আলবানি রহীম এ কিতাবের হাদিসগুলো তাহকিক করেছেন। আল-খাতীব আল-বাগদাদি রহীম বলেছেন, 'ইহুদিদের কাছে ইলম ছিল কিন্তু তারা ইলম অনুযায়ী আমল করত না। আর খ্রিষ্টানরা ইলম ছাড়াই আমল করত; এ কারণে প্রথম দলটি অভিশপ্ত এবং দ্বিতীয় দলটি পথভ্রষ্ট হয়েছে।' ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ রহীম বলেন, 'এই উম্মাহর মাঝে যারা অজ্ঞতার কারণে পথভ্রষ্ট হয়, তারা খ্রিষ্টানদের সাথে সাদৃশ্য রাখে আর ইলমের ওপর আমল না করার কারণে আলিমদের মধ্যে থেকে যারা বিপথগামী হয়, তারা ইহুদিদের সাথে সাদৃশ্য রাখে।'

নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন, ইলমকে অন্তরে স্থায়ীভাবে গোঁথে নেয়ার উপায় হলো এর ওপর আমল করা। কোনো কিছু মুখস্থ করতে কিংবা মনে রাখতে সমস্যা হলে কোনোভাবে সেই ইলমের ওপর আমল করার উপায় খুঁজে বের করুন। ইন শা আল্লাহ, তাহলে আপনি সেটা কখনোই ভুলবেন না।

ইলমের ওপর আমলের উদাহরণ :

ইলমের ওপর আমলের ব্যাপারে সালাফগণ অত্যন্ত একনিষ্ঠ ছিলেন। বুঝারিতে সালাম ইবনু আবদিল্লাহ ইবনু উমার ইবনুল খাত্তাব রহীম তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হে আবদুল্লাহ তোমার জীবন কতই-না বারাকাহপূর্ণ হতো, যদি তুমি রাতের সালাত আদায় করতে। রাসূলুল্লাহ ﷺ কিয়ামুল লাইল আদায়ের জন্য আবদুল্লাহ ইবনু উমার রহীম-কে উৎসাহিত করেছিলেন। সালাম (ইবনু উমার রহীম-এর পুত্র) বলেন, এরপর থেকে আমার পিতা খুব অল্পই ঘুমাতে।^[১০]

সহিহ মুসলিমে আছে, ফাতিমা রাঃ ও আলী রাঃ যখন খাদিম চেয়েছিলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ তাঁদের ৩৩ বার করে সুবহান আল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ ও আল্লাহ আকবার বলা শিখিয়ে দিলেন।^[১১] পরে আলী রাঃ বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ এ কথা বলার পর থেকে আজ পর্যন্ত এক দিনও আমি এর ওপর আমল করা বাদ দিইনি। কেউ একজন প্রশ্ন করল, সিয়ফিনের সময়ও কি আপনি এর ওপর আমল করেছিলেন? সিয়ফিনের যুদ্ধে ৭০ হাজার মুসলিম নিহত হয়েছিল। এর মধ্যে প্রায় ২৫ হাজার সৈন্য ছিল আলী রাঃ-এর বাহিনীর। আলী রাঃ বললেন, সিয়ফিনের রাতগুলোতেও। এমন ভয়ানক যুদ্ধের রাতগুলোতেও তিনি এই আমল চালিয়ে গেছেন। দেখুন, ইলমের ওপর আমল করাকে তাঁরা কতটা গুরুত্ব দিতেন।

সহিহ মুসলিমে আছে, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, কোনো মুসলিমের কোনো ওসিয়াত থাকলে, সে যেন অবশ্যই তা লিখে রাখে এবং তা বালিশের নিচে রেখে ঘুমায়।^[১২] ইবনু উমার রাঃ বলেছেন, এ কথা জানার পর থেকে আমি বালিশের নিচে ওসিয়াতনামা রাখা ছাড়া একটি রাতও পার করিনি। একই রকম আরেকটি উদাহরণ পাওয়া যায় সুনানু নাসায়ির একটি হাদিসে। যদিও ইবনুল জাওযী রাঃ এবং অন্যান্যরা একে যইফ বলেছেন, কিন্তু সঠিক মত হলো হাদিসটি সহিহ। আবু উমামাহ রাঃ বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন, প্রত্যেক সালাতের পর যে ব্যক্তি আয়াতুল কুরসি পাঠ করবে, তার জান্নাতে প্রবেশের পথে মৃত্যু ছাড়া আর কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই।^[১৩] অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই আমল করবে সে মৃত্যুর সাথে সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে। ইবনুল কাইয়িম রাঃ বলেছেন, ‘আমার শাইখ ইবনু তাইমিয়াহ রাঃ কোনো অবস্থাতেই সালাতের পর এই আমলটি বাদ দিতেন না।’

আবদুল্লাহ ইবনু উমার রাঃ-এর এই ঘটনাটি শুনুন। বর্ণনাটি এসেছে সহিহ বুখারিতে। রাসূলুল্লাহ সঃ জানতে পারলেন যে আবদুল্লাহ ইবনু উমার রাঃ প্রতিদিন সাওম পালন করছেন। তখন রাসূলুল্লাহ সঃ তাঁকে পরামর্শ দিলেন প্রতিমাসে তিন দিন সাওম থাকার। আবদুল্লাহ ইবনু উমার রাঃ-কে বললেন, আবদুল্লাহ, মাসে তিন দিন সাওম রাখো। আবদুল্লাহ ইবনু উমার রাঃ বললেন, আমি এর চেয়ে বেশি রাখতে সক্ষম। রাসূলুল্লাহ সঃ তখন বললেন, সপ্তাহে তিন দিন রাখো। আবদুল্লাহ ইবনু উমার রাঃ আবারও বললেন, আমি এর চেয়েও বেশি রাখতে সক্ষম। রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন, তাহলে দুদিন পরপর একদিন সাওম রাখো। আবদুল্লাহ ইবনু উমার রাঃ এবারও বললেন, আমি এর চেয়েও বেশি রাখতে সক্ষম। তখন রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন, তবে দাউদ রাঃ-এর মতো একদিন পরপর সাওম রাখো। এটি বুখারি বর্ণনা।^[১৪] কিন্তু হাদিসের পরের অংশে এসেছে :

يَا لَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৭৭ সহিহ মুসলিম : ৭০৯৪

৭৮ সহিহ মুসলিম : ৪২৯৪

৭৯ নাসায়ি, সুনানুল কুবরা : ৯৯২৮

৮০ সহিহুল বুখারি : (ডাবানুবাদ) ১৯৭৫

অর্থাৎ, বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হবার পর আবদুল্লাহ ইবনু উমার রাঃ বলতেন—রাসূলুল্লাহ সঃ আমাকে শ্রুত যে যা বলেছিলেন (অর্থাৎ মাসে তিন দিন সাওম পালন), আমি যদি তা-ই করতাম!

এই বক্তব্যের দিকে লক্ষ করুন। আবদুল্লাহ ইবনু উমার রাঃ আফসোস করে বলছেন, হায়! আমি যদি রাসূলুল্লাহ সঃ-এর কথামতো সবচেয়ে সহজ আমলটি বেছে নিতাম! আমি যদি মাসে তিন দিন, সপ্তাহে তিন দিন কিংবা দুদিন পরপর একদিন সাওম পালনকে বেছে নিতাম!

তিনি কেন এ কথা বললেন? এ কথা বলার পেছনে কী কারণ থাকতে পারে? এটা কি তাঁর ওপর ফরয করা হয়েছিল? না। যখন এ আমল তাঁর জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে গেল তিনি কেন এই অতিরিক্ত নফল সাওম ছেড়ে দিলেন না? কেন তিনি আফসোস করে বললেন, হায়! আমি যদি আমার জন্য রাসূলুল্লাহ সঃ-এর বাছাইকৃত সবচেয়ে সহজ আমলটি বেছে নিতাম! যদি তিনি বলতেন, আমি আর সাওম রাখব না। সারা জীবন অনেক সাওম রেখেছি, এখন আমি বৃদ্ধ, তাই এ থেকে বিরতি নিচ্ছি—তবে এতে তো কোনো সমস্যা ছিল না। অথবা তিনি যদি বলতেন, আমি এখন থেকে দাউদ খঃ-এর মতো সাওম রাখার বদলে মাসে তিন দিন সাওম রাখব, তাতেও সমস্যার কিছু ছিল না। কিন্তু তাঁরা এমন মানুষ ছিলেন যারা সুমাহর ওপর আমল করার প্রতিজ্ঞা করলে সেটাকে ফরযতুল্য মনে করতেন। মৃত্যুপর্যন্ত সেই আমল বহাল রাখতেন। এ কারণেই আবদুল্লাহ ইবনু উমার রাঃ এমন কথা বলেছিলেন। এভাবে তাঁরা ইলমের ওপর আমল করতেন।

সুফিয়ান আস-সাওরি রাঃ বলেন,

إِنَّمَا يُتَعَلَّمُ الْعِلْمُ لِيَتَّقَى اللَّهَ بِهِ ، وَإِنَّمَا فَضِّلَ الْعِلْمُ عَلَى غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ يُتَّقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ

‘ইলম শেখার উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া (আল্লাহভীতি) অর্জন করা। এ কারণেই ইলম ও আলিমের মর্যাদা বেশি এবং তাঁদের জন্য মাপকাঠি অন্য দশজনের চেয়ে আলাদা। কেননা, আলিমগণ আল্লাহ সঃ-কে বেশি ভয় করেন।’^[১১]

ইবনু আব্বাস রাঃ বলেছেন, সবাই ভালো কথা বলে, সে-ই সৌভাগ্যবান যার আমল তাঁর ইলমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যার আমল তার কথার সাথে মেলে না, সে আসলে নিজেই নিজেকে তিরস্কার করছে। আল-কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ রাঃ-এর সূত্রে মালিক রাঃ বর্ণনা করেছেন, আমি এমন মানুষ দেখেছি যারা কথার চেয়ে ইলমের প্রয়োগের বেশি কদর করতেন। এ সবকিছুর অন্তর্নিহিত শিক্ষা হলো—ইলম হলো আমলের জন্য।

এ কথাটি সব সময় মনে রাখবেন।

ওলামায়ে সু :

ওলামায়ে সু সম্পর্কে জানা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, ইলম অর্জনের উদ্দেশ্য হলো একে আমল রূপান্তরিত করা এবং নিজের জীবনে প্রয়োগ করা।

ওলামায়ে সু কারা?

এই ব্যাপারে আশ-শাতিবী رحمته একটি মূলনীতির কথা বলেছেন,

فإن علماء السوء هم الذين لا يعملون بما يعلمون

ওলামায়ে সু হলো সেইসব আলিম, যারা নিজেদের ইলমের ওপর আমল করে না।^[১২]

ইবনুল কাইয়্যিম رحمته তাঁর বই আল ফাওয়াইদে একটি উপমা দিয়েছেন। ওলামায়ে সু হলো এমন ব্যক্তি যারা জালাতের দরজায় দাঁড়িয়ে মানুষকে ভেতরে ঢোকার আহ্বান করে। তাদের মুখের কথা মানুষকে জালাতের দিকে ডাকে, কিন্তু তাদের কার্যকলাপ হলো সম্পূর্ণ বিপরীত। মানুষকে তারা যত বেশি জালাতের দিকে ডাকে, ততই তাদের আচরণে প্রতীয়মান হয় যে— 'আমাদের কথা গ্রহণ কোরো না। কারণ, সত্যবাদী হলে আমরা নিজেরাই প্রথমে এ কথাগুলো নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করতাম।' এসব ওলামায়ে সু-কে দেখে পথপ্রদর্শক মনে হলেও আসলে এরা ডাকাতির মতো। আল্লাহ ﷻ আমাদের এদের হাত থেকে রক্ষা করুন। ধরুন আপনি রাস্তায় গাড়ি করে যাবার সময় কারও কাছে একটি ঠিকানা জানতে চাইলেন। সে সঠিক পথের বদলে আপনাকে ভুল পথ দেখিয়ে দিলো যাতে করে সে আপনাকে লুট করতে পারে। এটাই হলো ওলামায়ে সু-দের অবস্থা।

আমাদের শিক্ষা দেয়ার জন্য আল্লাহ কুরআনে বিভিন্ন উপমা ও উদাহরণ এনেছেন। এসব উদাহরণের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট যেসব ব্যক্তির কথা এসেছে, যাদের দৃষ্টান্ত থেকে আমাদের শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত, তারা হলো ওই মানুষগুলো যারা ইলমকে আমলে পরিণত করে না।

আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَإِذْ عَلَّمْنَاهُ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ○ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَسَلْنَاهُ لَكَبَابٍ إِنْ غُبِلَ عَلَيْهِ بَلَهَتْ أَوْ تَنَزَّرَهُ بَلَهَتْ ذَلِكَ مِثْلَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

'তুমি এদের সেই ব্যক্তির বৃত্তান্ত শুনিবে দাও, যাকে আমি নিদর্শন দান করেছিলাম, কিন্তু সে তা বর্জন করে। ফলে শয়তান তার পেছনে লেগে যায়, আর সে পথভ্রষ্টদের মধ্যে शामिल হয়ে যায়। আর আমি ইচ্ছা করলে তাকে এই আয়াতসমূহের সাহায্যে উন্নত করতাম, কিন্তু

সে দুনিয়ার প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়ে এবং ধীর কামনা-বাসনার (প্রবৃত্তির) অনুসরণ করতে থাকে। তার উদাহরণ কুকুরের ন্যায়, ওকে যদি তুমি কষ্ট দাও, তাহলে জিহ্বা বের করে হাঁপায়, আবার কষ্ট না দিলেও জিহ্বা বের করে হাঁপাতে থাকে। যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, এই উদাহরণ হলো সেই সম্প্রদায়ের জন্য। তুমি কাহিনি বর্ণনা করে শোনাতে থাকো, হয়তো তারা এটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে।' (সূরা আল-আরাফ, ১৭৫-১৭৬)

যে আলিমের কাজ তার ইলমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না, যে আলিম তার ইলম অনুযায়ী কাজ করে না, আল্লাহ ﷻ তার তুলনা করেছেন কুকুরের সাথে।

فَتَنَّهُ كَمَنْ أَلِيبُ

আল্লাহ ﷻ বলছেন, ইচ্ছে করলে তিনি অবশ্যই এরকম আলিমকে সম্মানিত করতে পারতেন। কিন্তু এমন ব্যক্তির উদাহরণ হলো কুকুরের মতো, সে দুনিয়াকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে আর নিজের নফসের আনুগত্য করছে। নিজের ইলম অনুযায়ী সে আমল করেনি। অর্জিত ইলমের অনুসরণ সে করেনি। তার দৃষ্টান্ত হলো কুকুরের মতো যে কুকুরকে তাড়িয়ে দেয়া হলে জিব বের করে সে হাঁপাতে থাকে। তাকে তার মতো ছেড়ে দিলেও সে জিব বের করে হাঁপাতেই থাকে। কুকুর জিব বের করে হাঁপাতে থাকে, সে যেই অবস্থাতেই থাকুক না কেন। এই উপমার ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে ইবনুল কাইয়িম ﷺ ওলামায়ে সু ও কুকুরের মধ্যে সাদৃশ্যের ১০টি পয়েন্ট উল্লেখ করেন, তবে এখানে সেই বিস্তারিত আলোচনায় আমরা যাব না।

এই উদাহরণ কে দিয়েছেন? আল্লাহ ﷻ স্বয়ং এই উদাহরণ দিয়েছেন। এবং তিনি যেকোনো কুকুরের কথা বলেননি; বরং এমন কুকুরের কথা বলেছেন যেটা সারাক্ষণ জিব বের করে হাঁপাতে থাকে। বিশ্রামে কিংবা ক্রান্তিতে, ক্ষুধা কিংবা তৃষ্ণায়—সব অবস্থায় যে হাঁপাতে থাকা নিকট কুকুরের কথা আল্লাহ ﷻ বলেছেন। আপনি এসব আলিমদের যদি বলেন, শাইখ সত্য প্রকাশ করুন! সে জিব বের করে হাঁপাতে থাকে। সে যে নিজের ইলম অনুযায়ী আমল সে করছে না, এই ব্যাপারে যদি আপনি চূপ থাকেন, তাহলেও সে জিব বের করে হাঁপাতে থাকে। সে জিব করে হাঁপাতে থাকে যখন আপনি তাকে বর্জন করেন। সে হাঁপাতে থাকে যখন আপনি তাকে উপেক্ষা করেন। যখন সে মুখ খোলে তখন জিব বের করা কুকুরের মতো হাঁপায়। যেহেতু নিজের জ্ঞানকে সে কাজে লাগায়নি, তাই আল্লাহ ﷻ তার তুলনা করেছেন জিব বের করে হাঁপাতে থাকা কুকুরের সাথে।

مَثَلُ الَّذِينَ خَبِلُوا الذِّكْرَ أَتَى اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
مَثَلُ الَّذِينَ خَبِلُوا الذِّكْرَ أَتَى اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

যাদের ওপর তাওরাতের নির্দেশনা মেনে চলা এবং এর বিধানসমূহ প্রয়োগ করার দায়িত্ব

দেয়ার পর তারা ব্যর্থ হয়েছিল, তাদের উদাহরণ হলো গাধার মতো। যারা কাঁখে বিশাল বিশাল বই বয়ে বেড়ালেও এগুলো থেকে কোনোরকম কল্যাণ, কোনো জ্ঞান অর্জন করে না। যেসব ব্যক্তি আল্লাহর স্পষ্ট আয়াত-নির্দেশ, প্রমাণ, অস্বীকার করে তাদের উদাহরণ কতই-না দুর্ভাগ্যজনক। আর আল্লাহ যালিমদের (মুশরিক, অনিষ্টকারী, অবিশ্বাসীদের) পথপ্রদর্শন করেন না। (সূরা জুমুআ, ৫)

এই আয়াতে যদিও তাওরাতের কথা বলা হয়েছে কুরআনের বলা হয়নি, কিন্তু যাদের ওপর কুরআন নাযিল হয়েছে তাদের জন্যও এটা প্রযোজ্য। যাদের ওপর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে কুরআন মেনে চলার, কুরআনের নির্দেশনা মেনে চলার—দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে তাদের অবস্থাও বইয়ের বোঝা বহনকারী গাধার মতোই। কাঁখে বিরাট সব কিতাবের বোঝা তারা বহন করে। কিন্তু তা থেকে কোনো ইলম কি তারা অনুধাবন করেছে? উপলব্ধি করেছে? আল্লাহ স্ফুট-এর আয়াত অস্বীকারকারী ব্যক্তিদের অবস্থা এমনই। প্রথম উদাহরণে ইলমসম্পন্ন ব্যক্তিদের তুলনা করা হয়েছে কুকুরের সাথে আর দ্বিতীয় উদাহরণে তাদের তুলনা করা হয়েছে গাধার সাথে।

لَمْ يَحْمِلُوْهَا

‘তারা বহন করেনি।’

অর্থাৎ তারা সেটা কাজে লাগায়নি, নিজাদের জীবনে প্রয়োগ করেনি। ‘আসফার’ বা বহনকৃত বোঝা কি গাধার কোনো কাজে আসে? আরবি আসফার (أَسْفَر) শব্দটি হলো সফর (سَفَر)-এর বহুবচন। আসফার শব্দটি দিয়ে সেইসব বিরাটাকৃতি বই বা পাথরে খোদাই করা ট্যাবলেট বোঝানো হয় যেগুলোতে আগেকার যুগে লেখা হতো। গাধার পিঠে আসফার তুলে দিলেও সেগুলো থেকে গাধা কোনো জ্ঞানার্জন করতে পারে না। সে কেবল ওজন বহন করে। যে ব্যক্তি বুখারি, মুসলিম, মুধনী, উসূল আস-সালাসাহ-এর মতো বইয়ের জ্ঞান বহন করে, কিন্তু নিজের জীবনে এসবের শিক্ষা প্রয়োগ করে না, ওজন বহন করা ছাড়া আর কোনোভাবে কি সে উপকৃত হয়? না, সে কেবল গাধার মতো ওজনই বহন করে।

حَمِلُوا الْقُرْآنَ

ইবনু আব্বাস রাঃ বলেছেন, হাম্বিলু (حَمِلُوا) শব্দের মাধ্যমে তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এসব জ্ঞান আমলে পরিণত করার। ইবনু কাসির রাঃ বলেছেন, এই উপমা সেই ব্যক্তিদের জন্য যারা জানেই না কিতাবে কী আছে। শেখার জন্য কিতাব দেয়া হলেও শেখার ব্যাপারে কোনো আগ্রহ তাদের নেই। আবার সেই ব্যক্তিদের জন্যও এই উপমা খাটে যারা কিতাবে কী আছে তা জানে, এমনকি মুখস্থও করে, কিন্তু উপলব্ধি করে না। একইসাথে এ কথা তাদের জন্যও প্রযোজ্য যারা জানে কিতাবে কী আছে, কিন্তু নিজ স্বার্থে কিতাবের বক্তব্য তারা বিকৃত করে, ইচ্ছামতো ব্যাখ্যা করে। এরা গাধার চেয়েও অধম। কারণ, গাধার তো বোঝার মতো বুদ্ধি নেই, আর এরা বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও তা কাজে লাগায় না। ই‘লামুল মুওয়াক্কিযিন গ্রন্থে

ইবনুল কাইয়িম রহ বলেছেন, এই আয়াত যদিও ইহুদিদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে তবুও এটা সেইসব ব্যক্তিদের জন্য প্রযোজ্য, কুরআনের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও যারা নিজেদের জীবনে তা প্রয়োগ করে না।

ওয়াল্লাহি, গাধার সাথে তুলনীয় হওয়া কতো ভয়ংকর একটা ব্যাপার। আল্লাহ স্ব আমাদের সতর্ক করার জন্য কিছু ব্যক্তিকে গাধা আর কুকুরের সাথে তুলনা করেছেন, যাতে করে ইলম অর্জন করার পর তা আমলে পরিণত করার গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা সতর্ক হই। যাতে করে অর্জিত জ্ঞান আমরা নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করি। চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য এবং যারা আসলেই সত্য শুনতে চায়, মানতে চায়, তাদের জন্য এটা হলো রিমাইন্ডার।

আল্লাহ স্ব বলেন :

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ

‘নিশ্চয় এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য যার আছে অন্তঃকরণ অথবা যে শ্রবণ করে নিবিষ্টচিত্তে।’ (সূরা আল-কাফ, ৩৭)

আল্লাহ স্ব ইয়াহইয়া রহ-কে বলেন :

يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ

‘হে ইয়াহইয়া, তুমি কিতাবটিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো।’ (সূরা মারইয়াম, ১২)

মুজাহিদ ও যাইদ ইবনু আসলাম রহ বলেছেন, এ আয়াতে বি কুওয়াহ (بِقُوَّةٍ) দ্বারা বোঝানো হয়েছে—জ্ঞানার্জন করো এবং সেই জ্ঞান জীবনে প্রয়োগ করো। আস-সুযুতি রহ বলেছেন, আচরণ, ইবাদত, নেক আমল কিংবা অন্য কোনো বিষয়ে কোনো হাদিস জানার পর সেই হাদিসের ওপর আমল করতে হবে। কেননা, এটা হলো ইলমের যাকাত, অর্থাৎ জ্ঞানের স্তম্ভিকরণ। ইলম আত্মস্থ করার এটাই সর্বোত্তম পন্থা। ওয়াকি রহ বলেছেন, কোনো জ্ঞান কেউ আত্মস্থ করতে চাইলে তার উচিত সেটার ওপর আমল করা। বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ইব্রাহীম ইবনু ইসমাঈল বলেছেন, হাদিস মনে রাখার জন্য আমরা সেগুলোর ওপর আমল করতাম।

ওই ব্যক্তিদের মতো হবেন না যাদের ব্যাপারে কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ স্ব অভিযোগ করবেন। নিশ্চয় আপনি এমন কোনো বিচারের মুখোমুখি হতে চাইবেন না যেখানে আপনার বিরুদ্ধে স্বয়ং আল্লাহর রাসূল স্ব অভিযোগকারী হবেন, আর তিনি বলবেন :

يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا

‘হে আমার রব, নিশ্চয় আমার কণ্ঠ এ কুরআনকে পরিত্যাজ্য গণ্য করেছে। (সূরা আল-ফুরকান, ৩০)

ইবনুল কাইয়্যিম رحمہ اللہ এই ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন যে, মানুষ পাঁচভাবে কুরআনকে পরিত্যাগ করতে পারে। তার মধ্যে একটি হলো কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ না করা। আর কুরআনে কী বলা আছে সেটা না জানলে কীভাবে আপনি কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করবেন? তাই জানতে হবে আর তারপর সেই জ্ঞান অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

ইবনুল কাইয়্যিম رحمہ اللہ কুরআনকে পরিত্যাগ করার দ্বিতীয় আরেকটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন আর সেটা হলো কুরআনের বিধান দিয়ে বিচার করাকে পরিত্যাগ করা। মৌলিক এবং সেকেন্ডারি—যেকোনো ক্ষেত্রেই কুরআন দিয়ে বিচার না করা, কুরআনকে পরিত্যাগ করার শামিল।

তাই কুরআনের নির্দেশনা জানতে হবে এবং সে অনুযায়ী আমলও করতে হবে। কারণ, কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ ﷻ-এর দরবারে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগকারী হবেন—এটা আপনি বা আমি, আমরা কেউই চাই না।

দাওয়াহর ক্ষেত্রে ইলম অনুযায়ী আমল করা

চারটি বুনিয়াদি বিষয়ের তৃতীয়টি হলো দাওয়াহ ইলাল্লাহ। আপনি যা জেনেছেন, সেটার প্রতি মানুষকে আহ্বান করা। আসুন ইলমের ওপর আমল ও দাওয়াহ ইলাল্লাহ—এ দুটো নিয়ে একটু একসাথে চিন্তা করি। ইলম অর্জনের পর প্রথম দায়িত্ব হলো সেটা নিজের জীবনে প্রয়োগ করা। দ্বিতীয় দায়িত্ব হলো সেটা অন্যান্য মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া। আর দাওয়াহ বা মানুষকে শেখানোর সর্বোত্তম উপায় হলো অর্জিত ইলম নিজের জীবনে প্রয়োগ করা। আর এভাবে এ দুটি নীতির সংমিশ্রণ ঘটে। হাজার জন নিলে একজন ব্যক্তিকে বোঝানোর চেয়ে, একজন ব্যক্তির আমল হাজারো মানুষের জন্য বেশি উপকারী। অর্জিত ইলম নিজের জীবনে প্রয়োগ করে মানুষকে যতটা কার্যকরী ভাবে শেখানো যায়, কেবল মুখে সেই জ্ঞানের প্রচার ততটা কার্যকরী হয় না। অনেকে ভাবেন শুধু দারস আর খুতবা হলো দাওয়াহর মাধ্যম, অথচ ইলমের ওপর আমল করাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

ইবনুল জাওয়াযী رحمہ اللہ ও তাঁর শাইখগণ :

সাইদুল খাতিরের এক শ' আটবাড়ি পৃষ্ঠায় ইবনুল জাওয়াযী رحمہ اللہ বলেন,

'আমার বিভিন্ন ধরনের আর বিভিন্ন মাত্রার ইলমসম্পন্ন শাইখ ছিলেন। ওই শাইখদের সঙ্গেই আমার কাছে সবচেয়ে বেশি কল্যাণকর মনে হয়েছে যারা ইলম অনুযায়ী আমল করতেন, যদিও তাদের চেয়ে অধিক জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথেও আমার পরিচয় ছিল। আমি এমনও আলেমের সাক্ষাৎ পেয়েছি যারা অসংখ্য হাদিস মুখস্থ করেছেন, উসুলুল হাদিসে যাদের ছিল গভীর জ্ঞান—কিন্তু তারা গীবতকে বরদাশত করতেন। এমনকি অনেক সময় জার'হ ও তা'দীলের

অজুহাতে তারা গীবতের অনুমতি দিতেন এবং অর্থের বিনিময়ে হাদিস শিক্ষা দিতেন।'

ইবনুল জাওযী রাঃ এই বিষয়টি পছন্দ করেননি।

কোনো একটি হাদিস শিখতে চাইলে আপনাকে দশ হাজার কিংবা পনেরো হাজার টাকা দিতে হবে। তাঁর কিছু শাইখদের ব্যাপারে তিনি আরও বলেছিলেন যে, অনেক সময় তারা নিশ্চিত না হয়েও তড়িঘড়ি করে নানা প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিতেন। তারা সব প্রশ্নের জবাব দিতে চাইতেন যাতে করে নিজেদের খ্যাতি ও মর্যাদা বজায় থাকে।

তিনি বলেছেন, 'আমার সাথে আবদুল ওয়াহহাব আল-আনমাতি রাঃ-এর দেখা হয়েছিল, তিনি সালাফদের পথের ওপর ছিলেন। কখনো প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে কারও নামে গীবত করতেন না এবং কখনোই অর্থ গ্রহণ করতেন না।'

ইবনুল জাওযী রাঃ এমন শাইখকে পছন্দ করতেন যিনি শিক্ষা দেয়ার বিনিময়ে অর্থ নিতেন না। তিনি আরও বলেছেন, 'যখন আমি তাঁকে কোনো হাদিস শোনাতাম তিনি কেঁদে ফেলতেন। কার্দতেই থাকতেন। আমার বয়স তখন অনেক কম ছিল, আর এই বিষয়টি আমার ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। তিনি সেইসব মাশাইখদের মতো ছিলেন যাদের কথা সালাফদের কিতাবে পাওয়া যায়, যারা ছিলেন সাহাবী রাঃ-দের মতো।'

'আমি আবু মানসূর আল জাওয়ালিকী রাঃ-এর সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। তিনি ছিলেন অল্প কথার মানুষ, অত্যন্ত গভীর জ্ঞানের অধিকারী এবং বীনের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ। এমনও হয়েছে যে তাঁকে এত সহজ কিছু প্রশ্ন করা হয়েছে যে, তাঁর সবচেয়ে কমবয়সী ছাত্ররাও ভাবত তারা এর জবাব জানে। কিন্তু তিনি সেগুলোর উত্তর দিতেও ইতস্তত করতেন। উত্তর দিতেন শতভাগ নিশ্চিত হয়ে। তিনি টানা রোজা রাখতেন, দারসের সময় ছাড়া অন্যান্য সময় নিশ্চুপ থাকতেন অথবা কোনো উত্তম আমলে ব্যস্ত থাকতেন।'

ইবনুল জাওযী রাঃ বলেছেন অন্য যেকোনো শাইখের চাইতে এই দুজনের কাছ থেকে তিনি বেশি উপকৃত হয়েছেন। শত শত মাশাইখের মধ্য থেকে এ দুজনের কথাই তিনি বিশেষভাবে বলেছেন, অথচ তারা ততটা বিখ্যাত নন। অনেকে হয়তো তাদের চিনবেন না। কেন তিনি তাঁদের কথা বলেছেন? কারণ, তারা ইলমের ওপর আমল করতেন। ইবনুল জাওযী রাঃ-এর ওপর তাদের প্রভাব অনেক বেশি ছিল, কারণ তারা অর্জিত জ্ঞান নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করেছিলেন।

ইবনুল জাওযী রাঃ উপসংহার টেনেছেন এই বলে যে, 'মানুষকে কথা দিয়ে পথ দেখানোর চেয়ে, নিজের কাজের মাধ্যমে পথ দেখানো অনেক উত্তম ও ফলপ্রসূ। তিনি বলেছেন, আমি কিছু শাইখকে দেখেছি যারা নিজেদের একান্ত সময়গুলো ঠাট্টা-তামাশা অথবা অলসতায় কাটাতে। অনেকের কাছেই এ ধরনের কাজ তাদের সম্মানহানি করেছে, আর ধ্বংস করেছে তাদের ইলমকেও।'

আল্লাহর কসম, এ কথাগুলো খুবই মূল্যবান। স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখবার মতো কথা।

ইবনুল জাওযী رحمہ اللہ আরও বলেছেন, ‘জীবিত থাকাবস্থায় খুব সীমিত-সংস্কৃত লোক এ ধরনের আলিমদের দ্বারা উপকৃত হয় আর মৃত্যুর পরে সবাই তাদের কথা ভুলে যায়। কদাচিৎ কেউ তাদের লেখা কিতাব খুলে দেখে।’ তারপর তিনি বলেছেন, ‘সত্যিকার অর্থে দুর্ভাগা ও দুঃস্থ হলো সেই ব্যক্তি, যে অর্জিত ইলমের ওপর আমল না করে নিজের জীবন কাটিয়ে দেয়।

দুনিয়াতে আমল করার প্রশান্তি থেকে তারা বঞ্চিত হয়^[১৩], আর বঞ্চিত হয় আখিরাতের প্রতিদান থেকেও। কিয়ামতে সে অল্লাহ ﷻ-এর সামনে হাজির হয় নিঃস্ব অবস্থায়, নিজের বিরুদ্ধে অজস্র প্রমাণ নিয়ে।’

এই সবগুলোই ইবনুল জাওযী رحمہ اللہ সাইদুল খাতির গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।^[১৪]

মনে রাখবেন আপনাকে তিনটি প্রতিবন্ধক পার হতে হবে—আপনাকে ইলম অর্জন করতে হবে, সেই ইলম নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং ইলমের ব্যাপারে আন্তরিক ও সৎ হতে হবে। ইকতিদায়ুল ইলম আল আমল গ্রন্থে আল ফুদাইল ইবনুল ইয়াদ رحمہ اللہ বলেছেন, জ্ঞান অর্জন করেও একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত অজ্ঞ থাকে যতক্ষণ না সে নিজের জীবনে সেই জ্ঞান প্রয়োগ করে। কেবল ইলমকে অমলে পরিণত করলেই তিনি আলিম হিসেবে বিবেচিত হবেন। সালাফদের অনেকে দূরদূরান্ত থেকে আলিমদের কাছে ছুটে যেতেন। তাদের থেকে ইলম নেয়ার জন্য না, তারা কীভাবে ইলমের ওপর আমল করতেন, তাদের ওপর ইলমের প্রভাব কী রকম, তা দেখার জন্য।

শ্রষ্টা কিংবা সৃষ্টি, কারও সামনেই নিজেকে নিয়ে অহমিকায় ভুগবেন না :

যতই আমল করুন না কেন, কখনো যেন এ নিয়ে নিজের মধ্যে গর্ব না আসে। এ নিয়ে মানুষের সামনেও অহংকার করা যাবে না, আল্লাহ ﷻ-এর সামনেও না। আমল যেন আমাদের মধ্যে আত্মচুটি বা দস্ত তৈরি না করে। ভুলেও ভাববেন না যে অল্প বা কিছুসংখ্যক আমল করেই বা কিছু ইলমের অর্জনের সুবাদে আপনি জামাতুল ফিরদাউস পেয়ে যাবেন।

সিলাহ رحمہ اللہ-এর কথা মনে আছে? কিয়ামুল লাইলের ওপর দারসে^[১৫] আমি সিলাহ رحمہ اللہ-এর কথা বলেছিলাম। *সিফাতুস সাফওয়াহ* গ্রন্থে তার ব্যাপারে বলা হয়েছে। তিনি রাতের বেলা সালাত আদায় করার সময় বন্য পশুরা তাঁর কাছ থেকে পালিয়ে যেত। অন্ধকার জঙ্গলে তিনি তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। তাঁর অন্তরে আল্লাহতীতি এত গভীর ও প্রবল ছিল যে, আল্লাহ ﷻ জঙ্গলের প্রাণীদের মনে সিলাহ رحمہ اللہ-এর প্রতি ভয় সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। সিলাহ

১৩ কারণ, আমরা আগেই বলেছি যে ইলম অনুসারে আমল করতে পারা দুনিয়ার প্রশান্তির কারণ

১৪ সাইদুল খাতির, পৃ. ১৪৭

১৫ ‘কিয়ামুল লাইল’ নামে বাংলায় প্রকাশিত।

ﷺ কি কখনো আত্মতৃপ্তি আর অহমিকায় ভুগেছেন? তিনি কি কখনো বলেছেন, দেখো আমাকে, আমি সারা রাত সালাত আদায় করি! না, বরং সারা রাত সালাত আদায় করার পর ভোরে তিনি লুকিয়ে সেনাবাহিনীতে ফিরে আসতেন। সারা রাত কী করেছেন কাউকে স্টা বুঝতে দিতেন না। ভান করতেন যেন সারা রাত তিনি ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন। তিনি ছিলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি আল্লাহ ﷻ-এর কারামাহ লাভ করেছিলেন, বন্য প্রাণীরা তাঁর কাছ থেকে পালিয়ে যেত—তাও কি তিনি অহংকার অনুভব করতেন? বরং সালাত শেষে তিনি বলতেন,

يَا رَبِّ اجْزِنِي مِنَ الْكِبَرِ أَوْ مِثْلِي يَسْأَلُ الْجَنَّةَ

তিনি মনে করতেন তিনি জাম্নাত চাইবার যোগ্য নন। তাই বলতেন,

‘হে আল্লাহ, আমাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন, আমার মতো তুচ্ছ কেউ কি জাম্নাত চাইবার যোগ্য? আপনি আমাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন।’

সূতরাং যতটুকু আমল করুন না কেন, কখনো তা নিয়ে আল্লাহ ﷻ-এর সামনে অহমিকায় কিংবা আত্মতৃপ্তিতে ভুগবেন না। ইবনুল জাওযী ﷺ সাইদুল খাতিরে এমন ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করেছেন যারা কিছুদিন আল্লাহ ﷻ-এর ইবাদত করার পর একসময় থেমে যেত। দস্তভরে বলত, আর কেউ আমার মতো আল্লাহ ﷻ-এর এতটা উপাসনা করেনি, এখন আমি দুর্বল হয়ে গেছি। উমার আল ফারুক ﷺ জাম্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন, শয়তান তাঁকে দেখলে ভয়ে পালিয়ে যেত। এমন অনেক উদাহরণ আছে যখন কুরআন তাঁর বলা কথার সত্যায়ন করেছে। তিনি ছিলেন এমন একজন ব্যক্তি যার ব্যাপারে রাসূল ﷺ স্বপ্ন দেখেছিলেন, এমন একজন ব্যক্তি যিনি নিজ শাসনামলে সবার প্রতি ন্যায়বিচার করেছিলেন—হোক তা একটা ভেড়া বা একজন ইহুদি, একজন খ্রিস্টান বা একজন মুসলিম। সেই উমার ﷺ বলেছেন, আমার ইচ্ছা আমি কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় পুনরুত্থিত হব যে, আমার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ থাকবে না আর আমার পক্ষেও কিছু থাকবে না। অর্থাৎ তিনি কেবল জাহান্নাম থেকে, শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়া নিয়ে চিন্তিত ছিলেন।

মুহাদ্দিস সুফিয়ান আস সাওরি ﷺ সম্পর্কে আলী ইবনুল ফুদাইল ﷺ বলেছেন, আস সাওরি ﷺ সিজদাহয় থাকা অবস্থায় আমি সাতবার কাবা তওয়াফ করেছিলাম। অর্থাৎ তাঁর একটা সিজদাহর সময়ে সাতবার কাবা প্রদক্ষিণ করে আসা যেত। ইবনুল মুবারাক ﷺ বলেছেন, আমি এক হাজার এক শ জন শাইখের সম্পর্কে লিখেছি, আর তাঁদের মধ্যে আস সাওরি ﷺ ছিলেন শ্রেষ্ঠ, অতুলনীয়। তাকে বলা হয় হাদিসশাস্ত্রের আমিরুল মুমিনিন। ইয়াহইয়া ইবনু মা'ঈন ﷺ-কে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল ﷺ-এর প্রায় সমপর্যায়ের মনে করা হয়, তিনি আস সাওরি ﷺ সম্পর্কে বলেছেন,

سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث

সুফিয়ান আস সাওরি ﷺ হাদিসের আমিরুল মুমিনিन।

এই মহান ব্যক্তি, সুফিয়ান আস-সাওরি ﷺ কি অহংকার করতেন? আত্মতুষ্টিতে ডুগতেন? স্বীয় মৃত্যুশয্যায় হাম্মাদ বিন সালামাহ ﷺ-কে তিনি জিজ্ঞেস করছিলেন, তুমি কি মনে করো আমার মতো একজন ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করা হবে? তুমি কি মনে করো আমি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবার যোগ্য?

তাই যত আমল করুন না কেন, কখনোই অহংকার করবেন না, আত্মতুষ্টিতে ডুগবেন না।

উসুল আস-সালাসাহর লেখক যে চারটি বুনিয়াদি বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন তার তৃতীয়টি হলো দাওয়াহ, অর্জিত ইলম মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া।

লেখক বলেছেন,

السَّأَلَةُ الثَّالِثَةُ : الدَّعْوَةُ إِلَى

তৃতীয় মাসয়ালা : তার দিকে দাওয়াহ

কিসের দিকে আহ্বান করতে হবে? সাধারণত 'তার দিকে দাওয়াহ' বলতে ইলম অনুযায়ী আমল করার প্রতি আহ্বান করাকে বোঝানো হয়। আমরা আগেই বলেছি ইলম অর্জন করা ছাড়া তা প্রয়োগ করা সম্ভব না। কাজেই দাওয়াহ অর্থ মানুষকে ইলম অর্জন ও নিজেদের জীবনে অর্জিত ইলম বাস্তবায়নের দিকে আহ্বান করা। এ দুটি বিষয় পরস্পর অবিচ্ছেদ্য।

দাওয়াহ কি ফারযুল আইন নাকি ফারযুল কিফায়াহ?

দাওয়াহ করা কি সবার জন্য ব্যক্তিগতভাবে বাধ্যতামূলক নাকি সামষ্টিকভাবে? এ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি নিয়ে অনেকে আলোচনা করেছেন। দাওয়াহ হলো আমার বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার-অর্থাৎ সং কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধের অন্তর্ভুক্ত। এ দায়িত্ব ফারযুল আইন নাকি ফারযুল কিফায়াহ সে প্রশ্নের উত্তরের দুটো অংশ আছে।

বিশদ ইলম অর্জন করা ফারযুল কিফায়াহ :

উত্তরের প্রথম অংশ হলো, উম্মাহর মধ্যে এমন একদল লোক থাকতে হবে যারা একনিষ্ঠভাবে সং কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করার দায়িত্ব পালন করবে। এটা হলো ফারযুল কিফায়াহ বা সামষ্টিকভাবে উম্মাহর দায়িত্ব। উম্মাহর মধ্যে কোনো একদল

মানুষ এ দায়িত্ব পালন করলে সেটা বাকি সবার জন্য যথেষ্ট হবে। সবার খতিব হতে হবে না। আমাদের ১.৬ বিলিয়ন খতিবের প্রয়োজন নেই। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বুখারির সব হাদিসের ব্যাখ্যা বা সনদ জানা জরুরি না। উম্মাহর কিছুসংখ্যক ব্যক্তি হাদিস, মুসতাহা, সীরাহ, তাফসীর, ফারা'ইদ (সম্পত্তির উত্তরাধিকারের নীতি) ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত, গভীর জ্ঞান অর্জন করলেই সেটা যথেষ্ট। এগুলো সবই ফারযুল কিফায়াহ।

আল্লাহ ﷻ কুরআনে বলেন :

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

আর মুমিনদের জন্য সংগত নয় যে, তারা সকলে একসঙ্গে অভিযানে বের হবে। অতঃপর তাদের প্রতিটি দল থেকে কিছু লোক কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের গভীর জ্ঞান আহরণ করতে পারে এবং আপন সম্প্রদায় যখন তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, তখন তাদের সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা (শুনাহ থেকে) বেঁচে থাকে। (সূরা আত-তাওবাহ, ১২২)

অর্থাৎ এমন একদল লোক থাকা উচিত যারা দ্বীনের জ্ঞান ও নির্দেশনা লাভ করবেন এবং অভিযানে বেরিয়ে যাওয়া লোকেরা ফিরে আসার পর তাদের এ ব্যাপারে অবহিত করবেন। দাওয়াহর অগ্রভাগে থেকে নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য একদল লোকের প্রয়োজন। যখন কেউ বিব্রান্তির সৃষ্টি করবে তারা সেটার মোকাবেলা করবেন। দেশের সরকার যখন কুফরের প্রচার করবে তখন কাউকে না কাউকে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। কাউকে না কাউকে রাফীদা^[১৩], খারেজি^[১৪] আর মুরজিয়াদের^[১৫] মতবাদের জবাব দিতে হবে, প্রতিরোধ করতে হবে। কিছু মানুষ জুমুআর খুতবা দেবেন, কিছু মানুষ জামাতের ইমামতি করবেন, কেউ কেউ অর্জন করবেন জারহ ও তা'দীলের বিশদ জ্ঞান। সবার পক্ষে এই সবগুলো দায়িত্ব পালন করা সম্ভব না। বরং বিস্তারিত বিশদ জ্ঞান অর্জনের দায়িত্ব পুরো উম্মাহর সবার ওপর চাপিয়ে দেয়া অসম্ভব।

১৬ রাফীদা/আর-রাওয়াফিদ - চরমপন্থী শিয়া। যারা আবু বাকর, উম্মাহ, উসমান ﷺ এর নেতৃত্ব স্বীকার করে না। অধিকাংশ সাহাবিকে অস্বীকার করে, এবং উম্মাহতুল মুমিনীন ﷺ এর ওপর অপবাদ আরোপ করে।

১৭ খারিজি/আল-খাওয়ারিজ - একটি বাতিল ফিরকা। এই ফিরকার বিভিন্ন শাখ-উপশাখ আছে। এদের সবার মূল বৈশিষ্ট্য হলো, এমন কোনো কিছুর কারণে মুসলিমদের কাফির ঘোষণা (তাকফির) করে, যার কারণে আহলুস সুন্নাহর মতে তাকফির করা যায় না। এটা কবিরা গুনাহ হতে পারে, সগিরাহ গুনাহ হতে পারে। কোনো ভালো আমলের জন্যও হতে পারে।

১৮ মুরজিয়া - একটি বাতিল ফিরকা। মুরজিয়া শব্দটি এসেছে 'ইরজা' থেকে—যার অর্থ হলো বিলম্বিত করা। মূলত মুরজিয়াদেরকে মুরজিয়া বলা হয় এ জন্য যে, তারা আমলকে ইম্মান থেকে বিলম্ব বা বিচ্ছিন্ন করে। ইম্মান ও কুফরকে তারা কেবল মুখের কথা ও অন্তরের সাথে সম্পর্কিত করে। খারিজিদের মতো যুগে যুগে মুরজিয়াদেরও অনেক দল-উপদল সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান সময়েও এদের বিভিন্ন দল-উপদল বিদ্যমান।

দাওয়াহ প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব :

ইবনু কাসির رحمہ اللہ বলেছেন, বাতিলের মোকাবেলা, অন্যায়ে বাধা দেয়া আর সত্য প্রচারের জন্য উম্মাহর অগ্রভাগে একদল লোকের প্রয়োজন। আমাদের উত্তরের দ্বিতীয় অংশ আমরা পাব ইবনু কাসির رحمہ اللہ-এর পরের কথাগুলোয়। তিনি বলেছেন, (আর) সাধ্য অনুযায়ী বাতিলের মোকাবেলা, অন্যায়ে বাধা দেয়া আর সত্যের প্রচার করা প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব। প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফারযুল আইন হলো নিজের সাধ্য ও পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী দাওয়াহ করা। ব্যক্তির জ্ঞানের মাত্রার ওপর ভিত্তি করে এই দায়িত্বের তারতম্য হবে। তবে ইলম অনুযায়ী নিজের চারপাশের মানুষদের কাছে তাকে দাওয়াহ পৌঁছে দিতে হবে। যে সালাত পড়ে না তাকে সালাতের দাওয়াহ দিতে হবে। এ জন্য তো খতিব হবার প্রয়োজন নেই। যখন দেখবেন কেউ সালাত আদায় করছে না, তাকে বলুন সালাত আদায় করা বাধ্যতামূলক, তাই আপনাকে সালাত পড়তেই হবে। আপনি জানেন গীবত করা হারাম। কাউকে গীবত করতে দেখলে বলুন, গীবত করা হারাম, এটা বন্ধ করুন। সহিহ আল বুখারিতে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

‘প্রচার করো আমার পক্ষ থেকে, এক আয়াত হলেও।’^(১১)

যদি শুধু একটি আয়াতও জানেন, তাহলে সেটাই প্রচার করুন। যদি একটি আয়াতের অর্থ পরিপূর্ণভাবে জানেন, তাহলে সেটাই পৌঁছে দিন মানুষের কাছে।

আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

‘আর যেন তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম।’
(সূরা আলি ইমরান, ১০৪)

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ

আরবি ভাষায় মিন (من) দ্বারা তা’বীর (تعبير) বোঝায়। মিন ব্যবহৃত হবার কারণে ‘তোমাদের মধ্যে এমন একদল থাকুক’-এর অর্থ সামষ্টিক দায়িত্ব বা ফারযুল কিফায়াহ হিসেবে নেয়া যায়। অর্থাৎ একদল লোক থাকবে যারা বিস্তারিত ও গভীরভাবে ইলম অর্জন করবে। তবে আরবিতে মিন দ্বারা ‘জিনস’ও বোঝায়। মিন লিন জিনস অর্থ মানবজাতি। অর্থাৎ এই আয়াত

দ্বারা সমগ্র মানবজাতিকেও বোঝানো হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ফারযুল আইন দাওয়াহর অর্থও এই আয়াত থেকে পাওয়া যায়।

সাহিহ মুসলিমে আছে আবু হুরাইরা রাঃ বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ يَدُّوهُ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ

তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোনো খারাপ কাজ দেখবে, সে যেন তা নিজ হাত দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়। যদি (তাতে) ক্ষমতা না রাখে, তাহলে নিজ জিব দ্বারা। যদি (তাতেও) সামর্থ্য না রাখে, তাহলে অন্তর দ্বারা।^{১০১}

অর্থাৎ খারাপ কিছু দেখলে প্রত্যেক মুসলিমকে তা সংশোধনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর হাত, মুখ এবং অন্তর দ্বারা পরিবর্তন—প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য আছে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ও নীতিমালা।

ব্যক্তি যেসব বিষয়ের ওপর দায়িত্বপ্রাপ্ত—যেমন : নিজ সন্তান—সেগুলোর ক্ষেত্রে তাদের দাওয়াহ করা তার জন্য বাধ্যতামূলক।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

‘হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ। তাঁরা আল্লাহ যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তা-ই করে।’ (সূরা আত-তাহরীম, ৬)

দাওয়াহ করা ছাড়া কীভাবে আমরা তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করব? কীভাবে তাদের রক্ষা করব জাহান্নাম থেকে? প্রতিটি ব্যক্তিকে নিজ পরিবারে দাওয়াহ করতে হবে, কেননা সে তাদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল এবং কিয়ামতের দিন এই দায়িত্বের ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন নারীকে দাওয়াহ করতে হবে তার পরিবার, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, আর পরিচিতদের মাঝে, কারণ তাদের ব্যাপারে হয়তো তাকে কিয়ামতের দিনে জিজ্ঞাসা করা হবে। এমন কিছু পরিস্থিতি থাকে যেগুলোর বেলায় দাওয়াহ না করলে আশঙ্কা থাকে জবাবদিহির মুখোমুখি হবার। মদ পরিবেশন করা হচ্ছে এমন জায়গায় কেউ গেলে তার দায়িত্ব হলো মদ হারাম এ কথা বলা। কমসে কম সেখান থেকে চলে আসা। সেখান থেকে চলে আসাও মন্দ কাজের বাধা দেয়ার একটি উপায়—তবে উত্তম হলো মুখে নিষেধ করা।

কাজেই আমরা বুঝতে পারলাম, সুনির্দিষ্ট ও একনিষ্ঠভাবে দাওয়াহর কাজ করা, বিস্তারিত জ্ঞান অর্জনের পর মানুষের কাছে তা পৌঁছে দেয়া—এমন দাওয়াহ হলো ফারযুল কিফায়াহ।

খাওয়ারিজ, মুরজিয়া, রাওয়াফিহের ব্যাপারে মানুষকে জানানো, জারহ ও অ'দিলের আলোচনা, এগুলো এ ধরনের দাওয়াহর অন্তর্ভুক্ত। আর পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী, নিজের সাধ্য ও সামর্থ্য অনুযায়ী দাওয়াহ করা প্রতিটি ব্যক্তির ওপর বাধ্যতামূলক। এটা ফারযুল আইন।

পরিপূর্ণ ইলম অর্জনের আগে কি দাওয়াহ বন্ধ রাখা উচিত?

ইলম অর্জনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনার কারণে অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেন, দাওয়াহর কাজে বিরতি দিয়ে সেই সময়টা তারা ইলম অর্জনে কাজে লাগাবেন কি না?

এই প্রশ্নের উত্তর আমি দেবো ইমাম আহমাদ রহিমুল্লাহ-এর কাছ থেকে। ইবনুল জাওযী রহিমুল্লাহ-এর বই মানাকিবুল ইমাম আহমাদে বর্ণিত আছে, ইমাম আহমাদ রহিমুল্লাহ-এর পুত্র সালিহ রহিমুল্লাহ বলেছেন, একবার এক লোক বাবার হাতে একটি দোয়াত দেখতে পেল। বাবাকে সে বলল, হে আবু আদিল্লাহ, এত উঁচু মর্যাদার আসনে আপনি পৌঁছেছেন, আপনি মুসলিমদের ইমাম, আপনি আহলে সুন্নাহর ইমাম, আর কতদিন আপনি এই দোয়াত বহন করবেন? ইমাম আহমাদ রহিমুল্লাহ জবাব দিলেন,

مع المحبرة الى المقبرة

কবরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত।

মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাইল আস সাইগ ছিলেন একজন কামার। আস-সাইগ মানে কামার। তিনি বলেছেন, আমি আর আমার বাবা দোকানে বসে কাজ করছিলাম। বাবা দেখতে পেলেন ইমাম আহমাদ রহিমুল্লাহ জুতো হাতে করে আমাদের দোকানের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর জুবা টেনে ধরে বাবা তাকে থামালেন। বললেন, ইমাম আহমাদ! আপনার কি লজ্জা লাগে না? আর কতদিন আপনি এই কমবয়েসী যুবকদের কাছে গিয়ে শিখবেন? যাদের কাছে গিয়ে আপনি শিখছেন তারা হয় বয়সে আপনার চেয়ে ছোট অথবা তাদের জ্ঞান আপনার চাইতে কম। ইমাম আহমাদ রহিমুল্লাহ বললেন, আমি আমৃত্যু তাদের কাছে গিয়ে শিখব, কেবল মৃত্যু এলেই আমি থামব।

ইবনু আবদিল বার রহিমুল্লাহ-এর জামিযু বায়ানিল ইলম গ্রন্থে আছে, ইবনুল মুবারাক রহিমুল্লাহ-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আর কতদিন আপনি ইলম অধ্যয়নে কাটাবেন? তিনি জবাব দিয়েছিলেন, মৃত্যু আসার আগ পর্যন্ত। আরেকবার তাকে একই প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন, এমনও তো হতে পারে যে, আল্লাহ স্বত্ব-এর সামনে দাঁড়াবার সময় যে জ্ঞানের আমার প্রয়োজন হবে এখনো আমি তা অর্জন করতে পারিনি।

কাজেই যদি জ্ঞান অর্জন করা শেষ করে দাওয়াহ শুরু করতে চান, তাহলে তা আর কখনো করা হবে না। এ জীবনে আর দাওয়াহ করতে পারবেন না। তাই প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নিজের জ্ঞান অনুযায়ী দাওয়াহ করে যেতে হবে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনে ইলম অর্জন আর দাওয়াহর জন্য সময় ভাগ করে নিতে হবে। অর্থাৎ ইলমের জন্য সময় দিতে গিয়ে দাওয়াহ করা বন্ধ করলে চলবে না; বরং দাওয়াহ দেয়ার জন্য আলাদা করে সময় বের করে নিতে হবে। আমি আলী তানতালীকে (বর্তমান সময়ের একজন আলেম বা দাঈ) বলতে শুনেছি, পড়তে শেখার পর থেকে সত্তর বছরে এমন কোনো দিন যায়নি যেদিন তিনি কমপক্ষে ১০০ পৃষ্ঠা পড়েননি। কেবল সফরের সময় এর ব্যতিক্রম হয়েছে। অসুস্থ অবস্থায় পড়েছেন দৈনিক ২০০ পৃষ্ঠা করে। যৌবনে পড়েছেন দৈনিক ৩০০ পৃষ্ঠা করে। প্রতিদিন তিনি দশ ঘণ্টা পড়তেন। তিনি কিছুটা রসিক মানুষ ছিলেন। বলতেন, গাধাও যদি দিনে ১০ ঘণ্টা পড়ে, তাহলে সেও কিছু না কিছু শিখে ফেলবে। চিন্তা করে দেখুন, দৈনিক ১০০ থেকে ৩০০ পৃষ্ঠা, প্রতিদিন দশ ঘণ্টা করে পড়া! সারা জীবনে কত পড়েছেন! আমাদের সবার উচিত এভাবে পড়া। ইলম অর্জন একটা নিরন্তর প্রক্রিয়া।

আল্লাহ ﷻ রাসূল ﷺ-কে বলেন :

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

‘এবং বলুন, হে আমার পালনকর্তা, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।’ (সূরা আত-ত্বাহা, ১১৪)

এ কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। আমাদের আরও জ্ঞান দান করুন। কতক্ষণ পর্যন্ত? কত দিন পর্যন্ত? এ দুআর মেয়াদ কখন শেষ হবে? আল্লাহর নবি ﷺ কখন এই দুআ করা বন্ধ করতে পারবেন?

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

কখনো না। আমৃত্যু রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দুআ করে গেছেন। তাহলে আমাদের কথা চিন্তা করুন।

ইলম অর্জনের প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হবে, কিন্তু তার মানে এই না যে আমরা দাওয়াহকে অবহেলা করব। কেউ যদি মনে করে সে মদীনা বা অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে বা কোনো শাইখের কাছে ইলম শিখবে, নিজের ইলম অর্জনের প্রক্রিয়া শেষ করে, পরিপূর্ণ ইলম অর্জন করার পরই কেবল দাওয়াহ আর শেখাতে শুরু করবে, তাহলে সে আলিম না। হয়তো আজকের শাইখদের অবস্থা এমন কিন্তু সত্যিকার শাইখরা মৃত্যু পর্যন্ত ইলম অর্জন জারি রাখতেন। প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা শেষ করার পর বরং তাঁদের জ্ঞানের চর্চা আরও বেশি বেড়ে যেত। আপনি যদি গ্র্যাডুয়েশান শেষ হবার পর, পড়া শেষ হবার পর দাওয়াহ শুরু করবেন বলে ঠিক করেন, আর আমৃত্যু পড়াশোনা করেন, তাহলে জেনে রাখুন আপনি কোনো দিন দাওয়াহ করতে পারবেন না। কারণ, এই ইলম অর্জনের কোনো শেষ নেই। দ্বীনের জ্ঞান এতই গভীর ও বিস্তৃত যে জ্ঞানার্জনের পাঠ চুকিয়ে ফেলবেন, এ অংশের ইতি টানবেন, এমন

কোনো সুযোগই নেই। তাই ইলম অর্জনের পাশাপাশি সুবিধামতো সময় বের করে অর্জিত ইলম মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া শুরু করুন। পাশাপাশি, দুটো দায়িত্বের কোনটার পেছনে কতটুকু সময় দিচ্ছেন, সেই ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখুন। বিস্তারিত জ্ঞান না থাকাতে একদম মৌলিক বিষয়গুলোই মানুষকে জানান। সব মুসলিমই তো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জানে। কোনো কাফিরকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সম্পর্কে জানান। এই কালিমার কোনো একটি দিক সম্পর্কে জানান, অথবা আদব-আখলাকের কোনো একটি দিক নিয়ে দাওয়ায় করুন। যদি নিজের মুখে দাওয়ায় করতে ইতস্তত বোধ করেন বা না পারেন, তাহলে অন্যের মুখের কথা দিয়ে দাওয়ায় করুন। ইসলামি বই উপহার দিন। প্রচার করুন কোনো দারস বা লেকচারের অডিও বা ভিডিও। এতে অন্যের মুখের কথা দিয়ে দাওয়ায় হলেও আপনি তার সমপরিমাণ সাওয়াব পাবেন। উম্মাহর প্রত্যেক ব্যক্তিকে দা'ঈ হতে হবে, তবে সবাইকেই মিস্তারি দাঁড়িয়ে দাওয়ায় দিতে হবে না। প্রত্যেককে দাওয়ায়র দায়িত্ব পালন করতে হবে নিজ সাধ্য, সময় ও জ্ঞানানুযায়ী। দাওয়ায়র জন্য বের করে নিতে হবে কিছু সময়।

দাওয়ায় শুধু শাইখ বা আলিমদের একচ্ছত্র অধিকার না। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে যুবকেরা দাওয়ায় না দিলে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হতো না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়া হলো জাহাজে থাকা যাত্রীদের মতো। ধরুন কোনো লোক জাহাজ ডুবিয়ে দিতে উদ্যত হলো। এখন কেউ যদি বাধা না দেয়, তাহলে সবাই মারা যাবে। আর যদি সবাই মিলে জাহাজটিকে রক্ষা করে, তাহলে সবাই নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে।^{১১}

আল্লাহ ﷻ-এর ব্যাপারে না জেনে কথা বলার বিপদ :

যদিও আমরা সবাইকে দাওয়ায়র ব্যাপারে উৎসাহিত করছি তবে অবশ্যই আমাদের সবার নিজেদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন ও সতর্ক থাকতে হবে। কোনো জ্ঞান ছাড়া কথা বলা, দাওয়ায় দেয়া এখন বিশ্বব্যাপী মহামারির মতো হয়ে গেছে। কেউ হয়তো বক্তা

১১ নুমান ইবনু বাশির র‍াদী থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ ﷻ-এর নির্ধারিত সীমায় অবস্থানকারী (সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে বাধাদানকারী) এবং ওই সীমা লঙ্ঘনকারী (উক্ত কাজে তোষামোদকারী) উপরা হলো এমন এক সম্প্রদায়ের মতো, যারা একটি দ্বিতলবিশিষ্ট জাহাজে লটারি করে কিছু লোক ওপরতলায় এবং কিছু লোক নিচের তলায় স্থান নিল। (নিচের তলা সাধারণত পানির ভেতরে ডুবে থাকে। তাই পানির প্রয়োজন হলে নিচের তলার লোকদের ওপরতলায় যেতে হয় এবং সেখান হতে সমুদ্র বা নদীর পানি তুলে আনতে হয়।) সুতরাং পানির প্রয়োজনে নিচের তলার লোকেরা ওপরতলায় যেতে লাগল। (ওপরতলার লোকদের ওপর পানি পড়লে তারা তাদের ওপরভাগে আসা অপছন্দ করল। তারা বলেই দিলে, 'তোমরা নিচে থেকে আমাদের কষ্ট দিতে এসো না।') নিচতলার লোকেরা বলল, 'আমরা যদি আমাদের ভাগে (নিচের তলায় কোনো স্থানে) ছিদ্র করে দিই, তাহলে (আমরা পানি ব্যবহার করতে পারব) আর ওপরতলার লোকদের কষ্টও দেনো না। (এই পরিকল্পনার পর তারা যখন ছিদ্র করতে শুরু করল) তখন যদি ওপরতলার লোকেরা তাদের নিজ ইচ্ছায় ওপর ছেড়ে দেয় (এবং সে কাজে বাধা না দেয়), তাহলে সকলেই (পানিতে ডুবে) ধ্বংস হয়ে যাবে। (ওপরতলার লোকেরা সে অনায়াস না করলেও রেহাই পেয়ে যাবে না।) পক্ষান্তরে ওপরতলার লোকেরা যদি তাদের হাত ধরে (জাহাজে ছিদ্র করতে) বাধা দেয়, তাহলে তারা নিজেরাও বেঁচে যাবে এবং সকলকেই বাঁচিয়ে দেবে।' (সহিহল বুখারি : ২৪৯৩; তিরমিযি : ২১৭৩; আহমাদ : ১৭৮৯৭)

হিসেবে ভালো, কয়েকদিন হলো দাড়ি রাখছে আর মাথায় কুফিয়া বাঁধছে—হঠাৎ দেখা যায় সে এলাকার মসজিদে বক্তব্য দিতে শুরু করে দিয়েছে। অথবা কিছু লেকচার ডিডিও করে ইউটিউবে আপলোড করা শুরু করেছে। তারপর কী হয়? যে সারা জীবন মেডিকলে পড়েছে অথবা আইন বা ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়েছে, কিংবা ব্যবসা করেছে, পাশাপাশি ধর্মের জ্ঞানের টুকটাকি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা সে রাখে—রাতারাতি এমন লোক শাইখ বনে যাচ্ছে, হয়ে যাচ্ছে একেকজন মুফতি বা আলিম। আত্মবিশ্বাসের সাথে সে উম্মাহর ভবিষ্যৎ ও উত্তরণের সাথে সম্পর্কিত এমন সব ব্যাপারে কথা বলতে করতে শুরু করে দিয়েছে, যেসব বিষয়ে মন্তব্য করা থেকে খোদ সাহাবা রা ও ইমামগণও পিছিয়ে যেতেন।

অনেক ক্ষেত্রেই নির্দোষভাবে ব্যাপারটা শুরু হয়। হয়তো সে ভালো উদ্দেশ্য নিয়েই শুরু করে। মানুষকে শেখায়। হয়তো সে হাদিস সম্পর্কে কিছু জ্ঞান রাখে। হয়তো দু-একটা ভালো খুতবা বা লেকচার সে দেয়। কাফিরদের কোনো এলাকায় গিয়ে হয়তো সে দাওয়াহ করে—এভাবে ব্যাপারটা শুরু হয়। কিন্তু অনেকে এসব ক্ষেত্রে ধর্মের সীমারেখা সম্পর্কে সচেতন থাকে না। জানে না যে কখন, কোথায় থামতে হবে। দেখা যায় নিজ এলাকার মানুষের মাঝে লেকচার কিংবা খুতবা দেয়ার পর সে কয়েক দিনের দাড়ি মুখে ঘনঘন কুফিয়া পড়া শুরু করে দেয়। তারপর হয়তো সে হজ্জ যায়। আর হজ্জ থেকে ফেরার পর হয়ে যায় শাইখ বা মুফতি। কেউ হয়তো উমরাহ থেকে ফিরে, কয়েক দিন মদীনায় কাটিয়ে নিজেই শাইখ ভাবতে শুরু করে। অথচ হজ্জের জন্য সে তিন সপ্তাহ মদীনায় কাটিয়েছে। তিন সপ্তাহ এই তিন সপ্তাহে সে কতটুকু কী শেখে?

মানুষের সমস্যা হলো, তারা নিজেদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন না। আজ আমরা ‘কে শাইখ?’ এটা জিজ্ঞেস করি না। বরং আমরা জিজ্ঞেস করি কে শাইখ না। আজ যেকোনো জায়গায়, যেকোনো পরিস্থিতিতে ইসলামি কোনো বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তুলে দেখুন। দেখুন কয়জন বলে—আল্লাহ্ ‘আলাম, চলুন শাইখের কাছ থেকে জেনে আসি। আজ কেউ আলিমের কাছ থেকে জেনে আসার পরামর্শ দেয় না। এটা আজ খুব বিরল একটা ব্যাপার। তবে ‘ঈ আবদুর রাহমান ইবনু আবি লায়লা রা এক শ বিশজন আনসার রা—এর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, তাঁদের কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তারা অন্য কারও কাছে পাঠিয়ে দিতেন, শেষপর্যন্ত দেখা যেত যে প্রশ্ন ঘুরেফিরে আবার প্রথম ব্যক্তির কাছে ফিরে এসেছে। এক শ বিশজনের কাছ থেকে ঘুরে প্রশ্ন আবার ফিরে আসতো প্রথমজনের কাছে। তাঁদের মধ্যে এমন একজন ছিলেন না, যিনি হাদিস বর্ণনা করার সময় চাইতেন না যে, তাঁর বদলে অন্য কোনো মুসলিম ভাই এ দায়িত্ব নিক। এমন একজন ছিলেন না, যিনি ফতোয়া দেয়ার বেলায় মনে মনে কামনা করতেন না যে তাঁর বদলে অন্য কোনো ভাই এ কাজের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাক। আজকের যুগে কি এটা চিন্তা করা যায়? ধর্মের কোনো বিষয়ে জানার জন্য ১২০ জনের কাছে যাওয়ার কথা আজ চিন্তাই করা যায় না। কারও সামনে কিছু বলা হলে, সে নিজের মনমতো একটা জবাব দিয়ে দেবে। অথচ তাকে বলুন, আমার কম্পিউটার নষ্ট হয়ে গেছে

কী করব? সে বলবে রিপেয়ারিং সেক্টারে নিয়ে যাও। কিন্তু ইসলামের ব্যাপারে আজ সবাই নিজেদের শাইখ ভাবে।

উমার রা বলতেন, ঘিনের কোনো বিষয়ে নিজের মতামত দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ স্ব-কে ভয় করো। উমার আর আলী রা ছিলেন শ্রেষ্ঠ প্রজন্মের শ্রেষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ঘিনের কোনো বিষয়ে প্রশ্ন তাদের কাছে এলে, তাঁরা কখনো তড়িঘড়ি করে উত্তর দিতেন না। বরং অন্যান্য সাহাবি রা-দের ডেকে আলোচনা করতেন—হয়তো এ বিষয়ে এমন কোনো হাদিস কারও জানা আছে যা অন্যরা জানত না। আপনি কি মনে করেন, উমার বা আলী রা আসলে প্রশ্নগুলোর উত্তর না জানার কারণে সাহাবি রা-দের ডেকে আনতেন? না, বরং তাদের ডাকতেন উত্তরের ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চিত হবার জন্য, ছোট্ট কোনো বিষয়ও যেন নজর এড়িয়ে না যায় তা নিশ্চিত হবার জন্য।

তবে 'ঈ আতা ইবনুস সাইব রা বলেছেন, আমি এমন মানুষ দেখেছি কোনো বিষয়ে ফতোয়া চাইলে জবাব দেয়ার সময় তাঁরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়তেন। তাদের হাটু কাঁপত, শরীর প্রকম্পিত হতো। এখানে তিনি কাদের কথা বলেছেন? তিনি সাহাবি রা-দের কথা বলেছেন। তাঁদের এমন প্রতিক্রিয়া হতো, কারণ তারা আল্লাহ স্ব-কে ভয় করতেন। তাঁরা জানতেন যে, এই ব্যাপারে আল্লাহ স্ব-এর কাছে তাদের জবাবদিহি করতে হবে। তবে 'ঈ আশ-শা'বী, হাসান আল বাসরী আর আবু হুসাইন রা বলেছেন,

ان احدهم ليفي في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر

আজকাল তোমরা এমন সব বিষয়ে ফতোয়া দাও যেগুলো উমার রা-এর কাছে উপস্থাপন করা হলে মাশোয়ারা করতে তিনি বদর সাহাবিদের উপস্থিত করতেন।^{১২}

আশ শা'বী, হাসান আল বাসরী রা আজ থাকলে কী বলতেন? উম্মাহর প্রথম শতাব্দীর মানুষের ব্যাপারে যদি তারা এমন কথা বলেন, তাহলে আজকের লোকদের ব্যাপারে তারা কী বলতেন? ওয়াল্লাহি, কুরআনের একটা আয়াতও ঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারে না, এমন লোকেরা আজ মুফতি হয়ে গেছে—সেটা তারা নিজেরা দাবি করুক কিংবা অন্যরা। মানুষ আজ এতটা অস্ত, এতটা জাহিল যে ইসলামের রহিত হয়ে যাওয়া, মানসুখ হয়ে যাওয়া বিধান এনে এরা নিজেদের অবস্থানকে সঠিক প্রমাণ করার চেষ্টা করে। ওয়াল্লাহি, কুরআনের একটা আয়াত স্তম্ভভাবে উচ্চারণ করতে পারে না এমন লোককে আমরা ফতোয়া দিতে শুনেছি। দেখেছি মানসুখ হয়ে যাওয়া বিধানকে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করে ফ্রি মিস্ত্রিং-এর মতো ব্যাপারকে হালাল প্রমাণ করার চেষ্টা করতে।

ইমাম মালিক রা বলতেন,

من أحب أن يجيب عن مسألة فليعرض نفسه قبل أن يجيب على الجنة والنار ، وكيف

يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب

ইসলামের কোনো বিষয়ে নিয়ে কেউ কথা বলতে কিংবা ফতোয়া দিতে চাইলে, সে যেন আগে চিন্তা করে, আল্লাহ ﷻ-এর সামনে যখন দাঁড়াবে তখন কোন উত্তর তার জন্য উত্তম হবে। কোন উত্তর তাঁর জন্য যথেষ্ট হবে যখন সে আল্লাহ ﷻ-এর সামনে দাঁড়াবে। সে যেন উত্তর দেয়ার আগে জাম্মাত ও জাহান্নামের কথা স্মরণ করে, আর তারপরই যেন উত্তর দেয়।^{১০১}

এক লোক ইমাম মালিক রহীম-কে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিল, কিংবা তিনি জবাব দেননি। লোকটি তখন বলল, আবু আদিল্লাহ অনুগ্রহ করে জবাব দিন। জবাবে ইমাম মালিক রহীম বলেছিলেন, তুমি কি চাও আল্লাহ ﷻ-এর সামনে আমি তোমার কাজের জন্য দায়ী হই? আমি তোমাকে কিছু বলার পর তুমি যে কাজ করবে তার জন্য আমি দোষী হব আর তুমি আমার ওপর দোষ দিয়ে পার পেয়ে যাবে?

হাইসাম ইবনু জামিল বলেন, একবার ইমাম মালিক রহীম-কে আটচল্লিশটি বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি বত্রিশটির প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন আর বাকিগুলোর ব্যাপারে বলেছিলেন, 'আমি জানি না'। সারা দুনিয়াতে আজ আটচল্লিশটি প্রশ্ন করে দেখুন, কয়টার জবাব পান। পঞ্চাশটা প্রশ্ন করলে আজ পঞ্চাশটারই জবাব পাবেন। দশটা করলে দশটার জবাব পাবেন। আজ উম্মাহর এমনই দুরবস্থা।

একজন ব্যক্তি ইমাম মালিক রহীম-কে বললেন, আবু আদিল্লাহ আপনি যদি না জানেন, তাহলে আর কে জানবে বলুন? আপনিই তো আনাদের সময়ের মুফতি। ইমাম মালিক রহীম বললেন, তুমি কি আমাকে আমার নিজের চেয়ে বেশি চেনো? তিনি যা বোঝাতে চাচ্ছেন তা হলো, 'তুমি কি মনে করছ আমি বিশেষ কেউ? আমি একজন সাধারণ ব্যক্তিমাত্র আর আমি আমার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অবগত।' যদি ইমাম মালিক রহীম নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে থাকেন, তাহলে এখনকার সময়ের মানুষদের কি আরও বেশি সচেতন হওয়া উচিত না? তিনি আরও বলেছিলেন, ইবনু উমার রহীম, যদি 'আমি জানি না' বলতে পারেন, তাহলে আমিও বলতে পারি। অহংকার, প্রতিপত্তি আর নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা মানুষকে ধ্বংস করে ফেলে। এগুলো ইমাম মালিক রহীম-এর কথা। আর এ জিনিসগুলোর লোভেই মানুষ আজ 'আমি জানি না' বলে না। না জানার কথা স্বীকার করে না।

এখানে একটা কথা বলি। ফতোয়া দেয়ার আগে উমার রহীম মাসোয়ারার জন্য বদরি সাহাবি রহীম-দের ডেকে আনতেন। কেবল তার কাছ থেকে ফতোয়া জানার জন্য সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে, দূরদূরান্ত থেকে ভ্রমণ করে আসা লোকদের প্রশ্নের জবাবে ইমাম মালিক রহীম বলতেন, 'আমি জানি না'। তার মানে কি তারা আসলেই এসব প্রশ্নের জবাব জানতেন না? তাদের কি জ্ঞানের কমতি ছিল? আমি সব সময় বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করি।

ইমাম আশ-শাফে'ঈ রহিমুল্লাহ-কে ফতোয়া দেয়ার ইজাযাহ দেয়া হয়েছিল ১৫ বছর বয়সে। তার শাইখ ইবনু উয়াইনাহ রহিমুল্লাহ ১৫ বছর বয়সে তাঁকে বলেছিলেন তুমি এখন থেকে ফতোয়া দিতে পারো। শৈশব থেকে এই শাইখ তাকে পড়িয়েছিলেন। তিনিও ইমাম শাফে'ঈ রহিমুল্লাহ-এর কাছে ফতোয়া জানতে চাইতেন, হাদিসের ব্যাখ্যাসহ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মত জানতে চাইতেন। ইমাম শাফে'ঈ রহিমুল্লাহ-এর শিক্ষক মানুষকে বলতেন তোমরা আশ-শাফে'ঈর কাছ থেকে ফতোয়া নাও। ইমাম মালিক রহিমুল্লাহ ফতোয়া দেয়ার দায়িত্ব নেন ২১ বছর বয়সে। এ অবস্থায়ও তিনি বিভিন্ন শাইখের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি আসলেই ফতোয়া দেয়ার যোগ্য? তাঁরা উল্টো ইমাম মালিক রহিমুল্লাহ-কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার শাইখ যদি বলতেন তুমি ফতোয়া দিতে পারবে না, তাহলে কি তুমি বিরত হতে? তিনি জবাব দিলেন, নিশ্চয়।

ইবনুল জাওযী রহিমুল্লাহ-এর বিশিষ্ট দুজন শাইখের কথা আমরা এরই মধ্যে আলোচনা করেছি। এমন ফতোয়া দেয়া থেকেও তারা অনেক সময় বিরত থাকতেন যেগুলোর জবাব তাদের হালাকার আনাড়ি ছাত্ররাও দিতে পারে। কিন্তু ভেবে দেখুন, এর মানে কি এই যে, তারা এসব বিষয়ে জানতেন না? ঋহিব সম্পর্কে আমাদের কোনো জ্ঞান নেই, তবে আমি মোটামুটি নিশ্চিত যে এসব প্রশ্নের জবাব তারা জানতেন। আমার ধারণা এসব বিষয়ে আলিমদের একাধিক মত অথবা একাধিক হাদিস থাকার কারণে তারা পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলেন না যে কোন মতটি সঠিক। তারা হয়তো ৯৯.৯৯% নিশ্চিত ছিলেন, কিন্তু শতভাগ নিশ্চিত না হওয়ায় তারা এই বিষয়গুলোতে ফতোয়া দেয়ার ব্যাপারে পিছিয়ে যেতেন। এই ইমামদের সম্পর্কে যা জেনেছি তাতে এটাই আমার ধারণা।

অফিসের বস যদি কিছু কিছু বিষয়ের ভার আপনার বিবেচনার ওপর ছেড়ে দেন, তাহলে সেসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার আগে আপনি এক শ বার চিন্তাভাবনা করবেন। অন্যদের মতামত জানতে চাইবেন। আপনার বসকে আপনি খুশি করতে চান, তাই সিদ্ধান্ত নেবার আগে আপনি বিভিন্নজনকে জিজ্ঞেস করবেন যাতে সঠিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন কি না, সেটা বুঝতে পারেন। আপনি যদি কোনো রাজা, প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রপ্রধানের উপদেষ্টা হন আর তার পক্ষ থেকে কিছু কাজের দায়িত্ব আপনাকে দেয়া হয়, তাহলে অবশ্যই আপনি নিশ্চিত করার চেষ্টা করবেন যে আপনি যেই সিদ্ধান্তটি নিচ্ছেন তা ১০০% সঠিক। এসব ক্ষেত্রে আপনার দায়বদ্ধতা অফিসের বস বা রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে। একইভাবে যে ব্যক্তি ফতোয়া দেন তার দায়বদ্ধতা স্বয়ং আল্লাহ স্বত্ব-এর কাছে। কেননা, এই ব্যাপারে তাকে আল্লাহ স্বত্ব-এর সামনে দাঁড়াতে হবে, জবাবদিহি করতে হবে। ভুল হলে বসের কাছ থেকে আপনি পার পেতে পারেন। রেহাই পেতে পারেন রাজা বা প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে। কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ স্বত্ব-এর কাছ থেকে? আসমান-জমিনের মালিকের কাছে থেকে কীভাবে রেহাই পাবেন?

ইবনুল কাইয়িম রহিমুল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ স্বত্ব নিষেধ করেছেন তাঁর ব্যাপারে ধারণাপ্রসূত, অজ্ঞতাপ্রসূত কথা বলতে। আর এটি সবচেয়ে গুরুতর নিষেধাজ্ঞার অন্যতম। ইবনুল

কাইয়িম ﷺ একে সর্বনিকৃষ্ট গুনাহর একটি হিসেবে গণ্য করতেন।

আল্লাহ ﷻ বলেন :

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَرَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

‘আপনি বলে দিন, আমার পালনকর্তা কেবল অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, এবং হারাম করেছেন গোনাহ, অন্যায়-অত্যাচার আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা, তিনি যার কোনো সনদ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যা তোমরা জানো না।’ (সূরা আরাফ, ৩৩)

ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেছেন, আল্লাহ ﷻ গুনাহকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ফেলেছেন। এই আয়াতে তিনি চার শ্রেণির গুনাহর কথা বলেছেন। প্রথমে বলেছেন ফাওয়াহিশের (কবীরা গুনাহ, যেমন যিনা ও ব্যভিচার) কথা, তারপর যুলুম, তারপর শিরক আর তারপর বলেছেন সর্বনিকৃষ্ট মাত্রার গুনাহর কথা—না জেনে আল্লাহ ﷻ-এর ব্যাপারে কথা বলা, না জেনে তাঁর ব্যাপারে কিছু আরোপ করা। আল্লাহ ﷻ শুরু করেছেন সবচেয়ে কমমাত্রার গুনাহ দিয়ে আর শেষ করেছেন সবচেয়ে নিকৃষ্টমাত্রার গুনাহর কথা বলে।

আল্লাহ ﷻ আরও বলেছেন :

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

‘তোমাদের মুখ থেকে সাধারণত যেসব মিথ্যা বের হয়ে আসে তেমনি করে তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বোলো না যে, এটা হালাল এবং ওটা হারাম। নিশ্চয় যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে, তাদের মঙ্গল হবে না।’ (সূরা আন-নাহল, ১১৬)

আতীক ইবনু ইয়াকুব এবং ইবনু ওয়াহযাব ﷺ বলেছেন, ইমাম মালিক ﷺ-কে তারা বলতে শুনেছেন যে, সাহাবা ﷺ ও সালাফগণ কখনো ‘হালাল’ বা ‘হারাম’ বলতেন না। বরং তারা বলতেন, ‘আমরা এটা পছন্দ করি’ বা ‘আমরা এটা অপছন্দ করি’। তাঁরা বলতেন, ‘অমুক কাজ করা উচিত’ বা ‘অমুক কাজ করা উচিত না’। হালাল হারাম শব্দগুলো তারা ব্যবহার করতেন না, কারণ এই আয়াতে বলা হয়েছে :

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

‘বলো, আল্লাহ নিজেই লক্ষ্য করো, যা কিছু আল্লাহ তোমাদের জন্য রিযিক হিসাবে অবতীর্ণ করেছেন, তোমরা সেগুলোর মধ্য থেকে কোনটাকে হারাম আর কোনটাকে হালাল সাব্যস্ত করেছ? বলো, তোমাদের কি আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, নাকি আল্লাহর ওপর অপবাদ আরোপ করছ?’ (সূরা ইউনুস, ৫৯)

আজকের অনেক অজ্ঞ লোকেরা কেবল বই পড়ে শিখতে গিয়ে যখন দেখে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহ কোনো বিষয়ে তার অপছন্দের কথা বলেছেন, তখন তারা বুঝতেও পারে না যে তিনি মূলত হারাম বুঝিয়েছেন। কেননা, ইমাম আহমাদ রহ ‘হারাম’ শব্দটি ব্যবহার করতেন না। আমি আগেও বলেছি, একা একা কোনো শিক্ষক ছাড়া পড়া, ইলম অর্জনের সঠিক উপায় না। আলিমদের মধ্যে অনেকেই ‘হারাম’ শব্দটি ব্যবহার করেননি। এ বিষয়টি অনেক ছাত্রদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। আল্লাহ স্ব-এর ডয়ে তাঁরা হারাম-হালাল বলা থেকে বিরত থাকতেন। তারা বলতেন ‘এটা পছন্দনীয়’, ‘ওটা অপছন্দনীয়’। ইমাম মালিক রহ এমন অসংখ্য উদাহরণ এনেছেন যেখানে সালাফরা ‘হারাম’ বোঝাতে ‘মাকরুহ’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাঁদের মধ্যে সাধারণভাবে এভাবে বলার প্রচলন ছিল।

আবদুল্লাহ ইবনু আমর রহ বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءَ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ زُؤُوسًا جُهَالًا فَسَلُّوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

‘আল্লাহ মানুষের অন্তর থেকে ইলমকে টেনে বের করে নেবেন না; বরং আলিমদের মৃত্যুর মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নেবেন। এমনকি যখন কোনো আলিম অবশিষ্ট থাকবে না তখন লোকেরা মূর্খদের নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে। তাদের কোনো মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তারা বিনা ইলমেই ফতোয়া দেবে। ফলে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং মানুষদেরও পথভ্রষ্ট করবে।’^{১০১}

فَضَّلُوا وَأَضَلُّوا

এরা নিজেরাও পথভ্রষ্ট আর অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করবে।

তাই সেই বিষয়গুলোর দাওয়াহ দিন যেগুলো আপনি সঠিকভাবে, নিশ্চিতভাবে জানেন। আর যে বিষয়ে জানেন না, তা নিয়ে দাওয়াহ করা থেকে বিরত থাকুন। এসব ব্যাপারে কেউ আপনাকে জিজ্ঞেস করলে বলে দিন যে আপনি জানেন না। কিংবা সময় নিয়ে সেই বিষয়ে গবেষণা করে, লেখাপড়া করে তাকে জানান। তবে তাই বলে দাওয়াহ বন্ধ করে দেবেন না। ‘আমি কিছু জানি না তাই দাওয়াহ করব না’ এমন বলবেন না। বরং যা জানেন তা অন্যকে জানান, আর যা জানেন না সেই বিষয়ে কথা বলা থেকে বিরত থাকুন।

উসুল আস-সালাসাহর লেখক তিনটি মৌলনীতি নিয়ে আলোচনার আগে চারটি বুনিয়াদি বিষয়ের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, এই চারটি বুনিয়াদি বিষয় সম্পর্কে জানা অত্যাবশ্যিক। প্রথমটি হলো ইলম-আল্লাহ ﷻ, তাঁর রাসূল ﷺ আর দ্বীন সম্পর্কে ইলম বা জ্ঞান অর্জন করা। অর্থাৎ যে বিষয়গুলোর ব্যাপারে কবরে আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, সেগুলো সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। দ্বিতীয়টি হলো এই জ্ঞান বা ইলমের ওপর আমল করা, তৃতীয়টি হলো দাওয়াহ ইলাল্লাহ বা এ ইলম মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া।

লেখক বলেছেন,

الدَّعْوَةُ إِلَيْهِ

অর্থাৎ, পৌঁছে দেয়া, জানিয়ে দেয়া। কী পৌঁছে দিতে হবে?

গত দারসের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, আমাদের আহ্বান করতে হবে ইলম অর্জন ও তার ওপর আমল করার দিকে।

দাওয়াহর অজুহাতে গুনাহম লিপ্ত হবেন না :

কিছু মানুষ নিজেদের সাথে প্রতারণা করে। আল্লাহ ﷻ-এর সাথে প্রতারণা করা যায় না, তাই তারা আসলে নিজেদেরকেই প্রতারিত করে। নিজেদের গুনাহ আর ভুল অবস্থানগুলোকে তারা দাওয়াহর অজুহাতে জায়েজ করতে চায়। যেখানে মদ পরিবেশন করা হচ্ছে আপনি সেখানে থাকতে পারবেন না। মদের টেবিলে বসে আপনি দাবি করতে পারেন না যে, আপনি সেখানে দাওয়াহর জন্য বসে আছেন। উমার রাদী আল্লাহু আনহু-এর কাছে এমন একটি ঘটনার ব্যাপারে অভিযোগ এসেছিল। যারা মদ খেয়েছিল তাদের আগে যারা মদ খায়নি তিনি তাদের বেত্রাঘাত করার আদেশ দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ যখন বলল তারা সাওম পালন করছে, উমার রাদী আল্লাহু আনহু আগে সাওম পালনকারীদের শাস্তি দেবার আদেশ দিয়েছিলেন।

একজন মুসলিম ভাইয়ের কখনো উচিত না অমার্জিত, অশালীন পেশাক পরা নারীদের কাছে গিয়ে দাওয়াহ দেয়া বা একা একা নির্জনে কোনো বোনকে কুরআন শিক্ষা দেয়া। এমন কাজ করা যাবে না এবং এটাকে দাওয়াহও বলা যাবে না। আজ এমন অনেকে আছে যাদের দেখে মনে হবে এরা মডেল হবার চেষ্টা করছে—টাইট জিন্স পরে, মাথায় কাপড় প্যাঁচিয়ে, হাতে লিফলেট নিয়ে এরা মানুষের সামনে যাচ্ছে আর বলছে, এটা দাওয়াহ! না, এমন করা যাবে না। বিষয়টি নিয়ে আমি আলোচনা করছি কারণ আজ এগুলো মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়েছে। যেমন : মুসলিমদের বিয়ের অনুষ্ঠানগুলোতে এ ধরনের স্থাপারগুলো আজ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। যেহেতু এ ধরনের কাজ যারা করছেন তারা সালাত আদায় করেন, তাই আমরা তাদের কাফির বলতে পারি না। কিন্তু জেনে রাখুন, এ রকম আচরণ কবীরা গুনাহ। বিয়ের অনুষ্ঠানগুলোতে সব রকমের গানবাজনা থাকে। থাকে নিসার্ডিন কাসিয়াতুন আরিয়াত^(১), নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, আর নারীদের এমন বেশভূষা যা দেখা গায়েরে মাহরামের সম্পূর্ণ নাজায়েয। অথচ অনেকে এমন অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন, দিব্যি অবস্থান করছেন এমন পরিবেশে। আপাতদৃষ্টিতে বেশ ধার্মিক, দীনদার ভাইদেরও এমন করতে দেখা যায়। যদি জিজ্ঞেস করা হয়, এখানে তিনি কী করছেন, কেন তিনি এমন একটা জায়গাতে স্বেচ্ছায় অবস্থান করছেন? উত্তর আসবে, দাওয়াহর খাতিরে। এটা প্রায়শই দেখা যায়। আমি বলছি না যে সবাই এ রকম কাজ করে, কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় বিয়ের অনুষ্ঠানের ফিতনাময় পরিবেশে অবস্থানের জন্য দাওয়াহর অভ্যুত্থান দেয়া হচ্ছে। এ রকম পরিবেশে যাওয়া কেবল তখনই জায়েজ হবে যখন আপনি জানেন যে এসব হারাম কাজ থেকে তাদের আপনি বিরত রাখতে পারবেন। আর এটা হলো আমার বিল মাক্রুফ আর নাহি অনিল মুনকার—সং কাজের আদেশ ও অসং কাজে নিষেধের সর্বোত্তম পন্থা। যদি আপনি নিশ্চিত হন আপনার কথা শুনে তারা এসব বন্ধ করবে, তাহলে আপনার যাওয়া কেবল উচিতই নয়, বরং আপনাকে যেতে হবে এবং তাদের এসব কাজ থেকে বিরত করতে হবে। আর যদি আপনি জানেন যে তারা আপনার কথা শুনবে না, তাহলে আপনার এসব জায়গায় অবস্থান করা উচিত না।

চার মায়হাবের ফিকহের কিতাবাদি—দুররুল মুখতার, মালিকি মায়হাবের আদ-দুসুকি, আশ-

৯৫ এমন নারী, যে কাপড় পরেও উলঙ্গ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرُفْهُمَا مَعَهُنَّ سَيِّئَاتٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَطْرُقُونَ بِهَا النَّاسَ زُفَاءً غَلِيظَاتٍ غَارِبَاتٍ مُبِيلَاتٍ مَالِهَاتٍ زُرُوسُهُنَّ كَأَشْيَةِ الْخَيْبِ النَّاهِلَةِ لَا يَذْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُجِدْنَ رِيحَهَا زَائِلٌ رِيحُهَا يُورِثُ مِنْ سَمِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا»

আবু হুরাইরা (رضি) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, “দুই প্রকার জাহান্নামী মানুষ আসবে, যাদের আমি আমার যুগে দেখতে পাচ্ছি না। এক প্রকার হচ্ছে, ওই সমস্ত ব্যক্তি, যাদের হাতে গরুর লেজের মতো লাঠি থাকবে, তা দিয়ে তারা মানুষকে পেটাবে। আর দ্বিতীয় হলো, ওই সকল মহিলা যারা কাপড় পরিধান করেও উলঙ্গ থাকবে। তারা সাজসজ্জা করে পরপুরুষকে আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও অন্য পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথার খোপা (সাজসজ্জা ও ফ্যাশানের দরুন) উটের কুঁজের মতো এদিক-ওদিক হেলানো থাকবে। তারা জামাতে প্রবেশ করবে না, এমনকি তারা জামাতের সুগন্ধিটুকুও পাবে না। অথচ, জামাতের সুগন্ধি পাঁচ শ বছর রাস্তার দূরত্ব থেকেও অনুভব করা যাবে।” (সহিহ মুসলিম : ৫৭০৪)

শিরাজির আল মুহাযযাব, ইবনু দ্বইয়্যান-এর মুবদা এবং ইবনু কুদামার আল-মুগানি খুলে দেখুন। দেখবেন বলা হয়েছে, কোনো মুনকার বা মন্দ কাজ থামানোর সামর্থ্য থাকলে তা করা উচিত, আর তা না হলে এমন কোনো জায়গায় অবস্থান করা উচিত না যেখানে গুনাহ হচ্ছে। আপনাকে নিমন্ত্রণ করা হলেও না। আমি আলাদা করে নিমন্ত্রণের ব্যাপারটা উল্লেখ করলাম, কেননা অধিকাংশ আলিমের মত হলো একজন মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমের দাওয়াত বা নিমন্ত্রণ রক্ষা করা ওয়াজিব। তাহলে দেখুন, যদিও নিমন্ত্রণ রক্ষা করা ওয়াজিব, কিন্তু যখন সেটা এমন জায়গাতে হয় যেখানে প্রকাশ্যে গুনাহ ও ফাহিশা চলছে, তখন সেখানে যাওয়া আর ওয়াজিব থাকে না। যে কিতাবগুলোর কথা ওপরে বললাম সেগুলোতে বলা আছে এ রকম ক্ষেত্রে ওয়াজিব পরিবর্তিত হয়ে হারাম হয়ে যায়। অর্থাৎ আপনি যদি সেখানে গিয়ে গুনাহ বা ফাহিশা বন্ধ করতে না পারেন, তাহলে সেখানে যাওয়া আপনার জন্য হারাম।

আমাদের এমন অনেক ভূখণ্ড আছে, যেগুলো দখল হয়ে আছে আজ অর্ধ-শতাব্দীরও বেশি সময়জুড়ে। এর মধ্যে এমনও ভূমি আছে, যেখানে অবস্থিত আমাদের তৃতীয় পবিত্রতম মসজিদ। ‘...মুক্ত করো! মুক্ত করো!’—স্লোগান দেয়ার অনেকে আছে। মুক্ত করা নিয়ে তারা বিস্তার কথা বলে। কিন্তু সব কথা শেষ হবার পর, বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। প্রশ্ন করতে হয়, কেন উম্মাহর দুর্বল শরীর আজ এ নর্দমায় এসে ঠেকেছে? পবিত্র ভূমিকে ঘিরে যা হচ্ছে, কেন তা এত বছর ধরে চলছে? কেন লজ্জা আর অপমানের মধ্যে দিয়ে আমাদের এতগুলো বছর অতিক্রম করতে হচ্ছে? আমাদের উচিত চিন্তা করা, বিশ্লেষণ করা।

ধরুন একটি কোম্পানি লস করল। তখন কী হয়? কোম্পানির সিইও তার ম্যানেজার আর অন্যান্য উচ্চপদস্থ অফিসারদের নিয়ে মিটিংয়ে বসে। মিটিংয়ে সিইও সাধারণত ধরাবাঁধা কিছু প্রশ্ন করে :

কী করা যায়?

কোন স্ট্র্যাটিজি অনুসরণ করলে আগের মতো প্রফিট করা যাবে?

আমরা এখন যা করছি তার মধ্যে কী কী পরিবর্তন আনা দরকার?

মুসলিম-অমুসলিম সব জেনারেলরাই যুদ্ধে পরাজয়ের পর নিজেদের একটা ট্যাকটিকাল প্রশ্ন করে—আমরা এ যুদ্ধে কেন হারলাম?

এ হারের পেছনে কী কারণ ছিল?

একই রকমভাবে যখন ১.৬ বিলিয়নের মুসলিম উম্মাহ, ছয় কিংবা বড়জোর ১৬ বিলিয়নের একটি জাতির কাছে পরাজয়, লাঞ্ছনা আর অপমানের তিস্ততম স্বাদ অনুভব করে, তখন আমাদেরও প্রশ্ন করা দরকার :

কেন?

সাহাবি ﷺ-গণও পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন। উহদের যুদ্ধে সাময়িক পরাজয়ের পরে এই পরাজয়ের কারণ সম্পর্কে তারা নিজেদের প্রশ্ন করেছিলেন :

أَوَلَمْآ أَصَابَكُمْ مِصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا فُلْنُمْ أَنَّى هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

‘যখন তোমাদের ওপর একটি মুসিবত এসে পৌঁছাল, অথচ তোমরা তার পূর্বেই দ্বিগুণ কষ্টে পৌঁছে গিয়েছ, তখন কি তোমরা বলবে, এটা কোথা থেকে এল? তাহলে বলে দাও, এ কষ্ট তোমাদের ওপর পৌঁছেছে তোমাদেরই পক্ষ থেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ের ওপর ক্ষমতাশীল।’ (সূরা আলি ইমরান, ১৬৫)

যেভাবে আমরা চিন্তা করছি কেন আজ আমরা অধঃপতনের সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছেছি, ঠিক তেমনিভাবে উহদের পরাজয়ের পর মদীনা ফেরার পথে সাহাবি ﷺ-গণও প্রশ্ন করেছিলেন—
কেন?

أَنَّى هَٰذَا

কেন আমাদের সাথে এমনটা হলো?

কোন স্ট্র্যাটিজি অনুসরণ করলে আমরা হার এড়াতে পারব?

আমরা কেন হারলাম? কী কী কারণে?

মদীনায় পৌঁছানোর আগেই আল্লাহ ﷻ তাদের প্রশ্নের জবাব দিলেন।

قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ

‘তাহলে বলে দাও, এ কষ্ট তোমাদের ওপর পৌঁছেছে তোমাদেরই পক্ষ থেকে।’

আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ

‘তোমার রব বান্দাদের প্রতি কোনো যুলম করেন না।’ (সূরা ফুসসিলাত, ৪৬)

নিজেকে যাচাই করে দেখুন। উপকরণের মাধ্যমে মুক্তি আসে না; বরং শয়তানের তৈরি উপকরণ অধঃপতন ডেকে আনে। শয়তানের তৈরি পদ্ধতি দিয়ে দখল হয়ে যাওয়া ভুখণ্ড মুক্ত করা সম্ভব না। শয়তানের তৈরি ব্যবস্থা মুক্তির উপায় না; বরং অধঃপতনের কারণ। আপনি কার কাছ থেকে বিজয় আশা করছেন? কোন বিজয় আশা করছেন? বিজয় কে দেবে?

পাপাচার ছড়িয়ে পড়লে সবার ওপরে এর প্রভাব পড়ে :

সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির অবস্থাই এমন বা প্রত্যেকে গুনাহতে লিপ্ত, আমি সেটা বলছি না। আমি এটাও বলব না যে, সমাজের বেশির ভাগ মানুষ এসবে লিপ্ত; বরং আমি এমনভাবে বলব যে হয়তো বেশির ভাগ মানুষই এমন না। কিন্তু গুনাহ যখন জনসাধারণের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে যায় তখন তা কোনো না কোনোভাবে সমাজের প্রতিটি মানুষকে প্রভাবিত করে। ফিলিস্তিন কিংবা আমাদের এখানে (আমেরিকা) এমন কিছু শহর আছে যেখানে বিয়ের অনুষ্ঠানে বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয়। সেখানে এটা ব্যতিক্রম না, এগুলোই স্বাভাবিক রীতি। বরং কেউ যদি গান-বাজনা ছাড়া ইসলামি রীতি অনুসারে বিয়ে করতে চায়, তাহলে সে অস্বাভাবিক, অদ্ভুত, অসামাজিক ইত্যাদি নানা উপাধি পায়। এগুলো আজ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, প্রচলিত রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি বারবার বলছি এবং বলব, সবাই যে এমন করছে তা না। বরং আমরা একটু বাড়িয়েই বলব যে, হয়তো অধিকাংশই এমন করছে না। কিন্তু এসব গুনাহ আজ সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে গেছে, এটা বাস্তবতা।

উহদের যুদ্ধে আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর রাঃ-এর অধীনে ছিলেন পঞ্চাশজন সেনা। রাসূলুল্লাহ সঃ-এর আদেশ অমান্য করার নিয়ত বা উদ্দেশ্য তাঁদের ছিল না। বরং তারা ছিলেন এমন সব মানুষ, যারা রাসূলুল্লাহ সঃ-এর জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত ছিলেন। যুদ্ধের একটি পর্যায়ে উদ্ভূত পরিস্থিতির আলোকে নিজেদের অবস্থান থেকে তাঁরা একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাঁরা যেটাকে সঠিক মনে করেছিলেন, সেটাই করেছিলেন। সাহাবি রাঃ-দের সম্মান, মর্যাদা ও তাদের প্রতি শ্রদ্ধার কারণে, 'তারা ভুল করেছিলেন' এভাবে আমরা বলি না। বরং আমরা বলি উদ্ভূত পরিস্থিতির আলোকে নিজেদের অবস্থান থেকে তাঁরা একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর রাঃ বাকিদের বললেন, আমি পাহাড় থেকে নামব না, কারণ রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন কোনো অবস্থাতেই এই স্থান ত্যাগ না করতে। তাই এখান থেকে আমি সরব না। দেখুন কীভাবে সাত শ জন যুগশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি পরাজিত হলেন, কারণ মাত্র পঞ্চাশজন এমন একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যা সঠিক ছিল না। এ পঞ্চাশজনের মধ্যে অনেকে কিন্তু শেষপর্যন্ত পাহাড়ের ওপরে অবস্থান করেছিলেন। তাই সংখ্যাটা আসলে পঞ্চাশের চেয়ে কম। সেই সময়ের সম্পূর্ণ মুসলিম উম্মাহ পরাজিত হলো পঞ্চাশজনের চেয়েও কমজনের সিদ্ধান্তের কারণে। তাহলে গুনাহ আর অসং কাজ যখন ছড়িয়ে পড়ে, যখন ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে যায় তখন তো উম্মাহ পরাজিত আর লালিত হবেই। এটাই নিয়ম।

قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ

'তাহলে বলে দাও, এ কষ্ট তোমাদের ওপর পৌঁছেছে তোমাদেরই পক্ষ থেকে।'

আমি সজ্ঞানে, দায়িত্ব নিয়ে বলছি—ফিলিস্তিনে এমন কিছু শহর আছে যেখানে বিয়ের অনুষ্ঠানে নির্লজ্জভাবে নারী-পুরুষের মেলামেশা হয় আর নারীরা এমন সব অশালীন পোশাক পড়ে যা

আমাদের শত্রুদের (ইহুদি) সংস্কৃতিকেও হার মানাবে। আমি এই শহরগুলোর নাম আর উল্লেখ করলাম না।

সুনান আত-তিরমিযি একটি সহিহ হাদিসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এই উম্মাহর মাঝে ‘মাসখ’ ঘটবে।

মাসখ কী?

মাসখের সংজ্ঞায় আল মানাওয়ি বলেছেন,

‘মাসখ হলো, চেহারাকে বিকৃত করে দেয়া, অথবা অন্তরকে বিকৃত করে দেয়া।’^(১০)

উম্মাহর মধ্যে একসময় মাসখ ঘটবে শুনে সাহাবি রূহ-গণ জিজ্ঞেস করলেন এটি কোন সময়ে ঘটবে? তার আগে আসুন মাসখ নিয়ে আরেকটু বিস্তারিতভাবে জানা যাক।

মাসখ হলো মানুষকে অন্য কোনো কিছুতে রূপান্তর করে দেয়া। যেমন : এটা হতে পারে মানুষকে বানর ও শূকরে পরিণত করে দেয়া, যেমন অন্য হাদিসের বর্ণনায় এসেছে। যদিও এই হাদিসে নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি তবুও হতে পারে যে মানুষকে বানর কিংবা শূকর বানিয়ে দেয়া হবে। আবার মাসখ দ্বারা এটাও বোঝানো হতে পারে যে, মানুষের মন-মানসিকতা বদলে দেয়া হবে। হতে পারে আপনি কারও সাথে কথা বলছেন, যে বাহ্যিকভাবে মানুষের মতো দেখতে, কিন্তু তার মানসিকতা মোটেই মানুষের মতো না। আপনি তাকে বোঝাচ্ছেন, ডাই, আল্লাহর কসম এটা তো হারাম কাজ-কিন্তু সে কিছুই বুঝছে না। আপনার কথা আর তার বুকের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। তাই এই হাদিস দিয়ে শারীরিক রূপান্তর কিংবা মানসিকতার পরিবর্তন দুটোকেই বোঝানো হতে পারে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, مَنْ خُسِفَ وَخُسِفَ خَاسِفٌ وَ مَسْخُ وَ خَاسِفٌ, অর্থাৎ ভূমিকম্প হবে, ভূপৃষ্ঠে ফটল ধরবে আর তা অনেক মানুষকে গ্রাস করে নেবে। এটা হলো খাসফ।

তৃতীয় যে বিষয়টির কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন তা হলো, কাযফ। কাযফ হলো আকাশ থেকে প্রস্তরবৃষ্টি-যেমনটি আবরারাহ আর তার হস্তীবাহিনীর ওপর হয়েছিল। সাহাবি রূহ-গণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, কখন এগুলো সংঘটিত হবে? তিনি ﷺ জবাব দিলেন, যখন কায়নাত আর মা’আযিফ ছড়িয়ে পড়বে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِذَا ظَهَرَتْ

অর্থাৎ, যখন এগুলোর আবির্ভাব ঘটবে। যখন এগুলো দেখা দেবে। যাহারাত বলতে কিন্তু ব্যাপক প্রচলনের চেয়ে কম মাত্রা বোঝানো হয়।

কায়নাত আর মা'আযিফ কী? কায়নাত হলো বিনোদনকারী আর সংগীতশিল্পী যারা হারামের দিকে অনুপ্রাণিত করে, আর মা'আযিফ হলো শয়তানের বাদ্যযন্ত্র। আবু আমীর বা আবু মালিক থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদিসে এসেছে :

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ

'আমার উম্মাহর মধ্যে এমন কিছু লোক আসবে যারা যিনা, রেশম, মদ, গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে।' (১৯)

এখানে কাফিরদের কথা বলা হচ্ছে না। মুসলিমদের কথা বলা হচ্ছে। এই উম্মাহর মধ্যে কিছু মানুষ থাকবে যারা যিনা ও ব্যতিচারকে হালাল মনে করবে, হালাল মনে করবে মদ খাওয়া, বাদ্যযন্ত্র আর পুরুষদের রেশম পরাকে। হয় তারা কাজের মাধ্যমে প্রকাশ করবে যে এগুলো হালাল অথবা সরাসরি মুখে এগুলোকে হালাল বলবে। আর আজকের দিনে এমন অনেক উদাহরণ দেখা যাচ্ছে।

আবার অনেক হাদিসে রাতারাতি শাস্তি আসার বর্ণনা এসেছে। কিছু লোকের পাশ দিয়ে যাবার সময় এক বেদুইন তাদের কাছে কিছু জিনিস চাইবে। কী চাইবে, হাদিসে সেটা উল্লেখ করা হয়নি। হয়তো-বা সে কিছু কিনতে চাইবে বা অন্য কিছু। এই লোকগুলো গুনাহতে ডুবে থাকবে। ব্যবসায়িক লেনদেন বা অন্য যে জিনিস বেদুইন চাইবে, সেটার জবাবে তারা বলবে, তুমি আগামীকাল এসো, যা চাইছ পাবে। কিন্তু পরের দিন ঘুম থেকে উঠে এই লোকেরা দেখবে যে তারা বানর ও শূকরে পরিণত হয়েছে। এই হাদিসে এটাই বোঝানো হচ্ছে, এ ধরনের লোকদের জন্য আল্লাহ ﷻ-এর আযাব কতটা দ্রুত আসতে পারে। এরা মুসলিম উম্মাহরই অংশ। আল্লাহ ﷻ এদের বানর ও শূকরে পরিণত করবেন আর কিয়ামত পর্যন্ত তারা এই অবস্থায় থাকবে। (২০) যখন তারা হারাম বিষয়গুলোকে হালাল মনে করতে শুরু করবে, যার মধ্যে আছে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ও এগুলোকে হালাল মনে করা, তখন আল্লাহ ﷻ নাযিল করবেন আকস্মিক আর ভূরিত শাস্তি। আজ তাকিয়ে দেখুন বিশ্বের সব জাতির মধ্যে মুসলিম উম্মাহই সবচেয়ে বেশি লাক্ষিত। এর চেয়ে বড় শাস্তি আর কী হতে পারে? হয় বা মোলো মিলিয়ন ইহুদি যখন ১.৬ বিলিয়নের জাতিকে পদাবনত করে তখন সেটাকে ঐতিহাসিক মাত্রার পরাজয় বলতেই হয়।

দেখুন হাদিসে বলা হচ্ছে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ও একে হালাল মনে করার কারণে কিছু মুসলিম বানর ও শূকরে পরিণত হবে। আবার আমাদের শত্রু ইহুদিদের ব্যাপারে কুরআনে বলা আছে :

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِّنْ ذَلِكَ مُتَوَبَّةٌ عِنْدَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَعَصَيْبٌ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْفِرَّةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتُ^১ أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ

'বলুন, আমি তোমাদের বলি, তাদের মধ্যে কার মন্দ প্রতিফল রয়েছে আল্লাহর কাছে? যাদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন, যাদের প্রতি তিনি ক্রোধাশ্রিত হয়েছেন, যাদের কতককে বানর ও শূকরে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন এবং যারা শয়তানের আরাধনা করেছে, তারাই মর্যাদার দিক দিয়ে নিকৃষ্টতর এবং সত্য পথ থেকেও অনেক দূরো।' (সূরা মায়িদা, ৬০)

এই আয়াতে মুসলিম উম্মাহ সম্পর্কে বলা হচ্ছে না, আজ যারা আমাদের শত্রু, সেই ইহুদিদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে। ওপরে উল্লিখিত হাদিস দুটিতে এই উম্মাহ সম্পর্কে আর এই আয়াতে আমাদের শত্রুদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। সুতরাং বানর ও শূকরে রূপান্তরিত করে দেয়ার ব্যাপারটি দুই দিকের লোকদের সাথেই ঘটবে। আর একদল বানর ও শূকরের যখন আরেকদল বানর আর শূকরের সাথে যুদ্ধ করে, তখন যারা বেশি শক্তিশালী তারাই তো জিতবে।

আজ মহামারির মতো এই গুনাহগুলো ছড়িয়ে গেছে, প্রচলিত হয়ে গেছে। এ সত্য অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। এগুলো এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, আপনি কাউকে গিয়ে বলতেও পারবেন না যে এগুলো হারাম। ওয়াল্লাহি! এখানে এমন কিছু ক্লাব আছে যেখানে কফি খেতে খেতে মানুষ গীবতসহ আরও নানা হারাম কাজে সময় কাটায়, আর এসবের মধ্যেই ইসলামি লেকচার দেয়ার জন্য বিভিন্ন বক্তাকে আমন্ত্রণ করে আনে। আমন্ত্রণ করার আগে তারা বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে বক্তার মতামত জেনে নেয়। যদি সে একে হারাম বলে, তাহলে আর তাকে আমন্ত্রণ করা হয় না। ওয়াল্লাহি! এগুলো এখানে ঘটে আর আমরা অনেকেই এগুলো জানি। যখন গুনাহ আর ফাহিশা এভাবে ছড়িয়ে পড়ে তখন আল্লাহ ﷻ সবাইকে দায়ী করেন। যারা গুনাহর কাজে লিপ্ত হয় আর যারা এগুলো থেকে বিরত থাকে—সবাইকেই দোষী বিবেচনা করা হয়। আর এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে আমাদের আজকের অপমানজনক অবস্থা আর লাঞ্ছনাময় পরাজয়ের পেছনে বড় ভূমিকা আছে এসব অবৈধ উৎসব-অনুষ্ঠান আর ফাহিশার।

দাওয়াহর সঠিক পদ্ধতি জানতে হবে :

ভালো আমল করা, বিভিন্ন হালাকায় উপস্থিত হওয়া, দ্বীনের ব্যাপারে আন্তরিক ভাইদেরও অনেক সময় এ ধরনের ফাহিশাপূর্ণ অনুষ্ঠানে যেতে দেখা যায়। প্রায়ই এমনটা ঘটে। এটা দুঃখজনক ও খুবই বিরক্তিকর। কেন আপনি এমন পরিবেশে গেলেন? কোন অজুহাতে? তাদের অজুহাত হলো—দাওয়াহর জন্য। কেন আপনি এই পাপের মাঝে অবস্থান করলেন? উত্তর হলো—দাওয়াহ। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করুন, তিনি কি ওখানে দাওয়াহ করেই ফিরে এসেছেন? উত্তর আসে, না। আপনি কি ওখানে গিয়ে তাদের গুনাহ থেকে বিরত করেছেন? না। এমনকি ওখানে হালাল-হারামের ব্যাপারে একটা কথাও বলেছেন? না। আসলে, আপনি মনে করছেন, যেহেতু আপনার দাড়ি আছে, যেহেতু বেশভূষায় আপনাকে দেখে দীনদার মনে

হয় আর আপনি আপনার হিজাব পরা স্ত্রীকে নিয়ে যাচ্ছেন, তাই আপনার উপস্থিতিই অন্যদের জন্য দাওয়াহ। এটা শয়তানের খোঁকা ছাড়া আর কিছু না।

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

‘বলুন, আমি কি তোমাদের সেসব লোকের সংবাদ দেবো, যারা কর্ণের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত। তারাই সে লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে বিভ্রান্ত হয়, অথচ তারা মনে করে যে, তারা সংকর্ম করেছে।’ (সূরা আল-কাহফ, ১০৩-১০৪)

এমন অনেক লোক আছে যারা সংকর্ম মনে করে আসলে মন্দ কাজ করছে। যেমন : এখানে তারা ভাবছে যে তারা দাওয়াহ করছে, কিন্তু যা তারা করছে সেটা আসলে খারাপ। কাজেই দাওয়াহ দেয়ার অজুহাতে এসব জায়গায় যাবেন না। আপনি যদি মনে করেন, এসব লোকের ওপর আপনার প্রভাব খাটবে, আপনার কথা শুনে তারা এসব গুনাহ থেকে বিরত হবে, কেবল তখনই যাবেন। আর তা না হলে এসব জায়গা থেকে দূরে থাকুন। তাদের থানাতে পারলে যাবেন, না হয় যাবেন না। সং কাজের আদেশ আর মন্দ কাজের নিষেধ করার ক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন যে, গুনাহ করা ব্যক্তিদের এ ক্ষেত্রে হতে হবে সনাজের সংখ্যালঘু, বিচ্ছিন্ন। তাদের অনুসরণীয় বা আদর্শ মনে করলে হবে না। আজকাল কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী বিয়ে করার জন্য অনেক ভাইকে রীতিনীতি যুদ্ধ করতে হয়। দেখা যায় কনে নিজেই নানা আচার-প্রথা অনুযায়ী অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে চায়। কিছু আচার-প্রথা কুরআন-সুন্নাহর বিরুদ্ধে যায় না, আমরা সেগুলোকে নিয়ে আপত্তি করছি না। কিন্তু কুরআন আর সুন্নাহ-বিরোধী যেসব আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, ঐতিহ্য বা প্রথা আছে, কোনোভাবেই সেগুলোকে গ্রহণ করা যাবে না। এমন সবকিছু আমাদের পায়ের নিচে-সেঁটা যেই রীতি, ঐতিহ্য বা সংস্কৃতিই হোক না কেন। সবকিছুর ওপর প্রাধান্য পাবে কুরআন ও সুন্নাহ। যে ভাইবোনরা আজ কুরআন-সুন্নাহ অনুসারে বিয়ে করার জন্য রীতিনীতি যুদ্ধ করছেন, তারা হলেন সংখ্যালঘু, সমাজচ্যুত, বিচ্ছিন্ন। যারা গুনাহ আর ফাহিশা করার পক্ষে তারা না। ব্যাপকভাবে প্রচলন বলতে আমি এ অবস্থাকে বোঝাতে চেয়েছি। তাই দাওয়াহর অজুহাতে এসবে शामिल হবেন না।

একই জিনিস খাটে সেসব বোনদের বেলায় যারা সঠিকভাবে হিজাব পালন না করলেও ইউনিভার্সিটিতে টেবিলে সবার সামনে বসে লিফলেট বিলি করছেন। যদি তার কাছে জানতে চান সে কী করছে? সে বলবে, দাওয়াহ দিচ্ছে।

দাওয়াহ? এভাবে?

এটা তো দাওয়াহ সঠিক পন্থা না।

দাওয়াহর সঠিক পন্থা জানতে হবে। দাওয়াহ দিতে গিয়ে নিজে গুনাহয় লিপ্ত হওয়া যাবে না।

অবস্থান করা যাবে না প্রকাশ্য গুনাহ আর ফাহিশার পরিবেশে। ব্যতিক্রম হলো, যখন কেউ সুনিশ্চিতভাবে সেটা থামাতে সেখানে যাচ্ছে।

একই কথা প্রযোজ্য ওইসব লোকদের জন্য, যারা ইন্টারফেইথ বা আন্তঃধর্মীয় ফ্রোগান আর প্ল্যাটফর্মের অধীনে কাজ করতে যায়। তারা দাবি করে এটা দাওয়াহ। আপনি কেন ইন্টারফেইথ বা আন্তঃধর্মীয় সম্মেলনে এসেছেন? তাদের অজুহাত হলো, ভাই দাওয়াহর কারণে। এরা আহলে কিতাব, তাদের দাওয়াহ দেয়া আমাদের দায়িত্ব।

দাওয়াহ আর ইন্টারফেইথ এক না। দুটো আলাদা জিনিস। সবাই দাওয়াহর পক্ষে, কেউ এর বিরোধিতা করবে না। আর ইন্টারফেইথ হলো মৌলিকভাবে কুফর, এর যে মৌলিক ভিত্তি ও নীতি তা হলো নির্জলা কুফরের নীতি।^{১৯} যদি আপনি এটা না জানেন, তাহলে আপনার উচিত এ নিয়ে আরও পড়াশুনা করা। ইন্টারফেইথ বা আন্তঃধর্মীয় সম্মেলন ইত্যাদি শুধু কুফর না; বরং কুফরের ওপরে কুফর। আপনি এই কুফর ইন্টারফেইথের ব্যানারের অধীনে, ইন্টারফেইথের মধ্যে গিয়ে বক্তব্য দেবেন, কিংবা এমন কোনো সংগঠনের অংশ হবেন, আর তারপর বলবেন—আমি তো দাওয়াহর জন্য সেখানে গিয়েছিলাম? এটা গ্রহণযোগ্য না। দাওয়াহ করতে হলে দাওয়াহর ব্যানার নিয়ে যান। দরকার হলে কোনো নিরপেক্ষ, নিউট্রাল ব্যানারের অধীনে যান। কিন্তু ইন্টারফেইথের ব্যানারে না।

এই সব বলার উদ্দেশ্য হলো, দাওয়াহর নামে যেন আপনি গুনাহগারদের সাথে মেলামেশা না করেন। মুসলিমদের প্রতি উপহাস করা নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ ﷻ-এর আয়াত উল্লেখ করেছিলাম :

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَفْعَلُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

‘আর কুরআনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি এই হুকুম জারি করে দিয়েছেন যে, যখন আল্লাহর আয়াতসমূহের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও বিদ্রূপ হতে শুনবে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। তা না হলে তোমরাও তাদেরই মতো হয়ে

১৯ ইন্টারফেইথ বা ইন্টারফেইথ ডায়ালগ : আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি বা সংলাপ। এ-জাতীয় কার্যকলাপকে ঘিরে বিভিন্ন ধরনের মুখস্থ বুলি প্রচলিত থাকলেও অদতে আন্তঃধর্মীয় সমাবেশ, সম্প্রীতি ও সংলাপের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, ‘সকল ধর্ম সম্মান’, ‘সকল ধর্ম সঠিক’, ‘সকল পথই একই গন্তব্যে পৌঁছে দেয়’, ‘সকল ধর্ম এক’—এমন একটি দর্শনের প্রচার। এটি নির্জলা কুফর ও শিরক এবং বর্তমানের ইন্টারফেইথ আন্দোলন মূলত ফ্রিম্যাসনিক ‘এক ধর্ম, এক বিশ্ব’ এজেন্ডার বাস্তবায়ন। আল্লাহ ﷻ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, ইসলাম ছাড়া আর কোনো সঠিক ধর্ম নেই। ইমান ও কুফর, তাওহিদ ও শিরক, মুসলিম ও কাফির কখনো সমান হতে পারে না। অর্থিমদের মতে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি বা সংলাপের এ আদান হচ্ছে মূলত রিন্দার আদান। এ ব্যাপারে আরও জানতে দেখুন - <https://islamqa.info/en/10213> এবং লাজনাহ আদ দাইরাহর ফাতওয়া নম্বর ১৭,৩০০

যাবে। আল্লাহ দোষখের মাঝে মুনাফিক ও কাফেরদের একই জায়গায় সমবেত করবেন।’
(সূরা আন-নিসা, ১৪০)

তারা যখন ঠাট্টা-তামাশা, উপহাস করে তখন তাদের মাঝে অবস্থান করবে না, কেন? আল্লাহ ﷻ বলেন :

إِنَّكُمْ إِذَا مَثَلْتُمْ

তাদের মাঝে থাকলে আপনিও তাদের তাদের মতো হয়ে যাবেন।

এ কথা শুধু উপহাস না, বরং অন্য সব গুনাহর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

দাওয়াহর প্রমাণপঞ্জি :

মানুষকে আল্লাহ ﷻ-এর দিকে আহ্বান করুন ইলমের সাথে

আল্লাহ ﷻ বলেন :

قُلْ هَذِهِ سَبِيلُ اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعِيَ ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

‘বলে দিন, এই আমার পথ। আমি এবং আমার অনুসারীরা আল্লাহর দিকে বুঝে-সুঝে দাওয়াহ দিই। আল্লাহ পবিত্র এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।’ (সূরা ইউসুফ, ১০৮)

আল্লাহ ﷻ রাসূলুলাহ ﷺ-কে বলছেন, ‘বলুন, এই আমার পথ, আমি মানুষকে আল্লাহর দিকে দাওয়াহ দিই।’ এই দাওয়াহর জন্যই আমাদের পাঠানো হয়েছে। আমরা দাওয়াহর পক্ষে, আমরা দাওয়াহকে সমর্থন করি, আমরা দাওয়াহর বিরোধী না—কিন্তু দাওয়াহর সুনির্দিষ্ট নীতিমালা আছে, যেগুলো অনুসরণ করতে হবে।

أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ

আমি আল্লাহ ﷻ-এর দিকে বুঝে-সুঝে দাওয়াহ দিই।

আজ আপনারা সবাই এই দারসে অংশগ্রহণ করছেন, কেন? কারণ, আপনারা ইলমের মাধ্যমে এই শিক্ষা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান।

أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي

অর্থাৎ, আমি এবং আমার অনুসারীরা বুঝে-সুঝে সুস্পষ্ট জ্ঞান ও প্রমাণের ভিত্তিতে মানুষকে আল্লাহ ﷻ-এর একত্বের দিকে আহ্বান করি।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম رحمہ اللہ বলেছেন, নবি মুহাম্মাদ ﷺ যার প্রতি আহ্বান করেছেন, ইলমের সাথে ওই একই জিনিসের প্রতি আহ্বান করা ব্যতীত—আপনি তাঁর প্রকৃত অনুসারী হতে পারবেন না। এটা কুরআনের নিষেধাজ্ঞা।

أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ

আমি আল্লাহর দিকে বুঝে-শুনে দাওয়াহ দিই।

যেখানেই থাকুন না কেন, একজন দাঈ হিসেবে আপনি মানুষের সামনে এই শিক্ষা ও দাওয়াহ উপস্থাপন করবেন। আপনার কাজ বীজ বপন করা, বাকিটা আল্লাহ ﷻ-এর ওপর ছেড়ে দিন।

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

‘যে আল্লাহর দিকে দাওয়াহ দেয়, সংকর্ম করে এবং বলে, আমি একজন মুসলিম, তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার?’ (সূরা ফুসসিলাত, ৩৩)

দাওয়াহ আমাদের গর্ব :

বড় কোনো ফার্ম বা কর্পোরেশন কাউকে চাকরির প্রস্তাব দিলে আগ্রহভরে সে তা লুফে নেয়। সে প্রশিক্ষণ নেয়, যথাসম্ভব পড়াশোনা করে, চেষ্টা করে নিজের ফিল্ডে আরও দক্ষতা অর্জনের। এই উচ্চপদের চাকরির জন্য যা যা দরকার, তার সবই সে করে। ঠিক তেমনি, দাওয়াহও আল্লাহ ﷻ-এর দেয়া একটি অফার। কোনো প্রেসিডেন্ট কিংবা কর্পোরেশনের জব না, এটা আল্লাহ ﷻ-এর দেয়া চাকরি। এটা হলো আল্লাহ ﷻ-এর পক্ষ থেকে অফার এবং এর মাধ্যমে আপনি রাসূলদের চাকরি করবেন :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ.....

‘তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মাহ, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সং কাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।’ (সূরা আলি ইমরান, ১১০)

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ

তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মাহ

তোমরাই সর্বোত্তম। তোমরাই সর্বোত্তম ছিলে, আছো এবং ভবিষ্যতেও তোমরাই হবে মানবজাতির মধ্যে উত্তীর্ণ সর্বোত্তম জাতি—এটাই ‘কুনতুম’ (كُنْتُمْ) এর অর্থ। আমরা হলাম সর্বোত্তম উম্মাহ, আমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য। আমাদের দেয়া হয়েছে মানবজাতির নেতৃত্ব। কেন? আমরা আরব এই জন্য? কালো, এই জন্য? আমাদের

মধ্যে ভো সাপা-কালো, আরব-অনারব, উপমহাদেশীয় সবাই আছে। তাহলে কেন আমরা অন্যান্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ? আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি কি জাতিগত কোনো কিছু? জাতীয়তাবাদ কিংবা বর্ণের ওপর ভিত্তি করে কি আল্লাহ ﷻ আমাদের শ্রেষ্ঠ উম্মাহ আখ্যা দিয়েছেন? না, আমাদের শ্রেষ্ঠ উম্মাহ বলা হয়েছে তাওহিদের দাওয়াহ বহন করা এবং মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব পালনের কারণে।

تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।

আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মাহ হবার কারণ এটাই। আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মাহ কারণ আমরা মানুষকে আল্লাহ ﷻ-এর দিকে আহ্বান করি। আমরা দাওয়াহর উম্মাহ, আমরা মানুষের মাঝে ইসলামের শিক্ষা ছড়িয়ে দিই; আর এ জন্যই আল্লাহ ﷻ আমাদের অন্যান্য জাতির ওপর মর্যাদা দিয়েছেন, এই দাওয়াহ বহন ও পৌঁছে দেয়ার কারণে সম্মানিত করেছেন। তাওহিদের দাওয়াহ আমাদের সম্মানের উৎস। জাতীয়তাবাদ বা বর্ণ-পরিচয়ের কারণে আমরা সম্মানিত না।

قُلْ إِنِّي لَنْ يُخَيِّرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝ إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ ۚ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا ۝

'বলুন, আল্লাহর কবল থেকে আনাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং তিনি ব্যতীত আমি কোনো আশ্রয়স্থল পাব না। কিন্তু আল্লাহর বাণী পৌঁছানো ও তাঁর পয়গাম প্রচার করাই আমার কাজ। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি। তথ্যই তারা চিরকাল থাকবে।' (সূরা আল-জিন, ২২-২৩)

আল্লাহ ﷻ নবি ﷺ-কে বলছেন, বলুন, আমি যদি আল্লাহর অবাধ্য হই, তবে তাঁর আযাব থেকে কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। এ কথা নবি ﷺ-কে বলতে বলা হচ্ছে তাঁর নিজের ব্যাপারে, কিন্তু এটা আমাদের সবার ওপর প্রযোজ্য। এমন কে আছে যে আমাদের রক্ষা করবে আল্লাহ ﷻ-এর আযাব থেকে?

إِنِّي لَنْ يُخَيِّرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا

আল্লাহর কবল থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং তিনি ব্যতীত আমি কোনো আশ্রয়স্থল পাব না। (সূরা আল-জিন, ২২)

إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ

কিন্তু আল্লাহর বাণী পৌঁছানো ও তাঁর পয়গাম প্রচার করাই আমার কাজ। (সূরা আল-জিন, ২৩)

আল্লাহ ﷻ-এর এই আযাব থেকে রক্ষা করার কেউই নেই। এ কথা বিশ্বাস করা আবশ্যিক এবং এমন কোনো মুমিন নেই, যে এ কথা অস্বীকার করে। আল্লাহ ﷻ আযাব দিতে চাইলে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। তবে কিছুসংখ্যক আলিম বলেছেন, এ আয়াত প্রমাণ করে যে, তাওহীদের বাণী প্রচার করা, অর্থাৎ দাওয়াহ, আল্লাহ ﷻ-এর আযাব থেকে রক্ষা করে। আল্লাহ ﷻ-এর আযাব থেকে রক্ষা পাবার অন্যতম একটি উপায় হচ্ছে দাওয়াহ। দাওয়াহর কারণেই আমরা সম্মানিত, দাওয়াহ আমাদের গর্ব।

উঠুন, সতর্ক করুন :

নবুওয়াতের প্রথমদিকে আল্লাহ ﷻ মুহাম্মাদ ﷺ-কে বলেন :

يَا أَيُّهَا الْمَدْيِرُ ○ فُمْ فَأَنْذِرْ

‘হে বজ্রাবৃত, উঠুন, সতর্ক করুন।’ (সূরা আল-মুদ্দাসসির, ১-২)

এখানে ‘উঠুন, সতর্ক করুন’ এর অর্থ দাওয়াহ, অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ। ওয়াল্লাহি, যখন আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠলেন এবং সেই থেকে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত বিশ্রাম নিলেন না। যদি আপনি একটি আয়াত জানেন কিংবা একটি হাদিস জানেন, যদি শুধু ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর মূল তত্ত্ব জানা থাকে, আপনি এগুলোর দাওয়াহ দিন। দৃঢ়ভাবে যতটুকুই জানেন, সেটার দাওয়াহ করুন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও পৌঁছে দাও।^{১০০}

যদি একটি আয়াত জানা থাকে, সেটাই প্রচার করুন। যদি আপনার কোনো আয়াত কিংবা হাদিস জানা নাও থাকে, যদি শুধু ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর ইলম জানা থাকে (এটা আপনাদের সবারই জানা), তাহলে বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশীদের ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর দাওয়াহ দিন। আপনি যেখানেই থাকুন না কেন, এই দাওয়াহ দিন। আপনি যদি কিছুই না জানেন, তবে লিফলেট, ব্রোশোর কিংবা সিডি বিতরণ করুন, লিংক দিয়ে দিন। কিছুদিন আগে কিছু কিশোর-তরুণ আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল। আমি তাঁদের বললাম, যখন আমি তাদের বয়েসী ছিলাম তখন ফেইসবুক টুইটার এসব থাকলে, ওয়েবসাইট বানানো এখনকার মতো এত সহজ হলে, দাওয়াহর জন্য এতদিনে আমার এক হাজার সাইট থাকত। মুসনাদু আহমাদ ও সুনানুত তিরমিযিতে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে, যেখানে নবি মুহাম্মাদ ﷺ

আপনার চেহারা উজ্জ্বল হবার জন্য দুয়া করেছেন। নবী ﷺ এ দুআ বিশেষভাবে তাদের জন্য করেছেন, যারা কোনো হাদিস শোনার পর অন্যদের কাছে তা পৌঁছে দেয়। তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ সে ব্যক্তির চেহারা উজ্জ্বল করুন, যে আমার কথা শুনে একে ধারণ করে (অর্থাৎ এর মর্ম বোঝে এবং এর ইলম রাখে)।'^{১০১} এর অর্থ হলো, প্রথমে এ শিক্ষাকে সে ধারণ করে, আত্মস্থ ও উপলব্ধি করে—তারপর একে অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়। *সহিহ মুসলিম* সহ অন্যান্য হাদিসের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, আবু হুরাইরা ও ইবনু মাসউদ রাঃ একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন যেখানে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি মানুষকে হিদায়াতের দিকে দাওয়াহ দেয়, সে তার অনুসরণকারীদের সমান সাওয়াব পাবে, অথচ অনুসরণকারীদের সাওয়াব বিন্দুযাত্রও কমবে না। আর যে ব্যক্তি মানুষকে গোমরাহির দিকে আহ্বান করে, সে তার অনুসরণকারীদের মতোই গুনাহগার হবে, অথচ তাদের গুনাহ বিন্দুযাত্রও কমবে না।^{১০২} তাই, আমি যদি এক শ জনকে গোমরাহ করি—লা সামাহাল্লাহ, লা কাদারাল্লাহ—তবে তাদের সবার পাপ আমার ওপর এসে বর্তাবে।

একজন মানুষকে হিদায়াতের ওপর আনার মূল্য :

সহিহ বুখারি ও *মুসলিম*ে বর্ণিত হয়েছে, খাইবারের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সঃ যুদ্ধের পতাকা দিয়েছিলেন আলী রাঃ-কে। আলী রাঃ-এর চোখে অসুখ হয়েছিল, কিন্তু আল্লাহর রাসূল সঃ তাঁর চোখে ফুঁ দেয়ার পর তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সঃ তাঁকে যুদ্ধের পতাকা এবং কিছু উপদেশ দেন। দেখুন, আল্লাহর রাসূল সঃ আলী রাঃ-কে কী উপদেশ দিয়েছেন—তাদের এলাকায় গিয়ে পৌঁছার পর ধৈর্যধারণ করবে। তাদের ইসলাম গ্রহণের প্রতি আহ্বান করবে এবং ইসলামি বিধানে ওদের ওপর যেসব দায়িত্ব বর্তায় সেগুলো সম্পর্কে জানিয়ে দেবে। কারণ, আল্লাহর কসম! আল্লাহ সঃ যদি তোমার মাধ্যমে মাত্র একজন মানুষকেও হিদায়াত দেন, তাহলে তোমার জন্য তা লাল উটের মালিক হবার চেয়েও অনেক উত্তম।^{১০৩}

কাউকে ইসলামের দিকে ফেরানো, সালাত শুরু করানো (এবং এর অর্থ পুনরায় ইসলামে প্রবেশ করা), মদ কিংবা কবীরা গুনাহ ছাড়ানো—এ সবগুলো হিদায়াতের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। লাল রঙের উট ছিল আরবদের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। লাল উটের মালিক হওয়া হলো আমাদের সময়ে গ্যারেজভর্তি সবচেয়ে দামি স্পোর্টসকারের মালিক হবার মতো। যারা আল্লাহর রাসূলের ক্ষতি করেছিল এখন তিনি তাদের দোরগোড়ায়। বিজয়ের আর অল্প কিছু সময় বাকি। রাসূলুল্লাহ সঃ পতাকা তুলে দিলেন আলী রাঃ-এর হাতে। তিনি সঃ জানেন, আল্লাহ সঃ-এর ইচ্ছায় শত্রু পরাজিত হবে। দীর্ঘদিন ধরে এই শত্রু তাঁর ক্ষতি করে আসছে।

১০১ *মুসনাদ আহমাদ*: ৪০১২, *সুনানুত তিরমিযি*: ২৬০০, *ইবনু মাজাহ*: ২৩২

১০২ *সহিহ মুসলিম*: ৬৯৮০

১০৩ *সহিহল বুখারি*: ৩৭০১; *সহিহ মুসলিম*: ৬৩৭৬

কিন্তু আজ পরিস্থিতি বদলে গেছে। রক্তের বন্যা চাইলে তিনি আলী রাঃ-কে এই কথাগুলো বলতেন না। রক্তপাতের জন্য যদি তিনি উদ্বীষ হতেন, তাহলে এই উপদেশ দিতেন না। আল্লাহ স্বঃ-এর ইচ্ছায় রাসূল স্বঃ বিজয় আসন্ন, সবকিছু তাঁর নিয়ন্ত্রণে—এমন অবস্থায়ও প্রাধান্য পেয়েছিল তাঁর উদ্বেগ। তিনি স্বঃ বলেছিলেন—আলী শান্ত হও, আল্লাহর কসম, তোমার মাধ্যমে আল্লাহ যদি মাত্র একজন মানুষকেও হিদায়াত দেন, তাহলে তোমার জন্য তা লাল রঙের উটের মালিক হবার চেয়েও অনেক উত্তম।

উহুদ ও তাইফের দিবস :

বুখারি ও মুসলিমের বর্ণিত একটি হাদিসে এসেছে, রাসূল স্বঃ-কে আ'ইশা রাঃ জিজ্ঞেস করলেন, উহুদের চেয়েও কঠিন কোনো বিপদের সম্মুখীন কি আপনি হয়েছিলেন? ^(১০৪) উহুদের ঘটনা আ'ইশা রাঃ-এর মনে ছিল। তিনি দেখেছিলেন সেইদিন কী কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে রাসূল্লাহ স্বঃ-কে যেতে হয়েছিল। তাই তিনি জানতে চাইলেন, 'হে আল্লাহর নবি, উহুদের চেয়েও কঠিন কোনো বিপদের সম্মুখীন কি আপনি হয়েছেন? এর চেয়ে বারাপ আর কোনো সময় কি আপনার জীবনে এসেছে?' নবি স্বঃ উত্তর দিলেন, 'তোমার গোত্রের লোকেরা আমায় অনেক কষ্ট দিয়েছে। আ'ইশা রাঃ ও রাসূল্লাহ স্বঃ-এর গোত্র একই গোত্র, কুরাইশ। কিন্তু রাসূল্লাহ স্বঃ এখানে বললেন, তোমার গোত্রের লোকেরা আমায় অনেক কষ্ট দিয়েছে। আর আকাবাহর দিনটি ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময়। আকাবাহর দিবস বলা হয় তাইফের দিনকে। সেই দিন রাসূল স্বঃ ইসলামের দাওয়াহ নিয়ে তাইফে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাইফের লোকেরা তাকে প্রত্যাখ্যান করে, আর তাঁর বিরুদ্ধে তাইফের শিশুদের লেলিয়ে দেয়।

আ'ইশা রাঃ নির্দিষ্টভাবে উহুদের কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন, কারণ ওই দিন রাসূল্লাহ স্বঃ-এর সাথে কী হয়েছিল, তিনি নিজ চোখে দেখেছেন। তাই আ'ইশা রাঃ ভেবেছিলেন রাসূল্লাহ স্বঃ-এর দীর্ঘ তেইশ বছরের দাওয়াহ-জীবনের সবচেয়ে কঠিন দিন হলো উহুদের দিন। তাই তিনি নির্দিষ্ট করে উহুদের কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। কী হয়েছিল উহুদের দিন? আ'ইশা রাঃ কী দেখেছেন সেদিন?

তিনি দেখেছেন রাসূল্লাহ স্বঃ-এর পবিত্র মাথায় আঘাতের ছাপ। তিনি দেখেছেন, অস্ত্রের আঘাতে ডেঙে যাওয়া পবিত্র দাঁত, দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া শিরশ্রাণ। তিনি রাসূল্লাহ স্বঃ-এর জখমে ফাতিমা রাঃ-কে মাদুর পুড়ানো ছাঁই লাগাতে দেখেছেন। ^(১০৫) এতকিছু সত্ত্বেও কেন উহুদ রাসূল স্বঃ-এর দাওয়াহ-জীবনের সবচেয়ে কঠিন দিন না? এই যুদ্ধে তিনি সত্ত্বরজন প্রিয় সাহাবিকে হারিয়েছিলেন যাদের তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন। উহুদের দিন শহিদ হয়েছিলেন

তাঁর চাচা হামযা ﷺ। চাচার লাশ দেখে ছোট শিশুর মতো কেঁদেছিলেন আমার নবীজি ﷺ।
তবুও কেন উহুদ তাঁর জীবনের কঠিনতম সময় না?

স্ত্রী আ'ইশা ﷺ-এর ব্যাপারে মুনাফিকদের মিথ্যা গুজব রটানোর তীব্র মর্মবেদনাময় দিনগুলো কেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জীবনের কঠিনতম সময় হলো না? একজন পুরুষের জন্য এ ধরনের ব্যাপার অত্যন্ত গুরুতর এবং কষ্টের। আজ হয়তো অনেকে এর ওজন বুঝতে পারে না, কারণ তারা অসলে প্রকৃত পুরুষ না। একজন সত্যিকারের পুরুষ কখনো তার স্ত্রী অথবা পরিবারের নারীদের অমর্যাদা সহ্য করতে পারে না। মুনাফিকের দল রাসূল ﷺ-এর স্ত্রীকে নিয়ে মিথ্যা রটাত্তিল, ভুলবশত কয়েকজন সাহাবিও এতে জড়িয়ে গিয়েছিলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ পার করেছেন দুঃসহ সময়। তবুও কেন এই দিনগুলো তাঁর জীবনের কঠিনতম সময় না? মক্কার মুশরিকরা একদিন তাঁর পিঠে উটের নাড়িভুড়ি চাপিয়ে দিয়েছিল। তারপর হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খাচ্ছিল একে অপরের গায়ে। সেই দিনটি কেন তাঁর ﷺ কাছে সবচেয়ে কঠিন মনে হলো না? একদিন তারা জামা ধরে ওরা এমনভাবে শ্বাসরুদ্ধ করেছিল যে, তিনি প্রায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন, হাঁটু ভেঙে পড়ে গিয়েছিলেন কাবার কাছে; সেই দিনটি কেন তাঁর ﷺ জীবনের সবচেয়ে কঠিন দিন হলো না? যে কয়েক বছর কুরাইশরা তাঁকে অপদস্থ করেছিল, সেদিনগুলো কেন তাঁর জীবনের কঠিনতম সময় না? কেন তাইফের দিন? তাইফের দিনের বিশেষত্ব কী?

তাইফের ঘটনা পড়লে আপনি দেখবেন, এই দিন রাসূল ﷺ-কে দৈহিক নির্ধাতন করা হলেও আমার এতক্ষণ যে ঘটনাগুলোর কথা বললাম, সেগুলোর তুলনায় শারীরিক নির্ধাতনের দিক দিয়ে এটি ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক কম কষ্টের। তাঁর ওপর উটের নাড়িভুড়ি চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল, শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল, তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে মিথ্যে গুজব রটনা করা হয়েছিল এবং আরও অনেক ঘটনা তাঁর সাথে ঘটেছিল। তাইফের দিন ঘটা দৈহিক নির্ধাতনের চেয়ে এ সবকিছুই ছিল অনেক বেশি কষ্টের। আপাতভাবে তাইফের ঘটনা এগুলোর চেয়ে কম কষ্টদায়ক। উহুদ আর তাইফের ঘটনার কি তুলনা হয়? উহুদে অনেক সাহাবি শহিদ হয়েছিলেন, নির্মভাবে শহিদ করা হয়েছিল তাঁর চাচাকেও। তিনি নিজে গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তবু রাসূল ﷺ কেন তাইফের দিনকেই বেছে নিলেন? কেন আ'ইশা ﷺ-কে বললেন, এই দিন তাঁর জীবনের কঠিনতম দিন?

আ'ইশা ﷺ হয়তো বুঝিয়ে থাকবেন-হে আল্লাহর রাসূল, যে দিনটিতে আপনি সবচেয়ে গুরুতর আঘাত পেয়েছিলেন সেই দিনটিই কি আপনার জীবনের সবচেয়ে কঠিন দিন? হয়তো তিনি নির্ধাতনের দিক থেকে সবচেয়ে কঠিন দিনের কথা জানতে চেয়েছিলেন। আর তাই উহুদের কথা বলেছিলেন। আবার দেখুন, উহুদের দিন শহিদ হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সত্তরজন সাহাবি, শহিদ করা হলো তাঁর চাচাকে। চাচার লাশ দেখে তিনি অঝোরে কেঁদেছেন—শারীরিক ব্যাপারটা থাক, মানসিক আঘাত হিসেবে ধরলেও এ ছিল শোকের

প্রচণ্ডতায় বিশ্বস্ত হবার মতো এক দিন। এ জন্যই হয়তো আ'ইশা রাঃ উহদের কথা বলেছিলেন।

যখন আপনি সীরাহ পড়বেন এবং পাশাপাশি সীরাহর অন্তর্নিহিত শিক্ষা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করবেন—তখন রাসূলুল্লাহ সঃ—এর এ উত্তরের মর্মার্থ বুঝতে পারবেন। অনেক আশা নিয়ে তিনি তাইফ গিয়েছিলেন। তাইফের পাহাড়ে ওঠার সময় তার আশা ছিল তাইফবাসী ইসলাম গ্রহণ করবে আর তাইফ হবে ইসলামি খিলাফতের প্রথম শহর। আ'ইশা রাঃ—কে দেয়া উত্তরের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সঃ বোঝাচ্ছেন—আমার মাথার জখম, আমার দাঁতে পাওয়া আঘাত, এগুলোর কষ্ট বড় না। আমার সাহাবিদের মৃত্যুও না, কারণ ইন শা আল্লাহ জালাতে আমাদের দেখা হবে। সবচেয়ে তীব্র কষ্ট হলো আল্লাহ সঃ—এর একত্ববাদের দাওয়াহ প্রত্যাখ্যাত হতে দেখা। নবিজি তাইফে গিয়েছিলেন আশায় বুক বেঁধে, কিন্তু তিনি ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন তীব্র কষ্ট নিয়ে। এটা ছিল তার দাওয়াতি জীবনের সবচেয়ে কষ্টের দিন। রাসূলুল্লাহ সঃ বোঝাচ্ছেন, বাকি সবকিছু আমি সহ্য করতে পারব—সে আমার ওপর আসা আঘাত, জখম, বা যা কিছু হোক—কিন্তু তাওহিদের দাওয়াহ প্রত্যাখ্যাত হতে দেখার কষ্ট বিশ্বস্ত করে দেয়ার মতো। আর তাই তিনি বলেছিলেন, এ দিনটি ছিল তাঁর জন্য সবচেয়ে কঠিন দিন।

সত্যের দাওয়াহ দিতে গিয়ে যখন তিনি প্রত্যাখ্যাত হতেন, কষ্ট পেতেন, তখন তাঁকে শাস্ত করার জন্য আল্লাহ সঃ নাযিল করতেন কুরআনের আয়াত। আল্লাহ সঃ তাঁর নবির অন্তর দেখতেন, তিনি দেখতেন সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য তাঁর নবির অন্তরে কষ্ট, তিনি বিক্ষিপ্তচিত্ত। কারণ, দাওয়াহ—ই ছিল তাঁর জীবন। দাওয়াহ ছিল তাঁর হৃদয়, তাঁর আত্মা। দাওয়াহ প্রবাহিত হতো তাঁর শিরা-উপশিরায়। আর প্রত্যেক মুসলিম ও দা'ঈরও এমনটাই হওয়া উচিত। দাওয়াহকে আপনার নিজ রক্ত-মাংসের মতো মনে করতে হবে। একজন হকপন্থী দা'ঈ যখন দাওয়াহ করা থেকে বঞ্চিত হন, তখন মাটির ওপরে থাকার চেয়ে মাটির নিচে থাকাটাই তাঁর কাছে উত্তম মনে হয়। একজন সত্যিকার দা'ঈ, প্রত্যেক সত্যিকারের মুসলিমের অনুভূতি এমনই হয়। আজ আমরা বলি দা'ঈদের এমন হয়, কিন্তু এটা তো প্রত্যেক সত্যিকারের মুসলিমের অবস্থা, কারণ দাওয়াহ প্রত্যেক মুসলিমের জীবনের অংশ।

বড় আশা নিয়ে রাসূলুল্লাহ সঃ তাইফে গিয়েছিলেন। অন্যান্য দুর্ভোগের দিনগুলোর শারীরিক আঘাতের চেয়ে ওই দিনের শারীরিক আঘাত কম হওয়া সত্ত্বেও তাইফের দিনটিই ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে কঠিন দিন। কারণ, তায়িফবাসী তাঁর দাওয়াহ প্রত্যাখ্যান করেছিল। কুরআনের অনেক জায়গায় আল্লাহ সঃ তাঁর নবি সঃ—কে শাস্ত হতে বলেছেন। আল্লাহ সঃ তাঁকে বললেন :

فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ.....

‘সুতরাং আপনি তাদের জন্য অনুতাপ করে নিজেকে ধ্বংস করবেন না।’ (সূরা আল-ফাতির, ৮)

আরেক আয়াতে আল্লাহ ﷻ তাঁকে এই বলে শান্ত হতে বললেন যে :

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا

‘যদি তারা এই বিষয়বস্তুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে তাদের পশ্চাতে সম্ভবত আপনি পরিতাপ করতে করতে নিজের প্রাণ নিপাত করবেন।’ (সূরা কাহফ, ৬)

আল্লাহ যেন তাঁকে বলছেন—হে নবি, তাদের পেছনে ছুটে চলতে চলতে আপনি নিজে মর্মবেদনায় ভুগছেন, শান্ত হোন।

وَاضْمِرْهُمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ

‘আপনি সবর করবেন। আপনার সবর আল্লাহর জন্য ব্যতীত নয়, তাদের জন্য দুঃখ করবেন না এবং তাদের চক্রান্তের কারণে মন ছোট করবেন না।’ (সূরা আন-নাহল, ১২৭)

আল্লাহ ﷻ তাঁর নবিকে সবর করতে বলছেন। কিন্তু কেন? তারা তাঁকে আঘাত করেছে, তাই? তাঁর ক্ষতি করেছে, এই জন্য? না। আল্লাহ ﷻ তাঁকে বলছেন :

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ.....

তাদের (মূর্তিপূজারি, মূশরিক) জন্য দুঃখ করবেন না।

তাদের সত্য প্রত্যাখ্যানের কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যথিত হয়েছেন। আর আল্লাহ ﷻ তাঁকে শান্ত হতে বলছেন। একজন প্রকৃত ঈমানদারের কাছে দ্বীনের শিক্ষা ও এর দাওয়াহ নিজের জীবনের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ; গুরুত্বপূর্ণ নিজ পরিবার, সম্পদ, সম্মানের চেয়েও। দাওয়াহ এবং তাওহিদের বার্তা প্রচার করা সব সময় মুমিনের কাছে অগ্রাধিকার পায়।

শ্রোতার জ্ঞান ও অবস্থা অনুযায়ী দাওয়াহ :

যাদের দাওয়াহ দিচ্ছেন তাদের অবস্থা ও প্রকৃতি সম্পর্কে জানা আপনার জন্য খুব জরুরি। *বুখারি* ও *মুসলিমে* বর্ণিত হয়েছে যে, মুয়ায ﷺ-কে ইয়েমেনে আমির হিসেবে পাঠানোর সময় তাঁকে বিদায় জানাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনার বাইরে এসেছিলেন। এ সময় তিনি ﷺ মুয়ায ﷺ-কে নাসীহাত করেছিলেন এবং বলেছিলেন, তুমি আহলুল কিতাবদের কাছে যাচ্ছে। রাসূল ﷺ এ কথাটি কেন বললেন? কারণ, মদীনার উপকণ্ঠে অল্প কিছু ইহুদি থাকলেও মুয়ায ﷺ অধিকাংশ সময় মূর্তি-পূজারিদের দেখেছেন। আর মূর্তি-পূজারিদের সাথে

আহলুল কিতাবদের চিন্তা ও অবস্থার পার্থক্য আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাই মুয়ায ؓ-কে বোঝাতে চাইলেন যে, তুমি সব সময় যে মুশরিক মূর্তি-পূজারীদের দেখে এসেছ তাদের দাওয়াহ করা আর আহলুল কিতাবদের দাওয়াহ করার মাঝে পার্থক্য আছে।

একইভাবে আপনারও বুঝতে হবে, কারা আপনার শ্রোতা। বুঝতে হবে আপনি কাদের উদ্দেশ্যে কথা বলছেন, কাদের দাওয়াহ দিচ্ছেন। আমাকে যখন বক্তব্য দেয়ার জন্য আমন্ত্রণ করা হয় তখন আমার জন্য জানা জরুরি যে, আমি কি যুবকের উদ্দেশ্যে কথা বলব নাকি তাদের চাচার বয়েসীদের উদ্দেশ্যে। আপনি কি সাধারণের সামনে কথা বলছেন নাকি শিক্ষিত লোকদের সামনে-দাওয়াহর স্বার্থেই এসব আপনাকে জানতে হবে। কারণ, আপনাকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে আপনার কথাগুলো শ্রোতাদের উপযোগী করার।

আমি প্রথমবারের মতো উসুল আস-সালাসাহ মুখস্থ করা শুরু করি মদীনাতে। তখন আমি ক্লাস টুয়ের ছাত্র। আমি পড়তাম ‘মাদরাসাতু উবাই ইবনু কাব লি তাহফিযিল কুরআনিল কারিম’ নামে একটি মাদরাসায়। অন্যান্য সরকারি স্কুলের মতো হলেও এখানে আলাদাভাবে জোর দেয়া হতো কুরআনের ওপর। মদীনাতে এটা ছিল এ ধরনের প্রথম স্কুল। এই স্কুলের কারিকুলাম এমন ছিল যে, অল্প বয়সেই উসুল আস-সালাসাহর কিছু অংশ কিংবা পুরোটা মুখস্থ করতে হতো। এখন পশ্চিমারা কারিকুলাম পরিবর্তনের জন্য সৌদির ওপর চাপ দিচ্ছে, এসবের মাঝে স্কুলের কারিকুলাম আজও আগের মতো আছে কি না জানি না। যা হোক, সেই দিনগুলোতে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাবার সময় আমাকে স্কুলে নামিয়ে দিয়ে যেতেন বাবা। গাড়িতে বাবাকে উসুল আস-সালাসাহ মুখস্থ পড়ে শোনাতাম। আমি বাবাকে শোনাতাম আর তিনি বলতেন, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যা শিখছেন আমারটা হুবহু তা-ই। এখনো আমার এটা মনে আছে। আমি অবাক হয়ে ডাবতাম, বাবা যা শিখছেন, আমিও তাই শিখছি! আমি ক্লাস টুতে পড়ি আর বাবা পড়েন মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় বর্ষে, অথচ আমরা দুজন একই জিনিস পড়ছি!

বাবা বলতেন, একই বই হলেও তাঁরা পড়তেন আমাদের চেয়ে আরও গভীর ও বিস্তারিতভাবে। আসলে ক্লাস টুতে ‘মার রাব্বুকা ওয়ামা দিনুকা’ এবং রাসূল ﷺ ও এ সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয় সহজভাবে অল্প অল্প করে আমাদের শেখানো হয়েছিল। উসুল আস-সালাসাহ আমরা বাচ্চাদের পড়াই, আবার দা’ঈদেরও পড়াই। আমরা এর চেয়ে ছোট এবং বড়দেরও পড়াই। প্রত্যেককে তাঁর জ্ঞান ও বুকের অবস্থা অনুযায়ী পড়ানো হয়। যাতে তারা তাদের মতো করে বিষয়গুলো অনুধাবন করতে পারে। আমার দারসে কেউ কেউ নোট করে, কেউ কেউ আমার অধিকাংশ কথা মুখস্থ করে, এরা আগামী দিনের দা’ঈ ইন শা আল্লাহ। আমি দারসে যেভাবে পড়াই, সর্বসাধারণের সামনে লেকচারে নিশ্চয় সেভাবে বলব না।

সহিহ বুখারিতে আলী ؓ-এর একটি উক্তি বর্ণিত হয়েছে। আলী ؓ বলেছেন,

حَدَّثَنَا النَّاسُ بِمَا يَغْرِفُونَ أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

মানুষের সাথে কথা বলো তার অবস্থা অনুযায়ী। তুমি কি চাও, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হোক?^(১০৬)

আলী রা শ্রোতার বুঝ অনুযায়ী কথা বলতে বলছেন। এমনও হতে পারে যে, কোনো বিষয় মানুষের সামনে তাদের বুঝ অনুযায়ী যথাযথভাবে উপস্থাপন না করার কারণে তারা বিষয়টি অস্বীকার করে বসবে বা কাফির হয়ে যাবে। আমরা কেউই চাই না যে এমন হোক। *সহিহ মুসলিম*ে ইবনু মাসউদ রা-এর একটি কথা বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন,

مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ إِلَّا كَانَ لِيُعْطِيَهُمْ وَثْنَةً

তুমি কথা বলার সময় লোকেদের বোধগম্য করে বলবে, না হয় এটা তাদের অনেকের জন্য ফিতনাই হয়ে দাঁড়াবে।^(১০৭)

বোধগম্য না হবার কারণে হক ইলমের দাওয়াহও অনেক সময় ফিতনাই হয়ে দেখা দিতে পারে। দেখুন ইবনু আব্বাস রা কেমন করে শ্রোতার উপযোগী করে কথা বলেছেন। এক লোক ইবনু আব্বাস রা-এর কাছে এসে প্রশ্ন করল, 'হত্যাকারীর জন্য কি কোনো তাওবাহ আছে?' ইবনু আব্বাস রা জবাব দিলেন, 'অবশ্যই তাওবাহর দরজা খোলা আছে।' কিছুক্ষণ পর আরেকজন লোক এসে জিজ্ঞেস করল, 'হত্যাকারীর জন্য কি তাওবাহ আছে?' এবার তিনি বললেন, 'না, নেই।' প্রশ্নকারীরা ছিল পথচারী, তারা ফাতওয়া নিয়ে নিজ গন্তব্যে চলে যেত। ইবনু আব্বাস রা-এর ছাত্রদের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠল, 'ইবনু আব্বাস, আপনি দুজনকে দুভাবে উত্তর দিলেন? প্রথমজন জানতে চাইলো, হত্যাকারীর জন্য তাওবাহ আছে কি না। আপনি বললেন, আছে। আবার একই প্রশ্নের জবাবে দ্বিতীয়জনকে বললেন, নেই। কেন?'

ইবনু আব্বাস রা বললেন, 'প্রথম ব্যক্তির চোখে আমি তাওবাহর অশ্রু দেখেছি। আমি তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখেছি, সে মর্মবেদনায় ডুগছে। তার চোখে পানি।' প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগে তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন প্রশ্নকর্তা কেমন ধরনের লোক। তারপর প্রশ্নকর্তার অবস্থা অনুযায়ী হ্যাঁ-সূচক উত্তর দিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তির ব্যাপারে তিনি বললেন, 'আমি তার চোখে আগুনের শুল্লিঙ্গ লক্ষ করলাম, যেন সে কাউকে হত্যা করতে যাবে।' এই ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তি থেকে আলাদা। তাই তিনি না-বোধক উত্তর দিলেন যাতে করে সে কাউকে হত্যা না করে।

এখানে একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, ইসলামি শারীয়াহয় কাউকে হত্যা করা হারাম, এ ব্যাপারে কোনো ইখতিলাফ নেই। কিন্তু এই হারাম হবার ব্যাপারটা কীভাবে বোঝানো হবে, কীভাবে প্রচার করা হবে, সেটা একটা ভিন্ন প্রশ্ন। যা হোক, ইবনু আব্বাস রা এখানে মিথ্যা বলেননি।

এ ব্যাপারে আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। তিনি ফাতওয়ায় দেয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রতারণা করেননি। *তাকসির আস-সাআলিবি*তে ইমাম আস-সাআলিবি বলেন,

وروى عن بعض العلماء أنهم كانوا يقصدون الإغلاظ والتخويف أحيانا فيطلقون أن لا
تقبل توبته منهم ابن شهاب وابن عباس

কিছু আলিম দুইটি মতের কঠিন মতটি ব্যবহার করতেন যাতে লোকদের অন্তরে ভয় সৃষ্টি হয় এবং তারা পাপ থেকে বিরত থাকে। ইবনু শিহাব রাঃ ও ইবনু আকবাস রাঃ তাঁদের অন্তর্ভুক্ত।^(১০০)

কাজেই ইবনু আকবাস রাঃ মিথ্যে বলেননি। একজন মানুষকে হত্যা থেকে বিরত রাখতে তিনি কঠিন মতটি বলেছেন। এই মতটিও কিন্তু প্রমাণিত এবং বিভিন্ন কিতাবে আছে। প্রশ্ন হলো, এ ব্যাপারে এটাই কি শক্তিশালী মত? না, অবশ্যই এটি শক্তিশালী মত না। কিন্তু শক্তিশালী মত না হওয়া সত্ত্বেও ইবনু আকবাস রাঃ এই মতটি ব্যবহার করেছেন ওই ব্যক্তিকে হত্যা থেকে বিরত রাখতে।

কিতাব মুখস্থ করা সহজ, কিন্তু এই ইলম দাওয়াহর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার মতো আলিম আজ বিরল। আদাবুল ইফতা বিষয়ে পড়লে দেখবেন, একজন মুফতি প্রয়োজনে দুটো মতের মধ্যে কঠিন মতকে বেছে নিতে পারেন, যদি গ্রন্থকারীর অবস্থার ওপর ভিত্তি করে তিনি মনে করেন এতে কল্যাণ আছে। তবে এটা কোনো ছেলেখেলা না। অনেকে বলে আলিমরা ফাতওয়া নিয়ে খেলে, এ কথাটা ভুল। নিজের পছন্দমতো ফাতওয়া দেয়া যায় না। ইবনু আকবাস রাঃ বানিয়ে বানিয়ে ফাতওয়া দেননি। চোখের সামনে ঘটনা কোনো কিছুর ওপর ভিত্তি করেও আপনি পছন্দমতো ফাতওয়া বানাতে পারবেন না। আপনি বড়জোর, ইবনু আকবাস রাঃ-এর মতো যদি কাউকে হত্যা থেকে বিরত রাখতে, দুটো মত থেকে কঠিন মতটিকে গ্রহণ করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে আপনি নিজের খেয়ালখুশি মতো বানিয়ে বানিয়ে ফাতওয়া দিচ্ছেন না। আপনি কঠিন মতটা গ্রহণ করছেন কল্যাণের দিকে তাকিয়ে, কাউকে কবীরা গুনাহ থেকে বাঁচানোর জন্য।

এসব কথার মূল পয়েন্ট হলো, কাদের সাথে কথা বলছেন সেটা আপনাকে বুঝতে হবে। তাঁদের চিন্তা ও বুঝের মাত্রা সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে। দাওয়াহ ও ইলম উপস্থাপন করতে হবে বোধগম্যভাবে। কখনো হয়তো আপনাকে নারীদের উদ্দেশ্যে কথা বলতে হতে পারে। এমন ক্ষেত্রে আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে কিছু কিছু ব্যাপারে পুরুষ আর নারীদের বোঝানোর মধ্যে পার্থক্য আছে। আপনাকে কথা বলতে হবে কখনো যুবকদের আর কখনো বৃদ্ধদের সামনে। আপনি কোথায়, কাদের সাথে কথা বলছেন, এটা কথা বলার আগে আপনাকে চিন্তা করতে হবে। শ্রোতারা কোন ধরনের লোক? তারা যুবক নাকি বৃদ্ধ? তারা কি ফাসিক

নাকি স্বীনদার? এ সবকিছুই বিবেচনা করতে হবে। কখনো আপনার শ্রোতার হবে উদ্ধত, কখনো বিনয়ী। কখনো আপনি কথা বলবেন ইউনিভার্সিটি গ্র্যাজুয়েটদের সাথে, আবার কখনো কারখানার কর্মী বা খেটে খাওয়া মানুষের সাথে। কখনো আপনার শ্রোতা হবে নেতা গোছের কেউ, আবার অন্য সময় আপনি কথা বলবেন সাধারণ মানুষের মাঝে। মাঝে মাঝে আপনি এমন মানুষের সামনে বক্তব্য রাখবেন যারা শাস্ত-সুস্থির হয়ে বসতে এবং বিচারবুদ্ধি দিয়ে বুঝতে আগ্রহী। হয়তো তারা আপনাকে কিছু প্রশ্ন করবে, হয়তো তাঁদের সন্তুষ্ট করতে যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে আলোচনা করতে হবে। আবার অনেক সময় হয়তো রাগী আর অসভ্য প্রকৃতির লোকও থাকবে, যারা কোনো কিছুই মানতে রাজি না। যাদের সামনে কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত বা বুখারি-মুসলিমের সহিহ হাদিস উপস্থাপন করলেও তারা মেনে নেবে না। তিন-চারটা কিতাব আগাগোড়া পড়েছে এমন তালিবুল ইলমের সামনে যেভাবে কথা বলবেন, হাল আমলের সাধারণ পশ্চিমা তরুণদের সামনে আপনি সেভাবে কথা বলতে পারবেন না। কিছু মানুষ তারগিবে (ترغيب) অনুপ্রাণিত হয়, কিছু মানুষ অনুপ্রাণিত হয় তারহিবে^(১০১) (ترهيب)। আবার কিছু মানুষ তারগিব-তারহিব দুটোতেই উৎসাহিত হয়। অধিকাংশ মানুষ আসলে এ ধরনের হয়ে থাকে।

আপনাকে চিন্তা করতে হবে আপনার শ্রোতা কারা। একজন সফল দা'ঈ সবাইকে একই জিনিসের দাওয়াহ দেন, একই জিনিসের দিকে আহ্বান করেন, কিন্তু শ্রোতার বুঝ অনুযায়ী তিনি তাঁর দাওয়াহকে উপযোগী করে তোলেন। দাওয়াহর বিষয়বস্তু একই, এ ক্ষেত্রে আপস করার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু যাদের দাওয়াহ দিচ্ছেন তাদের কাছে একে কার্যকরভাবে তুলে ধরতে হবে। এ বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। দাওয়াহর জন্য ইলম যেমন জরুরি, তেমনি জরুরি শ্রোতার উপযোগী করে তা উপস্থাপন করাও।

দাওয়াহর ক্ষেত্রে প্রয়োজন হিকমাহর :

দাওয়াহর ভিত্তি বানাতে হবে ক্ষমা ও মমতাকে। আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

তুমি তোমরা রবের পথে হিকমাহ ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান করো। (সূরা আন-নাহল, ১২৫)

দাওয়াহ হবে সর্বোত্তম আচরণের সাথে

দাওয়াহর জন্য আপনাকে দয়ালু হতে হবে। দাওয়াহর ভিত্তি হলো নম্র ও ক্ষমাশীল হওয়া, বিনয়ের সাথে সর্বোত্তম ভাষায় মানুষের সাথে কথা বলা। দাওয়াহর জন্য সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী শব্দটিকে বেছে নিতে হবে। দাওয়াহ হলো সর্বোত্তম আচরণ ও ভাষার মাধ্যমে, সর্বোত্তম উপায়ে মানুষকে আহ্বান করা। আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

‘মানুষকে সৎ কথাবার্তা বলবো।’ (সূরা আল-বাকারাহ, ৮৩)

হুসনা মানে সর্বোত্তম, সব পদ্ধতির উত্তম পদ্ধতি।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

‘আল্লাহর রাহমাই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন পক্ষান্তরে আপনি যদি রাগী ও কঠিন হৃদয় হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। কাজেই

আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করুন এবং কাজে-কর্মে তাদের পরামর্শ করুন।' (সূরা আলি ইমরান, ১৫৯)

আল্লাহ ﷻ এখানে তাঁর নবি ﷺ-কে বলছেন, যদি আপনি তাদের প্রতি কঠোর-কর্কশ হতেন, তবে তারা আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যেত। আপনাকে পরিত্যাগ করে নিজেদের পথ ধরত।

وَأَسْتَغْفِرُ لَهُمْ

'তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করুন।'

অর্থাৎ, যাদের দাওয়াহ করছেন তাদের জন্য আল্লাহ ﷻ-এর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করুন। কেন? ই'লাম রাহিমাকাল্লাহ নিয়ে কথা বলার সময় আমরা এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। তাঁদের জন্য আল্লাহ ﷻ-এর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করুন, কারণ তারা আপনার ছাত্র, আর আপনি তাদের বাবার মতো।

وَشَاوَرَهُمْ فِي الْأَمْرِ

'কাজেকর্মে তাদের পরামর্শ করুন।'

যদি তাঁদের সিদ্ধান্ত শেষপর্যন্ত গ্রহণ নাও করেন, তবু তাদের প্রতি দয়ার অংশ হিসেবে তাদের সাথে পরামর্শ করুন।

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ

উত্তমপন্থা ব্যতীত তোমরা কিতাবধারীদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করবে না, তবে তাদের সাথে (একেবারেই) নয়, যারা তাদের মধ্যে বে-ইনসাফ। (সূরা আল-আনকাবুত, ৪৬)

কোনো বিষয় যদি তর্কে গড়ায় তখনো আহলুল কিতাবের সাথে তর্ক করতে হবে সর্বোত্তম পদ্ধতিতে। শ্রেষ্ঠ আখলাক ও সুন্দরতম ভাষার মাধ্যমে। যদি তর্কের ক্ষেত্রেই এ নিয়মগুলো মেনে চলতে হয়, তাহলে চিন্তা করুন দাওয়াহর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কেমন হতে পারে?

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

তুমি তোমরা রবের পথে হিকমাহ ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান করো। (সূরা আন-নাহল, ১২৫)

খোদ রাসূল ﷺ-কে আদেশ করা হয়েছিল উত্তম পদ্ধতিতে দাওয়াহ পৌঁছে দেয়ার জন্য। আল্লাহ ﷻ তাঁকে বলছেন, যদি আপনি কর্কশ হতেন, তারা আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যেত। রাসূল ﷺ-এর ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা এমন হলে, দাওয়াহর ক্ষেত্রে আমাদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত?

হিকমাহর অর্থ ইসলামের ব্যাপারে ছাড় দেয়া না

দাওয়াহর ক্ষেত্রে হিকমাহ অবলম্বন করা মানে এই না যে, আপনি ইসলামের মূলনীতিগুলোর ব্যাপারে আপস করবেন। মডার্নিস্টদের কাছে দাওয়াহ মানেই ইসলামের মূলনীতির ব্যাপারে ছাড় দেয়া। এদের কাছে দাওয়াহর সংজ্ঞাই এটা। বিক্রি হয়ে যাওয়া এসব বিভ্রান্তদের কাছে হিকমাহ হলো সবকিছুতে ছাড় দেয়া, আর কাফিররা যা কিছু শুনতে চায় সেটা বলা। হিকমাহর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মাদারিজুস সালিকিনে ইমাম ইবনুল কাইয়ীম রহিমুল্লাহ বলেছেন,

فالحكمة إذا فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي

‘হিকমাহ’ হলো—উপযুক্ত কাজটি, উপযুক্ত পদ্ধতিতে, উপযুক্ত সময়ে আদায় করা।^[১০]

মানুষের বুঝ অনুযায়ী তাদের সাথে কথা বলা আর কথাবার্তায় সদয় আচরণ বজায় রাখা, এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য আছে। একটি হলো, আপনি এমনভাবে কথা বলবেন যা আপনার শ্রোতাদের কাছে বোধগম্য হয়। আরেকটি হচ্ছে, আপনি তাদের সাথে কথা বলবেন দয়া ও বিচক্ষণতার সাথে। আর ইসলামের ব্যাপারে আপস করা, ছাড় দেয়া হলো এ দুটি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা আরেকটি বিষয়। এই পার্থক্যগুলো বোঝা জরুরি। দাওয়াহর সময় আপনি মানুষের সাথে তাদের বুঝ অনুযায়ী কথা বলবেন, তাদের প্রতি সদয় হবেন, এটা ভালো কথা। কিন্তু তার মানে এই না যে আপনি ইসলামের ব্যাপারে আপস করবেন। এ দুটো সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার।

আনাস ইবনু মালিক রাঃ থেকে সহিহ বুখারি, মুসলিম ও মুসনাদ আল-বায়হাযি-এ হাদিস বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, রাসুল সঃ মুয়ায রাঃ-কে ইয়েমেনে পাঠানোর সময় বললেন, মানুষের জন্য সহজ করো, কঠিন করো না।

يَسِّرُوا وَلَا تَعْسِرُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تَتَعَسَّرُوا

সহজ করো, কঠিন করো না; সুসংবাদ শোনাও, নিরাশ করো না।^[১১]

এর অর্থ কী? যেমন : সালাতকে সহজ করো। হ্যাঁ, সালাতকে সহজ করুন, কিন্তু সহজ করার মানে কি সালাত না পড়লে কোনো সমস্যা নেই, এমন বলা? সহজ করার মানে কি আপনি মানুষকে বলে বেড়াবেন যে, তারা যখন ইচ্ছে তখন সালাত আদায় করতে পারবে? অথবা কাজ থেকে ফিরে এসে দিনের সব নামায একেবারে ইশার পর আদায় করা যাবে? হাদিসে সহজ করার কথা এসেছে, কিন্তু সহজ করা বলতে এ ধরনের কিছুকে বোঝায় না। তাহলে সালাতকে সহজ করবেন কীভাবে? সফরের সময় একসাথে দুই ওয়াক্ত সালাত আদায় করা যায়, কসর করা যায়, এগুলো মানুষকে জানান। এটাই হলো সহজ করা। মানুষকে জানান শারীয়াহর কথাসাতের (সুবিধা বা ছাড়) ব্যাপারে। এভাবে সহজ করুন। কেউ যদি অসুস্থ হলে

১০ মাদারিজুস সালিকিন : ২/২৭৯

১১ সহিহুল বুখারি : ৬৯

তাকে জানান যে অসুস্থ অবস্থায় রোযা রাখা বাধ্যতামূলক না। অসুস্থ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে না পারলে, বসে অঙ্গদায় করতে পারবে। যদি অসুস্থ ব্যক্তি বসতেও না পারেন, তাহলে সালাত আদায় করবেন শুয়ে। যদি তাও না পারেন, তাহলে চোখের ইশারায়। মানুষকে এ ব্যাপারগুলো জানান। এভাবে সহজ করুন। তাঁদের জানিয়ে দিন সফরের সময় রোযা রাখা বাধ্যতামূলক না। রোযার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন সর্বোত্তম হলো সাহাবি দেরি করা আর ইফতার তাড়াতাড়ি করা। কিন্তু কেন? এতে করে রোযা বেশি দীর্ঘ হয় না, ফলে রোযা রাখা সহজ হয়। দীনকে এভাবে সহজ করুন, মর্ডানিস্টদের নতুন বিকৃত সংজ্ঞা অনুযায়ী না।

মানুষকে জানান যে দুটো হালালের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ তুলনামূলকভাবে সহজটিকেই বেছে নিতেন। কাজেই একই রকম পরিস্থিতিতে আমরা যেন বিষয়গুলো কঠিন না করে ফেলি। তবে মনে রাখতে হবে এ নীতি প্রযোজ্য দুটো হালাল জিনিসের মধ্যে। দ্বীনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা, বিকিয়ে যাওয়া মর্ডানিস্টরা এই নীতির অর্থকে আজ পাল্টে ফেলেছে। তারা এর অর্থ করেছে হালাল আর হারামের মধ্য থেকে ‘সহজটাকে’ বেছে নেয়া! অর্থাৎ, আপনার সামনে একটি হারাম এবং একটি হালাল আছে, সহজ বলে আপনি হারামকে বেছে নেবেন। একটা উদাহরণ দিই। ধরুন, হজে গাড়ি করে কিংবা হেঁটে যাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে আপনি বেছে নিতে পারেন যেকোনো একটাকে। এ সুযোগ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে থাকলে তিনি সম্ভবত গাড়িতে চড়ে যাওয়াকে বেছে নিতেন, যেহেতু দুটোর মধ্যে এটা সহজ। আর আমরা জানি রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা গিয়েছিলেন বাহনে চড়ে। কিন্তু তার মানে অর্থ এই না যে হালাল ও হারামের মধ্য থেকে হারাম বেছে নেয়ার সুযোগ আছে কারণ হারাম কাজটা সহজ। এই নীতি প্রযোজ্য দুটো হালালের মধ্য থেকে কোনো একটি বেছে নেয়ার ক্ষেত্রে।

হাদিসের প্রথম অংশে ব্যাপারটি সাধারণভাবে উল্লেখ করা হয়েছে,

مَا خَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيسَرَهُمَا

রাসূল ﷺ দুটো নির্দেশের মাঝে তুলনামূলক সহজটি বেছে নিতেন।^[১১২]

এখানে শুধু দুটো বিষয়ের মধ্য থেকে একটি বেছে নেয়ার কথা এসেছে। নির্দিষ্ট করে হালাল-হারামের উল্লেখ এ অংশে আসেনি। কিন্তু হাদিসের শেষের অংশের দিকে লক্ষ করলেই বুঝতে পারবেন আসলে এখানে দুটো হালালের মধ্য থেকে সহজটিকে বেছে নেয়ার ব্যাপারে বলা হয়েছে। আপনার সামনে একটি হারাম এবং একটি হালাল আছে, সহজ বলে আপনি হারামটি বেছে নেবেন, হাদিস কিন্তু তা বলে না। হাদিসের শেষ অংশ এটা পরিষ্কার করে দিয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে :

فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَيسَرَ النَّاسِ مِنْهُ

যদি এতে কোনো পাপের সম্ভাবনা থাকত, রাসূল ﷺ সবার আগে এ থেকে দূরে থাকতেন।

অথচ অনেকেই হাদিসের এই অংশটি বলে না। হাদিসে বলা হচ্ছে যদি এতে কোনো পাপের সম্ভাবনা থাকত, রাসূল ﷺ সবার আগে এ থেকে দূরে থাকতেন।

ধীনকে সহজ করা মানে ইচ্ছেমতো হারামকে হালাল বানানো না। আজকাল ধীনকে সহজ করার নামে অনেকে হারামকে হালাল বানিয়ে দিচ্ছে। ফাতওয়া দেয়া হচ্ছে। এদের দলিল কী? কিসের ভিত্তিতে এসব দেওয়া হচ্ছে? দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'ইয়াসিরক ওয়ালা তু'আসসিরু 'সহজ করো, কঠিন কোরো না।' আজ যেমন অনেকে বলছে, পাশ্চাত্যে সুদ হালাল। কেন? ওই যে, 'সহজ করো, কঠিন কোরো না।' ইয়াসিরক ওয়া লা তু'আসসিরু। কাফিরদের কাছে মদ বিক্রিও এদের কাছে হালাল। এই হাদিসের ব্যাপারে ভুল বুঝের কারণে মানুষ আজ এসব বিষয়ে চরম ছাড়াছাড়িতে লিপ্ত হয়েছে।

অথচ হাদিসের অর্থ কী? ধরুন, আগে আপনি সালাত আদায় করতে পারতেন দাঁড়িয়ে, এখন পারছেন না। তাহলে বসে সালাত আদায় করুন। সফরের সময় সালাত কসর করুন। সফরে থাকলে কিংবা বেশি অসুস্থ হলে আপনার সাওম কাযা করার সুযোগ আছে। কিন্তু আজ কীভাবে এর ব্যাখ্যা করা হচ্ছে? কীভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে? দেখবেন এখন কিছু টুপি বেরিয়েছে। মডার্নিস্টদের অনেকে হিজাব হিসেবে মহিলাদের এই টুপি পরতে পরামর্শ দেয়। একটা ছোট টুপিকে এরা হিজাব বলছে, কেন? কারণ, এ মহিলারা অ্যামেরিকাতে থাকেন, আর তাদের বাসে চড়তে হতে পারে। তো হাদিস তো আছেই, 'সহজ করো, কঠিন কোরো না।' ব্যস! পশ্চিমে বসবাস করা মুসলিমদের ওপর যেহেতু পশ্চিমা সরকার ও লোকজন বেশি নজর রাখে, তাই পশ্চিমা মুসলিমরা এসব কাজ করতে পারবে। হাদিস আছে, 'সহজ করো, কঠিন কোরো না।' কেউ কেউ তো আরও একধাপ এগিয়ে বলে যে, হিজাব বাদ। হিজাব ছাড়াই থাকো, হিজাবের একদম দরকার নেই। কারণ, ইয়াসিরক ওয়ালা তু'আসসিরু। 'সহজ করো, কঠিন কোরো না!'

দাওয়াহর ক্ষেত্রে রাহমাহ

দাওয়াহর মূল ভিত্তি হচ্ছে উদারতা এবং ধীনকে সহজ করে উপস্থাপন করা। আপনি রাস্তায় গাড়ি চালানোর সময় নির্দিষ্ট একটি লাইন বা সীমার ভেতরে চালান, চিহ্ন বা সীমানার বাইরে চলে যান না। আপনার সামনে দুটো লাইন আছে, এ দুটো লাইনের ভেতরে থেকে যেভাবে সহজ হয় সেভাবে আপনি গাড়ি চালাবেন। একইভাবে দাওয়াহর ক্ষেত্রে আপনি সহজ করবেন এবং বিনয়ী হবেন শারীয়াহর নির্ধারিত সীমারেখার ভেতরে থেকে। আল্লাহ ﷻ বলেন :

اذْعُ لَكَ سَبِيلَ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

তুমি তোমরা রবের পথে হিকমাহ ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান করো। (সূরা আন-নাহল, ১২৫)

রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মহিলার পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখলেন মহিলাটি একটি কবরের কাছে বসে কান্না করছে। তিনি মহিলাটিকে আল্লাহ ﷻ-এর কাছে সাওয়াব প্রত্যাশা ও সবার করতে বললেন। জবাবে মহিলাটি বলল,

إِنَّكَ عَنِّي فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبِّ بِمُصِيبَتِي

সরো আমার কাছ থেকে, আমার মতো তো তোমার ওপর বিপদ আসেনি! (১৭)

চিন্তা করুন! মহিলাটি রাসূল ﷺ-কে ধর্মকের সূরে কথা বলল! অন্য কোনো দা'ঈ কী বলত? হয়তো রেগে গিয়ে মহিলাকে বলত, আমাকে এসব বলছ? তোমার সাহস কত! জানো আমি কে? আমি একজন শাইখ, তুমি জানো আমি কতগুলো লেকচার দিয়েছি? আমার লেখা কতগুলো বই আছে তুমি জানো? অথচ রাসূল ﷺ কিছু বললেন না, স্বাভাবিকভাবে চলে গেলেন। পরে সাহাবি ﷺ-দের কাছ থেকে তাঁর পরিচয় জানতে পেয়ে মহিলা দ্রুত রাসূল ﷺ-এর কাছে গিয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। রাসূল ﷺ তাঁর সাথে সদয় আচরণ করলেন এবং বললেন,

إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى

আরে, আঘাতের শুরুতে সবর করাই তো হলো প্রকৃত সবর।

মহিলার জবাব শুনে রাসূল ﷺ রেগে যাননি, কারণ তিনি মহিলার মানসিক অবস্থা বুঝেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন সন্তানহারা মায়ের মানসিক অবস্থা কেমন হতে পারে। এ উদাহরণটি পরের পয়েন্ট নিয়ে আলোচনার সময় মাথায় রাখবেন।

মুসনাদ আহমাদে আবু উমামাহ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, এক যুবক রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে যিনা করার অনুমতি চাইলো। সে বলল, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাকে যিনা করার অনুমতি দিন।' আজকের আলিমদের সাথে যদি এই ঘটনা ঘটত, তবে কী হতো, আল্লাহ ﷻ ভালো জানেন। তারা হয়তো তাঁকে ফাসিক আখ্যা দিতেন, তার সম্পর্কে নানান কথা বলতেন। অথচ যুবকের কথা শুনে ক্ষিপ্ত হওয়া সাহাবি ﷺ-দের রাসূল ﷺ শান্ত করলেন। সাহাবি ﷺ-গণ এ প্রশ্ন শুনে ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন-কীভাবে এই লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে এমন প্রশ্ন করতে পারে? অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

مَنْ مَدَّ

শান্ত হও, শান্ত হও।

সাহাবি ﷺ-গণ রাসূল ﷺ-এর একান্ত অনুগত ছিলেন। এ কথা শোনামাত্র তাঁরা নীরব হয়ে গেলেন। রাসূল ﷺ লোকটিকে তাঁর কাছে ডাকলেন। লোকটি বসেছিল স্থলাকার শেষপ্রান্তে,

যাতে প্রশ্নের উত্তর শুনেই যেন চলে যেতে পারে। রাসূল ﷺ তাকে ডেকে এনে নিজের পাশে বসালেন, তার সঙ্গে কথা বললেন। তাঁকে বোঝালেন দলিল ও যুক্তি দিয়ে, উদাহরণ ও হিকমাহর সাথে। শুরুতে তাঁকে কোনো আয়াত বা হাদিস শোনালেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে প্রথমে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে শুরু করলেন, কারণ যুবকেরা সাধারণত বিচারবুদ্ধি ব্যবহার করে। এ জন্যই যুবকদের কাছে দাওয়াহ করা সবচেয়ে সহজ, যেহেতু তাঁরা চিন্তা করে, নিজের বিচার-বিবেচনা ব্যবহার করে। বৃদ্ধদের ধারা তারা আঁকড়ে থাকে না। তিনি ﷺ তাকে বললেন, 'তুমি কি নিজ মায়ের জন্য তা পছন্দ করো?' সে বলল, 'না।' রাসূল ﷺ বললেন, 'তাহলে লোকেরাও তো তাদের মায়ের জন্য তা পছন্দ করে না।' তারপর তিনি বললেন, 'তুমি কি তোমার বোনের জন্য তা পছন্দ করো?' সে বলল, 'না, কে আছে নিজ বোনের ব্যাপারে তা মেনে নেবে?' রাসূল ﷺ বললেন, 'তাহলে লোকেরাও তো তাদের বোনের জন্য তা পছন্দ করে না।' তারপর তিনি বললেন, 'তুমি কি তোমার ফুপুর জন্য তা পছন্দ করো?' সে বলল, 'না, কে আছে তা নিজ ফুপুর ব্যাপারে মেনে নেবে?' তিনি বললেন, 'তাহলে লোকেরাও তো তাদের ফুপুদের জন্য তা মেনে নিতে পারে না।' তারপর তিনি বললেন, 'তুমি কি তোমার খালার জন্য তা পছন্দ করো?' এভাবে তিনি একের পর এক উদাহরণ দিয়ে যেতে লাগলেন। ইচ্ছে করলে একটি উদাহরণ দিয়ে তিনি যেম্নে যেতে পারতেন, কিন্তু তিনি এতগুলো উদাহরণ দিলেন যাতে করে যুবকটি চিন্তা করতে পারে। তারপর তিনি তাকে জড়িয়ে ধরলেন, তার বুকে হাত রেখে দুআ করলেন। তিনি বললেন,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذُنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ وَحَصِّنْ فَرْجَهُ

'হে আল্লাহ, তাকে ক্ষমা করুন, তার অন্তরকে পবিত্র করুন এবং তার লজ্জাস্থানকে হারাম কাজ থেকে বিরত রাখুন।'^[১১৪]

এ যুবকটি পরে বলেছিল, 'ওয়ালাহি, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে আসার পর আমার কাছে আর কোনো কিছু যিনার চেয়ে বেশি ঘণ্য ছিল না। এ ঘটনার পর সে আর যিনার ধারেকাছেও যায়নি। সে এর কাছেও যায়নি এমনকি তার মনে আর কখনো যিনা করার আকাঙ্ক্ষাও জাগেনি। খুব অল্প কিছু কথা তার মনে বিরাট প্রভাব ফেলেছিল, এটাই হচ্ছে হিকমাহ।

বুখারি ও মুসলিমে এক বেদুইনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাসজিদে এসেছিল। ছোটবেলায় আমি যখন মদীনাতে গিয়েছিলাম, তখন মাসজিদ আন-নববীর আয়তন ছিল খুব ছোট। মাত্র পনেরো থেকে বিশ মিনিটে পুরো মদীনা (মূল অংশ) পায়ে হেঁটে ঘুরে আসা যেত। তাহলে চিন্তা করুন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময় মাসজিদ কতটা ছোট ছিল। মরুভূমি থেকে এসে আর কোনো জায়গা না পেয়ে ক্রান্তশ্রান্ত বেদুইন শেষমেশ মাসজিদের এক কোণে বসে পড়ল প্রস্তাব করতে। আজকের কোনো মাসজিদে এ ঘটনা ঘটলে কী হবে?

সবাই তাকে জুতোপেটা করবে, গণশিটুনি দেয়া হবে, হয়তো পুলিশের হাতে তাকে তুলে দেয়া হবে এবং তাকে জেল খাটতে হবে। এতে হয়তো সে তার ঘীনই পরিবর্তন করে ফেলবে কিংবা এর চেয়ে খারাপ কিছুও ঘটতে পারে। সাহাবি ﷺ-গণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের বললেন, ‘তার কাজে বাধা দিয়ো না।’

এই হাদিসের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে ইবনু হাজার ﷺ বলেছেন, ‘এ ঘটনা থেকে দাওয়াহর ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হিকমাহর গভীরতা প্রমাণিত হয়। যদি সাহাবি ﷺ-গণ লোকটিকে বাধা দিতেন, তাহলে প্রশ্নাব লোকটির সারা গায়ে ছড়িয়ে যেত। কারণ, তাকে থামতে বলা হলে প্রথমে সে উঠে দাঁড়াবে। কিন্তু প্রশ্নাব করা অবস্থায় যদি সে থামতে না পারে, তাহলে প্রশ্নাব ছড়াবে তার কাপড়ে ও মাসজিদে। আর সে যদি প্রশ্নাব থামাতেও পারে, তাহলে সেটা হবে তার জন্য কষ্টকর ও ক্ষতিকর।’ যা হোক, বেদুইনের কাজ শেষ হবার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবি ﷺ-দের তা পরিস্কারের নিয়ম শেখালেন এবং এ ঘটনা আমাদের জন্য একটি শিক্ষায় পরিণত হলো। আমরা জানতে পারলাম, এভাবে কার্পেট বা অন্য কোনো কিছু নোংরা হলে কীভাবে সেটা পরিস্কার করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই বেদুইনকে কাছে ডাকলেন। সংশোধন না করে এ রকম কিছু তিনি ছেড়ে দিতেন না, কিন্তু তিনি সমাধান ও সংশোধন করতেন হিকমাহর সাথে। বেদুইন লোকটিকে পাশে বসিয়ে এমন দয়া ও হিকমাহর সাথে বোঝালেন যা কেবল তাঁর ﷺ পক্ষেই সম্ভব ছিল। এমনকি বেদুইনটি বিদায় নেয়ার সময় বলল, ‘হে আল্লাহ, শান্তি বর্ষণ করো শুধু আমার ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর।’ রাসূলুল্লাহ ﷺ এটাও শুধরে দিলেন, বললেন, ‘আল্লাহ ﷻ-এর দয়া অপরিমিত, একে কেবল তোমার আর আমার মাঝে সীমাবদ্ধ কোরো না।’ রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও মানুষকে সংশোধন করেছেন, কিন্তু তিনি এ ক্ষেত্রে বিচক্ষণতা অবলম্বন করতেন, ফলে সবাই তা মেনে নিত, এগুলো তাদের বোধগম্য হতো।

বুখারিতে পাওয়া যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ উমার ইবনু আবি সালামাহ ﷺ-কে এত সুন্দরভাবে খাবারের আদব শিখিয়েছিলেন যে তিনি তা জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত অনুসরণ করেছিলেন। আরও সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে মক্কা বিজয়ের ঘটনায়। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিল অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত প্রায় দশ হাজার সৈন্যবিশিষ্ট সেনাদল। তাঁরা ঘিরে রেখেছিলেন সমগ্র মক্কাবাসীকে। প্রায় দুই দশক ধরে মক্কার এই লোকেরা সম্ভাব্য সব উপায়ে চেষ্টা করেছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্ষতি করার। এরাই তাঁর পরিবার-পরিজনদের ক্ষতি করেছিল, হত্যা করেছিল তাঁর প্রিয় সাহাবিদের। আজ তারা তাঁর দয়ার মুখাপেক্ষী। আজ মক্কাবাসীকে ঘিরে আছে তাঁর ﷺ অনুগত দশ হাজার সশস্ত্র সেনা। একটি ইশারা, একটিমাত্র কথাতাই দুনিয়ার বুক থেকে তিনি তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারতেন। অথচ তিনি যখন তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য শুরু করলেন, প্রথমে প্রশ্ন করলেন, ‘তোমাদের কী ধারণা, আজ আমি তোমাদের সাথে কেমন আচরণ করব?’ তারা কী বলল?

‘আপনি মহানুভব ব্যক্তি, মহানুভব ব্যক্তির সন্তান।’

অর্থাৎ, আপনি আমাদের মাফ করে দেবেন। মূলত তারা এর দ্বারা বুঝিয়েছিল যে, আপনি মহানুভব, আপনার পিতা মহানুভব, সুতরাং আপনি নিশ্চয় আমাদের ক্ষমা করবেন। কারণ, উদার-মহানুভব চরিত্রের অধিকারী কেউ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে ক্ষমার পথ অবলম্বন করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ সে কথাই বললেন, যা ইউসুফ ؑ বলেছিলেন :

لَا تَنْزِيْبَ عَلَيْكُمُ النَّيْمُ ۖ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ

‘আজ তোমাদের ওপর আমার কোনো অভিযোগ নেই, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন এবং তিনি দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।’ (সূরা ইউসুফ, ৯২)

اَذْهَبُوا فَاتُّمُّ الْمَطْلَقَاءُ

যাও, তোমরা মুক্ত।^{১১৭}

দেখুন, এসব ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ কী গভীর হিকমাহ অবলম্বন করেছিলেন। এমন বহু উদাহরণ আছে।

সহিহ মুসলিমের একটি ঘটনা। মুয়াউইয়া ইবনুল হাকাম আস-সালামি ؓ সালাত আদায় করছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে। হঠাৎ হাঁচি দিলেন আরেক সাহাবি। মুয়াউইয়া ؓ সালাতের মধ্যেই হাঁচি দেয়া লোকটির উদ্দেশ্যে বললেন ‘ইয়ারহামুকাল্লাহ’। ইনি মুআবিয়াহ ইবনু আবু সুফিয়ান ؓ নন আরেকজন সাহাবি। হাদিসের বর্ণনা থেকে মনে হয় প্রত্যুত্তরে ইয়াহদিকুমুল্লাহ ওয়া ইউসলিহ্ বালাকুম (يَهْدِيْكُمْ اللّٰهُ وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ) না বলার কারণে মুয়াউইয়া ؓ মর্মাহত হলেন। কোনো উত্তর না আসায়, সালাতের মধ্যেই তিনি বারবার ইয়ারহামুকাল্লাহ বলে যাচ্ছিলেন। এতে অন্যান্য সাহাবিদের মধ্যে অনেকে এতটাই বিরক্ত হলেন যে কেউ কেউ হাত দিয়ে নিজ উরুতে আঘাত করে শপথ করলেন যেন তিনি চুপ হয়ে যান। তিনি বুঝতে পারলেন, ব্যথিত হয়ে চুপ হয়ে গেলেন। তিনি কেন বারবার ইয়ারহামুকাল্লাহ বলছিলেন? এর কারণ হতে পারে যে, তিনি চাচ্ছিলেন যিনি হাঁচি দিয়েছিলেন তিনি যেন তার উদ্দেশ্যে ‘ইয়াহদিকুমুল্লাহ ওয়া ইউসলিহ্ বালাকুম’ বলেন। যখন তিনি দেখলেন, সাহাবিরা বিরক্ত হয়ে উরুতে আঘাত করছেন, তিনি চুপ করে গেলেন।

কোনো ভুল হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সেটাকে পাশ কাটিয়ে যেতেন না। তিনি বলতেন না যে হিকমাহ হলো পাশ কাটিয়ে যাওয়া। সালাত শেষে তিনি মুয়াউইয়া ؓ-কে কাছে ডাকলেন। তাঁকে নসীহাহ করলেন, বোঝালেন সালাতের সময় এমন করা যায় না। তাঁকে সালাতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানালেন। মুয়াউইয়া ؓ বলেছেন—ওয়াল্লাহি, তিনি আমার প্রতি একটুও ঘৃণা প্রকাশ করেননি। ওয়াল্লাহি, তিনি আমাকে মারেননি, কোনো কড়া কথা বলেননি।

অত্যন্ত নম্রতা ও দয়ার সাথে তিনি আমাকে বললেন, এটা সালাত, আমরা সালাতের মাঝে এ ধরনের কোনো কথা বলতে পারব না। এখানে কেবল তাসবিহ, তাকবির ও কুরআন তিলাওয়াত করা যাবে। কোমলতার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ভুল শুধরে দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ রকম ব্যবহার পাবার পরপর মুয়াউইয়া ইবনুল হাকাম র.এ. মন খুলে তাঁর সাথে কথা বলতে শুরু করলেন। ইসলাম গ্রহণের আগেকার জীবনের অনেক বিষয় নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। প্রশ্ন করলেন নিজের জাহিলি জীবনের নানা ঘটনা নিয়ে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, এ সব ছিল পথভ্রষ্টতা।

শিক্ষণীয় বিষয় হলো, মুয়াউইয়া র.এ. সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণ এত উদারতা ও হিকমাহপূর্ণ ছিল যে, মুয়াউইয়া র.এ. কাছে মনে হয়েছিল যে তাঁর ﷺ কাছে মন খুলে কথা বলা যায়, প্রশ্ন করা যায় যেকোনো বিষয়ে। উম্মাহ হিসেবে এর সুফল আমরা ভোগ করছি। কারণ, ইনি ছিলেন সেই সাহাবি, যিনি তাঁর দাসীকে চড় মারার পর অনুতপ্ত হয়ে বিচারের জন্য দাসীকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে এসেছিলেন। সেদিন মাসজিদে তার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ কঠোর আচরণ করলে মুয়াউইয়া র.এ. হয়তো আর কখনো তাঁকে কিছু বলার সাহস করতেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে দাসীকে নিয়ে এসে বলতে পারতেন না, আমি তাকে মেরেছি, এখন আমার কী করা উচিত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচরণের কারণে তিনি পরে এসে প্রশ্ন করার সুযোগ পেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন দাসীকে জিজ্ঞেস করলেন—‘আল্লাহ কোথায়?’ এটি একটি বিখ্যাত হাদিস, আপনারা সবাই জানেন। দাসীটি আরবি বলতে পারত না, কিন্তু সে প্রশ্ন ঠিকই বুঝতে পেরেছিল। আল্লাহ কোথায়, এ প্রশ্নের উত্তরে সে আকাশের দিকে আঙুল উঁচিয়ে ইশারা করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাঁকে মুক্ত করে দাও।”১১

১১৬ সহিহ মুসলিম, সহিহ ইবনু হিব্বান, মুসনাদু আহমাদ, সুনানুন নাসায়ি, সুনানুল বাইহাকি, সুনানু আবি দাউদ, মুসান্নাফ ইবনু আবি শাইবাহ, মুশকিলুল আসার লিত-তাহাবি, মু’জামুত তাবারানিসহ হাদিসের আরও বহু কিতাবে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। সহিহ মুসলিমের শব্দাবলি নিম্নরূপ :

মুয়াউইয়া ইবনুল হাকাম আস-সুলামী র.এ. থেকে বর্ণিত,

قَالَ وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تُزْعِي غُنَا لِي يَتَلَّحُ وَالْحَيَاءُ نَفَاذَتْ ذَاتُ يَوْمٍ فَبَدَأَ الْيَتِيمُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاوٍ مِنْ غَنِيَّتِي وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ أَتَفُ كُنَّا بِأَعْمَالٍ لِكَيْتِي صَكَّكُنَّهَا صَكُّكَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَزَّمْتُ ذَلِكَ عَلَيَّ فُلَّتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا أَعْمَالُهَا فَهِيَ «أَتَيْتِي بِهَا». فَأَتَيْتُ بِهَا فَقَالَ لَهَا «أَتَيْنَ اللَّهُ». قَالَتْ فِي السَّاءِ. قَالَ «مَنْ أَنَا». قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ «أَعْمَلُهَا فَبَدَأَ مُزْمِنًا»

তিনি বলেন, আমার এক দাসী ছিল। সে উহুদ ও জাওয়ানিয়াহ এলাকায় আমার বকরীপাল চরাতে। একদিন আমি হঠাৎ সেখানে গিয়ে দেখলাম পাল থেকে বাঘে একটি বকরী নিয়ে গিছে। আমিও তো অন্যান্য আদমসন্তানের মতো একজন মানুষ। তাদের মতো আমিও বেগে যেলাম ও দাসীকে আঘাত করলাম। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলাম (এবং সব কথা বললাম)। কেননা, বিষয়টি আমার কাছে খুবই গুরুতর মনে হলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমি কি তাকে মুক্ত করে নেবো? তিনি বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে আসো। সুতরাং আমি তাকে এনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে হাজির করলাম। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, (বলো তো) আল্লাহ কোথায়? সে বলল, আকাশে। তিনি বললেন, (বলো তো) আমি কে? সে বলল, আপনি আল্লাহর রাসূল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, তুমি তাকে মুক্ত করে দাও, সে একজন মুমিনাহ নারী। [বর্ণনা নং : ১২২৭]

প্রথমবার মুয়াউইয়া রাঃ-এর সংশোধনের সময় রাসূলুল্লাহ সঃ যদি উদার না হতেন, তিনি যদি তাঁকে চুপ কতে বলতেন, এমন কিছু বলতেন যা অন্য সাহাবিদের সামনে তাঁকে বিব্রত করত, যদি তাকে জামাতে আসতে নিষেধ করতেন কিংবা কোনো কঠোর কথা শুনিয়ে দিতেন, তাহলে আর কোনো দিন তিনি রাসূলুল্লাহ সঃ-এর কাছে নিঃসংকোচে আসতে পারতেন না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সঃ-এর আচরণের মাধুর্য মুয়াউইয়া রাঃ-এর অন্তরকে স্বস্তি দিয়েছিল, প্রশান্ত করেছিল। তার কাছে মনে হয়েছিল যেকোনো বিষয় নিয়ে তিনি রাসূলুল্লাহ সঃ-এর কাছে আসতে পারবেন। এ প্রেমের ফলাফল হিসেবেই আমরা পেয়েছি ‘আল্লাহ কোথায়?’ এ প্রশ্নের ব্যাপারে সুন্নাহর সবচেয়ে শক্তিশালী দলিলগুলোর একটি।

আল্লাহ সঃ দাওয়াহর ব্যাপারে মুসা ও হারুন আলাইহিমুস সালামকে উপদেশ দিলেন :

نَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى

‘এবং তোমরা তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবে, হতে পারে সে উপদেশ গ্রহণ করবে কিংবা আল্লাহকে ভয় করবে।’ (সূরা আত-ত্বাহা, ৪৪)

হিকমাহ অবলম্বনে এর চেয়ে বড় দলিল আর কী হতে পারে? দাওয়াহতে হিকমাহ ও নম্রতা অবলম্বনের সর্বোচ্চ উদাহরণ এই আয়াতটি। আল্লাহ তাঁর দুজন বিশিষ্ট রাসূলকে বলছেন তাঁরা যেন ফিরাউনের সাথে নম্রভাবে কথা বলেন। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু কাসির রাঃ বলেছেন, এই আয়াতের মধ্যে আমাদের জন্য শিক্ষা নিহিত। ফিরাউন পৌঁছে গিয়েছিল ওদ্ধাতের শিখরে, উপনীত হয়েছিল অহংকারের শেষ সীমায়। সে পরিণত হয়েছিল পৃথিবীতে অহংকার, ওদ্ধাত ও সীমালঙ্ঘনের মূর্ত প্রতীকে। অথচ এই ফিরাউনের ব্যাপারেও আল্লাহ তাঁর বিশিষ্ট রাসূলদের আদেশ দিলেন, তারা যেন তার সাথে নম্র আচরণ করেন। এমন এক ব্যক্তির সাথে আল্লাহ সঃ তাঁদের নম্রতা অবলম্বন করতে বললেন, যে নিজেকে রব দাবি করেছিল। সে বলেছিল :

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى

‘আমিই তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ রব।’ (সূরা আন-নাযিয়াত, ২৪)

যদি নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ পালনকর্তা দাবি করা উদ্ধত ফিরাউনের সাথে আল্লাহ সঃ নম্রতা অবলম্বনের নির্দেশ দেন, তাহলে যারা আল্লাহ সঃ-কে সর্বশ্রেষ্ঠ পালনকর্তা হিসাবে স্বীকার করে, তাদের সাথে কথা বলার সময় কী পরিমাণ সহানুভূতি, দয়া, নম্রতা ও হিকমাহ অবলম্বন করা প্রয়োজন? ভাবুন।

আব্বাসীয় খিলাফাহর সময়কার কথা। খলিফা আল-মামুনের কাছে এসে অত্যন্ত কড়া ভাষায় এক লোক তিরস্কার করতে শুরু করল। আল-মামুন বিচক্ষণ ছিলেন, কথাবার্তায় প্রজ্ঞা অবলম্বন করতেন। তিনি বললেন, তোমার চেয়ে উত্তম এক ব্যক্তিকে আল্লাহ আমার

চেয়েও নিকট এক লোকের কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ﷻ মুসা ও হারুন আলাইহিস্ সালামকে নির্দেশ দিয়েছিলেন :

نُفُوْلًا لَهُ فُوْلًا لَّنِيْنَا

'এবং তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবে।' (সূরা আত-ত্বহা, ৪৪)

বুঝারিতে আছে, ইবনু মাসউদ রাঃ বলেছেন, আমার এখনো এমনভাবে মশে আছে, যেন আমি রাসূলুল্লাহ সঃ কে নিজের চোখের সামনে দেখছি। রাসূলুল্লাহ সঃ আগেকার সময়ের এক রাসূলের নির্ঘাতনের কাহিনি বলছিলেন—তার কণ্ঠ তার ওপর শারীরিক নির্ঘাতন চালাত। রক্তাক্ত অবস্থায়ও তিনি বলতেন,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِيْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

হে আল্লাহ, আমার জাতির লোকেরা অজ্ঞ, আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন।^[১১৭]

চিন্তা করুন, একজন রাসূলের শরীর থেকে রক্ত বরছে। রক্ত মুছতে মুছতে তিনি বলছেন, 'হে আল্লাহ, আমার জাতির লোকেরা অজ্ঞ, আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন।'

এই হলো দাওয়াহ ইলাল্লাহ। এ পথের কষ্টগুলো আপনাকে বরণ করে নিতে হবে। কখনো লাঞ্ছিত হবেন। নেনে নিতে হবে। এ সবকিছুই দাওয়াহর অংশ। মনে রাখতে হবে যে, দাওয়াহর ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো নম্রতা ও হিকমাহ অবলম্বন। আমাদের নবি সঃ যেন মমতা ও কোমলতার আধার, তিনি ছিলেন উম্ম হুদয়ের অধিকারী; ছিলেন দয়া ও ভালোবাসার কূলহীন সমুদ্র। তাঁর কোনো কথার ব্যাপারে 'কেন তিনি এ কথাটা বলেছিলেন?', 'কেন ওভাবে বলেছিলেন?' এ ধরনের কোনো প্রশ্ন কেউ তুলতে পারবে না। এই হলেন আমাদের রাসূলুল্লাহ সঃ—দয়ার নিব্বিরগী।

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ

'এবং আমি আপনাকে আলামিনের (মানুষ, ইনসান ও যা কিছু আছে) জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।' (সূরা আল-আম্বিয়া, ১০৭)

তিনি ছিলেন মানবজাতির প্রতি রাহমাহস্বরূপ। শুধু মানবজাতি না; তিনি ছিলেন সমগ্র সৃষ্টির জন্য রাহমাহস্বরূপ। রাসূলুল্লাহ সঃ ছিলেন রাহমাতুল্লিল আলামিন। 'আলামিন' অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টি; মানুষ, জিন; মুমিন, কাফির ও এই মহাবিশ্ব সবকিছুর জন্য তিনি ছিলেন রাহমাহ। রাসূলুল্লাহ সঃ কখনো ভুলের সাথে আপস করেননি, ভুলগুলোকে এড়িয়ে যাননি। যখনই কোনো ভুল হয়েছে শুধরে দিয়েছেন। কিন্তু ভুল সংশোধনের জন্য তিনি সবচেয়ে সৌজন্যপূর্ণ, যথোপযুক্ত ও সর্বোত্তম উপায় অবলম্বন করতেন।

বনি ইসরাইলের এক মুমিন মহিলার^{১১৮} পতিতাবৃত্তির গুনাহ আল্লাহ ﷻ ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। কেন? কারণ, মহিলাটি একটি কুকুরের প্রতি দয়া দেখিয়েছিল। নিজের পিপাসার্ত হবার কারণে সে তৃষ্ণায় মৃতপ্রায় একটি কুকুরের কষ্ট অনুভব করতে পেরেছিল। তৃষ্ণার্ত কুকুরটিকে পানি পান করিয়েছিল নিজের জুতো ভরে। একটি কুকুরের প্রতি দয়া করার কারণে তার পতিতাবৃত্তিসহ অন্যান্য গুনাহ আল্লাহ ﷻ ক্ষমা করে দিলেন। তাঁকে জ্ঞানাত দান করলেন। কাজেই আপনার দাওয়াহয় মমতা থাকতে হবে, দাওয়াহ মানেনই রাহমাহ। কুকুরের প্রতি দয়ার কারণে যদি আল্লাহ ﷻ একজন পতিতার কবীরা গুনাহ ক্ষমা করে দিয়ে তাকে জ্ঞানাত দান করেন, তাহলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহয় বিশ্বাসী একজন বান্দার প্রতি দয়ার প্রতিদান কত বিশাল হবে একবার কল্পনা করুন। কল্পনা করুন, সমগ্র মানবজাতির ওপর দয়ার প্রতিদান কেমন হবে।

দাওয়াহ একটি শিল্প, যার সম্পর্ক মানুষের অন্তরের সাথে। একজন দাঈর কাজ মানুষের অন্তর নিয়ে। এ শিল্পের নিয়মগুলো আপনাকে জানতে হবে। কখনো এমনও হতে পারে, আপনি ন্যায়পরায়ণ বান্দাদের কাছে দাওয়াহ করছেন এবং তাঁদের সামনে সত্যকে উপস্থাপন করছেন, কিন্তু আপনার উপস্থাপনার কারণে সাধারণ লোকেরা হককে বাতিল মনে করছে। এ ব্যাপারে সতর্ক হোন। আপনি হকের ওপর আছেন, হকের দিকেই আহ্বান করছেন, কিন্তু আপনার পদ্ধতি বাতিল হবার কারণে সাধারণ মানুষ হককে বাতিল মনে করছে। আপনি ভুল পদ্ধতির অনুসরণ করছেন। এ ব্যাপারে সতর্ক হোন। আবার এমন কিছু বিদআতি ও মর্ডানিস্ট দাঈদের দেখবেন যাদের মুখে সব সনয় কৃত্রিম রেডিমেড হাসি লেগে থাকে। বিশেষ কথা, মর্ডানিস্টরা বিষাক্ত কথা আর মেকি হাসিতে খুব পারদর্শী। মুখে রেডিমেড হাসি নিয়ে নোংরা, বিকিয়ে যাওয়া ও কলুষিত এক 'ইসলাম' এরা ফেরি করে বেড়ায়। তাদের হাসি যেমন মেকি, তেমনি তাদের সন্তা মতাদর্শও মেকি। হয়তো আপনি এটা ধরতে পারবেন। কিন্তু তাদের আকর্ষণীয় উপস্থাপনার কারণে অনেক সাধারণ, অজ্ঞ লোক বাতিলকে হক মনে করতে শুরু করে। একজন দাঈ হিসেবে আপনাকে মনে রাখতে হবে, আমরা শয়তানদের কাছে দাওয়াহ নিয়ে যাচ্ছি না। শয়তানদের দাওয়াহ দিতে আমরা আদিষ্টও ইইনি। আবার আমরা যাদের দাওয়াহ দিচ্ছি তারা ফেরেশতাও না, অনুভূতিহীন পাথরও না। আমরা মানুষ নিয়ে কাজ করছি, মানুষের অন্তর নিয়ে কাজ করছি। এতে ভালো ও মন্দ দুটোই আছে। মানুষের মাঝে নিষ্ঠাবান মুক্তাকি যেমন আছে, তেমনি নির্ভেজাল ফাজিরিনও আছে। কাদের নিয়ে কাজ করছেন আপনাকে জানতে হবে।

আল্লাহ ﷻ কুরআনে বলেন :

وَنُفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

১১৮ এই মহিলা মুমিনাহ ছিলেন। বর্তমানের অনেক মর্ডানিস্ট এ বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে বর্তমানের কাকিরদের ক্ষেত্রে এই হাসি প্রয়োগের চেষ্টা করে।

‘শপথ প্রাণের (আদম কিংবা আত্মা কিংবা কোনো ব্যক্তি) এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন তাঁর, তারপর তিনি তাকে সত্য ও মিথ্যার জ্ঞান প্রদান করলেন।’ (সূরা আশ-শামস, ৭-৮)

অর্থাৎ, আপনি (মুত্তাকিন ও মুহ্জ্জার) উভয় শ্রেণির মানুষ পাবেন, তাই হিকমাহ ও দয়ার সাথে দাওয়াহ পৌঁছে দিন। আপনার কাজ মানুষের হৃদয় নিয়ে, অন্তরাত্মা নিয়ে, তাই হিকমাহর সাথে কাজ করুন।

কঠোরতাও হিকমাহর অন্তর্ভুক্ত

আমরা দাওয়াহয় দয়া ও হিকমাহ অবলম্বন এবং দাওয়াহর মূলনীতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছি। এবার আমরা এমন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, যেটাকে প্রথমে অগেগার আলোচনার বিপরীত মনে হতে পারে। কিন্তু আসলে এটা সেই একই আলোচনার ধারাবাহিকতা। দাওয়াহ একদিকে যেমন কোমল ও হিকমাহপূর্ণ হতে হয়, একইভাবে হিকমাহর কারণে কখনো কখনো একজন দাঈর আচরণে কঠোরতা প্রকাশ পায়। অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে দাওয়াহর খাতিরে কখনো কখনো কঠোরতা অবলম্বনের দরকার হয়। দাওয়াহর ক্ষেত্রে হিকমাহ, নম্রতা ও সর্বোত্তম আচরণ অবলম্বনের ব্যাপারে যেসব উদাহরণ আমরা এনেছি, সেগুলোর বেশির ভাগ থেকেই এবং অন্যান্য আরও উদাহরণ থেকে এটাও প্রমাণ হয় যে, দাওয়াহর ক্ষেত্রে অনেক সময় কঠোরতাও অবলম্বন করতে হয়। যেখানে কঠোরতা প্রয়োজন সে ক্ষেত্রে কঠোরতা আরোপ দাওয়াহর-ই একটি বৈশিষ্ট্য।

চলুন, মুসা ﷺ-কে যখন ফিরাউনের কাছে পাঠানো হয়েছিল সেই ঘটনায় ফিরে যাই। আল্লাহ ﷻ বলছেন :

قُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى

‘এবং তোমরা তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবে, হতে পারে সে উপদেশ গ্রহণ করবে কিংবা আল্লাহকে ভয় করবে।’ (সূরা আত-ত্বাহা, ৪৪)

অধিকাংশ মানুষ আলোচনার সময় এতটুকু বলেন। শেষ অংশটুকু তারা বলতে চান না। যখন ফিরাউন যখন উদ্ধত ও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠল, সে মুসা ﷺ-কে বলল :

إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا

‘হে মুসা, আমি তো মনে করি, তুমি জাদুগ্রস্ত।’ (সূরা আল-ইসরা, ১০১)

উদ্ধত, দাঙিক ফিরাউন মুসা ﷺ-কে তাচ্ছিল্য আর বিদ্রূপ করছিল। মুসা ﷺ তখন কী বললেন? আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

‘এবং তোমরা তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবে, হতে পারে সে উপদেশ গ্রহণ করবে কিংবা আল্লাহকে ভয় করবে।’ (সূরা আত-ত্বাহা, ৪৪)

আল্লাহ ﷻ তাঁকে বলেছেন হিকমাহ অবলম্বন করতে, নশ্তার সাথে তাকে তাওহিদের দিকে আহ্বান করতে। কিন্তু ফিরাউনের এ কথার পর মুসা ﷺ কী বললেন? মুসা ﷺ উত্তর দিলেন :

وَإِنِّي لَأَكْتُكُ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا

‘এবং হে ফিরাউন, আমি তো দেখছি, তুমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছ (সমস্ত কল্যাণ থেকে দূরে সরে গিয়েছ)!’ (সূরা আল-ইসরা, ১০২)

এখানে মাসবুরা (مَثْبُورًا) অর্থ ধ্বংসপ্রাপ্ত, শাস্তিপ্রাপ্ত ও অভিশপ্ত। ইবনু আব্বাস ﷺ বলেছেন, ‘মাসবুরা’ অর্থ অভিশপ্ত, মালউন, ملعون। মুসা ﷺ এখানে ফিরাউনকে বলছেন, ‘তুমি অভিশপ্ত।’ এটা ইবনু আব্বাস ﷺ-এর মত। অন্যান্য মুফাসসিরিনের মতে মাসবুরা মানে ধ্বংসপ্রাপ্ত কিংবা শাস্তিপ্রাপ্ত। যেমন : মুজাহিদ ﷺ বলেছেন, মাসবুরা মানে ধ্বংসপ্রাপ্ত। অর্থাৎ, মুসা ﷺ ফিরাউনকে বলছেন, তুমি ধ্বংসপ্রাপ্ত কিংবা শাস্তিপ্রাপ্ত হতে যাচ্ছ। আল-ফাররার মতে মাসবুরা মানে—এমন কেউ, যার মাঝে ভালো কোনো কিছু আর অবশিষ্ট নেই। লক্ষ করুন, আল্লাহ ﷻ ফিরাউনের প্রতি মুসা ﷺ-কে নরম হতে বলেছিলেন, তবে দাওয়াহর হিকমাহর আরও একটি দিক আছে, যা অস্বীকার যাবে না।

দাওয়াহর ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো কোমলতার। সাধারণভাবে দাওয়াহর ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হবে নশ্তা, কোমলতা ও মমতার। দাওয়াহর মূল ভিত্তি ও মূলনীতি হলো নশ্তা, সবার কাছে সর্বোত্তম উপায়ে এ বার্তা পৌঁছে দেয়া। কিন্তু কঠোরতা ও দাওয়াহর অন্তর্ভুক্ত। ব্যতিক্রম হলেও দাওয়াহর ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বনও ইসলামের অংশ। একমাত্র বিভ্রান্ত মর্ডানিস্ট ও তাদের অনুসারীরা এ সত্যকে অস্বীকার করবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দাওয়াহয় নশ্তা অবলম্বন করা হয়। আমাদের সামনে ফিরাউন ও মুসা ﷺ-এর ঘটনা আছে, নমরুদ ও ইব্রাহীম ﷺ-এর ঘটনা আছে, দুই বাগানবিশিষ্ট ব্যক্তি ও তার ভাইয়ের ঘটনা আছে, আছে কারুন ও তার লোকদের উদাহরণ। কুরআন ও হাদিসজুড়ে এমন অসংখ্য ঘটনা আছে। কিছু কিছু গল্প আগাগোড়া উদারতার আবার কিছু গল্পে প্রকাশ পেয়েছে কঠোরতা। আবার অনেক ক্ষেত্রে উদারতা ও কঠোরতার সংমিশ্রণ ঘটেছে। যেমন : ফিরাউনের কাহিনি। মুসা ও হারুন আলাইহিমুস সালাম শুরুতে ফিরাউনের সাথে নশ্তা ও উত্তম পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, কিন্তু শেষে মুসা ﷺ ফিরাউনকে উদ্দেশ্য করে বললেন :

وَإِنِّي لَأَكْتُكُ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا

‘এবং হে ফিরাউন, আমি তো দেখছি, তুমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছ (সমস্ত কল্যাণ থেকে দূরে সরে গিয়েছ)!’ (সূরা আল-ইসরা, ১০২)

কেন তিনি এ কথা বললেন? কারণ, হিকমাহ মানেই উদারতা না। উদারতা দাওয়াহর মূলনীতি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে উদারতাই নিয়ম। কিন্তু উদারতা দ্বারা হিকমাহকে সংজ্ঞায়িত করা

যাবে না। হিকমত হলো সঠিক স্থানে, সঠিক সময়ে, সঠিক পদ্ধতিতে, সঠিক কাজটি করা।

যে ব্যক্তি কালিমাতুশ শাহাদাহ (আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) বিশ্বাস করে না, সে কাফির। কাফির মানে কাফিরই। আমি জানি না এটা নিয়ে সবার এত সমস্যা কেন। কয়েক দশক ধরে আমি এটা বোঝার চেষ্টা করছি কিন্তু আমি এখনো বুঝে উঠতে পারিনি। কাফিরকে কাফির বলতে সমস্যা কোথায়? কাফিররা তো আমাদের কাফির বলে। 'যিশু আল্লাহর পুত্র', এ কথা বিশ্বাস না করলে খ্রিষ্টানদের কাছে আপনি একজন অবিশ্বাসী। অবিশ্বাসী মানে কাফির। তাহলে কাউকে কাফির বলতে সমস্যা কোথায়? আসলেই আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারি না। সমগ্র দুই শ্রেণিতে মানবজাতি বিভক্ত—মুমিন ও কাফির। অথচ উম্মাহর বিকিয়ে যাওয়া বিভ্রান্ত প্রতারণা আজ সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা প্রচার করে বেড়াচ্ছে। আল্লাহ ﷻ কুরআনে বলেন :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

‘তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাদের মাঝে কেউ হয় কাফির আর কেউ হয় মুমিন।’ (সূরা আত-তাগাবুন, ২)

মুমিন ও কাফির—মানবজাতি এই দুটো শ্রেণিতে বিভক্ত। এই দুইয়ের মাঝে তৃতীয় কোনো শ্রেণি নেই। যখনই কেউ আপনাকে তৃতীয় কোনো কিছুর কথা বলবে, আপনি ধরে নেবেন সে হয় কোনো মূর্খ, নয়তো তার আকিদাহয় ত্রুটি আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টা হয়ে থাকে।

অবিশ্বাসীরা কাফির, কিন্তু তাই বলে দাওয়াহর সময় আপনি কোনো খ্রিষ্টান বা ইহুদিকে বলতে যাবেন না—তুমি তো অবিশ্বাসী। আপনি তাকে গিয়ে বলবেন না—তুমি ইসলামে বিশ্বাস করো না, তুমি অবিশ্বাসী, তুমি কাফির। আপনি বলবেন না—এই! এই কাফির, এখানে আসো, আমি তোমাকে ইসলাম শেখাব। এটা দাওয়াহর সঠিক পদ্ধতি না। হ্যাঁ, সে অবশ্যই কাফির, কিন্তু এভাবে তো দাওয়াহ হয় না। তার কাফির হবার বিষয়টি নিয়ে তার সাথে তর্কে জড়াবেন না। সে যে কাফির, দাওয়াহ দেয়ার সময়ে তাকে এটা বলতে যাবেন না। আর তাকে এটা বলার কোনো দরকারও নেই। কিন্তু আপনাকে বিশ্বাস রাখতে হবে যে, সে কাফির। এমনকি বিদআতিদের মাঝেও যারা জানতে আগ্রহী, যাদের সঠিক পথে ফিরে আসার সম্ভাবনা আছে, তাদের সাথেও নস্রাত অবলম্বন করতে হবে। আবার অনেকে আছে বিদআতের ব্যাপারে উদ্ধত ও একগুঁয়ে। সগর্বে, সদস্তে তারা বিদআতের দিকে মানুষকে আহ্বান করে বেড়ায়। যখন কেউ এমন স্তরে পৌঁছে যায়, নিজ জিহ্বাকেও সংযত করে না, তখন তার সাথে কঠোর হওয়া যেতে পারে। এদের মাঝে এমন অনেকে আছে যারা আল্লাহ ﷻ-এর শত্রুদের খুশি করার জন্য বর্তমান ও পূর্বসূরি নেককার ব্যক্তিদের ব্যাপারে, আল্লাহ ﷻ-এর অনুগত সত্যপন্থী বান্দাদের ব্যাপারে লাগামহীন কথাবার্তা বলে। সুতরাং এসব ক্ষেত্রে পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আলাদা আলাদাভাবে খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। হ্যাঁ, বিদআতিদের সাথেও

কঠোর হওয়া যাবে, তবে তা অবশ্যই নির্ভর করবে অবস্থা ও প্রেক্ষাপটের ওপর। যদি কেউ শিখতে চায়, আয়াত, হাদিস ও সালাফদের কথা মেনে নেয়, তবে তার সাথে কঠোরতার কী প্রয়োজন? এ ধরনের প্রতিটি পরিস্থিতি নিয়ে একজন দাঈর বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন, জানা দরকার খুঁটিনাটি। কখন কঠোর হতে হবে আর কখন উদার হওয়া যাবে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন, আমরা সেই বিস্তারিত আলোচনায় এখন যাব না। তবে সব সময় মনে রাখতে হবে, দুটোই কিন্তু ইসলামে আছে।

এ কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য একটি প্রাথমিক রূপরেখা দেয়া। দাওয়াহর ক্ষেত্রে সাধারণত আমাদের অবস্থান হবে কোমলতার। কেবল কিছু ব্যতিক্রমের বেলায় কঠোরতার প্রয়োজন হবে। কিন্তু তাই বলে সং কাজে উৎসাহ ও মন্দকে প্রতিহত করার জন্য কঠোরতা অবলম্বনকে কখনো অস্বীকার করা যাবে না। দাওয়াহর ক্ষেত্রে উদারতা ও নরমপন্থা অনুসরণের দলিল হিসেবে লোকে ফিরাউনের কাহিনির পাশাপাশি নূহ ﷺ-এর ঘটনাও উল্লেখ করে। তারা আপনাকে বলবে, নূহ ﷺ দাওয়াহ দিয়েছেন সাড়ে নয় শ বছর ধরে। এই সাড়ে নয় শ বছর ধরে তিনি কেবল দাওয়াহই দিয়ে গেছেন। তাই আমাদেরও তাঁর মতো ধৈর্যশীল ও নরম হতে হবে, আর কেবল দাওয়াহ আর দাওয়াহ চালিয়ে যেতে হবে। আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَغْرَهُمُ الظُّلُمَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ

‘আমি নূহকে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। তিনি তাদের মধ্যে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর অবস্থান করেছিলেন।’ (সূরা আল-আনকাবুত, ১৪)

নূহ ﷺ সাড়ে নয় শ বছর তার সম্প্রদায়ের কাছে দাওয়াহ করেছিলেন। দাওয়াহর ব্যাপারে তিনি নম্রতা ও কোমলতা অবলম্বন করেছিলেন, এ সবই সত্য। কিন্তু ফিরাউনের কাহিনির মতো এখানেও অন্য একটি দিক আছে।

وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجَرْتُمْ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِظَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ

‘আর হে আমার জাতি, আমি তো এ জন্য তোমাদের কাছে কোনো ধনসম্পদ চাচ্ছি না; আমার বিনিময় তো শুধু আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে। আর আমি তো বিশ্বাসীদের তড়িয়ে দিতে পারি না। নিশ্চয়ই তারা নিজেদের পালনকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করবে। উপরন্তু আমি দেখছি, তোমরা এক নির্বোধ সম্প্রদায়।’ (সূরা হুদ, ২৯)

নূহ ﷺ দীর্ঘদিন মমতার সাথে তাঁর কওমকে সত্যের দিকে আহ্বান করেছেন। কিন্তু আয়াতের শেষ অংশটিও লক্ষ্য করতে হবে। তিনি সাড়ে নয় শ বছর দাওয়াহ দিয়েছিলেন এটা অবশ্যই সত্য, কিন্তু তাই বলে আমরা এই দাওয়াহর অন্য দিককে ভুলে যেতে পারি না। তার কওম

যখন বিশ্বাসীদের অড়িয়ে দেয়ার জন্য তাঁর ওপর ক্রমাগত চাপ প্রয়োগ করছিল, তখন তিনি তাদের সম্বোধন করলেন নির্বোধ সম্প্রদায় বলে।

‘নিশ্চয়ই তারা নিজেদের পালনকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করবে। উপরন্তু আমি দেখছি, তোমরা এক নির্বোধ সম্প্রদায়।’ (সূরা হুদ, ২৯)

তিনি তাঁর কওমকে নির্বোধ সম্প্রদায় বললেন। অত্যন্ত কঠোর ও কর্কশ শব্দ ব্যবহার করলেন। ঠিক যেমন মুসা ﷺ ফিরাউনের সাথে নরম পন্থা দেখিয়েছিলেন, আবার তিনিই তাকে মাসবুরা বলেছিলেন; একইভাবে নুহ ﷺ-ও সফেদ নয় শ বছর দয়া ও নম্রতার সাথে দাওয়াহ দিয়েছিলেন, কিন্তু একপর্যায়ে তিনি তাদের সম্বোধন করেছিলেন নির্বোধ সম্প্রদায় বলে।

ইব্রাহীম ﷺ-ও তাঁর কওম ও বাবার প্রতি সদয় আচরণ করেছিলেন। তিনি তাঁর বাবাকে বলেছিলেন :

يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ غَصْبًا ۝ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَبْسُكَ
عَذَابُ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا

‘হে আমার পিতা, শয়তানের ইবাদত কোরো না। নিশ্চয়ই শয়তান পরম দয়াময়ের অবান্দ্য। হে আমার পিতা, নিশ্চয়ই আমি আশঙ্কা করি, পরম দয়াময়ের আযাব তোমাকে স্পর্শ করবে এবং তুমি শয়তানের বন্ধু হয়ে যাবে।’ (সূরা মারইয়াম, ৪৪-৪৫)

বাবাকে ‘ইয়া আবাতি’ বলা খুবই মিষ্টি ডাক। এই ডাকের মাঝে আবেগ, ভালোবাসা, বিনয় ও শ্রদ্ধাবোধের প্রকাশ পায়। তিনি তাঁর বাবার প্রতি সদয় ছিলেন, তাঁকে সত্যের পথে আনার চেষ্টা করছিলেন। বছরের পর বছর দাওয়াহ প্রদানে সবচেয়ে উত্তম উপায়ে মমতার দাওয়াহ করছিলেন, কিন্তু একসময় তিনিই তাঁর কওমের উদ্দেশে বলেছিলেন :

أَبِ لَكُمْ وَلَيْسَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

‘ধিক তোমাদের এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদের ইবাদত করো তাদের! তবে কি তোমরা বুঝবে না?’ (সূরা আল-আযিয়া, ৬৭)

উফ্ফ (أَفْ) শব্দটি এসেছে দুটো কিরাতে। প্রথমটি কিরাতে এসেছে উফ্ফা (أَفْ) হিসেবে, অর্থাৎ ‘ফা’ এর ওপরে ফাতাহ (যবর)। অন্য কিরাতে তানবিনের সাথে কাসরা (যের) যুক্ত হয়ে এসেছে, অর্থাৎ উফ্ফিন (أَفْ)। দুটি ক্ষেত্রেই এর অর্থ দাঁড়ায় আল-কারাহিয়াহ ওয়াল-ইহতিকার (الكرهية والاحتقار) যার মানে হলো, অপছন্দ ও ঘৃণা।

‘উফ্ফ’-আমি ঘৃণা করি। লাকুম-তোমাদের। ইহতিকার অর্থ ঘৃণাভরে ত্যাগ করা। তাঁর দাওয়াহর একটি পর্যায়ে ইব্রাহীম ﷺ তার সম্প্রদায়ের প্রতি কঠোর হন। তিনি বলেন, ধিক তোমাদের ওপর! বাংলায় এর অনুবাদ করা হয়েছে ধিক, কিন্তু আরবিতে ‘উফ্ফ’ এর মাধ্যমে

প্রকাশ পায়, কারাহিয়াহ ও ইহতিখার অর্থাৎ অপছন্দ ও ঘৃণা। এ অপছন্দ ও ঘৃণা কাদের প্রতি? তারা ও তাদের উপাস্যদের প্রতি।

‘তবে কি তোমরা বুঝবে না?’

এটা কি দাওয়াহর ক্ষেত্রে কঠোরতা নয়? অবশ্যই। কঠোরতা দাওয়াহর-ই একটি অংশ। মুসনাদে আহমাদে একটি বর্ণনা আছে এবং এর কিছু অংশ বুখারি-মুসলিমে এসেছে। বর্ণনাটি হলো সুবাইয়াহ বিনতুল হারিস বিধবা হবার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। ইসলামি ফিকহের দৃষ্টিকোণ থেকে বাচ্চা জন্ম দেয়ার ফলে তার ইদ্দতকাল পূর্ণ হয়ে গেছে, যেহেতু তিনি অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন এবং তার গর্ভের সন্তানের জন্ম হয়ে গেছে। অন্যান্য বিধবাদের মতো তাই তাকে আর চার মাস দশ দিন পূরণ করতে হবে না। চাইলে তিনি এখন বিয়ে করতে পারেন। একদিন আবু সানাবিল তার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি সুবাইয়াহর কাছ থেকে বা অন্য কোনোভাবে জ্ঞানতে পেরেছিলেন যে সুবাইয়াহর সন্তান হয়েছে এবং তিনি বিয়ের প্রস্তাব গ্রহণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আবু সানাবিল তাঁকে বললেন, পুরো চার মাস দশ দিন আপনাকে পূরণ করতে হবে। সুবাইয়াহ তার নিজের মতকে সঠিক মনে করলেন, আসলেও তা-ই ছিল। তার মত ছিল অন্তঃসত্ত্বা নারীর স্বামী মারা গেলে ওই নারীর জন্য ইদ্দত হলো তার সন্তান জন্মদানের সময় পর্যন্ত। আবু সানাবিল বললেন, না, আপনাকে চার মাস দশ দিন পূরণ করতে হবে। কোনো কোনো ব্যাখ্যাকারের মতে, আবু সানাবিল তাকে বিয়ে করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন, কিন্তু সুবাইয়াহ তাকে প্রত্যাখ্যান করায় আবু সানাবিল ইচ্ছে করে ইদ্দতকাল বাড়িয়ে বলেছিলেন।^[১১৯]

সুবাইয়াহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কী বললেন? মনে রাখুন ইনি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি মাসজিদের কোনায় থ্রাসাব করা এক বেদুইনকে মমতাবরে শিক্ষা দিয়েছিলেন, যিনি করতে ইচ্ছুক যুবককে কাছে ডেকে বৃকে হাত রেখে বুঝিয়েছিলেন। এই একই ব্যক্তি ﷺ সুবাইয়াহ-এর কথার জবাবে বলেন,

كَذَّبَ أَبُو السَّائِلِ

আবু সানাবিল মিথ্যে বলেছে।^[১২০]

আরেক বর্ণনায় এসেছে,

لَيْسَ كَمَا قَالَ أَبُو السَّائِلِ ، قَدْ حَلَلَتْ فَرْوَجِي

আবু সানাবিল যে রকম বলছে, ব্যাপারটা এমন নয়। তোমার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেছে। তুমি চাইলে এখন বিয়ে করতে পারো।

১১৯ ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে সহিহুল বুখারির কিতাবুল মাগাবিতে (হাদিস নং : ৩৯৯০), সহিহ মুসলিমের কিতাবুত তালাকে (হাদিস নং : ৩৭৯৫)। এ ছাড়াও সুনান ও মুসনাদের কিতাবাদিতে শাখিক ভিন্নতা-সহকারে বর্ণিত হয়েছে।

১২০ মুসনাদুশ শাফে'ঈ : ৭৮২

নবি ﷺ তাঁকে বললেন, তুমি মুক্ত, তোমার ইন্দ্রত পূর্ণ হয়ে গেছে, চাইলে বিয়ে করতে পারো। মাসজিদের কোনায় প্রশ্রাব করা এক বেদুইনের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ সদয় আচরণ করেছিলেন, তাকে আপন করে নিয়েছিলেন। অথচ সেই একই রাসূলুল্লাহ ﷺ আজ এক ব্যক্তির ব্যাপারে বললেন, সে মিথ্যাবাদী। কেন? কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বুঝতে পেরেছিলেন এই পরিস্থিতিতে এই ব্যক্তির ওপর কঠোর হওয়া দরকার। মুসলিম, আবু দাউদ ও আন-নাসায়ীতে এসেছে, এক ব্যক্তি বক্তব্য দেয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল। সব খুতবাহর শুরুতে আমরা বলি যে,

مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَزَقَهُ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ عَوَى

‘যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে-ই তো সুপথ পায়। আর যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অবাধ্যাচরণ করে, সে-ই তো বিভ্রান্ত হয়।’

কিন্তু, وَمَنْ يَعْصِهَا অর্থাৎ, ‘যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে’ বলার পরিবর্তে তিনি বললেন, ‘যে তাঁদের অবাধ্যতা করবে’।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কথায় জবাবে বললেন,

«يُنْسِي الْخَطِيْبُ أَنْتَ. قُلْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ»

তুমি তো একজন মন্দ খতিব! (‘তাঁদের’ পরিবর্তে) বলো যে, ‘যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে’।

কত সূক্ষ্ম পার্থক্য দেখুন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কারণে তাকে মন্দ খতিব বললেন, ‘তাঁদের’ না বলে ‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূল’ বলতে বললেন। এই সামান্য ভুলের কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার প্রতি কঠোরতা দেখালেন, কারণ ওই ব্যক্তির এবং ওই পরিস্থিতির জন্য এটাই ছিল হিকমাহ।

অন্য বর্ণনায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

قُمْ - أَوْ اذْهَبْ

ওঠো, বের হয় যাও।^(১৩)

আর আমি প্রথমে যে বর্ণনাটি উল্লেখ করেছি, সেখানে তিনি বলেছেন, يُنْسِي الْخَطِيْبُ মন্দ খতিব।

জনসম্মুখে বক্তব্য দেয়ার সময় এ ধরনের কথা, বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখ থেকে, যে কাউকে বিপর্যস্ত করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। হয়তো এ ঘটনার পর আর কোনো দিন সে

লোকসম্মুখে খুতবাহ না-ও দিতে পারে। কিন্তু ওই পরিস্থিতিতে তার সাথে এমন আচরণ করাই ছিল হিকমাহ। খুতবাহ দেয়ার সময়ে খতিব হিসেবে কিংবা জুমুআর সালাতে মুক্তাদি হিসেবে হাত ওঠানোর নিষেধাজ্ঞা-সংক্রান্ত সহিহ মুসলিমের হাদিসের উল্লেখ আমি আগেই করেছি। উমারাহ ইবনু রুআইবাহ রাঃ দেখলেন, বনু উমাইয়াহর এক নেতা মিস্বারে দাঁড়িয়ে হাত উত্তোলন করছে। উমারাহ রাঃ বললেন, আল্লাহ ওই দুই হাতকে লালিত করুক, রাসূলুল্লাহ সঃ মিনারে দাঁড়িয়ে কখনো এর বেশি করেননি (অর্থাৎ কেবল আঙুল ওঠাতেন)।^১ রাসূলুল্লাহ সঃ দু'আ করার সময় আঙুল উঁচিয়ে ধরতেন। এখানে উমারাহ রাঃ অত্যন্ত কঠিন কথা বলেছেন, তিনি বলেছেন—আল্লাহ ওই দুই হাতকে লালিত করুন। এই পরিস্থিতিতে কঠোর হওয়াই তাঁর কাছে সমীচীন মনে হয়েছে।

আবু আইয়ূব রাঃ গেলেন সালিম ইবনু আবদিলাহ ইবনু উমারের বিয়ের অনুষ্ঠানে। সালিম ইবনু আবদিলাহ ছিলেন উমার রাঃ-এর নাতি। আবু আইয়ূব রাঃ দেখলেন সালিমের ঘরের দেয়াল রঙিন পর্দা দ্বারা আবৃত। তিনি সালিমকে বললেন, এভাবে দেয়াল আবৃত করাকে রাসূলুল্লাহ সঃ অপছন্দ করতেন কিন্তু তোমার ঘরের দেয়ালগুলো দেখছি পর্দা দিয়ে ঢাকা। উত্তরে সালিম বললেন, আপনি তো এখনকার নারীদের অবস্থা সম্পর্কে জানেন, তারা আমাদের ওপর কর্তৃত্ব গেড়ে বসেছে। তিনি অজুহাত দিতে শুরু করলেন, যেভাবে এখন অনেকে দেয়। আবু আইয়ূব রাঃ বসতে অস্বীকৃতি জানান, অনুষ্ঠান থেকে চলে গেলেন।^২ অধিকাংশ আলিমের মত হচ্ছে, বিয়ের দাওয়াত কবুল করা ওয়াজিব, কিন্তু রঙিন পর্দা দিয়ে দেয়াল ঢেকে রাখার কারণে তিনি বিয়ের আসর থেকে চলে গেলেন। ভুল শোধরানোর জন্য বিয়ের অনুষ্ঠান ফেলে চলে আসাটা কিন্তু কঠোর আচরণ। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, আবু আইয়ূব রাঃ ছিলেন বিখ্যাত সাহাবীদের একজন।

ইবনু উমার রাঃ একবার জানাযায় গেলেন। জানাযার সূরাহ হলো দ্রুত হাঁটা। খাটলি বহন করার সময়ে আপনি আর-রামিল করবেন। দ্রুত পায়ে হাঁটাকে আরবিতে আর-রামিল (الرمل) বলা হয়। ইবনু উমার রাঃ লোকদের বলছিলেন যে, লাশ আমাদের কাঁখে, কাজেই দ্রুত হাঁটতে হবে। তিনি বললেন, যদি তোমরা দ্রুত পা না চালাও, আর-রামিল না করো, তবে আমি আর এখানে থাকব না, চলে যাব। আস্তে হাঁটার কারণে জানাযা ছেড়ে চলে যাবার কথা বলা, নিঃসন্দেহে কঠোরতা। কিন্তু কেন তিনি এমন করেছিলেন? কারণ, সেই অবস্থার পরিশ্রেক্ষিত্তে তাঁর মনে হয়েছিল তাদের সাথে এমনই আচরণ করা উচিত।

চলুন, উল্লিখিত শেষ দুটো পয়েন্ট থেকে সারসংক্ষেপ বের করা যাক। দাওয়াহ এবং আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি আনি ওয়াল মুনকার-এর ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো উদারতা, যথাসম্ভব কোমল হওয়া। এ ব্যাপারে বেশ কিছু আয়াত ও কাহিনি উল্লেখ করা হয়েছে। তবে দাওয়াহর ক্ষেত্রে কখনো কখনো কঠোরও হতে হয়। বিষয়টিকে কোনোমতেই অস্বীকার করা যাবে না, এটা দাওয়াহর হিকমার অংশ। কিন্তু মর্ডানিস্ট ও সমমনারা একে অস্বীকার করতে খুব পছন্দ

করে। কখন, কোথায়, কোন পদ্ধতির অনুসরণ করতে হবে, কোন ধরনের লোকের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে, তা নির্ভর করে ওই ঘটনা, সংশ্লিষ্ট মানুষ ও প্রেক্ষাপটের ওপর। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা অনেক লম্বা। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দাওয়াহর মূলনীতি হবে উদারতা ও দয়া।

মুদারাহ ও মুদাহানাহর মধ্যে পার্থক্য :

মুদারাহ (مُدَارَاه) হলো দ্বীনের জন্য দুনিয়াকে ত্যাগ করা। দাওয়াহ করার সময় হয়তো আপনাকে অপমান করা হবে, কিন্তু সেটা আপনাকে মেনে নিতে হবে। অপমান সত্ত্বেও কথা বলার সময় সবচেয়ে ভালো শব্দটিকে বেছে নিতে হবে। নিজের গর্ব ও আত্মাভিমানকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে নিজের সাথে লড়াই করে। আঘাত সহ্য করতে হবে, এসবের মোকাবেলা করতে হবে সুন্দর আখলাক দিয়ে। দাওয়াহ করতে গিয়ে অনেক সময় এমন পরিস্থিতিতে আপনি পড়বেন যেখানে তীব্র অনিচ্ছাসত্ত্বেও আপনাকে সুন্দর কথা বলতে হবে। এ সবই মুদারাহ এবং মুদারাহর এমন অনেক উপায় আছে।

আর অন্য একটি ব্যাপার আছে যা করা যাবে না, যা থেকে বেঁচে থাকতে হবে, আর তা হলো—মুদাহানাহ (مُدَاهِنَة)। আমরা অনেকে এ সম্পর্কে জানি না। মুদাহানাহ আর মুদারাহ সম্পূর্ণ বিপরীত। মুদারাহ হলো দ্বীনের জন্য দুনিয়া ত্যাগ করা, আর মুদাহানাহ হলো দুনিয়ার জন্য দ্বীনকে বিসর্জন দেয়া। মনে রাখবেন, কোনো অবস্থাতেই আমরা ইসলামের ব্যাপারে আপস করতে পারি না। যার সাথে কথা বলছি, যাকে দাওয়াহ দিচ্ছি তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য ইসলামের কোনো বিষয়কে অস্বীকার করতে বা এর বিকৃত ব্যাখ্যা দিতে আমরা পারি না। কোনো সরকার, নেতা কিংবা পশ্চিমা বিশ্বের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আমরা ইসলামের বিকৃত ব্যাখ্যা দিতে পারি না। কোনো অবস্থায় এটা করা যাবে না। এমন করাই মুদাহানাহ। আমরা মুদাহানাহ করি না; বরং মুদারাহ করি। আল্লাহ ﷻ কুরআনে বলেন :

وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ

‘তারা চায় যদি আপনি নমনীয় হন, তবে তারাও নমনীয় হবে।’ (সূরা আল-কালাম, ৯)

দ্বীন ও দা’ঈর উদাহরণ হলো পাত্র ও পানির মতো। পানি যদি কাপে রাখেন, তাহলে কাপের আকার ধারণ করবে। যদি ফুলদানিতে রাখেন, তাহলে ধারণ করবে ফুলদানির আকার। যখন যে পাত্রে রাখা হয় পানি সেটার আকার ধারণ করে। পানি প্রয়োজন অনুযায়ী বদলায়। কিন্তু পাত্র—কাপ ও ফুলদানি—মজবুত। দ্বীনের মূলনীতিগুলো ঠিক এমনই। এগুলোর কোনো পরিবর্তন হয় না, এগুলো নিয়ে দর কষাকষিতে যাওয়া যায় না। কিন্তু পানি আকার বদলে নেয়। মানুষের সাথে আমাদের আচরণের ব্যাপারটা হবে এই পানির মতো। আচরণের ক্ষেত্রে অবলম্বন করতে হবে সবচেয়ে কোমল ও উত্তম পদ্ধতি, সর্বোত্তম আদব। তবে দ্বীনের মূলনীতিগুলো থাকবে অপরিবর্তিত।

সালাফদের দাওয়াহর উদাহরণ :

দাওয়াহর ক্ষেত্রে সালাফ আস-সালিহিনের উদাহরণ দেখুন। ইসলাম গ্রহণ করার পর কয়েকদিন যেতে না যেতেই আবু বকর রাঃ তাঁর দাওয়াহর মাধ্যমে পাঁচজন সাহাবিকে ইসলাম কবুল করালেন। এই পাঁচজন ছিলেন জামাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবির অন্তর্ভুক্ত— উসমান ইবনু আফফান, যুবাইর ইবনুল আওয়াম, আব্দুর রহমান ইবনু আউফ, সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস এবং তালহা ইবনু উবায়দিল্লাহ রাঃ। ইসলাম প্রচারের পুরস্কার আর ফযিলত সম্পর্কে এ সময় আবু বকর রাঃ-এর কতটুকুই বা ধারণা ছিল? এ সময় তিনি শুধু 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' জানতেন, আর এই কালিমার দিকেই দাওয়াহ দিচ্ছিলেন। ইসলামের একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় তাঁর দাওয়াহয় আশাঘরা মুবাশ্শারার অন্তর্ভুক্ত পাঁচজন সাহাবি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। অন্যদের ইসলামে আনার পুরস্কার ও ফযিলত-সংক্রান্ত নানা হাদিস এখন আমরা জানি, কিন্তু এটা ছিল ইসলামের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়। এই হাদিসগুলো সম্ভবত তখন ছিল না কিন্তু আবু বকর রাঃ উপলব্ধি করেছিলেন ইসলামই তাঁর জীবন ও লক্ষ্য। ইসলাম জীবন ও লক্ষ্যে পরিণত হলে আপনি অবশ্যই এ নিয়ে কথা বলবেন। একে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেবেন, এর দিকে মানুষকে আহ্বান করবেন। এই বোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই আবু বকর আস-সাদিক রাঃ অন্যদের আহ্বান করেছিলেন এই সত্য দ্বীনের দিকে। আর এ কারণেই পুরো উম্মাহর ঈমানের চেয়ে আবু বকর রাঃ-এর ঈমান বেশি, কারণ আল্লাহ স্বঃ-এর ইচ্ছায় আমাদের পূর্বপুরুষদের তিনি ইসলামে এনেছিলেন। আসলে আমাদের সবার ইসলামের পেছনে তাঁরই অবদান, বড় বড় সাহাবিদের ইসলাম গ্রহণের পেছনে অবদান তাঁরই।

আবু বকর রাঃ-এর দাওয়াহয় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এই উম্মাহর বিখ্যাত পূর্বপুরুষগণ। আর আবু বকর রাঃ ইসলাম কবুল করেছিলেন রাসূলুল্লাহ স্বঃ-এর দাওয়াহর কারণে। তিনি দাওয়াত কবুল করেছিলেন রাসূলুল্লাহ স্বঃ-এর বার্তার প্রতি তাঁর অগাধ সমর্থন ও বিশ্বাসের কারণে। এ কারণেই আবু বকর রাঃ এত বেশি সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর ঈমানও ছিল বেশি, তাঁর দ্বীনও ছিল উত্তম। তাঁর দাওয়াহয় ইসলাম কবুল করেছিলেন উসমান রাঃ। পরবর্তীকালে উসমান রাঃ ইসলামের তৃতীয় খলিফা নিযুক্ত হন। উম্মাহর জন্য উসমান রাঃ এত বেশি কল্যাণকর কাজ করে গিয়েছেন যে, বলতে গেলে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে যাবে। এই সব সওয়াবের ভাগীদার কে হবে? উসমান রাঃ এই সাওয়াব পাবেন আর যেহেতু ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন আবু বকর রাঃ-এর দাওয়াহয় তাই সমপরিমাণ সাওয়াব আবু বকর রাঃ-ও পাবেন।

আবদুর রহমান ইবনু আউফ রাঃ ও তাঁর অবদানের দিকে তাকান। আপনারা সবাই জানেন দ্বীন ইসলামের কল্যাণে আব্দুর রহমান ইবনু আউফ রাঃ-এর অসংখ্য অমূল্য অবদান আছে। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন আবু বকর রাঃ-এর দাওয়াহয়। মদীনা থেকে ইসলামকে ইরাক ও পারস্যের ছড়িয়ে দেয়া সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাঃ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন আবু

বকর ﷺ-এর দাওয়ায়। সাদ ইবনু আবু ওয়াহ্বাস ﷺ য়েসব স্থানে ইসলামের আলো পৌঁছে দিয়েছিলেন, সেখানকার কোটি কোটি মুসলিমের সাওয়াব তাঁর আমলনামায় যুক্ত হচ্ছে। এবং এই সব সাওয়াব যুক্ত হচ্ছে আবু বকর ﷺ-এর আমলনামায়। হাদিসে আছে :

« مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِيهِ »

যে ব্যক্তি কাউকে ভালো কাজের নির্দেশ দেয়, তবে সে তার সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে।^(১২০)

দুনিয়াতে জাম্মাতের সুসংবাদপ্রাপ্তদের মধ্যে পাঁচজন তাঁর মাধ্যমে ইসলাম কবুল করেছিলেন। তিনি বিলাল ﷺ-কেও ইসলামে প্রবেশ করিয়েছিলেন। চিন্তা করে দেখুন, বিলাল ﷺ-এর মর্যাদা, ত্যাগ ও অর্জন কত ব্যাপক। বিলাল ﷺ-এর যত সাওয়াব আবু বকর ﷺ-ও তার সমান সওয়াবের অধিকারী হবেন। কবরে তাঁর আমলনামায় এসব সাওয়াব যুক্ত হচ্ছে।

তুফাইল ইবনু আমর আদ-দাওসি ﷺ ছিলেন তাঁর গোত্রের নেতা। মক্কা আসার পর কুরাইশরা তাঁকে বারবার সতর্ক করে দিলো যেন তিনি নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে না যান। তারা জানত তিনি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ধীন কবুল করলে তবে দেখাদেখি তাঁর গোত্রও ইসলাম কবুল করবে। তাঁর সাথে কুরাইশদের চুক্তি ছিল, ব্যবসা ছিল। তারা চাচ্ছিল না চুক্তিতে কোনো ফাটল ধরুক বা এর ওপর কোনো প্রভাব পড়ুক। কিন্তু তুফাইল ﷺ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের কাহিনি বেশ দীর্ঘ। আমরা এখানে সেই আলোচনায় যাচ্ছি না, কিন্তু দেখুন ইসলাম কবুল করার পর তিনি কী করলেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি নিজিয় সম্ভাষিতে ভুবে যাননি। তিনি বলেননি, ঈমুক গোত্রের নেতা হয়েও আমি ইসলাম কবুল করেছি। ব্যস, এই তো যথেষ্ট! এটি একটি সর্বজনবিদিত ও সাধারণ উপলব্ধির ব্যাপার যে, আপনি যখন সত্যিকার অর্থে কোনো মতাদর্শে বিশ্বাসী হবেন তখন আপনি সবার মাঝে একে ছড়িয়ে দিতে চাইবেন। তাই ইসলাম গ্রহণ করামাত্রই তিনি ছুটে গেলেন তাঁর বাবা ও নিজ গোত্রের কাছে। তাদের ইসলামের দিকে আহ্বান করলেন। তাঁর বাবা তাঁকে বললেন,

‘তোমার ধীন-ই আমার ধীন।’^(১২১)

তারপর তিনি গেলেন তার পরিবারের কাছে। একে একে তারাও ইসলাম কবুল করে নিল। তাঁর দাওয়াহর কারণে তাঁর গোত্রের যারা ইসলাম কবুল করেছিল, তাঁদের একজন ছিলেন আবু হুরাইরা ﷺ। হাদিসের ভান্ডার, বহু ফযিলতের অধিকারী, আবু হুরাইরা ﷺ। হাদিস পড়তে গেলে কতবার তাঁর নাম উচ্চারণ করতে হয়? যতবার আবু হুরাইরা ﷺ-এর কাছ থেকে বর্ণিত হাদিস আমরা পড়ি, আমরা বলি ‘রাদিয়াল্লাহু আনহু’। এভাবে যতবার আবু হুরাইরা ﷺ-এর জন্য দুআ করা হচ্ছে ততবার দুআ যোগ হচ্ছে তুফাইল ইবনু আমর আদ-দাওসি ﷺ-এর জন্যও। তাঁর গোত্রের নাম ছিল দাওস, তাদের ইসলামের পথে আনতে

তাকে বেশ কঠিন সময় পার করতে হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ফিরে এসে তিনি বলেছিলেন 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার গোত্রের লোকদের জন্য দুআ করুন, আমার ইচ্ছা আপনি তাদের জন্য দুআ করবেন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ দুআ করলেন,

اللَّهُمَّ اخذْ دُونَنا

'হে আল্লাহ, আপনি দাওস গোত্রকে হিদায়াত দিন।' (১২৫)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তোমার গোত্রের কাছে ফিরে যাও, দাওয়াহ দিতে থাকো।' তিনি ফিরে গিয়ে আবারও তাদের মাঝে দাওয়াহ করতে শুরু করলেন, এবার তাঁরা খুব সহজেই দাওয়াহ কবুল করে নিল। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ফিরে আসলেন তাঁর গোত্রের প্রায় আশি অথবা নব্বইটি দলসহ। তাঁরা সবাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে কালিমা শাহাদাহ পাঠ করল, তাঁকে বাইয়াহ দিলো। সেদিন থেকে শুরু করে মক্কা বিজয়ের শেষ বছরগুলো পর্যন্ত তুফাইল ﷺ, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছেই থেকে গেলেন।

দাওস গোত্রের বসবাস ছিল আজকের দক্ষিণ সৌদিতে। বর্তমানে সেখানে বসবাস করা গোত্রগুলো মূলত যাহরান নামে পরিচিত, আর তাদের পাশেই হলো গামিদ গোত্র। যাহরান ও গামিদ গোত্রের শত শত আলিম আজ আমাদের মাঝে আছেন। হারি সাদ আল-গামিদিগকে আপনারা প্রায় সবাই চেনেন। আত-তুফাইল ﷺ যে শহরে ছিলেন, তার পার্শ্ববর্তী শহরেই তিনি বাস করেন। আত-তুফাইল ﷺ এখন কবরে শায়িত, কিন্তু প্রায় তেরো শতাব্দী পরেও তিনি এই বিখ্যাত হারি এবং গামিদ ও জাহরান গোত্রের শত শত আলিমের জন্য সাওয়াবের অধিকারী হচ্ছেন। তুফাইল ইবনু আমর আদ-দাওসি ﷺ কবরে শায়িত থেকে সাওয়াব পাচ্ছেন, আবার এই একই পরিমাণ সাওয়াব কার আমলনামায় যুক্ত হচ্ছে? অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমলনামায় যুক্ত হচ্ছে। কল্যাণময় দাওয়াহর ফযিলত ও পুরস্কারের বিষয়টি একটি চেইন রিঅ্যাকশানের মতো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এক নাপিতের দোকানে গেলেন, তাকে দাওয়াহ দিলেন। এর ফলে ছয়জন কিশোর ইসলাম কবুল করল। পরের বছর এই ছয়জন কিশোর সাথে করে নিয়ে এল আরও বারোজনকে। বারোজন পরের বছর সঙ্গে নিয়ে এল তিহাজ্জরজন পুরুষ ও দুইজন মহিলাকে। তার পরের বছর তাঁদের ইসলাম শিক্ষা দেয়ার জন্য মুসআব ইবনু উমাইর ﷺ-কে ﷺ পাঠানো হলো মদীনাতে। কিছুদিন পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে মুসআব ﷺ বার্তা পাঠালেন, মদীনা ইসলাম কবুল করেছে, আপনি এখানে চলে আসতে পারেন। পুরো ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল নাপিতের দোকানের ছয়জন কিশোরের দাওয়াহ গ্রহণ করার মাধ্যমে। রাসূলুল্লাহ ﷺ নাপিতের দোকানেও গিয়েও দাওয়াহ পৌঁছে দিয়েছিলেন, যার ফসল ছিল ইসলাম মদীনা পর্যন্ত প্রসার লাভ করা। সেই দিনের সেই কিশোরেরা উপলব্ধি করেছিলেন তাদের অবশ্যই

এই বার্তা ছড়িয়ে দিতে হবে। খুব অল্প সময়ের জন্য তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এক গোপন বৈঠকে বসেছিলেন। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাওহীদের এই বার্তাকে তাঁরা আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন। সংকল্প করেছিলেন এই দাওয়াহ সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার।

আফ্রিকাতে ইসলামের বীজ বোনা হয়েছিল আবিসিনিয়ায়, জাফর ইবনু আবি তালিব ؓ-এর দাওয়াহর মাধ্যমে। তিনি সেখানে হিজরত করেছিলেন। ইসলামের বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলেন নাজ্জাশির কাছে। এভাবেই আফ্রিকায় ইসলামের সূচনা। তার মানে আফ্রিকার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রায় সব মুসলিমের সাওয়াব জাফর ইবনু আবি তালিব ؓ-এর আমলনামাতে লেখা হবে। ইয়েমেনে ইসলামের দাওয়াহ নিয়ে গিয়েছিলেন আবু মুসা আল-আশআরি ও মুয়ায ইবনু জাবাল ؓ। এখানে আমরা যাদের নাম বললাম, জাফর ইবনু আবি তালিব, মুয়ায ইবনু জাবাল ؓ-সহ তাঁরা সবাই ছিলেন তরুণ, তাঁদের সবার বয়স ছিল ২০-এর ঘরে।

সূরা ইয়াসিনে বর্ণিত সেই মুমিনের কথা আপনাদের প্রায় সবারই জানা আছে। ইয়াসিনের কমবেশি ষোলোটি আয়াতে তাঁর ঘটনার কথা এসেছে। তিনি কে ছিলেন, যাকে নিয়ে কুরআনের ষোলোটি আয়াতজুড়ে একটি কাহিনি বিবৃত হলো?

আল্লাহ ﷻ বলেন :

‘আমি ওদের কাছে দুজন রাসূল পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু ওরা তাদের মিথ্যাবাদী বলল; তখন আমি তাদের তৃতীয় একজন দ্বারা শক্তিশালী করেছিলাম। এবং তারা বলেছিল, ‘নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।’ ওরা বলল, ‘তোমরা তো আমাদেরই মতো মানুষ আর পরম দয়াময় তো কিছুই অবতীর্ণ করেননি। তোমরা কেবল মিথ্যাই বলছ।’ রাসূলরা বলল, ‘আমাদের প্রতিপালক জানেন যে, আমরা অবশ্যই তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। স্পষ্টভাবে প্রচার করাই আমাদের দায়িত্ব।’ ওরা বলল, ‘আমরা তোমাদের অমঙ্গলের কারণ মনে করি। যদি তোমরা বিরত না হও, তবে অবশ্যই তোমাদের পাথর মেঝে হত্যা করব এবং আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদের মর্মস্বদ শাস্তি স্পর্শ করবো।’ তারা বলল, ‘তোমাদের অমঙ্গল তোমাদের সাথেই। এটা কি এ জন্য যে, আমরা তোমাদের সদুপদেশ দিয়েছি? বরং তোমরা এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।’ (সূরা ইয়াসিন, ১৪-১৯)

তারা মনে করল, আল্লাহ ﷻ-এর প্রেরিত রাসূলগণ তাদের জন্য অমঙ্গলের কারণ। রাসূল দুজনকে তারা হুমকি দিলো। তাঁদের পাথর মারা হবে, নির্যাতন করা হবে। এ অবস্থায় মুমিন লোকটি নিষ্ক্রিয় বসে থেকে নিরাপত্তা আর সুবিধার জীবন বেছে নিল না। এটি তো আমার দেখার বিষয় না, বলে এড়িয়ে গেল না। সে কী করল? আল্লাহ ﷻ বলেন :

‘নগরীর এক প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে এল এবং বলল, ‘হে আমার সম্প্রদায়, রাসূলদের অনুসরণ করো। অনুসরণ করো তাঁদের, যারা তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় কামনা করে না এবং যারা সুপথপ্রাপ্ত। যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যার কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত

হবে, আমি তাঁর ইবাদত করব না কেন? আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্যান্য উপাস্য গ্রহণ করব? পরম দয়াময় যদি আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চান, তবে তাদের সুপারিশ আমার কোনো কাজে আসবে না এবং ওরা আমাকে উদ্ধারও করতে পারবে না। এরূপ করলে আমি অবশ্যই প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে পড়ব। আমি তো তোমাদের প্রতিপালকে বিশ্বাসী, অতএব তোমরা আমার কথা শোনো।" (সূরা ইয়াসিন, ২০-২৫)

এসব অন্যান্য হচ্ছে জানতে পেয়ে, নেককার হিসেবে পরিচিত মানুষটি শহরের প্রান্ত থেকে ছুটে আসলেন। তারা তাঁকে হত্যা করে ফেলল। কিন্তু মৃত্যুর পর পরকালীন জীবনেও তাঁর অন্তর যুক্ত ছিল দাওয়াহর সাথে। জাহান্নামের পুরস্কার পাবার পরও তাঁর অন্তর উন্মুখ হয়ে ছিল তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের বাঁচাতে।

আল্লাহ ﷻ বলেন :

‘(যখন তারা তাঁকে হত্যা করল এবং তার মৃত্যুর পর তাঁকে বলা হলো, ‘তুমি জাহান্নামে প্রবেশ করো।’ সে বলল, ‘হায়! আমার সম্প্রদায় যদি জানতে পারত যে, আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন!’ (সূরা ইয়াসিন, ২৬-২৭)

আখিরাতের জীবনেও তাঁর অন্তর লোকদের বাঁচানোর চিন্তায় নিমগ্ন। তাঁর আক্ষেপ—যদি শহরের লোকদের জানাতে পারতেন যে আল্লাহ ﷻ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, স্থান দিয়েছেন সম্মানিতদের কাতারে! সম্ভবত এ ইচ্ছার কারণ হলো, এই সম্মানিত অবস্থার কথা জানলে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা এ সম্মানের অধিকারী হতে চাইবে এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। তিনি আফসোস করছেন—আমি যদি তাদের কাছে ফিরে যেতে পারতাম, তাদের দাওয়াহ দিতে পারতাম, সব জানাতে পারতাম! তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করতে বলা হলো। এমন অবস্থাতেও তিনি দাওয়াহর কথা চিন্তা করছেন। এভাবেই দাওয়াহ কারও কারও বেলায় জীবনের একটি অংশে পরিণত হয়। রাসূলগণ, সাহাবা এমনকি কোনো মানুষের উদাহরণও যদি আপনাকে দাওয়াহর কাজে অনুপ্রাণিত করতে যথেষ্ট না হয়, তাহলে জিনদের উদাহরণ দেখুন। জিনরাও দাওয়াহ করে, এতে তারা বেশ মজবুত। যখন জিনদের একটি দল ইসলাম কবুল করেছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ করেছিল, তখন কি তাঁরা চুপচাপ বসেছিল? দেখুন, কুরআনে আল্লাহ ﷻ তাঁদের ব্যাপারে কী বলছেন। তাঁরা বলেছিল :

يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

‘হে আমার সম্প্রদায়, আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দাও এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন ও তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করবেন।’ (সূরা আল-আহকাফ, ৩১)

ইমান আনার সাথে সাথে জিনরা ছুটে গিয়েছিল তাওহিদের দাওয়াহ পৌঁছে দিতে। জিনরাও

দাওয়াহর কাজে আগ্রহী। যদি রাসূলগণ, সাহাবা, জিনরাও দাওয়াহর কাজে আপনাকে উদ্বুদ্ধ করতে যথেষ্ট না হয়, তবে পশুপাখিদের দিকে তাকান। কুরআনে বর্ণিত হৃদহৃদ পাখির ঘটনার দিকে তাকান। সুলাইমান ﷺ তাঁর সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিলেন সারিবদ্ধভাবে অবস্থান নিতে। কিন্তু তিনি দেখতে পেলেন একটি পাখি অনুপস্থিত। আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَتَقَفَّذَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ○ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ

‘সুলায়মান পক্ষীকুলকে পর্যবেক্ষণ করলেন এবং বললেন, ‘কী ব্যাপার! আমি হৃদহৃদকে দেখছি না কেন? সে অনুপস্থিত নাকি? সে উপযুক্ত কারণ না দর্শালে আমি অবশ্যই ওকে কঠোর শাস্তি দেবো কিংবা জবাই করব।’ (সূরা আন-নামল, ২০-২১)

ফিলিস্তিন থেকে ইয়েমেনে গিয়ে হৃদহৃদ আবার ফিরে এল ফিলিস্তিনে। সে ভালো কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ করল। দাওয়াহর কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে সেনাবাহিনীর সাথে অংশগ্রহণ করতে তার দেরি হয়ে গেল। পাখিটি বলল :

أَحْطَ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَحِجَّتْكَ مِنْ سَبِيلٍ يَنْبَغِي يَقِينٍ

‘...আমি আপনার কাছে সাবা থেকে নিশ্চিত এক সংবাদ নিয়ে আগমন করেছি।’ (সূরা আন-নামল, ২২)

সে দাওয়াহর মিশন নিয়ে ব্যস্ত ছিল। তাই সে বলল, সুলাইমান ﷺ আপনি জানেন না, আমি এমন এক বিষয়ের সংবাদ নিয়ে এসেছি।

সে কী সংবাদ এনেছিল?

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ○ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّامِثِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ○ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ○ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

‘আমি এক নারীকে সাবাসীদের ওপর রাজত্ব করতে দেখেছি। তাকে সবকিছুই দেয়া হয়েছে এবং তার আছে এক বিরাট সিংহাসন। আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম, তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজদাহ করছে। শয়তান ওদের দৃষ্টিতে ওদের কার্যাবলিকে সুশোভিত করেছে এবং ওদের সং পথ থেকে বিরত রেখেছে। ফলে ওরা সং পথ পায় না। (সুশোভন করেছে এই জন্য যে,) যাতে ওরা আল্লাহকে সিজদাহ না করে, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের গোপন বস্তুকে প্রকাশ করেন এবং তিনি জানেন যা তোমরা গোপন করো

ও যা তোমরা প্রকাশ করো। আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; তিনি মহা-আরশের অধিপতি।' (সূরা আন-নামল, ২৩-২৬)

সেই নারী ও তার সম্প্রদায় সূর্যের ইবাদত করত। অথচ তাঁদের জন্য ফরয মহান আরশের অধিপতি এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ ﷻ-এর ইবাদত করা। তাদের শিরকে লিপ্ত দেখে পাখিটি আর চূপ থাকতে পারেনি।

দাওয়াহ ইল্লাল্লাহর ব্যাপারে উপসংহার :

আসল ফুল আর প্লাস্টিকের নকল ফুল কখনো এক হয় না। বাড়িতে একটি তাজা ফুল এনে রাখুন, দেখবেন তা ঘরের শোভাবর্ধন করছে। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে তার মিষ্টি সৌরভ। প্লাস্টিকের ফুল সুন্দর হলেও কেবল নামেই ফুল। যে মুসলিম দাওয়াহর কাজের সাথে সম্পৃক্ত না, যে ভালো কাজে উৎসাহ ও অন্যান্য কাজে বাধা দেয় না, সে যদিও মুসলিম এবং দেখতে সুন্দর—কারণ, সব অবস্থাতেই মুসলিমের মধ্যে কল্যাণ থাকে—কিন্তু তার উদাহরণ হলো সেই প্লাস্টিকের ফুলের মতো। আর দাওয়াহ কাজের সাথে সম্পৃক্ত, ভালো কাজের নির্দেশ ও অন্যান্যে বাধা দেয়া মুসলিম চারপাশকে সুরভিত করা সেই তরতাজা আকর্ষণীয় ফুলের মতো।

নিজেকে দাওয়াহর কাজে নিযুক্ত করা, এই দায়িত্বকে নিজের জন্য আবশ্যক করে নেয়া মুমিনের উদাহরণ হলো। প্রবাহিত পানির মতো। স্থির পানির চেয়ে প্রবাহমান পানি বিশুদ্ধ। কোনো বদ্ধ জলাশয়ে থাকা স্থির পানির বেলায় কী ঘটে? কিছুদিন তা পরিষ্কার থাকে, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সেটা দূষিত হয়ে যায়। সেটা পুকুর, খাল এমনকি এরচেয়েও বড় কিছু হোক না কেন। কিন্তু প্রবাহিত পানির বেলায় ব্যাপারটা ভিন্ন। প্রবাহিত পানি সমুদ্রে গিয়ে মেশে, আর সমুদ্রের পানি তো আরও বিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ। আপনি যদি অন্যান্য কাজে বাধা না দেন, ভালো কাজের উপদেশ না দেন, দাওয়াহর কাজ না করেন, তাহলে আপনার অবস্থা ওই স্থির পানির মতো—যা একটা সময় পার হবার পর দূষিত হয়ে যেতে পারে।

দাওয়াহর কাজে কোনো নিরপেক্ষ অবস্থান নেই, বিশেষ করে যারা পশ্চিমে বসবাস করছে তাদের জন্য। এই মূলনীতিটি আমার কাছ থেকে গ্রহণ করুন, দাওয়াহর ক্ষেত্রে কোনো নিরপেক্ষ অবস্থান নেই। আপনার এ কথা বলার কোনো সুযোগ নেই যে, আমি নিজেকে এসবে জড়াব না, আমি আমার মতো থাকব। আপনাকে হয় দাওয়াহ দিতে হবে, নয়তো আপনার ঈমান অক্রান্ত হবে। আবদ্ধ পানি ময়লা হবেই, বিশেষ করে আজকের পরিস্থিতিতে। কাজেই নিজেকে প্রবাহিত পানির মতো বিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ করে তুলুন মানুষকে আল্লাহ ﷻ-এর দিকে আহ্বান করার মাধ্যমে। একজন মুমিন কখনো তার দীন নিয়ে চূপচাপ বসে থাকতে পারে না, সে সব সময় চাইবে তার দীনকে ছড়িয়ে দিতে। কেনই বা চাইবে না? এ তো এক মহান দায়িত্ব, আর এই দায়িত্ব দিয়েই যুগে যুগে পাঠানো হয়েছে আশ্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের।

উসুল আস-সালাসাহ বইয়ের শুরুতে উল্লেখিত চারটি বুনিয়াদি বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। প্রথমটি ছিল ইলম ও এর সংজ্ঞা। দ্বিতীয়টি ইলমের প্রয়োগ। তৃতীয়টি ইলমের প্রচার ও প্রসার তথা দাওয়াহ ইলাল্লাহ। এবার আমরা আলোচনা করব চতুর্থ বিষয়টি নিয়ে।

চতুর্থ বুনিয়াদি বিষয় : সবার

চতুর্থ বিষয়টি হলো সবার। লেখক বলেছেন,

المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ : الصَّبْرُ عَلَى الْأَذَى فِيهِ

চতুর্থ বিষয় : দাওয়াহর কর্তব্য পালনে সম্ভাব্য কষ্ট ও বিপদ-বিপর্যয়ে সবার করা।

ইলম অর্জনের জন্য অবশ্যই সবার অবলম্বন করতে হবে। ধৈর্যধারণ করতে হবে ইলম অর্জন ও একে বহনের জন্য। সবার না করার কারণেই অধিকাংশ মানুষ ইলম অর্জনের পথে টিকে থাকতে পারে না। ‘গারিবুল হাদিস’ সংকলনটি লেখার পেছনে আবু উবাইদ রাঃ চল্লিশটি বছর ব্যয় করেছিলেন। ইবনু আদিল বার রাঃ তাঁর কিতাব আত-তামহিদ রচনা করতে সময় নিয়েছিলেন তিরিশ বছর। আমাদের সবার মুখে মুখে ফাতহুল বারির কথা শোনা যায়, এটি লিখতে ও রিভাইস করতে ইবনু হাজার রাঃ-এর দীর্ঘ তেইশ বছর সময় লেগেছিল। সুতরাং ইলম অর্জন ও একে অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রয়োজন ধৈর্যের। আবার আমাদের ক্ষেত্রে এবং মানুষকে আল্লাহ স্বঃ-এর দিকে আহ্বান করার বেলাতেও ধৈর্য প্রয়োজন। সব ক্ষেত্রে সবারের প্রয়োজন আছে, তবে লেখক এখানে বিশেষভাবে দাওয়াহর ব্যাপারে সবারের কথা বলেছেন। তিনি বিশেষভাবে দাওয়াহর ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণের কথা বলেছেন। কারণ, সাধারণত মানুষকে আল্লাহ স্বঃ-এর দিকে আহ্বান করতে শুরু করলে বিপদও আসতে শুরু করে। একজন দাঈ মানুষকে আহ্বান করেন নফসের শেকল থেকে মুক্তি ও নিজের সংশোধনের দিকে। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা কিছু কিছু জাহিলি, শয়তানি প্রথা অনেক সময়

মানুষের জীবনের অংশে পরিণত হয়। এগুলো যেন মিশে যায় তাদের রক্ত-মাংসে। একজন দা'ঈ মানুষকে আহ্বান করেন প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা এসব প্রথা ও রীতিনীতি ত্যাগ করে আল্লাহ ﷻ-এর শরীয়াহর সীমারেখা মেনে চলার দিকে। এ কাজটি অত্যন্ত কঠিন। অনেক সময় দেখা যায়, যাদের দাওয়াহ করা হচ্ছে তারা এই কথাগুলো প্রথমবারের মতো শুনছেন। আর যেহেতু মানুষের জন্য নিজেকে পরিবর্তন করা খুব কঠিন তাই প্রাথমিক পর্যায়ে তারা দাওয়াহর প্রবল বিরোধিতা করে, দাওয়াহকে প্রত্যাখ্যান করে, প্রতিহত করতে শুরু করে। আর আক্রমণের নিশানা বানায় বার্তাবাহককে। একজন দা'ঈকে দুটো পথের একটিকে বেছে নিয়ে হয়-হয় আমি দাওয়াহর কাজ বাদ দিয়ে দেবো অথবা আমি ইসলামের কিছু দিক বাদ দেবো। আসলে যেকোনো সত্যিকারের মুসলিমের জন্যই কথাটা প্রযোজ্য। কিন্তু কোনো মুমিনের পক্ষে এটা আদৌ সম্ভব না। অন্যের হাসি-তামাশা কিংবা ঠাট্টার কারণে কেউ হিজাব, নিকাব, দাড়ি বা সালাত ছেড়ে দেবে, তা হতে পারে না। একই কথা প্রযোজ্য দাওয়াতি কাজের বেলাতেও। প্রতিকূলতার কারণে দাওয়াহ ছেড়ে দেয়া কোনো সমাধান নয়।

সুনানুত তিরমিযিতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَضِيرُ عَلَى أَدَاهُمْ أُعْظِمَ أَجْرًا مِنَ الَّذِي لَا يُخَالِطُهُمْ وَلَا يَضِيرُ عَلَى أَدَاهُمْ

দাওয়াহর উদ্দেশ্যে কোনো মুমিন ব্যক্তি যদি লোকজনের সাথে ওঠাবসা করে, তাদের দ্বারা কোনো অনিষ্ট হলে তাতে সবর করে, তবে সে ওই মুমিন থেকে উত্তম যে তার ঘরে একাকী থাকে এবং মানুষের অনিষ্টে সবর করতে পারে না।^[১২৬]

কাজেই দাওয়াহর পথে যে বিপদ আসে, যে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় তার সমাধান নিহিত সবরে।

সবর একজন দা'ঈর অপরিহার্য গুণ

ধৈর্য সবারই দরকার। কিন্তু দাওয়াহর সাথে জড়িত ব্যক্তি, কথা ও কাজের মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বানকারীর জন্য সবরের প্রয়োজন বিশেষভাবে। সবর হলো দা'ঈর অন্তরের উজ্জ্বলতা, যা কখনো ম্লান হয় না। সবর হলো দা'ঈর জন্য (جواد لا يَكُور) -এমন এক দ্রুতগামী অশ্ব যা কখনো হেঁচট খায় না। এ হলো দা'ঈর (جند لا يهزم) -অপ্রতিরোধ্য সেনাদল, (حصن لا يهدم) -এক অতেদ্য দুর্গ।

ধীন মেনে চলা মুমিন হিসেবে, একজন দা'ঈ হিসেবে আপনাকে ধৈর্যশীল হতে হবে। নিঃসন্দেহে মুমিনমাত্রই ধীন মানলেওয়ালা (Practicing) হতে হবে, কিন্তু আজ উম্মাহর

পরিস্থিতি এতটা দুর্ভাগ্যজনক যে, আমাদের আলাদাভাবে Practicing Muslim বা 'দীন মেনে চলা' মুসলিম কথাটি বলতে হচ্ছে।

সবরের প্রতিদান

সবর এক অভেদ্য বর্ম ও ঢাল; একজন সৈনিকের যেমন বর্ম, হেলমেট ও বুলেটপ্রুফ ভেস্ট থাকে, একজন দা'ঈর জন্য সবর ঠিক তেমন। যোদ্ধা যেভাবে বর্ম আর ঢালকে ব্যবহার করে, দা'ঈ সেভাবে সবরকে ব্যবহার করেন। আল্লাহ ﷻ বলেন :

رَّان تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا

'কিন্তু যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে তাদের প্রতারণায় তোমাদের কোনোই ক্ষতি হবে না।' (সূরা আলি ইমরান, ১২০)

সবরকারীদের জন্য এটি অত্যন্ত সম্মানজনক বিষয় যে আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ সবরকারীদের সাথে আছেন।' (সূরা আল-বাকারাহ, ১৫৩)

মায়িয়াহ (معية-আল্লাহর সান্নিধ্য) দুধরনের। প্রথম প্রকার হলো, মায়িয়াতু আশ্বাহ (معية عامة)-সাধারণ বা সর্বজনীন অর্থে আল্লাহ ﷻ-এর সান্নিধ্য। এ মায়িয়াহ হলো আল্লাহ ﷻ-এর জ্ঞানের মাধ্যমে সান্নিধ্য, কারণ সমগ্র বিশ্বজগৎ আল্লাহ ﷻ-এর জ্ঞানের আওতাধীন। দ্বিতীয় প্রকারের সান্নিধ্য হলো আল্লাহ ﷻ-এর বিশেষ, সম্মানজনক সান্নিধ্য। এই সান্নিধ্যই আমার ও আপনার দরকার; এ সান্নিধ্য অর্জনের চেষ্টাই আমরা করি। প্রথম প্রকারের মায়িয়াহ সবার জন্য, কিন্তু খুব সীমিত-সংখ্যক মানুষ এই দ্বিতীয় প্রকারের মায়িয়াহ অর্জন করে। তাঁরা কারা?

আল্লাহ ﷻ বলেন :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'আপনি কি ভেবে দেখেননি যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, আল্লাহ তা জানেন। তিন ব্যক্তির মাঝে এমন কোনো পরামর্শ হয় না, যাতে তিনি চতুর্থ হিসেবে উপস্থিত না থাকেন এবং পাঁচজনেরও হয় না, যাতে তিনি ষষ্ঠ না থাকেন। তারা এতদপেক্ষা কম হোক বা বেশি হোক, তারা যেখানেই থাকুক না কেন তিনি তাদের সাথে আছেন। তারা যা করে, কিয়ামতের দিন তিনি তাদের তা জানিয়ে দেবেন।' (সূরা আল-মুজাদালাহ, ৭)

তাঁর ইলম সবকিছুকে পরিব্যাপ্ত করে আছে।

‘তিনি ব্যক্তির মাঝে এমন কোনো পরামর্শ হয় না, যাতে তিনি চতুর্থ হিসেবে উপস্থিত না থাকেন।’

এই আয়াতে ‘নাজওয়া’ মানে গোপন পরামর্শ। আল্লাহ ﷻ বলছেন, তিনি ব্যক্তির মাঝে এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থ হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকেন না। এ সবকিছুই তাঁর জ্ঞানের আয়ত্তাধীন। পরবর্তী দারসগুলোতে আমরা একটি বিষয় আলোচনা করব, আর তা হলো আল্লাহ ﷻ তাঁর আরশের ওপর। এ বিষয়টি সুপ্রতিষ্ঠিত। আমরা বহুবার প্রমাণ করে দেখিয়েছি যে, আল্লাহ ﷻ সাত আসমানের ওপরে, তাঁর আরশের ওপরে। তিনি বলেছেন :

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

‘তিনি পরম দয়াময় (আল্লাহ), আরশে সমুন্নত হয়েছেন।’ (সূরা আত-ত্বাহ, ৫)

তাই সূরা মুজাদালাহর উল্লেখিত আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাঁর জ্ঞান-তিনি ব্যক্তির মাঝে এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যেখানে তাদের চতুর্থ হিসেবে আল্লাহ ﷻ তাঁর জ্ঞানের মাধ্যমে উপস্থিত থাকেন না। এটাই হলো মায়িয়াতু আশ্বাহ (معية عامة); সর্বজনীন সান্নিধ্য। এর স্বপক্ষে আরও কিছু আয়াত আছে।

আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَرْجِعُ فِيهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

‘তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, অতঃপর আরশের ওপর ইস্তিওয়া (সমুন্নত) হয়েছেন। যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা কিছু ভূমি থেকে নির্গত হয় তিনি তা জানেন এবং আকাশ থেকে যা কিছু বর্ষিত হয় ও যা কিছু আকাশে উথিত হয় তাও তিনি জানেন। তোমরা যেখানেই থাকো, তিনি তোমাদের সাথে আছেন। তোমরা যা করো, আল্লাহ তা দেখেন।’ (সূরা আল-হাদিদ, ৪)

অর্থাৎ, আপনি যেখানেই থাকুন না কেন, আল্লাহ ﷻ-এর জ্ঞানের মাঝেই আছেন। মুমিন, কাফির, মুত্তাকি যে-ই হোক না কেন এই মায়িয়াহ (معية) প্রযোজ্য সবার জন্য।

আল্লাহ ﷻ আরও বলেন :

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِيعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ

شَيْءٌ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

‘আল্লাহ সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং একই রূপ পৃথিবীও সৃষ্টি করেছেন, এসবের মাঝে তাঁর আদেশ অবতীর্ণ হয়, যাতে তোমরা জানতে পারো যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহর জ্ঞান প্রতিটি বস্তুকেই পরিবেষ্টন করে রেখেছে।’ (সূরা আত-তালাক, ১২)

অর্থাৎ, তাঁর জ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ সবকিছু পরিবেষ্টন করে আছেন।

‘আল্লাহ ﷻ-এর জ্ঞান প্রতিটি বস্তুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে।’

এটাই মায়িয়াত আম্মাহ (معية عامة)।

এখন আসা যাক, মায়িয়াতু খাস্সাহ (معية خاصة)-তো মায়িয়াতু খাস্সাহ হলো, বান্দার সাথে আল্লাহ ﷻ-এর বিশেষ ও সম্মানজনক সান্নিধ্য।

وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

‘আর তোমরা ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ আস-সাবিরীনদের (ধৈর্যশীলদের) সাথে আছেন।’ (সূরা আল-আনফাল, ৪৬)

আল্লাহ ﷻ বলছেন :

ثَلَاثِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

‘তিনি ছিলেন দুজনের একজন, যখন তারা (মুহাম্মাদ ﷺ ও আবু বকর ؓ) গুহাতে ছিলেন। তখন তিনি আপন সঙ্গীকে বললেন বিষম হোয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।’ (সূরা আত-তাওবাহ, ৪০)

মদীনায় হিজরতকালে গুহায় আশ্রয় নেয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর ؓ-কে বলেছিলেন:

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

‘বিষম হোয়ো না, ভয় পেয়ো না, দুঃখ করো না, আল্লাহ ﷻ আমাদের সাথে আছেন।’

আল্লাহ ﷻ আমাদের সাথে আছেন—এটা ছিল আল্লাহ ﷻ-এর পক্ষ থেকে এক বিশেষ ও সম্মানজনক সান্নিধ্য। একইভাবে আল্লাহ ﷻ যখন ফিরাউনের কাছে মুসা ও হারুন আলহিহিমুস সালামকে পাঠিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন :

قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْتَعِزُّ وَأُرَى

‘আমি তোমাদের সাথে আছি, আমি শুনি ও দেখি।’ (সূরা আত-ত্বহা, ৪৬)

গুহার ভেতর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে থাকা, মুসা ও হারুন আলাইহিমুস সালামের সাথে থাকা, সবারকারীদের সাথে থাকা, এসবই হলো জ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ-এর বিশেষ মায়িয়াহ বা সান্নিধ্য। এই বিশেষ ও সম্মানজনক সাহচর্য হলো বাছাই করা বিশেষ কিছু মানুষের জন্য। এ হলো বিশেষ কিছু মানুষের জন্য প্রশংসাজনক মায়িয়াহ। এ হলো আল্লাহ ﷻ-এর পক্ষ থেকে সাহায্য আর আমর সবাঈ তো আল্লাহ ﷻ-এর সাহায্যের মুখাপেক্ষী। এই বিশেষ সান্নিধ্য অর্জনের জন্য আমাদের ধৈর্যশীল হতে হবে।

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ সাবিরীন (ধৈর্যশীলদের) সাথে আছেন।’ (সূরা আল-আনফাল, ৪৬)

আল্লাহ ﷻ-এর বিশেষ, সম্মানজনক ও প্রশংসার মায়িয়াহ ছাড়াও ধৈর্যশীলদের জন্য আছে আরও পুরস্কার।

আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَاللَّهُ يُجِبُّ الصَّابِرِينَ

‘আর যারা সবর করে, আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন।’ (সূরা আলি ইমরান, ১৪৬)

ওপরের এই দুটো আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করুন। ইমাম আহমাদ ﷺ-এর মতে, কুরআনে মোট নব্বইটি আয়াতে সবরের আলোচনা বা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ এ দুটি ছাড়াও কুরআনে আরও ৮৮টি আয়াতে সবরের কথা বলা হয়েছে। শুধু এ দুটি আয়াতের দিকে তাকানো যাক। এই দুটো আয়াত নিয়ে ভাবুন, গভীরভাবে চিন্তা করুন, বাকি আটটি আয়াত আপাতত রেখে দিন।

প্রথম আয়াতে বলা হচ্ছে আল্লাহ ﷻ সবারকারীদের সাথে আছেন আর দ্বিতীয় আয়াতে বলা হচ্ছে আল্লাহ ﷻ সবারকারীদের ভালোবাসেন। সুতরাং সবরের একটি প্রতিদান হলো নিজ ইলমের দ্বারা আল্লাহ ﷻ সবারকারীদের সাথে আছেন বিশেষ ও সম্মানজনক এক পদ্ধতিতে। যদি আসলেই এ কথা আপনি বিশ্বাস করেন, অন্তরে বদ্ধমূল করে নিতে পারেন, তাহলে কী করে আপনি ভীত হন? কী করে একাকী বোধ করতে পারেন? যদি আল্লাহ ﷻ আপনার সাথে থাকেন আর আপনি তা অনুভব করেন, তবে ভীত হবার কিংবা নিজেকে একা মনে করার অবকাশ কোথায়? আর দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, সবারকারীদের আল্লাহ ﷻ ভালোবাসেন। আপনি যদি জানেন, আল্লাহ ﷻ আপনাকে ভালোবাসেন, তবে কী করে আপনি দুঃখ পান, কী করে দুশ্চিন্তা করতে পারেন? আল্লাহ ﷻ যদি আপনাকে ভালোবাসেন, তবে আপনার দুঃখ কীসে আর চিন্তাই বা কিসের?

সবরের আরেকটি প্রতিদান হলো আল্লাহ ﷻ-এর পক্ষ থেকে সুসংবাদ। আপনি কি আল্লাহ ﷻ-এর কাছ থেকে সুসংবাদ চান না? তাহলে সবরের মাধ্যমে তা অর্জন করুন।

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

‘এবং অবশ্যই আমি তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জামের ক্ষতি এবং ফল ও ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের। যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর এবং আমরা সবাই তাঁরই সামিথে ফিরে যাব।’ (সূরা আল-বাকারাহ, ১৫৫-১৫৬)

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

‘সবরকারীদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ।’

কারা সবরকারী?

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

‘যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর এবং আমরা সবাই তাঁরই সামিথে ফিরে যাব।’

আপনি কি চান, জান্নাতে প্রবেশের জন্য ফেরেশতারা জান্নাতের সবগুলো দরজা দিয়ে আপনাকে ডাকতে থাকুক?

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

‘তারা বলবে : তোমাদের সবরের কারণে তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। নিঃসন্দেহে তোমাদের এ পরিণাম-গৃহ কতই-না চমৎকার।’ (সূরা আর-রাদ, ২৪)

ফেরেশতারা তাঁদের (ইন শা আল্লাহ আমরা তাঁদের অন্তর্ভুক্ত) জান্নাতে প্রবেশ করাবে আর বলবে, ‘সালামুন আলাইকুম’ তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমরা সবর অবলম্বন করেছিলে আর তোমাদের চূড়ান্ত আবাস নিঃসন্দেহে চমৎকার। কেন ফেরেশতাগণ এ আহ্বান জানাবেন?

তারা বলবেন :

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ

‘তোমাদের সবরের কারণে তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।’

ফেরেশতাগণ তাদের সবরের মানের ওপর ডিঙ্গি করে সালাম দেন। আল্লাহ ﷻ বলেন :

إِنَّمَا يُؤْتِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

‘মূলত সবরকারীদের জন্য রয়েছে অগণিত পুরস্কার।’ (সূরা আয-যুমার, ১০)

আপনি যদি ধৈর্যধারণ করেন, তাহলে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে অগণিত পুরস্কার। কোনো ক্ষমতাশালী, উদার ব্যক্তি যদি আপনাকে বলেন—আপনার বিষয়টা আমি দেখছি, আপনি নিজের অংশ যেন ঠিকঠাক বুঝে পান সেই দায়িত্ব আমি নিলাম। তখন আপনি বুঝে নেবেন যে, আপনার জন্য বেশ ভালো পরিমাণ প্রতিদান অপেক্ষা করছে। তাহলে যিনি আল-কারিম (সর্বশ্রেষ্ঠ মহানুভব), তিনি যখন বলছেন, ‘অগণিত পুরস্কার’ তখন এই পুরস্কারের মাত্রা কেমন হতে পারে চিন্তা করুন।

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَنَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

‘তারা সবর করত বিধায় আমি তাদের (বনি ইসরাইল) মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার আদেশে পথপ্রদর্শন করত এবং তারা আমার আয়াতসমূহে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল।’ (সূরা আস-সাজদাহ, ২৪)

তারা কখন নেতৃত্বের আসনে ছিল? যখন তারা ছিল সবরকারী ও দৃঢ় বিশ্বাসী। ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ, ইমাম ইবনুল কাইয়িম ও ইমাম ইবনু কাসির رحمهم الله-ও মত প্রকাশ করেছেন যে,

بِالصَّبْرِ وَالْيَقِينِ تُنَالُ الْإِمَامَةُ فِي الدِّينِ

ইয়াকিন ও সবরই কাউকে ধীন ইমামাত এনে দিতে পারে।^[১৭]

সবরের সংজ্ঞা

সবরের শাব্দিক অর্থ—বাধা দেয়া এবং বিরত রাখা (الحبس والمنع)। অর্থাৎ হতাশা ও উদ্বিগ্ন হওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখা ও বাধা (prevent) দেয়া। আল্লাহ ﷻ বলেন :

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ

‘...তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হোয়ো না।’ (সূরা আয-যুমার, ৫৩)

নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে গুনাহ থেকে বাধা দেয়া ও বিরত রাখার নাম সবর। নিজের জিহ্বাকে অভিযোগ থেকে বিরত রাখা সবর। সবর একটি পদ্ধতি, একটি মানহাজ—আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না। এটা নিছক মুখে উচ্চারণ করার বিষয় না যে, কেউ বিপদে আক্রান্ত হবার

পর বলল, ওয়াল্লাহি, আমি সবার করেছি, আর এতেই সে ধৈর্যশীল হয়ে গেল। কারণ, হতে পারে যে সে এর আগে এমন কিছু বলেছে, যা আল্লাহ ﷻ-এর ক্রোধের কারণ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى

আঘাতের শুরুতে সবার করাটাই হলো প্রকৃত সবার।^[১২৮]

সবার সুসংজ্ঞায়িত। এর নিজস্ব কিছু নিয়মনীতি ও শিক্ষা রয়েছে।

অভিযোগ কি সবারকে বাতিল করে দেয়?

আমরা যদি অভিযোগ করি, তাহলে কি আমাদের সবার বাতিল হয়ে যাবে? এর উত্তর হলো, অভিযোগ দুভাবে হতে পারে। প্রথমটি খারাপ আর দ্বিতীয়টি হলো অভিযোগ প্রকাশের সুন্দরতম পদ্ধতি। আপনি সৃষ্টির কাছে স্রষ্টার ব্যাপারে অভিযোগ করতে পারেন না। আপনি তো অভিযোগ করবেন আল্লাহ ﷻ-এর কাছে। আল্লাহ ﷻ-এর কাছে অভিযোগ করা বরং মজবুত ঈমানের পরিচায়ক। ইউসুফ ﷺ-এর পিতা ইয়াকুব ﷺ-কে যখন পরীক্ষা করা হয়েছিল, শুরুতেই তিনি বলেছিলেন :

فَصَبْرٌ جَمِيلٌ

‘...সুন্দর সবার...।’ (সূরা ইউসুফ, ১৮)

সুন্দর সবার হলো অভিযোগ না করে সবারের পস্থা অবলম্বন করা। তাই ইয়াকুব ﷺ বললেন, আমি বরং সুন্দর সবার অবলম্বন করব। আমি কোনো অভিযোগ করব না, অভিযোগ ছাড়াই সবার করব। সবারের পেছনের নিয়্যাত বিস্তৃত হতে হবে। মানুষ আপনাকে সবারকারী বলবে এই কারণে সবার করবেন না। এ জন্যও সবার করবেন না যে, লোকে বলবে, ওয়াল্লাহি, সে তো নিরাশ হয়নি।

এমনকি যদিও ইয়াকুব ﷺ বলেছিলেন,

‘...সুন্দর সবার...।’ (সূরা ইউসুফ, ১৮)

এবং আল্লাহ ﷻ কুরআনে তা উল্লেখও করেছেন, তবুও যখন তিনি তাঁর ছেলে ইউসুফ ﷺ-এর সাথে ঘটাবিপর্যয়ের ব্যাপারে জানলেন, তখন তিনি অভিযোগ করেছিলেন। ইয়াকুব ﷺ অভিযোগ করেছিলেন, কিন্তু পাশাপাশি তিনি এ-ও বলছিলেন, ‘ফাসাবরুন জামিল’। সাবরুন জামিল হলো এমন সবার যাতে কোনো অভিযোগ নেই। কিন্তু তিনি যে অভিযোগ করছিলেন সে কথারও স্পষ্ট উল্লেখ কুরআনেই আছে। তাহলে এ দুটোর মধ্যে সামঞ্জস্য

কীভাবে হবে? হ্যাঁ, ইয়াকুব ﷺ অভিযোগ করেছিলেন, কিন্তু তিনি অভিযোগ করেছিলেন আল্লাহ ﷻ-এর কাছে। তিনি বলেছিলেন :

إِنَّمَا أَشْكُو بَيْنِي وَبَيْنَكَ إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

‘আমি তো আমার দুঃখ ও অস্থিরতা আল্লাহর সমীপেই নিবেদন করছি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না।’ (সূরা ইউসুফ, ৮৬)

তিনি বলেছেন, ইমামা-ইমামা বলার মাধ্যমে এই অভিযোগের নিবেদন শুধু আল্লাহ ﷻ-এর প্রতি তিনি নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন। কাজেই আল্লাহ ﷻ-এর কাছে অভিযোগ পেশ করার কারণে আপনার সবর বাতিল হবে না। বরং আল্লাহ ﷻ-এর কাছেই অভিযোগ করুন। আপনার দারিদ্র্য, দৃষ্টিভ্রান্তি, অস্থিরতা ও দুর্বলতা—সবকিছুর জন্য আল্লাহ ﷻ-এর কাছে অভিযোগ করুন। আপনার অন্তরের সব অভিযোগ, অনুযোগ, দুঃখ—সবকিছু আল্লাহ ﷻ-এর কাছে বলুন। কিছু চেপে রাখবেন না। হৃদয়ে যা কিছু আছে তার সব আল্লাহ ﷻ-এর কাছে পেশ করুন, বিনয় ও নম্রতার সাথে ভিক্ষা করুন, তারপর দেখুন না ফলাফল কী হয়।

আইয়ুব ﷻ-কে আল্লাহ ﷻ, সকল বিচারকের বড় বিচারক, সবরকারী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন।

إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ

‘আমি তাকে পেলাম সবরকারী। চমৎকার বান্দা সে। নিশ্চয়ই সে ছিল প্রত্যাবর্তনশীল।’ (সূরা আস-সাদ, ৪৪)

এটা আল্লাহ ﷻ-এর পক্ষ থেকে ঘোষণা। স্বয়ং আল্লাহ ﷻ ঘোষণা করছেন যে, তিনি আইয়ুব ﷻ-কে ধৈর্যশীল পেয়েছেন। যদিও তিনি অভিযোগ করছিলেন তবু আল্লাহ ﷻ তাকে সবরকারী আখ্যা দিয়েছেন। কারণ, তিনি অভিযোগ করেছিলেন আল্লাহ ﷻ-এর কাছে, আর তাই তাঁর অভিযোগ করার ব্যাপারটি বরং সেই সব নিয়ামকের অন্তর্ভুক্ত যেগুলোর কারণে তিনি আল্লাহ ﷻ-এর কাছ থেকে সবরকারী হিসেবে স্বীকৃতি লাভের মহান সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। তিনি আল্লাহ ﷻ-এর কাছে অভিযোগ করে বলেছিলেন:

أَيُّ مَسْنَى الضُّرِّ وَأَنْتَ أَزْهَمُ الرَّاحِمِينَ

‘নিঃসন্দেহে আমাকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করেছে। আর আপনি দয়াবানদের চাইতেও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান।’ (সূরা আল-আম্বিয়া, ৮৩)

লক্ষ করুন, আইয়ুব ﷻ কত সূক্ষ্মভাবে শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন, মাসসানি مَسْنَى (আমাকে স্পর্শ করেছে)। আহলাকানি (أهلكنى) অর্থাৎ, আমাকে ধ্বংস করেছে

কিংবা শেষ করে দিয়েছে, এ ধরনের কোনো শব্দ তিনি ব্যবহার করেননি। তিনি বলেছেন, আমাকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করেছে। স্পর্শ শব্দের মানে দাঁড়ায় তিনি খুব সামান্য দুঃখ-দুর্দশায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। কী ছিল সেই সমস্যা? আমাদের সবারই জানা আছে, এ নিয়ে আর আলোচনায় যাচ্ছি না। ধৈর্যশীল বান্দার উদাহরণ হলেন আইয়ুব রাঃ। তিনি তাঁর সম্পদ, সম্ভান ও পরিবার সব হারিয়েছিলেন। কেবল স্ত্রী ছাড়া আর কেউ ছিল না। তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল, রুগ্ন দেখে শয্যাশায়ী ছিলেন। তাঁর এই অবস্থা কেবল এক-দুদিনের ছিল না, বরং বছরের পর বছর তিনি এই দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও আল্লাহ স্বঃ-এর কাছে অভিযোগ করার সময় তিনি বললেন,

‘নিঃসন্দেহে দুঃখ-কষ্ট আমাকে স্পর্শ করেছে।’

তিনি এটুকুই বললেন কারণ এমনও মানুষ থাকতে পারে যারা তাঁর চেয়েও খারাপ অবস্থায় আছে। তাই খুব বিনয়ের সাথে তিনি অভিযোগ করলেন। আল্লাহ স্বঃ তাঁকে সবরকারী বান্দা আখ্যা দিলেন।

এই হলো অভিযোগের সুন্দরতম পদ্ধতি।

আর যে ধরনের অভিযোগে বান্দা গুনাহগার হয়, তা হলো সৃষ্টির কাছে স্রষ্টার ব্যাপারে অভিযোগ করা। এমন অভিযোগ বান্দার সবরকে বাতিল করে দেয়। এটা এমন অভিযোগ যেখানে গ্রহীতার কাছে অভিযোগ করা হয় দাতার নামে। অভিযোগ করার আগে আমরা কি ভেবে দেখছি, কার কাছে অভিযোগ করছি? আমরা সেই মহান সত্তাকে-দয়ালুতার গুণে যথাযথ ও পরিপূর্ণ পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ স্বঃ -কে-ভুলে গিয়ে এমন সত্তার কাছে অভিযোগ করি, যে তার দয়ালে ত্রুটিপূর্ণ কিংবা তার মাঝে আদৌ দয়ালুতার কোনো গুণ নেই। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাঃ বলেছেন, অভিযোগ তিন প্রকার। প্রথম প্রকার হচ্ছে, সৃষ্টির কাছে আল্লাহ স্বঃ-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ, এটি সর্বনিকৃষ্ট। যেমন : কেন এমন হলো?, কেন আমি বিপদে পড়লাম? এভাবে অভিযোগ করা এবং নিজের বিশ্বাস ও চালচলন বদলে ফেলা। দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে, বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাপারে আল্লাহ স্বঃ-এর কাছে অভিযোগ করা; এটি অভিযোগের সর্বশ্রেষ্ঠ স্তর। তৃতীয় প্রকারটি মাঝামাঝি অর্থাৎ স্রষ্টার কাছে সৃষ্টির ব্যাপারে অভিযোগ করা। প্রথমটি সবরকে বাতিল করে দেয় আর বাকি দুটোতে সবর নষ্ট হয় না।

সবরের প্রকারভেদ

এখানে আমি সবরের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরছি। সবর তিন ধরনের হতে পারে। প্রথম প্রকার হলো, সবর আলাস্তা আহওয়াল-মামুর (صبر على الطاعة والأمر) অর্থাৎ আল্লাহ স্বঃ-এর আনুগত্য ও হুকুম পালনে সবর করা। তারপর হলো, সবর আলাল মাসিয়াহ (صبر على المعصية), অর্থাৎ গুনাহ থেকে বিরত থাকার সবর।

এ দুই প্রকার সবরের একটি উদাহরণ হচ্ছে, ফজরের সালাতে ঘুম থেকে ওঠা। এক দীর্ঘ কর্মমুখর দিনের শেষে আপনি হয়তো রাত করে ঘুমোতে গিয়েছেন কিংবা রাত্তে তাহাজ্জুদ আদায় করে শুয়েছেন। এমন অবস্থায় হঠাৎ ফজরের ওয়াক্ত চলে এল। আপনাকে আবারও ফজরের সালাতের জন্য উঠতে হলো; কিংবা স্বামী হয়তো স্ত্রীর সাথে বিছানার উষ্ণতা উপভোগ করছেন, এ অবস্থায় সালাতুল ফজর কিংবা সন্ধ্যাতুন নাফিলার সময় উপস্থিত হলো, ফলে তিনি বিছানা ছেড়ে সালাতের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। এ ছাড়া আরও কিছু উদাহরণ দেয়া যায়, যেমন : আপনি হয়তো পরিবারকে নিয়ে বসবাসের জন্য একটি সুন্দর বাড়ির স্বপ্ন দেখেছিলেন, কিন্তু সুদি লেনদেনে জড়াতে হবে ভেবে তা পরিত্যাগ করলেন। গীবত ও নামিমাহ থেকে বিরত থাকা, এ থেকে জিহ্বা সংযত রাখার জন্যও প্রচুর সবরের প্রয়োজন। এগুলো প্রথম দুই প্রকার সবরের উদাহরণ।

সবরের তৃতীয় প্রকারটি হলো, আস-সবরু আলাল বালায়ি ওয়াল-মাকদুর (الصبر على البلاء والمقدور) অর্থাৎ, আল্লাহ ﷻ-এর দেয়া পরীক্ষা ও বিপদ-আপদে ষৈর্থধারণ করা।

আল্লাহ ﷻ বলেন :

الم ○ أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ○ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

আলিফ-লাম-মীম। মানুষ কি মনে করে যে, তারা এ কথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, ‘আমরা ঈমান এনেছি’ আর তাদের কোনো পরীক্ষা করা হবে না? আমি তাদেরও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে ছিল। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী।’ (সূরা আল-আনকাবুত, ১-৩)

এখানে আল্লাহ ﷻ বলছেন, আমি তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরও পরীক্ষা করেছি, আর তোমরা তাঁদের চেয়ে উত্তম নও। সুতরাং আল্লাহ ﷻ অবশ্যই জানিয়ে দেবেন, কারা সত্যপন্থী আর কারা বাতিলের অনুসরণ করে। মুখে উচ্চারণ করলেই ঈমান হয় না। ঈমান কেবল মৌখিক স্বীকৃতি নয়; বরং অন্তরে বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি ও আমলের সমন্বয় হচ্ছে ঈমান।

আল্লাহ ﷻ কেন আমাদের পরীক্ষা করেন?

আল্লাহ ﷻ কুরআনে বলেছেন :

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَكُمْ عَلَىٰ الْقَبْرِ وَلَئِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيٰ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ فَأَمَتُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ

‘আল্লাহ এমন নন যে, মুমিনদের তাদের বর্তমান অবস্থার ওপর ছেড়ে দেবেন, যতক্ষণ না তিনি ভালোদের মন্দদের থেকে পৃথক করে নেন। আর আল্লাহ এমনও নন যে, তোমাদের ধাইবের সকল সংবাদ অবহিত করবেন। কিন্তু আল্লাহ স্বীয় রাসূলদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা বাছাই করে নেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করো। যদি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করো ও আল্লাহকে ভয় করো, তবে তোমাদের জন্য রয়েছে বিরাট প্রতিদান।’ (সূরা আলি ইমরান, ১৭৯)

আমাদের সাথে যা কিছু ঘটে তার পেছনে আল্লাহ ﷻ-এর হিকমাহ থাকে। আমাদের ওপর কোনো পরীক্ষা এলে কখনো কখনো আমরা এর পেছনের হিকমাহ টের পাই, আবার কখনো কখনো আমরা তা উপলব্ধি করতে পারি না। আল্লাহ ﷻ এখানে এ কথাই বুঝিয়েছেন যে, আমরা ধাইবের ব্যাপারে জ্ঞান রাখি না। আল্লাহ ﷻ ধাইব প্রকাশ করবেন না। কিন্তু আমরা যদি আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর ওপর ঈমান আনি, আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে মহাপ্রতিদান।

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ إِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ

‘সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করো। যদি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করো ও আল্লাহকে ভয় করো, তবে তোমাদের জন্য রয়েছে বিরাট প্রতিদান।’

এখানে মূল শিক্ষা হলো, আপনার জীবনে যা-ই ঘটুক না কেন, আপনি সত্যের ওপর অবিচল থাকবেন। এ আয়াতের শেষে আল্লাহ ﷻ মূলত এই বিষয়টির কথাই বলেছেন-আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আলাইহিস সালাম-গণের সত্য পথের ওপর অটল থাকা। তাই আল্লাহ ﷻ মানুষের ঈমান যাচাই করবেন, যেন সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীদের মাঝে পার্থক্য করা যায়। আল্লাহ ﷻ বলছেন :

حَتَّى يَبَيِّرَ الْحَقِيبَتِ مِنَ الطَّيِّبِ

...যতক্ষণ না তিনি ভালোদের মন্দদের থেকে আলাদা করে নেন।

আল্লাহ ﷻ বিভিন্ন ধরনের ফিতনা ও পরীক্ষার মাধ্যমে ভালোদের মন্দদের থেকে আলাদা করেন। হতে পারে সেটা আর্থিক দিক দিয়ে কিংবা কারও অসুস্থতা বা ব্যবসা-বাণিজ্যের পরীক্ষার মাধ্যমে। আবার কেউ হয়তো দ্বীনের কোনো বিষয়ে পরীক্ষায় পড়তে পারে। আর দ্বীনের ব্যাপারে পরীক্ষাই সবচেয়ে বড় পরীক্ষা।

আল্লাহ ﷻ আরও বলেন :

لِيَبَيِّرَ اللَّهُ الْحَقِيبَتِ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْحَقِيبَتِ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

‘যেন আল্লাহ আলাদা করে দেন খারাপদের (কাফির, মুশরিক ও মন্দ আমলকারী) ভালোদের (মুসলিম, যারা নেক আমল করে) থেকে এবং খারাপগুলোকে একটির পর একটি স্থাপন করে সমবেত স্বূপে পরিণত করেন ও তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন। এরাই হলো ক্ষতিগ্রস্ত।’ (সূরা আল-আনফাল, ৩৭)

লক্ষ করুন, আল্লাহ ﷻ বলছেন খারাপদের ভালোদের থেকে আলাদা করে দেবেন এবং খারাপগুলোকে একসাথে জড়ো করবেন। গত দশ কিংবা পনেরো বছরে ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক সময়ের ফিতনাগুলোর মাধ্যমে সমস্ত আবর্জনা একদিকে, আর সমস্ত সত্যপন্থী লোকগুলো অন্যপাশে জড়ো হচ্ছে। দু-পক্ষ আলাদা হয়ে যাচ্ছে। আপনারা এখন দা’ঈদের মাঝেও পার্থক্য করতে পারবেন—যারা আবর্জনা তারা আবর্জনা, আর যারা আসলেই সত্যের ওপর আছেন আপনি তাঁদেরও চিনতে পারবেন। সামান্য দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করলে মুহূর্তের মধ্যে অনেকের চোখমুখের ভাব বদলে যায়। সেই সাথে বদলে যায় তাদের নীতি, আদর্শ আর মানহাজও। দ্বীনের যে বিষয়গুলো এতদিন তাদের কাছে সুনিশ্চিত ফরয হিসেবে বিবেচিত হতো, হঠাৎ করেই সেগুলো ‘সুন্নাহ’তে পরিণত হয়, কিংবা সুন্নাহর চেয়েও কম গুরুত্বের হয়ে যায়। বিপদের মুখোমুখি হলে তারা দ্বীনকে কাটছাট করে ফেলে। আগে তাদের কাছে ওয়াল্লা ও বারার সংজ্ঞা ছিল এক রকম, আর এখন রাতরাতি সেগুলোর অর্থ সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। আলহামদুলিল্লাহ, সবকিছুই লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে এবং আমরা এসবের প্রত্যক্ষ নিদর্শনও দেখতে পাচ্ছি।

أَحْسِبِ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

‘মানুষ কি মনে করে যে, তারা এ কথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা বিশ্বাস করি এবং তাদের পরীক্ষা করা হবে না?’ (সূরা আল-আনকাবুত, ২)

সাধারণ অজ্ঞ মুসলিমদের মধ্যে সবরের পরীক্ষায় যারা ফেল করে তারা বলে, আল্লাহ তুমি এটা কেন করলে? কিন্তু অনেকে মুখে এটা না বললেও বিপদের মুখোমুখি হলে নিজেদের নীতি ও বিশ্বাস পাল্টে ফেলে। শুরু করে নিজের আদর্শের সাথে আপস করা। অনেকে আছে, যারা জেল থেকে ফেরে সম্পূর্ণ ভিন্ন, নতুন মানুষ হয়ে। তাদের বন্দিত্বের আগেকার অভিও, ভিডিও ও লেকচারগুলো লক্ষ করুন, আর এখনকার কথাবার্তা শুনুন। তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষে পরিণত হয়েছে। এরা মুখে কখনো বলে না, ‘আল্লাহ তুমি আমার সাথে কেন এমন করলে’, এরা মুখে অভিযোগ করে না। কিন্তু তাদের বিশ্বাস আর আদর্শ বদলে যায়, এক ভিন্ন আদর্শে তারা বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। এরাই হলো সেসব আবর্জনা যারা আল্লাহ ﷻ-এর দ্বীনের দাওয়াহর ওজন বহনের যোগ্য না। সমস্ত আবর্জনাকে একপাশে জড়ো করা হচ্ছে, আর হকপন্থীরাও জড়ো হচ্ছে একপাশে।

পরীক্ষা নেই এমন জীবনের প্রত্যাশা করবেন না :

হক মানহাজের দাওয়াহর পথ কখনো কুসুমাস্তীর্ণ, লাল গালিচা বিছানো হবে না। কখনো এমন আশা করবেন না এবং এমন আশার কারণে নিজের জীবনকে আরাম ও ভোগবিলাসের দিকে যেতে দেবেন না। হকের দিকে মানুষকে আহ্বান করার কারণে আপনাকে যেসব দুঃখ-দুর্দশা ও কষ্ট ভোগ করতে হবে, তার মোকাবেলায় এখন থেকেই নিজেকে গড়ে তুলুন, আর সে জন্য আপনার দরকার মজবুত ঈমান ও সবর। ‘নবি ইউসুফ عليه السلام—এর পাঠশালা’^(১২৬) নামক আলোচনায় আমি বলেছিলাম, কখনো আল্লাহ ﷻ—এর কাছে পরীক্ষা চাইবেন না। বরং আল্লাহ ﷻ—এর কাছে দুআ করুন তিনি যেন আপনাকে পরীক্ষা থেকে হেফাযত করেন। কিন্তু একই সাথে নিজের ভেতরে ঈমান ও সবরকে প্রতিষ্ঠিত করুন, আর তা শুধু ইলম অর্জনের মাধ্যমে সম্ভব। এ কারণেই আমরা ইলম অর্জন করি, যেন এর সাহায্যে কঠিন পরীক্ষার মুহূর্তেও আমরা অবিচল থাকতে পারি। ওয়াল্লাহি, আমি এমন কয়েকজনকে চিনি, পরীক্ষার মুখোমুখি হবার পর যারা হকের ওপর টিকে থাকতে ব্যর্থ হয়েছেন—তারা এ সময়কার বেশ পরিচিত মুখ এবং আপনারা হয়তো তাদের মিডিয়াতেও দেখে থাকবেন।

কখনো তাদের মতো হবেন না, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۚ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْخَسِرَانُ الْمُبِينُ

মানুষের মধ্যে কেউ কেউ সংশয়ের সাথে আল্লাহর ইবাদাত করে। সে যদি কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, তবে এতে সে প্রশান্তি লাভ করে, কিন্তু যদি কোনো বিপর্যয় তার ওপর আপতিত হয়, সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায় (ঈমান আনার পর কুফরিতে ফিরে যায়)। ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানেই সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি।’ (সূরা আল-হাজ্জ, ১১)

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ

মানুষের মধ্যে কেউ কেউ সংশয়ের সাথে আল্লাহ ﷻ—এর ইবাদাত করে—অর্থাৎ ব্যাপারটা এমন যে, ধরুন কেউ সাগর কিনারে কোনো উঁচু পাহাড়ের ধার অথবা কোনো গিরিখাতের কিনারায় সংকীর্ণ পথ ধরে হাঁটছেন।’ সে যদি কল্যাণপ্রাপ্ত হয় এবং সবকিছু তার ইচ্ছামতো ঘটে, তবে এতে সে প্রশান্তি লাভ করে—যখন সাফল্য আসে তখন সে খুশি, ‘ওহ! আমি তো মুমিন, আমি প্রশান্তি অনুভব করছি’। কিন্তু যদি কোনো বিপর্যয় তার ওপর আপতিত হয়, সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়, ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানেই সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়—যখন বিপদ আসে তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তার পা ফসকে যায়। দ্বীনের রাস্তা থেকে সে বিচ্যুত হয়ে যায়, আর এভাবে দুনিয়া-আখিরাত দুটোই হারায়। দুনিয়াতে সে বিপর্যস্ত হয়, আর আল্লাহ

ﷺ তার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন এর ওপর অসন্তুষ্ট হবার কারণে আখিরাতেও সে বিপর্যস্ত হবে। আল্লাহ্‌র সাক্ষ্যতানা, আল্লাহ্‌র সাক্ষ্যতানা। এরা যদি নিজেদের চাহিদা মোতাবেক ধন, যশ, খ্যাতি, সম্পদ, সম্মান ও অনুসারীদের পেয়ে যায়, তবে এরা মুমিনদের স্বাভাবিক গতিপথে মিশে থাকে। কিন্তু হঠাৎ কোনো পরীক্ষার সম্মুখীন হলে তারা সেই পথ ছেড়ে দেয়।

এখনকার অনেক দা'ঈকে বলতে শুনবেন, আমি ডাই শাস্তিতে থাকতে চাই, আমি ছা-পোষা মানুষ, বউবাচ্চা নিয়ে নির্ঝঞ্ঝাটে জীবন কাটিয়ে দিতে চাই। এখন ফিতনার সময়, আমি কোনো ঝামেলায় জড়াতে চাই না। অথচ এরা ফিতনার কিছুই দেখেনি। ফিতনা কী এদের ধারণাই নেই, ফিতনা এখনো এদের ধারেকাছেও ঘেঁষেনি, এমনকি ফিতনার গন্ধও এরা পায়নি। আজ এমনও মানুষ দেখবেন যারা বলছে, 'দাওয়াহ আমার জন্য না'। মাত্র কদিন আগেও আমি একজনকে বলতে শুনলাম, মাসজিদে যাওয়ার কারণে যদি আমার ওপর নজরদারি করা হয়, তাহলে আমি আর মাসজিদেই যাব না।

'মানুষ কি মনে করে যে, তারা এ কথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা বিশ্বাস করি এবং তাদের পরীক্ষা করা হবে না?' (সূরা আল-আনকাবুত, ২)

একজন দা'ঈ, একজন মুসলিমের দায়িত্ব হলো সীরাতুল মুস্তাক্বিমের ওপর চলা, আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর দেখানো পথের অনুসরণ করা এবং একইসাথে এ পথের বোঝাগুলোও বহন করা। একজন দা'ঈ সঠিক পথকে গ্রহণ করে নেয় এবং স্বীকার করে নেয় এ পথের সকল কষ্টও। আল্লাহ ﷻ তার জন্য যে পরিণতিই নির্ধারণ করুন না কেন, নির্দিধায়, বুক চিতিয়ে দৃঢ়তার সাথে সে তা মেনে নেয় এবং ঘোষণা করে, আমি একজন মুমিন!!

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

'এবং নিঃসন্দেহে আমি তাদেরও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে ছিল। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই জেনে নেবেন মিথ্যাকদের।' (সূরা আল-আনকাবুত, ৩)

এই আয়াতে আল্লাহ ﷻ বলছেন যে, আল্লাহ ﷻ অবশ্যই সত্যবাদী ও মিথ্যাকদের জেনে নেবেন (যদিও তিনি আগে থেকেই সমস্ত ব্যাপারে অবহিত আছেন)। নবি আলাইহিস্‌সালামগণ পরীক্ষিত হয়েছেন, শক্তির সম্মুখীন হয়েছেন। উলুল আযমের^[১০০] এমন একজন রাসূলও পাবেন না, যার দাওয়াহর পথে আরাম-আয়েশ, ভোগবিলাস ও লাল গালিচা বিছানো ছিল। সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে যিনি আল্লাহ ﷻ-এর সবচেয়ে প্রিয় তিনিও এগুলো পাননি। কোনো রাসূলের দাওয়াহর পথ দুঃখ, কষ্ট, পরীক্ষা ছাড়া ছিল না। আর দাওয়াহর ক্ষেত্রে

১০০ উলুল আযম : দৃঢ়সংকল্প। সমস্ত নবি ও রাসূলের মধ্যে পাঁচজন নবিকে আল্লাহ ﷻ 'উলুল আযম' বা দৃঢ়সংকল্প বলে বিশেষ বর্ণনা দিয়েছেন। সেই পাঁচজন হচ্ছেন : ১. নূহ ﷺ, ২. ইব্রাহীম ﷺ, ৩. মুসা ﷺ, ৪. ইসা ﷺ এবং ৫. মুহাম্মাদ ﷺ।

আমাদের অনুসরণীয় কারা? দাওয়াহর ক্ষেত্রে আমাদের আদর্শ কারা? আল্লাহ ﷻ-এর রাসূল আলাইহিমুস সালামগণই হলেন আমাদের আদর্শ। আপনারা কি এমন কোনো রাসূলের কথা জানেন যিনি তার জীবনের শুরু থেকে শেষ অবধি কোনো দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেননি? তাঁরাই আমাদের আদর্শ, দাওয়াহর ক্ষেত্রে তাঁরাই অনুসরণীয়। আজকে এমন অনেককে দেখা যায় যারা দাওয়াহকে তাদের পেশা ও ক্যারিয়ার হিসেবে নিয়েছে। তারা দাওয়াহর কাজ করে খ্যাতি, সম্মান আর বিলাসিতার জন্য। তাই এরা সব সময় শ্রোতের সাথে ভাল মিলিয়ে চলে। যে সময়ের যে রীতি, যা বললে জনপ্রিয়তা পাওয়া যাবে, মানুষের মন জয় করা যাবে, সেটাই তাদের আদর্শ। শ্রোতের সাথে চলাই তাদের দীন, তাদের ধর্ম। আপনি মনে করছেন আপনি হকের ওপর আছেন, কিন্তু আপনার কোনো শত্রু নেই, আপনি পরীক্ষিত হচ্ছেন না—যদি এমন হয়, তাহলে বাসায় যান, রুমের দরজা বন্ধ করে আবার শুরু থেকে চিন্তা করে দেখুন। বারবার ভেবে দেখুন, আপনি আসলেই হকের ওপর আছেন কি না।

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

‘এমনিভাবে আমি প্রত্যেক নবির জন্য শত্রু হিসেবে সৃষ্টি করেছি শয়তান—মানুষ ও জিনদের মধ্য হতে। তারা ঘোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে একে অপরকে চমকপ্রদ কথা বলে। যদি আপনার পালনকর্তা চাইতেন, তবে তারা এ কাজ করত না। সুতরাং তাদেরকে তাদের মিথ্যার ওপরে ছেড়ে দেন।’ (সূরা আল-আনআম, ১১২)

আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

অর্থাৎ, প্রত্যেক নবির জন্য শত্রু...

তাওহীদের দিকে আহ্বানকারীর শত্রু থাকবেই। আল্লাহ ﷻ এখানে শত্রু হিসেবে শয়তানের কথা বলেছেন। এ থেকে কেউ হয়তো বলতে পারে, আল্লাহ ﷻ এখানে জিন শয়তানের কথা বলেছেন। কিন্তু লক্ষ করুন, আল্লাহ ﷻ এখানে নির্দিষ্ট করে বলেছেন, এ শত্রু শুধু জিন জাতির মধ্যে থেকে হবে না; বরং আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ

মানুষ ও জিনদের মধ্য থেকে।

তাই এই আয়াতে শয়তান বলতে কেবল জিনদের বোঝানো হচ্ছে, এমন বলা যাবে না। সূরা আল-ফুরকানে এই আয়াতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আরেকটি আয়াত এসেছে :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا

‘এমনিভাবে প্রত্যেক নবির জন্য আমি মুজরিমুন (অর্থাৎ কাফির, মুশরিক, যালিম ইত্যাদি)-দের মধ্য থেকে শত্রু সৃষ্টি করেছি। আপনার জন্য পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারীরূপে আপনার পালনকর্তাই যথেষ্ট।’ (সূরা আল-ফুরকান, ৩১)

যারাই হক পথে চলবে তাদের শত্রু থাকবেই। এটা আল্লাহ ﷻ-এর সূন্যাহ, আপনি আল্লাহ ﷻ-এর সূন্যাহকে বদলাতে পারবেন না। এ শত্রু কারা? কাফির, মুশরিক, যালিম, এখনকার সময়ের মর্ডানিস্টরাসহ আরও অনেক ধরনের লোকজন—এই শত্রুদের অন্তর্ভুক্ত। দেখুন আল্লাহ ﷻ বলছেন ﴿يُكُ﴾ অর্থাৎ, প্রত্যেক। এই প্রত্যেকজন কারা? আল্লাহ ﷻ এখানে আমার বা আপনার কথা বলছেন না। তাঁদের (আলাইহিসুস সালাম) ব্যাপারে বলছেন যারা আমার এবং আপনার চেয়ে উত্তম—যারা দাওয়াহর পথে মানবজাতির আদর্শ। আল্লাহ যদি উলুল আযমের প্রত্যেক রাসুলের জন্য, অন্যান্য সকল নবির (আলাইহিসুস সালাম) জন্য শত্রু নিযুক্ত করে থাকেন, তাহলে আপনি কীভাবে আশা করেন যে সত্যের পথে থাকা একজন প্রকৃত মুসলিম পরীক্ষিত হবে না? তার কোনো শত্রু থাকবে না? তাকে কোনো সমস্যা, দুঃখ-কষ্ট ও ফিতনার মধ্য দিয়ে যেতে হবে না? এটা কীভাবে সম্ভব?

আমাদের সময়ের ইলমের পোশাক পরা কিছু ডগু, মূর্খ—যাদের বক্তব্য খুব ফলাও করে প্রচার করা হয়—মনে করে তারা সবাইকে খুশি করে চলতে পারবে। কল্পরাজ্যের এই বাসিন্দারা মনে করে কোনো এক জাদুবলে তারা সব মানুষকে এক করে ফেলতে পারবে, নিয়ে আসতে পারবে একেবারে কোনো এক গণ্ডিতে। তারা নিজেদের নতুন মাসীহ মনে করে, যার এমন কোনো শক্তি ও জ্ঞান রয়েছে, যা দ্বারা সে সবাইকে তার গণ্ডির মাঝে নিয়ে আসতে সক্ষম হবে। তারা মনে করে তারা দীন ও দুনিয়াকে বাঁচাতে প্রেরিত নতুন কোনো মসীহ! মনে করে সবাইকে এক্যবদ্ধ করার এমন কোনো যোগ্যতা বা সক্ষমতা তাদের আছে যা আমাদের রাসূলুল্লাহ ﷺ-এরও ছিল না। এদের কথা হলো সব ধর্মের, সব আদর্শের সবাই একসাথে মিলেমিশে, একসাথে হাসিখুশি অবস্থায় থাকবে। সবার দৃষ্টিভঙ্গি একই হবে, সবার অবস্থান একই হবে। শুধু ভালোবাসা, সম্প্রীতি আর ঐক্য থাকবে। অথচ আল্লাহ ﷻ বলছেন :

‘এমনিভাবে আমি প্রত্যেক নবির জন্য শত্রু হিসেবে সৃষ্টি করেছি শয়তান—মানুষ ও জিনদের মধ্য হতে।’

তারা সমগ্র দুনিয়াকে এক্যবদ্ধ করতে চায় বাতিলের ওপর এবং এর বিনিময়ে তারা আল্লাহ ﷻ-এর অসন্তুষ্টি কামাই করে। এ ধরনের লোকের উচিত দাওয়াহর প্রাথমিক বিষয়গুলো, মূলনীতিগুলো আবার শেখা। শুধু দাওয়াহ-ই না, বরং তাদের আগে দীনের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে আবার মনোযোগ দিয়ে শেখা উচিত। যখন আপনি সঠিক মানহাজের ওপর, সঠিক অকিদাহ নিয়ে দাওয়াহ করবেন এবং আপনার দাওয়াহ কার্যকরী হবে তখন অবশ্যই আপনার শত্রু থাকবে। আজকের দিনে কেউ যদি সত্যের দিকে আহ্বান করে, যদি পরিপূর্ণ তাওহিদের কথা বলে, তবে কাফিরদের আগে নামধারী তথাকথিত মুসলিমরাই তার বিরোধিতা করবে।

কোনো কারণ ছাড়া কি দু-দুবার কুরআনে এই ব্যাপারটি উল্লেখ করা হয়েছে?

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ○ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ○ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكَيْبِينَ ○ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُونَ

‘নিঃসন্দেহে (দুনিয়ার জীবনে) অপরাধীরা বিশ্বাসীদের উপহাস করত। তারা যখন তাদের কাছ দিয়ে গমন করত, তখন একে অপরের দিকে চোখ টিপে ইশারা করত। যখন তারা তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরত, তখনো হাসাহাসি করতে করতে ফিরত। আর যখনই তারা বিশ্বাসীদের কাউকে দেখত, তারা বলত, নিশ্চয়ই এরা তো বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছে।’ (সূরা আল-মুতাফফিীন, ২৯-৩২)

আল্লাহ ﷻ বলছেন, নিঃসন্দেহে (দুনিয়ার জীবনে) অপরাধীরা বিশ্বাসীদের উপহাস করত। আমরা সবাই জুযু আশ্মা (৩০ তম পারা) পড়ি। অনেকেই জুযু আশ্মা মুখস্থ। কিন্তু আমরা কি কখনো কুরআনের আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তা করি? এ আয়াতে কাকিররা মুসলিমদের সাথে যে আলোচনা করত আল্লাহ ﷻ সেটার ব্যাপারে বলছেন। আজকে আমাদের মাঝে একশ্রেণির লোক আছে যারা নিজেদের মুমিন দাবি করে থাকে, অথচ খাঁটি তাওহিদে বিশ্বাসীদের সাথে তারা ঠিক এই কাকিরদের মতো আচরণ করে। বিস্ময় তাওহিদের ওপর আমলকারীদের দেখলে এরা বলে, ‘নিশ্চয় এরা তো বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছে।’ নির্ভেজাল তাওহিদে বিশ্বাসী সত্যপন্থীরা আজ আগন্তুকদের মধ্যেও আগন্তুক, এমনকি তাদের মাঝেও আগন্তুক।

সেটা কীভাবে?

إِنَّهُمْ لَضَالُونَ.....

দল্লুন শব্দের অর্থ কী? মানে হলো, তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। কাকিররা মুসলিমদের উদ্দেশ্য করে বলত, এরা তো পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। আর আজ নামধারী মুসলিমরা কী বলে? আরে সে তো তাকফিরি, সে খারিজি। আজ এরা এসব বলে বেড়ায়। এদের ডেকে প্রশ্ন করুন, ঠিক আছে ভাই, আপনারা যেহেতু তাদের এসব নামে ডাকছেন, তাহলে বলুন, আলিমদের মতানুসারে তাকফিরির সংজ্ঞা কী? তারা জবাব দিতে পারবে না। কিছুই বলতে পারবে না। তাদের জিজ্ঞেস করুন, সালাফদের মতে খারিজিদের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী—তারা বলতে পারবে না। আসল ব্যাপার হলো, এরা কিছু মোরগকে ডাকাডাকি করতে শুনেছে, তাই তারাও সুর মিলিয়েছে। আমি তাদের একটু বেশিই সম্মান দিচ্ছি—আমি বলিনি যে, তারা কুকুরের পালকে ঘেঁউ ঘেঁউ করতে শুনেছে, আমি তাও তাদের মতো ঘেঁউ ঘেঁউ শুরু করেছি। আমি বরং বলেছি যে, এরা মোরগের ডাক শুনে সুর মিলিয়েছে। আল্লাহ ﷻ—এম ভয় ছাড়া, এরা মুহূর্তের মধ্যে এসব রেডিমেইড ট্যাগ ছুড়ে দেয়।

যা হোক, মনে রাখবেন, যদি মুমিন হয়ে থাকেন, হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত ও অবিকল থাকেন,

তবে অবশ্যই পরীক্ষিত হবেন এবং তখন আপনাকে এর ওপর ধৈর্যশীল হতে হবে।

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ

‘নিঃসন্দেহে (দুনিয়ার জীবনে) অপরাধীরা বিশ্বাসীদের উপহাস করত।’ (সূরা আল-মুতাফফিফীন, ২৯)

পরীক্ষার সম্মুখীন হলে এই আয়াতগুলোকে চোখের সামনে রাখবেন। আমার কাছে অনেকে অনেক সমস্যা নিয়ে আসেন। হ্যাঁ, পরামর্শ করা খারাপ না, কিন্তু আপনারা এই আয়াতগুলোর কথা সব সময় মনে রাখবেন। আপনি যদি হকের ওপর থাকেন এবং এ ব্যাপারে নিশ্চিত হন যে, আপনি কুরআন ও সুন্নাহর নির্ধারিত পথের (সাহাবা রা ও তাঁদের অনুসারীদের পথ) ওপরে আছেন—আর এই কারণে যদি আপনাকে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করা হয়, আপনার নামের সাথে জুড়ে দেয়া হয় বিভিন্ন ট্যাগ, আপনাকে নিয়ে হাসি-তামাশা ও বিদ্রূপ করা হয়, তাহলে এই আয়াতগুলোর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন।

তারা আপনাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে, ক্ষতি করে। কিন্তু যদি সবর করেন, তবে ফলাফল হিসেবে আপনি কী পাবেন? আল্লাহ স্ব আপনাকে ঠিক এই দিনের জন্য অপেক্ষা করতে বলছেন :

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ

‘আজ যারা বিশ্বাসী, তারা কাফেরদের উপহাস করছে।’ (সূরা আল-মুতাফফিফীন, ৩৪)

দুনিয়াতে এদের কাউকে নিয়ে আমরা হাসি-তামাশা করব না। কিন্তু পরকালে, ওদের নিয়ে মুমিনরাই উপহাস করবে। আজ যারা আপনাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা ও উপহাস করছে, সেদিন আপনি তাদের নিয়ে পাল্টা হাসি-তামাশা ও উপহাস করবেন। ইবনুল মুবারাক রা বলেন, আল-কালবি এই আয়াতের ব্যাপারে আবি সালিহকে মন্তব্য করতে শুনেছেন।

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ

‘আল্লাহ তাদের সাথে উপহাস করেন।’ (সূরা আল-বাকারাহ, ১৫)

আবু সালিহ আল্লাহ স্ব—এর এই আয়াতের ব্যাপারে বলেছেন, জাহান্নামে তাদের দৈনন্দিন শাস্তির সাথে উপরিপাওনা হিসেবে যোগ হবে এই উপহাস। জাহান্নামের দরজাগুলো খুলে দিয়ে তাদের চলে যেতে বলা হবে। জাহান্নামীরা দ্রুতবেগে দরজার দিকে ছুটে যাবে। কিন্তু তারা দরজার কাছে পৌঁছানোমাত্র তা বন্ধ করে দেয়া হবে। জাহান্নামের জানালা দিয়ে জাহান্নামীদের দেখে মুমিনরা হাসাহাসি করবে। আবু সালিহ বলেছেন এটাই হচ্ছে এই আয়াতের ব্যাখ্যা,

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ

‘আজ যারা বিশ্বাসী, তারা কাফেরদের উপহাস করছে।’ (সূরা আল-মুতাফফ্বীন, ৩৪)

ওয়াল্লাহি, সবচেয়ে অধীর আগ্রহে আমি সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করি যেদিন ইন শা আল্লাহ আমরা আল্লাহ ﷻ-এর চেহারা দেখতে পাব। এটা আমার প্রথম চাওয়া। আর দ্বিতীয় যে বিষয়টির জন্য আমি উন্মুখ হয়ে আছি তা হলো, হাতে দুধের শরবত, মধু ও পানীয়-বিশিষ্ট গ্লাস নিয়ে আমরা আল-আরাইকের সিংহাসনে আয়েশ করে বসব, আর জাল্লাতের জানালা দিয়ে জাহান্নামীদের দিকে তাকাব। সেই জাহান্নামীদের দিকে যারা পৃথিবীতে দিনের পর দিন বিরামহীনভাবে আমাদের ওপর বিভিন্ন রকমের অত্যাচার করেছিল। যারা আমাদের নিয়ে উপহাস করত আর আমাদের হত্যা করত। আল্লাহ ﷻ আমাদের অপরাধগুলো ক্ষমা করুন এবং হক পথের ওপর আমাদের দৃঢ় রাখুন, যাতে করে সেই সম্মান ও মর্যাদার স্তরে আমরা উপনীত হতে পারি, ইন শা আল্লাহ তাআলা। কাজেই দুনিয়াতে এদের কাউকে নিয়ে আমরা উপহাস করব না, কেননা এখানে তাওবাহর সুযোগ আছে। সুযোগ আছে যেকোনো সময় তাওবাহ করে সঠিক পথে ফিরে আসার। কিন্তু পরকালীন জীবনে এমন একটা সময় আসবে যখন আপনার নিজের আত্মীয়স্বজনকে নিয়ে উপহাস করতেও আপনার খারাপ লাগবে না।

আল্লাহ ﷻ বলেন :

عَلَىٰ أَرْبَابِكُمْ يَنْظُرُونَ ۖ هَلْ تُؤْتِيهِمُ الْكَفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۚ

‘সিংহাসনে বসে তারা তাদের দেখবে। এবং কাফিররা যা করত, তার প্রতিদান পেয়েছে তো?’ (সূরা আল-মুতাফফ্বীন, ৩৫-৩৬)

এবার প্রতিদানের পালা। তাদের কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল বুঝিয়ে দেয়া হবে। দুনিয়াতে যে উপহাস করেছে, পরকালে তাকে নিয়ে অন্যরা উপহাস করবে। আমরা আল্লাহ ﷻ-এর কাছে দুআ করি, তিনি যেন আমাদের আল-আরাইকের ওপর সমবেত করেন যেন আমাদের সাথে এমন আচরণকারীদের সেদিন এ দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় আমরা দেখতে পারি, ইন শা আল্লাহ তাআলা।

আল্লাহর রাসূল ﷺ, মুসলিম কিংবা মুজাদ্দিদ—এ মহান কাজের দায়িত্ব যে-ই গ্রহণ করেছেন, প্রত্যেককে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এটা আল্লাহ ﷻ-এর সুন্নাহ। সুতরাং আমাদের সবরের ওপর আরও দৃঢ় হওয়া ও এর ওপর আমল করা প্রয়োজন। আর একমাত্র ইলম অর্জনের মাধ্যমে তা হতে পারে। সবর ও ইলম। আল্লাহ ﷻ আমাদের অবিচল রাখুন ও পথদ্রষ্টতা থেকে হিফায়ত করুন।

কুরআনে পরীক্ষা-সংক্রান্ত কিছু আয়াত :

পরীক্ষার ব্যাপারে কুরআনের আয়াতগুলোর দিকে লক্ষ করুন। আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْقُرَىٰ ۚ وَيَبْلُوكُمُ الصَّابِرِينَ

‘এবং অবশ্যই আমি তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি এবং ফল ও ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের।’ (সূরা আল-বাকারাহ, ১৫)

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ

এই অংশে যে লাম এসেছে তা হলো লাম আত-তাওকিদ (لام التوكيد)। লাম আত-তাওকিদের ব্যবহার করা হয় কোনো কিছু ঘটার ব্যাপারে নিশ্চিত করার জন্য। বাক্যে শপথ বোঝাতেও লাম ব্যবহৃত হয়, যাকে বলে (لام القسم) লাম আল-কসম। সুতরাং এখানে আল্লাহ শপথ করছেন যে—ওয়াল্লাহি, তোমাদের পরীক্ষা করা হবে। লাম এর ঠিক পরের অক্ষরটি হচ্ছে ‘ভারী নুন’ (نون النغيلة)। পুরো কুরআনজুড়ে এ বিষয়গুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ। লক্ষ করুন, আল্লাহ ﷻ বলছেন :

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ

‘আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব, যে পর্যন্ত না ফুটিয়ে তুলি তোমাদের জিহাদকারীদের এবং সবরকারীদের এবং যতক্ষণ না আমি তোমাদের অবস্থানসমূহ যাচাই করি।’ (সূরা আল-মুহাম্মাদ, ৩১)

لَنَبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا ۚ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

‘অবশ্যই তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন সম্পর্কে পরীক্ষা করা হবে এবং অবশ্যই আহলে কিতাব (ইহুদি ও খ্রিস্টান) ও মুশরিকদের থেকে তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনতে পারো। কিন্তু যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো এবং সংযমী হও, তবে তা হবে দৃঢ়সংকল্পের কাজ।’ (সূরা আলি ইমরান, ১৮৬)

প্রতিটি আয়াতে একই অর্থে লামের প্রয়োগ ঘটেছে—লাম আত-তাওকিদ কিংবা লাম আল-কসম। উল্লিখিত শেষ আয়াতের দ্বিতীয় অংশের প্রতি লক্ষ করুন,

وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا

এবং অবশ্যই আহলে কিতাব (ইহুদি ও খ্রিষ্টান) ও মুশরিকদের থেকে তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনেতে পছরা।

অর্থাৎ, এটি একটি সুনিশ্চিত ও অনিবার্য বিষয়। তাহলে কীভাবে আমরা এর মোকাবেলা করতে পারি? এর উত্তরও এখানে বলে দেয়া হয়েছে,

وَأَنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

কিন্তু যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে তা হবে দৃঢ়সংকল্পের কাজ।

আল্লাহ ﷻ বিষয়টি অর্ধেক বলেননি, ঝুলিয়ে রাখেননি। তিনি আমাদের সমাধান জানিয়ে দিয়েছেন। যদি আমরা সবারকারী ও মুত্তাকিদের অন্তর্ভুক্ত হই, তাহলে যাবতীয় ব্যাপারে এটাই আমাদের সাফল্যে পৌঁছে দেবে। এবং এটাই আমাদের পরকালীন জীবনে সফলতার অন্যতম পাথেয়।

পার্থিব জীবনে আপনার দাওয়াহর ফলাফল কী হচ্ছে সেটা দেখা জরুরি না। অনেকে এ দুনিয়াতেই চূড়ান্ত বিজয় দেখে যেতে চায়। কিন্তু চূড়ান্ত বিজয় তো হলো, হকের রাস্তায় ধৈর্যের সাথে অবিচল থাকা ও এর ওপরেই মৃত্যুবরণ করা। আর তাই আমরা আল্লাহ ﷻ-এর কাছে সব সময় কেবল এই দুআই করি, তিনি যেন বিশুদ্ধ তাওহিদ ও হক পথের ওপর আমাদের দৃঢ় ও অবিচল রাখেন। নবি-রাসূল ও বিশ্বাসীরা অসংখ্য পরীক্ষা ও ফিতনার মুখোমুখি হয়েছেন এবং আমাদের নবিজি ﷺ তাঁদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁকে এত বেশি পরিমাণ দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল যে তাঁকে সাস্তানা দানের জন্য আল্লাহ ﷻ আয়াত নাযিল করেছিলেন। আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّىٰ أَنَاهُمْ نَصْرَنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيِّ الْمُزْنَلِيِّينَ

‘নিশ্চয়ই (হে মুহাম্মাদ) আপনার পূর্বেও বহু রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা এর ওপর সবার করেছিল, যতক্ষণ না আমার সাহায্য তাদের কাছে পৌঁছায়। আল্লাহর বাণীর পরিবর্তনকারী কেউ নেই, আর অবশ্যই রাসূলদের কিছু সংবাদ তো আপনার কাছে পৌঁছেছে।’ (সূরা আল-আনআম, ৩৪)

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তীব্র মনঃকষ্টে কাতর হয়ে পড়েছিলেন তখন আল্লাহ ﷻ তাকে বললেন, তোমার আগে যারা এসেছিল তাদেরও এভাবে তারা অস্বীকার করেছিল। তাদেরও অনেক ক্ষতি করা হয়েছিল, অত্যাচার করা হয়েছিল। বিজয়ের আগ পর্যন্ত অস্বীকৃতি ও নিজেদের ওপর আপত্তি পরীক্ষাসমূহের ওপর পূর্ববর্তীরা সবার করেছিল।

وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ

‘আর আল্লাহর বাণীর পরিবর্তনকারী কেউ নেই।’

এর কোনো বিকল্প নেই। প্রত্যেক দাঈকে এটা জানতে হবে। এমন কেউ নেই যে আল্লাহ ﷻ-এর আয়াতের পরিবর্তন ঘটাবে। সুতরাং বিজয় আসবেই এবং সেই সাথে সুনিশ্চিতভাবে আসবে বিজয়ের আগের পরীক্ষাগুলো। আপনি আল্লাহ ﷻ-এর সুমাহ বা স্বাভাবিক নিয়মে কোনো ব্যতিক্রম পাবেন না। বিস্তুক তাওহিদের ওপর প্রতিষ্ঠিত দাঈ বিপদে পড়বে, ক্ষতির সম্মুখীন হবে, এটাই আল্লাহ ﷻ-এর সুমাহ। একে এড়িয়ে যাবার কোনো উপায় নেই। ইউনিভার্সিটি অব ইউসুফ^(১০১) ﷺ লেকচারটি যদি শুনে থাকেন, আমি সেখানে বলেছিলাম উম্মাহর ইতিহাসের সবচেয়ে সম্মানিত আলিমগণ জীবনভর অসংখ্য পরীক্ষা ও দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে গেছেন। ইমাম আবু হানিফা ﷺ-সহ হকপন্থী আলিমগণ কীভাবে জীবনে একের পর এক পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন, কী পরিমাণ বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত হয়েছিলেন, তা নিয়েও আমরা আলোচনা করেছি। এ ছাড়া এমন অনেক বই আছে, যেখানে বিভিন্ন মুজাদ্দিদ ব্যক্তিদের জীবনী ও আলোচনা উঠে এসেছে। যেমন : *সিয়াকু আলামিন নুবালা* (ইসলামের মহানায়কেরা)। ইসলামের ইতিহাসের এই মুজাদ্দিদ ও মহাপুরুষদের মধ্যে এমন একজনও কি ছিলেন যাকে তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী কোনো ফিতনার মোকাবেলা করতে হয়নি? তাদের সবাইকেই পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। এটা কি কোনো কাকতাল? না।

আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيِّ الْمُرْسَلِينَ

‘এবং অবশ্যই রাসূলদের কিছু সংবাদ তো আপনার কাছে পৌঁছেছে।’

অর্থাৎ, আল্লাহ ﷻ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলছেন যে, আপনার আগে যারা রাসূল হিসেবে এসেছিল, তাদের বেলাতেও আপনার মতোই হয়েছিল। তারাও সম্মুখীন হয়েছেন ফিতনা ও পরীক্ষার। আর বিজয়ী হয়েছেন আল্লাহ ﷻ-এর ইচ্ছায়। আপনার বেলাতেও তা-ই ঘটবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দাওয়াহ ও ব্যক্তিগত জীবন সব ক্ষেত্রেই একের পর এক ফিতনার মুখোমুখি হয়েছেন। পরীক্ষিত হয়েছেন। আল্লাহ ﷻ তাকে সবরের আদেশ দিয়েছেন—ফাসবির। কুরআনে অন্ততপক্ষে ১১ বার আল্লাহ ﷻ তাঁকে সবরকারী হবার ব্যাপারে সরাসরি আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ ﷻ বলেন :

فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ

‘সুতরাং তুমি ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয়ই শুভ পরিণাম সংযম অবলম্বনকারীদের জন্যই।’
(সূরা হুদ, ৪৯)

মানুষ যখন পরীক্ষার মুখোমুখি হয়, যখন সে উম্মাহকে আজকের মতো চরম দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় দেখে, তখন সে আসন্ন বিজয়ের কথা ভুলে যায়। সে ভুলে যায় যে চূড়ান্ত বিজয় আল-মুত্তাকীনের জন্য।

فَاضْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ

‘সুতরাং (হে মুহাম্মাদ) তারা যা বলে সে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করুন...।’ (সূরা আত-ত্বাহা, ১৩০)

আল্লাহ ﷻ তাঁর রাসূল ﷺ-কে বলছেন, ধৈর্য ধরুন, কারণ আপনার ব্যাপারে অনেক কথা বলা হবে। ঘরে বসে থাকলে কেউ আপনার ব্যাপারে কথা বলবে না। কিন্তু দাওয়াহর ময়দানে নামুন, দেখবেন নিজের ব্যাপারে এমন সব আপত্তিকর, ভয়ংকর কথা শুনতে হবে যে, আপনি হয়তো অনেক সময় নিজেই নিজের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে উঠবেন।

আল্লাহ ﷻ বলেন :

فَاضْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

‘সুতরাং আপনি সবর করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য।’ (সূরা আর-ক্বম, ৬০)

فَاضْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

‘অতএব, আপনি সবর করুন নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য।’ (সূরা গাফির, ৫৫)

একই সূরা অর্থাৎ সূরা গাফিরের অন্য আরেকটি আয়াত হচ্ছে,

فَاضْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

‘সুতরাং, (হে মুহাম্মাদ) আপনি সবর করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য।’ (সূরা গাফির, ৭৭)

আল্লাহ ﷻ কেন তিনবার একই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন? এটা কেন করা হয়েছে? কুরআনের একটি বিন্দুও অকারণে পুনরাবৃত্তি হয় না। আল্লাহ ﷻ বারবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যাতে আমরা বারবার এ কথা পড়ি এবং অনুধাবন করি যে, মুমিনের জন্য প্রতিকূল অবস্থায় সবর অবলম্বনই হলো একমাত্র সমাধান।

আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا

‘নিশ্চয়ই (হে মুহাম্মাদ) আমি আপনার প্রতি পর্যায়ক্রমে কুরআন নাযিল করেছি।’ (সূরা আল-ইনসান, ২৩)

এখানে তানযীলা শব্দের অর্থ পর্যায়ক্রমে। আয়াত শোনার পর মনে হতে পারে যে পরের আয়াতে হয়তো-বা আল্লাহ ﷻ-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কথা বলা হবে। আল্লাহ কুরআন নাযিল করেছেন এবং এর দ্বারা আপনাকে সম্মানিত করেছেন, সুতরাং আল্লাহ ﷻ-এর প্রতি কৃতজ্ঞ হোন। কিন্তু দেখুন পরের আয়াতে কী বলা হচ্ছে, আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

فَاضْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ.....

‘সুতরাং (হে মুহাম্মাদ) ধৈর্যের সাথে তোমার রবের নির্দেশের অপেক্ষা করো।’ (সূরা আল-ইনসান, ২৪)

আল্লাহ ﷻ-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বাপনের কথা না বলে বলা হয়েছে, আল্লাহ ﷻ আপনাকে আদেশ করছেন তিনি আপনার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন সে ব্যাপারে ধৈর্য অবলম্বন করার।

আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

فَاضْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُكُنْ كَصَاحِبِ الْخَوْبِ

‘আপনি আপনার পালনকর্তার আদেশের অপেক্ষায় সবর করুন এবং মাছওয়ালার মতো হবেন না, যখন সে দুঃখে কাতর হয়ে ডেকেছিল।’ (সূরা আল-কালাম, ৪৮)

এখানে আল্লাহ ﷻ বলেছেন, আল্লাহ ﷻ আপনার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন, তার ওপর ধৈর্যধারণ করুন। মাছের নবির মতো হবেন না, যিনি দাওয়াহ পরিতাগ্য করেছিলেন। যখন বিপদ আপনাকে পেয়ে বসবে, আপনি সবর করবেন।

فَاضْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ

‘অতএব, আপনি সবর করুন, যেমন সবর করেছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ...।’ (সূরা আল-আহকাফ, ৩৫)

আল্লাহ ﷻ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পূর্ববর্তী রাসূলদের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছেন, তাদের মতোই সবরকারী হোন। এটা সহজ দায়িত্ব না। এটা যদি সহজসাধ্যই হতো, তবে সবাই এ পথের ওপর অবিচল থাকত। এ চরম বিপদসংকুল, কাঁটা বিছানো এক পথ। কিন্তু এ পথ আপনাকে নিয়ে যাবে ফিরদাউসে। আরাম-আয়েশ, লাল গালিচায় মোড়ানো আরেকটি পথ আছে। কিন্তু সে পথের শেষ গন্তব্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক। একে দেখে ভালো মনে হলেও সে পথে যাওয়া যাবে না। বরং আমাদের সেই কষ্টদায়ক, দুর্গম পথে হাঁটতে হবে যে পথ পৌঁছে দেবে সঠিক গন্তব্যে।

ছোট থেকে ছোট ঘটনার কারণে আজ মানুষ নিজের দীন নিয়ে সংশয়ে পড়ে যায়। বারবার সুযোগ খুঁজতে থাকে সঠিক পথ ছেড়ে উল্টো দিকে মোড় নেয়ার জন্য। যখন আপনার মাথায়

খুলো ছুড়ে দেয়া হবে, তখন হয়তো আপনি অভিযোগ করতে পারেন। যখন আপনার মাথার ওপর উটের নাড়িভুড়ি চাপিয়ে দেয়া হবে, লোকেরা হাসতে হাসতে দুর্বল হয়ে একে অপরের ওপর গড়াগড়ি খাবে, তখন হয়তো আপনি কিছু বলতে পারেন, অভিযোগ করতে পারেন। যখন গলা টিপে শ্বাসরুদ্ধ করে কিংবা মারতে মারতে মেরে ফেলার অবস্থা হয়, আর আবু বকর রাঃ ছুটে এসে তাঁকে স্বঃ মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করেন—এমন অবস্থায় পড়লে হয়তো আপনি অভিযোগের সুরে দু-একটা কথা বলতে পারেন। কিংবা রাসূলুল্লাহ স্বঃ—এর ওপর যেভাবে অবরোধ আরোপ করা হয়েছিল, আপনার বেলাতেও যদি তা-ই করা হয়, তাহলে হয়তো আপনি অভিযোগ করতে পারেন। রাসূলুল্লাহ স্বঃ যখন শিয়াব আবু তালিবে ছিলেন, সে অবস্থাকে আপনি অবরোধ, জেল কিংবা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প যেকোনো কিছু বলতে পারেন। সবগুলোই এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এটি কারাগারে বন্দী হবার মতোই ছিল।

রাসূলুল্লাহ স্বঃ—এর সীরাত সম্পর্কে বিস্তারিত জানলে দেখবেন তাহলে আপনার কাছে এটাকে কারাগার অপেক্ষাও বেশি কিছু মনে হবে। রাসূলুল্লাহ স্বঃ—কে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য কুরাইশরা তাঁকে ভণ্ড বলে আখ্যায়িত করেছিল। কোনো মানুষের সাথে না, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়েছিল স্বয়ং আল্লাহ স্বঃ—এর ব্যাপারে প্রতারণার। তারা তাঁকে মাজনুন অর্থাৎ উন্মাদ ব্যক্তি আখ্যা দিয়েছিল। ওয়াল্লাহি, আমি হত্যা ও খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত এমন অনেক জঘন্য অপরাধীকেও দেখেছি, যারা পাগল পরিচয়ে অল্প সময়ে মুক্তি পাওয়ার বদলে বরং বাকিটা জীবন কারাগারেই কাটিয়ে দেয়াকে বেছে নেয়।^{১৩২} সারা জীবন কারাগারে কাটাতে, তবু পাগলের খাতায় নাম আসবে, এটা তারা মেনে নিতে পারে না। বিকল্প যখন আমৃত্যু বন্দি তখনো আত্মসম্মানবোধ তাদের পাগলের খেতাব মেনে নিতে বাধ্য দেয়। অথচ আমাদের রাসূলুল্লাহ স্বঃ—কে পাগল ও উন্মাদ আখ্যা দেয়া হয়েছিল। আর কাউকে পাগল অভিহিত করা অত্যন্ত গুরুতর একটি ব্যাপার, যেনতেন বিষয় না। কেবল রাসূলুল্লাহ স্বঃ—ই না, বরং তাঁর আগের নবি-রাসূল আলাইহিমুস সালামদেরও একই নামে ডাকা হতো। আল্লাহ স্বঃ বলেছেন :

كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجُنٌّ

‘এমনিভাবে, তাদের কাছে পূর্বের যে রাসূলই আগমন করেছে, তারা বলেছে, এক জাদুকর, না হয় উন্মাদ।’ (সূরা আয-যারিয়াত, ৫২)

আমাদের নবিজি স্বঃ—কে তারা এমন নামে আখ্যায়িত করেছিল যেটাকে আজ আমরা বলি অযোগ্য ও অপদার্থ ব্যক্তি—নিষ্কর্মা, বাউকুলে, ভবঘুরে—আউমুবিলাহ। আমার জীবন, আমার আত্মা, আমার অন্তর, আমার পরিবার ও আমার সম্পদ সবকিছু আমার হাবিব রাসূলুল্লাহ স্বঃ—এর জন্য কুরবান হোক। আমার নবিজি স্বঃ—এর ব্যাপারে তারা এত জঘন্য কথা বলেছিল।

وَإِذَا رَأَوْهُ إِذْ يَتَخَيَّدُونَكَ إِلَّا هُزُّوْا هَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُوْلًا

‘এবং তারা যখন আপনাকে দেখে, আপনাকে কেবল বিদ্রুপের পাত্ররূপে গ্রহণ করে। তারা বলে, এই-ই কি সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ রাসূল করে প্রেরণ করেছেন?’ (সূরা আল-ফুরকান, ৪১)

আল্লাহ ﷻ বলছেন, তারা বিদ্রুপ করে। বিদ্রুপ ও হাসি-তামাশার লক্ষ্যবস্তু হওয়া অত্যন্ত কষ্টের। তারা বলেছিল, আল্লাহ কি এই লোককে রাসূল করে পাঠিয়েছেন? একে? আল্লাহ কি এর চেয়ে ভালো কাউকে পেলেন না? তারা সবাই বসে হাসি-তামাশা করতে করতে বলত,

هَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُوْلًا

‘এই-ই কি সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ রাসূল করে প্রেরণ করেছেন?’

তারা ঘৃণাভরে তাঁর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে এবং বলত আল্লাহ কি এই লোকের চেয়ে ভালো আর কাউকে পেলেন না?

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِثَيْنِ عَظِيْمٍ

‘তারা বলে, কুরআন কেন দুই জনপদের কোনো প্রধান ব্যক্তির ওপর অবতীর্ণ হলো না?’ (সূরা আয-যুখরুফ, ৩১)

অর্থাৎ, মক্কার বাইরের কোনো এক বিখ্যাত ব্যক্তির ওপরে কেন কুরআন নাযিল করা হলো না? আল্লাহ কি তাঁর চেয়ে উত্তম কাউকে খুঁজে পাননি?

কুরআনে বহুবার এ বিষয়টি এসেছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবি ﷺ-গণ হাবশাতে (আবিসিনিয়া) নাজ্জাশির ভূমিতে শরণার্থী। বাকিদের অনেককে নির্ধাতন করা হয় তপ্ত রোদের নিচে। খোদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পাথর মারা হয়। এমন অবস্থায় তিনি আল্লাহ ﷻ-এর কাছ থেকে হিজরতের নির্দেশ পেলেন। পথে তাঁর প্রাণপ্রিয় বন্ধুর সাথে আশ্রয় নিলেন সাপ-বিচ্ছু ভরা এক গুহায়। তাদের দুজনকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। এ খবর ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে চারিদিকে। এমন অবস্থায়ও তিনি সত্য থেকে নড়েননি। সবার করেছেন। কাসিম, আবদুল্লাহ, ইবরাহিম, যয়নব, রুকাইয়াহ ও উম্মু কুলসুম, একের পর এক তাঁর সব সন্তান মৃত্যুবরণ করেছিল। ফাতিমা ﷺ-ই ছিলেন একমাত্র সন্তান, যিনি তাঁর জীবদ্দশার শেষ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ বেঁচে থাকতেই ফাতিমা ﷺ-এর মৃত্যুকাল সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন। একের পর এক বিপদ, একের পর ফিতনা, একের পর এক পরীক্ষা তাঁর ওপর এসেছিল। ব্যক্তিগত ও দাওয়াহ-জীবনের উভয় ক্ষেত্রেই তাঁকে এসবের মোকাবেলা করতে হয়েছিল। অথচ

আজ আমরা আমাদের বাবা-মা কিংবা সন্তানদের কোনো একজনকে হারিয়েই বিমর্ষ হয়ে পড়ি, যেন এ বিপর্যয়ের পর আর ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব না। অথচ একমাত্র ফাতিমা রা ছাড়া রাসূলুল্লাহ স তাঁর সব সন্তানকেই হারিয়েছিলেন। এমনকি জীবনের অন্তিম মুহূর্তগুলোতেও তিনি কষ্ট থেকে মুক্তি পাননি। বুখারি ও মুসলিমের একটি হাদিসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ স যখন তাঁর মৃত্যুশয্যা শায়িত ছিলেন, তখন ইবনু মাসউদ রা তাঁকে দেখতে গেলেন। রাসূলুল্লাহ স তখন স্বরে কাঁপছিলেন। তাঁর দেহে হাত রেখে ইবনু মাসউদ রা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি খুবই অসুস্থ। ইবনু মাসউদ রা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ স বললেন, আমাকে দুজন মানুষের যন্ত্রণা দেয়া হয়েছে। ইবনু মাসউদ রা প্রশ্ন করলেন, আপনার জন্য কি পুরস্কারও দিগুণ হবে? রাসূলুল্লাহ স বললেন, হ্যাঁ, আমি দিগুণ পুরস্কার পাব।^[১০০]

রাসূলুল্লাহ স ওয়াসিলাহর অধিকারী এবং নিঃসন্দেহে এর দাম অত্যন্ত চড়া। কাজেই আপনি যদি আল্লাহ স-এর নিকটবর্তী হতে চান, যদি ওয়াসিলাহর নিকটবর্তী হতে চান এবং আল্লাহ স-এর আরশের যথাসম্ভব কাছাকাছি হতে চান—তবে যত শক্তভাবে সম্ভব এই পথকে আঁকড়ে ধরুন। এই সত্য প্রচার করুন। মানুষকে এর দিকে আহ্বান করুন, এবং অন্তর্ভুক্ত হোন সবারকারীদের। এটাই আপনার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছবার একমাত্র পথ। দাওয়াহর ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ স-এর মহান বৈশিষ্ট্য ছিল সবার। প্রতিশোধ নিতে চাইলে পুরো আরবের জন্য তিনি তাইফবাসীকে দৃষ্টান্ত বানাতে পারতেন। পর্বতের চূড়া থেকে মন্ডার উপত্যকা পর্যন্ত প্রবাহিত হতো তাইফবাসীদের রক্ত এবং কুরাইশসহ সমস্ত আরব উপদ্বীপের সকলে জানতে পারত যে রাসূলুল্লাহ স-এর অব্যাহত হবার পরিণাম কী। কোনো দিনই তারা এই শিক্ষা ভুলতে পারত না। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁর যেকোনো হুকুম বাস্তবায়নে প্রস্তুত পর্বতের ফেরেশতাদের উদ্দেশে তিনি স বলেছিলেন, ওদের ছেড়ে দাও, হয়তো তাদের মধ্য থেকে এমন কেউ আসবে যে আল্লাহ স-এর ইবাদাত করবে।^[১০১] যখনই কোনো বিপদ এসেছে, পরীক্ষা এসেছে, রাসূলুল্লাহ স আরও বেশি আশা ও উদ্যম নিয়ে তাঁর দাওয়াহর দায়িত্বে বাঁপিয়ে পড়েছেন। বিপদ যত বৃদ্ধি পেয়েছে ততই তিনি সুনিশ্চিত হয়েছেন বিজয়ের ব্যাপারে। কেননা, তাঁর চোখের সামনে ছিল সেই আয়াত—ফাসবির। কারণ, সবার ব্যতীত বিজয় আসে না। এ শিক্ষা সব সময় মনে রাখবেন।

একজন দাঈ তাঁর কঠিনতম মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি আশাবাদী হবে :

সবচেয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন মুহূর্তগুলোতে সাহাবি রা-দের অনুপ্রাণিত করতে রাসূলুল্লাহ স সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক ভবিষ্যদ্বাণীগুলো শোনাতে। এ থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, পরিস্থিতি যখন অন্য সবার কাছে সবচেয়ে তিক্ত ও কঠিন মনে হয়, একজন দাঈ সে মুহূর্তেই

সবচেয়ে বেশি আশার আলো দেখতে পান। বিপদের মুহূর্তগুলোতে একজন দাঈ হবেন সুস্থির, আশ্বস্ত, আত্মবিশ্বাসে দৃঢ়। কারণ, তিনি জানেন বিজয় নিকটবর্তী এবং তিনি জানেন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে হাল ধরাই তাঁর দায়িত্ব।

দেখুন, বিজয়ের প্রতিশ্রুতিগুলো কীভাবে কঠিনতম বিপদের সময়গুলোতে এসেছে। খন্দকের দিনগুলো ছিল উম্মাহর সবচেয়ে বিপদসংকুল মুহূর্তগুলোর অন্যতম। মরুভূমির হাড় কাঁপানো ঠান্ডার সাথে যুক্ত হয়েছিল ঝড় ও শিলাবাণী। সাহাবি রাঃ-গণ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং সমগ্র দুনিয়া যেন তাদের বিরুদ্ধে একত্রীভূত হয়েছিল।

هَٰذَا لِكَيْ يُثْبِتَ الْمُؤْمِنُونَ وَيُزْزِلُوا زُلْزَالًا شَدِيدًا

'সে সময়ে মুমিনরা পরীক্ষিত হয়েছিল এবং তারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হচ্ছিল।' (সূরা আয-যুবরুফ, ৩১)

তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। গাতফান, নাজদ, মুররাহ, আশজা, কুরাইশসহ সব গোত্র তাদের বিরুদ্ধে এক হয়েছিল। শেষ মুহূর্তে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল মদীনার উপকণ্ঠে বাস করা ইহুদিরা। কিন্তু গাঢ় অন্ধকারের এ সময়ে রাসূলুল্লাহ সঃ ছিলেন আশাবাদী। পুরো দুনিয়া তার বিরুদ্ধে এক হয়ে দাঁড়িয়েছে, সম্মিলিত সেনাদল তাঁর সামনে আর তিনি বলছেন, আমরা অবশ্যই বিজয়ী হব। আমরা শুধু এই শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়ী হব না, আমরা বিজয়ী হব দুই সুপারপাওয়ার রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যের ওপরেও। এমন এক অবস্থায় তিনি এ কথা বলেছিলেন যখন দুনিয়ার বুক থেকে তাঁর দাওয়ারের নাম ও নিশানাটুকু মুছে ফেলতে শত্রুরা একত্র হয়ে তাঁকে ঘিরে ফেলেছে। রাসূলুল্লাহ সঃ-সহ ইসলাম ও মুসলিমদের নিশিচহ্ন করে দেয়াই ছিল সম্মিলিত কুফকার বাহিনীর উদ্দেশ্য। সেই ভয়ংকর পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছিলেন, সমগ্র সানআহর ওপর আমরা বিজয়ী হব। আমরা বিজয়ী হব পূর্ব-পশ্চিমের ওপর, মধ্যবর্তী অঞ্চলের ওপর। পুরো দুনিয়া হবে আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন।^[১৩৩]

অন্তরে ব্যাধিগ্রস্তরা বলছিল, তোমরা কি এই ব্যক্তির কথা বিশ্বাস করছ? যে লোক জান বাঁচাতে পরিখা খুঁড়ছে সে কিনা বলছে দুনিয়ার সুপার পাওয়ারগুলো তাঁর কাছে পরাজিত হবে? আমরা তো আজ নিজেদেরও রক্ষা করতে পারছি না। কয়েক কদম দূরে গিয়ে প্রাকৃতিক কাজ সারতেও আমরা ভয় পাচ্ছি, আর সে তোমাদের সমগ্র দুনিয়ার ওপর কর্তৃত্বের কথা শোনাচ্ছে?

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا

'এবং যখন মুনাফিক ও যাদের অন্তরে রোগ (সংশয়) ছিল তারা বলছিল, আল্লাহ ও রাসূল আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা প্রতারণা বৈ কিছুই নয়।' (সূরা আল-আহযাব, ১২)

কিন্তু সেই অন্ধকার মুহূর্তে পরিস্থিতির অবনতির সাথে সাথে মজবুত হচ্ছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মুমিনদের ঈমান। পরিস্থিতি যত খারাপ হয়, তাঁদের ঈমান তত বৃদ্ধি পায়। যখন ঝড়বৃষ্টি শুরু হলো ঈমান আরও মজবুত হলো। শেষ মুহূর্তে গোত্রগুলো যখন বিশ্বাসঘাতকতা করল, তাদের ঈমান আরও মজবুত হলো। সবশেষে ১০ হাজারের সেনাবাহিনী কয়েক গজের ব্যবধানে এসে দাঁড়াল।

আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَخْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا

‘এবং মুমিনরা যখন শত্রুবাহিনীকে দেখল, তারা বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের এরই ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন। আর এতে তাঁদের ঈমান ও আনুগত্যই কেবল বৃদ্ধি পেলে।’ (সূরা আল-আহযাব, ২২)

মুমিনরা বলল, আমরা তো এরই প্রতীক্ষায় ছিলাম। এই সেই চরম বিপদের মুহূর্ত, কিন্তু আমরা এরই জন্য অপেক্ষা করছিলাম। একজন দাঈ যতক্ষণ সত্য ও সঠিক পথের ওপর থাকবে, বিপদ ও প্রতিকূলতার সাথে সাথে তাঁর আশা ও আত্মবিশ্বাস বাড়তে থাকবে। আল্লাহ ﷻ-এর আয়াতের প্রতি তাঁর আশা-ভরসাও তত বাড়তে থাকবে। রাত চিরস্থায়ী হয় না। রাত তো মাত্র কয়েক ঘণ্টার, তারপরই অন্ধকারের বুক চিরে আসে ভোরের সূর্য।

তিরমিযিতে বর্ণিত একটি হাদিসে আছে, সাদ রাঃ রাসূলুল্লাহ সঃ-কে জিজ্ঞেস করলেন,

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟

অর্থাৎ, ইয়া রাসূলুল্লাহ সবচেয়ে বেশি কাকে পরীক্ষা করা হয়?

ইসলামের মূলনীতি ও ধারণাগুলোর ব্যাপারে ধারণা না থাকলে এ প্রশ্নের জবাবে আমি হয়তো বলতাম, সবচেয়ে বেশি পরীক্ষা করা হয় গুনাহগার ব্যক্তিদের। যিনা, ব্যভিচারকারী ও ধর্ষক—এ ধরনের লোকেরা সবচেয়ে বেশি পরীক্ষিত হবে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন,

الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَلَا أَمْثَلَ فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ

‘নবি-রাসূল ও তাঁদের অনুসারীদের। প্রত্যেক ব্যক্তি তার ঈমান অনুযায়ী, তাঁর ধর্মের অবস্থা অনুযায়ী পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। যার ঈমান যত মজবুত হয়, তার পরীক্ষাও তত কঠিন হয়।’

কেউ ধর্মের ওপর মজবুত হওয়াটা কি যথেষ্ট? সে কি নিজেকে সন্তোষজনকভাবে প্রমাণ করতে পেরেছে? না। কারণও ধর্ম যদি মজবুত হয় তবে তাকে আরও পরীক্ষা দেয়া হয়। নিজের আমল,

নিজের দ্বীন্দারির মাধ্যমে যে জামাতের দ্বিতীয় স্তরে পৌঁছানোর ক্ষমতা রাখে, পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁকে তুলে আনা হয় জামাতের তৃতীয় স্তরে। যখন বান্দা জামাতের তৃতীয় স্তরে পৌঁছানোর অবস্থায় আসে, আল্লাহ পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁকে জামাতের আরও ওপরের স্তরে উঠিয়ে নেন। আল্লাহ তাঁর বান্দাকে ভালোবাসেন, তাই তিনি চান আপনি আরও উঁচু স্তরে পৌঁছান। তিনি চান আপনি যতটা সম্ভব আরশের কাছাকাছি অবস্থানে আসুন।

وَأَنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ

আর যদি ঈমান অতটা ময়বুত না হয়, তাহলে তাঁর পরীক্ষাও সে অনুপাতেই হয়।

এমন মানুষ কেবল জামাতের দরজার ভেতরে অবস্থানের সুযোগটুকু পায়। এটাই তার জায়গা এবং সে এখানেই অবস্থান করে।

فَمَا يَبْرُحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرَكَ يَمْسِي عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ

একের পর এক পরীক্ষা আসতে থাকে, যতক্ষণ না বান্দা একেবারে পরিশুদ্ধ হয়ে যায়, নিষ্পাপ অবস্থায় বিদায় নেয় দুনিয়ার বুক থেকে।^(১০০)

আল্লাহ ﷻ আপনাকে পবিত্র করতে চান, পরিশুদ্ধ করতে চান। তিনি চান আপনি নিষ্পাপ অবস্থায় তাঁর মুখোমুখি হবেন যাতে আপনার স্থান হয় তাঁর মহাপবিত্র আরশের কাছে। সোনাকে পরিশুদ্ধ করা হয় আগুনে পুড়িয়ে। যত পোড়ানো হয়, তত তা হয়ে ওঠে খাঁটি ও নিখুঁত। কিন্তু পরিশোধনের এই প্রক্রিয়াটি মোটেও সহজ না। এ জন্য স্বর্ণকে পোড়াতে হয় এক হাজার ডিগ্রী সেলসিয়াসের চেয়েও বেশি উত্তপ্ত আগুনে। তাই পরীক্ষার সম্মুখীন হলে মনে রাখবেন আল্লাহ ﷻ আপনাকে পরিশুদ্ধ করছেন, পবিত্র করছেন। পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ আপনাকে পরিশুদ্ধ ও খাঁটি করতে চান।

আজ সকালে ঘণ্টা খানেক আগে ব্রিটেনের একজন দা'ঈর সাথে কথা বলছিলাম। জনসাধারণ ও যুবকদের দাওয়াহ করতে, তাদের ইলম শেখানোর ব্যাপারে আমি তাঁকে উৎসাহ দিচ্ছিলাম। এটাই ছিল নূর আদ-দীন জিহ্বিকির এই পদ্ধতি এভাবে তিনি একটি প্রজন্ম তৈরি করেছিলেন, আর এটাই সঠিক পদ্ধতি। সেই ভাই বললেন, আমার কোনো লেকচারের কথা ঘোষণা করা হলেই পুলিশ সেটা বন্ধ করে দেয়। আমি বললাম, এই অবস্থা তবু এখানকার (অ্যামেরিকা) চেয়ে ভালো, এখানে মুসলিমরাই বরং এমন আচরণ করে। আমাদের এখানে অনেক মাসজিদ আছে, কিন্তু তাঁর একটিতেও উসুল আস-সালাসাহ পড়াতে দেয়া হয় না। প্রতিটি দারসের জন্য অনেক খুঁজে খুঁজে জায়গা বের করতে হয় এবং কোনোরকম প্রচারণাও আমরা চালাতে পারি না। কারণ, আমাদের এত লোক জায়গা দেয়ার মতো সামর্থ্য নেই। অনেক সময়ই দেখা যায় যে, জায়গার অভাবে বোম্বের চলে যেতে বলতে হয়। আমাদের এই এলাকাতে মাসজিদের

সংখ্যা কতগুলো আমি ঠিক জানি না, তবে ১৫ কিংবা তার বেশিও হতে পারে। এগুলোর মধ্যে কোনো একটি মাসজিদ থেকে আমাকে কখনো বক্তব্য দেয়ার জন্য আমন্ত্রণ করা হয় না, সুযোগও দেয়া হয় না। দু-সপ্তাহ আগে হঠাৎ করে এক মাসজিদের ব্যবস্থাপনায় কিছু অদল-বদল হলো। তারা বড় আকারের একটি ইভেন্ট আয়োজন করছিল, সেখানে একজন ব্যক্তি-আল্লাহ ﷻ তাকে উত্তম প্রতিদান দিন-বললেন, আমি শায়খ আহমাদকে আমন্ত্রণ জানাব এবং তিনি তা-ই করলেন। আমি বললাম, আমার আপত্তি নেই কিন্তু আপনি দেখুন অন্যান্য লোকজন এতে রাজি কি না। পোস্টার ছাপানোমাত্রই লোকেরা বলাবলি করতে শুরু করল, সাবধান! এই লোকের পেছনে তো অ্যামেরিকান সরকারের নজরদারি আছে, আমরা চাই না সে এখানে আসুক। কীভাবে আপনারা এমন লোককে আমন্ত্রণ জানান?

আমি সব সময় বলি, আমাদের কথায় কোনো ভুল থাকলে আসুন বিতর্ক হোক। আমরা সব সময় বিতর্কের জন্য প্রস্তুত, আর বিতর্কের ময়দান তো বিস্তৃত। কিন্তু যেহেতু আমাদের প্রতিপক্ষ হলো মর্ডানিস্ট, গোমরাহ এবং এ-জাতীয় অন্যান্য লোকজন, তাই বিতর্কের পর আমরা মুবাহালা^{১৩৭} করব। দেখা যাক কারা আসলে ভুলের ওপর আছে। বিতর্কের পর দুপক্ষ দুজা করবে-যে পথভ্রষ্ট, যে সত্য থেকে বিচ্যুত, যে ভুলের ওপর আছে, যে তাওহীদের পথের বদলে অন্য কোনো মতাদর্শ বেছে নিয়েছে তার ওপর যেন আল্লাহ ﷻ-এর গযব নেমে আসে। আসুন। ইন শা আল্লাহ একটি ভুলও তারা দেখাতে পারবে না, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা নির্ভুল হবার দাবি করি না। আমি গর্ব করছি না, অহংকারও করছি না, কিন্তু আসুন বিতর্ক হোক। বিইয়নিল্লাহি তাআলা, উপস্থিত সকলে দেখতে পাবে কারা আসলে বিদ্রূপের উপযুক্ত। কুফযারদের সৃষ্টি অর্জনের জন্য মুসলিম ভাইদের আক্রমণ করা এই বিভ্রান্ত মর্ডানিস্টরাই। অনেক সময় আপনি ডানে-বামে তাকিয়েও একজন সমর্থক দেখতে পাবেন না। আবার অনেক সময় প্রচুর কোলাহল শুনতে পাবেন, কিন্তু কাউকে পাশে পাবেন না। উসুল আস-সালাসাহ নিয়ে আমাদের আলোচনার দশটি দারস সম্পন্ন হলো। এর মাঝে আপনারা কি এমন কোনো কিছু পেয়েছেন যেটা দ্বীনের সাধারণ বিষয়বস্তুর মধ্যে পড়ে না? মূলত এগুলো হচ্ছে একেবারে প্রাথমিক জ্ঞান, যা ছেলে-বুড়ো সবারই জানা উচিত।

বর্তমানের মাসজিদগুলোর অবস্থা মুহাম্মাদ ইকবালের কিছু কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি

১৩৭ 'মুবাহালা' শব্দটি আরবি 'বাহলাহ' থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ 'অভিসম্পাত'। আক্ষরিক অর্থে 'মুবাহালা' শব্দটির অর্থ একে অন্যের ওপর অভিসম্পাত করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ নাযরানের খ্রিষ্টানদের সাথে মুবাহালা করেন। ৯নং হিজরি সনের ২৪শে যুলহিজ্জাহ মুবাহালার আয়োজন করা হয়। সূরা আলি ইমরানের ৬১ নং আয়াতটি এ সম্পর্কেই নাযিল হয়েছিল :

لَمَّا جَاءَكَ يَهُدَىٰ مِنْ بُنْدٍ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَلْيُنَادِلْ مُنَادٍ نَدَىٰ أَتَيْنَاهُ وَأَتَيْنَاهُكُمْ وَأَتَيْنَاهُكُمْ وَأَتَيْنَاهُكُمْ وَأَتَيْنَاهُكُمْ
وَأَتَيْنَاهُكُمْ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَكُمْ فَتَبَيَّنَ لَكُمْ فَتَبَيَّنَ لَكُمْ فَتَبَيَّنَ لَكُمْ فَتَبَيَّنَ لَكُمْ

'তোমার নিকট সত্য সংবাদ এসে যাওয়ার পর যদি এ সম্পর্কে তোমার সাথে কেউ বিবাদ করে, তাহলে বলো, এসো, আমরা ডেকে নিই আমাদের পুত্রদের এবং তোমাদের পুত্রদের এবং আমাদের স্ত্রীদের ও তোমাদের স্ত্রীদের এবং আমাদের নিজেরদের ও তোমাদের নিজেরদের আর তারপর চলো আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা করি এবং তাদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত করি যারা মিথ্যাবাদী।'

বলেছিলেন,

وجلجلة الأذان بكل حي- ولكن أين صوت من بلال
مناشركم علت في كل حي- ومسجدكم من العباد خال

আযানের ধ্বনি তো বাজে চারিদিকে, কিন্তু কোথা সেই বিলালের সুর?
চারিদিকে কত সুউচ্চ মিনার, কিন্তু মাসজিদ তো হয়ে গেছে আবেদশূন্য।

আমি তাঁর অনুকরণে, কিছুটা বদলে বলব,

ومسجدكم من صيحة الحق خال

প্রতিদিন আপনি মাসজিদে গিয়ে শুনতে পান নতুন মাসজিদ বানানোর জন্য সাদাকাহ তোলা হচ্ছে। একের পর এক ইটের গাঁথুনি ফেলা হয়, একের পর মাসজিদ তৈরি হয়

ولكن أين صوت من بلال

কিন্তু কোথায় সেই বিলালের কণ্ঠস্বর?

যখন কাফিরদের ওপর কোনো দুর্যোগ আসে এরা নিন্দা জানাতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু যখন বিপর্যয় আসে কোনো মুসলিমের ওপর, ওয়াল্লাহি আশেপাশে কাউকে দেখতেও পাওয়া যায় না। কাফিররা আক্রান্ত হলে সবাই এর নিন্দা জানাতে উঠেপড়ে লেগে যায়। অথচ কারাগারে মুমিনদের ওপর যেভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে কিংবা উম্মাহ আজ যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এ নিয়ে কথা বলার একজনও কি পাওয়া যায়?

ومسجدكم من صيحة الحق خال

শহরে শহরে গড়ে উঠেছে সুউচ্চ মিনার, কিন্তু হকের বাণী উচ্চারিত হয় না আজ সেথায়।

এই হলো উম্মাহর আজকের দুঃখজনক বাস্তবতা।

সবর নিয়ে আরও আলোচনায় যাবার আগে সবরের সাথে সম্পর্কিত একটি কাহিনি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই। আমার কাছে একটি ফিকহি প্রশ্ন এসেছে, যারা আত্মহত্যা করেছে তাদের ব্যাপারে আমাদের আচরণ কেমন হবে? মুসলিমরা কি তার কাফন-দাফনের কাজ সম্পন্ন করতে পারবে? আমরা কি তার জন্য দুআ করতে পারব? তার জন্য জানাযার সালাত পড়া কি বৈধ হবে?

আসলে এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা আমার মূল উদ্দেশ্য না, তবে যেহেতু প্রশ্ন করা হয়েছে, আমি উত্তর দিচ্ছি—হ্যাঁ, আত্মহত্যাকারীর জানাযার সালাত পড়া উচিত। এ ব্যাপারে আলিমদের সঠিক মত হচ্ছে, আত্মহত্যা করা কুফরি না। এটি কবীরা গুনাহ, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে কেবল আত্মহত্যার কারণে কেউ কাফির হয়ে যায় না কিংবা কারও তাওহিদ বাতিল হয়ে যায় না। আত্মহত্যা করা ব্যক্তিও মুসলিম। তাই অবশ্যই তার জানাযা ও দাফন-কাফন সম্পন্ন করা উচিত, অন্যান্য মুগ্নিনদের সাথে তাদের সমাধিস্থ করা উচিত এবং আমাদের উচিত তাদের জন্য দুআ ও ইস্তিগফার করা। তবে আত্মহত্যা করা ব্যক্তি যদি জীবিত অবস্থায় সালাত আদায় না করে, তবে সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি প্রসঙ্গ। যে ব্যক্তি সালাত আদায় করে না, সে কাফির—এ মতটিকেই আমি সঠিক মনে করি।^{১৩৮} এমন ব্যক্তি যদি দাবি করে যে

১৩৮ ইচ্ছাকৃত সালাত পরিত্যাগকারীর ব্যাপারে ইমামগণের দুটি মতাবহ আছে। ইমাম আবু হানিফা, শাফিয়ি ও মালিক রহিমুল্লাহ-এর মতে সালাত পরিত্যাগ করা ফিসক বা কবীরা গুনাহ। তবে তারা তার শাস্তির ব্যাপারে মতবিরোধ করেছেন। ইমাম শাফিয়ি ও মালিক রহিমুল্লাহ-এর মত হলো : তাকে হুদ তথা শারিয়্যাহ-নির্ধারিত শাস্তি হিসেবে হত্যা করা হবে। আর ইমাম আবু হানিফা রহিমুল্লাহ-এর মত হলো : তাকে তা'যিরি তথা শাসনমূলক শাস্তি প্রদান করা হবে, হত্যা করা হবে না। আর ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল, ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, ইবরাহিম আন-নাখ্বি, হাকাম ইবনু উতাইবা, আইয়ুব সাখতিয়ানি, আবু দাউদ আত-তায়ালিসি, ইবনু আবি শাইবাহ, যুহাইর ইবনু হারব রহিমুল্লাহ প্রমুখ ইমামদের মতে কুফর। তাই তাদের মত হলো, তাকে তিন দিন পর্যন্ত তাওবাহর সুযোগ দিতে হবে, তাওবাহ না করলে হত্যা করতে হবে।

সাহাবা রহিমুল্লাহ-দের মধ্য থেকে উমার ইবনুল খাত্তাব, আবদুর রহমান ইবনু আউফ, মুয়ায ইবনু জাবাল, আবু হুরাইরা, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস, জাবির ইবনু আবদিল্লাহ এবং আবু দারদা রহিমুল্লাহ প্রমুখ থেকে এই মতটি বর্ণিত হয়েছে। ইমাম ইবনু রজব হাম্বলি রহিমুল্লাহ তার আমিমুল উলুম ওয়াল হিকাম গ্রন্থে এ ব্যাপারে ইজমার দাবি করেছেন।

অলসতাবশত সে সালাত আদায় করেনি, ভবুও সে কাফির। সালাতের প্রশ্ন এলে হিসেব সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু যদি সে সালাত আদায়কারী হয়, আর তারপর আত্মহত্যা করে, তবে সে কবীরী গুনাহকারী হিসেবে গণ্য হবে। আলিমগণ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক আত্মহত্যাকারী ব্যক্তির জানাযা পড়াতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। কিন্তু এর কারণ হিসেবে তাঁরা বলেন যে, তিনি জানাযা পড়াননি অন্যদের আত্মহত্যা থেকে বিরত রাখার জন্য। আলিম, সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ এবং শাসকদের উচিত আত্মহত্যাকারীর জানাযা পড়া থেকে বিরত থাকা, যাতে তারা অন্যদের আত্মহত্যা থেকে বিরত রাখতে পারেন। কেননা, এর ফলে সবাই চিন্তা করবে আত্মহত্যা করলে তার জানাযা নাও হতে পারে। এই চিন্তা একজন ব্যক্তিকে আত্মহত্যা করার আগে দ্বিতীয়বার মতো ভাবাবে।

এ প্রশ্নগুলো আমার কাছে এসেছে একজন যুবকের আত্মহত্যার পরিপ্রেক্ষিতে। যুবকটির ঘটনা বিস্ময়কর। সে তেইশ বছর বয়সী এক বাংলাদেশি যুবক। কুরআনের হাফিজ। সে সালাতের ব্যাপারে সচেতন ছিল, কেউ তাকে কখনো এক ওয়াস্ত সালাত কাযা করতে দেখেনি। এমনকি আত্মহত্যার দিনও সে যুহর ও আসরের সালাত আদায় করেছিল। সে পরিচিত ছিল নেককার হিসেবে। ঘুণাক্ষরেও কেউ ভাবেনি যে এ ধরনের কিছু সে করতে পারে। মানুষের কাছ থেকে তার ব্যাপারে বারবার যা শুনেছি সেটুকুই আপনাদের বলছি। ছেলেটির লম্বা দাড়ি ছিল, তার সব আলোচনার একমাত্র বিষয় ছিল ইসলাম। আসরের কয়েক ঘণ্টা পর গৃহপরিচারিকা রুমে গিয়ে তাকে দড়ির সাথে বুলবুল অবস্থায় দেখতে পায়।

আরেক বোনের ঘটনা, তিনি প্রথমে আমাকে টেক্সট করেছিলেন। তারপর আনুমানিক ভোর চারটার দিকে আমাকে ফোন করে বললেন, তিনি বাথরুমে ঢুকে হাতের কবজির রং কাটার চেষ্টা করছেন। আমাকে যখন ফোন করেছেন তখন অলরেডি হাত কাটা শুরু করে দিয়েছেন। আমি তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। বললেন, স্বামীর সাথে কথা কাটাকাটি হয়েছে (আসলে সেটা বেশ বড়সড় রকমের ঝগড়া ছিল)। আমি বললাম, তার সাথে ঝগড়ার কারণে আপনি জাহান্নামে এক মিলিসেকেন্ড শাস্তি ভোগ করবেন, আপনার কাছে কি এটা সঠিক মনে হচ্ছে? আলহামদুলিল্লাহ এতে কাজ হলো। তিনি হাত কাটা বন্ধ করলেন। এখন তাঁর অবস্থা ভালো। কিন্তু একবার ভাবুন, তিনি যদি সেদিন আত্মহত্যা করে ফেলতেন, তাহলে আজ কী অবস্থা দাঁড়াত? আল্লাহ ﷻ তাঁকে, তাঁর সন্তানদের এবং আমাদের বোনদের প্রশান্তি ও সুখময় জীবন দান করুন।

মানুষ আরামে থাকা অবস্থায় সবরের বিষয়টিকে অবহেলা করে। অনেকেই সবর-সম্পর্কিত আলোচনা ও শিক্ষাগুলো গভীরভাবে অনুধাবন করেন না। মূলত এ কারণে এ-জাতীয় সমস্যাগুলো দেখা দেয়। যাদের সবরের সক্ষমতা নেই, তারা পরীক্ষা, হতাশা, দুশ্চিন্তা ও দুঃসময়ে নিজেদের বাঁচাতে পারে না। একদিন এভাবে মানুষ ঈমানহারা হয় কিংবা তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। কেউ কেউ এগুলোর দ্বারা এমনভাবে আক্রান্ত হয় যে, একেবারে

পাগল হয়ে যায়। অনেকে চিন্তা করে আত্মহত্যার কথা। কিন্তু মাত্র একটি আয়াত কিংবা হাদিস, সবর-বিষয়ক কোনো কাহিনি অথবা ওপরে উল্লেখ করা ঘটনাগুলোর মতো দৃষ্টান্ত যদি কারও মাথায় থাকে, তবে সাথে সাথে সে এ চিন্তা থেকে সরে আসবে। এই ঘটনাগুলো উল্লেখ করার মূল উদ্দেশ্য আসলে এটাই ছিল যে, আপনারা এগুলো অন্তরে বসিয়ে নেবেন।

সত্যের পথ দুঃখ-কষ্টে ঘেরা :

সবর নিয়ে আমরা বেশ লম্বা আলোচনা করেছি। এ আলোচনার মূল শিক্ষা হলো হকের অনুসারী ব্যক্তির জীবনে দুঃখ-কষ্ট আসাটা খুব স্বাভাবিক। বহু বছর আগে আমি ইবনু হায়ম رحمہ اللہ-এর একটি লেখা পড়েছিলাম, যেখানে তিনি বলেছিলেন, যে ব্যক্তি হকের ওপর আছে অথচ সে মনে করে তাকে কোনো দিন কোনো দুঃখ-কষ্ট, পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে না, সে উদ্ভ্রান্ত। আপনি যদি হক পথে থেকেও আশা করেন যে আপনাকে কোনো বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হবে না, তাহলে আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

পরীক্ষিত হওয়া ছাড়া কেউ ইমাম হতে পারে না। এমন একজন ইমাম পাবেন না যিনি পরীক্ষিত হননি।

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَمًا يَهْتَدُونَ بِأَمْرِ لَنَا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

‘এবং যখন তারা ছিল সবরকারী, আমি তাদের (বনি ইসরাইল) মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার আদেশে লোকদের পথপ্রদর্শন করত...।’ (সূরা আস-সাজ্দাহ, ২৪)

আল্লাহ ﷻ বলছেন, আমি তাদের মাঝে থেকে ইমাম বা নেতা নির্বাচন করেছিলাম। কখন?

যখন তারা ছিল সবরকারী।

এই দ্বীন মহান, একমাত্র মহানেরাই একে বহনের ক্ষমতা রাখে। তারা মহান হয়ে ওঠেন ক্রমাগত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে। একদিন না একদিন সব পরীক্ষার অবসান ঘটে। একসময় মেঘ কেটে যায়, পরীক্ষাও একসময় শেষ হয়। যে পরীক্ষা, যে বিপদই আসুক না কেন একদিন তা দূরীভূত হবে অথবা আপনিই পরীক্ষাকে রেখে গাফুরুর রাহীমের কাছে চলে যাবেন। পরীক্ষা চলাকালীন হয়তো আপনার মৃত্যু আসবে। অনেক আলিম বলে থাকেন, প্রতিটি জিনিসই শুরুতে ছোট থাকে আর সময়ের সাথে সাথে তা বড় হয়, ব্যতিক্রম হলো পরীক্ষা। সুবহান আল্লাহ, পরীক্ষা শুরুতে বেশ বড় আকারে দেখা দেয় কিন্তু সময়ের সাথে আস্তে আস্তে তা মলিন হতে থাকে, একসময় ক্ষুদ্র আকার ধারণ করে। পরীক্ষা হলো মুমিনের সম্মান এবং পরিশুদ্ধির উপায়।

ইমাম আহমাদ رحمہ اللہ তাঁর কিতাবুয যুহদ ও মুসনাদে একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। আবু সাইদ

আল-খুদরি রাঃ রাসূলুল্লাহ সঃ-এর কাছে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সঃ মৃত্যুশয্যায় শায়িত। তিনি রাসূলুল্লাহ সঃ-এর দেহে হাত রাখলেন, বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার এত স্বর যে আমি কাপড়ের ওপর দিয়েও আপনার শরীরে হাত রাখতে পারছি না। রাসূলুল্লাহ সঃ তাঁকে বললেন,

আমরা নবি-রাসূলরা এভাবেই দ্বিগুণ বিপদ-মুসিবতের সম্মুখীন হই, ঠিক যেভাবে আমরা দ্বিগুণ প্রতিদান পেয়ে থাকি। একজন নবি উকুনের সংক্রমণ দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছিলেন। তাঁর শরীরে উকুন বাসা বেঁধেছিল, কুঁড়ে কুঁড়ে তাঁর মাংস খেয়েছিল এবং এভাবেই যন্ত্রণায় তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। অনেক নবি-রাসূল এত বেশি দরিদ্র ছিলেন, অনাহারের কারণে এত দুর্বল ছিলেন যে একটিমাত্র জোকা কিংবা 'আবা'র (কমদামি উলের বস্ত্র) ওজন তাঁরা সহ্য করতে পারতেন না। আরেক বর্ণনায় অয়ছ, তাঁরা একটি জোকা উঁচু করে তুলে ধরতে পারতেন না। অভুক্ত থাকার কারণে তাঁরা এতটা দুর্বল ছিলেন যে, একটি পাতলা জামাও তাঁদের কাছে এত ভারী মনে হতো। সেটা গায়ে দিয়ে হাঁটতে পারতেন না। দারিদ্র্যের কশাঘাতে ক্লিষ্ট তাঁদের দুর্বল, শীর্ণকায় দেহ একটি কাপড়ের ভারও বহন করতে পারত না।

হাদিসটি কি শুধু এতটুকু? না, সুবহানাল্লাহ! তারপর রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন,

‘তাঁরা এই পরীক্ষাতে সেভাবে সন্তুষ্ট ছিলেন, যেভাবে তোমরা। তোমাদের সমৃদ্ধি নিয়ে সন্তুষ্ট।’^(১০৯)

আল্লাহ সঃ বলেন :

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ مَسْتَهْزِئِينَ
وَالضُّرَّاءُ وَرُلُّوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرَ اللَّهُ ۚ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, অথচ সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করোনি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের ওপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। আর এমনভাবে শিহরিত হতে হয়েছে যাতে নবি ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তাঁদের পর্বস্ত্র এ কথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য! তোমরা শুনে নাও, আল্লাহর সাহায্যে একান্তই নিকটবর্তী। (সূরা আল-বাকারাহ, ২১৪)

আপনি কি মনে করছেন আপনি জান্নাতে যাবেন যখন জান্নাতবাসীদের একজন হলেন আশ্শার রাঃ? আপনি আর আমি কি সেই জান্নাতে যাব যেখানে আশ্শার রাঃ গিয়েছেন? তিনি যেসব পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং আল্লাহ সঃ-এর স্বার্থে সহ্য করেছিলেন, আপনি আর আমি কি তার ছিটেফোঁটাও দ্বীনের জন্য করেছি? তারপরও কি আমরা তাঁর সমান মর্যাদা পাব? আমিও কি সেই একই জান্নাতে যাব যেখানে বিলাল রাঃ যাবেন? অথচ বিলাল রাঃ পরীক্ষিত হয়েছিলেন আর তিনি ছিলেন পরীক্ষায় দৃঢ়। তিনি আর আপনি কি সমান? আপনি

কি ধরে নিয়েছেন যে, আপনি জামাতে চলে যাবেন অথচ পূর্ববর্তীদের মতো আপনার ওপর কোনো বিপদ আসবে না?

তাদের ওপর কী কী বিপদ এসেছিল?

مَسَّتْهُمْ النَّبَأُ وَالطَّرَاءُ وَزُلْزَلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

‘তাদের ওপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। আর এমনভাবে শিহরিত হতে হয়েছে যাতে নবি ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তাঁদের পর্যন্ত এ কথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য! তোমরা শুনে নাও, আল্লাহর সাহায্যে একান্তই নিকটবর্তী।’

মুখে ঈমানের দাবি করলেই জামাত পাওয়া যায় না। বিশৃঙ্খলা ও এলোমেলো পথচলার মাধ্যমে জামাত পাওয়া যায় না। জামাত কোনো সস্তা বুলি না। দুঃখ-কষ্ট ও পরীক্ষার মধ্যে দিয়েই কেবল জামাতের দেখা মেলে। অন্ধকার যত ঘনিয়ে আসে, বিজয় তত কাছে আসে, আর জামাতে পৌঁছানো যায় পরীক্ষা ও ফিতনা অতিক্রম করার মাধ্যমে।

পরীক্ষা গুনাহ থেকে পরিশুদ্ধির উপায় :

ইমাম আহমাদ, নাসায়ি, ইবনু হিব্বান, আল-হাকিম ও আল-বাযযার رحمهم الله নিচের হাদিসটি উল্লেখ করেছেন :

একবার এক বেদুইন লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন,

هَلْ أَخَذْتُكَ أَمْ مَلَمْتُكَ

তুমি কি কখনো ‘উম্ম মিলদাম’ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলে?

লোকটি বলল, ‘উম্ম মিলদাম কী?’

রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন,

حَرُّ يَكُونُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ

এটি হলো এক ধরনের স্বর যা চামড়া ও হাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে প্রবেশ করে।

আসলে উম্ম মিলদাম দ্বারা মূলত স্বর বোঝানো হয়। বেদুইনটির কখনো স্বর হয়নি, এমনকি সে জানতই না যে এটি কী। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে আবারও প্রশ্ন করলেন,

فَهَلْ أَخَذَكَ هَذَا الصَّدَاغُ

তোমার কি কখনো মাথাব্যথা হয়েছে?

সে বলল, ‘মাথাব্যথা কী?’

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

عِزُّي يَضْرِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ فِي رَأْسِهِ

স্বাঘুঘটিত কারণে মাথার অভ্যস্তরে অনুভূত ব্যথা।

সে বলল, না, আমার কখনো এমন হয়নি। সে জানতই না মাথাব্যথা কী।

যখন লোকটি চলে গেল, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا

‘কেউ যদি জাহান্নামী কোনো লোক দেখতে চায়, সে যেন একে দেখে নেয়।’^{১৪০০}

এ বেদুইনটি ছিল এমন এক ব্যক্তি যার কখনো স্বপ্ন হয়নি, মাথাব্যথা হয়নি, কোনো ধরনের পরীক্ষা তার ওপর আসেনি—আর তার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন কেউ জাহান্নামী কোনো ব্যক্তি দেখতে চাইলে যেন এই বেদুইনের দিকে তাকায়। সব সময় যে এমনটা হবে তা নয়, তবে এটাই অধিকাংশ সময় হয়ে থাকে।

এক সহিহ হাদিসে এসেছে, মুমিন গাছের কচি শাখার মতো। গাছের কচি সবুজ শাখা বাতাসে ক্রমাগত ডানে-বামে দোল খেতে থাকে। একজন মুমিনের জন্য পরীক্ষাও তেমনই। জীবনে চলার পথে মুমিন বারবার পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। কচি শাখার মতো তাঁর জীবনও পরীক্ষার দমকা বাতাসে ডানে-বামে দুলতে থাকে। সাধারণত কেউ পরীক্ষার মুখোমুখি না হবার অর্থ হলো, তার অবস্থার ওপরই আল্লাহ ﷻ তাকে ছেড়ে দিয়েছেন। হতে পারে সে জাহান্নামী, নাউযবিলাহ মিন যালিক; কিংবা হতে পারে সেই ব্যক্তি জাহান্নাতে থাকবে একেবারে সর্বনিম্ন স্তরে, তার স্থান হবে রাকবুল আলামিনের আরশ থেকে বহু দূরে। কিন্তু যারা পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হবে উল্টো। এটা জানার কারণে ইন শা আল্লাহ আপনার ঈমান মজবুত হবে—লা সামাহাল্লাহ, আপনাকেও যদি কখনো কোনো বিপদের মুখোমুখি হতে হয়, তবে আপনি সবর করতে পারবেন।

মুসনাদে আহমাদ^{১৪০১} ও সহিহ আত-তারগিব ওয়াত তারহিবে একটি হাদিস এসেছে :

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : الْحَتَّى كَبِيرٌ مِنْ جَهَنَّمَ، فَمَا أَصَابَ الْمُؤْمِنَ مِنْهَا كَانَ حَقَّهُ مِنَ النَّارِ

এই হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বরকে তুলনা করেছেন কামারের হাপর এবং ধাতু পরিশুদ্ধিকরণের সাথে। আমরা জানি, একজন কামার তার হাপরের সাহায্যে ধাতুকে বিশুদ্ধ করে। যেভাবে কামার আগুন, উত্তাপ আর হাতুড়ির মাধ্যমে লোহাকে বিশুদ্ধ করে, স্বরও সেভাবে মুমিনের জাহান্নামের অংশটুকুকে মিটিয়ে দেয়। কামার লোহাকে আগুনে উত্তপ্ত করে, ময়লা ও অপদ্রব্য থেকে মুক্ত হয়ে তা পুরোপুরি বিশুদ্ধ হয়ে ওঠে। তেমনিভাবে একজন মুমিন যখন পরীক্ষা ও মুসিবতের মুখোমুখি হয় (যেমন : এই হাদিসে স্বরের কথা বলা হয়েছে), তখন তার গুনাহগুলোও এভাবে দূর হতে থাকে। এভাবে একসময় সে এমনভাবে পরিশুদ্ধ হয় যার ফলে বিচারের দিন তাকে আর কোনোরকম জিজ্ঞাসাবাদ কিংবা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে না।

ফুযাইল ইবনু আয়ায رحمه الله বলেছেন,

إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا أَكْثَرَ غَمًّا وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا أَرْسَعَ عَلَيْهِ دُنْيَا

আল্লাহ ﷻ যখন কাউকে ভালোবাসেন তখন তার বিপদ ও দুঃখ-কষ্ট বাড়িয়ে দেন। আর তিনি যাদের ঘৃণা করেন, তাদের সমৃদ্ধ জীবন দান করেন।^[১৪২]

সহিহ বুখারিতে আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ

আল্লাহ যার ভালো চান, তাকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে।^[১৪৩]

লক্ষ করুন, এখানে বলা হচ্ছে—‘স্পর্শ করে’। তার মানে আল্লাহ ﷻ একজন মুমিনের জন্য যে দুঃখ-কষ্টই নির্ধারণ করুন না কেন, এমনকি যদি সেটা তার জীবনের প্রথম দিন থেকে শুরু করে একেবারে মৃত্যুর শেষ দিনটি পর্যন্তও হয়, তবু সেটা কেবল স্পর্শই। এর বেশ কিছু না। আল্লাহ ﷻ আপনাকে যে অবস্থায় রাখুন না কেন, যে পরীক্ষা বা বিপদের মুখোমুখি করুন না কেন, সেটা আপনারই গুনাহর কামাই। অল্প কিছু গুনাহর জন্য কিছু পরীক্ষার মুখোমুখি করার মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ আপনার অন্যান্য গুনাহগুলো মাফ করে দেন।

আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

‘তোমাদের ওপর যেসব বিপদ-আপদ পতিত হয়, তা তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেন।’ (সূরা আশ-শুরা, ৩০)

ইবনু হিব্বান, আবু ইয়ালা ৷-সহ আরও অনেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ   বলেছেন, আল্লাহ যখন কাউকে জাম্মাতের এমন কোনো স্তরে পৌঁছাতে চান যেখানে পৌঁছানো ওই ব্যক্তির অ্যমলের দ্বারা সম্ভব না, তখন তিনি তাকে বিপদাপদ দ্বারা আক্রান্ত করেন যাতে সে ওই উচ্চ স্তরে পৌঁছতে পারে। ধরুন, আপনার আমলের মাধ্যমে আপনি বড়জোর জাম্মাতের দ্বিতীয় স্তরে পৌঁছতে পারবেন। কিন্তু আল্লাহ   আপনাকে নিয়ে যেতে চান জাম্মাতের সপ্তম স্তরে। তিনি চান আপনার জাম্মাতের প্রাসাদের ছাদ হোক তাঁর আরশ। এমন অবস্থাতেই পরীক্ষা ও বিপদ আসে। আপনাকে পরীক্ষার মুখোমুখি করা হয় যাতে আল্লাহ   আপনার অবস্থান আরও উঁচুতে, জাম্মাতের সর্বোচ্চ স্তরে—সপ্তম স্তরে—নিয়ে যেতে পারেন।

যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আল্লাহ  -এর সাথে আছেন, যতক্ষণ আপনার অন্তর আল্লাহ  -এর সাথে জুড়ে আছে, হৃদয় আল্লাহ  -এর কৃতজ্ঞতায় বিনম্র ও জিহ্বা আল্লাহ  -এর ঘিকিরে সচল আছে, যতক্ষণ আপনি সবর অবলম্বন করে চলছেন, ততক্ষণ হতাশ হবার কিছু নেই। আল্লাহ   আমাদের কৃতজ্ঞ, প্রশংসাকারী ও সবারকারী বান্দা হিসেবে কবুল করুন। পরীক্ষা জীবনের এক চরম বাস্তবতা। একজন দা'ঈ ও মুসলিমের জীবনে পরীক্ষা থাকবে, এটাই চূড়ান্ত সত্য। তাই আমাদের সবর করা শিখতে হবে। একে মনে করতে হবে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর সবরের অর্থ হলো সত্যের ওপর অবিচল থাকা। আপনি একা আছেন নাকি আপনার সাথে অনেক অনুসারী আছে, তার কোনো গুরুত্ব নেই। তবে দাওয়াহর ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় আপনি আশেপাশে কাউকে পাবেন না কিংবা পেলেও খুব অল্পসংখ্যক মানুষই হয়তো আপনার সাথে থাকবে। এমনটাই হয়ে আসছে এবং এটাই নিয়ম।

ফুয়াইল ইবনু আয়ায   বলেছেন,

الزم طريق الهدى، ولا يغرك قلة السالكين
وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين

‘হিদায়াতের পথ আঁকড়ে থাকো, হতাশ হোয়ো না অনুসারীদের সংখ্যা কম দেখে।

সাবধান হও ভ্রষ্টপথের ব্যাপারে, শৌকায় পোড়ো না ধ্বংসপ্রাপ্তদের সংখ্যাধিক্য দেখে।’^[১০০]

নিয়্যাতের গুরুত্ব :

আপনার অঙ্গীকারকে নবায়ন করুন। প্রতিদিন আপনার নিয়্যাত নবায়ন করুন। দিনে একবার না, বারবার। প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি সিদ্ধান্তের আগে নিশ্চিত হয়ে নিন আপনার নিয়্যাত ঠিক আছে কি না। আপনার নিয়্যাতকে ঠিক করে নিন প্রতিটি কথা, প্রতিটি লেখা, দাওয়াহর প্রতিটি পদক্ষেপের আগে। বিপদের মুহূর্তে নিয়্যাতের শুদ্ধতা আপনাকে সবরের শক্তি জোগাবে। কখনো যদি কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হন, আপনার পাশে কাউকে না

পান, আপনার কি মনে হয় আল্লাহ ﷻ ছাড়া আর কেউ তখন আপনার সাহায্যে আসবে?

يَوْمَ يَبْعَثُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ○ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ○ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ

'সেদিন পলায়ন করবে মানুষ তার ভ্রাতার কাছ থেকে, তার মাতা, তার পিতা, তার পত্নী ও তার সন্তানদের কাছ থেকে।' (সূরা আবাসা, ৩৪-৩৬)

দুনিয়াতে যদি তারা আপনাকে সাহায্য না করে, আপনার কি মনে হয় আখিরাতে তারা আপনার কোনো উপকারে আসবে? যখন পরীক্ষা আপনাকে বিহ্বল করে ফেলবে, যখন প্রবল প্রতিপক্ষের সামনে নিজেকে একাকী আবিষ্কার করবেন, মনে রাখবেন আল্লাহ ﷻ-ই আপনার জন্য যথেষ্ট। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ﷻ তাঁর বান্দাদের জন্য যথেষ্ট। আমরা আসলে তাঁরই মুখাপেক্ষী। প্রশ্ন হলো, কীভাবে আমরা আল্লাহ ﷻ-কে আমাদের পাশে পেতে পারি? দাওয়াহর পথে আপনাকে অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করতে হবে। প্রতিবন্ধক হয়ে যেয়ে আসবে একের পর এক পরীক্ষা ও মুসিবত। এই প্রতিকূলতায় এক আল্লাহ ﷻ ছাড়া আর কাউকে আপনি পাশে পাবেন না। সুতরাং যদি বিপদের মুহূর্তে আল্লাহ ﷻ-কে পাশে চান তবে দুর্যোগের মুখোমুখি হবার আগেই নিশ্চিত করুন যে কেবল তাঁরই সন্তুষ্টির লক্ষ্যে আপনি কাজ করছেন। প্রতিটি পদক্ষেপের আগে নিজেকে প্রশ্ন করুন, আমি কি আল্লাহ ﷻ-এর সন্তুষ্টির জন্য কাজটি করছি? এটা কি ইসলামসম্মত? আল্লাহ ﷻ এতে খুশি হবেন তো? আল্লাহ ﷻ-এর সন্তুষ্টিকেই নিজের উদ্দেশ্য বানিয়ে নিন।

আমাদের সবারই কমবেশি এমন বন্ধুবান্ধব আছে যারা আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। প্রায় সবার এমন অভিজ্ঞতা আছে। এগুলো নিয়ে কথা বলতে গেলে সারাদিন কেটে যাবে। আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আমি কোথাও কিছু বলি না, তবে কখনো কখনো এগুলোর মধ্যে শিক্ষণীয় কিছু বিষয় থাকে যা হয়তো অন্য মুসলিমের জন্য সতর্কতার কারণ হবে। তাই এখানে আমি কিছু কথা বলছি।

আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, জেলে যাবার পর একজন ছাত্র কিংবা সমর্থককেও আমি পাশে পাইনি। কেউ ঝামেলায় জড়াতে চায়নি। একজনকেও পাওয়া যায়নি এ নিয়ে প্রশ্ন করার জন্য। রমাদানের একেবারে শেষদিকে, ঈদুল ফিতরের দুদিন আগে ওরা আমাকে নিয়ে যায়। বন্দিভের প্রথম রাতের পরের সকাল ছিল ঈদুল ফিতর। ঈদের সকাল শুরু করলাম বন্দী হিসেবে। সেই কঠিন মুহূর্তগুলোতে আমার মাকে যে কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছে, তার জন্য আল্লাহ ﷻ তাঁকে জালালের সর্বোচ্চ স্তর দান করুন, আমীন।

জেলে যাবার একরাত আগের কথা। আমি আর বাবা এক ছাত্রের বাড়িতে ইফতারের দাওয়াতে গিয়েছিলাম। আহমাদ জিবরিল আর তার বাবা শাইখ মুসা আসছেন জানতে পেয়ে অনেক মানুষ এসেছিল। লোক বেশি হবার কারণে ইফতারের পর বেশ কিছুক্ষণ আমরা সেখানে কাটিয়ে দিলাম এবং সেখানেই ইশা ও তারাবিহর জামাআত করলাম। পুরো রমাদান মাসজুড়ে

আমি তারাবিহ পড়িয়েছিলাম আরেক জায়গায়। সেই দিন ত্রিশতম পারা শেষ করে কুরআন খতম করার কথা ছিল। সেই ভাইয়ের বাড়িতে বেশ বড়সড় জামাআত হওয়াতে সেদিন ওখানে তারাবিহ পড়লাম। ত্রিশতম পারা শেষ হলো, আমাদের যতমও হয়ে গেল। সালাত শেষে বায় বললেন, কাল যদি ঈদ না হয়, তবে আমাদের বাসায় সবার দাওয়াত রইল। পরদিন ঈদ হবার একটা সম্ভাবনা ছিল। আমাদের একদল বের হয়েছিল ঈদের চাঁদ দেখার জন্য, তবে তারা তখনো আকাশে চাঁদ দেখতে পায়নি। সবাই আমাদের বাড়িতে আমন্ত্রিত হয়েছিল। আল্লাহ ﷻ আমার বাবাকে উত্তম প্রতিদান দিন, তাঁর নেক আমলগুলো কবুল করে নিন। আল্লাহ ﷻ আমার মাকে জামাতুল ফিরদাউস নসিব করুন। আমরা কমপক্ষে দেড় শ থেকে দুই শ লোকের আয়োজন করেছিলাম। সবাই পরদিন আমাদের বাড়িতে এল। এটা একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একদলের খাওয়া শেষ হলে আরেক দল বসতো। আল্লাহ ﷻ আমার মায়ের মর্যাদা বৃদ্ধি করুন, তাঁকে ফিরদাউস পর্যন্ত পৌঁছে দিন। সেই দিনগুলোতে তারাবিহর পর অনেকে আমাকে ঘিরে বসতে উন্মুখ হয়ে থাকত। আমার আজও সবকিছু স্পষ্ট মনে আছে, যেন আমার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে দারস দেয়ার সময় আমার সাথে এত মানুষ হতো যে গাড়িগুলো দেখে মনে হতো কাফেলা যাচ্ছে। আমার পাশে কে বসবে এ নিয়েও তর্ক শুরু হয়ে যেত। এমনকি ভাইয়েরা এসে আমাকে বলেছে, আমার গাড়ি কে চালাবে এ নিয়ে তাদের মাঝে ঝগড়া হয়েছে। ওয়াল্লাহি, এমন ঘটনা বহুবার ঘটেছে।

আমার শুনানির দিনও কোর্ট প্রাসঙ্গে অনেক মানুষ ছিল। প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে সবার কাঁধে কাঁধ লেগে যাচ্ছিল। কিন্তু পার্থক্য হলো, সেই দিন আমি আর বাবা ছাড়া ওখানে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-তে বিশ্বাসী আর একজন মানুষও সেখানে ছিল না। এফবিআই প্রসিকিউটর, সরকারি বাহিনীর এজেন্ট, কাউন্টার-টেরোরিয়মের অফিসার ও কর্মকর্তাদের সবাই সেখানে উপস্থিত ছিল। আমার উকিল আমাকে বলল, 'এই লোকগুলো আপনাদের প্রচণ্ড ঘৃণা করে, আর কোনো শুনানিতে আমি তাদের এমন করতে দেখিনি।' বিচার চলাকালীন আদালতে অনেক মানুষ থাকলে বিচারকের ওপর মানসিক এক ধরনের চাপ কাজ করে। যেহেতু সরকারপক্ষ জানত না কী রায় হবে, তাই তারা অনেক লোক জড়ো করেছিল বিচারকের ওপর চাপ তৈরি করার জন্য। যাতে বিচারক আমাদের শাস্তির মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। উকিল আমাকে বলল, 'এর আগে অন্য কোনো শুনানিতে এত কর্মকর্তা দেখিনি। এরা আসলেই আপনাদের ঘৃণা করে। কিন্তু তারা আপনার এত এত যেসব অনুসারীর কথা বলছে, তারা কোথায়?'

পেছনের দিনগুলোতে ফিরে যাই। ছাত্রদের জন্য আমাদের বাসার ওপরের তলা ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকত। ওয়াল্লাহি, আমি এগুলো শুধু এ জন্য বলছি, যেন সবাই এ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে। এর পেছনে আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। কয়েক দিন আগে আমি আমাদের পুরোনো কফি মেশিনটা দেখছিলাম। আমাদের মেশিনটা ছিল দোকানের বড় মেশিনগুলোর মতো। বাসায় সব সময় কোনো না কোনো অতিথি থাকত, ছোটগুলো দিয়ে আমাদের কাজ

চলত না। কয়েক দিন আগে আবার মেশিনটা চোখে পড়ল। মেশিনটার ওপর এখনো লেখা আছে—এজের ইলম ক্যাফে। ছাত্ররা আমাদের বাড়ির নাম দিয়েছিল আহমাদ জিবরিলের ইলম ক্যাফে।

বাসায় সব সময় মানুষের আসা-যাওয়া করত—শেখা, শেখানো, দাওয়াই চলতে থাকত। আল্লাহ ﷻ আমার মাকে উচ্চ মর্যাদা দান করুন। প্রয়োজনীয় সবকিছুর জোগান দেওয়া, দেখাশোনা, রান্নাবান্না, খাবার পরিবেশন, কফি—এ সবকিছু তিনি একা সামলেছেন। এখনো আমার সেই দিনগুলোর কথা মনে আছে। বয়ান কিংবা হালাকাহ শেষে ভাইরা আমার পেছনে পেছনে আমাদের বাসার বাথরুমের দরজা পর্যন্ত চলে আসত। বাসায় এত মানুষ আসত যে অনেককে বাথরুমের দরজার সামনে বসতে হতো।

আমার মামলার বিচারক ছিল বেশ খাটো। লম্বায় মাত্র পাঁচ ফুট। কিন্তু এই পাঁচ ফুট লম্বা বিচারকের সামনে দাঁড়ানোর জন্য একজন লোকও সেদিন ছিল না। তাহলে আপনারা কি মনে করেন সব আদালতের আদালতে গিয়ে দাঁড়বার দিন আপনার পাশে কাউকে পাবেন? পাঁচ ফুট লম্বা একটা মানুষের সামনে যদি তারা দাঁড়াতে না পারে, তবে আলিমুল খাইব—যার কুরসি সমস্ত আসমান ও জমিনের চেয়েও বিশাল—তাঁর সামনে তারা কীভাবে দাঁড়াবে? কাজেই প্রতিটি পদক্ষেপে আপনার নিয়্যাত যাচাই করুন। এতকিছু বলার কারণ এটাই। প্রতিটি কাজের আগে নিজেকে প্রশ্ন করুন, আপনি কি এটা আল্লাহ ﷻ-এর সন্তুষ্টির জন্য করছেন? কখনো নিজের পাশে অনেক মানুষ দেখতে পেলেও শুধু আল্লাহ ﷻ-এর কথাই ভাবুন। সবকিছু আপনি তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই করছেন তো? কারণ, যখন বিপদ আসবে সবাই আপনার পাশ থেকে উধাও হয়ে যাবে। সেই মুহূর্তে পাশে পাবেন একমাত্র আল্লাহ ﷻ—কেই। আপনি আল্লাহ ﷻ-এর হকের হেফাজত করুন, তিনি আপনাকে হেফাজত করবেন। বিপদের মুহূর্তে ধৈর্যধারণের এটিই সর্বোত্তম পদ্ধতি। ইয়া আল্লাহ, আমি শুধু আপনার জন্যই এটা করছি—সর্বদা সব সময়।

সত্যের ওপর দৃঢ় থাকুন একাকী হলেও :

সুলাইমান আদ-দারানি ﷺ বলেছেন,

لَوْ شَكَ النَّاسُ كُلُّهُمْ فِي الْحَقِّ مَا شَكَّكَتْ فِيهِ وَخَيَّرَ

‘যদি সবাই হকের ব্যাপারে সংশয় পোষণ করে, আর আমি যদি একা হই, তবুও আমি হকের ব্যাপারে সন্দিহান হব না।’^[১৯৫]

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً.....

‘নিশ্চয়ই ইব্রাহীম (একাই) ছিল এক উম্মাহ বা একটি জাতি...!’ (সূরা আন-নাহল, ১২০)

ইব্রাহীম ﷺ ছিলেন একাই একটি উম্মাহ। সহিহ বুখারিতে আছে, ইব্রাহীম ﷺ তাঁর স্ত্রী সারাকে বলেছিলেন, আমি আর তুমি ছাড়া এই দুনিয়ার বুকে আর কোনো মুমিন নেই; দুনিয়ার বুকে মুমিন কেবল আমরা দুজন-ই।

শারহ্ উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআহ কিভাবে ইমাম আল-লালাকায়ি সহিহ সূত্রে ইবনু মাসউদ রহীম-এর এই কওলটি বর্ণনা করেছেন,

الجماعة ما وافق الحق؛ ولو كنت وحدك

জামাআহ সেটাই যা হকের ওপর আছে, এমনকি তুমি যদি একা হও তবুও।^(১৪৬)

যারা হকের ওপর আছে তাঁরাই জামাআহ, তাদের সংখ্যা যতই কমই হোক না কেন। সংখ্যা দেখে কখনো ধোঁকায় পড়বেন না। সংখ্যাধিক্যের কারণে বাতিল কখনো হক হয়ে যায় না। আর হকপন্থীদের কম সংখ্যা তাঁদের ভ্রান্ত হবার প্রমাণ না।

কুরআনে সংখ্যাগরিষ্ঠদের তিরস্কার করা হয়েছে :

সংখ্যাগরিষ্ঠদের ব্যাপারে সাধারণত কুরআনে তিরস্কারই এসেছে। আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَإِنْ تُطِيعُوا أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

‘আর যদি আপনি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মেনে নেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে ছাড়বে।’ (সূরা আল-আনআম, ১১৬)

তিনি বলেন :

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ

‘আপনি যতই আগ্রহী হোন না কেন, অধিকাংশ লোক ঈমান আনার মতো নয়।’ (সূরা ইউসুফ, ১০৩)

فَأَتَى أَكْثَرَ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا

‘কিন্তু অধিকাংশ লোক সত্যকে অস্বীকার না করে থাকেনি।’ (সূরা আল-ইসরা, ৮৯)

১৪৬ এটি আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রহীম-এর মশহুর একটি কওল। বিভিন্ন সনদে, বিভিন্ন শব্দে এটি বর্ণিত হয়েছে। ইমাম লালাকায়ি নিম্নোক্ত শব্দে বিশুদ্ধ সনদে এটি বর্ণনা করেছেন :

إِنَّمَا الْجَمَاعَةُ مَا وَافَقَ طَاعَةَ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتَ رَحْدَكَ

জামাআহ হলো সেটাই, যা আল্লাহ ﷻ-এর আনুগত্যের সাথে মিলে যায়, যদিও তুমি একা হও। (বর্ণনা নং : ১৬০)

لَقَدْ جِئْتَكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ

‘আমি তোমাদের কাছে সত্য পৌঁছিয়েছি; কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই তো সত্যবিমুখ ছিলো।’ (সূরা আয-যুখরুফ, ৭৮)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ

‘নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন আছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়।’ (সূরা আশ-শুআরা, ৮)

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ

‘অনেক মানুষ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, কিন্তু তার সাথে সাথে শিরকও করে।’ (সূরা ইউসুফ, ১০৬)

কুরআনে অল্পসংখ্যকদের প্রশংসা করা হয়েছে :

অপরদিকে কুরআনের এমন বেশকিছু আয়াত রয়েছে যেখানে সংখ্যালঘুদের প্রশংসা করে হয়েছে। আল্লাহ ﷻ বলেন :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ.....

‘(দাউদ বলল) সে তোমার দুশ্চাটিকে নিজের দুশ্চাগুলোর সাথে সংযুক্ত করার দাবি করে তোমার প্রতি অবিচার করেছে। শরিকদের অনেকেই একে অপরের প্রতি ঘৃণা করে থাকে। তবে তারা করে না, যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী ও সৎকর্ম সম্পাদনকারী। অবশ্য এমন লোকের সংখ্যা অল্প...। (সূরা সাদ, ২৪)

আল্লাহ ﷻ নূহ ﷺ-এর প্রসঙ্গে বলেছেন :

وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ

‘অতি অল্পসংখ্যক লোকই তাঁর সাথে ঈমান এনেছিল।’ (সূরা হুদ, ৪০)

অর্থাৎ, নূহ ﷺ-এর সাথে খুব অল্পসংখ্যক লোকই ঈমান এনেছিল।

তালূত-জালূতের ঘটনার ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ বলেন :

فَلَمَّا كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ

‘অতঃপর যখন লড়াইয়ের নির্দেশ হলো, তখন সামান্য কয়েকজন ছাড়া তাদের সবাই ঘুরে দাঁড়াল।’ (সূরা আল-বাকারাহ, ২৪৬)

তিনি আরও বলেন :

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

‘বলত আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা যদি তোমাদের ওপর বিদ্যমান না থাকত, তবে তোমাদের অল্প কয়েকজন ব্যতীত সবাই শয়তানের অনুসরণ করতে শুরু করতো।’ (সূরা আন-নিসা, ৮৩)

সুতরাং স্বল্পসংখ্যক হলেও আল্লাহ ﷻ তাদের প্রশংসা করেছেন হকের অনুসারী হবার কারণে। আর হকের অনুসারীরা সংখ্যায় কম হবে—এটাই তো নিয়ম।

আল্লাহ ﷻ তো সবকিছু জানেন, তারপরও কেন আমাদের পরীক্ষা করেন?

গত অধ্যায়ে আমরা বলেছিলাম,

فليعلمنَّ

(আল্লাহ পরীক্ষা করবেন) যাতে তিনি জেনে নেন...

আল্লাহ পরীক্ষা করেন যাতে তিনি জেনে নিতে পারেন...। এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে—জানার জন্য আল্লাহ ﷻ-এর পরীক্ষা করতে হবে কেন? তিনি তো এমনিতেই সবকিছু জানেন। তাহলে পরীক্ষা করার কী দরকার? আল্লাহ ﷻ যদি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সবকিছু জানেন—ই, তাহলে তিনি পরীক্ষা কেন করবেন?

নিঃসন্দেহে কোনো পর্বতশৃঙ্গ হোক কিংবা কোনো সাগর অথবা নদী, এমন কিছুই নেই যার একেবারে কেন্দ্রস্থল, গভীর থেকে গভীরতম বিন্দু, সবচেয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থান সম্পর্কেও আল্লাহ ﷻ জ্ঞাত নন। এতে কোনো সন্দেহ নেই, কোনো প্রশ্নের অবকাশ নেই। অন্ধকার রাতে কোনো পাথরের ওপর ছুটে চলা কালো পিঁপড়ের পদক্ষেপগুলোও তিনি দেখেন, শোনে। ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের গায়ের ওপর দিয়ে কোনো পিঁপড়া হেঁটে গেলেও হয়তো আমরা টের পাব না, শোনার তো প্রশ্নই আসে না। অথচ সাত আসমানের ওপর থেকে আল্লাহ ﷻ সেই শব্দ শুনতে পান।

وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا زَلْطٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

‘তারই কাছে রয়েছে অদৃশ্য জগৎসমূহের চাবি। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না।

জলে-হলে যা কিছু আছে, তা তিনিই জানেন। তাঁর অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও ঝরে না; মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোনো শস্যকণা কিংবা রসযুক্ত অথবা শুষ্ক বস্তু পড়ে না; যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।' (সূরা আল-আনআম, ৫৯)

কাজেই সবকিছু লিপিবদ্ধ এবং আল্লাহ ﷻ সবকিছু সম্পর্কে অবগত। কিছুদিন আগে আমি আমার প্রিয় ছাত্র মুহাম্মাদের সাথে কথা বলছিলাম। মুহাম্মাদের বয়স সাত বছর, সে ইউকে-তে থাকে। আমি ওকে বলছিলাম, আমাদের বাড়ির পেছনের খোলা আঙিনায় যদি ছোট্ট একটি গাছ থাকত, তাহলে হেমন্তে ঝরে-পড়া পাতাগুলোর সাথে কিছুতেই আমরা পেরে উঠতাম না। কতগুলো পাতা ঝরে পড়ছে, কোনটা কোথায় পড়েছে, কোথায় যাচ্ছে-কিছুতেই আমরা হিসাব রাখতে পারতাম না। একটি ছোট্ট গাছের বেলাতে যদি আমাদের এই অবস্থা হয়, তবে একটি ঘন বনের বেলায় ব্যাপারটা কেমন হবে? গাছপালায় ঘেরা একটি বনে গিয়ে দেবুনা। আচ্ছা চিন্তা করুন তো, পৃথিবীজুড়ে কতগুলো বন আছে, সেগুলোতে কতগুলো গাছ আছে, সেগুলোর কতগুলো পাতা আছে? জেনে রাখুন, প্রতিটি গাছে কতগুলো পাতা আছে, এক একটি পাতা কখন, কোথায়, কোন স্থানে ও কীভাবে ঝরে পড়ছে, ঝরে পড়ার আগে কোথায় ছিল এবং ঝরে পড়ার পর তারা কোথায় যাচ্ছে, এ সবকিছুই আল্লাহ ﷻ জানেন।

وَمَا تَسْطُفُ مِنْ زَرْقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا

তাঁর অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও ঝরে না;

এমনকি মাটির অন্ধকার কিংবা সাগরের গভীর অন্ধকার তলদেশে থাকা এর চেয়েও ক্ষুদ্র শস্যকণা সম্পর্কেও তিনি অজ্ঞাত নন, যা আমি কিংবা আপনি খালি চোখে দেখতেও পারব না।

তাহলে আল্লাহ ﷻ কেন পরীক্ষা করবেন? এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া একেবারেই সহজ। আল্লাহ ﷻ কুরআনে অসংখ্যবার এটি উল্লেখ করেছেন। তেমনই কিছু আয়াত হলো :

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

‘এবং আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী।’ (সূরা আল-আনকাবুত, ৩)

অর্থাৎ, আল্লাহ ﷻ মানুষকে সুখ ও দুঃখের মুহূর্ত দ্বারা পরীক্ষা করবেন যাতে ভালো থেকে মন্দদের আলাদা করা যায়।

وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ

‘অবশ্যই আল্লাহ তাআলা জেনে নেবেন কারা মুমিন ও কারা মুনাব্বিক।’ (সূরা আল-আনকাবুত, ১১)

وَلَتَبْلُؤُنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَتَبْلُؤُنَّكُمْ

‘এবং আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব, যতক্ষণ না আমি তোমাদের মাঝে মুজাহিদ ও সবরকারীদের জেনে নিই এবং আমি তোমাদের অবস্থা পরীক্ষা করি।’ (সূরা মুহাম্মাদ, ৩১)

অর্থাৎ, কারা মুজাহিদ তা জানতে আল্লাহ ﷻ আপনাকে পরীক্ষা করবেন।

وَيَلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ

‘এবং মানুষের মধ্যে (বিপদের) এ দিনগুলোকে আমি অদল-বদল করে থাকি, যাতে আল্লাহ ঈমানদারদের জানতে পারেন এবং তোমাদের মধ্যে কিছু লোককে তিনি শহিদ হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন।’ (সূরা আলি ইমরান, ১৪০)

আল্লাহ ﷻ জেনে নেবেন, কারা মুমিন।

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا فَاتَّبِعُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا

এবং তিনি মুনাফিকদেরও জেনে নেবেন, তাদের বলা হয়েছিল, ‘এসো, আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো কিংবা প্রতিরক্ষা করো...।’ (সূরা আলি ইমরান, ১৬৭)

আল্লাহ ﷻ মুনাফিকদেরও জেনে নেবেন।

وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ

‘আর আমি নাযিল করেছি লোহা, যাতে আছে প্রচণ্ড রণশক্তি এবং মানুষের জন্য বহুবিধ উপকার। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ জেনে নেবেন কে না দেখেই তাঁকে ও তাঁর রাসূলদের সাহায্য করে।’ (সূরা আল-হাদিদ, ২৫)

আল্লাহ ﷻ আমাদের পরীক্ষা করবেন, যাতে তিনি জানতে পারেন, কে তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য কাজ করবে।

সুতরাং এককথায় সব প্রশ্নের জবাব হলো, আল্লাহ ﷻ তাঁর সর্বব্যাপী ইলমের ভিত্তিতে মানুষের জবাবদিহি নেন না, দায়ী করেন না, মানুষকে পুরস্কার বা শাস্তি দেন না; বরং তিনি তা করেন আমাদের আমলের ভিত্তিতে। আল্লাহ ﷻ আমাদের সবকিছু জানেন, তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর অপরিসীম করুণা, ন্যায়বিচার ও সীমাহীন ধৈর্যের কারণে তাঁর ইলমের ওপর ভিত্তি করে আমাদের বিচার করেন না; বরং আমাদের আমলের ভিত্তিতে বিচার করেন। এ কারণেই মানুষের মধ্যে কারা সঠিক ও ভুল, নেককার ও পাপী, এ সবকিছু জানার পরও আল্লাহ ﷻ

আমাদের পরীক্ষা করেন, যাতে আমাদের আমলগুলো আমাদের জন্য প্রমাণ হয়। নেককার ব্যক্তির নেক আমল প্রমাণ করবে সে নেককার এবং পাপাচারীর বদ আমল প্রমাণ করবে তার পাপাচারিতা।

মুমিনের জন্য সবকিছুই কল্যাণকর :

সবরের ব্যাপারে আমরা বিভিন্ন আয়াত, হাদিস ও দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছি কারণ সময়ের সাথে সাথে সবরের পরিমাণ কমতে থাকে। বিপদের মুখোমুখি হবার পর সবর করা ছাড়া আমাদের আর কিছু করার থাকে না। আর সময়ের সাথে সাথে তা ক্রমশ ফিকে হয়ে আসে। তাই এসব দারস থেকে আপনি যা শিখেছেন সবর ধরে রাখার জন্য সেগুলো ব্যবহার করবেন। এগুলো হলো মধু যা আপনার হৃদয়ের বিষণ্ণতার তিক্ততাকে সবরের মিষ্টতায় ভরিয়ে দেবে, সবরের ওপর টিকে থাকার অনুপ্রেরণা দেবে; শক্তি জোগাবে এবং আপনি এ-ও উপলব্ধি করবেন যে আল্লাহ ﷻ যা করেন ভালোর জন্যই করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَخَذِ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ

মুমিনের ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক! সবকিছুই তার জন্য কল্যাণকর, একমাত্র মুমিনদের বেলাতেই এমন হয়ে থাকে।^[১৩৭]

আমার মতে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন ইফকের ঘটনার সময়। এটা যদি সবচেয়ে কঠিন নাও হয় তবুও অন্তত এটুকু বলা যায় যে, এটা ছিল তাঁর জীবনের কঠিনতম পরীক্ষাগুলোর একটি। অভিযোগ আরোপিত হয়েছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মান-আ'ইশা ﷺ-এর ওপর। তাঁর জীবনের সবচেয়ে প্রিয় মানুষটির ব্যাপারে অভিযোগ উঠেছিল। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি কাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন? তিনি তখন বলেছিলেন, আ'ইশা। তিনি আ'ইশা ﷺ-কে নিয়ে গর্বিত ছিলেন, সবার সামনে এ কথা বলেছিলেন। সাফওয়ান ﷺ-এর সম্মানও প্রশংসিত হয়েছিল। আবু বকর ﷺ-কে সবাই অপবাদ দিচ্ছিল। আ'ইশা ﷺ মর্মবেদনা ও কষ্টে কাতর হয়ে পড়েছিলেন, এ ছিল তাঁর জীবনের চরম বেদনাদায়ক মুহূর্ত। আ'ইশা ﷺ আমাদের সম্মান। তিনি আমাদের মা, আমাদের সম্মান, আমাদের গর্ব, আমাদের মর্যাদা। এ ঘটনায় তিনি শোকে ভেঙে পড়েছিলেন, কিন্তু সবশেষে আল্লাহ ﷻ-এর আয়াত নাযিল হলো :

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

‘যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল। তোমরা একে নিজেদের

জন্য খারাপ মনে কোরো না; বরং এটা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক।' (সূরা আন-নূর, ১১)

আল্লাহ ﷻ বললেন, এ তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাঁরা এই পরীক্ষাকে খারাপ মনে করেছিলেন, কিন্তু আল্লাহ ﷻ একে তাঁদের জন্য কল্যাণকর বললেন। এ পরীক্ষার বারাকাহ ও কল্যাণ আজ চৌদ্দ শ বছর পার হবার পরও আমাদের মাঝে রয়ে গেছে। শিয়াদের প্রকৃত রূপ এবং আমাদের মা, উম্মুল মুমিনিন আ'ইশা রাদিহালাহু-এর প্রতি তাদের তীব্র ঘৃণার কথা সবারই জানা আছে। আ'ইশা রাদিহালাহু আমাদের মা। তাদের মা নন, কারণ তিনি কেবল মুমিনদেরই মা। বাস্তবে অনেক আহলুস সুন্নাহর দাবিদারদেরও আমরা দেখতে পাই, যারা তাদের এই মায়ের ব্যাপারে ঈর্ষান্বিত হয় না। থাইরাহ (আত্মমর্যাদাবোধ) বোধ করে না। আপনি কারও মাকে নিয়ে কিছু বললে সে হয়তো সারা জীবনের মতো আপনার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দেবে। অথচ শিয়ারা আমাদের মা আ'ইশা রাদিহালাহু-কে নিয়ে কথা বলে, কিন্তু কিছু আহলুস সুন্নাহর দাবিদার বলে, 'শিয়ারা আমাদের ভাই!' আ'ইশা রাদিহালাহু-কে নিয়ে কথা বললে সমস্যা নেই, কিন্তু নিজের মাকে নিয়ে বললে বিরাট কিছু। আ'ইশা রাদিহালাহু-কে নিয়ে যে কেউ কথা বলতে পারবে, কিন্তু নিজের মায়ের বেলাতে হলেই সমস্যা।

এই ঘটনা যে খারাপ কিছু ছিল না এটা তার খুব সামান্য একটি উদাহরণ। এ থেকে উৎসারিত কল্যাণ ও বারাকাহ আজ চৌদ্দ শ বছর পরও বহাল আছে।

لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمۡ ۚ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمۡ

‘একে নিজেদের জন্য খারাপ মনে কোরো না; বরং এটা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক।’

এটা যেকোনো পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—কখনো কখনো হয়তো আমরা সেটা বুঝতে পারি, কখনো পারি না।

কষ্টদায়ক কথার বিপরীতে সবার করুন :

সবার করুন। আপনাকে নিয়ে বলা বাজে কথা, অভিযোগ, ইসলামের বিধি-নিষেধ মেনে চলার কারণে আপনাকে নিয়ে অন্যদের মাঝে চলা ঠাট্টা-তামাশা এবং তাদের বিভিন্ন বিরক্তিকর আচরণের বিপরীতে সবার করুন। আপনার আগে সালাফদের সাথেও এমন হয়েছে। যদি আপনার নিকাব নিয়ে উপহাস করা হয় কিংবা আপনার দাড়ি, সবার মাঝে আপনার সালাত আদায়, আপনার দাওয়াহ কিংবা সাহাবা রাদিহালাহু ও সালাফদের অনুকরণে কুরআন ও সুন্নাহর ওপর প্রতিষ্ঠিত আপনার আদর্শ নিয়ে যদি আপনাকে উপহাস করা হয়, তবে জেনে রাখুন, আপনার আগের লোকদের ক্ষেত্রেও এমনটা ঘটেছে। যারা আমাদের চেয়ে অনেক উত্তম ছিলেন তাদের সাথেও এমন ঘটেছে।

এক ব্যক্তি ইব্রাহীম ইবনু আদহাম রাদিহালাহু-কে খুব গালাগালি করল; বলল, তুই একটা কুকুর!

ইব্রাহীম ইবনু আদহাম রহিম খুব ধীরস্থির ও শান্তভাবে উত্তর দিলেন, আমি যদি জাম্মাতে যাই, আমার ধারণা আমি কুকুরের চেয়ে ভালো হব; আর যদি জাহাম্মাতে যাই, তাহলে আমি তো কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট। এই বলে তিনি চলে গেলেন। একবার এক বিখ্যাত আলিমকে এক লোক অভিশাপ দিলো, গালিগালাজ করার পর বলল, আমি তোমাকে এমন অপমান করব, এমন ছোট করব যে এটা তোমার কবর পর্যন্ত তোমার সাথে যাবে। তিনি বললেন, বরং এটা (তোমার আমল) তোমাকে অনুসরণ করবে তোমার কবর পর্যন্ত। এ কথা বলেই তিনি হাটা শুরু করলেন। আহনাফ ইবনু কাইস রহিম তাঁর বিচক্ষণতার জন্য পরিচিত ছিলেন। একবার এক লোক এসে তাকে গালমন্দ করা শুরু করল, চিংকার-চোঁচামেচি করতে লাগল। আহনাফ রহিম তাঁর বাসার দেউড়ি পর্যন্ত পৌঁছানোর পর পেছন ফিরে লোকটির দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার যদি আরও কিছু বলার থাকে তবে এখানেই বলো, না হয় এখন যাও। আমি চাই না আশেপাশের ভবঘুরের দল তোমার এসব কথাবার্তা শুনতে পাক, আর তোমার সাথে এমন কোনো আচরণ করুক যা তোমার অপছন্দনীয় হবে। অর্থাৎ, তিনি বলতে চেয়েছিলেন, আমার ভবঘুরে প্রতিবেশীরাও তোমার এসব কথার সাথে একমত হবে না।

ওয়াইস আল-কারনি রহিম-কে ছোট ছেলেরা পাথর ছুড়ে মারত। তিনি কেবল তাদের পাশে দাঁড়িয়ে বলতেন, তোমরা যদি আমাকে মারতেই চাও, তাহলে বড় বড় পাথরগুলো রেখে ছোট ছোট পাথর নাও, নয়তো পা থেকে রক্ত ঝরবে আর আমি কিয়ামুল লাইল আদায় করতে পারব না। মালিক ইবনু দিনার রহিম-কে এক মহিলা বললেন, তুই একটা ভণ্ড। তিনি বললেন, আপনি আমাকে এমন নামে সম্বোধন করলেন যা সমগ্র বসরাবাসীর কেউ কোনো দিন আমার ব্যাপারে কাউকে বলতে শোনেনি। এমন অনেক অগ্রীতিকর ঘটনার সন্মুখীন তাঁরা হয়েছেন, তাঁদের নানাভাবে অভিযুক্ত করা হয়েছে। কেউ একজন সালিম ইবনু আবদিল্লাহ ইবনু উমার রহিম-এর কাছে এসে বলল, তুমি একটা ভণ্ড শাইখ। সালিম রহিম বললেন, তুমি খুব ভুল কিছু বলোনি ভাই, সম্ভবত তুমি ঠিকই বলেছ। এই বলে তিনি চলে গেলেন। এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রহিম-এর কাছে এসে তাঁকে গালিগালাজ করতে শুরু করল। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রহিম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচাতো ভাই-বিজ্ঞ ইমাম, শাইখ ও আলিম। সে থামার পর ইবনু আব্বাস রহিম তাঁর ছাত্র ইকরিমাকে বললেন, এই লোককে জিজ্ঞেস করো, তার কি কিছু লাগবে কি না, যাতে আমরা তার প্রয়োজন পূরণ করতে পারি। লোকটি লজ্জায় মাথা নিচু করে চলে গেল।

এঁরা হলেন আমাদের ইমাম, তাঁরাও এসবের মুখোমুখি হয়েছেন, আর এমনই ছিল তাঁদের প্রতিক্রিয়া। এসব কিছু তাদের ক্রোধান্বিত করেনি। তাঁদের দমাতে পারেনি কিংবা নিজেদের পথ ও পন্থা নিয়ে তাঁদের মাঝে কোনো সন্দেহ-ও দোষ দেয়নি। এমনকি আমাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কেও এসব আচরণ সহ্য করতে হয়েছে। তিনিও এসব থেকে অব্যাহতি পাননি। সহিহ বুখারিতে আছে, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রহিম বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার কিছু মাল বণ্টন করছিলেন, এমন সময় আনসারীদের একজন বলে উঠল, ওয়াল্লাহি এই বণ্টন আল্লাহর

পছন্দ অনুযায়ী হয়নি। আমাদের শ্রিয় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্পদ ভাগ করার ব্যাপারে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। নিঃসন্দেহে এটি খুব মারাত্মক এক বিষয়। এ কথা শোনার পর আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাঃ বললেন, ওয়াল্লাহি, আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ কথা জানাব। ইবনু মাসউদ রাঃ বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন তাঁর সাহাবি রাঃ-দের সাথে ছিলেন, তাঁর কাছে গিয়ে এ কথা জানালাম। এ কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর এতখানি প্রভাব ফেলেছিল যে, সাথে সাথে তাঁর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেল। এটা তাঁর ওপর প্রভাব ফেলেছিল, কারণ তাঁর বিরুদ্ধে সম্পদ বন্টনে বে-ইনসাফির অভিযোগ করা হয়েছিল। যার ঘরে একাধারে তিন দিন কখনো চুলো জ্বলেনি, তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল সম্পদ বন্টনের ব্যাপারে। তাঁর রাঃ চেহারার এমন পরিবর্তন দেখে ইবনু মাসউদ রাঃ আফসোস করতে লাগলেন, কেন তিনি এ কথা তাঁকে জানাতে গেলেন।

তারপর রাসূলুল্লাহ রাঃ বললেন, মুসা রাঃ-কে আমার চেয়েও বেশি কষ্ট দেয়া হয়েছিল, তিনি তা সহ্য করেছেন। নিন্দা ও অপবাদ যদি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ রাঃ-এর ওপর প্রভাবে ফেলে থাকে, তাহলে আপনার ওপরও এসব প্রভাব ফেলতে পারে। কিন্তু দেখুন, রাসূলুল্লাহ রাঃ কীভাবে নিজের আবেগকে সংবরণ করেছেন। তিনি বললেন, মুসা রাঃ-কে তাঁর চেয়েও বেশি কষ্ট দেয়া হয়েছিল, তিনি আমার চেয়েও বেশি সহ্য করেছেন। কাজেই আপনাকেও এভাবে চিন্তা করা করতে হবে, এমন দৃষ্টিভঙ্গি রাখতে হবে।^(১৯৬) এই ঘটনা নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে ইবনু হাজার রাঃ বলেছেন, এ থেকে আমরা জানতে পারি যে, অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্যও মর্মান্তক হওয়া একটি স্বাভাবিক বিষয়। সূতরাং আপনি কাউকে এমন বলতে পারেন না যে, কেন তিনি মানুষের কথা শুনে আপসেট হচ্ছেন, বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছেন; বরং এমন হওয়া তো স্বাভাবিক। তবে কাউকে অন্যায়ভাবে কিছু বলার কারণে যদি সে রাগান্বিত হয়, তবে রাগান্বিত হবার পরও তার উচিত এসব ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ রাঃ-এর আদর্শের অনুসরণ করা। তিনি যেভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করা।

এখানে লক্ষণীয় হলো, রাসূলুল্লাহ রাঃ-এর চেহারায় ফ্রোথের ছাপ ফুটে ওঠেছিল, চেহারার রং বদলে গিয়েছিল। কিন্তু তিনি একে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। কখনো ফ্রোথের কারণে নিজের আচরণকে ইসলামি আচরণের সীমা অতিক্রম করতে দেবেন না। সবর অবলম্বন করুন। যখন আপনার ব্যাপারে অন্যায়ভাবে কিছু বলা হবে, রাসূলুল্লাহ রাঃ যেভাবে মুসা রাঃ-এর কথা স্মরণ করেছিলেন, আপনিও একইভাবে রাসূলুল্লাহ রাঃ-এর কথা স্মরণ করবেন। স্মরণ করবেন রাসূলুল্লাহ রাঃ-কে আপনার চেয়েও বেশি কষ্ট দেয়া হয়েছিল।

مَا يَقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ

‘আপনার সম্পর্কে তো তা-ই বলা হয়, যা বলা হতো আপনার পূর্ববর্তী রাসূলদের সম্পর্কে...’ (সূরা ফুসসিলাত, ৪৩)

আল্লাহ ﷻ তাঁর রাসূল ﷺ-কে বলছেন, এরা আপনাকে যা বলে আপনার পূর্ববর্তী রাসূলদেরও তা-ই বলা হতো, সুতরাং রাগান্বিত হবেন না। কাজেই আপনিও এ থেকে শিক্ষা নিন। নিজের জীবনে এ শিক্ষা প্রয়োগ করুন। আপনাকে যা বলা হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কেও সেই একই কথা বলা হয়েছিল। সুতরাং, শান্ত হোন।

আল্লাহ ﷻ আমাদের সৃষ্টিকর্তা, রিয়কদাতা ও পালনকর্তা। তিনিই মানুষকে রিয়ক দেন, লালন-পালন করেন, রাতের অন্ধকারে রুহ বের করে আনেন, আবার ফিরিয়ে দেন সকাল হলে। তবুও মানুষ আল্লাহ ﷻ সম্পর্কে বাজে মন্তব্য করে। আবু মুসা আল-আশআরি রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لَا آخِذَ أَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَىٰ يَسْمَعُهُ مِنَ اللَّهِ إِنَّهُ يَشْرَكَ بِهِ وَيُجْعَلُ لَهُ الْوَلَدُ ثُمَّ هُوَ يَعَايِهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ

মন্দ ও বিরক্তিকর কথা শ্রবণে আল্লাহর চেয়ে বেশি ঐর্ষ্যশীল আর কেউ নেই। তাঁর সাথে শিরক করা হয়, তাঁর প্রতি সন্তান গ্রহণের অপবাদ আরোপ হয়, এরপরও তিনি তাদের নিরাপত্তা দেন এবং তাদের রিয়ক দেন।^[১৪১]

কারা আল্লাহ ﷻ-এর ব্যাপারে এসব কথা বলে? মানুষ। তারা বলে আল্লাহ ﷻ সন্তান গ্রহণ করেছেন! অথচ এটা আল্লাহ ﷻ-কে গালি দেয়ার সমতুল্য। অথচ তারপরও আল্লাহ ﷻ তাদের সুস্বাস্থ্য ও রিয়ক দান করেছেন।

আমাদের নবি সঃ কে আমাদের চেয়েও বেশি কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে, অপবাদ দেয়া হয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেয়েও বেশি কষ্ট ভোগ করেছেন মুসা রাঃ। সালাফগণ-আমাদের অনুসরণীয় সাহাবা রাঃ ও আলিমগণও অভিযুক্ত হয়েছেন। তাঁদের বিরুদ্ধেও অপবাদ দেয়া হয়েছে। এমনকি মানুষ অভিযোগ ও অপবাদ আরোপ করেছে স্বয়ং আল্লাহ ﷻ-এর ওপরও। এ কথাগুলো জানা, এগুলো স্মৃতিতে মজুদ রাখা ভিটামিনের মতো কাজ করে। এগুলো আপনার সবরের মাত্রাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেবে। নিজেকে দৃঢ় প্রত্যয়ী মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলুন, কেননা যখন শত্রু পরিস্থিতি তৈরি হয়, তখন শত্রু মানুষই পারে বাধাকে অতিক্রম করতে।

পরীক্ষার মুখোমুখি হলে তাওবাহ করুন, আল্লাহ ﷻ-এর রহমতের প্রত্যাশী হোন

একটা কথা সব সময় মনে রাখবেন, যখনই কারও দিক থেকে ক্ষতি বা পরীক্ষার সম্মুখীন হবেন, সাথে সাথে আল্লাহ ﷻ-এর দিকে ফিরে যাবেন, তাওবাহ করবেন। যদি আপনি একজন দা'ঈও হয়ে থাকেন এবং যদি আপনার বিপদ, কষ্ট কিংবা আপনাকে নিয়ে করা আজেবাজে মন্তব্য আপনার ইসলামি মূল্যবোধের কারণেও হয়ে থাকে, তবুও এমন যেকোনো পরিস্থিতিতে তাওবাহ করুন। আপনি হকের ওপর থাকার কারণে যদি তারা আপনাকে দু-

একটা বিশেষ নাম দেয়, তবুও ইস্তিগফার করুন। বাড়িতে গিয়ে আপনার ঘরের দরজা বন্ধ করে ইস্তিগফার করতে থাকুন। ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ-এর মাজমু আল ফাতাওয়াজুড়ে এমন অনেক উদ্ধৃতি আছে, যেগুলোর সারমর্ম হলো, যখন অন্যদের দ্বারা কষ্ট পাবেন কিংবা অভিযুক্ত হবেন তখন ইস্তিগফারের মাধ্যমে আল্লাহ স্ব-এর দিকে ধাবিত হোন।

যারা আপনার বিরুদ্ধে বলছে তারা হয়তো কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত সবচেয়ে নিকট ব্যক্তি, আর আপনি হয়তো একজন হকপন্থী মুসলিম—কিন্তু আপনার কোনো গুনাহর কারণে আজ তারা আপনার ওপর (জেল, অভিযোগ ও মিডিয়া ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে) নিজেদের কর্তৃত্ব ফলাচ্ছে, আর এর মাধ্যমে আল্লাহ স্ব আপনার অনেক গুনাহ ক্ষমা করে দিচ্ছেন। পাশাপাশি আপনার সাথে যা-ই করা হোক না কেন, যদি আপনাকে তাদের কোনো বিষবাক্য শুনতে হয় কিংবা তারা আপনার ক্ষতি করে, তবুও অন্তরে সব সময় দয়া ও মমতা রাখুন। যদি আপনার সাথে প্রতারণা করা হয়, আপনার বিপদের সময়ে দুর্বলতার সুযোগে নানা কথা বলা হয়, কিংবা যদি আপনার কাছ থেকে নানাভাবে উপকৃত হওয়া লোকেরা আজ আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়, তবুও তাদের প্রতি অন্তরে দয়ার অনুভূতি বজায় রাখুন। সবার সাথে এমন কিছু না কিছু ঘটে। আপনি হয়তো তাদের দরকারের সময় কোনো একটা কাজ করে দিয়েছেন, সাহায্য করেছেন, কিন্তু আজ হঠাৎ তারাই আপনার বিরুদ্ধে বলছে। আপনার জীবন কিন্তু শুধু আপনার মাঝে সীমাবদ্ধ না। যেমন আমার পরিচয় কেবল ‘আহমাদ’ না। আপনি দুনিয়াতে এসেছে একটি গুরুদায়িত্ব নিয়ে। সুতরাং দাওয়ায়র এ পথে আপনাকে যদি কোনোভাবে কষ্ট, প্রতারণা কিংবা ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়, তবুও নির্দয় হবেন না, রহমদিল হোন।

দয়ার নবি স্ব তাঁর প্রিয় চাচার হত্যাকারীদের শাহাদাহ কবুল করেছিলেন। কাবার দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন তাঁর সাহাবি রা-দের হত্যাকারী ও যালিমদের উদ্দেশ্যেও। বলেছিলেন,

لَا تَنْزِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَزْمُ... اِذْهَبُوا فَاَنْتُمْ الطُّلَقَاءُ

তোমাদের কারও ওপর কোনো অভিযোগ নেই। যাও, তোমরা যেখানে খুশি যেতে পারো।

فَيَمَّا رَضِخُوْا مِنَ اللّٰهِ لِيَنْتَ لَهُمْ

‘এবং এটা আল্লাহর অনুগ্রহ যে, আপনি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছেন...।’ (সূরা আলি ইমরান, ১৫৯)

সুনান আবু দাউদ, জামি তিরমিযি ও মুসনাদু আহমাদে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স্ব বলেছেন,

الرَّاجِعُونَ يَزِيحُهُمُ الرَّحْمَنُ، اَرْحَمُوْا مَنْ فِي الْاَرْضِ يَزِيحُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ

দয়ালুদের প্রতি পরম দয়াময় দয়া করেন। যারা জমিনে আছে তাদের প্রতি তোমরা দয়া করো, তাহলে যিনি আসমানে আছেন, তিনিও তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।^[১৫০]

আমাদের নবীজি ﷺ আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছেন। সহিহুল বুখারি ও সহিহ মুসলিমের অপর এক হাদিসে এসেছে,

مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ

যে দয়া করে না, আল্লাহও তার প্রতি দয়া করেন না।^(১৫১)

এ ব্যাপারে শিক্ষা নেয়া যেতে পারে ইউসুফ ﷺ-এর কারাগার থেকে মুক্ত হবার পরের ঘটনাগুলো থেকে। আমি এ ব্যাপারে অত্যন্ত সুন্দর কিছু আলোচনা আমার শাইখদের কাছে থেকে শোনার সুযোগ পেয়েছি। ইউসুফ ﷺ যখন কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন তখন তিনি ছিলেন শক্তি-সামর্থ্যবান। যখন শেষমেশ তাঁর ভাইদের সাথে মিলিত হলেন তখন চাইলেই তাদের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু ইউসুফ ﷺ কী বললেন,

وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ

‘...হে আমার পিতা, এটাই আমার পূর্বকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা, আমার পালনকর্তা একে সত্যে পরিণত করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে...।’ (সূরা ইউসুফ, ১০০)

এতদিন পর তাঁর ﷺ তো বরং এটা বলা স্বাভাবিক ছিল যে, আল্লাহ ﷻ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আমাকে কুয়ো থেকে মুক্ত করেছেন। কিন্তু তিনি কারাগারের কথা বললেন কেন? কারণ, তিনি তার সহোদর ভাইদের কুয়োর ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিয়ে তাদের মনে কষ্ট দিতে চাননি। অথচ এই ভাইয়েরা তাঁর বিরুদ্ধে কত কিছু করেছিল। এখন তিনি শক্তিশালী অবস্থানে আছেন, তবুও তিনি কুয়োর ব্যাপারটি সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে গেলেন, যাতে তাঁর ভাইরা নিজেদের অতীত কৃতকর্মের কথা মনে করে কষ্ট না পান। তিনি এখন স্বাধীন এবং কর্তৃত্বের অধিকারী, কিন্তু তিনি মহানুভব, তাঁর পিতা মহানুভব, তাঁর পিতামহ মহানুভব, তাঁর প্রপিতামহ মহানুভব। যেমনভাবে সহিহুল বুখারির একটি হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

الكَرِيمُ ابْنُ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

আল-কারিম (মহানুভব) ইবনুল কারিম, ইবনুল কারিম-ইউসুফ ইবনু ইয়াকুব ইবনু ইসহাক ইবনু ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)।^(১৫২)

মহান ব্যক্তির ক্ষমতাসীন হবার পর ক্ষমতা থাকার পরও যে ক্ষমা করে দেয়,

সে-ই প্রকৃত দয়ালু। অনেকে আপনার বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে, আড়ালে আপনাকে নিয়ে বাজে মন্তব্য করতে পারে। এমন প্রায়ই দেখা যায় যে, আপনি কারও উপকার করলেন আর হঠাৎ তারাই আপনার গীবত করতে শুরু করল। তারা ইন্টারনেটে আপনার ব্যাপারে মর্মান্বাহনিকর মন্তব্য করতে শুরু করল। কাফিররা তো শুরু থেকেই আপনার পেছনে লেগে ছিল, এখন উম্মাহর মধ্য থেকে একটি দলও আপনার বিরোধী হয়ে গেল। যেই দিন এ সবকিছু অতিক্রম করে আপনি শত্রু অবস্থানে পৌঁছবেন, চাইলেই অতীতের সব আঘাতের বদলা নিতে পারবেন, পারবেন প্রমাণসহ তাদের মুখোশ খুলে দিতে, তখন আপনার সবর আপনাকে বলবে এ থেকে বিরত থাকতে। দয়াশীল হোন, এটাই দা'ঈদের পথ।

কোন জিনিস ইউসুফ عليه السلام-কে এতখানি সবার করতে শেখাল যে, তিনি ভাইদের অনুভূতিতেও আঘাত করতে চাইলেন না? তাঁর প্রতি তাদের আচরণ এবং তাদের কারণে তাঁকে ও তাঁর বাবাকে যে সীমাহীন কষ্ট, দুর্ভোগ ও বিপদের মাঝে দিয়ে যেতে হয়েছে, এর বিপরীতে তাদের প্রতি কোনো ধরনের তিক্ততাও তিনি প্রকাশ করলেন না। কীভাবে? এর মূল কারণ হলো, তাঁর অন্তর সব সময় আল্লাহ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَلَالُهُ-এর দিকে ঝুঁকে থাকত। মনে রাখবেন, এই জীবন, এই দাওয়াহ আপনার নিজের না। এ সবকিছুর উদ্দেশ্য হলো ইসলাম-আল্লাহ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَلَالُهُ ও রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ। ইউসুফ عليه السلام আল্লাহ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَلَالُهُ-কে এত বেশি পরিমাণে স্মরণ করতেন যে শেষপর্যন্ত তিনি যখন পুনরায় ভাইদের সাথে মিলিত হলেন এবং তাদের ওপর কর্তৃত্বের অধিকারী হলেন, তিনি কথা শুরু করলেন আল্লাহ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَلَالُهُ-কে দিয়ে এবং শেষও করলেন আল্লাহ سُبْحَانَهُ وَتَعালَى جَلَالُهُ-কে দিয়ে।

তিনি বললেন,

وَقَدْ أَحْسَنَ بِي

তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।

অর্থাৎ, তাঁকে কারাগার থেকে মুক্ত করে আল্লাহ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَلَالُهُ তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। এবং সবশেষে তিনি বললেন,

إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَنشَأُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

‘আমার পালনকর্তা যা চান, কৌশল ও নিপুণতার সাথে সম্পন্ন করেন। নিশ্চয়ই তিনি বিজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।’ (সূরা ইউসুফ, ১০০)

তিনি عليه السلام তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন আল্লাহ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَلَالُهُ-এর স্মরণের মাধ্যমে এবং আল্লাহ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَلَالُهُ-এর স্মরণ করার মাধ্যমেই তা শেষ করলেন। এ কারণেই ভাইদের প্রতি কোনো ধরনের বারাপ কিংবা তিক্ত অনুভূতির তাঁর মনে সৃষ্টি হয়নি। তেমনি দা'ঈ হতে হলে আমাদের শিখতে হবে ইব্রাহীম عليه السلام-এর দৃষ্টান্ত থেকেও। তিনি নিজেকে আগুনে সঁপে দিয়েছিলেন, মেহমানদের আপ্যায়ন করতে গিয়ে নিজে ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করেছিলেন, নিজ সন্তানকে কুরবানির জন্য

উৎসর্গ করেছিলেন। আপনি শুধু দিতে থাকবেন, আর দিয়েই যাবেন, কোনো বিনিময় কিংবা প্রতিদানের আশা করবেন না। বরং ধরে নেবেন যে ক্ষতি আসবে। নিজেকে অন্যদের জন্য দৃষ্টান্তে পরিণত করুন। কোনো বিনিময় নেবেন না। আর যদি বিনিময় প্রত্যাশী হয়ে থাকেন, তবে কেবল ক্ষতির আশা-ই করুন। আপনি কেবল দান করুন, ত্যাগ করুন, পরীক্ষা এলে সবর করুন। এর চূড়ান্ত বিনিময় আপনি পাবেন আল্লাহ ﷻ-এর কাছ থেকে। আর সেটা কী?

وَيُثَرِّفُ الصَّابِرِينَ

‘সুসংবাদ দাও সবরকারীদের।’ (সূরা আল-বাকারাহ, ১৫৫)

সবরকারীদের জন্য রয়েছে প্রশংসা, গৌরব ও মর্যাদা।

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

‘যখন তাদের ওপর বিপদ আপতিত হয়, তারা বলে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর এবং নিশ্চিতভাবে আমরা তাঁরই দিকে ফিরে যাব। এরা হচ্ছে সেসব লোক, যাদের আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাওয়াত (ক্ষমা ও করুণা) প্রদান করা হয়েছে, আর এরাই হলো সুপথগামী।’ (সূরা আল-বাকারাহ, ১৫৬-১৫৭)

সবর করলে আল্লাহ ﷻ-এর সালাওয়াত পাবেন। আপনার ওপর আল্লাহ ﷻ-এর করুণা বর্ষিত হবে, আল্লাহ ﷻ আপনার মর্যাদা উন্নীত করবেন। এত সব অনুগ্রহের কারণ কী? কারণ, কেবল সবর। আল্লাহ ﷻ আপনাকে হিদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, সুতরাং সবর অবলম্বন করুন।

দাওয়াহর পথে সবরের রয়েছে বিশেষ মর্যাদা :

শেষ কথা হলো, অধিকাংশ পরীক্ষা আপনি এড়াতে পারবেন না। কখনো কখনো সবর অবলম্বন করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। মৃত্যুর কথাই ধরুন। মুসলিম, নেককার, পাপাচারী, কাম্বির, নাস্তিক, ইহুদি, খ্রিস্টান—মৃত্যুর হাত থেকে কেউ রেহাই পাবে না। মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে প্রত্যেককে। সম্পদের ক্ষতি—প্রত্যেককে এর মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়। বিয়ে-সংক্রান্ত নানা জটিলতা—সবাইকে কমবেশি এগুলোর মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এগুলোর আলাদা কোনো বিশেষত্ব নেই। কিন্তু দাওয়াহর পথে সবরের বিশেষ মর্যাদা আছে। দ্বীনের ওপর অটল থাকা এবং এর ওপর সবর করা, অবশ্যই বিশেষ মর্যাদার দাবি রাখে। কেন? কারণ, অন্যান্য পরীক্ষাগুলো আপনি চাইলেও এড়াতে পারবেন না, কিন্তু দ্বীনের পথের, দাওয়াহর পথের পরীক্ষা চাইলেই আপনি এড়িয়ে যেতে পারবেন।

দ্বীনের ও দাওয়াহর পরীক্ষাগুলোর ক্ষেত্রে পরীক্ষাগুলো এড়িয়ে চলার, এগুলোর মুখোমুখি না হবার, এমনকি পরীক্ষা আসার আগেই তা পরিত্যাগ করার সুযোগ ও সামর্থ্য আপনার আছে। সালাতের কারণে অফিসে নানা ঝামেলা হচ্ছে? আমি আর অফিসে সালাত আদায় করব না। ইশার পর বাসায় ফিরে পুরো পাঁচ ওয়াস্ত সালাত একসাথে আদায় করে নেব। দাওয়াহর কারণে আমাকে নজরদারিতে পড়তে হচ্ছে? আমি এসব ছেড়ে আমার স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে থাকব। আপনি চাইলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এ পরীক্ষাগুলো এড়িয়ে যেতে পারবেন। ঠিক এ কারণেই এ ধরনের কষ্ট হলো সর্বোত্তম কষ্ট, কারণ, এটা হচ্ছে আল্লাহ ﷻ-এর রাস্তায় কষ্ট। এ ধরনের কষ্ট ও তার ওপর সবরের মর্যাদাও সর্বোত্তম। কারণ, আপনাকে এখানে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে আল্লাহ ﷻ-এর রাস্তায় আর আপনি এর ওপর সবর করছেন। বাধ্য, নিরুপায় হয়ে না; বরং স্বেচ্ছায় আপনি সবর করছেন। যারা এই বিশেষ ধরনের কষ্টের মুখোমুখি হয়েও ধৈর্যশীল থাকেন তাদের জন্য আল্লাহ ﷻ আল-ফিরদাউসে জায়গা করে দেন। এমন এক অবস্থান তাঁদের জন্য নির্ধারিত করেন নিজেদের আমলের মাধ্যমে যেখানে তারা হয়তো পৌঁছতে পারতেন না। এ ধরনের পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ তাঁর প্রিয় বান্দাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন, তাঁদের নিয়ে যান তাঁর আরও কাছাকাছি, আল-আরশের কাছাকাছি।

কখনো যদি এমন পরিস্থিতির সন্মুখীন হন যখন মনে হবে আপনি আর পারছেন না, তখন জান্নাতে প্রবেশ করার প্রথম মুহূর্তটির কথা চিন্তা করার চেষ্টা করবেন। সব সময় সেই মুহূর্তটির কথা চিন্তা করবেন, আপনার মনে একে গেঁথে রাখবেন। কল্পনা করুন তো, দুনিয়াতে সবচেয়ে কষ্টে কাটানো মানুষটিকে কিয়ামতের দিনে আল্লাহ ﷻ কয়েক মুহূর্ত, এমনকি এক মিলি সেকেন্ডের চেয়েও কম সময়ের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তারপর আল্লাহ ﷻ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি এর আগে কষ্টকর কিছু দেখেছিলে? সে আর কিছুই মনে করতে পারবে না।

কেবল এই দৃশ্যটি কল্পনা করুন, এটা আপনার সবরে শক্তি জোগাবে।

শাইখ মুসার কিছু প্রজ্ঞাময় বাণী :

পরিশেষে, আমার বাবার বলা কিছু কথা উল্লেখ করব। কথাগুলো স্বর্ণাক্ষরে খোদাই করে রাখার মতো। প্রজ্ঞার পাশাপাশি যে পরিস্থিতিতে কথাগুলো বলা হয়েছিল সেটাও একে গভীর অর্থবোধকতা দান করেছে। আগেই বলেছি, কারাগারের একটা সময় আমরা সলিটারি সেলে কাটিয়েছি। প্রথমে আমাদের দুজনকে আলাদা আলাদা সেলে রাখা হয়েছিল। দুজনের সেল ছিল সলিটারি ওয়ার্ডের দুই প্রান্তে। কথা বলা, দেখা করা, এমনকি একজন আরেকজনের খোঁজ নেওয়ারও কোনো উপায় ছিল না।

কারাগারের নিয়ম অনুযায়ী জেলার প্রতি সপ্তাহে একবার সলিটারি সেলের বন্দীদের পরিদর্শনে আসত। পরিদর্শনের সময় নিয়ম করে প্রতিটি সেলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বন্দীর অবস্থা

দেখত। একবার আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কেন আমাকে সলিটারিতে রাখা হয়েছে?

কারণ, তুমি সম্ভ্রাসী, তুমি অন্য কয়েদিদেরও তোমার মতাদর্শে গড়ে তুলতে পারো, তাদের সংগঠিত করতে পারো।

তোমার এই অভিযোগের পেছনে প্রমাণ কী?

কারাগারের মুসলিম ইমাম তোমার ব্যাপারে লম্বা রিপোর্ট দিয়েছে।

আসলে উম্মাহর সমস্যার মূলে মুনাফিকরা। কারাগারের ইমাম আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট দিয়েছিল। আমি জেলারকে বললাম, তুমি আমার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করলে, কিন্তু আমার বাবার ব্যাপারে কী বলবে? তাঁকে কেন সলিটারিতে রাখা হয়েছে? সে আমার বাবার ব্যাপারেও সেই একই অভিযোগ করল, অথচ বাবা জেলে খুব অল্প কথা বলতেন।

আমি আবার বললাম, তোমরা আমাদের আলাদা রেখেছ, ঠিক আছে। কিন্তু আমি কেন তাঁর সাথে দেখা করার সুযোগও পাই না?

তোমরা সবাইকে নিজেদের মতো চরমপন্থী বানাও, তাই তোমাদের সবার কাছ থেকে আলাদা রাখা হয়েছে।

ঠিক আছে, আমার আর বাবার বিরুদ্ধে তোমার এ অভিযোগ যদি সত্য হয়, তাহলে এটা তো একটা ছোঁয়াচে রোগের মতো। আর আমরা দুজনই যেহেতু এই রোগে আক্রান্ত তাই আমাদের আর আমার বাবাকে একই সেলে রাখলে তোমাদের জন্যই ভালো। তখন এ অসুখ আর অন্য কারও মধ্যে সংক্রমিত হবে না।

এ কথা শুনে গর্দভটা কিছুক্ষণ চিন্তা করে, যাবার সময় অর্ডার দিয়ে গেল, আমাদের দুজনকে যেন একই সেলে রাখা হয়। তারপর বাবাকে আমার সাথে একই সেলে রাখা হলো। বাবার সাথে কাটানো সেই দিনগুলো ছিল আমার কারা-জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। সলিটারিতে কাটানো বোট নয় মাসের মধ্যে প্রায় তিন বা চার মাস আমরা একই সেলে কাটিয়েছি। আমি এ সময় দেখেছি আমার বাবা হাসিমুখে সব পরিস্থিতির মোকাবেলা করেন। আজ অবধি তা-ই আছে। যা-ই ঘটুক না কেন তাঁর মধ্যে কখনো অসন্তোষ দেখিনি, তাঁকে সব সময় ধৈর্যশীল ও পরিতৃপ্ত পেয়েছি। আল্লাহ্‌ম্মা বারিক লাছ, আল্লাহ ঈঈ তাঁকে নেক আমল-সমৃদ্ধ দীর্ঘায়ু দান করুন।

আমাদের ছোট সেলে ওপর-নিচ দুটো বেড ছিল। বাবা ঘুমাতেন নিচের বেডে, আমি ওপরেরটায়। তাঁর সময় কাটত সালাত আর কুরআন তিলাওয়াতে মগ্ন হয়ে। ওপর থেকে আমি দেখতাম সব সময় তাঁর মুখে হাসি লেগে থাকত। তিনি কিছুটা উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াত করতে ভালোবাসতেন। অন্যান্য বন্দীরা প্রতিরাতে তাঁর সুরা কাহফের তিলাওয়াত শুনতে পছন্দ করত। অনেকে চিৎকার করে তাঁর কাছে নাসীহাহ চাইত। তিনি হাসিমুখে সবার কথার জবাব দিতেন। মাঝে মাঝে সেলের দরজায় দাঁড়িয়ে খুতবাহ দিতেন। দরজার শিক ধরে দাঁড়িয়ে জোরে

কথা বললে সবাই শুনতে পেত। খুববাত্তে তিনি মুসলিম ও অমুসলিম সবাইকে নাসীহাহ দিতেন। আমরা সলিটারিতে থাকা অবস্থায় অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।

ইবনুল কাইয়িম رحمہ اللہ তাঁর উস্তাদ ইবনু তাইমিয়াহ رحمہ اللہ-এর ব্যাপারে বলেছিলেন, যখন আমাদের ঈমান দুর্বল হয়ে যেত, আমরা আমাদের শাইখ ইবনু তাইমিয়াহ رحمہ اللہ-এর শরণাপন্ন হতাম। তাঁর সামনে কয়েক মুহূর্ত কাটালেই তাঁর কথা আমাদের ঈমানকে তরতাজা করত। আমার বাবার ক্ষেত্রেও আমি তা-ই লক্ষ করেছি। আল্লাহ ﷻ তাঁকে নেক আমল-সমৃদ্ধ দীর্ঘায়ু দান করুন। তাঁর বারাকাহময় চেহারা থেকে এক মুহূর্তের জন্যও হাসি মুছে যেত না। শুধু গভীর রাতে তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেন, সিজদাহয় পড়ে আল্লাহ ﷻ-এর ক্ষমা ও করুণা ভিক্ষে করতেন।

শীতের সময় মিশিগানে তাপমাত্রা শূন্যের নিচে চলে যায়। কারাগারে ছিল বরফজমাট শীত। সেন্ট্রাল হিটিং বা তাপ নিয়ন্ত্রণের অন্য কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তার ওপর ওরা আমাদের কাছ থেকে সব কব্বলও নিয়ে গিয়েছিল। কখনো কখনো দিনের পর দিন ওরা আমাদের কোনো খাবার কিংবা পানি দিত না। ইরাক-ফেরত নির্দয় ও নিষ্ঠুর পশুগুলো বন্দীদের ওপর নিজেদের আক্রোশ মৌটাতে চাইত। আসলে তাদের পশু বলাও উচিত না, এতে বরং পশুদের অসম্মান করা হয়। তবে কয়েকজন ব্যতিক্রমও ছিল। এক মেক্সিকান গার্ডের কথা মনে আছে, যে তখন মাত্র ইরাক থেকে ফিরেছে। অ্যামেরিকান নাগরিকত্ব পাবার জন্য সে আর্মিতে যোগ দিয়েছিল। ওদের একটি আইন আছে, কেউ যদি অ্যামেরিকান আর্মির হয়ে কয়েক বছর যুদ্ধ করে তবে তাকে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। এই গার্ডটি নিয়মিত আমাদের সেলের সামনে এসে দাঁড়াত। আমার বাবার দিকে তাকিয়ে সে কেঁদে ফেলত আর বলত, আমি জানি না ওরা কীভাবে আপনার সাথে এমন আচরণ করছে। তবে এ ধরনের লোক হলো ব্যতিক্রম, আর নিয়ম কখনো ব্যতিক্রমদের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয় না।

আমার ও বাবার সেল আলাদা করে দেবার কয়েক দিন আগের কথা। ওপরের বেডে বসে আমার বাবার আলোকদীপ্ত মুখ আর উজ্জ্বল হাসির দিকে তাকিয়ে ছিলাম। তিনি হাঁটছিলেন। এটা ছিল তাঁর রোজকার রুটিন। অল্প জায়গার মধ্যেই পায়চারি করতেন আর কুরআন তিলাওয়াত করতেন। আমি বললাম, আবু আপনার কি কখনো নিজের ঈমান নিয়ে সংশয় হয়েছে? যে পরীক্ষা আর কষ্টের সময় আমরা অতিক্রম করছি এগুলোর কারণে কখনো কি আপনার ঈমান দুর্বল হয়েছে?

এ সময় আমার বাবা এমন এক অবস্থায় ছিলেন যখন কারাগারে তাঁর ওপর নির্ধাতন চলছে, পুরো পৃথিবী তাঁর পরিবারকে ত্যাগ করেছে, তিনি নিজে অসুস্থ, বাসায় তাঁর স্ত্রী অসুস্থ। একের পর এক বিপদ তাঁর ওপর আসছে। চেনা একজন মানুষকেও বিপদের সময় নিজের পাশে পাননি, তাঁর সব সম্পদ তিনি হারিয়েছেন, শুধু সম্পদ না জাগতিক প্রায় সবকিছু তিনি

হারিয়েছেন। পরীক্ষার সময় মাঝে মাঝে এমন অবস্থা আসে যখন রাসূলগণও আশাহীন হয়ে পড়েন।

আল্লাহ ﷻ বলেন,

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ

‘অবশেষে যখন রাসূলগণ নিরাশ হলো এবং লোকে ভাবল যে, তাদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য এল। তারপর আমি যাকে ইচ্ছা করলাম উদ্ধার করা হলো।’ (সূরা ইউসুফ, ১১০)

مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرُّسُلُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

‘তাদের ওপর ভীষণ বিপদ ও কষ্ট এসেছিল আর এতে তারা এমনভাবে শিরিত হয়েছিল যে, নবি ও তাঁর সাথি ঈমানদার লোকেরা বলে উঠেছিল, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্যে নিকটেই!’ (সূরা আল-বাকারাহ, ২১৪)

রাসূল ﷺ ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহাবি ؓ-গণ তীব্র দারিদ্র্য ও দুঃখ-কষ্টের মুখোমুখি হয়েছিলেন। বিপদের তীব্রতায় তাঁরা এতটা বিপর্যস্ত হয়েছিলেন যে, রাসূল ﷺ ও তাঁর সঙ্গীরা বলেছিলেন, কখন আসবে আল্লাহ ﷻ-এর সাহায্য? তাই রাসূলগণও এতটা কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন, যখন তাঁরা আশা ছেড়ে দিয়েছেন। রাসূলগণকেও এত ভয়ংকর কঠিন সময় পার করতে হয়েছে।

এতসব কথা এ জন্য বললাম যাতে উপলব্ধি করতে পারেন, কোন পরিস্থিতিতে কথাগুলো বলা হয়েছিল। কারণ, হাজার কিংবা পাঁচ শ ডলার দামের ম্যাট্রেসের ওপর শোয়া অবস্থায়, নরম উষ্ণ বিছানায় স্ত্রীকে পাশে নিয়ে বলা কথা, আর শূন্য ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রার নিচে কোনো কঞ্চল ছাড়া কারাগারের নির্জন অন্ধকার কক্ষে শুয়ে বলা কথা এক রকম নয়।

আমি বাবাকে প্রশ্ন করলাম, আবু আপনার কি কখনো নিজের ঈমান নিয়ে সংশয় হয়েছেন? যে পরীক্ষা আর কষ্টের সময় আমরা অতিক্রম করছি এগুলোর কারণে কখনো কি আপনার ঈমান দুর্বল হয়েছে? প্রশ্ন শুনে অন্ধকার কারাগারেও যেন তাঁর মুখ আলোকিত হয়ে উঠল। শাস্ত দৃষ্টিতে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে জীবন্ত কারও কাছে থেকে শোনা সবচেয়ে অনুপ্রেরণামূলক কথাগুলো তিনি উচ্চারণ করলেন। তিনি বললেন,

প্রিয়, আমাদের সাথে যদি এমন না ঘটত, তাহলে আমি সংশয়ে থাকতাম। এই পরীক্ষা যদি আমাদের ওপর না আসত, তাহলে বরং আমি আমাদের মানহাজ নিয়ে সংশয়ে ভুগতাম।

উপসংহার :

একজন মুসলিম, একজন দাঈ হিসেবে আপনাকে সব সময় এই সত্য পথের ওপর অটল থাকতে হবে। অন্যরা যে চোখে দুনিয়াকে দেখছে, আপনি সেভাবে দুনিয়াকে দেখতে পারবেন না। ওদের কাছে জীবন হলো প্রাইমারি, জুনিয়র, হাইস্কুল ও কলেজ শেষ করা। ওদের কাছে জীবন হলো অনার্স, মাস্টার্স কিংবা পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করা। এরই মধ্যে বা এর পর হয়তো বিয়ে করা, বাচ্চা জন্ম দেওয়া, তাদের বড় করে তোলা, চাকরি-বাকরি করা। সবশেষে রিটায়ারমেন্ট, রকিং চেয়ারে দোল খাওয়া। কোনো সমুদ্রসৈকত কিংবা নিরিবিলি রিসোর্টে ক্রীর সাথে বসে নাতি-নাতনিদের খেলা দেখা আর মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা। ওদের কাছে এই হলো জীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু একজন মুসলিমের জন্য সমীকরণটা আলাদা। একজন মুসলিম জানে, তার জীবনের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আছে। এসব পার্থিব বিষয়াদি কখনো আমাদের বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য হতে পারে না।

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

‘বলুন হে মুহাম্মাদ, আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন, আমার মরণ বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই।’ (সূরা আল-আনআম, ১৬২)

আমাদের জীবন শুধুই আল্লাহ ﷻ-এর জন্য। আল্লাহ ﷻ-এর সন্তুষ্টির জন্যই আমাদের সব প্রচেষ্টা, আর শুধু তাঁর জন্য এ পথের সব বাধা-বিপত্তি আর কষ্ট সহ্য করা। আমরা কখনো পরীক্ষা কামনা করব না, কিন্তু পরীক্ষা এলে আল্লাহ ﷻ-এর দ্বীন ও তাঁর সন্তুষ্টির জন্য আমরা ধৈর্য ধরব। দ্বীনের প্রশ্নে আপসহীন নীতিনির্ভর একজন ব্যক্তির জন্য পরীক্ষা অবশ্যস্বাভাবী। এ ধরনের মানুষকে পরীক্ষার মোকাবেলা করতেই হবে। আর যারা হকের দিকে আহ্বান করেন তাঁদের জন্য এ কথা আরও বেশি প্রযোজ্য। দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, মানুষের বানানো বিভিন্ন নোংরা, অর্থহীন আদর্শের অনুসারীরা যে পরিমাণ ত্যাগস্বীকার করে, নিজ নীতির ওপর অবিচল থাকার ও আপস না করার যে দৃঢ়তা তাদের মধ্যে দেখা যায়, আজ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর অনুসারীর মধ্যে ততটুকু সবার, ততটুকু দৃঢ়তা দেখা যায় না। আপনারা মাফিয়া নেতা, খুনি, কমিউনিস্টসহ বিভিন্ন মতাদর্শের লোকের জীবনী পড়ে দেখুন। জন গিটি বা এ-জাতীয় অন্যান্যদের জীবনী পড়ে দেখুন। অবাক হয়ে যাবেন। নোংরা আদর্শের জন্য এই লোকগুলোর মধ্যে আত্মত্যাগের যে মানসিকতা ছিল আজ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর বাহকদের মধ্যে তার ছিটেকোটাও খুঁজে পাওয়া কঠিন।

আপনারা সবাই সম্ভবত বিখ্যাত কারি আবু বকর আশ-শাতরিকে চেনেন। আমার বাবার কাছ থেকে আবু বকর আশ-শাতরির একটি সাক্ষাৎকারের কথা শুনেছিলাম। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনার তিলাওয়াতের মধ্যে এক ধরনের বিষমতা খুঁজে পাওয়া যায়। কেন? তিনি জবাবে বলেছিলেন, ‘কুরআন হিফয শুরু করার পর থেকে আমি একের পর এক দুর্বোনের

সম্মুখীন হই। আজ পর্যন্ত আমি একের পর এক বিপর্যয়ের মোকাবেলা করে যাচ্ছিঃ' এই হলো মুমিনের পার্থিব জীবন। আপনাদের কাজ হলো সবার করা, সত্যের ওপর অটল ও অবিচল থাকা।

এ উপলক্ষিকে আপনার মন, মগজ ও অন্তরে গেঁথে নেবেন। যাতে যেদিন পরীক্ষার মুখোমুখি হবেন সেদিন যেন তার মোকাবেলা করতে পারেন। এটি এমন এক পরীক্ষা যেটাতে বেশির ভাগ মানুষ আটকে যায়। চাইলে এমন অনেকের নাম বলা যাবে যারা সামান্য পরীক্ষার কারণে সত্যের পথ ত্যাগ করেছে। এমন অনেক জনপ্রিয় নাম আর মুখ আছে যারা এমন সব সামান্য বিষয়ের জন্য সত্যকে ত্যাগ করেছে যেগুলোকে আসলে পরীক্ষাও বলা যায় না। তারা যখন দেবল, দুনিয়া পাল্টাতে শুরু করেছে, সত্যের প্রতি দুনিয়ার মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে শুরু করেছে—সাথে সাথে নিজেদের আদর্শকে ছুড়ে ফেলল। আল্লাহ ﷻ ছাড়া অন্যের সন্তুষ্টিকে লক্ষ্য বানিয়ে নেওয়া এ ধরনের লোকেরা কীভাবে ঈর্ষের সাথে পরীক্ষার মোকাবেলা করবে? কীভাবে এমন একজন মানুষ বিপদের সময় আল্লাহ ﷻ-কে পাশে পাবার আশা করে?

আমরা চারটি বুনিয়াদি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। বইয়ের শুরুতে শাইখ رحمته বলেছেন,

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَعْلَمُ رَحِمَكَ اللَّهُ، أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا تَعَلُّمُ أَرْبَعِ مَسَائِلَ، الْأُولَى : اَلْعِلْمُ ، وَهُوَ مَعْرِفَةُ اللَّهِ ، وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ ، وَمَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ بِالْأَدِلَّةِ . الثَّانِيَةُ : الْعَمَلُ بِهِ . الثَّالِثَةُ : الدَّعْوَةُ إِلَيْهِ . الرَّابِعَةُ : الصَّبْرُ عَلَى الْأَذَى فِيهِ . وَالذَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ : وَالْعَصْرُ - إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خُسْرٍ - إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : لَوْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِهِ إِلَّا هَذِهِ السُّورَةُ لَكَفَتْهُمْ .

‘বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম। অবগত হোন, আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন, চারটি বিষয়ের ইলম অর্জন করা আমাদের ওপর ওয়াজ্বিব।

এক. এমন ইলম, যার সাহায্যে দলিল-প্রমাণসহ আল্লাহ ﷻ, তাঁর নবি ﷺ ও দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে পরিচয় লাভ করা যায়।

দুই. ওই ইলম অনুযায়ী আমল করা।

তিন. এর দিকে দাওয়াহ দেয়া।

চার. এই কর্তব্য পালনে সম্ভাব্য কষ্ট ও বিপদ-বিপর্যয়ে সবর করা।

এ কথাগুলোর দলিল হচ্ছে আল্লাহ ﷻ-এর নিম্নোক্ত বাণী :

‘কালের শপথ, নিশ্চয়ই মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা ছাড়া, যারা ইমান এনেছে, নেক আমল করেছে, আর যারা পরস্পরকে হক তথা সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং মৈর্যধারণের নিরস্তর উপদেশ দিয়েছে।’ (সূরা আল-আসর, ১-৩)

ইমাম শাফে'ঈ رحمہ اللہ বলেছেন,

যদি আল্লাহ ﷻ তাঁর সৃষ্টির ওপর প্রমাণ পেশ করার জন্য এ সূরা ছাড়া অন্য কোনো কিছু অবতীর্ণ না করতেন, তাহলে এ সূরাই তাদের জন্য সবদিক দিয়ে যথেষ্ট হতো।^[১৫০]

উসুল আস-সালাসাহর মূল বিষয়বস্তু তাওহিদ। আপনার ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে বইগুলোকে যদি বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে—যেমন : ফিকহ, উসুল, তাওহিদ, সিরাহ ইত্যাদিতে—ভাগ করে রাখেন, তাহলে এই বইটিকে রাখতে হবে তাওহিদের ক্যাটাগরিতে। তবে ইসলামি ইলমের শাখাগুলো পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আগের দারসগুলো আমাদের আলোচনায় উসুল ও হাদিসশাস্ত্র-বিষয়ক বিভিন্ন বিষয় এসেছিল, এখন আমাদের আলোচনা তাফসিরের দিকে যাবে।

ভূমিকা :

আমরা আজ সূরা আল-আসর নিয়ে কিছুটা আলোচনা করব। তবে খুব একটা গভীরে যাব না, কারণ এতদিন ধরে আমরা যা কিছু আলোচনা করেছি তার পুরোটাই আসলে সূরা আল-আসরের তাফসির। এতদিন যে চারটি বুনিয়াদি বিষয়ের ব্যাপারে আমরা আলোচনা করেছি সেগুলো সরাসরি সূরা আল-আসর থেকে নেয়া হয়েছে।

সূরা আল-আসরের ভূমিকা হিসেবে *আত-তাবারানি*তে উল্লেখিত একটি সহিহ হাদিস উল্লেখ করা যিথেষ্ট,

كَانَ الرَّجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا التَّفَعُّا لَمْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَقْرَأَا أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ : وَالْقَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِنَفْسٍ خُسِرٍ

‘যখন সাহাবি رضي الله عنه-গণ কোথাও একত্র হতেন অথবা একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করতেন, তারা কখনো সূরা আল-আসর তিলাওয়াত না করে বিদায় নিতেন না।’^[১৫১]

এ থেকেই বোঝা যায়, তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু কেমন ছিল। নিজেদের আলোচনার বিষয়বস্তুর ব্যাপারে আমাদের অনেক সাবধান হওয়া উচিত। আপনার কথাবার্তার সাথে তাঁদের আলোচনার তুলনা করুন। আপনি হাদিসে দেখতে পাবেন, তাঁদের স্বপ্ন, আশা, চিন্তা-ভাবনা সবকিছু ছিল ইসলামকে কেন্দ্র করে। ইলম মানে বইপত্র মজুদ করা না, বরং এটি বাস্তব জীবনে প্রয়োগের বিষয়। ইলমের প্রভাব আপনি দেখতে পাবেন সাহাবি رضي الله عنه-দের জীবনীতে, তাঁদের চলাফেরায়। মাসজিদে এক রকম আর দেয়ালের অপর পাশে ব্যক্তিগত জীবনে সম্পূর্ণ আরেক রকম, এমন দ্বিমুখী তাঁরা ছিলেন না। বর্তমান যুগের মানুষদের নিয়ে জরিপ করলে

দেখা যাবে, তালিবুল ইলম, ব্যবসায়ী, ইঞ্জিনিয়ার, পেশাদার ব্যক্তি, সাধারণ শ্রেণির লোক, সবার আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে রাজনীতি, খেলা, ব্যবসা, সম্পদ ইত্যাদি। আর অনেকে তো এমন আরও বিষয় নিয়ে আলোচনা করে যা সুস্পষ্ট হারাম।

এখন প্রশ্ন হলো, কেন সাহাবি রাঃ-গণ তাদের ব্যক্তিগত বৈঠকে সূরা আল-আসর তিলাওয়াত করতেন? কুরআনের এত এত আয়াত এবং এত এত হাদিস জানা সত্ত্বেও কেন সূরা আল-আসর? কুরআনে ১১৪টি সূরা আছে। কেবল সাওয়াবের জন্য হলে তো সর্বপ্রথম গুরুত্ব পাওয়ার কথা সূরা আল-ফাতিহার। কারণ, সূরা আল-ফাতিহাকে 'উম্মুল কুরআন' বলা হয়। অথবা সূরা আল-ইখলাস প্রাধান্য পাওয়ার কথা, কেননা এটি কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ। কিন্তু কেন সূরা আল-আসর?

সূরা আল-আসরে রয়েছে তিনটি আয়াত, চৌদ্দটি শব্দ এবং সতেরোটি বর্ণ। কুরআনের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত সূরাগুলো হলো আল-ইখলাস, আল-কাউসার, আন-নাসর এবং আল-আসর। এড় মধ্যে সবচেয়ে ছোট হলো আল-কাউসার আর তার ঠিক পরেই আল-আসর। তাহলে কেন সূরা আল-আসর? কারণ, এই সূরা থেকে আমাদের বিশ্বাসের চারটি বুনিয়াদি বিষয় পাওয়া যায়। এই সূরার মাঝে রয়েছে আপনার পরিভ্রাণ। দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার উপায় আছে এই সূরায়। এই সূরা আপনার পথপ্রদর্শন করে, বন্ধুত্বের সঠিক অর্থ এবং অপরের সাথে সম্পর্কের ধরন নির্ধারণ করে, আর তাই সাহাবি রাঃ-গণ এ সূরাকেই বেছে নিয়েছিলেন। আল্লাহ স্বঃ সূরা আল-আসরে বলেন :

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং ধৈর্যধারণের নিরন্তর উপদেশ দিয়েছে।

تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ

যারা পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে—অর্থাৎ যারা পরস্পরকে আল্লাহ স্বঃ-এর নির্ধারিত উত্তম কাজের প্রতি আহ্বান করেছে এবং আল্লাহ স্বঃ-এর নিষিদ্ধকৃত সকল গুনাহ ও মন্দকাজ থেকে বারণ করেছে।

وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

অর্থাৎ কারা সফল সেটা জানাতে গিয়ে ঈমান ও সংকর্মে পর আল্লাহ স্বঃ বলছেন, তাঁরাই সফল যারা পরস্পরকে হক তথা সত্যের উপদেশ দিয়েছে—যেমন একে অপরকে সব ধরনের সং কাজে উৎসাহিত করেছে ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিয়েছে। এবং পরস্পরকে ধৈর্যধারণের নিরন্তর উপদেশ দিয়েছে। অর্থাৎ, যারা তাওহিদের দাওয়ায় অথবা জিহাদসহ অন্যান্য বিষয়ের কারণে আল্লাহ স্বঃ-এর পৃথক আসা বিপদ, আঘাত ও বিপর্যয়ের

সময় পরস্পরকে বারবার সবরের উপদেশ দিয়েছে।

আল্লাহ ﷻ এখানে সময়ের শপথ করছেন। তিনি যে বিষয়ে ইচ্ছা শপথ করতে পারেন। তবে কোনো বিষয়ে আল্লাহ ﷻ-এর শপথ করা বিষয়টিকে বিশেষভাবে সম্মানিত ও গুরুত্ববহ করে তোলে। আমরা সবাই জানি, আল্লাহ ﷻ-এর সব বাণীই অত্যন্ত সম্মানিত। তাহলে চিন্তা করুন, আল্লাহ ﷻ যে বিষয়ে কসম করছেন, তা কতটা সম্মানিত! এক বেদুইন সূরা আয-যারিয়াতের এই আয়াতটি শুনে কাঁপতে শুরু করেছিল, যেখানে আল্লাহ ﷻ শপথ করে বলেন :

فَوَرَبِّ السَّاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنْتُمْ تَنْطِفُونَ

নডোমগুল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তার কসম, তোমাদের কথাবার্তার মতোই এটা সত্য।
(সূরা আয-যারিয়াত, ২৩)

এ আয়াত শুনে বেদুইনটি কাঁপতে শুরু করেছিল। বলেছিল, কে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ ﷻ-কে এতটা রাগান্বিত করেছে যে, আল্লাহ ﷻ এমন শপথ করলেন? আল্লাহ ﷻ-এর এই শপথের ওজন সে অন্তর থেকে উপলব্ধি করেছিল।

‘আসর’ অর্থ :

আসর অর্থ সময়। তবে আল্লাহ ﷻ আল-আসর বলতে কোন সময়কে বুঝিয়েছেন তা নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে। কুরআনের শব্দগুলোর অর্থ কখনো কখনো অনেক ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়, তাই একটি শব্দ বা আয়াতের ব্যাপারে আপনি বিভিন্ন মত দেখতে পাবেন। আমার অভিজ্ঞতায় মনে হয়েছে এমতগুলোকে সংক্ষেপ করে চারটি মতে তুলে আনাই উত্তম, এর প্রত্যেকটি মত সঠিক।

প্রথম অভিমত : শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ সময়

আল-আসর এর প্রথম অর্থটি হচ্ছে আদ-দাহর ওয়ায-যামান (الدَّهْرُ وَالزَّمَانُ) বা সময় ও যুগ। এখানে কোন যুগকে বোঝানো হচ্ছে তা নিয়ে দুটো মত রয়েছে,

এক. সৃষ্টির শুরু থেকে বিচার দিবস পর্যন্ত;

দুই. মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত; এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে, মানুষের জীবন ঘুরতে থাকা চাকার মতো। প্রতিটি মুহূর্ত, সেকেন্ড, পার হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে জীবনের একটি অংশ হারিয়ে যায়। কল্পনা করুন যেন আপনি সময় থেকেই সৃষ্ট। যাপিত প্রতিটি মুহূর্তের সাথে আপনার এক-একটি অংশ গিয়ে সমাহিত হচ্ছে কবরে। ইবনু আব্বাস রাঃ-এর মতে, আসর হচ্ছে দাহর (دمر)-সময়শ্রোত, সময়কাল, যামান, যুগ। ওয়ায-আসর (والغُضْر) এখানে

ওয়া (و) হলো একটি হারফু কাসম (حرف قسم) বা শপথ-বর্ণ।

সূতরাং প্রথম অভিমত অনুযায়ী আল-আসর হলো সৃষ্টির শুরু থেকে বিচার দিবস পর্যন্ত সময় অথবা ব্যক্তির জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়।

খুব গুরুত্বপূর্ণ বলেই আল্লাহ ﷻ সময়ের কসম করেছেন। কিন্তু কেন এটি এত গুরুত্বপূর্ণ? কারণ, এই সময়কালের মাঝেই নেয়া হয় মানবজাতির চূড়ান্ত ভাগ্য-নির্ধারণকারী পরীক্ষা। এটি এ জন্যও গুরুত্বপূর্ণ যে, আল-আসরের মাঝে আল্লাহ ﷻ তাঁর অলৌকিক নিদর্শন প্রকাশ করেন। তিনি রাতকে সৃষ্টি করেছেন আচ্ছাদন হিসেবে এবং ঘুমকে সৃষ্টি করেছেন বিশ্রামস্বরূপ। দিনকে করেছেন কর্মশক্তিপূর্ণ যেন আমরা কাজ করতে পারি। এ সব আল্লাহ ﷻ-এর নিদর্শন। আল-আসরের মাঝেই নির্দিষ্ট কক্ষপথে প্রবাহিত হচ্ছে দিন-রাত, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-উপগ্রহ। সূতরাং আল-আসর গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই আল-আসরের মাঝেই আপনার চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারিত হয়, এর মাঝেই আল্লাহ ﷻ-এর তাঁর অলৌকিক নিদর্শনের অনেকগুলোকে প্রকাশ করেন।

সময় এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, একজন ব্যক্তির জীবনের শেষ মুহূর্তটি হতে পারে তার চূড়ান্ত গন্তব্য নির্ধারণের কারণ। এই মুহূর্তে সে যদি শাহাদাহ পাঠ করে, তবে তা তাকে নিয়ে যেতে পারে চিরস্থায়ী ধ্বংস থেকে জান্নাতের দিকে; সেই জান্নাত যা আসমান ও জমিনের চেয়েও সুবিশাল। যদি জীবনের অল্প কিছু মুহূর্ত একজন ব্যক্তিকে চিরস্থায়ী ধ্বংস থেকে জান্নাতের বাগানে নিয়ে যেতে পারে, তাহলে ভেবে দেখুন আপনার পুরো জীবনে এই সময়ের মূল্য কত! ভেবে দেখুন সময় কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আর তাই আল্লাহ ﷻ সময়ের শপথ করছেন।

দ্বিতীয় অভিমত : নবি মুহাম্মাদ ﷺ এর যুগ

দ্বিতীয় অভিমত হলো, আল-আসর বলতে নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর যুগকে বোঝানো হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগ হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং আদর্শ যুগ। এটাই এ উম্মাহর 'সোনালি যুগ'। কারণ, আমরা সবকিছুতে সিদ্ধান্তের জন্য বারবার এ যুগের কাছে ফিরে যাই। সোনালি এ যুগের শিক্ষায় নিজেদের জীবনকে সাজিয়ে না তোলা পর্যন্ত এই উম্মাহ কখনো সফলতা অর্জন করতে পারবে না। রাজনীতি থেকে শুরু করে ইবাদত, আকিদাহ, শিষ্টাচার, সঠিক পথ-নির্দেশনা—সবকিছুর শিক্ষা এই সর্বোত্তম সোনালি যুগ থেকে গ্রহণ করতে হবে।

এটা হলো দ্বিতীয় মত।

তৃতীয় অভিমত : দিনের শেষাংশ

তৃতীয় অভিমত হলো, আসর হলো দিনের শেষাংশ। কাতাদাহ র‍াদী তাঁর অনেকগুলো মতের মধ্যে আল-আসর সম্পর্কে একটি মত দিয়েছেন যে, আল-আসর হচ্ছে দিনের সর্বশেষ সময়;

অর্থাৎ সূর্যাস্তের আগমুহূর্ত। সাধারণত যে সময় সবাই কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরতে শুরু করে। দিন শেষে কর্মস্থল থেকে ঘরে ফিরে মানুষ সারা দিনের লাভ-ক্ষতির হিসাব করে। চিন্তা করতে থাকে, ওই দিনে সে কী কী অর্জন করল বা হারাল। আল্লাহ ﷻ চান দুনিয়াবি এই জীবনের ব্যস্ততা থেকে সাময়িক অবসর পেয়ে আপনি যখন পার্শ্বব-হিসেব-নিকেশ মেলাতে শুরু করেন, তখন যেন আখিরাতের প্রতিও মনোযোগী হন। তিনি চান আপনি যেন এই সময়ে আখিরাতমুখী হন, দুনিয়ার পাশাপাশি আখিরাতের লাভ-ক্ষতি নিয়েও চিন্তা-ভাবনা করেন।

আখিরাত একটি ব্যবসায়িক লেনদেন। আল্লাহ ﷻ স্বয়ং একে ব্যবসা বলেছেন। দিন শেষে যেমন আপনি লাভ-ক্ষতির হিসেব করেন, ব্যর্থতা-অর্জন নিয়ে ভাবেন, ঠিক তেমনি আখিরাত নিয়েও করবেন। আল্লাহ ﷻ বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, নামায কয়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসা আশা করে, যাতে কখনো লোকসান হবে না। (সূরা আল-ফাতির, ২৯)

তিজারাহ হলো ব্যবসায়িক লেনদেন। আল্লাহ ﷻ আখিরাতকে একটি ব্যবসায়িক লেনদেন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এ এমন এক ব্যবসা যা দুনিয়াবি ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে এমন এক লেনদেনের কথা বলা হচ্ছে, দুনিয়াবি ব্যবসার মতো যা কখনো ধ্বংস হয় না। এমন এক লেনদেন যেখানে কোনো লস নেই, শুধুই প্রফিট। তাই দিন শেষে যেমন আপনি দুনিয়া নিয়ে ভাবেন, ঠিক তেমনি আখিরাত নিয়েও ভাবুন। আল্লাহ ﷻ চান, আপনি এই সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার করুন।

আমার এক উস্তাদ তাঁর উস্তাদের কাছ থেকে শোন। একটি কথা আমাকে বলেছিলেন। অথবা তিনি কোথাও এটা পড়েছিলেন বা শুনেছিলেন, আসলে আমি সঠিক মনে করতে পারছি না; কিন্তু কথাটি তাঁর অন্তরে গাঁথে গিয়েছিল আর তাঁর কাছ থেকে শোনার পর কথাটি আমার অন্তরেও গাঁথে গেছে। তিনি বলেছিলেন, আলিমগণ আল-আসরের মূল্য অনুধাবন করতেন যখন তাঁরা ঠেলাগাড়িতে করে বরফ ফেরি করে বেড়ানো বিক্রেতার দিকে তাকাতে। আমি শেষবার হজে গিয়েছিলাম নব্বই দশকের মাঝামাঝি। সেই সময়টাতে হজের মৌসুমে উত্তপ্ত গরমের মধ্যে মিনা, আরাফাহ ও মুযদালিফাতে অনেক মালবাহী গাড়িতে করে বড় বড় বরফ-খণ্ড বিক্রি করা হতো। এমন একজন বিক্রেতার কথা চিন্তা করুন। সে যদি প্রতিটা সেকেন্ডের সুযোগ না নেয় এবং বরফগুলো বিক্রি না করে, তাহলে কী হবে? বরফগুলো গলতে শুরু করবে। যদি সে বরফের গাড়িটি রেখে মিনার তীব্র তাপে বিশ্রাম নিতে থাকে, অলসভাবে বসে সময় কাটায়, তাহলে বরফগুলো তরল পানিতে পরিণত হবে আর তার বিনিয়োগ করা অর্থ,

তার মূলধন ও ল্লাভ সব নিঃশেষ হয়ে যাবে। অনর্থক গলে বরফ যখন ধুলোর সাথে মিশে যাবে তখন বিলাপ আর আফসোস ছাড়া তার আর কিছু করার থাকবে না। কোনোভাবে সে আর এই হারানো সম্পদটি ফিরে পাবে না। এই বরফ হলো আল-আসর, আপনার সময়। আপনি যদি একে বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজে না লাগান, তাহলে এটি পানির নিষ্ফল ফোঁটার মতো হারিয়ে যাবে অলিগলি আর নর্দমায়। আর কখনো আপনি তা ফিরে পাবেন না।

কুরআন খুললেই আপনি বুঝতে পারবেন, এ কেমন অসাধারণ কিতাব! আল্লাহ ﷻ সূরা আদ-দুহাতে পূর্বাহ্নের শপথ করেছেন। আল্লাহ ﷻ এমন সময়ের শপথ করেছেন যখন দিনের আলো থাকে, মানুষজন কাজকর্ম করে। আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَالصُّحَىٰ

পূর্বাহ্নের শপথ। (সূরা আদ-দুহা, ১)

দিনের শুরুতে মানুষের কর্মোদ্দীপনা শুরু হয়। তারা স্থূল-কলেজে যায়, ব্যবসা শুরু করে, অফিসে যায়—এ সময়টাই দুহা। দিনের প্রথমভাগ। এর কয়েক আয়াত পর আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ

আপনার পালনকর্তা সত্ত্বরই আপনাকে দান করবেন, অতঃপর আপনি সন্তুষ্ট হবেন। (সূরা আদ-দুহা, ২)

আর দিনের আলোর নামে এই শপথের কিছুক্ষণ পরই আল্লাহ ﷻ তাঁর নবিকে প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। দিনের প্রথমভাগের শপথের সাথে আল্লাহ ﷻ পুরস্কারের প্রতিশ্রুতিকে যুক্ত করলেন। কিন্তু সূরা আল-আসরের দিকে তাকালে আপনি দেখবেন আল্লাহ ﷻ দিনের শেষভাগের শপথ করে বলছেন,

‘কালের শপথ, নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত।’

তৃতীয় অভিমত অনুযায়ী আসর হচ্ছে দিনের শেষভাগ, সূর্য ডোবার আগমুহূর্ত। যখন মানুষজন কর্মস্থল থেকে ফিরে আসে। যখন একটি দিন শেষ হয়ে পরবর্তী দিন শুরু হয়, কারণ হিজরি মতে নতুন দিনের সূচনা ধরা হয় মাগরিবের সময় থেকে।

আল্লাহ ﷻ বলছেন :

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ

নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত।

কেন মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত বলা হয়েছে? কারণ, এখন দিন শেষ হয়ে গেছে আর এ দিনকে যদি

আপনি কাজে না লাগিয়ে থাকেন, তাহলে আপনার বরফ গলে পানি হয়ে গেছে। অন্যদিকে সূরা আদ-দুহায় দিনের শুরুতেই আল্লাহ ﷻ আপনাকে ভালো কাজে উৎসাহিত করতে দুহার নামে শপথ করে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। সুতরাং তৃতীয় মতানুযায়ী, যদি আপনি পুরো দিনকে সং কাজে ব্যয় না করেন, তবে দিনের শেষে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত বলে বিবেচিত হলেন।

চতুর্থ অভিমত : সালাতুল আসর বা আসরের সালাতের ওয়াস্ত

ইবনু উমার রাঃ থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন,

«الَّذِي تَقُوُّهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّكَ تُرَى أَهْلَهُ وَمَالَهُ»

‘যার আসরের সালাত ছুটে গেল, সে যেন পরিবার, সম্পত্তি সব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেল।’^[১০১]

অপর এক বর্ণনায় আছে,

مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ

যে ব্যক্তি আসরের সালাত ত্যাগ করল, তার আমল বিনষ্ট হয়ে গেল।^[১০২]

লক্ষ করুন, এ হাদিসগুলোতে আসরের সালাতের সময় মিস করার কথা বলা হচ্ছে। সালাত একেবারে ত্যাগ করার কথা কিন্তু বলা হচ্ছে না। এটা হলো শুধু আসরের সালাত ওয়াস্তে না পড়ার পরিণতি। কল্পনা করুন, আপনার খুব ভালো একটি চাকরি আছে। আছে সুখের সংসার। বেশ চমৎকার সময় কাটাচ্ছেন আপনি। হঠাৎ একদিন দেখলেন আপনার চাকরি, পরিবার, ধন-সম্পত্তি কিছুই নেই। এককথায় আপনি নিঃস্ব, রিক্ত এবং দেউলিয়া। আপনার কেমন লাগবে? ওই মুহূর্তে আপনার যে তীব্র কষ্টের অনুভূতি হবে, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন আসরের সালাতের ওয়াস্ত মিস করা লোকের অবস্থা তার চেয়েও করুণ।

নির্বাচিত অভিমত :

আল্লাহ সঃ-এর কলাম মুজিবা এবং এর অর্থ অনেক ব্যাপক। একই শব্দ অনেক সময় অনেকগুলো অর্থকে ধারণ করে। আত-তাবারি রাঃ-এর মতে, আল-আসরের ব্যাপারে সঠিক অভিমতটি হলো আল্লাহ সঃ এখানে যুগের কসম করেছেন। দিন, রাত, অপরাহ্ন, সমস্ত সময় এর আওতাভুক্ত। আল্লাহ সঃ এখানে নির্দিষ্ট করে কোনো সময়ের কথা উল্লেখ করেননি। তাই যা কিছু সময়ের আওতায় পড়ে সে সবই এই একটি আয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম আত-তাবারি রাঃ-এর এই মতটিই গ্রহণ করেছেন আশ-শানকিতি রাঃ। আমি আদওয়াযুল বায়ান-এর লেখক শানকিতির কথা বলছি। শানকিতি নামে অনেক মানুষ আছে,

আর এই নামে অনেক আলিমও আছেন। কিন্তু যখন আপনি বলবেন আশ-শানকিত্তি, তখন ইলমের সম্পর্শে থাকা মানুষজন মুহাম্মাদ আমিন আশ-শানকিত্তি রহিমতুল্লাহ-এর কথাই চিন্তা করবে। যেমন : কেউ যদি বলে আল-কিতাব তাহলে আমরা বুঝে নিই যে, কুরআনের কথা বলা হচ্ছে। যদিও কিতাব অনেক আছে।

আমার বাবা যখন মদীনাতে পড়াশোনা করছিলেন তখন আশ-শানকিত্তি রহিমতুল্লাহ সেখানে উদ্ভাদ ছিলেন। তিনি ছিলেন ইলমের এক পর্বতস্বরূপ। আমার খুব ইচ্ছে ছিল তাঁকে দেখার, যদিও আমার সে সুযোগ হয়নি। বাবার কাছে আশ-শানকিত্তি রহিমতুল্লাহ-এর অডিও লেকচারের অনেকগুলো ক্যাসেট ছিল যেগুলো প্রায় পঞ্চাশ বছর পুরনো। খুব যত্নে নিজের বিছানার নিচে তিনি এগুলো গুছিয়ে রেখেছিলেন। আনুমানিক বারো বছর আগে এফবিআই এগুলো হিনিয়ে নেয়। আমার মনে আছে, আমি এসব ক্যাসেট থেকে কিছু কিছু শুনতাম। যার মধ্যে ছিল সূরা তাওবাহর তাফসির। এই মহিরুহসম ব্যক্তির ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন, ইবনু বায, ইবনু উসাইমিন, আব্দুর রাহমান আল-বাররায, হামুদ বিন উকলা আশ-শুআইবি, বাকর আবু যাইদ এবং আতিয়াহ সালিম রহিমতুল্লাহ। আমার বিশ্বাস তাঁর প্রধান ছাত্র ছিলেন আতিয়াহ সালিম রহিমতুল্লাহ, কারণ শায়খ আশ-শানকিত্তি রহিমতুল্লাহ-এর ছাত্র হবার পর থেকে তিনি আর তাঁকে ছেড়ে যাননি। আশ-শানকিত্তি রহিমতুল্লাহ-এর সাথে দেখা হবার পর থেকে তার মৃত্যু পর্যন্ত আতিয়াহ সালিম রহিমতুল্লাহ তাঁর সাথে ছিলেন। আর আতিয়াহ সালিম রহিমতুল্লাহ ছিলেন আমার ও আমার বাবার শিক্ষক।

শাইখ আশ-শানকিত্তি রহিমতুল্লাহ কুরআনের তিনটি তাফসির লিখেছিলেন, এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শেষেরটি এবং এটিই সবচেয়ে অসাধারণ। তিনি এতে কুরআন দিয়ে কুরআনের তাফসির করেছেন। এই তাফসিরের সাতটি খণ্ড আছে, আর সূরা আল-মুজাদালাহর ২২ নম্বর আয়াত পর্যন্ত পৌঁছানোর পর আশ-শানকিত্তি রহিমতুল্লাহ-এর মৃত্যু হয়-রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। তার ছাত্র আতিয়াহ সালিম রহিমতুল্লাহ-আমার বাবার শিক্ষক, আমার শিক্ষক এবং আমি তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ ছাত্র ছিলাম-আশ-শানকিত্তি রহিমতুল্লাহ-এর মৃত্যুর পর তাফসিরের বাকি অংশ শেষ করেন। তারপর তা প্রকাশিত হয় এবং বিশ্বজুড়ে আজ তা আদওয়ায়ুল বায়ান নামে পরিচিত।

বাবার কাছে শুনেছি আশ-শানকিত্তি রহিমতুল্লাহ-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনি কেন তাফসিরের ওপর এত জোর দেন? তিনি উসুলের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ইলমসম্পন্ন ছিলেন, ফিকহের ওপর গভীর জ্ঞান রাখতেন, আকিদাহর ওপর অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক ইলমসম্পন্ন ছিলেন এবং এ বিষয়ে তাঁর লেখা বিভিন্ন ছোট পুস্তিকাও আছে। ইসলামি জ্ঞানের অনেক শাখার ওপর তিনি গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। আরবি ভাষা ও ব্যাকরণের ওপর গভীর দখল রাখতেন। তবুও তাঁর জীবনের একটা বিশাল অংশ তিনি তাফসিরের পেছনে দিয়েছিলেন। এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন, কুরআনের কোনো আয়াতের ব্যাপারে সালাফগণের একজনেরও এমন কোনো মত নেই, যা আমি জানি না। গর্ব করে তিনি এ কথা বলেননি,

নিজের ঘনিষ্ঠ ছাত্রদের সাথে একান্তে আল্লাপে জানিয়েছেন কেবল। আর তাঁর ছাত্ররাও কারা? একেকজন প্রতিভাবান আলিম। আমার বাবা বলেছেন তিনি নিজের কানে এ কথা শুনেছেন। আর অবশ্যই আমি আমার বাবার কথা বিশ্বাস করি এবং তাঁকে ভালোবাসি। আল্লাহ ﷻ তাঁকে নেক আমল সমৃদ্ধ কল্যাণময় দীর্ঘ জীবন দান করুন। পরে মদীনা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবার পর আমি শাইখ আতিয়াহ সালিম রহীম-এর সান্নিধ্যে ছিলাম। একদিন তাঁকে প্রশ্ন করলাম, আমি বাবার কাছ থেকে এ রকম শুনেছি, এ কথোপকথন কি আপনি শুনেছিলেন? শায়খ আতিয়াহ রহীম বললেন, যেই দিন তোমার বাবা এ প্রশ্ন করেছিলেন সেই দিন, সেই স্থান এবং তাঁর চারপাশের অবস্থার কথাও আমার মনে আছে।

আশ-শানকিতি রহীম ছিলেন ইলমের পর্বতস্বরূপ। কুরআনের কোণো আয়াতের ব্যাপারে সালাফদের কোনো মত তাঁর অজানা ছিল না। এখন ছোকরা-বদমাইশ ছেলেপেলে ছুটোছুটি করে বেড়ায় আর নিজেদের এমনভাবে উপস্থাপন করে যেন তারা ইমামুল মুফাসসিরিন। আল্লাহ ﷻ-এর শত্রু এবং মানবজাতির শত্রুদের সন্তুষ্ট করার জন্য তারা ভুচ্ছ মূল্যে আল্লাহ ﷻ-এর আয়াত আর রাসূল ﷺ-এর হাদিস বিক্রিয়ে দেয়।

কিছুদিন আগে এক ভাই এসেছিলেন। তিনি সত্যবাদী ছিলেন, আর আমি তাঁর সত্যবাদিতাকে সম্মান করতে বাধ্য। তিনি আমাকে বললেন, আপনি কি আমাকে একটি তথ্যকিয়্যাহ বা রেকোয়েন্ডেশন লেখে দেবেন যাতে করে আমি অনুক জায়গায় পড়ার সুযোগ পাই? যেহেতু আমি তাঁকে চিনি না, তাই কিছু প্রশ্ন করলাম। তুমি কেন ইলম অর্জন করতে চাও? তুমি কেন ওইখানে পড়তে চাও? উনি বেশ আন্তরিক এবং সং ছিলেন। উনি বললেন, উনি শিখতে চান যাতে করে এ দিয়ে টাকা রোজগার করতে পারেন।

উনি বললেন, উনি অনুক অনুককে চেনেন যারা কেবল আরবি জানে। এরা ইস্টিটিউট খুলে বসেছে আর প্রতিবছর প্রত্যেক ছাত্রের কাছ থেকে ফি নিচ্ছে। তিনি এমন অনেকের নামও বললেন যাদের আমি চিনিও না। এমন একজনের কথা বললেন, যার কাছ থেকে কুরআনের তাফসির শিখতে হলে তাকে টাকা দিতে হয়। এই ভাইটিও এটা চাচ্ছিলেন। কিছু ইলম জোগাড় করে সেটা বেচে খেতে চাচ্ছিলেন।

এখনো ডিম থেকে ফুটে বের হয়নি এমন সব ছেলেছোকরা, নিকৃষ্ট মুফাসসির আজ আমাদের মধ্যে আছে, যখন কাফিরদের ওপর কোনো বিপদ আসে তখন এসব লোকদের সম্মিলিত চিংকারে মিস্তারগুলো কাঁপতে শুরু করে। তারা একে অপরকে উসকে দেয়। আল্লাহ ﷻ-এর আয়াতের অর্থকে তারা বিকৃত করে, হাদিসের অর্থকে বিকৃত করে। আর যখন উম্মাহর ওপর কোনো বিপর্যয় আসে, যখন উম্মাহর ওপর জেনোসাইড চালানো হয়, বাংলাদেশে আমাদের ২,৫০০-৩,০০০ প্রাণপ্রিয় ভাইদের হত্যা করা হয়, তখন তাদের মুখ থেকে কোনো শব্দ বের হয় না। যখন কাফিরদের রক্তপাত হয় তারা তখন একভাবে চিন্তা করে, যখন মুসলিমদের রক্ত ঝরে তখন আরেকভাবে। এরা হলো নপুংসক। আমি আগেও বলেছি এখনো বলছি,

এরা হলো উম্মাহর নপুংসক। নপুংসক হলো সে, যার মধ্যে পুরুষ ও নারী—উভয়ের জননাঙ্ক থাকে, আর তার চিন্তা ও কথার ধরনের মধ্যে সাংঘর্ষিকতা ও বিসদৃশ বৈশিষ্ট্য থাকে। উম্মাহর নপুংসকদের একই অবস্থা।

আসলে এসব বিষাক্ত টিউমারদের চেয়েও বেশি দোষ হলো শ্রোতের টানে ভেসে আসা ভেড়ার মতো ওইসব লোকের যারা এদের অনুসরণ করে—দোষ এই মূর্খ জনগণের। আপনি দেখবেন, অলংকারের ব্যাপারে কোনো ধারণা নেই এমন লোকও নিজের স্ত্রী কিংবা মায়ের নেকলেস অলংকারের দোকানির কাছে সারানোর জন্য আধাঘণ্টার জন্য রাখার আগেও দশবার ভাবে। এই দোকানি বিশ্বস্ত কি না, সে ভালো কাজ জানে কি না, দক্ষ কি না—নেকলেস দেয়ার আগে সে এ ব্যাপারগুলো নিশ্চিত হয়ে নেয়। ডাক্তারের ক্ষেত্রেও একই কথা। সে খুঁজে খুঁজে সেয়া ডাক্তারকে বের করে তার কাছে যায়। কিন্তু যখন ঘ্রীনের প্রশ্ন আসে, কোনো যাচাইবাছাই ছাড়া সে এসব নপুংসকদের কাছ থেকে ঘ্রীন গ্রহণ করবে।

যা হোক, আমরা মূল আলোচনাতে ফিরে যাই। সূরা আল-আসরের এই আয়াতের ব্যাপারে শায়খ আশ-শানকিতি রহিমাহুল্লাহ ইমাম আত-তাবারি রহিমাহুল্লাহ-এর মতই গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ আল-আসর হলো সম্পূর্ণ সময়। অর্থাৎ শাইখ আশ-শানকিতি রহিমাহুল্লাহ-এর মতে, আল-আসর হলো আপনার পার্শ্ববর্তী জীবনকাল অথবা সৃষ্টির সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত সময়কাল। তাঁর অভিমত ইমাম আত-তাবারি রহিমাহুল্লাহ-এর মতের খুব কাছাকাছি। কত অসাধারণ ও অনন্য উপায়ে শাইখ আশ-শানকিতি রহিমাহুল্লাহ এই উপসংহার টানলেন এবং এর পক্ষে দলিল দিলেন তা তুলে ধরার জন্য আমি এখানে তাঁর কথা বললাম। তিনি বলেছেন, সূরা আল-আসর এর আগে আসে সূরা আত-তাকাসুর। যেখানে আল্লাহ স্বত্বাহু ওইসব লোকেদের প্রতি নিন্দা জানাচ্ছেন যারা কবরের সাক্ষাৎ পাবার আগ পর্যন্ত দুনিয়ার প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত থাকে। আবার সূরা আল-আসরের পর এসেছে সূরা আল-হুমাযাহ। এখানেও আল্লাহ স্বত্বাহু বলেন :

الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ - يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ - كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ - وَمَا أَرْزَاكَ مَا الْحُطَمَةُ - نَارُ اللَّهِ الَّتِي تَوَقَّدُ

যে অর্থ সঞ্চয় করে ও গণনা করে। সে মনে করে যে, তার অর্থ চিরকাল তার সাথে থাকবে! কখনো না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামাহর মধ্যে। আপনি কি জানেন, হুতামাহ কী? এটা আল্লাহর প্রদলিত অগ্নি। (সূরা আল-হুমাযাহ, ২-৬)

আল্লাহ স্বত্বাহু এখানে বলছেন, সঞ্চয় সম্পদ তোমাদের চিরজীবী করতে সক্ষম নয়। সুতরাং, এখান থেকে মানুষের শিক্ষা নেয়া উচিত সময়ের সদ্ব্যবহার করার, যাতে করে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে সফল হওয়া যায়। এ থেকে বোঝা যায়, যেহেতু সূরা আল-আসরের আগের এবং পরের সূরাগুলোতে দুনিয়াবি জীবনে সময়ের সঠিক ব্যবহার না করার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে এবং সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহারের দিকে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, সুতরাং এই দুইয়ের

মধ্যবর্তী সূরাটি অর্থাৎ সূরা আল-আসরও একই তাৎপর্য বহন করে। অর্থাৎ এখানে দুনিয়ার জীবনে সময়ের সদ্ব্যবহার করা। শায়খ আশ-শানকিতি رحمته-এর মতে সূরা আল-আসরের মূলভাবকে বুঝতে হলে, আমাদের এর আগের ও পরের সূরার মূলভাবকে জানতে হবে, সেটা অনুযায়ী সূরা আল-আসরকে বুঝতে হবে।

আল-আসরের গুরুত্ব :

‘আসর’ শব্দটি তিনটি আরবি অক্ষরের সমন্বয়ে গঠিত—আইন, সাদ, রা। একটি মাত্র শব্দ, কিন্তু গুরুত্ব অনুধাবনকারীদের জন্য এই ছোট শব্দটির ভার অনেক। অধিকাংশ মানুষ সময়ের মূল্য দেয় না। বিশেষ করে বর্তমান যুবসম্প্রদায় একেবারেই সময়ের মূল্য দেয় না। তরুণেরা আমাদের ভবিষ্যৎ, সামনে এক বিরাট পথ তাদের পাড়ি দিতে হবে। কিন্তু সময়ের মূল্য না জানার কারণে তারা সময়ের অপচয় করে চলেছে।

সহিহ বুখারিতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

يَغْمَتَانِ مَغْبُورٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصَّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

বেশির ভাগ মানুষই দুটো নিয়ামতের ব্যাপারে উদাসীন—একটি হলো অবসর সময়, অপরটি সুস্থতা।^[১৭]

কারণ হয়তো সুস্বাস্থ্য আছে, কিন্তু সে না একে ধ্বিনের জন্য কাজে লাগাচ্ছে আর না দুনিয়ার কোনো বৈধ কাজে ব্যবহার করেছে। সময়ের ক্ষেত্রেও একই কথা। সময় হলো ঘূর্ণায়মান চাকার মতো, যে অংশ পার হয়ে যায় তা আর ফিরে পাওয়া যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় মানুষ সময়ের মূল্য উপলব্ধি করে শেষ বয়সে পৌঁছানোর পর। তারা এমন একটা সময়ে এসে উপলব্ধি করে যখন সময়কে কাজে লাগানোর সেই সুস্বাস্থ্য তাঁদের থাকে না। অন্যদিকে হারানো সময়কেও তখন আর ফিরে পাওয়া যায় না। অতীত কেবলই অতীত। অপরদিকে তরুণদের রয়েছে অফুরন্ত সময়, আল-আসর। তাদের আছে সুস্বাস্থ্যের সম্পদ। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা সেগুলোর অবহেলা ও অপচয় করছে। আপনি এমন বৃদ্ধদের পাবেন যারা শেষ সময়ে এসে সময়ের মূল্য উপলব্ধি করেছেন, কিন্তু এখন তারা ওয়াকার বা হুইল চেয়ারে আবদ্ধ, তাঁদের সময় কেটে যায় হাসপাতাল আর ডাক্তারের কাছে আসা-যাওয়া করে। বার্বক্যে পৌঁছলে মানুষের মাঝে প্রজ্ঞা আসতে শুরু করে, অতীতের সময়ের জন্য সে আফসোস করে। যদি সময়টা হারামের পেছনে ব্যয় না হয়ে নিছক মুবাহ কাজেও ব্যয় হয়, তবুও একজন সত্যিকারের প্রজ্ঞাবান বৃদ্ধ এই সময়ের জন্য আফসোস করবেন-ই।

মনোযোগী হোন, এ থেকে শিক্ষা নিন, সময়ের সদ্ব্যবহার করুন। যারা এখনো তরুণ্যে আছেন এ সময়কে কাজে লাগান। কারণ, আপনাদের এখনো সুযোগ আছে। জীবনের

গুরুত্বপূর্ণ সময়টি আপনারা পার করছেন। আপনারা আছেন তাকুণ্য এবং শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতার তুঙ্গে। ইবাদত ও দাওয়াহর ক্ষেত্রে এ সময় ও সক্ষমতার সদ্ব্যবহার করুন। জীবনের একটি মুহূর্তও অপচয় হতে দেবেন না।

এই ব্যাপারে প্রখ্যাত একটি প্রবাদ আছে যা গুরুজনেরা আগে তাঁদের শিষ্যদের বলতেন— যৌবনে মুখস্থ করা হচ্ছে পাথরে ওপর খোদাই করার মতো, আর বার্ধক্যে মুখস্থ করা হলো পানিতে লেখার মতো। আমার বাবা অবশ্য এ কথার সাথে দ্বিমত করেন। আল্লাহ ﷻ তাঁকে বারাকাহ দিন, আমলপূর্ণ দীর্ঘ হায়াত নসিব করুন, তাঁকে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে দাখিল করুন। এখন তাঁর বয়স প্রায় পঁচাত্তর বছর হওয়া সত্ত্বেও বাবা বলেন, এখন তাঁর স্মৃতিশক্তি তাঁর তাকুণ্যের চেয়েও ভালো কাজ করে।

হাসান আল-বাসরি ﷺ বলেছেন, আমি এমন লোকদের দেখেছি যারা টাকার চেয়ে সময়ের ব্যাপারে বেশি কৃপণতা করতেন। টাকা চাইলে তাদের উদার পাবে, কিন্তু সময় চাইলে তারা তোমাকে দিতে চাইবে না। রাবি ইবনু সুলাইমান ﷺ বলতেন, আশ-শাফে'ঈ ﷺ রাতকে তিন ভাগে ভাগ করতেন। এক ভাগে লেখালেখি করতেন, আরেক ভাগে সালাত আদায় করতেন এবং আরেক ভাগে তিনি ঘুমাতে। এক মুহূর্তও অপচয় করতেন না। এক ব্যক্তি আমির ﷺ-এর কাছে এল। তিনি দেখলেন, লোকটি অনর্থক কথা বলছে। সে বলল, আমি আপনার সাথে কথা বলতে চাই। আমির ﷺ বললেন, যদি সূর্যকে থামাতে পারো তবেই আমরা বসে আলাপ করতে পারি। অর্থাৎ, সময়কে থামাতে পারলে বসে কথা বলা যেতে পারে। অন্যথায় আমার সময়ের দাম আছে, আমি এর উপযুক্ত ব্যবহার করব। হাম্মাদ ইবনু সালামাহ ﷺ তাঁর উস্তাদ সুলাইমান আত-তাইমি ﷺ সম্পর্কে বলেছেন, যখনই উস্তাদকে দেখতাম তখনই তিনি ওয়ু অবস্থায় থাকতেন, হয় জানাজা পড়াতেন অথবা মাসজিদে পাঠরত বা পাঠদানে ব্যস্ত থাকতেন। মুহাদ্দিস সুলাইমান আত-তাইমি ﷺ রাসূল ﷺ-এর হিজরতের ছেচল্লিশ বছর পর জন্মগ্রহণ করেন। হাম্মাদ ইবনু সালামাহ ﷺ বলেন, একসময় তাঁর অবস্থা দেখে আমার মনে হলো তিনি যে পাপ করবেন, এই চিন্তা করারও সময় পেতেন না।

আয-যাহাবি ﷺ খাতীব আল-বাগদাদি ﷺ-এর জীবনীতে উল্লেখ করেছেন, রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময়ও তাঁর হাতে বই থাকত, আর এই পুরোটা সময় পড়তেন। অপচয় করার মতো কোনো সময় তাঁর ছিল না। আবু ওয়াফা আলি ইবনু আকিল ﷺ বলতেন, জীবনের এক মুহূর্ত সময় অপচয় করাও আমার জন্য জায়েজ না। যদি আমি চোখকে কাজে না লাগাই তবে মুখ সচল রাখি; যখন মুখ সচল থাকে না তখন আমার অন্তরকে কাজে লাগাই, কী পড়লাম আর ছাত্রদের কী শিখালাম এই নিয়ে গভীর চিন্তা করি।

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে শপথ :

আল্লাহ ﷻ তাঁর সৃষ্টিকে নিয়ে শপথ করেছেন। শপথ করেছেন মানুষ, প্রাণী ও

জড়বস্তুর। তিনি আদ-দুহা'র শপথ করেছেন, শপথ করেছেন আল-লাইলের, আল-ফাজরের। কিন্তু মানবজাতির মধ্যে কেবল একজনকে নিয়ে তিনি শপথ করেছেন—নবি মুহাম্মাদ ﷺ।

আল্লাহ ﷻ বলেন :

لَعَنَّاكَ إِنَّمَا لَفِي سَكَرَتِهِمْ يَتَمَثَّلُونَ

আপনার প্রাণের শপথ, তারা আপন নেশায় প্রমত্ত ছিল। (সূরা আল-হিজর, ৭২)

কোনো বিষয়ের পেছনের হিকমাহ সম্পর্কে যদি আমাদের জ্ঞান না থাকে অথবা কুরআন ও সহিহ হাদিসের কোনো ব্যাপার যদি আমরা বুঝতে না পারি, তবুও সে বিষয়ে কোনো ধরনের আপত্তি করা যাবে না। কক্ষনো না; আপত্তি করলেই আপনি ইবলিসের কাতারে চলে যাবেন। সে আপত্তি করেছিল, আর এই কারণে আজ তার এই অবস্থা।

قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتُ طِينًا.....

কিন্তু সে বলল, আমি কি এমন কাউকে সিজদাহ করব, যাকে আপনি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন? (সূরা আল-ইসরা, ৬১)

তার মনে এটা এল না যে, আল্লাহ ﷻ তাকে আদেশ করছেন; বরং সে বলল, আপনি কি আমাকে কাদামাটি থেকে সৃষ্ট মানুষকে সিজদাহ করতে বলছেন? শয়তানের অগ্নিপরীক্ষা শুরু হয়েছিল আল্লাহ ﷻ-এর আদেশের ওপর আপত্তি তোলা দিয়ে। কাজেই কোনো কিছু যদি কুরআন ও সহিহ হাদিসে থাকে তবে আপনাকে বিনা দ্বিধায় তা মেনে নিতে হবে। আল্লাহ ﷻ বলেন :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّنَّا فَضَلَّيْتُ وَتَسْلَمُوا تَسْلِيمًا

অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোনোরকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে। (সূরা আন-নিসা, ৬৫)

নুসুসের ওপর আপত্তি করা যাবে না। নুসুসের ব্যাপারে আপত্তি তোলা ব্যক্তির ব্যাপারে যদি হুসন আদ-দান বা ভালো ধারণা রাখতে চান, যদি তাকে বেনিফিট অফ ডাউট দিতে চান, তাহলে তার মধ্যে বড় শয়তান ইবলিসের বৈশিষ্ট্য আছে বলার পরিবর্তে সর্বোচ্চ এটুকু বলা যেতে পারে যে—তার মধ্যে শয়তানের বৈশিষ্ট্য আছে। এই ব্যাপারে আমাদের সব কথাই আসলে এই আয়াতের শিক্ষার মাঝে পড়ে :

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ

তিনি যা করেন, তৎসম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না; বরং তারা ই জিজ্ঞাসিত হবে। (সূরা আল-আখিয়া, ২৩)

আপনি কখনো আল্লাহ ﷻ-কে প্রশ্ন করতে পারেন না। আপনিই আল্লাহ ﷻ-এর কাছে জিজ্ঞাসিত হবেন। যাকে প্রশ্ন করা হবে সে কখনো প্রশ্নকর্তাকে প্রশ্ন করতে পারে না। আল্লাহ ﷻ-এর হুকুম নিয়ে প্রশ্ন করার অধিকার কারও নেই। আপনি অনেককে বলতে শুনবেন যে, আল্লাহ কেন শপথ করলেন? যদি সে ঈমানদার হয়ে থাকে, তাহলে ঈমানদারেরা তো কোনো প্রশ্ন ছাড়া এর প্রতি ঈমান এনেছে। আর কাফিররা তো কখনোই বিশ্বাস করতে চাইবে না। আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَلَيْنِ أَتَيْنَا الَّذِينَ أَوْثَرُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ.....

যদি আপনি আহলে কিতাবদের কাছে সমুদয় নিদর্শন উপস্থাপন করেন, তবুও তারা আপনার কিবলা মেনে নেবে না। (সূরা আল-বাকারাহ, ১৪৫)

আপনি যদি তাদের আল্লাহ ﷻ-এর প্রত্যেকটি নির্দেশ এনেও দেখান, তারা মেনে নেবে না। যেমন : অনেকে বলে, 'সাদ ইবন মুয়ায রাঃ -এর মৃত্যুতে আল্লাহ ﷻ-এর আরশ কেঁপে ওঠেছিল, আমি এটা বিশ্বাস করি না; আনি জানি এই হাদিস সহিহ, কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না।' এ রকম মনোভাব রাখা যাবে না।

কেন কুরআন ও সুন্নাহয় শপথের কথা এসেছে :

আল্লাহ ﷻ-এর শপথের বিষয়ে কুরআন, সুন্নাহ ও সালাফদের বক্তব্যের মূলনীতির আলোকে আলিমগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কেন কুরআন ও হাদিসে শপথের বিষয়টি এসেছে এ ব্যাপারে তিনটি ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হলো :

১. বর্তমানে বিভিন্ন ভাষায় কুরআনের তরজমা হয়েছে। এখন অনেকে ইংলিশে বা অন্য কোনো ভাষায় কুরআনের অনুবাদ পড়ে থাকেন। আর এ কারণে অনেকে ভুলে যান যে কুরআনের ভাষা আরবি, আরবিতেই কুরআন নাযিল হয়েছিল। আরবিতে কোনো কিছু সুনিশ্চিত করতে শপথ করা হয়। যে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, সেই জ্ঞাত বিষয়ের প্রতি জোর দেয়ার জন্য আরবি ভাষায় শপথ করা হয়। এটি আরবি ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য, আর আমাদের মাথায় রাখতে হবে আরবি ভাষা সমৃদ্ধির শীর্ষে থাকার সময় কুরআন নাযিল হয়েছিল। কুরআনে শপথ আসার এটা হলো একটা কারণ।

২. যখন কোনো বিষয়ে শপথ করা হয়, একজন মুমিনের বিশ্বাস দৃঢ় হয়। একজন মুমিনের

ঈমান দৃঢ় করার জন্য অন্যান্য উদাহরণ ও প্রমাণ ব্যবহার করায় কোনো সমস্যা নেই। এ বিষয়টি অস্বীকারের কোনো কারণ নেই। যেমন : ইবরাহিম ﷺ বলেছিলেন,

رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَتْ أَوْلَمْ تُؤْمِنْ قَالَتْ بَلَىٰ وَلَكِنْ إِنِّي ظَنَمْتُ لِقَابِي.....

হে আমার পালনকর্তা আমাকে দেখাও, কেমন করে তুমি মৃতকে জীবিত করবে। বললেন, তুমি কি বিশ্বাস করো না? বলল, অবশ্যই বিশ্বাস করি, কিন্তু দেখতে এ জন্য চাইছি যাতে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতে পারি। (সূরা বাকারাহ, ২৬০)

আল্লাহ ﷻ-এর খলিল বলছেন, আমি ঈমান রাখি, তবুও আমার ঈমানকে মজবুত করতে চাচ্ছি। সুতরাং, শপথ মুমিনদের বিশ্বাসকে আরও মজবুত করে।

৩. কোনো বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ বা মনোযোগ আকর্ষণের জন্যও শপথ করা হয়। যে বিষয়ে এবং যার দ্বারা শপথ করা হয় তার গুরুত্বের দিকে পাঠকের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। মাজমু আল ফাতাওয়ায় প্রথম খণ্ডে ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ ﷻ তাঁর কিছু সৃষ্টির নামে শপথ করেছেন; সেগুলোকে সম্মানিত করতে, গুরুত্ব দিতে, মনোযোগ আকর্ষণ ও প্রশংসা করতে।

আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَالْعَصْرِ - إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ

কালের শপথ, নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা আল-আসর, ১-২)

এখানে ۞ হচ্ছে তাওকিদ; যার অর্থ জোর দেয়া, প্রতিশ্রুতি ও নিশ্চিতকরণ। আবার এখানে ۞-এর লামের মাধ্যমেও তাওকিদ বোঝানো হচ্ছে। অর্থাৎ জোর দেয়া, নিশ্চিত করা হচ্ছে। সুতরাং ۞ এর মাধ্যমে ও ۞ এর মাধ্যমে দ্বিতীয় আয়াতে দুইবার প্রথম আয়াতের শপথের নিশ্চিত করা হয়েছে।

কোনো বিষয়ের সম্মান ও সত্যায়নের জন্যও শপথ করা হয়। যেমন কুরআনে এসেছে :

وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ

আর তোমার কাছে সংবাদ জিজ্ঞেস করে, এটা কি সত্য? বলে দাও, অবশ্যই আমার স্রবের কসম, এটা সত্য। আর তোমরা পরিত্রাণ করে দিতে পারবে না। (সূরা ইউনুস, ৫৩)

আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ.....

কাফেররা বলে আমাদের ওপর কেয়ামত আসবে না। বলুন কেন আসবে না? আমার

পালনকর্তার শপথ, অবশ্যই আসবে। (সূরা আস-সাবা, ৩)

তিনি আরও বলেন :

رَعِمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

কাফেররা ধারণা করে যে, তারা কখনো পুনরুত্থিত হবে না। বলুন, অবশ্যই হবে, আমার পালনকর্তার কসম, তোমরা নিশ্চয় পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমাদের অবহিত করা হবে যা তোমরা করতে। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। (সূরা আত-তাগাবুন, ৭)

এই তিনটি ক্ষেত্রে আল্লাহ ﷻ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে শপথ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এই শপথগুলো করা হয়েছে পুনরুত্থান নিয়ে, পুনরুত্থানকে স্মরণ করিয়ে দেয়া ও এর গুরুত্ব বোঝানোর জন্য। হাদিসে অন্যান্য আরও শপথের উদাহরণ এসেছে। যেমন :

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ
وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ

অনেক হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এভাবে শপথ করার বিষয়টি এসেছে। মনে রাখুন, তিনি সেই রাসূল যিনি সৎ ও বিশ্বস্ত এবং তার ওপর তিনি শপথ করছেন। তিনি শপথ করছেন কারণ তিনি আল্লাহ ﷻ-এর পক্ষ থেকে শপথ করার জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছেন। শপথ এই জন্য যেন আমরা সাবধান হই, যেন শপথগুলো আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে, শপথ করে যে বিষয়ের কথা বলা হচ্ছে সেগুলোর গুরুত্ব ও তাৎপর্য আমরা অনুধাবন করতে পারি।

মানুষের শপথ :

আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির যেকোনো কিছু নিয়ে শপথ করতে পারেন; কিন্তু আমরা শপথ করব কেবল আল্লাহ ﷻ-এর নামে। মুসনাদু আহমাদে এক সহিহ হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ دُونَ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ

যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে শপথ করে, সে শিরক করল।^[১০৮]

তিরমিযি ও হাকিমি বর্ণিত আরেকটি সহিহ হাদিসে এসেছে,

مَنْ خَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ وَأُشْرَكَ

যে কেউ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর নামে শপথ করল, সে কুফর বা শিরক করল।^[১০]

কেউ যদি আল-আসর, নিজ মা-বাবা, মা-বাবার জীবন বা তাঁদের কবরের নামে শপথ করে, তবে কি সে কাফির হয়ে যাবে? কেবল বলার মাধ্যমে কি সে কাফির হয়ে যাবে?

এ প্রশ্নের উত্তরের দুটো অংশ আছে :

এক. যার নামে শপথ করা হয়েছে তাকে যদি কেউ আল্লাহ ﷻ-এর সমপর্যায় বা তাঁর চেয়েও বেশি মনে করে, অথবা মনে করে যার নামে শপথ করা হচ্ছে তার আল্লাহ ﷻ-এর মতো কোনো ক্ষমতা আছে বা সে আল্লাহ ﷻ-এর মতো পবিত্র-তবে সে নিজের ইসলামকে নাকচ করে দিয়েছে।

দুই. যদি সে ভুলবশত বলে ফেলে অথবা আল্লাহ ﷻ-এর সাথে কোনোভাবে সমকক্ষ না করে এমনি এমনি বলে, তাহলে এটি ছোট শিরক হবে, গুনাহ হবে।

কেউ নিজ মা-বাবাকে সম্মান করে তাঁদের নামে শপথ করেছে, কিন্তু সে তাদের আল্লাহ ﷻ-এর সমপর্যায়ের, কিংবা আল্লাহ ﷻ-এর চেয়ে বেশি মর্যাদার মনে করে না। এ ক্ষেত্রে সে গুনাহগার হবে আর এটা ছোট শিরক। তার এই কাজের জন্য আল্লাহ ﷻ-এর কাছে তাওবাহ করে ক্ষমা চাইতে হবে। কোনো কোনো আলিমের মতে, যদিও সে এই কাজের কারণে ঈমানহারা হয়নি, বরং ছোট শিরক করেছে, তবুও তাকে পুনরায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়তে হবে।

আল্লাহ ﷻ-এর নামে শপথ করায় কোনো সমস্যা নেই। সূরার দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায় আশিবারের মতো শপথ করেছিলেন। কখনো কখনো আল্লাহ ﷻ নিজেই তাঁকে শপথ করতে বলেছেন। তবে অনেক আলিমের মতে, উত্তম হলো নিজ শপথকে সংরক্ষণ করা, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রেই শুধু শপথ করা। গুরুত্বপূর্ণ না হলে তাঁরা শপথ করতে বারণ করেন। তাঁদের দলিল হলো এই আয়াত :

وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ.....

তোমাদের কসমের হেফায়ত করো। (সূরা আল-মায়িদা, ৮৯)

আল্লাহ ﷻ ব্যতীত অন্য কারও নামে শপথ করা বৈধ, এমনটা প্রমাণের জন্য অনেক সহিহ মুসলিমের একটি হাদিস দলিল হিসেবে ব্যবহার করেন যেখানে বলা হয়েছে, এক ব্যক্তি রাসূল

ﷺ-এৰ কাছে প্রস্ত করলে তিনি তার প্রশ্নের উত্তর দেন এবং তখন সেই ব্যক্তিটি বলে, সে যা শিখেছে তার ওপর আমল করবে।

তখন রাসূল ﷺ বলেন,

أَفْلَحَ وَأَيُّهُ إِنْ صَدَقَ

তার পিতার শপথ, সে যদি সত্যবাদী হয়, তাহলে সে সফল হবে।^{১৬০}

অর্থাৎ রাসূলুলামহি ﷺ ওই ব্যক্তির বাবার শপথ করেছেন।

এই ব্যাপারে আলিমদের মাঝে একাধিক মত রয়েছে :

একটি মত হলো এই বর্ণনা শায় (شاز) অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন।

দ্বিতীয় হলো, যেমন ইবনু আব্বিল বার ﷺ বলেছেন, হাদিসটি বর্ণনা করতে গিয়ে রাবি ভুল করেছেন। আসল বর্ণনাটি হবে এমন, أُنْفَخَ وَاللَّهِ—আল্লাহর শপথ, সে সফল হবে।

তৃতীয় মত হলো, এ ঘটনা শপথের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ার আগে ঘটেছে।

ইবনু মাসউদ ﷺ বলেন,

لَأَنْ أَخْلِفَ بِاللَّهِ كَذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَخْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا

আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু নামে সত্য শপথ করার চেয়ে আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ করা আমার কাছে বেশি পছন্দনীয়।^{১৬১}

অর্থাৎ আল্লাহ ﷻ-এর নামে শপথ করে মিথ্যে বলাও, অন্য কারও বা কোনো কিছু নামে শপথ করে সত্য বলার চেয়ে উত্তম।

উসুল আস-সালাসাহ্ লেখক যে চারটি বুনিয়াদি বিষয়ের কথা বলেছেন সেগুলোর দলিল হলো সূরা আল-আসর। আগের দারসে সূরা আল-আসর নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। ইন শা আল্লাহ আজ আমরা সূরা আল-আসরের তাফসির শেষ করব।

সময়ের অপচয় করবেন না :

সময়ের গুরুত্ব ফুটিয়ে তোলার জন্য আল্লাহ ﷻ আল-আসরের শপথ করেছেন। কাজেই সময়ের অপচয় করবেন না। মনে রাখবেন, আপনার সময়কে পণ্ড করার জন্য শয়তান বিভিন্ন ধরনের কৌশলের অবলম্বন করে। দেখবেন আপনার আখিরাত ও দুনিয়ার জন্য সফলতা বয়ে আনবে এমন ভালো কিছু করার সময় যখন আসে, ঠিক সেই মুহূর্তে আপনাকে পেয়ে বসে উদাসীনতা ও অলসতা। অন্যদিকে শয়তান আপনার কাছে অনর্থক ও ফাহেশা কাজগুলোকে আনন্দদায়ক করে উপস্থাপন করে। এটা শয়তানের অন্যতম একটা ফাঁদ। শয়তানের এ ধরনের হীন চক্রান্ত ও কৌশলের ব্যাপারে সতর্ক হোন, এ থেকে বাঁচার উপায় সম্পর্কে জানুন।

একটি উদাহরণ দিই। ধরুন কেমনো পার্কিং লট বা এ রকম জায়গায় হঠাৎ কোনো বন্ধুর সাথে আপনার দেখা হয়ে গেল। মানুষ এ অবস্থায় কী করে? বন্ধুকে দেখে থামে, তার সাথে কথা বলতে শুরু করে। একসময় আবিষ্কার করে কথা বলতে বলতে পার হয়ে গেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অথচ তার কাছে হয়তো মনে হয়েছে যে মাত্র কয়েক মিনিট পার হয়েছে। এ সময়টুকু তারা গীবত অথবা অপ্রয়োজনীয় আলাপচারিতায় ব্যয় করে। আবার এও হতে পারে যে, তারা হয়তো এমন বিষয়ে কথা বলেছে যা মুবাহ। অর্থাৎ এ কথাবার্তার কারণে তাদের কোনো গুনাহ হয়নি। কিন্তু শয়তানের কাছে এটা মুখ্য না, তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলো আপনাকে আল্লাহ ﷻ-এর আনুগত্য থেকে দূরে রাখা। সে দেখবে কতক্ষণ আল্লাহ ﷻ-এর স্মরণ ও ইবাদত থেকে সে আপনাকে দূরে রাখতে পেরেছে। হিংসার কারণে যা থেকে সে নিজে বঞ্চিত হয়েছে, আপনাকেও সে তা করতে দেবে না।

এতক্ষণের আড্ডাবাজির পর ঘরে ফেরার পর দেখা যায় আপনি অন্যান্য দিনের মতো আজ পাঁচ মিনিটের জন্যও কিয়ামুল লাইলের জন্য দাঁড়াতে পারছেন না। আপনার বোর লাগছে। অথবা ইশা বা ফজরের সালাতে ইমাম রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মতো করে লম্বা তিলাওয়াত করতে শুরু করলে দেখবেন অনেকের পা দোলানো শুরু হয়ে যায়, তারা আনমনে নড়াচড়া শুরু করে, বারবার ঘড়ির দিকে তাকায়, কিংবা এদিক-সেদিক তাকাতে শুরু করে। এটা হলো তাদের বাহ্যিক অবস্থা, হয়তো তাদের মন আরও বেশি বিক্ষিপ্ত। অনেককে দেখবেন, তারা তাদের বন্ধুদের সাথে খুব হাসিখুশি ও ফুরফুরে মেজাজে আড্ডায় বসে, মনোযোগের সাথে তাদের কথাবার্তা শোনে, সময় দেয়। দেখলে মনে হবে তাদের জীবনে দুশ্চিন্তার কোনো বালাই-ই নেই। এদের জিজ্ঞেস করলে দেখবেন বলছে, বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেবার সময় তারা সব দুশ্চিন্তা ভুলে যায়। অথচ যখন সে সালাতে দাঁড়ায়, তখন শয়তান এসে তার জীবনের যাবতীয় দুশ্চিন্তা, স্কুল, পরীক্ষা, চাকরি, সম্ভান ইত্যাদি সবকিছুর কথা মনে করিয়ে দেয়। আর এভাবে যা তার আখিরাতের জন্য কল্যাণকর তা থেকে তার মনোযোগ সরিয়ে দেয়। কুরআন ও সুন্নাহ থেকে আমরা পাই যে মুমিনের চোখের প্রশান্তি হলো সালাত ও যিকির। অথচ আজ সালাত ও যিকির ছাড়া অন্য সবকিছু আমাদের চোখে তৃপ্তিদায়ক হয়ে গেছে।

তাই আল্লাহ ﷻ আল-আসরের শপথ করে সময়ের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আপনার জীবন সময়ের সমষ্টি। প্রতিটি সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা, দিন, মাস ও বছরের সমন্বয় হলো আপনার জীবন। আজকের এই দিনটি অতিবাহিত করা মানে আপনার জীবন থেকে একটি অংশ চিরতরে হারিয়ে যাওয়া। প্রতিটি অতিক্রান্ত দিনের সাথে সাথে আপনি নিজের একটি অংশকে কবর দিচ্ছেন। মাগরিবের সালাত আদায়ের সাথে সাথে আপনার একটি দিন শেষ হয়ে গেছে। শুরু হতে যাচ্ছে পরবর্তী দিনটি। ঠিক তখনই আপনি নিজের একটি অংশকে কবর দিচ্ছেন। এভাবেই আপনার জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে এক একটি অংশ। জীবন ও সময় সম্পর্কে এভাবেই চিন্তা করতে হবে। জীবন একটি দালানের মতো। আপনার বয়স বিশ বছর হওয়া মানে আপনার দালানের বিশটি তলা হয়ে গেছে। ধরুন, কারও দালান অর্থাৎ মোট আয়ু হলো পঁচাত্তর তলা। প্রতিদিন একটি করে দিন বিদায় নিচ্ছে আর এই দালানের একটি করে ইট খুলে নিয়ে জমা করা হচ্ছে আখিরাতে। তাই অনুধাবন করুন যে পেছনে ফেলে আসা প্রতিটি আমলহীন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তকে নিয়ে একদিন আপনাকে ঠিকই আফসোস করতে হবে। যদি আপনি হারানোর মাঝে সময় পার করেন, তাহলে এর ফলাফল কী সবাই জানে। কিন্তু যদি কোনো অর্থহীন মুবাহ কাজেও লিপ্ত হয়ে থাকেন, তবে সেটাও আপনার আফসোসের কারণ হবে। কেননা, এর ফলে আপনি জাম্মাতের উঁচু স্তরে পৌঁছতে পারবেন না। জীবন কতগুলো সময়ের সমষ্টি কেবল। আর এ সময় চলে যাচ্ছে। মনে রাখবেন, আমাদের জাম্মাতে প্রবেশ করতে হবে এই সময়কে কাজে লাগানোর মাধ্যমে।

এ কারণে আল্লাহ ﷻ সময়ের নামে শপথ করেছেন। দুনিয়ার জীবনের প্রতিটি মিনিট আপনার মূলধন। একেকটি দিন অতিবাহিত হওয়া মানে আপনার জীবনের একেকটি দিন হারিয়ে

যাওয়া, নিজের একটি অংশকে দাফন করা।

শপথের মূল বিষয়বস্তু :

সূরা আল-আসরের এ শপথের মূল বিষয়বস্তু কী? কোন বিষয়টি এত গুরুত্বপূর্ণ যে আল্লাহ ﷻ এ নিয়ে শপথ করার মাধ্যমে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছেন?

আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ

নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা আল-আসর, ২)

এ শপথের প্রধান বিষয়বস্তু এই যে, আমরা প্রত্যেকেই ক্ষতিগ্রস্ত। আল-আসরের নামে শপথ করে আল্লাহ ﷻ আমাদের জানাচ্ছেন যে, মানবজাতি ক্ষতিগ্রস্ত। এটা বোঝানোর জন্য শপথ করার জন্য কেন আল-আসরকে বাছাই করা হলো? আল্লাহ ﷻ কেন অন্য কোনো কিছুকে এ ক্ষেত্রে শপথের জন্য বেছে নিলেন না? আল-আসর, সময় হলো আপনার জীবনকাল। আমাদের দুনিয়ার জীবন হলো সময়ের নিদর্শন। এ সময়কে আপনি কীভাবে কাজে লাগাবেন তার ওপরই নির্ভর করছে আপনার জীবনের সফলতা কিংবা ব্যর্থতা। সুতরাং শপথের এই বিষয়বস্তুর সাথে আল-আসরই সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত ও সবচেয়ে বেশি খাপ খায়, আর নিশ্চয় আল্লাহ ﷻ সর্বোত্তম মনোনিয়নকারী।

তারপর আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ

এখানে ইনসানা (إنسان) বলতে মানবজাতিকে বোঝানো হচ্ছে। আপনি যেহেতু মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত, তাই কথটা আপনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

এ ব্যাপারে অবশ্য ইখতিলাফ আছে। কেউ বলেন ইনসানা বলতে এখানে শুধু কাকিরদের বোঝানো হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন এ দ্বারা সমগ্র মানবজাতিই উদ্দেশ্য। আর যদি কোনো আয়াতকে নির্দিষ্ট করার কোনো দলিল পাওয়ার না যায়, সে ক্ষেত্রে কুরআনের আয়াতের ব্যাপক অর্থ গ্রহণের নীতি অনুযায়ী এ ক্ষেত্রে ইনসান অর্থ সমগ্র মানবজাতি নেয়াই সম্ভবত অধিকতর সঠিক মত। শাইখ আশ-শানকিতি رحمه-এর মতও তাই।

মানবজাতি ক্ষতিতে নিমজ্জিত :

খুসর (خُسْر) শব্দটি নামবাচক অর্থ প্রকাশ করে।

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ

এখানে লাফি (لَفِي) এর লাম দ্বারা তাওকিদ তথা জোর সেমা ও নিশ্চিত করা হয়েছে। অন্যদিকে খুসর (خُسْرٍ) শব্দটি ক্রিয়া নয়, বরং অর্থকে আরও বেশি জোরালো ও স্থায়িত্ব দানের জন্য নামবাচক পদ হিসেবে এটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ ﷻ খাসির (خَاسِر) বলেননি, অর্থাৎ 'সে হারানো, সে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে' বলেননি। লাকাদ খাসির (لَقَدْ خَسِرَ), যার অর্থ 'সে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে' বলেননি; বরং আল্লাহ ﷻ বলেছেন লাফি খুসর। তিনি খুসর (خُسْرٍ) নামবাচক পদটি বেছে নিয়েছেন।

একটি উদাহরণ দিলে আপনারা সহজেই বুঝতে পারবেন কুরআনে শব্দ বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কতখানি সূক্ষ্মতা অবলম্বন করা হয়েছে। ধরুন একজন কোটিপতির এক হাজার টাকা হারিয়ে গেছে, এখানে এই ব্যক্তি হলো 'খাসির' (خَاسِر)। কোটি কোটি টাকা থেকে এক হাজার টাকা হারালে কীই-বা আসে যায়? যেহেতু সে চূড়ান্তভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি তাই তাকে বলা হচ্ছে খাসির। কিন্তু যদি ওই ধনকুবের তার কোটি কোটি টাকা হারিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং এর ফলে ক্ষতি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তাহলে এমন পরিস্থিতিতে তার ব্যাপারে 'খুসর' শব্দ প্রয়োগ হবে। সে এখন আর 'খাসির' না, যেহেতু সে চূড়ান্তভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। খুসর মানে চূড়ান্ত ও সামগ্রিক ক্ষতি। এমন ক্ষতি যা তাকে অবরুদ্ধ, আচ্ছন্ন ও আপাদমস্তক পরিবেষ্টন করে রেখেছে।

খুসর কেন নাকিরাহ (অনির্দিষ্ট) হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে

এই আয়াতে কি 'লা ফি খুসর' (لَفِي خُسْرٍ) বলা হয়েছে, নাকি 'লা ফিল খুসর' (لَفِي الْخُسْرِ) বলা হয়েছে? এখানে লা ফি খুসর (لَفِي خُسْرٍ) বলা হয়েছে। 'খুসর' হচ্ছে নাকিরাহ (نَكْرَة—অনির্দিষ্ট), অন্যদিকে আল-খুসর (الْخُسْر) হচ্ছে নির্দিষ্ট। আল-খুসর এর পরিবর্তে নাকিরাহ হিসেবে শুধু খুসর শব্দটি প্রয়োগের দুটো কারণ আছে। এর একটি হলো, এর মাধ্যমে ক্ষতির ব্যাপকতা তুলে ধরা। আরবরা সাধারণত কোনোকিছুর প্রাবল্য ও ব্যাপকতা প্রকাশের জন্য 'আল' বাদ দিয়ে নামবাচক পদ গ্রহণ করে। নাকিরাহ ব্যবহার করে। এ কারণে ক্ষতির বিশালতা বোঝাতে এটি ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লাহ ﷻ 'আলা' (عَلَى) এর বদলে 'ফি' (فِي) ব্যবহার করেছেন

আরেকটি ব্যাকরণগত শিক্ষণীয় বিষয় হলো, আল্লাহ ﷻ এখানে 'আলা' (عَلَى) এর বদলে 'ফি' (فِي) ব্যবহার করেছেন। হিদায়াতের ব্যাপারে বলতে গিয়ে অন্য এক আয়াতে আল্লাহ ﷻ বলেন :

أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ.....

তারা নিজেদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সুপথপ্রাপ্ত। (সূরা আল-বাকারাহ, ৫)

এই আয়াতে আল্লাহ ﷻ (فی) ব্যবহার করেননি। তাহলে আল-আসরে কেন আল্লাহ ﷻ ব্যবহার করলেন? কারণ, এর মাধ্যমে বোঝানো হচ্ছে সে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এবং ক্ষতি তাকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করে আছে। যদি বলা হতো, সে ক্ষতির ওপর (على) আছে তবে এ থেকে মনে হতে পারে যে এটি মাত্রার দিক থেকে কিছুটা কম তীব্র। তাই আল্লাহ ﷻ (فی) প্রয়োগের মাধ্যমে এর গভীরতা ও তীব্রতা সম্পর্কে আমাদের অবহিত করছেন। অর্থাৎ এই ব্যক্তি ক্ষতির দ্বারপ্রান্তে বা কাছাকাছি না, বরং সে সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। ক্ষতি তাকে গ্রাস করে ফেলেছে।

এসব সূক্ষ্ম ব্যাকরণগত বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য হলো, এ থেকে যেন আমরা ক্ষতির মাত্রা উপলব্ধি করতে পারি। এখানে একটি বা দুটি লেনদেন, এক বা দুবছর সময়, সেমিস্টার, কুইজ, কোনো পরীক্ষা ও ব্যবসায়িক লেনদেনে ক্ষতিগ্রস্ত হবার কথা বলা হচ্ছে না। বরং এ হলো এমন ক্ষতি, আপনি আপনার পুঁজি-মুনাফা সব হারিয়ে এখন ঋণগ্রস্ত ও বিরাট বিপর্যয়ের সম্মুখীন। এটা কোনো সাময়িক ক্ষতি না; বরং চিরস্থায়ী ও চূড়ান্ত ক্ষতি। যে ব্যক্তি জাহান্নামী হবে তার জন্য ধ্বংস-আমরা এ থেকে আল্লাহ ﷻ-এর পানাহ চাই। আর যে ব্যক্তি জান্নাতে অবস্থান করবে কিন্তু জান্নাতের যে স্তরে তার পৌঁছুবার আশা ছিল তা পাবে না, সেও কিন্তু এক অর্থে ক্ষতিগ্রস্ত।

এই সূরার সাথে সংশ্লিষ্ট বাস্তব জীবনের কিছু উদাহরণ

এই সূরার সাথে হুবহু মিলে যায় এমন কিছু বাস্তব উদাহরণ আমরা এখন দেখব। প্রথম উদাহরণ হলো ওই ব্যক্তির যে লাভবান হয়েছে, দ্বিতীয়জন কোনো লাভ করতে পারেনি এবং তৃতীয়জন তার পুঁজি ও লাভ দুটোই হারিয়ে এখন ঋণগ্রস্ত।

আপনি যখন আপনার কর্মস্থল কিংবা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে বাড়ি ফেরেন, দিনের এই শেষভাগটি হলো আল-আসর। যে সময়টাতে কেউ তার সারাদিনের কর্মকাণ্ড নিয়ে ভাবতে শুরু করে। আপনি রাতে বাড়ি ফেরেন, পরিবার-পরিজনের সাথে দেখা করেন। হয়তো বাচ্চাদের কুরআন শেখান, হয়তো তাদের সাথে খেলা করেন কিংবা ফরয বা নফল সালাত আদায় করেন। কিংবা হয়তো আপনার স্ত্রীর সাথে মিলিত হন। এমনও হতে পারে যে এ সময়টাতে আপনি কুরআন-চর্চা করেন, অনলাইনে কোনো লেকচার কিংবা কুরআনের তিলাওয়াত শোনেন। হয়তো আপনি ভালো নিয়্যাতে কিছুক্ষণ ব্যায়াম করেন অথবা খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নেয়ার জন্য শোন। আপনার হয়তো নিয়্যাতে থাকে যে, আমি কিছু সময় ঘুমিয়ে নেব যাতে লম্বা দিনের ক্লান্তি শেষে আমি আবারও শক্তি সঞ্চয় করে তাহাজ্জুদে দাঁড়াতে পারি। তাহাজ্জুদ আদায়ের জন্য এ ঘুম আমার সহায়ক হবে। এ ব্যাপারে একটি হাদিস এসেছে যেখানে বলা হয়েছে, দিনের হালকা ঘুম (قيلولة) রাত্রি জাগরণে সহায়ক। সুতরাং যে ব্যক্তি তার সময়কে

কল্যাণকর কাজে ব্যয় করে, সে সফলতা লাভ করে। এটা হলো ওই প্রথম ব্যক্তির উদাহরণ।

দ্বিতীয় ব্যক্তি হলো যার সারাটা দিন হয়তো বাজে কেটেছে। সে বাড়ি ফিরেছে হতাশাগ্রস্ত, চিন্তিত ও বিষন্ন মনে। এমন পরিস্থিতিতে আপনার মাথায় চিন্তার ঝড় বয়ে যায়, সারাদিন যা কিছু ঘটেছে বারবার আপনি সেগুলো মনে করতে থাকেন। এ পুরো সময়টা আপনার জন্য লস। ভালো কাজে ব্যয় না করে অলস কাটানো পুরো সময়টুকুই লোকসান। এর ফলে আপনার লস হচ্ছে, কারণ আপনি প্রফিট হারাচ্ছেন। হ্যাঁ, আপনি হয়তো গুনাহয় লিপ্ত হচ্ছেন না। আমি বলছি না যে, সারাদিনের নানা ঘটনার কথা মনে করে সেগুলো নিয়ে বারবার চিন্তা-দুশ্চিন্তা করা গুনাহ। কিন্তু তবুও এর মাধ্যমে আপনার লস হচ্ছে। কারণ, আপনি আপনার সময়কে, আপনার পুঁজিকে কাজে লাগাচ্ছেন না। এই সূরা কী দিয়ে শুরু হয়েছিল? আল-আসর অর্থাৎ সময়। যেকোনো ভালো ব্যবসায়ীকে প্রশ্ন করুন, সে আপনাকে বলবে, যে টাকা আপনি বিনিয়োগ না করে অযথা ফেলে রাখবেন, তা হলো লোকসান। টাকা না খাটালে সেই টাকা থেকে প্রফিট পাওয়া যায় না। টাকা বিনিয়োগ না করার মানে এর অপচয়। একইভাবে যে সময়কে আপনি আখিরাতের কাজে বিনিয়োগ করেননি, তা অপচয় করারই নামান্তর। অন্যদিকে এই সময়কে আল্লাহ ﷻ-এর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করা হলো প্রফিট। এভাবে নেকি হাসিল করা অভ্যস্ত সহজ ব্যাপার। যদি আপনার নিয়্যাত সঠিক থাকে তবে যা-ই করেন না কেন, কমবেশি এতেই আপনি আজর (প্রতিদান) পাবেন। যদি সঠিক নিয়্যাতে রিগিকের সন্ধানে বের হন, তবে এর বিনিময়ে আপনি সাওয়াব পাবেন। ভালো নিয়্যাতে যদি রাতে কিংবা দুপুরে সামান্য একটু ঘুমিয়ে নেন, তবে এতেও সাওয়াব। একইভাবে নিজ বাচ্চাদের সাথে খেলা করলেও আপনি সাওয়াব পাবেন।

তৃতীয় ব্যক্তির অবস্থা হলো, যে কাজ থেকে ফিরে বাকিটা সময় বন্ধুদের সাথে আড্ডায় পার করে দেয়। আজকালকার আড্ডাগুলোতে সাধারণত কী হয়? গীবত, ফাহেশা, গল্পগুজব, হারাম কিছু দেখা, গান শোনা, বন্ধুদের সাথে বসে থাকা কিংবা এসব অসার বিষয় নিয়ে ইন্টারনেটে লেখালেখি করা, জীবিত ও মৃতদের ব্যাপারে নানা ধরনের কথাবার্তা বলা—এসবই কিন্তু হয়!

আপনারা কিছু অবাধ্য বান্দাদের দেখবেন যারা এটুকু জানে না যে পরদিন সকালে তারা মুসলিম হিসেবে ঘুম থেকে জেগে উঠতে পারবে কি না, কিন্তু তারা মুখের কথায় আল্লাহ ﷻ-এর এমন সব বান্দাদের সম্মানহানি ও অপদস্থ করে যাদের পরিণতি এখন আল্লাহ ﷻ-এর হাতে। তারা আল্লাহ ﷻ-এর কাছে চলে গেছেন এবং আল্লাহ ﷻ তাদের উপযুক্ত প্রাপ্য বুঝিয়ে দিচ্ছেন। আবার কিছু লোক আছে তারা এমন সব ব্যক্তিদের আক্রমণ করে, অপবাদ দেয়, যারা হয়তো জাম্মাতের নদীর তীরে সবুজ পাখি হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাদের সময় কাটছে জাম্মাতের ফল খেয়ে এবং আল্লাহ ﷻ-এর আরশের কাছে ঝুলে থাকা তাঁদের বাসস্থানে। অথচ কিছু কুলাঙ্গার এসব মানুষের সমালোচনা করে বেড়ায়, যদিও এরা নিজেরাই জানে না,

পরদিন মুনাফিক নাকি মুমিন অবস্থায় তার ঘুম ভাঙবে।

দুজন ব্যক্তির মাঝে কয়েক মুহূর্তের জন্যও গীবতকেও আল্লাহ ﷻ হারাম করেছেন। মাত্র দুজন মানুষ মিলে যদি গীবত করে তবে সেটা কবীরা গুনাহ হয়ে যায়। আপনি দেখবেন, দুজন মানুষ কোনো ব্যক্তিকে নিয়ে গীবত শেষে যখন নিজ নিজ গন্তব্যে রওনা দেয়, তারা কী বলেছে না বলছে এ ব্যাপারে কোনো কিছু তাদের আর মনে থাকে না। কিন্তু তবুও এটা কবীরা গুনাহ। কেউ যদি ওই স্থানেই তৎক্ষণাৎ এটা ভুলে গিয়ে থাকে, তবুও এটা কবীরা গুনাহ। তাহলে চিন্তা করুন, এ ধরনের কোনো গুনাহ যখন কয়েকজন মিলে দলবেঁধে করা হয় তবে সেটা কত গুরুতর আকার ধারণ করে। এবার একটু ভেবে দেখুন যখন এ ধরনের কথাগুলো সোশ্যাল মিডিয়াতে বলা হয়, যেখানে পুরো বিশ্ব সেটা দেখতে পায় তখন ব্যাপারটা কেমন দাঁড়ায়? মনে রাখবেন, এই গীবত কিন্তু দুজন মানুষের আলাপচারিতার মতো কেবল ওই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং সোশ্যাল মিডিয়াতে বলা এ কোথাগুলো প্রজন্মের পর প্রজন্ম এবং হয়তো কিয়ামতের দিন পর্যন্ত সবার চোখের সামনে থাকবে। ওয়াল্লাহি, কারও অন্তরে আখিরাতে বিশ্বাস ও কবরের আযাবের ভয় থাকলে সে অবশ্যই এ ধরনের মারাত্মক অপরাধ থেকে নিজেকে বিরত রাখবে। ইন্টারনেটে ছড়িয়ে থাকার এসব কথার কারণে হয়তো কাউকে বছরের পর বছর কিংবা হতে পারে শিংগায় ফুঁ দেয়ার আগ পর্যন্ত হাজার হাজার বছর ধরে কবরের আযাব ভোগ করতে হবে। তার কাছে এগুলো খুব সামান্য মনে হয়েছিল, কিন্তু আল্লাহ ﷻ-এর কাছে এগুলো ছিল অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার। আমি বলছি শিরকের পর সবচেয়ে বড় গুনাহর অন্যতম হচ্ছে অন্যের হকের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়। কাজেই সময়ের ব্যাপারে সতর্ক হোন এবং এসবের পেছনে নিজের সময় অপচয় করা থেকে বিরত থাকুন। এ জন্যই এতকিছু বলা, কারণ আজকাল এ ব্যাপারগুলো অহরহ হচ্ছে।

মনে রাখবেন, আমাদের বোঝাপড়া হবে গাফুরুর রাহীম আল্লাহ ﷻ-এর কাছে। আপনি যখন আল্লাহ ﷻ-এর দয়া ও শাফায়াতের বিষয়ে জানবেন, আশায় উদ্বেলিত হবেন। কিন্তু কিছু গুনাহ আছে যেগুলো দুই ধারবিশিষ্ট তলোয়ারের মতো, যেমন অন্যের প্রতি যুলুম-বাড়াবাড়ি, হত্যা, গীবত, অপরের সম্পত্তি আত্মসাৎ এবং অন্যের নামে কুংসা রটানো। এসব করার মাত্র দুই সেকেন্ডের মাঝেই আপনি হাত তুলে আল্লাহ ﷻ-এর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে পারেন। এটা আপনার ও গাফুরুর রাহীমের মধ্যকার বিষয়। কিন্তু এখানের আরেকটি বিষয় থেকে যায়। বান্দার হক। যেই দিন আপনি আল্লাহ ﷻ-এর সামনে দাঁড়াবেন, তখন আল্লাহ ﷻ-এর বান্দারা আপনার কাছে নিজেদের হক দাবি করবে।

পুলসিরাত পার হবার মুহূর্তগুলো সবার জন্য একের পর এক প্রতিবন্ধকতা ও আতঙ্কের। আল্লাহ ﷻ বলেন :

زُلْزِلَتِ السَّاعَةُ شَيْءٌ عَظِيمٌ

...কিয়ামতের প্রকল্পন একটি ভয়ংকর ব্যাপার। (সূরা আল-হাজ্জ, ১)

নিঃসন্দেহে বিচার দিবসের সেই প্রতীক্ষা ভয়ংকর, আল্লাহ ﷻ-এর সামনে জবাবদিহিতা ভয়ংকর, মিয়ান ভয়ংকর, আমলনামা হাতে পাওয়া ও পুলসিরাত পার হওয়া—এসবই ভয়ংকর। ধরুন এই সবকিছুর শেষে এখন আপনি পুলসিরাতের ওপর। আপনি পুলসিরাত অতিক্রম করছেন, আপনি দেখতে পাচ্ছেন এর মধ্যে অনেকে পার হয়ে জামাতের আউনায়ও পৌঁছে গেছে।

সহিহ আল বুখারিতে আবু সাইদ আল-খুদরি রাঃ থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুলাহ সঃ বলেছেন,

إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ ، حُبِسُوا بِقَنْظَرَةٍ بَيْنَ الْحَبَّةِ وَالنَّارِ ، فَيَتَنَاضَرُونَ مَطَالِمَ كَانَتْ يَنْتَهَمُ فِي الدُّنْيَا ، حَتَّى إِذَا نَقُّوا وَهَدَّبُوا أُذُنَ لَهُمْ بِدُخُولِ الْحَبَّةِ

মুমিনরা যখন জাহান্নাম থেকে নাজাত পাবে, তখন জামাত ও জাহান্নামের মাঝখানে এক পুলের ওপর তাদের আটকে রাখা হবে। তখন পৃথিবীতে একের প্রতি অন্যের যা যা যুলুম ও অন্যায় ছিল, তার প্রতিশোধ গ্রহণের পরে যখন তারা পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে, তখন তাদের জামাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে।^(১২৭)

জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার পর (পুলসিরাত পার হবার পর) মুমিনদের আল-কানতারাহ (الْقَنْظَرَةُ) নামক একটি পুলের ওপর দাঁড় করানো হবে। এর উদ্দেশ্য কী? দুনিয়াতে যারা একে অপরের প্রতি যুলুম করেছিল, তার প্রতিশোধ এখানে গ্রহণ করা হবে যেন তারা পরিশুদ্ধ হয়। এভাবে তারা যখন পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে তখন তাদের জামাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। হতে পারে, কানতারাহ পুলসিরাতের শেষ অংশ। তবে যা পড়েছি তার ভিত্তিতে আমার মতে, কানতারাহ হলো পুলসিরাত পার হবার পর জামাতের প্রবেশমুখে অবস্থিত আরেকটি ছোট সেতু। জামাতে ঢোকার আগে কানতারাহতে গিয়ে এই উম্মাহর মুমিনদের নিজেদের মধ্যকার দেনা-পাওনা আগে মিটমাট করে নিতে হবে। আর তারপরই কেবল তারা জামাতে পা রাখতে পারবে।

নিজেকে এই অবস্থায় কল্পনা করুন। কেউ যদি আখিরাত নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে, অনুধাবন করে, আর নিজেকে সেই অবস্থানে কল্পনা করে, তবে তার পক্ষে কোনো অবস্থাতে আর এ ধরনের গুনাহ করা সম্ভব হবে না। সেই উত্তেজনার মুহূর্তটি কল্পনা করুন—আপনি একের পর এক ধাপগুলো অতিক্রম করে এগিয়ে যাচ্ছেন। এইমাত্র কালিলিব (كَلَالِيْب) পার হয়ে এসেছেন, যেগুলো পুলসিরাত থেকে পাপীদের জাহান্নামের দিকে টেনে নেয়। আপনি পুলসিরাতের অপর প্রান্তে এসে পৌঁছেছেন, জাহান্নাম থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন। আর কিছুক্ষণের মধ্যে আপনি জামাতের আউনায় পা রাখতে যাচ্ছেন। আপনি দেখতে পাচ্ছেন যারা আপনার সামনে ছিল তাঁরা উল্লসিত হয়ে সরাসরি জামাতের উঠানের দিকে এগিয়ে

যাচ্ছে, কিন্তু আপনি যেতে পারছেন না। আপনাকে এখন যেতে হবে ‘আল-কানতারাহ’য়। দুনিয়াতে যেসব মুসলিমের সাথে আপনার বিরোধ ছিল, দেনা-পাওনা ছিল তা মীমাংসার জন্য। আর এখানে বোঝাপড়ার পর বিস্তুদ্ধ হয়েই কেবল আপনি জামাতে প্রবেশের অনুমতি পাবেন।

ভাবুন তো, দুনিয়ার কেউ কি জামাতের আঙিনায় কয়েক মিলি সেকেন্ড দেরি করে ঢোকার কারণ হবার উপযুক্ত? দুনিয়ার কারও জন্য কি আপনি জামাতে প্রবেশের অনুমতির জন্য অতিরিক্ত কয়েক মিলি সেকেন্ড অপেক্ষা করতে রাজি হবেন? ওয়াল্লাহি, একবার ভাবুন, এই মুহূর্তে আপনি কানতারাহর ওপর আছেন। আপনি জামাত দেখতে পাচ্ছেন, জামাত এখন আপনার দৃষ্টিসীমার ভেতরে। কিন্তু অন্য একজনের গুনাহর ভার এখন আপনাকে বহন করতে হবে, কারণ আপনি হয়তো তাকে প্রচণ্ড ঘৃণা করতেন, আর তাই তার ব্যাপারে কথা বলেছিলেন, নিন্দা করেছিলেন, অপবাদ দিয়েছিলেন। চিন্তা করতে পারছেন এ সময় আপনি কী এক তীব্র মানসিক যন্ত্রণার সম্মুখীন হবেন?

এ অবস্থার পর আল্লাহ ﷻ আপনার সব কষ্ট দূর করে দেবেন।

وَزَعْنَا مَا فِي صُؤْرِهِمْ مِنْ عَيْلٍ.....

তাদের অন্তরে যা কিছু দুঃখ ছিল, আমি তা দূর করে দেবো...। (সূরা আল-আরাফ, ৪৩)

কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আপনাকে এর কষ্ট ভোগ করতে হবে। আপনি কি কানতারাতে আটকে যাবার সেই তীব্র যন্ত্রণা উপলব্ধি করতে পারছেন? কল্পনা করুন, আপনি দেখছেন জামাতে আপনার অবস্থান এক এক করে নিচে নামছে, ক্রমশ ফিরদাউস আপনার দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যাচ্ছে। আপনি কি জামাতের সামনে দাঁড়িয়ে এমন ব্যক্তির অন্তর্বেদনার তীব্রতা সম্পর্কে ধারণা করতে পারছেন? কেউ হয়তো ততক্ষণে ইব্রাহীম ﷺ-এর পাশে ভিড় জমিয়েছে তাঁকে কাছ থেকে দেখার জন্য, কেউ হয়তো যাচ্ছে নূহ ﷺ এর সাথে দেখা করতে, কেউ জড়ো হয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আর যা আ'ইশা ﷺ-এর পাশে, কেউ খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ﷺ আর আবু উবাইদা ﷺ এর সাথে দেখা করছে; তারা সবাই হাস্যোজ্জ্বল ও আনন্দিত। এই সবকিছু জামাতের আঙিনায়, আর সেই মুহূর্তে আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন জামাতে আপনার স্থান একের পর এক কমে যাচ্ছে। কেন? কারণ, আপনি হয়তো দুনিয়াতে কোনো মুমিনের নামে কিছু বলেছিলেন কিংবা কোনো মুমিনের হক নষ্ট করেছিলেন। আপনি যাকে এত ঘৃণা করেন, সে কি আপনার এই মূল্যবান সম্পদ (জামাতে আপনার স্তর) হারানোর কারণ হবার যোগ্য?

যদি আপনাকে গীবত করতেই হয়, তাহলে আপনার বাবা-মায়ের গীবত করুন! কিংবা আপনার শাইখ বা এমন কাউকে নিয়ে যাকে আপনি ভালোবাসেন; কারণ, বান্দার হকের কারণে কানতারাতে আটকে গেলে নিদেনপক্ষে আপনি যা হারাবেন সেটা আপনার প্রিয়জনদের

কাছে যাবে। জামাতে আপনার অবস্থান কমবে আর তাদের মর্যাদা ও অবস্থানের স্তর বৃদ্ধি পাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ কেন অন্যের হক বিনষ্টকারীকে দেউলিয়া বলেছেন? ফাইন্যান্সের জ্ঞান আছে এমন কাউকে জিজ্ঞেস করুন। যার সম্পদই নেই, যে সম্পদশূন্য তাকে কি দেউলিয়া বলা হয়? না, এমন ব্যক্তিকে দেউলিয়া বলা হয় না। যার কখনো কিছু ছিল না, এমন ব্যক্তিকে দেউলিয়া বলা যাবে না। বরং দেউলিয়া হচ্ছে ওই ব্যক্তি যে আগে অটল সম্পদের মালিক ছিল কিন্তু এখন সে নিঃস্ব।^{১৩০} হতে পারে যে অন্যের নামে কুৎসা রটনা, গীবত, অধিকার-হরণ ও সম্মানহানি করার মতো কর্মকাণ্ডে যারা লিপ্ত, তাদের নেক আমলের পাল্লা অনেক ভারী। হাদিসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অনেক মানুষ 'বিপুল পরিমাণ নেক আমল' নিয়ে হাজির হবে। কিন্তু তারা সব হারিয়ে দেউলিয়া হয়ে যাবে। আপনি দুনিয়াতে কাউকে আঘাত করেছিলেন, আপনার কিছু পুরস্কার সে নিয়ে যাবে। কারও নামে গীবত করেছিলেন, এই সুবাদে সে কিছু পুরস্কার পেয়ে যাবে। নিজের ভাইয়ের সম্মানের প্রশ্নে কিছু মানুষের মুখ এতই লাগামছাড়া যা দেখলে আপনি আসলেই বিস্মিত হবেন। এর কারণ হলো, তারা এই বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করেনি। আখিরাতের উপলব্ধি তাদের অন্তরের গভীরে ঠাই নেয়নি।

কাজেই আমরা তিনটি পরিস্থিতি দেখালাম। প্রথম ব্যক্তি তার সময়ের সম্ভাবহারের মাধ্যমে সফলতা অর্জন করে। দ্বিতীয় ব্যক্তি নিজ সময় থেকে ফায়দা হাসিল না করতে পারার কারণে কোনো গুনাহ না করা সত্ত্বেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ, যে সময় আখিরাতের কল্যাণে ব্যয় হয় না, তা বৃথা। আর তৃতীয় উদাহরণ ছিল ওও ব্যক্তির, যে তার সময় থেকে কোনো ফায়দা হাসিল করেনি; বরং গুনাহ করেছে। ফলে সে বিরাট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সে তার সময়কে ভালো কিংবা মূবাহ কাজে অতিবাহিত করেনি; বরং সে কেবল গুনাহই কামিয়েছে।

মানুষ পূর্ণমাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত (লা ফি খুসর) তখন হয়, যখন সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নিজের আমলের কারণে। এসব কাজে কেউ তাকে বাধ্য করেনি, কেউ তার মাথায় বন্দুকের নল ঠেকিয়ে এসব করতে বলেনি। স্বেচ্ছায় সে এই কাজগুলো করেছিল, এ সবই তার নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের

১৩০ হাদিসে এসেছে :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «أَتَذَرُونَ مَا التُّفْلِسُ». قَالُوا التُّفْلِسُ فِيمَا لَا ذَرْعَ لَهُ وَلَا مَنَاعَ. فَقَالَ «إِنَّ التُّفْلِسَ مِنْ أُمِّي بَائِي يَوْمَ الْفِتَانَةِ يَصْلُو زُرَّارًا وَيَأْتِي قَدْ شَمَّ مَنَا وَتَفَّضَ مَنَا وَأَكَلَ مَنَا مَنَا وَتَشَكَّ مَنَا وَطَرَبَ مَنَا فَيَغْطِي مَنَا مِنْ خُسَاتِيهِ وَمَنَا مِنْ خُسَاتِيهِ فَإِنْ نَبِثَ خُسَاتِيَهُ قَبِلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُجِدَّ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطَرَحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طَرَحَ فِي النَّارِ»

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ স. একবার সাহাবীদের বললেন, “আচ্ছা, তোমরা কি জানো, তুফলিস (নিঃস্ব) কে?” তারা বললেন, “আমাদের মধ্যে যার টাকা-কড়ি ও ধন-সম্পদ নেই, সে-ই তো নিঃস্ব।” তখন তিনি বললেন, “আমার উম্মাহর মধ্যে সেই প্রকৃত নিঃস্ব, যে কিয়ামতের দিন সালাত, সাওন ও যাকাত নিয়ে হাযির হবে; অথচ সে এই অবস্থায় আসবে যে, কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে অপবাদ দিয়েছে, কারও সম্পদ ভোগ করেছে, কাউকে হত্যা করেছে কিংবা কাউকে মেরেছে। এরপর এসব লোকদের (জরিমানাস্বরূপ) তার নেক আমল থেকে সাওয়াব দেওয়া হবে। দিতে দিতে তার নেক আমল থেকে তার কাছে (পাওনাদারের) প্রাপ্য পূরণ করা না গেলে শপথের বিনিময়ে তাদের পাপের একাংশ তার ওপর চাপানো হবে। এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।” (সহিহ মুসলিম : ৬৭৪৪)

কামাই এবং কিয়ামত দিবসে এগুলো তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। অতএব ‘আল-খুসর’ এর পরিবর্তে নাকিরাহ হিসেবে ‘খুসর’ শব্দ ব্যবহারের প্রথম কারণ হলো, ক্ষতির মাত্রা ও এর ব্যাপকতার ব্যাপারে জানানো।

ক্ষতির বিভিন্ন মাত্রা

আল-খুসরের বদলে নাকিরাহ হিসেবে ‘খুসর’ ব্যবহারের দ্বিতীয় কারণ হলো, তানওয়ী (تنويع) অর্থাৎ ক্ষতির বিভিন্ন মাত্রা আছে এটা বোঝানো। কুরআনে এর স্বপক্ষে অসংখ্য আয়াত পাওয়া যায়। আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخَسِرَانُ الْمُبِينُ

বলুন (হে মুহাম্মাদ), কিয়ামতের দিন তারাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যারা নিজেদের ও পরিবারবর্গের থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জেনে রাখো, এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি। (সূরা আয-যুমার, ১৫)

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا

বলুন (হে মুহাম্মাদ), আমি কি তোমাদের সেসব লোকের সংবাদ দেবো, যারা কর্মের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত? (সূরা আল-কাহফ, ১০৩)

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ

তাদের জন্যই রয়েছে মন্দ শাস্তি এবং তারাই পরকালে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা আন-নামল, ৫)

সুতরাং কুরআনে ক্ষতিগ্রস্তদের একাধিক মাত্রার কথা বলা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের ‘খাসির’ বলা হয়েছে আবার ‘আখসার’ বলা হয়েছে। সব ক্ষতিগ্রস্তকে এক কাতারে শামিল করা হয়নি। সূরা আল-আসরে পূর্ণমাত্রার ক্ষতিগ্রস্ত (খুসর) হবার কথা বলা হচ্ছে, যখন ব্যক্তি ক্ষতি দ্বারা সম্পূর্ণভাবে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ে। এটি হচ্ছে নাকিরাহ হিসেবে খুসর ব্যবহারের দ্বিতীয় কারণ।

কেন সূরাতে প্রথমে সর্বজনীন ঘোষণার পর নির্দিষ্ট করা হয়েছে?

আল্লাহ ﷻ বলেন :

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ

‘কিন্তু তারা নয়, যারা (অঃহিদে) ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করে এবং যারা পরস্পরকে হক

ও সবরের নিরন্তর উপদেশ দিয়েছে।’

লক্ষ করুন, আল্লাহ ﷻ এই আয়াতের মাধ্যমে কীভাবে প্রথমে সর্বজনীন ঘোষণা করেছেন যে, ‘প্রত্যেকেই ক্ষতির মধ্যে আছে’ এবং তারপর তিনি এর ব্যতিক্রম উল্লেখ করেছেন। ইম্মা (U) হচ্ছে ব্যতিক্রম। আয়াতটি কেন এভাবে নাখিল হলো? কেন শুরুতে সবাইকে সফল হিসেবে চিহ্নিত করে এরপর ব্যতিক্রম হিসেবে যারা ক্ষতিগ্রস্ত, তাদের কথা বলা হলো না? যেমন : ‘সবাই ক্ষতির মধ্যে আছে কিন্তু তারা ব্যতীত’, না বলে কেন ‘সবাই সফল হয়েছে কিন্তু তারা ব্যতীত’ বলা হলো না? কারণ, এই আয়াতটি মূলত ওই একই শিক্ষার পুনরাবৃত্তি করছে যে অধিকাংশরা সাধারণত নিন্দিত। অধিকাংশ মানুষ সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হবার কারণে কথ্যাটি এভাবে বলা হয়েছে। এর আগে আমরা কুরআনের বেশ কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করেছিলাম যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের নিন্দা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে এবং খুব সামান্যসংখ্যক মানুষই হকের ওপর থাকে। আর কুরআনে এই অল্পসংখ্যক মানুষই প্রশংসিত।

আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَأَن تُطِيعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَأَن هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

আর আপনি যদি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের আনুগত্য করে চলেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী করে দেবে। তারা তো অলীক কল্পনার অনুসরণ করে, আর সম্পূর্ণ অনুমাননির্ভর কথাবার্তা বলে থাকে। (সূরা আল-আনআম, ১১৬)

তিনি আরও বলেন :

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ

আপনি যতই ইচ্ছা করেন না কেন, অধিকাংশ লোক মুমিন নয়। (সূরা ইউসুফ, ১০৩)

এটাই বাস্তবতা। কুরআন-আল-খালিক আল্লাহ ﷻ-এর কালাম। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ﷻ যা বলেছেন তা-ই সত্য। এই বিশ্বে সর্বমোট সাত শ কোটি লোক আছে। এদের মধ্যে মুসলিম আছে প্রায় এক শ ষাট কোটির মতো। আবার এদের মাঝ থেকেও হাটাই করতে হবে। যারা কখনো সালাত আদায় করে না, যারা বড় ধরনের আকিদাহগত ভ্রান্তিতে আছে, যেমন শিরকে লিপ্ত, এদের বাদ দিতে হবে। শিয়াদের বাদ দিতে হবে। এভাবে করতে করতে দেখুন কতজন বাকি থাকে।

যদি অধিকাংশ মানুষ ক্ষুধার্ত এবং অল্পসংখ্যক লোক ব্যতিক্রম হয়, তাহলে আরবি ভাষাশৈলী অনুযায়ী বলা হয়-সবাই ক্ষুধার্ত, তারা ব্যতীত (আন-নাস জাউ ইল্লা—الناس جاعوا إلا)। যদি মাত্র তিন-চারজন ছাড়া বাকি সবাই আপনার বিয়ের নিমন্ত্রণ কবুল করে, তাহলে আপনি

বলবেন, আন-নাসু আতাউ ইল্লা (الناس أتوا إيا)। লোকেরা আমার বিয়ের অনুষ্ঠানে এসেছে, তারা ব্যতীত (অর্থাৎ অধিকাংশই এসেছে)। আর যদি অধিকাংশ ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকে, তাহলে কথাটা উল্টে যাবে। তখন আপনি বলবেন, লাম ইয়াতি ইল্লা (لم يأتِ إيا) অর্থাৎ, কেউ আমার বিয়েতে আসেনি, তারা ব্যতীত।

এটাই আরবি ব্যাকরণের সঠিক নিয়ম। আগে আপনি সংখ্যাগরিষ্ঠের কথা বলবেন আর তারপর ব্যতিক্রম উল্লেখ করবেন।

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا.....

এখানে ‘ইল্লা’ দিয়ে বোঝানো হচ্ছে, সংখ্যাগরিষ্ঠের ক্ষতিগ্রস্ত। এর আগে যেসব আয়াত উল্লেখ করেছি সেগুলোর বক্তব্যের সাথে এ কথা সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আল্লাহ ﷻ মানবজাতির ক্ষতিগ্রস্ত হবার কারণ উল্লেখ করেননি

লক্ষ করুন, আল্লাহ ﷻ মানবজাতির ক্ষতিগ্রস্ত হবার কথা জানিয়েছেন, কিন্তু তিনি এর কারণ জানাননি। ক্ষতিগ্রস্ত হবার কারণ হিসেবে তিনি মদ, প্রতারণা, ঘিনা ইত্যাদি অগণিত সমস্যা চিহ্নিত করেননি। বিস্তারিত কোনো ব্যাখ্যাও দেননি। তিনি বলতে পারতেন,

وَالْعَصْرِ، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَزَنُوا وَقَتَلُوا وَهَبُوا

মহাকালের শপথ, নিশ্চয় যারা শিরক করেছে, ব্যভিচার করেছে, হত্যা করেছে অথবা ডাকাতি করেছে—তারা চরম ক্ষতিগ্রস্ত।

আল্লাহ ﷻ ক্ষতিগ্রস্তদের বৈশিষ্ট্যগুলো বলতে পারতেন। তা না করে তিনি আমাদের মুক্তিপ্রাপ্ত ও বিজয়ীদের বৈশিষ্ট্যগুলো জানিয়ে দিলেন। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কিংবা ক্ষতির স্বরূপ বলার পরিবর্তে বিজয়ীদের বৈশিষ্ট্য ও তাদের অনুসৃত পথের কথা বলেছেন। কেন? কারণ, ক্ষতিগ্রস্ত ও তাদের ভুলের ব্যাপারে কথার শেষ নেই। এদের ধরন ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অগণিত, ক্ষতিগ্রস্ত হবার কারণ অসংখ্য, কিন্তু বিজয় ও সফলতা অর্জনকারীদের জন্য দিকনির্দেশনা খুবই সহজ সরল। দিকনির্দেশনা মেনে চলার ব্যাপারটাও জটিলতামুক্ত, সরল। এই বৈশিষ্ট্যগুলো তাহলে কী? এর আগের বারোটি দারসে যে চারটি বুনিয়াদি বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি, এগুলোই সেই বৈশিষ্ট্য। এ কারণেই কুরআনের বহু আয়াত এবং এমনকি কিছু হাদিসেও সিরাতুল মুস্তাকিম বা সরল পথকে একক, অনন্য বলা হয়েছে। সিরাতুল মুস্তাকিম সব সময় ‘একবচন’ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যান্য পথের বেলায় ‘বহুবচন’ এসেছে,

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ.....

নিশ্চয়ই, এই-ই হচ্ছে (১৫১ ও ১৫২ নম্বার আয়াতে উল্লেখিত পন্থা) আমার সরল পথ।
অতএব, এ পথে চলো এবং অন্যান্য পথে চোলো না...। (সূরা আনআম, ১৫৩)

সিরাতি (صراطی—আমার পথ) একবচন অর্থাৎ, একটি-ই সরল পথ। অন্যদিকে বহুবচন হলো সুবুল (سبل)। দেখুন কুরআনে সঠিক পথের বেলায় একবচন আর ভ্রান্ত পথের ব্যাপারে, গোমরাহির রাস্তার ব্যাপারে বহুবচন এসেছে।

যারা ঈমান আনে :

ঈমান ইলম থেকে উৎসারিত

ঈমান ইলম থেকে উৎসারিত হয়। উসুল আস-সালাসাহ্ লেখক যে চারটি বুনিয়াদি বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে প্রথম হলো ইলম। তিনি বলেছেন, প্রথম মূলনীতি হলো জানা। অর্থাৎ আল্লাহ ﷻ, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও কুরআনের ইলমকে জানা। আপনি এসব বিষয়ে জানবেন যাতে আপনি ঈমান আনতে পারেন। ইলম আপনাকে আল্লাহ, রাসূল, কুরআন ও ফিরিশতাদের প্রতি ঈমান আনা শেখাবে। এর আগে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। যে বিষয়টা অনেকের মনে প্রশ্ন জাগাতে পারে তা হলো, উসুল আস-সালাসাহ্ লেখক মূলনীতি হিসেবে ইলমের কথা বলেছেন। আল্লাহ ﷻ, রাসূল ﷺ ও কুরআনের ইলম হাসিল করাকে লেখক মূলনীতি দাবি করেছেন। আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি, সূরা আল-আসরে ঈমানের কথা বলা হয়েছে। এর কারণ হলো, ঈমান পাবার একমাত্র পথ হলো ইলম, তাই লেখক ইলমের মাধ্যমে ঈমানকেই মূলনীতি হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন। ইলম ছাড়া কি খাঁটি ঈমান সম্ভব? কখনোই না।

ঈমান হলো ইলমের শাখা আর এ থেকেই এটি উৎসারিত হয়। তাই লেখক প্রথম মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন ইলমকেই। লক্ষ করুন, তিনি ইলমকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। ইলমকে তিনি আল্লাহ ﷻ, রাসূল ﷺ ও কুরআন এই তিনটির মধ্যে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এই বিষয়গুলোর ব্যাপারে জানা ছাড়া, ইলম ছাড়া, ঈমান থাকতে পারে না। বৃক্ষ ব্যতীত তার ফল কি পাওয়া সম্ভব? ইলম হচ্ছে বৃক্ষ আর ঈমান তার ফল। কাজেই লেখক যখন বলছেন ইলম হলো আল্লাহ ﷻ, রাসূল ﷺ ও কুরআনের ব্যাপারে জানা ও জ্ঞান অর্জন, তখন তিনি এই সূরা আল-আসরের এই আয়াতে যে ঈমানের কথা বলা হচ্ছে তা-ই বোঝাচ্ছেন। কারণ, এই ইলমের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ ﷻ-এর, তাঁর রাসূল ﷺ ও কুরআনের ওপর ঈমান আনা।

এই আয়াতে ঈমানের তাৎপর্য :

আল্লাহ ﷻ কেন সবিস্তারে ঈমানের আলোচনা করলেন না

কিসের কীসের ওপর ঈমান আনতে হবে, সূরা আল-আসরে কেন সেগুলো বলে দেয়া হলো না? আল্লাহ ﷻ বলেন :

إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوا.....

তারা ব্যতীত, যারা ঈমান এনেছে।

এটুকু বলেই তিনি শেষ করেছেন। বিস্তারিতভাবে ঈমানের শাখাগুলোর ব্যাপারে তিনি বলেননি। কেন? এ ব্যাপারে আমি তিনটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই। আল্লাহ ﷻ এই আয়াতে ঈমান নিয়ে বিশদ আলোচনা করেননি, কারণ :

১) এটি স্পষ্ট,

২) এটি স্বাভাবিক, এবং

৩) ঈমান কী, তা নিয়ে কুরআন ও হাদিসে অনেক আলোচনা এসেছে যা থেকে স্পষ্টভাবে এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়।

যেমন ধরুন আমার একটি গাড়ি আছে। আমি আর আপনি গাড়িতে করে কোথাও যাচ্ছি। আমি চালাচ্ছি। চলার পথে এক জায়গায় থেমে আপনাকে গাড়ির চাবি দিয়ে আমি বললাম, এখন আপনি চালান। আমি আপনাকে কোন গাড়ি চালাতে বলছি সেটা কি এখানে গাড়ির রং, মডেল, প্লেট নম্বারসহ আপনাকে বলার দরকার আছে? মাত্র আপনি আমার সাথে গাড়িতে বসে ছিলেন। কোন গাড়ির কথা বলা হচ্ছে আপনি জানেন। তাই শুধু এটুকু বলা যথেষ্ট যে, আপনি আমার গাড়িটি চালান। ঈমানের ব্যাপারটাও ঠিক তা-ই।

ঈমান নিয়ে এ আয়াতে বিস্তারিত আলোচনা না আসার আরেকটি দিক হলো, এর মাধ্যমে যা কিছু বিশ্বাস করা আবশ্যিক তার সবকিছুকে বোঝানো হয়েছে। যেহেতু এই আয়াতে আল্লাহ ﷻ ঈমানকে সীমাবদ্ধ করে দেননি তাই এর অর্থ ব্যাপকতা লাভ করেছে। আল্লাহ, আসমানি কিতাব, ফিরিশতা, রাসূলগণ, কাদা, কাদর এবং এগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ ঈমানের সব দিক এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

আল্লাহ ﷻ-এর নির্দেশ মেনে চলা

তিন নান্নার পরেই হলো, ঈমানকে সীমাবদ্ধ না করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ ﷻ-এর হুকুম-আহকামের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখা এবং সব অলীক, অবাস্তব রূপকথা, কাহিনি ও কুসংস্কার থেকে বেঁচে থাকা। আপনারা দেখবেন কুরআন ও সহিহ হাদিস থেকে আখিরাতে ও কবর

সম্পর্কে আমরা এমন কিছু ধারণা পাই, যা হৃদয়কে ভয়ে প্রকম্পিত করে। আতঙ্কে অন্তর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার উপক্রম হয়। অথচ এমন অনেক লোক আছে যাদের ওপর এগুলোর কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না। কারণ, তাদের অন্তরে ঈমান পূর্ণভাবে গাঁথেনি এবং তাদের কুরআনের বুঝেও যথেষ্ট ঘাটতি আছে। কিন্তু এদের মাঝেই আবার আপনি এমন অনেক মনগড়া কাহিনির প্রচলন দেখতে পাবেন যেগুলো শোনামাত্র আপনি বুঝতে পারবেন, এগুলো বানোয়াট। যেমন : এক লোককে কবর দেয়া হলো। যে লোক তাকে দাফন করেছিল ভুলক্রমে তার মানিব্যাগ কবরের ভেতরে পড়ে যায়। রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর হারানো মানিব্যাগের কথা তার মনে পড়ে। রাতেই সে মাটি খুঁড়ে মানিব্যাগ বের আনার জন্য রওনা হয়। তারপর সে গিয়ে দেখে কবরের মধ্যে লাশটি পুড়ে কয়লার মতো হয়ে গেছে। আর এটা কেবল ওই একজন লোক দেখেছে আর কেউ দেখেনি! তারপর গল্পের একদম শেষে লেখা থাকবে যে, এই গল্প যদি আপনি দশজন লোকের কাছে না পাঠান, তাহলে আপনি কিংবা আপনার পরিবারের কেউ মারা যাবে! মনে রাখবেন, আল্লাহ ﷻ যখন আপনাকে ঈমান আনতে বলছেন তখন তিনি তাঁর আয়াতসমূহের ওপর বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলেছেন। তার নাযিলকৃত দিকনির্দেশনার ওপর ঈমান আনতে বলছেন। ইসলাম আপনাকে কল্পকাহিনি বিশ্বাস করতে বলে না। ইসলাম বলে না যে আপনি যা শুনবেন তা-ই বিশ্বাস করবেন। বরং ঈমানের প্রশ্নে মুমিনকে সব সময় বুদ্ধিমত্তার অধিকারী, বিচক্ষণ ও প্রাজ্ঞ হতে হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইসরা ওঘাল মিরাজের রাতের পরের ঘটনা। তখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আবু বকর রَضী-এর দেখা হয়নি। কুরাইশের লোকেরা আবু বকর রَضী-কে ধরে বলতে শুরু করল, হে আবু বকর, শুনেছ নাকি? তোমার সাথি বলছে সে নাকি এক রাতের মধ্যে মক্কা থেকে আল-আকসায়ে চলে গেছে। তারপর সাত আসমান ভ্রমণ করে এক রাতের মধ্যেই ফিরে এসেছে! এ কথা কি তোমার বিশ্বাস হয়?

এই সেই ব্যক্তি যাকে আস-সিন্দীক উপাধি দেয়া হয়েছিল, তিনি এই আয়াতে বর্ণিত মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি হিদায়াতের ওপর ছিলেন, কল্প-কাহিনিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি অল্প কথায় স্পষ্টভাবে উত্তর দিলেন এবং আমাদের জন্য একটি মূল্যবান মূলনীতির দৃষ্টান্ত তৈরি করলেন। তিনি বললেন,

إِنْ كَانَ قَالٍ فَقَدْ صَدَّقَ

যদি রাসূলুল্লাহ এ কথা বলে থাকেন, তবে অবশ্যই সত্য বলেছেন।

অর্থাৎ, তোমাদের কথা মিথ্যা হতে পারে, কিন্তু যদি আসলেই এটা নবি মুহাম্মাদ ﷺ বলে থাকেন তবে এই ঘটনা সত্য। কোনো বিষয় যদি কুরআন বা সহিহ হাদিসে এসে থাকে, তবে সেটা আপনার মনঃপূত হোক বা না হোক, অন্তরে বসুক বা না বসুক, এতে কিছু যায় আসে না। সেটা বিশ্বাস করতেই হবে। তবে যা শুনবেন, তা-ই বিশ্বাস করে বসবেন না।

যারা সৎকর্ম করে :

আল্লাহ ﷻ বলেন :

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ.....

আমিলুস সালিহাত (عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) –যারা নেক আমল করে। এটি হলো সাফল্য অর্জনকারীদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। প্রথম বৈশিষ্ট্য ছিল ঈমান আনা আর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো নেক আমল। আল্লাহ ﷻ কুরআনে মোট একাদশটি আয়াতে ঈমান ও নেক আমলকে সরাসরি যুক্ত করেছেন। ঈমান থাকতে হলে আমল ও আচরণ থাকতে হবে। লক্ষ্য করুন, কীভাবে ঈমানের ক্ষেত্রে প্রথমে ইলম ও তারপর আমলের কথা আসছে। ঈমান ছাড়া কোনো নেক আমল করা সম্ভব না, আর ঈমানের জন্য প্রয়োজন ইলম। সুতরাং প্রথমে হলো ইলম, তারপর ঈমান আর এর পরের ধাপ হলো আমল।

ঈমানের শর্ত আমল

এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আমল ব্যতীত কোনো ঈমান নেই। যাদের কাজকর্ম ইসলামের বিধি-বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক তারা সব সময় বলে বেড়ায়, আমাদের অন্তরে ঈমান আছে। আমানু ও আমিলুস সালিহাতকে একসাথে উল্লেখ করার মাধ্যমে কুরআন এই ধরনের লোকদের মিথ্যাবাদী বলে ঘোষণা দিচ্ছে। আমি সেই ব্যক্তির কথা বলছি না, যে যুহরের সময় শাহাদাহ পাঠ করল আর আসরের আগেই মারা গেল। এ ব্যক্তি তো ইসলামের হুকুম-আহকামগুলো মেনে চলার সুযোগই পায়নি। মুসলিম হওয়া থেকে মৃত্যু, এই সময়টুকুতে কোনো ফরয আমলের সময় তার সামনে আসেনি, এমন ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনাস্থলের কথা আমি বলছি না। আমি ওইসব প্রতারকদের কথা বলছি, যারা কোনো আমল ছাড়াই দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করে আর তাদের এ নিয়ে কিছু বলতে গেলে জবাব দেয়—আমার তো অন্তরে ঈমান আছে। ঈমান হলো অন্তরের সেই চারাগাছ যা থেকে ফুল প্রস্ফুটিত হয়। যদি আপনি চারাগাছে নিয়মিত পানি না দেন, যত্ন না করেন, চারাগাছ যদি প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও পরিচর্যা না পায়, তাহলে একদিন তা মারা যাবে। কাজেই আপনি যদি দু-তিন সপ্তাহ আপনার ঈমানকে আমল ছাড়াই ফেলে রাখেন, যত্ন না করেন, তবে আপনার ঈমান মরে যাবে। এর আর কোনো উপকারিতা থাকবে না। অন্তরের ঈমানকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে আপনাকে অবশ্যই আমল করতে হবে। ঈমান হলো প্রাণের স্পন্দন। আর আমল হলো দেহের সঞ্জীবনী। কোনো কিছু ভেতরে মৃত কিন্তু বাহ্যিকভাবে জীবিত, এমন কি হয়? কিংবা বিপরীতটা? আর যদি আসলেই কারও মধ্যে এমন ঘটে তবে সেটা হবে সাময়িক, কারণ একসময় একটির অনুপস্থিতি অন্যটিরও মৃত্যুর কারণ হবে।

যারা নিজেদের ঈমানদার দাবি করে কিন্তু সপ্তাহ, মাস এমনকি বছরের পর বছর আমল

না করে কাটিয়ে দেয়, তাদের বৈশিষ্ট্য হলো শয়তান, কুফরার কুরাইশ এমনকি ফিরাউনের মতো। আল্লাহ ﷻ এই আয়াতে কী বলেছেন দেখুন :

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا.....

তারা অন্যায় ও অহংকারভরে নিদর্শনাবলিকে প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল। (সূরা আন-নামল, ১৪)

আল্লাহ ﷻ এখানে কাকিরদের কথা বলছেন। তারা আল্লাহ ﷻ-এর আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করত, যদিও তাদের অন্তরে তারা এগুলোকে সত্য হিসেবে জানত। অন্তর্যামী আল্লাহ ﷻ আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন যে, ভেতরে ভেতরে ঠিকই তারা বিশ্বাস করত। তাদের অন্তরে ঈমান ছিল কিন্তু আমলের মাধ্যমে তারা আল্লাহ ﷻ-এর আয়াতের বিরোধিতা করেছিল, আর এ কারণেই তাদের কাকির ঘোষণা করা হয়েছে। যারা কোনো আমল ছাড়া ঈমানের দাবি করে তারা হলো নদীগর্ভে বিলীন ফিরাউনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, কারণ অন্তরের গভীরে তো ফিরাউনও আল্লাহ ﷻ-এর ওপর বিশ্বাস করত। লক্ষ করুন, ফিরাউনের পরিবর্তনের দিকে। এই ফিরাউনই বলেছিল,

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى

এবং বলল, আমিই তোমাদের সবচেয়ে বড় রব। (সূরা আন-নাযিয়াত, ২৪)

আবার জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হয়ে, মৃত্যুর ঠিক আগমুহূর্তে সে বলেছিল, ‘আমি মুসার রবের ওপর ঈমান আনলাম’!^[১৩৪]

অন্তিম মুহূর্তে সবার অন্তরের সত্য প্রকাশিত হয়। পঞ্চাশ বছর কিংবা আরও বেশি সময় ধরে আল্লাহ ﷻ-এর নাফরমানি করে বেড়ানো লোক ক্যাপারে আক্রান্ত হয়। যখন নিশ্চিত মৃত্যুর কথা তাকে জানানো হয়, ঠিক সেই মুহূর্তে সে আল্লাহ ﷻ-এর দিকে ফিরে আসে। আমি এক লোকের কথা জানি, যার মুখে সব সময় মহান আল্লাহ ﷻ-এর ব্যাপারে গালিগালাজ আর অভিলাপ লেগে থাকত। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে তীব্র যন্ত্রণা নিয়ে সে হাসপাতালে ভর্তি হলো। এখন এই উদ্ধত যালিম, যে আল্লাহ ﷻ-কে নিয়ে গালিগালাজ করত, তার পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে সালাত আদায়ের নিয়ম-কানুন জানতে চায়, তাদের হক নষ্ট করার কারণে ক্ষমা চেয়ে কাকুতি-মিনতি করে।

১৩৪ কুরআনে এসেছে :

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَآئِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَيْنَهُمْ فِزْعُونَ فِزْعًا وَنَعَدُوا فِزْعًا نَغِيًّا وَعَذَّوْا حَتَّىٰ إِذَا أَذْرَكَ الْمَرْغَىٰ قَالِ أَأَنْتَ أَتَىٰ لَا إِلَهَ إِلَّا الْوَيْ
أَنْتَ بِبَنِي إِسْرَآئِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

আর বনি ইসরাইলকে আমি পার করে দিয়েছি সাগর। তারপর তাদের পশ্চাৎদান করেছি ফিরাউন ও তার সেনাবাহিনী—দুরাচার ও বাড়াবাড়ির উদ্দেশ্যে। যখন সে ভ্রূতের আরম্ভ করল তখন বলল, এবার আমি স্বীকৃতি দিচ্ছি যে, কোনো ইলাহ নেই তাকে ছাড়া যার ওপর ঈমান এনেছে বনি ইসরাইল। বরন্ত আমিও তাঁরই অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা ইউনুস, ৯০)

অসুস্থতা কিংবা বিপর্যয়ের পরই কেন এমন হয়? অসুস্থ হবার পর বুঝি সত্যের ব্যাপারে একজন মানুষের এমন আকস্মিক ও ব্যাপক উপলব্ধি হয়? নাকি এ উপলব্ধি এতদিন তার অন্তরে লুকিয়ে ছিল, বিপদ কেবল এর ওপর জমে থাকা ধুলোবালি সরিয়ে দিয়েছে? সাধারণত এমন আকস্মিক ও বিরাট পরিবর্তনের পেছনে মূল কারণ হলো, এ সত্য তাদের অন্তরেই ছিল, কিন্তু তারা একে কবর দিয়ে রেখেছিল। একটা লাল গালিচার কথা কল্পনা করুন। বছরের পর বছর ধুলো-ময়লা জমে একসময় এর রং-ই বদলে যায়। কিন্তু একটি লাঠি দিয়ে যখন আপনি এর ওপর আঘাত করা শুরু করবেন তখন দেখবেন, ধুলো-বালি উড়তে শুরু করেছে আর দীর্ঘদিনের চাপা পড়া লাল রং আবারও ফুটে উঠছে। বিপর্যয় হলো এই লাঠির আঘাতের মতো।

কুফরীদের অধিকাংশই সত্য জানে, আল্লাহ ﷻ তাদের ব্যাপারে বলেছেন :

وَأَسْتَفْتِنَهَا.....

তারা সত্য অবগত আছে।

তারা অন্তরে নিশ্চিতভাবে সত্যকে চেনে, কিন্তু এটা তাদের কোনো কাজে আসে না, কেননা তারা একে (জ্বান ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দ্বারা) আমলে পরিণত করে না। ফিরাউনের অন্তরে সত্য লুক্কায়িত ছিল, কিন্তু এ বিশ্বাসের সাথে আমল না থাকার কারণে তার এই বিশ্বাস কোনো কাজে আসেনি। বস্তুত তাদের আমল ছিল তাদের অন্তরের বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক। সারকথা হলো, ঈমানের জন্য অন্তরের ঈমানের সাথে বাহ্যিক ঈমানও যুক্ত হতে হবে। আর বাহ্যিক ঈমান হলো আমল। কেউ যতই নিজেকে মুমিন দাবি করুক না কেন, দীর্ঘ সময়ব্যাপী সে যদি কোনো আমল না করে, তবে সে মুমিন না।

আচ্ছা বলুন তো, আপনি কি কোনো মানুষের ব্যাপারে কেবল অন্তরের ওপর সন্তুষ্ট হবেন? ব্যবসার ক্ষেত্রে কি আপনি শুধু অন্তরের চুক্তি মেনে নেবেন যদি আমলে এর কোনো ছাপ না থাকে? আপনি শুধু অন্তরের ভালোবাসায় সন্তুষ্ট হবেন যদি আমল এর বিপরীত হয়? যদি দুনিয়াবি বিষয়েই কেবল অন্তরের অবস্থাকে আপনি গ্রহণ না করেন, তাহলে আবিরাতেই বেলায় আপনি তা কীভাবে আশা করেন? কোনো স্বামী যদি দিনরাত তার স্ত্রীকে ভালোবাসার কথা বলে, কিন্তু তার কাজে এর কোনো ছাপ না থাকে—যদি সে তার স্ত্রীর ভরণপোষণ না দেয়, সন্তানদের বাবার, পোশাক, পড়াশুনা কোনো কিছুই খরচ না দেয়, সাংসারিক কাজে কোনো সহযোগিতা না করে—কিন্তু সারাদিন সোফায় বসে বলে ‘আমি তোমাকে ভালোবাসি’ তাহলে তার স্ত্রীর প্রতিক্রিয়া কী হবে? এমন অবস্থায় স্ত্রীদের কমন কথা কী হয়? তুমি যদি আসলেই ভালোবাসতে, তাহলে তুমি তোমার আচরণে সেটা প্রকাশ পেতে। আর তারপর সে শাইখের

কাছে গিয়ে খুলা'র^(১০০) জন্য আবেদন করবে।

স্কুল, কলেজ কিংবা অফিসে, যখন আপনি ভালো করবেন আপনার শিক্ষক বা বস আপনাকে পছন্দ করবে। তার আচরণ, তার কথায় আপনার প্রতি তার পছন্দের ছাপ থাকবে। সে আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবে, আপনাকে ভালোবাসবে। 'আমি যদি আসলেই ভালো হয়ে থাকি তবে সেটা প্রকাশ করা হোক', এটা আমরা সবাই চাই। যদি আমি ভালো হয়ে থাকি তবে আমার মূল্যায়ন কোথায়? এ প্রাস কোথায়? আমার প্রমোশন কোথায়?

ঈমানবিহীন আমল

আমল ছাড়া ঈমানের বিপরীত হলো ঈমানবিহীন আমল। অন্তরে ঈমান না এনেই আমল করা। এটিও অত্যন্ত বিপজ্জনক। আমলের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছানো যায় যখন বাহ্যিক আমল অন্তরের ঈমানের সাথে সংগতিপূর্ণ হয়। যাদের আমল ঈমানবিহীন তাদের বৈশিষ্ট্য মুনাফিক ও বহরুগীদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আপনি দেখবেন এমন লোকদেরই ঈমানে ধস নামে, তারাই অধঃপতনের স্বীকার হয়। এরাই নিজেদের অবস্থান সম্পূর্ণ পাল্টে ফেলে। বাইরে থেকে দেখলে এসব লোকদের খুব ধর্মপ্রাণ মুসলিম মনে হবে, কিন্তু হঠাৎ করে একদিন দেখবেন সে পুরোপুরি বদলে গেছে। একেবারে উল্টো আচরণ করতে শুরু করেছে। এ মানুষগুলোর আমল থাকলেও বাইরের এ রূপ ছিল অন্তঃসারশূন্য।

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। আসলে উদাহরণের মাধ্যমে সহজে এ ব্যাপারগুলো বোঝা যায় তাই প্রতিটি ক্ষেত্রে আমি আপনাদের উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছি। এই শতাব্দীর শুরুর দিকের কথা। আবদুল্লাহ আল-কাসিমি নামে এক লোক ছিল। তার জন্ম সৌদিতে কিন্তু একপর্যায়ে সে স্বেচ্ছা নির্বাসনে মিসর চলে যায়। আল-কাসিমি বেঁচে ছিল ১৯০৭ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত। গত শতাব্দীর প্রথমভাগে ইসলাম ও ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাবের সমর্থনে এবং বিভিন্ন বাতিল ফিরকা ও নাস্তিক্যবাদ ইত্যাদির বিরুদ্ধে আল-কাসিমি অনেকগুলো বই লিখেছিল। তার গভীর জ্ঞান ও ইসলামের খেদমতে অবদানের প্রশংসা করে আব্দুয় যাহির আবু সামহ رحمته (হারাম শরিফের একজন ইমাম; ১৯৫২ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন) একটি কবিতাও লিখেছিলেন।

১৬৫ খুলা (الخُلَا) হচ্ছে, মহিলা তার স্বামীর নিকট থেকে কোনো কিছু (মোহরের) বিনিময়ে নিজেকে নিষ্কিন করে নেয়া। কুমআন ও সুম্মাহয় খুলা করার বৈধতা রয়েছে। আল্লাহ ﷻ বলেন, 'যদি তোমাদের ভয় হয় যে, তারা (স্বামী-স্ত্রী) উভয়েই আল্লাহ ﷻ-এর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, তাহলে সে ক্ষেত্রে স্ত্রী যদি কিছু বিনিময় দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় তবে উভয়ের কারও পাপ হবে না।' (সূরা আল-বাকারাহ, ১২১)

খুলা আসলে তালাক কি না—এ নিয়ে আয়িশা কিরামের মাঝে ইবতিলাফ আছে। ইমাম আবু হানিফা رحمته-সহ কতিপয় ইমামের মতে খুলা তালাকের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে ইমাম আহমাদ رحمته-সহ অন্যান্য ইমামদের মতে খুলা মূলত তালাক নয়; বরং খুলা হচ্ছে 'ফাসখুন নিকাহ' বা বিবাহ বাতিল করা।

আবদুল্লাহ আল-কাসিমি অনেকগুলো বই লিখেছিল। তার বেশকিছু বই আমি পড়েছি এবং আসলেই তার প্রথম দিকের বইগুলো পড়লে আপনি উপকৃত হবেন। যেমন : তার সবচেয়ে জনপ্রিয় বই *আস-সিরায়ু বাইনাল ইসলামি ওয়াল ওয়াসানিয়াহ* (الصراع بين الإسلام والوثنية)। তার আরেকটি বই হলো *আল বুরুকুন নাজদিয়াহ* (البروق النجدية)। যারা দাবি করে সৃষ্টির সাথেও শাফায়াত আছে এই বইটি তাদের এই দাবি নিয়ে মূলত এখানে শিরক আকবর নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তার আরেকটি বই হলো *মুশকিলাতুল আহাদিসিন নাবাউইয়াতি ওয়া বায়ানিহা* (مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها)। এ বইতে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সে ওইসব নাস্তিকদের কথার খণ্ডন করেছে যারা দলিলের ওপরে যুক্তিতে স্থান দিতে চায়। তার একটি বইয়ের নাম *আল-ফাসলিল হাসিম বাইনাল ওয়াহাবিযিয়ন ওয়া মুখালিফিহিম* (الفصل الحاسم بين الوهابيين ومخالفهم)। এ ছাড়া শুযুখুল আযহার, আস-সাওরাতুল ওয়াহাবিয়াহসহ তার লেখা আরও বেশ কিছু বই আছে। এ বইগুলোতে সে বিশুদ্ধ তাওহিদ ও এর অনুসারীদের পক্ষে লেখালেখি করেছে। তার একটি বিখ্যাত বই হলো হায়াত মুহাম্মাদ এবং এর একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থও সে লিখেছিল। আপনারা যদি তার বইগুলো পড়তেন কিংবা তার সময়ে যদি আজকের মতো অডিও টেপ বা ইউটিউব ভিডিও লেকচার থাকত, তাহলে আপনি মনে করতেন সে হলো সালাফদের পথের ওপর থাকা ইমামদের মধ্যে অগ্রগণ্য। যিনি শুধু সাধারণভাবে ইসলামের দাওয়াহ করছেন না; বরং তাওহিদের মৌলিক বিষয়গুলোর পক্ষে লড়াই করছেন। এই ছিল বাহ্যিক অবস্থা, আপাতভাবে তার ব্যাপারে এমনটাই মনে হচ্ছিল। কিন্তু আসলেই কি তাই?

এই আবদুল্লাহ আল-কাসিমি একসময় ঘোরতর নাস্তিক হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে সে ছিল এমন একজন লোক যার বাহ্যিক আমলের সাথে তার অন্তরের অবস্থা মিলত না। আজকে যাদের দেখছেন এমন অনেক নূরুর্থের ব্যাপারটাও একই রকম। হয়তো এদের অবস্থা আল-কাসিমির মতো এত গুরুতর না, তবে মৌলিকভাবে তাদের সমস্যা এক। যারা পনেরো বছর আগেও কুরআন, হাদিস, তাওহিদের বাণী ও সালাফদের বক্তব্য গ্রহণ করত, আচমকা তারা আজ মর্ডানিস্ট হয়ে গেছে কিংবা মর্ডানিস্ট হবার কিনারায় পৌঁছে গিয়েছে। নুসুসের অনুসরণের বদলে আজ এরা রাজনৈতিক বিশ্লেষক বনে গেছে। কুরআন-সুন্নাহ দলিলের আলোকে বিশ্লেষণ না করে তারা সিএনএন-এর জন কিং এর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এদের অনেকের বর্তমান কথাবার্তা ও লেখনী এবং পনেরো বছর আগের অবস্থার সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। পূর্ব-পশ্চিমে সব জায়গায় আপনি এদের দেখতে পাবেন। আল-কাসিমি, যে একসময় কলম হাতে তাওহিদের পক্ষে লড়াই করত, সে-ই ঘোরতর নাস্তিকে পরিণত হয়েছিল। হ্যাঁ, এদের অবস্থা আল-কাসিমির মতো অতটা চরম পর্যায়ে এখনো পৌঁছায়নি। কিন্তু আল-কাসিমির সাথে এদের মৌলিক সন্দ্ব্য বিদ্যমান আর তা হলো, এদের বাহ্যিক রূপের সাথে অন্তরের অবস্থা মেলে না। এই হলো তাদের সবার কমন সমস্যা, নাসআলুলাহাল আফিয়াহ।

আল-কাসিমি নাস্তিক হয়ে যাবার পর তার ঘনিষ্ঠ কিছু বন্ধুর কাছ থেকে জানা যায়, যে

সময়টাতে ইসলাম, তাওহিদ ও বিশুদ্ধ আকিদাহর সমর্থনে বইগুলো সে লিখছিল, তখন বন্ধুদের সাথে একান্ত বৈঠকে এমন সব বিষয় নিয়ে সে বিতর্ক করত যা ছিল খুব অস্বাভাবিক। তারা অবাক হয়ে ভাবতেন, এই লোক কীভাবে এসব কথা বলতে পারে? আল-কাসিমির এক বন্ধু বলেছিলেন, আকিদাহ ও তাওহিদের পক্ষ নিয়ে বই লেখার সময়েই বন্ধুদের সাথে রাতের খাবার খেতে বসে মুহাম্মাদ ﷺ ও আল্লাহ ﷻ-কে নিয়ে সে এমন সব প্রশ্ন তুলত, যা থেকে সংশয় ও সন্দেহ প্রকাশ পেত। আবার দিনের বেলায় অম্মি তাকে দেখতাম সহিহ মুসলিমের দারস দিতে। তাই আমি ভাবতাম, গতরাতে সে যা বলেছে তা হয়তো শয়তানের ওয়াসওয়াসা। কারণ, এটা কীভাবে সম্ভব যে গতরাতে যেই লোক আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর ব্যাপারে যে সংশয়ে ছিল, সে-ই ভোরে উঠে মানুষকে সহিহ মুসলিমের দারস দিচ্ছে?

চিন্তা করে দেখুন, আমরা কিন্তু বাইরে থেকে এগুলো কিছুই জানতে পারিনি। আমরা কেবল তার বাহ্যিক অবস্থা দেখেছি, তার বইগুলো দেখেছি। তাওহিদের দিকে আহ্বানকারী থেকে যোরতর নাস্তিকে পরিণত হওয়া আল-কাসিমি এবং তার মতো অন্যান্যদের মূল অসুখ হলো, তাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থার অসামঞ্জস্য। তাদের বাইরের অবস্থার সাথে ভেতরের অবস্থা মেলে না। তাদের মধ্যে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ঈমানের সমন্বয় ঘটেনি।

এ কারণে আল্লাহ ﷻ-এর কাছে কিছু চাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ যেভাবে চেয়েছিলেন ঠিক সেভাবেই চাইবেন। একটি সহিহ হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুআ করতেন,

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ

হে অন্তরের পরিবর্তনের মালিক, আমার অন্তরকে আপনি আপনার দ্বীনের ওপর দৃঢ় ও অবিচল রাখুন।^[১২১]

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, আপনি আমার অন্তর ও আমলকে একই পথে চালনা করুন, যাতে আমি তাওহিদের ওপর অবিচল থাকতে পারি।

সর্বপ্রকার নেক আমল এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত

পরিশেষে, আমালুস সালিহাত হলো নেক আমল (ইসলামের ওপর আমল)। এটা ক্ষতি থেকে পরিত্রাণ লাভকারীদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। অন্তরের অভ্যন্তরীণ কর্ম এবং জিহ্বা, হাত ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে সংঘটিত বাহ্যিক কর্ম—সব ধরনের আমল এর অন্তর্ভুক্ত। ফরয, সুমাহ, আল্লাহ ﷻ-এর হক ও বান্দার হক, এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত সব ধরনের আমল। এ সবকিছু আমালুস সালিহাতের অন্তর্ভুক্ত।

হক ও সবর-সক্রেস্ত কিছু নাসীহাহ :

আল্লাহ ﷻ বলেন :

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

‘যারা পরস্পরকে হক ও সবরের নিরন্তর উপদেশ দেয়’

পরস্পরকে হক ও সবরের পরামর্শ দেওয়া। এটা হলো চারটি মূলনীতির তৃতীয় ও চতুর্থ মূলনীতি। ঈমান পাথর নয় যে, হাজার হাজার বছর পরও তা একই রকম থেকে যাবে। একটি পাথরের দিকে লক্ষ করুন, শত শত বছর ধরে ফেলে রাখলেও এতে কোনো পরিবর্তন আসে না। কিন্তু ঈমান এমন না, যদি হতো তাহলে ভালোই হতো, কিন্তু বাস্তবতা তা নয়। ঈমান ওঠানামা করে আর এই ওঠানামার পেছনে কিছু শক্তি বা নিয়ামক কাজ করে। এর পেছনে তিনটি বিষয় কাজ করে।

প্রথমটি হলো, আন-নাফস। আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ.....

নিশ্চয়ই মানুষের মন মন্দপ্রবণ...। (সূরা ইউসুফ, ৫৩)

দ্বিতীয়টি হলো শায়াতিন আল-ইনস, আর তৃতীয় হলো শায়াতিন আল-জিন। কুরআনে এগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আপনার নাফস এবং মানুষ ও জিনজাতির শয়তানরা আপনার জন্য ওত পেতে বসে আছে। এগুলো বাইরে থেকে আপনার ওপরে প্রয়োগ হয়। কখনো এদের একটি আপনাকে আক্রমণ করে। কখনো দুটি একসাথে আক্রমণ করে আবার কখনো তিনটিই একসাথে আপনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আপনাকে পথভ্রষ্ট করার জন্য। কখনো পূর্ণ শক্তিতে তারা আপনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, আবার কখনো-বা হালকাভাবে শক্তি প্রয়োগ করে।

তাহলে এই আক্রমণ প্রতিহত করার এবং এ থেকে বেঁচে থাকার উপায় কী?

সত্য ও সবরের উপদেশ দেয়া। নফসের কুমন্ত্রণা, শয়তানের ওয়াসওয়াসা এবং জিন ও মানুষের কাছ থেকে আসা হারাম কাজের প্ররোচনা নিয়ন্ত্রণ করতে আপনাকে সাহায্য করে আপনার মুসলিম ভাইবোনেরা। কীভাবে? আপনাকে সঠিক ও উত্তম নাসীহাহ করার মাধ্যমে। এ জন্যই আপনার দরকার দ্বিনি ভাইদের সাথে যুক্ত হয়ে থাকা। কেননা, একাকী মানুষ অত্যন্ত দুর্বল, সহজেই সে গলে যায়। আপনি যদি দশটি কাপের প্রতিটিতে একটি করে বরফের টুকরো রাখেন আর অন্য একটি কাপে দশটি বরফের টুকরো রাখেন, তাহলে কোন বরফগুলো আগে গলবে? যে টুকরোগুলো আলাদা আলাদা আছে সেগুলোই আগে গলে যাবে।

দাওয়াহ কারও একচেটিয়া অধিকার নয়

আল্লাহ ﷻ কেন আওসাও (أوصوا) এর পরিবর্তে তাওয়াসাও (تواصوا) বললেন? এর কারণ হলো, এর মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ জানিয়ে দিলেন হক ও সবরের নাসীহাহ ও পরামর্শ দেয়ার ব্যাপারটি কোনো এক শ্রেণির মুসলিমদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়নি। যেকোনো মুসলিম এ কাজটি করতে পারে, এটি সব মুসলিমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাওয়াসাও হলো দাওয়াহ। দাওয়াহ কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি কিংবা একচেটিয়া অধিকার না। যদি আওসাও বলা হতো, তাহলে হয়তো একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির সাথে একে যুক্ত করা যেত। কিন্তু যখন বলা হয়েছে তাওয়াসাও, এর মানে হলো এটা সবার জন্য উন্মুক্ত এবং সবার ওপরই এ দায়িত্ব বর্তায়। দায়িত্বটি হলো অপরকে নাসীহাহ করা এবং অন্যের নাসীহাহ গ্রহণ করা। এটাই আওসাও এর বদলে তাওয়াসাও ব্যবহারের কারণ।

এই ব্যাপারে সবার অবস্থান সমান, কেউ কারও চেয়ে উত্তম নয়। কোনো শাইখ নাসীহাহর অমুখাপেক্ষী নন, কোনো তালিবুল ইলম ও সাধারণ মানুষ সত্য ও সবরের ব্যাপারে নাসীহাহর অমুখাপেক্ষী নয়। এ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ, তালিবুল ইলম, শাইখ ও ইমাম সবাই সমান। এখানে কোনো যাজকতন্ত্র নেই; বরং আমরা সবাই এর অংশীদার। কিছু কিছু দেশে আলাদাভাবে সং কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ-সম্পর্কিত মন্ত্রণালয় থাকে (The Agency of the Propagation of Virtue and the Prevention of Vice)।^[১৯১] কিছু দেশ সং কাজের আদেশ ও দাওয়াহ কেবল এই মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়। যদি আয়াতে আওসাও বলা হতো তবে তাদের এ কাজের পক্ষে দলিল দেওয়া যেত, কিন্তু তাওয়াসাও বলা মানে প্রত্যেক মুমিনকেই একে অপরকে উপদেশ দিতে হবে এবং গ্রহণ করতে হবে। আমরা সবাই এ ক্ষেত্রে সমান। এখানে একমুখী হবার কোনো সুযোগ নেই। শুধু নাসীহাহ দেবো কিন্তু গ্রহণ করব না, এমন করা যাবে না। প্রত্যেকের একসাথে দুটোই মেনে চলতে হবে।

পরামর্শ দান একটি সামষ্টিক প্রচেষ্টা

মুমিনদের মধ্যকার সম্পর্কে উদাহরণ হলো দুটি হাতের মতো, যার একটি অপরটির ময়লা দূর করে। এক হাতের ময়লা দূর করতে গেলে অন্য হাতের সাহায্য লাগবে। মুমিনরাও ঠিক তেমন। আপনি যদি চান অন্যরা আপনার শিক্ষা ও নাসীহাহ গ্রহণ করুক, তাহলে আপনার নিজেকে দিয়ে শুরু করতে হবে। আপনি নিজেকে যা-ই মনে করেন না কেন। অন্যের উপদেশ গ্রহণের মানসিকতা থাকতে হবে, আপনার মধ্যে নাসীহাহ গ্রহণের মানসিকতা রাখতে হবে। শুরু করতে হবে এখান থেকেই। ওয়াল্লাহি, আমরা কেউই নির্ভুল নই, আমাদের প্রত্যেকেরই কোনো না কোনো দুর্বলতা আছে। এই উম্মাহ একটি দেহের মতো আর আমাদের করণীয় হচ্ছে একে অপরের দুর্বলতা সংশোধনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া। কেউ কেউ সংশয়-

সন্দেহে ভুগতে পারেন, একে বলা হয় শুবুহাত (شبهات)। যেমন : কোনো ব্যক্তি হয়তো আল্লাহ ﷻ-এর ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়ে। আজ অনেকের ক্ষেত্রে এটি দেখা যায়। অন্তরে শয়তানের ওয়াসওয়াসা এমন এক পর্যায়ে চলে যায় যে, ব্যক্তি আল্লাহ ﷻ-এর অস্তিত্বের ব্যাপারেই সন্দিহান হয়ে পড়ে। একদিকে কিছু মানুষ যেমন এমন শুবুহাতে আক্রান্ত হয়, অপরদিকে এমন মুমিন থাকে যারা দৃঢ়তার সাথে শুবুহাত দমন করতে পারে। আবার দেখা যায় অনেকে দৃঢ়তার সাথে প্রবৃত্তি তথা শাহাওয়াতের (شهرات) মোকাবেলা করতে পারেন না। নারী, বাদ্যযন্ত্র এগুলো শাহাওয়াতের উদাহরণ।

শুবুহাত মোকাবেলায় যিনি দৃঢ়, হতে পারে যে তিনি শাহাওয়াতের ক্ষেত্রে দুর্বল। যেমন : তিনি সংশয়ে পড়েন না কিন্তু হয়তো হারাম জিনিস দেখার প্রতি সহজে আকৃষ্ট হন। এসব ক্ষেত্রে এক ক্ষেত্রে শক্তিশালী মুমিন তার ওই ভাইকে সাহায্য করবে, যে এ ব্যাপারে দুর্বল। আপনি যদি শুবুহাতের ব্যাপারে সুদৃঢ় হন, তাহলে আপনি ওই ভাইদের সাহায্য করুন যারা সংশয়ে আক্রান্ত হয়েছে। একইভাবে আপনি যদি শাহাওয়াতের মোকাবেলায় শক্তিশালী হন, তাহলে আপনার ওই ভাইকে সাহায্য করুন যিনি কামনা-বাসনার কাছে দুর্বল। ঈমানের বৃক্ষ তরতাজা রাখতে পানি দিতে থাকতে হবে। পারস্পরিক নাসীহাহ মুমিনদের ঈমানকে তাজা রাখে।

আপনার ঘরের টেবিলের কথাই ভাবুন না। ধরুন, আপনি এক কি দুমাসের জন্য বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও গেলেন। কিংবা আপনি বাড়িতেই আছেন কিন্তু বেশ কিছুদিন একে ঝেড়েমুছে পরিষ্কার করতে ভুলে গেলেন। তাহলে কী হবে? একসময় তা ধুলোমলিন হয়ে যাবে। আমরা যখন একে অপরকে নাসীহাহ ও সং পরামর্শ দিই তখন এটা আমাদের অন্তরের ওপর জমা ধুলোময়লা দূর করে।

লক্ষ করুন, সূরাতে প্রথমে ঈমান (আমানু) ও আমলের (আমিলুস সলিহাত) বলা হয়েছে। অর্থাৎ অনেকটা ব্যক্তিগত পর্যায়ের দায়িত্বের কথা এখানে এসেছে। কিন্তু যখন সূরাতে পরামর্শ দেয়ার কথা এসেছে তখন মুসলিম হিসেবে দলগত বা সামষ্টিক দায়িত্বের কথা বলা হচ্ছে, কারণ আমরা প্রত্যেকে মুসলিম উম্মাহর একজন সদস্য। কাজেই এটি সামষ্টিক বা দলগতভাবে পুরো উম্মাহর দায়িত্ব। এ সবকিছুই আমরা পাচ্ছি ওয়া তাওয়াসার (وَتَوَاصُوا) এর অর্থ থেকে।

হক হলো কুরআন ও সুন্নাহ :

সূরা আল-আসরে তৃতীয় যে মূলনীতিটি এসেছে-অর্থাৎ পরস্পরকে হকের নাসীহাহ করা, লেখক মূলত একে দাওয়াহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

تَوَاصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصُوا بِالصَّبْرِ.....

হক শব্দটির মাধ্যমে এখানে আল্লাহ ﷻ-এর নাবিলকৃত ওয়াহিকে (কুরআন ও সুন্নাহ) বোঝানো হচ্ছে।

সবর :

সম্পূর্ণ সূরাব্যাঙ্গী সবরের শিক্ষা নিহিত

চতুর্থ ও সর্বশেষ মূলনীতি হলো সবর। এই সূরার অন্যান্য অমূল্য শিক্ষার পর এ থেকে পাওয়া সবরের শিক্ষা হলো অনেকটা বোনাস পুরস্কারের মতো। আপনি যদি সূরা আল-আসরের অন্তর্নিহিত শিক্ষার দিকে তাকান, তাহলে দেখতে পাবেন এই সূরাতে চারবার সবরের কথা এসেছে।

প্রথম হলো,

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا.....

ঈমানের বিরাট একটি বড় অংশ সবর থেকে উৎসারিত। কিছু কিছু আলিমের মতে, ‘সবর হলো ঈমানের অর্ধেক’।^{১১১} সুতরাং সবরের ইঙ্গিত প্রথম এসেছে এই আয়াতে।

দ্বিতীয় হলো,

عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ.....

অর্থাৎ, যারা নেক আমল করে। সবর কি নেক আমলের অন্তর্ভুক্ত নয়? মনে করে দেখুন, আমরা কিন্তু বলেছি বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সমস্ত (নেক) আমলই আমিলুস সালিহাতের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এখানেও সবরের শিক্ষা এসেছে।

তৃতীয় স্থান হলো,

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ.....

হকের উপদেশ দাও। সবর কি সাধারণভাবে হকের অন্তর্ভুক্ত নয়? অবশ্যই সবর হকের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এর মাধ্যমে তৃতীয়বারের মতো সবরের উল্লেখ হয়েছে।

সর্বপ্রকার ধৈর্য ‘সবর’-এর অন্তর্ভুক্ত

সবশেষে সবর শব্দটি আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, জীবনের পথচলায় ও সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব ও সুগভীর প্রভাবের কথা বোঝানোর জন্য। আর এ কারণেই সূরার শেষে চতুর্থবারের মতো এর উল্লেখ এসেছে।

وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

আল্লাহ ﷻ-এর আনুগত্যে ধৈর্যধারণ, গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য সবার, সব বিপদ-আপদ ও পরীক্ষায় ধৈর্য অবলম্বন করা এ সবই এর অন্তর্ভুক্ত। এর আগে দশম দারসে আমরা এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। মনে রাখবেন। ক্ষুদ্র কিংবা বড় যেকোনো ব্যাপারে ধৈর্যধারণ, এমনকি বিরক্তির সময় সবার করাও এর অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে, বিষয়গত, উদাসীনতা, এগুলোর মোকাবেলা করাও সবারের অন্তর্ভুক্ত। ইবাদত ও নেক আমল থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য শয়তান আপনার মনে এক্ষেত্রে আর উদাসীনতার সৃষ্টি করবে। সবারের মাধ্যমে শয়তানের এই কৌশলের মোকাবেলা করতে হবে। আমরা এখন যা করছি, সেই ইলমচর্চার বেলাতেও সবার প্রয়োজন। এভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রেও সবার প্রয়োজন। আপনি বিশাল এক জগ পানি নিয়ে একটা চারাগাছের ওপর ঢেলে দিয়ে, তারপর ওভাবে সেটাকে ফেলে রাখতে পারেন। আবার প্রতিদিন নিয়ম করে এক মগ করে পানি দিতে পারেন। কোনটা ভালো? আপনি যদি একবারে এক জগ পানি পুরোটা ঢেলে দিয়ে তারপর আর পানি না দেন, তাহলে গাছটির বাঁচার কোনো সম্ভাবনা নেই। গাছটিকে বাঁচাতে হলে অবশ্যই নিয়মিত এক-দুই মগ করে পানি ঢালতে হবে। ইবাদতের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা এ রকম।

শয়তানের একটা কৌশল হলো সে কিছু কিছু ইবাদতের ক্ষেত্রে মানুষকে এগিয়ে যেতে দেয়। কেউ হয়তো মাত্র ইসলাম কবুল করার পর, কিংবা কোনো একটা খুতবাহ অথবা লেকচার শুনে হঠাৎ করেই ইশা থেকে ফজর অবধি কিয়ামুল লাইল করার কথা চিন্তা করতে শুরু করে। এ জন্যই 'মুমিনের অন্তরের প্রশান্তি (কিয়ামুল লাইল)'^(১৬৯) লেকচারে আমি বলেছিলাম, আপনি শুরু করুন তবে ধীর-স্থিরতার সাথে, ধাপে ধাপে। একসাথে বেশ কিছুটা কাজ করে তারপর সেটা বন্ধ করে ফেলে রাখার চেয়ে, ধাপে ধাপে শুরু করে সেটা নিয়মিত চালিয়ে যাওয়া উত্তম। শয়তান হয়তো একদিন সারা রাত আপনাকে কিয়াম করতে দেবে, যাতে করে পরের দিন থেকে আপনার উৎসাহে ভাটা পড়ে যায়। আর এভাবে এক রাতের ইবাদতের বিনিময়ে সে আপনাকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এমনকি বছরের পর বছরও ওই ইবাদত করা থেকে বিরত রাখে। ইসলামে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হয়। তাই ইবাদতের ক্ষেত্রে একগুঁয়েমি ও উদাসীনতা সৃষ্টির শয়তানী কৌশলের মোকাবেলায় আপনাকে সবার করতে হবে। একইভাবে ইলম অর্জনের ক্ষেত্রেও সবার প্রয়োজন। আপনারা দেখবেন, অনেকে অনেক আগ্রহ-উদ্যমে ইলম অর্জনে এগিয়ে আসে, কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই হঠাৎ করে ইসলাম, তাওহিদ ও ইলমের প্রতি তাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ভাটা পড়ে। তাই আপনাদের অবশ্যই সবার ধরে রাখতে হবে।

কখনো এর পেছনে কিছু যৌক্তিক কারণ থাকে, আবার কখনো কখনো এটা পুরোপুরিভাবে শয়তানের কারসাজির কারণে হয়। আমি এমন অনেককেই চিনি যারা মদীনা ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যাবার তীব্র আগ্রহ নিয়ে শুরু করে। আপনারা হয়তো জানেন, এখানে ভর্তি হবার একটি মোটামুটি লম্বা প্রক্রিয়া আছে। আবেদনপত্র পাঠানো, সেটা গৃহীত হওয়া ইত্যাদিতে যে

সময়টুকু যায়, এর মাঝে অনেকেই ইলম অন্বেষণের স্পৃহা মলিন হয়ে যায়। তখন তারা আর মদীনায যেতে চায় না। এ কারণেই মুসা عليه السلام-কে বিভিন্ন عليه السلام বারবার বলেছিলেন,

إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا

আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না। (সূরা আল-কাহফ, ৬৭)

তালিবুল ইলমগণ এক মহৎ পথের পথিক, তাই এ পথে তাদের অবশ্যই মৈথলীল হতে হবে। রাতারাতি ইসলাম শেখা যায় না, এ জন্য প্রয়োজন সবর, অধ্যবসায় ও একনিষ্ঠতা।

কখনো কখনো আপনার উস্তাদ ও শিক্ষকের ব্যাপারেও আপনার সবর করতে হবে। আমি বেশ কয়েকজন শাইখের কাছ থেকে শেখার সুযোগ পেয়েছি। তাদের একজনের কথা আমার মনে আছে। আমি কখনো তাঁর মুখে মুচকি হাসি দেখেছি বলেও মনে পড়ে না। তাঁর কাছে প্রশ্ন করার পর প্রশ্নকারীকে বকুনি খেতে হয়নি বা লজ্জিত হতে হয়নি, এমন খুব কমই হতো। কিন্তু তাই বলে আমরা সেখান থেকে চলে আসিনি।

শাইখ আহমাদ বাসাফ একবার শাইখ নাসির আল-আকিলকে প্রশ্ন করলেন, আকিদাহর ব্যাপারে কে সবচেয়ে বেশি জানেন? শাইখ নাসির আল-আকিলকে এ প্রশ্ন করার কারণ হলো, তিনি আকিদাহর ওপর মাস্টার্স ও পিএইচডি করেছেন। আকিদাহর ব্যাপারে তিনি গভীর জ্ঞানের অধিকারী এবং অসংখ্য ছাত্র তাঁর কাছ থেকে আকিদাহর শিক্ষা লাভ করেছে। ভো শাইখ নাসির আল-আকিলকে প্রশ্ন করা হলো, আকিদাহর ব্যাপারে কে সবচেয়ে বেশি জানেন? তিনি বললেন, পৃথিবীর বুকে এমন কাউকে আমি চিনি না যিনি আকিদাহর ব্যাপারে শাইখ আবদুল্লাহ আল-গুনাইমানের চেয়ে বেশি জানেন। আমি মনে করি শাইখ নাসির আল-আকিলের এই কথা সম্পূর্ণ সঠিক। আমি আর বাবা দুজনেই শাইখ আবদুল্লাহ আল-গুনাইমানের কাছে পড়েছি। শাইখের কাছে বাবা অনুরোধ করেছিলেন যেন তিনি আমহক পড়ান। তাঁর কাছে পড়ার সময় আমার নিয়মিত তাঁর বাসায় যাওয়া হতো। এ ছাড়া মদীনা ইউনিভার্সিটিতেও তিনি আমাদের পড়াতেন। সপ্তাহে তিন বা চার দিন মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে তিনি হারামেও দারস দিতেন।

আমার ভুল হতে পারে, তবে আমার যতটুকু মনে পড়ে আমি কখনো তাঁর মুখে হাসি দেখিনি। একবার শাইখ গুনাইমানের বাসায় এক বন্ধুকে নিয়ে গিয়েছিলাম। দারসের মাঝখানে আমার বন্ধু কিছু একটা জিজ্ঞেস করায় তিনি কড়াভাবে বকুনি দিয়েছিলেন। ফেরার পথে গাড়িতে আমার বন্ধু বলেছিল, তুমি আর কোনো দিন আমাকে এখানে আনবে না। শাইখ খুব শক্ত মানুষ ছিলেন, আর এর পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য সবাইকে যথাযথ শিক্ষা দেয়া কিংবা এটাই হয়তো তাঁর প্রকৃতি ছিল। আমি এই মহিফহের কাছে এসেছি ইলম অর্জনের জন্য, এটাই আসল কথা। আল্লাহ ﷻ তাঁকে ও আমার বাবাকে নেক আমলপূর্ণ দীর্ঘ হায়াত দিন এবং বারাকাহ দিন।

সারকথা হলো, ইলম হাসিলের জন্যও সবার দরকার। আজকের দিনে ছাত্রদের সাথে ছোট বাচ্চাদের মতো আচরণ না করলে হঠাৎ একদিন দেখা যায় সে অধৈর্য হয়ে উধাও হয়ে গেছে। আপনি যদি তাকে মাথায় তুলে না রাখেন, তাহলে দেখা যাবে সে আপনাকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো এক প্রাস্তে নেতিবাচক কোনো মন্তব্য করে বসবে। কিন্তু এমন মনোভাব রাখা যাবে না। সবারকে আপনার দুচোখের মাঝে রাখুন। আপনি একজন তালিবুল ইলম হিসেবে যাত্রা করছেন, কাজেই আপনাকে ধৈর্যশীল হতে হবে।

আশ-শাফে'ঈ ﷺ-এর বক্তব্য

সূরা আল-আসরের শেষে লেখক ইমাম শাফে'ঈ ﷺ-এর যে মন্তব্য উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে ইলমের আন্তরিক ও গভীর অধ্যবসায়ী ছাত্রদের জন্য শিক্ষা রয়েছে।

قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : لَوْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِهِ إِلَّا هَذِهِ السُّورَةُ لَكُنْتُمْ.

আশ-শাফে'ঈ ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ ﷻ যদি তার বান্দাদের জন্য এই সূরাটি ছাড়া আর কোনো সূরাই নাযিল না করতেন, তাহলে এটাই সবার জন্য যথেষ্ট হতো।'

এই উদ্ধৃতির ব্যাপারে বেশ কিছু কথা আছে। প্রথমত, মন্তব্যটির দিকে লক্ষ করুন। এই বক্তব্যের মূলকথা কিন্তু এই না যে, আমাদের জন্য কেবল এই একটি সূরা ছাড়া আর অন্য কিছুই প্রয়োজন নেই। সমস্ত কুরআনকে একপাশে রেখে দিয়ে আপনি শুধু সূরা আল-আসরকে নেবেন, এমন কিছু কিন্তু এখান বলা হচ্ছে না। বরং এর অর্থ হলো, হিদায়াত ও মুক্তির পথে চলার অনুপ্রেরণা, সাহস ও সামগ্রিক একটি দিকনির্দেশনা দানে এই একটি সূরাই যথেষ্ট। আলিমগণ যখন এই উদ্ধৃতি ব্যবহার করেন তখন এটা বোঝানোই তাদের উদ্দেশ্য।

লক্ষ করুন, আমি বলছি কিছু কিছু আলিম যখন এই উদ্ধৃতি ব্যবহার করেন, কারণ আমি একে ইমাম শাফে'ঈ ﷺ-এর হুবহু উদ্ধৃতি মনে করি না। উসুল আস-সালাসা হতে আসা এই উদ্ধৃতিটির কোনো সনদ পাওয়া যায় না।

আমার শাইখদের একজন হলেন মালির বিখ্যাত মুহাদ্দিস, ইমাম হাম্মাদ আল-আনসারি ﷺ। ফ্রেঞ্চ সন্ত্রাসীদের কবল থেকে বাঁচতে খুব অল্প বয়সে তিনি মালি থেকে হিজরত করে মক্কা-মদীনায় এসেছিলেন। এ পবিত্র ভূমিতে পা দেয়ার পর থেকে আমৃত্যু তিনি ইলমের সাধনা করে গেছেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বড় মাপের একজন আলিম। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে আছেন ইবনু জিবরিন, বকর আবু যায়িদ, সালিহ আলুশ-শাইখ, শাইখ উমার ফাল্লাতাহ এবং শাইখ আতিয়াহ সালিম। শেষের দুজন আমার শিক্ষক ছিলেন। শাইখ সালিহ আল-হুসাইনিও তাঁর ছাত্রদের একজন। শাইখ হাম্মাদ আল-আনসারি ইন্তেকাল করেন ১৯৯৭ এর দিকে। শাইখের ব্যাপারে জানার জন্য আমার কাছে অনুরোধ এসেছে, ইন শা আল্লাহ সুযোগ পেলে আমি তাকে নিয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে কিছু আলোচনা করার ইচ্ছা রাখি। এ আলোচনাগুলো

গুরুত্বপূর্ণ, কারণ শাইখ হাম্মাদের মতো আলিমরা হলেন সাহাবি ﷺ-দের ওইসব সত্যিকার অনুসারীদের একজন যারা আমাদের সময়ে অত্যন্ত বিরল। আর তাঁর মতো মানুষদের নিয়ে আলোচনা করা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ যখন আপনি সত্যিকারের উলামা সম্পর্কে জানবেন তখন আপনি বুঝতে পারবেন কে সত্যিকার অর্থে আলিম আর কে না।

শাইখ হাম্মাদের একটি লাইব্রেরি ছিল, যা ছিল জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। এই লাইব্রেরিতে একদিন শাইখকে এই উক্তিটির ব্যাপারে আমি প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, এটি সহিহ হবার ব্যাপারে কোনো সূত্র খুঁজে তিনি পাননি। আরেকজন তালিবুল ইলমের কাছ থেকে শুনেছি, শাইখ আল-আলবানি ﷺ-ও এ ব্যাপারে একই ধরনের মন্তব্য করেছেন। আমি যদি শাইখ হাম্মাদ আল-আনসারি ﷺ-এর কাছ থেকে আর কোনো কিছুই না শিখতাম তবুও আজীবন তাঁর জন্য দুআ করার জন্য এটাই যথেষ্ট হতো। আলহামদুলিল্লাহ তিনি আমাকে আরও বহু কিছু শিখিয়েছেন, আল্লাহ ﷻ জানাতে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিন। তিনি তাঁর অনেক বইয়েও এ ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন যে, অনেক ষোঁজাখুঁজির পরও তিনি এই উদ্ধৃতির কোনো সূত্র পাননি। তবে বাইহাকি ﷺ-এর *মানাকিবুশ শাফে'ঈ*তে একই রকম আরেকটি উদ্ধৃতির সনদ পাওয়া যায়। উদ্ধৃতিটি হলো,

لَوْ فَكَّرَ النَّاسُ فِي هَذِهِ السُّورَةِ لَكَفَّثَهُمُ

লোকেরা যদি কেবল এই সূরাটি হৃদয়ঙ্গম করত, তবে তা-ই তাদের জন্য যথেষ্ট হতো।

উসুল আস-সালাসাহতে আসা উদ্ধৃতির সাথে এটার কিছু পার্থক্য আছে, তবে এই উক্তিটি ইমাম শাফে'ঈ ﷺ-এর হবার ব্যাপারে সনদ পাওয়া যায়। শাইখ হাম্মাদ আল-আনসারি ﷺ-এর মতে, ইমাম শাফে'ঈ ﷺ থেকে এটি নির্ভুল সনদে বর্ণিত হয়েছে। এ কারণে প্রথমত, আমাদের এই উক্তিটিই ব্যবহার করা উচিত; কারণ, এর সনদ আছে। দ্বিতীয়ত, ইমাম শাফে'ঈ ﷺ কী বোঝাতে চাচ্ছেন তা এই উক্তি থেকে আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ, ইবনুল কাইয়িম, ইবনু কাসির, আশ-শানকিতি ﷺ সবাই তাঁদের বিভিন্ন গ্রন্থে এই উক্তিটিই উল্লেখ করেছেন,

لَوْ فَكَّرَ النَّاسُ فِي هَذِهِ السُّورَةِ لَكَفَّثَهُمُ

উসুল আস-সালসাহতে যেভাবে এসেছে সেই উক্তিটি তাঁরা কেউ ব্যবহার করেননি।

তাহলে উসুল আস-সালাসাহ লেখক কেন অন্য উদ্ধৃতিটি ব্যবহার করলেন?

لَوْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِهِ إِلَّا هَذِهِ السُّورَةُ لَكَفَّثَهُمُ

এটা দেবার কারণ কী? যখন *মানাকিব আশ-শাফে'ঈ* ﷺ থেকে পাওয়া উক্তিটির সনদ পাওয়া যায় এবং এটি অর্থের দিক থেকেও অনেক স্পষ্ট?

এর একটি কারণ হতে পারে যে, লেখক হুবহু উদ্ধৃত না করে এর অর্থ উল্লেখ করেছেন। আপনি যদি মুহাম্মাদ ইবনু আবিল ওয়াহহাব রহিমুল্লাহ-এর রচনাবলির দিকে তাকান ও যারা তাঁর রচনাসমূহের ওপর কর্তৃত্ব অর্জন করেছেন তাদের মন্তব্য লক্ষ করেন, তাহলে দেখবেন কিছু কিছু আলিম বলেছেন উদ্ধৃতি দেয়ার সময় ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আবিল ওয়াহহাব রহিমুল্লাহ বক্তব্যের অর্থ প্রাধান্য দিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে কারও গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করলে, তার লেখার ধাঁচ ও ধরন সম্পর্কে আপনি একটা ধারণা পাবেন। সুতরাং এখানে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে অর্থকে প্রাধান্য দেয়ায় কোনো সমস্যা নেই, তবে আমাদের উচিত সহিহ সনদে যে উক্তিটি এসেছে সেটা গ্রহণ করা। কারণ, প্রথমত এর সনদ আছে, আর দ্বিতীয়ত এর অর্থটি আরও স্পষ্ট।

এটি *উসুল আস-সালাস* হ্র চৌদ্দতম দারস। আগের তেরোটি দারসে আমরা চারটি বুনিয়াদি বিষয়ের আলোচনা শেষ করেছি। প্রথম মূলনীতিটি ছিল ইলম-আল্লাহ ﷻ, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও কিতাব সম্পর্কীয় জ্ঞান, দ্বিতীয়টি হলো এ ইলমের ওপর আমল, তৃতীয়টি হলো এগুলোর দাওয়াহ ও প্রচার এবং চতুর্থটি হলো এর ওপর সবর করা। এই চারটি মূলনীতির দলিল হলো সূরা আল-আসর। সূরা আল-আসর থেকেই এই চারটি মূলনীতি সংগ্রহ করা হয়েছে। চারটি মূলনীতির পক্ষে দলিল হিসেবে লেখক বুখারির একটি অধ্যায়ের শিরোনামকেও এনেছেন। এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমরা চারটি প্রাথমিক মূলনীতির আলোচনার পরিসমাপ্তি টানব এবং এই বইয়ের প্রথম অধ্যায় শেষ করব ইন শা আল্লাহ।

বুখারি থেকে উদ্ধৃত অধ্যায়ের শিরোনাম :

قَالَ الْبُخَارِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : بَابُ الْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ. وَالذَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى : فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ (محمد: ١٩) فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ.

লেখক বলছেন,

‘বুখারি ﷺ বলেছেন, অধ্যায় : কথা ও কাজের পূর্বে ইলম। আর এর দলিল হলো, মহান আল্লাহ ﷻ-এর এই বাণী, ‘জেনে রাখো (হে মুহাম্মাদ), আল্লাহ ছাড়া (সত্য) কোনো উপাস্য নেই। সুতরাং, তোমার গুনাহর কারণে ক্ষমাপ্রার্থনা করো...।’ (সূরা মুহাম্মাদ, ১৯)। কথা ও কাজের আগে ইলমের উল্লেখপূর্বক তিনি ﷺ আয়াত শুরু করেছেন।’

এটি হলো লেখকের উদ্ধৃত বুখারির অধ্যায়ের শিরোনাম।

গত দারসে আমরা উল্লেখ করেছি যে, আশ-শাফে’ঈ ﷺ-এর একটি উক্তির ক্ষেত্রে লেখকের দেয়া উদ্ধৃতিতে সামান্য কিছু পার্থক্য ছিল। হতে পারে লেখক আক্ষরিকভাবে উদ্ধৃত না করে

এখানে উক্তিটির অর্থ উদ্ধৃত করার কারণে এমন হয়েছে। এখানে বুখারির উদ্ধৃতির ক্ষেত্রেও দুটি ছোট পার্থক্য লক্ষ করা যায়। আপনি যখন মূল বুখারির সাথে মেলবেন তখন এ দুটো পার্থক্য দেখতে পাবেন। এ পার্থক্যের পরিমাণ আসলে খুব নগণ্য কিন্তু তালিবুল ইলমদের এটি জেনে রাখা রাখা উচিত।

দেখুন এখানে লেখক বলেছেন,

وَالَّذِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى

কিন্তু বুখারিতে বলা হয়েছে,

لِقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى

দুটো কথার অর্থ একই, কিন্তু শাব্বিকভাবে দুটোর মাঝে কিছু পার্থক্য আছে।

দ্বিতীয় আরেকটি পার্থক্য দেখা যায়, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্বিল ওয়াহাব رحمته الله-এর দেয়া উদ্ধৃতির শেষ বাক্যে। তিনি এখানে দুটো অতিরিক্ত শব্দ যোগ করেছেন। তিনি উদ্ধৃত করেছেন এভাবে—সূতরাং কথা ও কাজের আগে ইলমের উল্লেখপূর্বক তিনি আয়াত শুরু করেছেন। ‘কথা ও কাজের আগে’ এ শব্দগুলো লেখক অতিরিক্ত যুক্ত করেছেন। এ সংযুক্তির কারণে অর্থের কোনো পরিবর্তন আসে না। বরং এটি বুখারির বক্তব্যকে আরও স্পষ্ট করে। তবে এটি হুবহু ইমাম বুখারি رحمته الله-এর দেয়া শিরোনাম নয়।

লেখক رحمته الله বলেছেন,

فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ

আর ইমাম বুখারি رحمته الله এ পর্যন্ত গিয়ে থেমে গেছেন,

فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ

লেখকের পক্ষে থেকে যুক্ত করা শব্দ হলো,

قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ

লেখক কেন এই অতিরিক্ত অংশটুকু যোগ করলেন? এই পার্থক্যের কারণ কী? হতে পারে যে তিনি শাব্বিকভাবে উদ্ধৃতি দেয়ার বদলে অর্থ প্রকাশ করতে চেয়েছেন কিংবা আরও একটু ব্যাখ্যার মাধ্যমে অর্থকে আরও স্পষ্ট করতে চেয়েছে। কারণ, বর্ধিত অংশটুকুসহ পড়লে অর্থটি আরও সহজে বোঝা যায়। আবার অনেকের মত হলো, লেখক হয়তো আল-বুখারির সংকলনের এমন কোনো সংস্করণ ব্যবহার করছিলেন যেখানে অধ্যায়ের শিরোনামগুলোতে (হাদিসে না) সামান্য পার্থক্য ছিল।

বুখারির শিরোনামকে দলিল সাব্যস্তকরণের কারণ :

ইমাম বুখারি রহ-এর হাদিস-সংকলনটি স্বর্ণাঙ্করে লিখে রাখার মতো। এ কথা আমরা সবাই জানি। এটি হলো এমন এক সংকলন যার বর্ণনাকারীরা হলেন আকাশের নক্ষত্রের মতো। এ সংকলনের মান, গ্রহণযোগ্যতা ও মর্যাদা ইজমার ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। এ হলো এমন এক সংকলন যা মন্দ ও অপবাদের মূলোৎপাটন করেছে। এই গ্রন্থ হক ও হকপন্থীদের সত্যায়ন করেছে। শুধু তা-ই না, এ সংকলনের বিন্যাস, গঠনপ্রণালি ও শিরোনাম নির্বাচনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদ্ধতির দিকে দিকে খেয়াল করলে দেখবেন এগুলো থেকেও শেখার মতো অনেক কিছু আছে। আলিমদের বইতে প্রায়ই দেখবেন নিজেদের বক্তব্যের পক্ষে দলিল হিসেবে তাঁরা বুখারির উদ্ধৃতি দিয়ে বলছেন,

قَالَ الْبُخَارِيُّ

নিজেদের কথার পক্ষে দলিল হিসেবে তাঁরা বুখারির দেখা শিরোনামগুলোকে পেশ করেন। বুখারির সংকলনের শিরোনামের যদি এই মর্যাদা হয়, তাহলে চিন্তা করুন এতে উল্লেখিত রাসূলুল্লাহ স-এর হাদিসের মর্যাদা কেমন হতে পারে!

একটি উদাহরণের মাধ্যমে আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবেন।

একজন তালিবুল ইলম একবার একটি গবেষণাপত্র নিয়ে কাজ করছিলেন। এর বিষয়বস্তু ছিল এক সফরে একাধিক উমরাহ করা ভালো নাকি কেবল একটি উমরাহ করা উত্তম? যেমন ধরুন, আপনি এখান থেকে মক্কাতে গিয়ে উমরাহ করলেন। মক্কায় থাকা অবস্থায় আপনি দ্বিতীয়বারের মতো আত-তানিয়ে গেলেন। এ রকম অনেকে করে থাকে। তারপর আপনি তৃতীয় এবং এভাবে চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তমবারের মতো গেলেন, আর এভাবে বারবার উমরাহ করলেন। এটা ভালো নাকি এক সফরে কেবল একটি উমরাহ করা উত্তম? এটি একটি ফিকহি মাসআলা এবং এ নিয়ে আলিমদের মধ্যে বিস্তার আলোচনা ও মতপার্থক্য হয়েছে। এমনকি চার ইমামদের মধ্যেও এ নিয়ে মতভেদ হয়েছে। এই তালিবুল ইলম দীর্ঘ সময় নিয়ে সমস্ত দলিল-প্রমাণাদি পর্যবেক্ষণ, অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণের পর তার এক বন্ধুকে বলল, সব শেষে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, ব্যক্তির পুরস্কার নির্ভর করবে সে কিসের পেছনে প্রচেষ্টা ব্যয় করেছে তার ওপর। তার বন্ধু বলল, ঠিক একই কথা বুখারির একটি অধ্যায়ে শিরোনাম হিসেবে এসেছে,

بَابُ أَجْرِ الْمُعْتَمِرَةِ عَلَى قَدْرِ النَّصَبِ

অর্থাৎ, প্রচেষ্টার পরিমাপ অনুযায়ী উমরাহর সাওয়াবপ্রাপ্তি-সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ।

আন-নাসাব (النَّصَب) মানে আপনি কতটুকু চেষ্টা বা পরিশ্রম করেছেন, সুতরাং প্রত্যেকে তার প্রচেষ্টা অনুযায়ী সাওয়াব লাভ করবে।

সেই তালিবুল ইলম তখন বললেন, আল্লাহর শপথ! এটা যদি আগে দেখতাম, তাহলে আমার অনেক সময় বেঁচে যেত। কেবল শিরোনাম থেকে তিনি এই উত্তর পেয়ে যেতে পারতেন। তিনি হয়তো বুঝারিতে চোখ বুলিয়েছিলেন, কিন্তু অনেক সময় এমন হয় যে আমরা কোনো কিছু খোঁজার সময় শিরোনামের দিকে তেমন একটা মনোযোগ দিই না। আপনি হয়তো খুঁজতে খুঁজতে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টে গেছেন কিন্তু এর শিরোনামটাই খেয়াল করেননি। বুখারি রহ তার হাদিস সংকলনে অধ্যায়গুলোর যে শিরোনাম দিয়েছেন, সেটা নিয়ে যুগে যুগে আলিমগণ বইয়ের পর বই লিখে গেছেন। ইবনু হাজার রহ-এর শরাহগ্রন্থে আপনারা এর কিছু নমুনা দেখতে পাবেন। তাঁর শরাহগ্রন্থে তিনি এ নিয়ে কিছু আলোচনা করেছেন। বুখারি রহ-এর দেয়া শিরোনামের ওপর বই লিখেছেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবি রহ ও ইবনু হামামাহ রহ। বুখারি রহ-এর দেয়া শিরোনামগুলো কী শুধু শিরোনাম নাকি এগুলো তাঁর ফিকহি মতামত? এ নিয়ে আলিমদের মধ্যে অনেক তর্ক-বিতর্ক, অনেক লেখালেখি হয়েছে।

তাঁরাই ছিলেন ইলমের মহিকর। শুধু হাদিস-সংকলনের অধ্যায়ের শিরোনামের মাঝে এত গভীর জ্ঞান নিহিত আছে। তাঁদের লেখা বইগুলো কতটা সমৃদ্ধ চিন্তা করুন! শুধু ইলম থাকলেই এটা সম্ভব হয় না। ইলমের জগতের এই মহিকরদের সাথে তাঁদের মালিকের এমন কোনো গুঢ় রহস্য ছিল, যা তাঁদের এত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন করে তুলেছে। ভাইয়েরা আমাকে একটা প্রোগ্রামের কথা বলেছেন যেখানে ছয় হাজার ইসলামি বই আছে, আর সব মিলিয়ে এসব বইয়ের প্রায় ২০,০০০ খণ্ড আছে। ইন শা আল্লাহ একটি ল্যাপটপ পেলে তাঁরা আমাকে সেটা ডাউনলোড করে দেবেন বলেছেন। একটু চিন্তা করুন। বুখারি, সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ, ইবনু মাইন, ইবনু হাম্বল, আন- নাওয়াউরী, ইবনু তাইমিয়াহ ও ইবনুল কাইয়িম রহ প্রমুখ, হাদিসের খোঁজে কখনো কখনো সম্পূর্ণ মহাদেশ পাড়ি দিয়েছেন। আজ এত বিশাল এক জ্ঞানভান্ডার আমাদের হাতের নাগালে। ইলম এত সহজলভ্য হওয়া সত্ত্বেও এই কিংবদন্তিদের রচনাবলির ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারে এমন কোনো কিছু কেন আজকের তালিবুল ইলম ও আলিমগণ দিতে পারছেন না?

ইবনু তাইমিয়াহ, ইবনুল কাইয়িম, ইমাম বুখারি রহ এবং তাঁদের মতো অন্যান্য আলিমদের (রচনার মান ও সংখ্যার দিক থেকে) রচনাবলির দিকে তাকালে অভিভূত হতে হয়। গাড়ি কিংবা প্লেনে না, এ মানুষগুলো দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতেন গাধা ও উটের পিঠে। তারা ল্যাপটপ সাথে নিয়ে সেডেন স্টার হোটেল ঘুরে বেড়াতেন না। তাঁদের জীবন কেটেছে কারাগারে আসা-যাওয়া করে, আর জীবনভর নানা প্রতিকূলতার মোকাবেলায়। তাঁরা অনেক সময় স্মৃতি থেকে লিখতেন, সামনে বইপত্র নিয়ে কিংবা ল্যাপটপ খুলে বসে না। তাহলে তাঁরা কীভাবে এত বারাকাহ পেতেন?

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ.....

সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহ তোমাদের শিক্ষা দেন। (সূরা আল-বাকারাহ, ২৮২)

হ্যাঁ, ইলম অবশ্যই দরকার, কিন্তু এমন মর্যাদায় উন্নীত হতে হলে আল্লাহ ﷻ ও নিজের মাঝে বিশেষ কিছু গোপনীয়তা আপনাকে বজায় রাখতে হবে, যা কেবল তিনি আর আপনি জানবেন। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, তাঁদের এ ধরনের কোনো গোপন সম্পর্ক বা আমল ছিল, যা সম্পর্কে তাঁদের স্ত্রী ও সবচেয়ে কাছের ছাত্ররাও জানতেন না।

আমলের আগে ইলম :

ইমাম বুখারি رحمہ اللہ অধ্যায়ের শিরোনামে এই আয়াত ব্যবহার করেছেন,

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ

জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই এবং ক্ষমাপ্রার্থনা করুন।

ফা'লাম (فَاعْلَمْ) অর্থাৎ জানো। আল্লাহ ﷻ প্রথমে বলছেন, জানো যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আর তারপর বলছেন এবং নিজ পাপের জন্য আল্লাহ ﷻ-এর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করো। অর্থাৎ কথা ও কাজের আগে আসে ইলম। ইলম হলো তাওহিদের স্বীকৃতি ও আমল কবুলের শর্ত। নিয়্যাতের বিশুদ্ধতা, কথা ও আমলের সঠিক পদ্ধতি ও পূর্ণতা অর্জিত হয় ইলমের মাধ্যমে। আমলের আগে কেন ইলম অর্জন জরুরি, এর স্বপক্ষে ইমাম বুখারি رحمہ اللہ এই আয়াতকে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। মনে রাখতে হবে, যখন আমলের কথা বলা হচ্ছে তখন অন্তর, জিহ্বা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল, সবগুলোকে বোঝানো হচ্ছে। কাজেই কথা ও কাজের আগে একজন মুসলিমকে যে ইলম অর্জন করতে হবে, এ আয়াত হলো তার প্রমাণ। বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকেও এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, কিছু করার আগে আপনার সে বিষয়ে জানতে হবে। যা জানেন না সে বিষয়ে কীভাবে আপনি আমল করবেন? এটি নিছক কমনসেন্স থেকেই আমরা সবাই বুঝতে পারি। ধরুন, আপনি চাচ্ছেন আপনার বস, বাবা কিংবা শিক্ষককে সন্তুষ্ট করবেন। তাদের সন্তুষ্ট করার আগে কীভাবে সন্তুষ্ট করতে হবে, সেটা আপনাকে জানতে হবে। আপনার জানতে হবে কোন কাজগুলো তাঁদের পছন্দনীয়। নইলে এমনও তো হতে পারে যে আপনি এমন কিছু করলেন যাতে সন্তুষ্ট হবার পরিবর্তে তাঁরা বরং রেগে গেলেন। সুতরাং কথা ও কাজের আগে আসে ইলম, দলিল ও কমনসেন্স তা-ই বলে।

হ্যাঁ, কিছু কিছু ব্যাপার আছে যেগুলো আমরা ফিতরাতিভাবে জানি। আল্লাহ ﷻ-এর একত্ববাদ বা তাওহিদের শিক্ষা প্রত্যেক মানুষের ফিতরাতের মধ্যে নিহিত। এই ফিতরাহ বা স্বাভাবিক প্রবণতার ওপর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। রক্ত-মাংসের মতোই মানুষের প্রকৃতিতে মিশে আছে তাওহিদের উপলব্ধি। একটি শিশু যখন প্রথম কথা বলতে শেখে তখন শাহাদাহ পড়িয়ে তাকে ইসলামে প্রবেশ করানো হয় না। আপনি তাকে কালেমা শাহাদাহ শেখান, কিন্তু শাহাদাহ মুখে উচ্চারণের মাধ্যমে শিশু ইসলামে প্রবেশ করে না। কারণ, সে মুসলিম হয়েই জন্মেছে। ঈমান তার ফিতরাহর সাথে মিশে আছে। তবে মনে রাখতে হবে, ফিতরাতি ব্যাপারেও শিক্ষা

অর্জন জরুরি। কারণ, সময়ের সাথে সাথে বাহ্যিক মন্দ শক্তিগুলো এমনভাবে মানুষকে ঘিরে ধরে যে তা ফিতরাতি বিষয়কেও কলুষিত করে। এ কারণে এসব বিষয়েও জানা ও চর্চার প্রয়োজন।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ :

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

জানো, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। (সূরা মুহাম্মাদ, ১৯)

আল্লাহ ﷻ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর ইলমের কথা বলেছেন। এ হলো এমন এক ইলম যা সঠিকভাবে আয়ত্ত করতে পারলে অন্য যেকোনো জ্ঞানের অভাব ব্যক্তির কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর যার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর জ্ঞান নেই, অন্য কোনো জ্ঞান তার কোনো উপকারে আসবে না। এখানে আমরা চূড়ান্ত সাফল্য ও ক্ষতির কথা, অর্থাৎ আখিরাতের কথা বলছি।

সুনানুত তিরমিযিতে আবু হুরাইরা রাঃ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সঃ বলেছেন,

مَنْ قَالَهَا فِي مَرَضٍ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمُهُ الْكَاؤُ

মৃত্যুরোগে আক্রান্ত অবস্থায় যে এই কথাটি (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) বলবে, এ অবস্থায় মারা গেলে জাহান্নাম তাকে স্পর্শ করতে পারবে না।^(১১০)

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর ইলম অর্জনের পেছনে এত সময় দেয়ার কারণ কী? এর অন্যতম কারণ হলো কিছু মুফাসসিরিনের মতে, আল্লাহ ﷻ যখন কুরআনে বলেছেন 'তুমি কি দেখো না কীভাবে আল্লাহ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন? উৎকৃষ্ট বাক্যের তুলনা উৎকৃষ্ট বৃক্ষের ন্যায় যার শেকড় সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত আর শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত আকাশপানে।^(১১১) তখন তিনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর কথা বলেছেন। তাঁদের মতে, এই পবিত্র বৃক্ষ হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এ বৃক্ষের শেকড় সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত হওয়া হলো আপনার অন্তরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর গভীরতা। আর এ বৃক্ষের শাখা-প্রশাখাগুলো হলো আপনার আমল, যা প্রতিনিয়ত আল্লাহ ﷻ-এর কাছে পৌঁছচ্ছে।

আল্লাহ ﷻ বলেন :

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَضَلُّهَا ثَابِتٌ وَفُرَعُهَا فِي السَّمَاءِ

তুমি কি দেখছো না আল্লাহ কালিমা তাইম্মিয়াহর উপমা দিয়েছেন কোন জিনিসের দ্বারা?

১১০ সুনানুত তিরমিযি: ৩৪৩০; মিশকাতুস সাঈয়িহ: ২৩১০

১১১ সূরা ইব্রাহীম, ১৪

এর উপমা হচ্ছে যেমন একটি উৎকৃষ্ট প্রজাতির গাছ, যার শিকড় মাটির গভীরে প্রোথিত এবং শাখা-প্রশাখা অকাশে উথিত। (সূরা ইব্রাহীম, ২৪)

রাসূল ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে নাযিলকৃত আয়াত কি আমাদের জন্যও প্রযোজ্য?

এটি আসলে উসুলুল ফিকহের একটি ব্যাপার। এই আয়াতে সরাসরি রাসূল ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে,

فَاعْلَمْ

অর্থ। জানো, শেখো। এ নির্দেশ কি আপনার-আমার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য? হ্যাঁ, এই আয়াতের নির্দেশ আমাদের সবার ওপর প্রযোজ্য। রাসূল ﷺ-এর পর আমরাও এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

এমন আরও আয়াত আছে যেখানে এভাবে বলা হয়েছে,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ

হে নবি।

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ

হে রাসূল।

এই আয়াতগুলোও কি আমাদের জন্য প্রযোজ্য? উসুলুল ফিকহের অধিকাংশ আলিমের মতে, অন্য কোনো সুস্পষ্ট দলিল থাকলেই কেবল এ আয়াতগুলো আমাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। অন্যথায় আমরা এই আয়াতের হকুমের অন্তর্ভুক্ত হব না। তবে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আহমাদ, ইমামুল হারামাইন ও ইমাম সামআনি رحمهم الله-এর মতে, রাসূল ﷺ-এর উদ্দেশ্যে বলা আয়াতগুলোতে আমরাও शामिल, যদি না शामिल না হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট দলিল পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় মতটাই অধিকতর শক্তিশালী হবার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, কুরআনে আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْضُوا الْعِدَّةَ

হে নবি, তোমরা যখন স্ত্রীদের তলাক দিতে চাও, তখন তাদের তলাক দিয়ে ইদতের প্রতি লক্ষ রেখ এবং ইদত গণনা করো। (সূরা আত-তলাক, ১)

আয়াতের শুরুতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধন করে يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ বলা হয়েছে, কিন্তু এর

পরেই পুরো উম্মাহকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ

সূরা আত-তাহরিমে আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَرْوَاحِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

হে নবি, আল্লাহ তোমার জন্য যা হালাল করেছেন তোমার স্ত্রীদের সম্বন্ধে কামনায় তুমি কেন তা হারাম করছ? আল্লাহ তো অতীব দয়ালু, ক্ষমাশীল। (সূরা আই-তাহরিম, ১)

এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। কিন্তু পরের আয়াতে সমগ্র উম্মাহকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ ﷻ বলেছেন :

فَذَرَّضَ اللَّهُ لَكُمْ حِلَّةً أَيْمَانِكُمْ

আল্লাহ তোমাদের জন্য কসম থেকে অব্যাহতি-লাভের উপায় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। (সূরা আত-তাহরিম, ২)

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধনের পর পরই উম্মাহকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাই দ্বিতীয় মতের প্রবক্তারা বলেন, এ আয়াতে প্রথমে রাসূলুল্লাহ ﷺ উদ্দেশ্য এবং সরাসরি সম্বোধনের মাধ্যমে তাঁকে ﷺ এখানে সম্মানিত করা হয়েছে এবং তাঁর ﷺ পর এই আয়াত উম্মাহর জন্যও প্রযোজ্য। দুটো অভিমতই يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ শব্দগুলোকে কেন্দ্র করে এসেছে, সে শব্দগুলোতে সরাসরি রাসূল ﷺ-কে সম্বোধন করা হয়েছে।

উসূল আস-সালাসাহ পুস্তিকার গঠন-বিন্যাস :

এই আলোচনার মাধ্যমে আমরা উসূল আস-সালাসাহর প্রথম অধ্যায়ের আলোচনা শেষ করলাম। আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন, নিঃসন্দেহে এটা আল্লাহ ﷻ-এর রহমত। এ পুস্তিকার পরবর্তী অংশ নিয়ে আলোচনার আগে আগে আমি এই বইয়ের গঠন-বিন্যাস নিয়ে কিছুটা আলোকপাত করতে চাই। আসলে একেবারে প্রথমেই আমাদের এ আলোচনা করার কথা ছিল। কিন্তু ইচ্ছা করেই আমি বিষয়টি নিয়ে এখন কথা বলছি, কারণ এখন ব্যাপারটি আপনাদের জন্য আরও সহজবোধ্য হবে।

গত তেরোটি দারসজুড়ে আমরা কেবল চারটি প্রাথমিক ও বুনিয়াদি বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। এইগুলোর দলিল হলো সূরা আল-আসর ও আল-বুখারির উদ্ধৃতি। সেগুলো নিয়েও আমরা আলোচনা করেছি। এই আলোচনা করতে আমাদের প্রায় চৌদ্দটি দারস লেগেছে এবং আলহামদুলিল্লাহ চারটি বুনিয়াদি বিষয়ের ব্যাপারে আলোচনা আমরা শেষ করেছি। কিছুসংখ্যক আলিমের মতানুযায়ী, এই অধ্যায়টি উসূল আস-সালাসাহ পুস্তিকার অন্তর্ভুক্ত না। তাঁদের মতে, এটা ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব রহিমহু-এর একটি স্বতন্ত্র

রচনা, যা পরবর্তী সময় তাঁর কোনো ছাত্র *উসুল আস-সালাসাহ* শুরুতে যুক্ত করে দিয়েছেন। সুতরাং এই আলিমদের মত হচ্ছে, চারটি বুনিয়াদি বিষয়ের এই আলোচনা একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা হিসেবে রচিত হয়েছিল, পরে লেখকের একজন ছাত্র একে *উসুল আস-সালাসাহ* শুরুতে ভূমিকা হিসেবে যুক্ত করেছেন। আবদুর রাহমান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু কাসিম এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

আপনারা হয়তো আবদুর রাহমান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু কাসিম নামটির সাথে পরিচিত নন। ১৯৭২ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এক অর্থে তিনি ছিলেন একজন মুজাদ্দিদ। তিনিই আধুনিক সময়ে ইবনু তাইমিয়াহ রহিমুল্লাহ-এর আল-ফাতাওয়াসংকলন করেছেন। ইবনু তাইমিয়াহ রহিমুল্লাহ-এর মৃত্যুর পর শতাব্দীর পর শতাব্দী তাঁর ফাতওয়াগুলো বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। ষাটের দশকে সর্বপ্রথম আবদুর রাহমান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু কাসিম এগুলো একত্র করেন। এ জন্য তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন সারা পৃথিবী। তিনি তাঁর কার্যক্রম শুরু করেন আরব উপদ্বীপ থেকে। ইবনু তাইমিয়াহ রহিমুল্লাহ-এর কোনো লেখা, ফাতওয়া কিংবা বক্তব্য যা-ই পেতেন, তিনি সেগুলো সংগ্রহ করতেন। তারপর ইবনু তাইমিয়াহ রহিমুল্লাহ-এর ফাতওয়ার খোঁজে তিনি মিসরে যান। প্রথমবার মিসর সফরে শেষে তাঁকে খালি হাতে ফিরে আসতে হয়। তবে দ্বিতীয়বার মিসর থেকে তিনি ইবনু তাইমিয়াহ রহিমুল্লাহ-এর বেশ কিছু লেখা সংগ্রহ করতে সমর্থ হন। তারপর তিনি যান লেবাননে। বার্ষিকের কারণে শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ায় এ সফরে ছেলে মুহাম্মাদকেও তিনি সাথে নেন। লেবাননে পৌঁছতে পারলেও পার্শ্ববর্তী শামে যাওয়া তাঁর জন্য প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে, তাই ছেলেকে সেখানে পাঠান। আল্লাহ স্ব শামবাসীদের কবুল করুন এবং তাঁদের বিজয় ত্বরান্বিত করুন। শাম থেকে তাঁর ছেলে ইবনু তাইমিয়াহ রহিমুল্লাহ-এর নিজ হাতে লেখা আট শ পঞ্চাশ পৃষ্ঠা সংগ্রহ করতে সমর্থ হন, যা এর আগে কোথাও প্রকাশিত হয়নি। এর কারণ হলো, ইবনু তাইমিয়াহ রহিমুল্লাহ তাঁর জীবনের একটা বিরাট অংশ শামে পার করেছিলেন। এরপর তাঁরা প্যারিসে গিয়ে সেখান থেকে ইবনু তাইমিয়াহ রহিমুল্লাহ-এর লেখা এমন তেরোটি মাসায়িল উদ্ধার করেন, যা সারা আরববিশ্বে খুঁজে পাননি। তারপর তাঁরা বাগদাদে যান এবং আরও বেশ কিছু রচনা সংগ্রহ করেন, যার মধ্যে ছিল আর-রিসালাতুত তাদমুরিয়াহ, যা ইবনু তাইমিয়াহ রহিমুল্লাহ-এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলির অন্যতম।

এভাবে গোটা পৃথিবী চষে তিনি শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ রহিমুল্লাহ-এর রচনাবলি মোট সাইত্রিশটি খণ্ডে সংকলন করেন, যা আজ *আল-ফাতাওয়া* নামে সুপরিচিত।

আবদুর রাহমান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু কাসিমের ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : আবদুল্লাহ ইবনু জিবরিন, হামুদ বিন উকলাহ আশ-শুয়াইবি এবং আবদুল্লাহ ইবনু ফাইয়ান রহিমুল্লাহ। আপনাদের সবার পরিচিত শাইখ হামুদ বিন উকলাহ আশ-শুয়াইবি রহিমুল্লাহ তাঁর পালকপুত্র ছিলেন। তেরো বছর বয়সে শাইখ হামুদ রহিমুল্লাহ-কে বাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল। তখন তিনি তাঁকে দস্তক নেন, লেখাপড়া শেখান, বিভিন্ন শাইখদের কাছে শিক্ষাগ্রহণের জন্য পাঠান। এভাবেই ঘরছাড়া সেই কিশোর এক সময় আমাদের সময়ের মহান ইমামদের একজনে

পরিণত হন। যাদের কথা বললাম, তাঁদের কেউই আজ জীবিত নেই, রহমাতুল্লাহি আলাইহি আজমাইন। আবদুর রাহমান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু কাসিম ৷-এর আরেকজন ছাত্র আবদুল্লাহ আল ফাইয়ান ৷ সমগ্র আরব উপদ্বীপে কুরআনের হালাকাহর আয়োজন করেছিলেন। তিনি ছিলেন আমার ও বাবার শিক্ষকদের একজন। আল-ফাতাওয়ার পাশাপাশি ইবনু কাসিম ৷ উলামায়ে নাজদের ষোলো খণ্ডবিশিষ্ট *আদদুরারুস-সুন্নিয়াহ* সংকলন করেন। ইবনু কাসিম ৷-কে নাজদি দাওয়াহর একজন ইমাম গণ্য করা হয়। *উসুল আস-সালাসাহ* নিয়ে আল-হাশিয়াহ নামে তাঁর রচিত প্রায় এক শ পৃষ্ঠার একটি ছোট ব্যাখ্যাগ্রন্থ আছে।

এতদিন আমরা যে অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করেছি, ইবনু কাসিম ৷-এর মতে সেটি *উসুল আস-সালাসাহ* পুস্তিকার অন্তর্ভুক্ত নয়। তাঁর মতে এটি ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওম্মহহাব ৷-এরই লেখা, তবে একটি পৃথক ও স্বতন্ত্র রচনা। আমার কাছে এই মতকেই অধিকতর সঠিক বলে মনে হয়েছে। আসলে আগে আমি এ মতের ব্যাপারে অনড় হিলাম বলা যায়। কিন্তু শাইখ আলী আল-খুদাইর (আল্লাহ ৷ তাঁর মুক্তি দ্বারান্বিত করুন) এ বিষয়ে বিপরীত মত দিয়েছেন। তাঁর মতে এই অধ্যায়টি *উসুল আস-সালাসাহ* পুস্তিকার অন্তর্ভুক্ত এবং *উসুল আস-সালাসাহ* ভূমিকা হিসেবেই লেখক এটি রচনা করেছেন। শাইখ আলী আল-খুদাইরের অভিমতের কারণেই আমি কিছুটা দ্বিধার সাথে বিষয়টি এখানে উল্লেখ করছি, যদিও আমি মনে করি ইবনু কাসিম ৷-এর মতটিই অধিকতর সঠিক। এই ব্যক্তিগণ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওম্মহহাব ৷-এর রচনাবলির ওপর গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী। এ ব্যাপারে তাঁদের জ্ঞান বিশদ ও বিস্তৃত। শুধু লেখকের-ই নয়, বরং তাঁর পরবর্তী দুই থেকে তিন প্রজন্মের ছাত্রদের রচনার ব্যাপারেও তাঁরা সমান পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান রাখেন। তাঁরা এ বিষয়ে বিস্তারিত ও গভীর অধ্যয়ন-গবেষণা করেছেন, যার ফলে এই পুস্তিকার অধ্যয়ন, গবেষণা, পর্যালোচনা এবং এর বিন্যাস ও গঠনশৈলীর ব্যাপারে বোঝা আমাদের জন্য সহজ হয়েছে। এর মর্মার্থ উদ্ধার করা আমাদের জন্য অনেক সহজ হয়েছে। তাঁর এই বিশদ গবেষণা না থাকলে পড়ার সময় আমাদের মনোযোগ হয়তো বিভিন্ন দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যেত। *উসুল আস-সালাসাহ* পুস্তিকাটির ব্যাপারে এ বিষয়গুলো জানাও উপকারী জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, কারণ এ পুস্তিকাটি শেখার পেছনে আমরা প্রচুর সময় ব্যয় করি। আর এ ব্যাপারে উল্লেখ করা না হয়, বিশেষ করে ইংরেজি বা অন্যান্য অনারব ভাষার ছাত্রদের মাঝে, তাহলে একসময় এ তথ্যগুলো বিস্মৃত হয়ে যেতে পারে।

অনেককেই দেখবেন শেজ্ঞপিয়ার কিংবা এডগার অ্যালান পো'র মতো লোকের লেখা নিয়ে অর্থহীন গবেষণায় বছরের পর বছর ব্যয় করে। এর পেছনে তারা পুরো জীবন পার করে দেয়। তারা এত গভীরভাবে এসব লেখকদের ব্যাপারে গবেষণা করে যে, আপনি তাদের কয়েক পৃষ্ঠা লেখা দেখিয়ে যদি জানতে চান এটা শেজ্ঞপিয়ারের লেখা কি না, তবে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তারা বলে দিতে পারবে। তারা যেকোনো নকল লেখা ধরে ফেলতে পারবে এবং বলবে যে এটা কোনোভাবেই শেজ্ঞপিয়ারের লেখা হতে পারে না, কারণ তিনি এই শব্দ

এভাবে ব্যবহার করবেন না, তিনি অমুক শব্দের বদলে অন্য শব্দ ব্যবহার করতেন ইত্যাদি ইত্যাদি। আলহামদুলিল্লাহ মুসলিম হিসেবে আমাদের মধ্যে ইবনু কাসিম, আলী আল-খুদাইর এবং নাসির আল-ফাহাদদের মতো মানুষ আছেন, যারা ইবনু তাইমিয়াহ, ইবনুল কাইয়িম, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব رحمہم اللہ এবং তাঁর অনুসারী নাজদি উলামায়ে কেরামের রচনাবলি গভীরভাবে অধ্যয়ন, বিশ্লেষণ ও গবেষণার মহান কাজটি করেছেন ও করছেন। আল্লাহ ﷻ তাঁদের মুক্তি ত্বরান্বিত করুন এবং তাঁদের মাঝে যারা ইস্তিকাল করেছেন তাঁদের ওপর রাহমাহ নাযিল করুন।

এ বিষয়ে প্রকৃত গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী ব্যক্তিদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন শাইখ নাসির আল-ফাহাদ। তিনি শুধু এ ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ নন; বরং এ পুস্তিকার লেখক, তাঁর ছাত্র এবং বিগত শতাব্দীগুলোতে যারা তাঁদের অনুসারী, তাঁদের সবার প্রায় সমস্ত রচনাবলি তিনি মুখস্থ করেছেন। এমন কিছু কিছু বিষয় থাকে, যা আপনার কাছে অনেক সময় সাংঘর্ষিক মনে হতে পারে। আপনি হয়তো একটি বই পড়লেন যেখানে এক রকম লেখা আছে, আবার অন্য বইয়ে দেখলেন কিছুটা পার্থক্য আছে, ফলে আপনার মনে এ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। কিংবা দুটো বইয়ের বক্তব্যে আপনি ভিন্নতা দেখতে পান এবং তখন আপনাকে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয়। এখানে কেন পার্থক্য হচ্ছে? কেন এখানে এমন বলা হলো? এমন বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর তখন প্রয়োজন হয়। কিংবা হতে পারে সূরা আল-আসর নিয়ে ইমাম শাফে'ঈ কিংবা ইমাম বুখারি رحمہم اللہ-এর উদ্ধৃতি বিষয়ে যে পার্থক্যের আলোচনা আমরা করেছি, এমন কিছু বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। এসব ব্যাপারে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে বছরের পর বছর গবেষণা ও অধ্যয়নের দরকার হয়, আর শাইখ নাসির আল-ফাহাদ এমনই গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী একজন বিশেষজ্ঞ। উসমানি খিলাফাহর ওপর লেখা তাঁর বইয়ে এর কিছু নমুনা দেখতে পাবেন।

যা হোক, এ আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল এই বিষয়টি পরিষ্কার করা যে, কেউ কেউ বলেছেন চারটি প্রাথমিক মূলনীতি-সংক্রান্ত অধ্যায়টি আসলে উসুল আস-সালাসাহর অংশ নয়। এটি লেখকের একটি পৃথক ও স্বতন্ত্র রচনা, যা পরে তাঁর কোনো ছাত্র ভূমিকা হিসেবে উসুল আস-সালাসাহর শুরুতে যুক্ত করেছেন।

এবার আসুন আমরা কীভাবে এই পুস্তিকাটি নিয়ে অগ্রসর হব তা নিয়ে একটা ধারণা দেয়া যাক। আমি এভাবে অন্য কোথায় পড়াতে দেখিনি তবে আমাদের দারসের জন্য আমরা এই পদ্ধতির অনুসরণ করব।

প্রথম অধ্যায় হলো চারটি বুনয়াদি বিষয়ের আলোচনা। আমরা আলহামদুলিল্লাহ এই আলোচনা শেষ করেছি। যেমনটা বলেছি, ইবনু কাসিম رحمہم اللہ-এর মতে এই অংশটি একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা যেটি পরে লেখকের ছাত্ররা ভূমিকা হিসেবে সংযুক্ত করেছে। আবার শাইখ আলী আল-খুদাইরের মতে এটি মূল পুস্তিকারই অংশ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরুও হয়েছে প্রথম অধ্যায়ের মতো ই'লাম রহিমাকাল্লাহ-এর আলোচনা দিয়ে। ই'লাম রহিমাকাল্লাহ-অবগত হোন, আল্লাহ ﷻ আপনার ওপর রহম করুন। ই'লাম রহিমাকাল্লাহ দিয়ে শুরু হবার পর দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং এগুলোকে 'তিনটি মাসায়েল' নামকরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথমটি হলো তাওহিদ আর-রুবুবিয়াহ। তাওহিদের আর-রুবুবিয়াহর আলোচনাকে আবার ছয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো তাওহিদ আল-উলুহিয়াহ বা শিরক এর আলোচনা। আর তৃতীয়টি হলো আল ওয়ালা ওয়াল বারা-এর সাথে সম্পৃক্ত আলোচনা। এই গেল পুস্তিকার দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়ে মূলত মিল্লাতু ইব্রাহীমের ওপর একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা এসেছে। লেখক এখানে মিল্লাতু ইব্রাহীমের কথা বলেছেন এবং তিনি এ কথা বলে শুরু করেছেন,

إِغْلَمْ أَرْشَدَكَ اللَّهُ لِيُطَاعِيَهُ

জানুন, আল্লাহ আপনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন।

এটি হচ্ছে তৃতীয় অধ্যায়। তবে এগুলো কি লেখক নিজে উসুল আস-সালাসাহ পুস্তিকায় যুক্ত করেছেন, নাকি তাঁর ছাত্রের পরে এগুলোকে উসুল আস-সালাসাহর ভূমিকা হিসেবে সংযুক্ত করেছেন, এ নিয়ে বিতর্ক আছে। তবে এ সবই ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আকিল ওয়াহাব রহীম-এর লেখা এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

চতুর্থ অধ্যায়টি শুরু করা হয়েছে এভাবে,

فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ؟

যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করা হয়, সেই তিনটি মূলনীতি কী?

চতুর্থ অধ্যায়টিই এই পুস্তিকার মূল নির্যাস। এই অধ্যায়ে তিনি সেই তিনটি বিষয়ের ওপর আলোচনা করেছেন, যে ব্যাপারে আমাদের কবরে প্রশ্ন করা হবে এবং পরিশেষে তিনি কুফর বিত তাগুত (الكفر بالطاغوت) ও আখিরাতের জীবন নিয়ে কিছু উপসংহার এনেছেন।

মূলত এইভাবেই পুস্তিকাটি বিন্যস্ত হয়েছে। মোটামুটি এই হলো আমাদের আলোচনার মূল আউটলাইন। আমরা এভাবে চারভাগে বিভক্ত করে, চারটি অধ্যায় ধরে নিয়ে অগ্রসর হব। আশা করি এভাবে চিন্তা করলে পুরো ব্যাপারটা বোঝা এবং আমরা কীভাবে এতদিন পড়ে এসেছি ও কীভাবে সামনে আলোচনা করব তার কাঠামোটো ধরা আপনাদের জন্য সহজ হবে। আহামদুলিল্লাহ এই চারটি অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম অধ্যায়ের আলোচনা আমরা শেষ করেছি। এবার আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচনা শুরু করব।

(প্রথম খণ্ড সমাপ্ত)



ତାତ୍ତ୍ୱିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ

ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶ



ଆହମାଦ ମୁଖା ଉପାଦିତ

ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମୂଳନୀତି

[ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ]



Ilmhouse

তাওহীদে মূলনীতি

[দ্বিতীয় খন্ড]

আহমাদ মুসা জিবরিল

অনুবাদ

ইলমহাউস অনুবাদক টিম

অনুবাদ নিরীক্ষণ ও তথ্যসূত্র সংযোজন

মানযুরুল কারিম



Ilmhouse

তাওহীদ মূলনীতি

[দ্বিতীয় খন্ড]

প্রথম সংস্করণ

রাবিউস সানি ১৪৪২ হিজরি, ডিসেম্বর ২০২০

গ্রন্থস্বত্ব © ইলমহাউস পাবলিকেশন ২০২০

সর্বস্বত্ব ইলমহাউস পাবলিকেশন কর্তৃক সংরক্ষিত

978-984-8041-79-6



প্রকাশক

ইলমহাউস পাবলিকেশন

www.facebook.com/IlmhouseBD

পৃষ্ঠাসজ্জা, মুদ্রণ ও বাঁধাই সহযোগিতায়

বই কারিগর ০১৯৬ ৮৮ ৪৪ ৩৪৯

নির্ধারিত মূল্য: ২৮০ টাকা

Tawhider Mulniti (Principles Of Monotheism) Part Two, Based on the lecture series 'Explanation of The Three Fundamental Principles' by Shaikh Ahmad Musa Jibril, Published by Ilmhouse Publication. First Edition, December 2020.

উৎসর্গ

বিশুদ্ধ তাওহিদের শিক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত করা
উম্মাহর সত্যপন্থী আলিমগণের প্রতি...

পূর্বকথা	১০
সম্পাদকের ভূমিকা	১২
লেখক পরিচিতি	১৪
ভূমিকা	১৭
উসুলুস সালাসাহর দ্বিতীয় অধ্যায়	১৮
দারস ১	২০
লেখক কেন আলাদা করে 'মুসলিম' বললেন?	২১
প্রথম বিষয় : তাওহিদ আর-রুবুবিয়্যাহ	২৪
তাওহিদ আর-রুবুবিয়্যাহ : কুরআন ও সুন্নাহ থেকে	২৪
তাওহিদ আর-রুবুবিয়্যাহর বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ	৩০
ইমাম আহমাদ	৩০
ইমাম শাফে'ঈ	৩০
ইমাম আবু হানিফা	৩২
তাওহিদ আর-রুবুবিয়্যাহ সম্পর্কে জানার গুরুত্ব	৩৪
দারস ২	৩৭
আল্লাহ আমাদের রিয়কদাতা	৩৭
আর-রাযিক এবং আর-রাযযাকের মধ্যে পার্থক্য	৩৮
রিয়ক কী?	৩৯
আকাশের মাঝে রয়েছে তোমাদের রিয়ক	৪০
আল-আসমাঈ এবং বেদুইন	৪১
রিয়ক আল্লাহর কাছ থেকে আসে	৪৪
রিয়ক নির্ধারিত এবং অপরিবর্তনীয়	৪৬
আর-রাযযাক রিয়ক দানে বিচক্ষণ	৫০
আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকুন	৫৩
প্রকৃত তাওয়াক্কুল	৫৫
বান্দা সাধ্যমতো চেষ্টা করবে, কিন্তু অন্তর জুড়ে থাকবে আল্লাহর সাথে	৫৮
রিয়ক শুধু দুনিয়াবি সম্পদ না	৬৩

রিয়কের ওপর তাদের মিথ্যা উপাস্যদের কোনো মালিকানা নেই	৬৫
আর-রাযযাক পথ করে দেবেন	৬৯
দারস ৩	৭৫
হামালা কী?	৭৫
সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে প্রচলিত ভুল ধারণা	৭৬
মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে	৮০
নিজেকে আগুন থেকে বাঁচান	৮১
আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির মুখাপেক্ষী নন	৮৩
আল্লাহ মানবজাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছেন	৮৬
যে রাসূলের আনুগত্য করবে সে জাম্মাতী হবে	৮৮
শরীয়াহর উৎস হিসেবে কুরআন এবং সুন্নাহ সমপর্যায়ের	৮৯
হাদীসের ওপরে কুরআনের অগ্রাধিকার	৯২
রাসূল (ﷺ)-এর পূর্ণ আনুগত্য করতে হবে	৯২
জুলাইবিব (رضي الله عنه)-এর কাহিনি	৯৪
দারস ৪	১০৩
কুরআন ও সুন্নাহর আসা আদেশের প্রকারভেদ	১০৩
কুরআন এবং সুন্নাহর মধ্যে সম্পর্ক	১০৮
সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য	১০৮
সুন্নাহর মাধ্যমে বিশদ বর্ণনা, ব্যাখ্যা বা সুনির্দিষ্টকরণ	১০৯
হাদীস শরীয়াহর স্বতন্ত্র উৎস	১১২
সুন্নাহ অস্বীকারকারীরা	১১৫
‘রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অবাধ্যতাকারী নিশ্চিত জাহান্নামে প্রবেশ করবে’	১২০
অবাধ্যতার প্রকারভেদ	১২০
শিরক আকবর বা কুফর আকবর	১২০
গুনাহগার মুসলিম	১৩১
যে ব্যক্তি ছোট শিরক নিয়ে আল্লাহর মুখোমুখি হবে	১৩৪
যারা ছোট শিরক করে তারা কী মালীআহর অন্তর্ভুক্ত হবে?	১৩৭
ছোট শিরক থেকে নিজেকে রক্ষা করার দু’আ	১৪১
আল্লাহ কেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে মুসা (عليه السلام)-এর তুলনা করলেন?	১৪২

দারস ৫	১৪৫
দ্বিতীয় বিষয় : ইবাদাতে শিরক	১৪৫
তাওহিদ ও শিরক নিয়ে আলোচনার ভূমিকা	১৪৫
শিরক আল-উলুহিয়াহ	১৫২
প্রথম প্রকার : আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা	১৫২
দ্বিতীয় প্রকার : ইবাদাতের কিছু অংশ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য নির্ধারণ করা	১৫২
দু'আ আত-তালাবের (دعاء الطلب) ক্ষেত্রে শিরক	১৫২
দু'আ আল-ইবাদাহর (الدعاء العبادة) ক্ষেত্রে শিরক	১৫৭
নিয়্যাতের শিরক	১৫৭
ভালোবাসার শিরক	১৬০
ভয়ের শিরক	১৬৩
আশার ক্ষেত্রে শিরক	১৬৮
রুকু এবং সিজদাহয় শিরক	১৬৯
সুজুদ, রুকু এবং ক্রিয়ামের মধ্যে পার্থক্য	১৭০
দারস ৬	১৭৩
কুরবানীর ক্ষেত্রে শিরক	১৭৩
তাওয়াফের ক্ষেত্রে শিরক	১৭৪
তাওহিদের শ্রেণি কি ৩টি নাকি ৪টি?	১৭৬
শিরক আল-উলুহিয়াহর তৃতীয় প্রকার : আনুগত্যের ক্ষেত্রে শিরক	১৮৫
শাসনের ক্ষেত্রে শিরকের উদাহরণ	১৮৭
উসুলুস সালাসাহর লেখকের উত্থাপিত প্রমাণ	১৯৬
উপসংহার	১৯৮
দারস ৭	২০০
তৃতীয় বিষয় : আল ওয়ালা ওয়াল বারা	২০১
আল ওয়ালা ওয়াল বারার দলিল	২০১
আল ওয়ালা ওয়াল বারার গুরুত্ব	২০৪
আল ওয়ালা ওয়াল বারাতে ত্রুটির বিপদ	২০৭
আল ওয়ালা ওয়াল বারাকে কলুষিত করার উদ্দেশ্য এবং ফলাফল	২১২
যারা নিজেদের বিশ্বাস বদলে ফেলে তাদের নিয়ে দুটো আসার	২১৭

ইলম বহনকারীদের একটি বিশেষ শ্রেণি	২২০
দারসের উপসংহার	২২৫
দারস ৮	২২৭
ইন্টারফেইথ অংশগ্রহণ করা লোকের ধরন	২২৭
ইহুদী খ্রিষ্টানরা কখনোই তোমাদের ওপর সন্তুষ্ট হবে না	২২৯
আবু ওয়াফা ইবনু আকিলের বক্তব্য	২৩১
আশ-শাফে'ঈর মতো হবার দাবির জবাব	২৩২
ইসলামী পরিভাষা বদলে দেয়ার যুদ্ধ	২৩৮
আল ওয়ালা ওয়াল বারার ক্ষেত্রে ইসলামী পরিভাষা বদলে ফেলা	২৪২
আল ওয়ালা ওয়াল বারার শ্রেণিবিভাগ	২৪৬
প্রথম শ্রেণি: তাওয়াল্লি	২৪৭
দ্বিতীয় শ্রেণি : আল মুওয়ালাহ	২৫১
তৃতীয় শ্রেণি : কাফির-মুশরিকদের সাথে বৈধ সম্পর্কের সীমানা	২৫৩
দারস ৯	২৫৫
কাফির-মুশরিকদের সাথে বৈধ সম্পর্কের সীমানা	২৫৬
কাফিরদের প্রতি দাওয়াহ	২৫৭
আহলুল কিতাবের যবেহ খাওয়া	২৫৮
আহলুল কিতাবের সাথে বিয়ে	২৫৮
উপহার বিনিময়	২৫৯
কাফিরদের সাথে দেখা করা	২৬০
কাফিরদের সাথে আচরণ	২৬১
আল ওয়ালা ওয়াল বারার কেন্দ্র হলো ভালোবাসা ও ঘৃণা	২৬৫
কুফর ও কাফিরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ	২৬৯
আমাদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ ইসলামের বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত	২৭৫
সহজাত ভালোবাস ও ঘৃণার স্বীকৃতি ইসলাম দেয়	২৭৭
আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সুলুলের ছেলের দৃষ্টান্ত	২৮১
উপসংহার	২৮৪

সকল প্রশংসা আল্লাহ -এর, যিনি আসমান ও যমিনের একচ্ছত্র অধিপতি, যিনি অনন্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়নকারী, যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু, যিনি তাওবাহ কবুলকারী, যিনি শাস্তি প্রদানে অত্যন্ত কঠোর, যিনি অতীব দানশীল। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, অমুখাপেক্ষী, অপ্রতিরোধ্য, সার্বভৌম। তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমরা তাঁর কাছ থেকেই এসেছি এবং তাঁর কাছেই আমাদের চূড়ান্ত গন্তব্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার ও তাঁর সাহাবি (رضي الله عنه)-দের ওপর।

আলহামদুলিল্লাহ, দীর্ঘ বিরতির পর তাওহিদের মূলনীতি দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল। নবি-রাসূল আলাইহিমুস সালাম-গণ এবং সালাফ আস-সালেহিন -এর শিক্ষার ওপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠ মহান সংস্কারক ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আদিল ওয়াহাব (رحمهم الله)-এর রচিত পুস্তিকাউসুলুস সালাসাহ। কালজয়ী এ পুস্তিকার ব্যাখ্যামূলক আলোচনা শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল হাফিযাহুল্লাহ উপস্থাপন করেছেন (Explanation Of The Three Fundamental Principles) নামের লেকচার সিরিযে (যা 'তাওহিদ সিরিয' নামে অধিক পরিচিত)।

শাইখ আহমাদ তাঁর আলোচনাকে চারটি অধ্যায়ে ভাগ করেছেন। প্রথম অধ্যায়ের আলোচনা ইতিপূর্বে 'তাওহিদের মূলনীতি প্রথম খণ্ড' নামে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডে উঠে এসেছে শাইখের লেকচার সিরিযের প্রথম চৌদ্দটি দারসের আলোচনা। দ্বিতীয় খণ্ডে থাকছে লেকচার সিরিযের চৌদ্দ থেকে বাইশ নম্বর দারসের আলোচনা। এই দারসগুলোতে শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল উসুলুস সালাসাহ-র দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যামূলক আলোচনা করেছেন।

তাওহিদ ও শিরকের শ্রেণীবিভাগ, আল্লাহর আইন দিয়ে শাসনের অপরিহার্যতা, শাসনের ক্ষেত্রে শিরক, ইন্টারফেইথ, আল ওয়ালা ওয়াল বারা এবং সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে আকীদাহ বদলে ফেলা বহুরূপীদের নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সমৃদ্ধ আলোচনা উঠে এসেছে তাওহিদের মূলনীতি দ্বিতীয় খণ্ডে। আজকের সংকট কবলিত সময়ে বিশুদ্ধ, অবিকৃত সত্যকে চেনার ক্ষেত্রে শাইখের এই আলোচনা পাঠকের জন্য উপকারী হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

অনুবাদের ক্ষেত্রে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে মূল আলোচনা ও বক্তব্যকে কোনোরকম

পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও বিয়োজন ছাড়া উপস্থাপন করার। যুক্ত করা হয়েছে শাইখের দেয়া উদ্ধৃতিগুলোর রেফারেন্স (তাখরীজ) এবং প্রয়োজনীয় টীকা।

বইটি নিয়ে কাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অনেক মানুষের স্বপ্ন, সময়, শ্রম জড়িয়ে আছে। এই মানুষগুলোর কেউ কেউ স্বীয় রবের কাছে ফিরে গেছেন। মহান আল্লাহ তাদের সকলের পক্ষ থেকে এ কাজটি কবুল করুন। এই কাজের সাথে জড়িত সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে তাঁর এই গুনাহগার বান্দাদের নাজাতের উসিলা বানিয়ে দেন।

শাইখ আহমাদ একটি কথা প্রায়ই বলেন,

‘মসজিদের চৌকাঠে আবদ্ধ থাকার জন্য তাওহিদের শিক্ষা নাযিল হয়নি। তাওহিদের শিক্ষা নাযিল হয়েছে এই পৃথিবীতে বাস্তবায়িত হবার জন্য’।

আমরা আশা করি তাওহিদের মূলনীতি পাঠকের মনে এই উপলব্ধি তৈরি করবে, ইন শা আল্লাহ।

মহান আল্লাহ যেন আমাদের এই শিক্ষা আত্মস্থ করার, আমাদের জীবনে এবং পৃথিবীতে বাস্তবায়ন করার তাউফিক দান করেন। এই মহান কর্তব্য পালনের উপযুক্ত শক্তি এবং আত্মত্যাগের সক্ষমতা দান করেন। নিশ্চয় সাফল্য কেবল তাঁরই পক্ষ থেকে।

ইলমহাউস পাবলিকেশন

রাবিউস সানি ১৪৪২, ডিসেম্বর ২০২০

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

আল্লাহ সুব'হানাহু ওয়া তা'আলার অশেষ মেহেরবানীতে শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলের (হাফিয়াহুল্লাহ) আরেকটি অসাধারণ গ্রন্থ বাংলাভাষী পাঠক পাঠিকার সমীপে উপস্থাপিত হতে যাচ্ছে। বিশুদ্ধ ইসলামী আকীদাহর প্রচার ও প্রসারে তা অশেষ অবদান রাখবে বলে আমি আশা করি।

শাইখ আহমাদ মুসার (হাফি.) লেকচার আমি যখন প্রথম প্রথম শুনি তখন নিজেকে তালিবুল ইলম বলার যোগ্যতাও আমার ছিল না, তখন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত জীবনের অনেকটা সময় কেটে গিয়েছে। কেবল আমিই নই আমার মত আরও বহু মানুষের জীবনে তাওহিদের সঠিক শিক্ষার ভিত শাইখের লেকচারগুলো স্থাপন করেছে এবং ইন শা আল্লাহ আগামীতেও করবে।

উম্মাহর এই মহীরুহের লেকচার থেকে সংকলিত “তাওহিদের মূলনীতি” বইটির প্রথম খণ্ড যখন প্রকাশিত হয়ে আমার হাতে আসে আমি তখন অত্যন্ত উদ্বেলিত হয়ে পড়ি এবং যতদূর মনে পড়ে মাত্র তিন দিনে আল্লাহর মেহেরবানীতে পুরো বইটা পড়ে ফেলেছিলাম। হয়তো জীবনের প্রাত্যহিক ব্যস্ততা না থাকলে এক বসাতেই পড়ে ফেলতে চেষ্টা করতাম, পারতাম কি পারতাম না সেটা ভিন্ন বিষয়। আসলে শাইখের লেকচারের আকর্ষণ তো এমনই, সাবলীল বিশুদ্ধ আলোচনা যেন বহুতা নদীর প্রবহমান স্রোতধারা। পাঠকের পিপাসাকে নিবারণ তো করেই বরং দুকূল উপচে দেয় মাঝেমাঝেই।

তখন থেকেই দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদের আশায় পথ চেয়ে ছিলাম। শ্রদ্ধেয় প্রকাশক মহোদয় যখন আমাকে এই দায়িত্ব দিলেন তখন অত্যন্ত আনন্দিত হই। আলহামদুলিল্লাহ, ইতোমধ্যে ইমাম ইবনুল কায়্যিম, ইবনু রজবসহ (رحمهم الله) আরও বহু ইমামের অনূদিত গ্রন্থে আমার যুক্ত হবার তাওফিক হয়েছে, আশা করি এগুলো আমার জন্য আখিরাতে নাজাতের মাধ্যম হবে। এই অর্জনের দানিতে আরেকটি পালক হিসেবে শাইখের এই অসাধারণ কিতাবের সম্পাদনার দায়িত্ব হাতে এসে গেল।

বইটা এমন সময় হাতে এসেছিল যখন আমি বেশ অসুস্থ আর এজন্য ভালোই ভুগতে

হচ্ছিল। আলহামদুলিল্লাহ এরপরও পাশাপাশি চলছিল সম্পাদনার কাজ। শাইখের কিতাবের সম্পাদনা মানে বইয়ের সাগরে অবগাহন করা। এত এত উদ্ধৃতি তিনি দিয়েছেন, এগুলো খুঁজে বের করা মুশকিল ও দুরূহ বটে। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানি যে আমাদের কাছে মাকতাবাতুশ শামিলা আছে, ইন্টারনেট আছে, নয়তো এরকম বইয়ের তাখরিজ বা তথ্যসূত্র উল্লেখ করতে হলেও হয়তো এক বছরের প্রয়াস জরুরি। শাইখের কিতাবটা আমি সম্পাদক হিসেবে না, বিমুক্ত পাঠক হিসেবে পড়েছি। এতে প্রয়োজনীয় বহু তথ্যসূত্র উল্লেখ করেছি। অধিকাংশ গ্রন্থসূত্র-ই মাকতাবাতুশ শামিলা থেকে গৃহীত, তবে বেশ কিছু গ্রন্থসূত্র পিডিএফ বা মূলকপি থেকে নেয়া হয়েছে। তাহকিকের ক্ষেত্রে নিজস্ব কোনো মত উল্লেখ করিনি; বরং মুহাক্কিক আলিমদের মত উল্লেখ করেছি।

এই বইটার সম্পাদনা করতে গিয়ে আমাকে বিপুল পরিমাণ বই ঘাঁটতে হয়েছে, পড়তে হয়েছে। একটা উদাহরণ উল্লেখের লোভ সামলাতে পারছি না, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়ার (রাহ.) একটা উদ্ধৃতি খুঁজতে মাজমুউল ফাতাওয়ার ৩৫তম খণ্ড প্রায় পুরোটাই পড়তে হয়েছে। এরকম ঘটনা কয়েকবারই ঘটেছে। এতে শাইখ আহমাদ মুসার মুখস্থশক্তি ও ধীশক্তির ব্যাপারে বারবার বিস্মিত হতে হয়েছে।

শাইখ কিছু স্থানে রিওয়াযাত বিল মা'না বা মূল অর্থকে বর্ণনা করে চলে গেছেন আক্ষরিক উদ্ধৃতি না দিয়ে, সেখানে আমি মূল উদ্ধৃতি উল্লেখ করে দিয়েছি। আশা করি এর ফলে গ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং মূল আলোচনার গতিও নষ্ট হবে না।

এই খণ্ডের আলোচনায় আকীদাহর বহু পাঠকের অনেক বিষয়েই ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটবে আর ইলমের যথেষ্ট বিকাশ ঘটবে বলে আমি আশা করি। আল্লাহ তা'আলার কাছেই এই কাজের কামিয়াবি ও মাকবুলিয়াতের জন্য দু'আ করি। এতে সম্পাদক হিসেবে আমার তরফ থেকে কোনো ভুল হয়ে থাকলে তা একান্তই আমার নিজস্ব দোষ ও শয়তানের ওয়াসওয়াসার ফল, আর যা সঠিক তার সবটাই আল্লাহর মেহেরবানী।

আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করি যেন এই গ্রন্থ, এর সাথে যুক্ত আমাদের সবার এবং পাঠকের নাজাতের উসিলা হয়-আমিন।

নিবেদক

মানযুরুল কারিম

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলের জন্ম যুক্তরাষ্ট্রে। তাঁর পিতা শাইখ মুসা জিবরিল ছিলেন মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সেই সুবাদে আহমাদ মুসা জিবরিল তাঁর শৈশবের বেশ কিছু সময় মদিনায় কাটান। সেখানেই এগারো বছর বয়সে তিনি হিফয সম্পন্ন করেন। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার আগেই তিনি *বুখারি ও মুসলিম* মুখস্থ করেন। কৈশোরের বাকি সময়টুকু তিনি যুক্তরাষ্ট্রেই কাটান এবং সেখানেই ১৯৮৯ সালে হাইস্কুল থেকে পাশ করেন। পরবর্তীকালে তিনি *বুখারি ও মুসলিমের* সনদসমূহ মুখস্থ করেন, এরপর হাদিসের ছটি কিতাব (কুতুবুস সিত্তাহ) মুখস্থ করেন। তারপর তিনিও তাঁর বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শরিয়াহর ওপর ডিগ্রি নেন।

আহমাদ মুসা জিবরিল শাইখ ইবনু উসাইমিনের তত্ত্বাবধানে অনেকগুলো কিতাবের অধ্যয়ন সম্পন্ন করেন এবং তিনি তাঁর কাছ থেকে অত্যন্ত বিরল তায়কিয়াহ ও লাভ করেন। শাইখ বাকর আবু যাইদের সাথে একান্ত দারসে তিনি আল ইমাম ওয়াল মুজাদ্দিদ শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহ্‌হাব ও শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহর কিছু কিতাবও অধ্যয়ন করেন। তিনি শাইখ মুহাম্মাদ মুখতার আশ শানকিতির অধীনে চার বছর পড়াশোনা করেন। আল্লামাহ হামুদ বিন উকলা আশ শুয়াইবির অধীনেও তিনি অধ্যয়ন করেন এবং তায়কিয়াহ লাভ করেন।

তিনি তাঁর পিতার সহপাঠী শাইখ ইহসান ইলাহি জহিরের অধীনেও পড়াশোনা করেছেন। শাইখ মুসা জিবরিল শাইখ ইহসানকে অ্যামেরিকায় আমন্ত্রণ জানান। শাইখ ইহসান অ্যামেরিকায় কিশোর শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলের সাথে পরিচিত হবার পর চমৎকৃত হয়ে তার বাবাকে বলেন, ইন শা আল্লাহ আপনি একজন মুজাদ্দিদ গড়ে তুলেছেন। তিনি আরও বলেন, এই ছেলেটি তো আমার বইগুলো সম্পর্কে আমার চেয়েও বেশি জানে।

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল *আর রাহিকুল মাখতুম* বইয়ের লেখক শাইখ সফিয়ুর রাহমান আল মুবারাকপুরির অধীনে দীর্ঘ পাঁচ বছর অধ্যয়ন করেন। এ ছাড়াও তিনি অধ্যয়ন করেন শাইখ মুকবিল, শাইখ আব্দুল্লাহ গুনাইমান, শাইখ মুহাম্মাদ আইয়ুব এবং শাইখ আতিয়াহ আস সালিমের অধীনে। শাইখ আতিয়াহ আস সালিম ছিলেন শাইখ আল্লামাহ মুহাম্মাদ আমিন আশ শানকিতির প্রধান ছাত্র এবং তিনি শাইখ আশ

শানকিত্তির ইত্তিকালের পর তাঁর প্রধান তাফসিরগ্রন্থ *আদওয়াযুল বায়ান* এর কাজ শেষ করেন। শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল শাইখ ইবরাহিম আল হুসাইনেরও ছাত্র ছিলেন। শাইখ ইবরাহিম ছিলেন শাইখ আব্দুল আযিয বিন আব্দুল্লাহ বিন বাযের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহচর। আল-লাজনাহ আদ-দাইমাহ লিল বুহসিল ইলমিয়াহ ওয়াল ইফতাহর প্রথম দিকের সদস্য শাইখ আব্দুল্লাহ আল কুদের সাথে শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল হাজ্জ করার সুযোগ লাভ করেন। এ ছাড়া দুই পবিত্র মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ কমিটির প্রধান শাইখ সালিহ আল হুসাইনের অধীনেও তিনি অধ্যয়নের সুযোগ পান।

মুহাদ্দিস শাইখ হামাদ আল আনসারির অধীনে হাদিস অধ্যয়ন করেন এবং তাঁর কাছ থেকেও তাযকিয়াহ লাভ করেন তিনি। তিনি শাইখ আবু মালিক মুহাম্মাদ শাকরাহর অধীনেও অধ্যয়ন করেন। শাইখ আবু মালিক ছিলেন শাইখ আলবানির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। শাইখ আল আলবানি ওয়াসিয়াহতে শাইখ আবু মালিককে তার জানাযার ইমামতি করার জন্য অনুরোধ করেন। শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল শাইখ মুসা আল কারনিরও ছাত্র। কুরআনের ব্যাপারে শাইখ আহমাদ ইজাযাহপ্রাপ্ত হন শাইখ মুহাম্মাদ মাবাদ ও অন্যান্যদের কাছ থেকে। শাইখ মুসা জিবরিল ও শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলের ইলম থেকে উপকৃত হবার জন্য শাইখ বিন বায অ্যামেরিকায় থাকা বিলাদুল হারামাইনের ছাত্রদের উৎসাহিত করেন। শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল শাইখ বিন বাযের কাছ থেকেও তাযকিয়াহ অর্জন করেন। শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলের ব্যাপারে মন্তব্য করার সময়ে শাইখ বিন বায তাঁকে ‘শাইখ’ হিসেবে সম্বোধন করেন এবং বলেন, তিনি (আলিমদের কাছে) পরিচিত এবং উত্তম আকিদাহ পোষণ করেন। শাইখ আহমাদ বর্তমানে অ্যামেরিকায় নিজ পরিবারের সাথে অবস্থান করছেন।

ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମୂଳନୀତି ୧

উসুলুস সালাসাহ পুস্তিকাটিতে চারটি অধ্যায় আছে। প্রথম অধ্যায় হলো চারটি বুনিয়াদি বিষয়ের আলোচনা। আলহামদুলিল্লাহ তাওহিদের মূলনীতি প্রথম খণ্ডে আমরা এই আলোচনা শেষ করেছি। তাওহিদের মূলনীতি দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা আলোচনা করব উসুলুস সালাসাহর দ্বিতীয় অধ্যায় নিয়ে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে এবং এগুলোকে ‘তিনটি মাসায়েল’ নামকরণ করা হয়েছে। এ তিনটি বিষয় হলো :

১. তাওহিদ আর-রুবুবিয়াহ (দারস ১ - দারস ৪)

তাওহিদ আর-রুবুবিয়াহর আলোচনাকে আমরা ছয়ভাগে ভাগ করেছি।

- আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা
- আল্লাহ আমাদের রিয়কদাতা।
- আল্লাহ কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া আমাদের সৃষ্টি করেননি।
- তিনি আমাদের কাছে রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন।
- যে রাসূল (ﷺ)-এর আনুগত্য করবে সে জান্নাতে যাবে।
- যে রাসূল (ﷺ)-এর অবাধ্য হবে সে জাহান্নামে যাবে।

২. তাওহিদ আল-উলুহিয়াহ (দারস ৫ - দারস ৬)

৩. আল ওয়ালা ওয়াল বারা (দারস ৭ - দারস ৯)

উসুলুস সালাসাহর দ্বিতীয় অধ্যায়

‘তিনটি মাসায়েল

জেনে রাখুন, আল্লাহ আপনার ওপর রহমত বর্ষণ করুন। নারী ও পুরুষ, প্রত্যেক মুসলিমের একান্ত দায়িত্ব এবং কর্তব্য হলো এই তিনটি বিষয় সম্পর্কে জানা এবং সে অনুযায়ী আমল করা।

এ তিনটি বিষয় হচ্ছে :

এক. আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, রিয়ক দান করেছেন এবং তিনি আমাদেরকে দায়িত্বহীনভাবে ছেড়ে দেননি। (বরং হেদায়াতের জন্য) তিনি আমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছেন। যে রাসূল (ﷺ)-এর আনুগত্য করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে; আর যে অবাধ্যতা করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণী,

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۖ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيًّا ۖ ﴾ [المزمل: ৫১, ৬১]

‘নিশ্চয় আমরা তোমাদের প্রতি একজন রাসূল প্রেরণ করেছি তোমাদের ওপর সাক্ষীস্বরূপ, যেমন পাঠিয়েছিলাম একজন রাসূল ফির‘আউনের প্রতি। কিন্তু ফির‘আউন সেই রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করল। ফলে আমরা তাকে পাকড়াও করলাম অত্যন্ত কঠোরভাবে।’ [সূরা আল-মুযযাম্মিল, ৭৩: ১৫-১৬]

দুই. ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ কাউকে তাঁর অংশীদার বা শরীক হিসেবে পছন্দ করেন না—চাই তা কোনো নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা হোন কিংবা কোনো প্রেরিত রাসূলই হোন না কেন। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ۖ ﴾ [الجن: ৮১]

‘নিশ্চয় সাজদাহর স্থানসমূহ শুধু আল্লাহর জন্য। অতএব, আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে আহ্বান করো না।’ [সূরা আল-জিন, ৭২: ১৮]

তিন. যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর আনুগত্য করে এবং ইবাদাতের জন্য এক আল্লাহকেই বেছে নিয়েছে, তাঁর পক্ষে এমন লোকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব (মুওয়ালাহ) করা মোটেই বৈধ নয়, যারা আল্লাহ ও রাসূল (ﷺ)-এর বিরুদ্ধাচরণকারী। যদিও তারা তাঁর

সবচেয়ে আপনজন হয়। এর প্রমাণ হলো আল্লাহর বাণী,

لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ
أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ
ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ
أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

‘আল্লাহ ও শেষ দিবসের ওপর ঈমান পোষণকারী এমন কোনো সম্প্রদায়কে আপনি পাবেন না, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারে। হোক না কেন তারা ঈমানদারদের পিতা, পুত্র বা ভ্রাতা কিংবা গোত্র-গোষ্ঠী। আল্লাহ এদের হৃদয়ে ঈমানকে শক্তিশালী করে রেখেছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে প্রেরিত (ফেরেশতা তথা) আত্মিক শক্তি দ্বারা তাদেরকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করে দেবেন যার নিম্নদেশ দিয়ে বয়ে চলেছে স্রোতঃস্বিনী—সেখানে তারা অবস্থান করবে চিরকাল। আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন তাদের ওপর এবং তারাও সন্তুষ্ট আল্লাহর ওপর। বস্তুত এরাই হচ্ছে আল্লাহর সেনাদল। জেনে রাখো, আল্লাহর এ সেনাদলই হবে পরিণামে সফলকাম।’ [সূরা আল-মুজাদালাহ, ৫৮: ২২]’

লেখক (ﷺ) দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু করছেন এভাবে,

(اعْلَمُوا) رَحِمَكَ اللَّهُ أَنَّهُ يُحِبُّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ تَعْلَمُ هَذِهِ الثَّلَاثِ مَسَائِلَ وَالْعَمَلِ
بِهِنَّ

জেনে রাখুন, আল্লাহ আপনার ওপর রহমত বর্ষণ করুন। নারী ও পুরুষ, প্রত্যেক মুসলিমের একান্ত দায়িত্ব এবং কর্তব্য হলো এই তিনটি বিষয় সম্পর্কে জানা এবং সে অনুযায়ী আমল করা।

প্রথম অধ্যায়ের মতো দ্বিতীয় অধ্যায়ও লেখক শুরু করেছেন, ‘ইলাম রাহিমাকাল্লাহ’ দিয়ে। অবশ্য এখানে একটি ব্যতিক্রম আছে। ব্যতিক্রমটি হলো, লেখক এখানে আলাদা করে নারী ও পুরুষের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন,

‘নারী ও পুরুষ, প্রত্যেক মুসলিমের একান্ত দায়িত্ব এবং কর্তব্য হলো...’

তিনি কেন এখানে আলাদা করে ‘নারী ও পুরুষ’ বললেন? কেন তিনি বললেন,

مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ

মূলত নারী ও পুরুষের কথা এখানে আলাদাভাবে বলা হয়েছে বক্তব্যকে আরও শক্তিশালী করার জন্য। আরবী সাহিত্যে—এবং অবশ্যই আরবী ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন আল কুরআনে—পুরুষকে সম্বোধন করে কিছু বলা হলে, সেটি নারীর জন্যেও প্রযোজ্য হয়। যদি না তা স্পষ্টভাবে শুধু পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। আরেকটু সহজ করে বলি। আরবীতে যখন শুধু পুরুষকে সম্বোধন করা হয়, তখন নারী-পুরুষ উভয়কেই বোঝানো হয়। আলাদা আলাদাভাবে সম্বোধন করার প্রয়োজন হয় না। পুরুষকে সম্বোধন করা হলে, সেটার মাধ্যমে নারীদের সম্বোধন করাও বোঝায়। ব্যতিক্রম হবে যদি নির্দিষ্ট করে বলে দেয়া হয় যে, এখানে শুধু পুরুষদের সম্বোধন করা হচ্ছে।

তাই বক্তব্যকে শক্তিশালী করার জন্য লেখক এখানে আলাদা আলাদাভাবে নারী ও পুরুষের কথা বলেছেন। এর মাধ্যমে তিনি বলছেন, নারী ও পুরুষ, প্রত্যেককে এই তিনটি বিষয় সম্পর্কে জানতে হবে এবং সে অনুযায়ী আমল করতে হবে।

লেখক কেন আলাদা করে ‘মুসলিম’ বললেন?

লেখক (ﷺ) বলেছেন,

নারী ও পুরুষ, প্রত্যেক মুসলিমের একান্ত দায়িত্ব এবং কর্তব্য হলো এই তিনটি বিষয় সম্পর্কে জানা এবং সে অনুযায়ী আমল করা।

মুসলিম কে?

মুসলিম হলো এমন কেউ, যে দুই কালেমার সাক্ষ্য দেয়। যারা মুসলিম ঘরে জন্ম নিয়েছে তাদের আলাদা করে এটা বলতে হয় না। কিন্তু কুফর বা শিরক ত্যাগ করে কেউ যখন ইসলাম গ্রহণ করে, তখন দুই কালেমার সাক্ষ্য তাকে উচ্চারণ করতে হয়। কাজেই মুসলিম দুই কালেমার সাক্ষ্য দেয়। কালেমা অনুযায়ী আমল করে, এমন সব কাজ থেকে বিরত থাকে যা মানুষের ঈমানকে বিনষ্ট করে এবং তাকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়।

কালেমা অনুযায়ী আমল করার অর্থ হলো—ইলম অর্জন, সুনিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন, আন্তরিকতা, আত্মসমর্পণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-কে ভালোবাসা, সত্যবাদিতা, মনেপ্রাণে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আইন মেনে নেয়া এবং এর আনুগত্য করা।

এই তিনটি বিষয়ের (কালেমার সাক্ষ্য, কালেমা অনুযায়ী আমল, ঈমান বিনষ্টকারী কাজ থেকে বিরত থাকা) কোনো একটি অনুপস্থিত থাকলে ঐ ব্যক্তিকে আর মুসলিম বলা যাবে না। ইসলামে প্রবেশের দরজা একটি; কিন্তু ইসলাম থেকে বের হবার দরজা অনেক। ওয়ু যেমন বিভিন্ন কারণে ভাঙতে পারে, তেমনিভাবে এমন অনেক কাজ আছে যেগুলোর কারণে ঈমান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কাজেই এ ব্যাপারগুলো খুব গুরুত্বের সাথে নিতে হবে।

যে ব্যক্তি ঈমান আনার পর ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়, তাকে বলা হয় ‘মুরতাদ’। আর ইসলাম ত্যাগ করে কাফিরে পরিণত হওয়াকে বলা হয় ‘রিদ্দা’। অর্থাৎ ঈমান ত্যাগ করার কাজটাকে বলা হয় রিদ্দা, আর যে রিদ্দা করে তাকে বলা হয় মুরতাদ।

আবার একজন ইহুদী বা খ্রিষ্টান—যে একদম ছোট থেকেই কুফরের ওপর বড় হয়েছে, যে কোনো সময়ই মুসলিম ছিল না—সেও কাফির। তবে তাকে বলা হয় কাফির আসলি

(كافر أصلي)।

মুরতাদ এবং কাফির আসলি দুজনেই কাফির। তবে ফিকহের কিতাবাদিতে এই দুই ধরনের কাফিরের বিধানের ব্যাপারে ভিন্নতা এসেছে।

তো লেখক এখানে বলছেন,

নারী ও পুরুষ, প্রত্যেক মুসলিমের একান্ত দায়িত্ব এবং কর্তব্য...

এখানে আরও একটা প্রশ্ন আসতে পারে।

লেখক এখানে যে কাজগুলোর কথা বললেন, সেগুলো কি শুধু মুসলিমদের জন্য প্রযোজ্য? কথাগুলো কি কাফিরদের জন্য প্রযোজ্য না? তারা কি এ বক্তব্যের আওতাভুক্ত হবে না?

ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো কাফিরের জন্যও প্রযোজ্য—এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এ নিয়ে আলিমগণের মধ্যে মতপার্থক্য নেই। যেমন: ইসলাম সমগ্র মানবজাতিকে তাওহিদের দিকে আহ্বান করে। এটা কাফিরদের জন্যও প্রযোজ্য। যারা এ দুনিয়াতে তাওহিদের আহ্বানে সাড়া দেবে না, তাদেরকে আখিরাতে শাস্তি পেতে হবে। কিন্তু লেখক এখানে শুধু মুসলিমদের কথা বলেছেন, কারণ এ পুস্তিকাটি লেখা হয়েছে মুসলিমদের জন্য।

সাধারণভাবে তাওহিদের আহ্বান মুসলিম ও কাফির সবার জন্যই প্রযোজ্য। অর্থাৎ ইসলামের মৌলিক বা প্রাইমারি বিষয়গুলো কাফিরদের জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু যেগুলো সেকেন্ডারি বিষয়, অর্থাৎ একজন মানুষ ইসলাম গ্রহণ করার পর যে বিষয়গুলো আসে, সেগুলো কাফিরদের জন্য প্রযোজ্য হবে কি না—তা নিয়ে মতপার্থক্য আছে। কেউ বলেছেন, হ্যাঁ, প্রযোজ্য হবে। আবার কেউ বলেছেন, প্রযোজ্য হবে না।

আমি মনে করি এ ব্যাপারে সারমর্ম হলো, এ ধরনের সেকেন্ডারি বিষয়গুলোর মধ্যে কিছু ক্ষেত্রে কাফিদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে আবার কিছু ক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়নি।

যেমন একজন মুসলিম যখন কাফিরদের কাছে ইসলামের দাওয়াহ নিয়ে যায়, তখন তাদেরকে সে সালাত, হজ্জের মতো কিছু বিষয় শেখাতে পারে। তাদেরকে আদাব শেখাতে পারে। হয়তো এ বিষয়গুলো জানার কারণে কোনো কাফিরের অন্তর ইসলামের প্রতি ঝুঁকে পড়বে। এ কারণেই মুয়ায বিন জাবাল (رضي الله عنه)-কে ইয়েমেনে পাঠানোর সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইয়েমেনের অধিবাসীদের যা যা শেখাতে বলেছিলেন,

তার মধ্যে এমন অনেক বিষয় ছিল।^[১]

আবার দেখুন, যেসব ব্যাপারে কাফিররা শাস্তি দেয়া হবে এমন বিষয়েও তাদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে দুটি মতের মধ্যে এটিই সঠিক মত। অর্থাৎ এমন কিছু বিষয় আছে যেগুলো সেকেন্ডারি—যেগুলো ইসলাম গ্রহণ করার পরে আসে—তবে এগুলো মেনে না নিলে, পালন না করলে শাস্তি হবে। যেমন এই আয়াতগুলো লক্ষ্য করুন।

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصْلِينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَحْوُضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴿٤٥﴾ وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٤٦﴾ حَتَّىٰ آتَانَا الْيَقِينَ ﴿٤٧﴾

‘তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে নীত করেছে? তারা বলবে, আমরা নামায পড়তাম না, অভাবগ্রস্তকে আহায্য দিতাম না। আর আমরা বেহুদা আলাপে মগ্ন থাকতাম। এবং আমরা প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতাম। অবশেষে আমাদের কাছে মৃত্যু আগমন করে।’ [সূরা মুদাসসির, ৭৪: ৪২-৪৭]

এ লোকগুলো যখন জাহান্নামে যাবে তখন তাদের প্রশ্ন করা হবে, তোমাদেরকে এই বেদনাদায়ক পরিণতি বরণ করতে হলো কেন? কেন তোমরা জাহান্নামের বাসিন্দা হলে? তখন তারা জবাব দেবে, আমরা সালাত আদায় করতাম না, যাকাতও দিতাম না। আমরা মিথ্যাচার করতাম, বেহুদা কথাবার্তায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতাম। তাই আজ আমরা জাহান্নামী।

দেখুন এখানে যে বিষয়গুলোর কথা আসছে সেগুলোর কিছু কিছু সেকেন্ডারি বিষয়। তবুও কিন্তু এ বিষয়গুলোর ব্যাপারে তাদেরকে বলা হচ্ছে। এই আয়াতে যে কাফিরদের কথাই বলা হচ্ছে সেটা আমরা বুঝতে পারি আয়াতের এই অংশ থেকে—

[১] মুয়ায (ؓ)-কে ইয়েমেন পাঠানোর সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে বলেছিলেন, ‘তুমি এক আহলে কিতাব জাতির কাছে যাচ্ছ। তাদের কাছে পৌঁছে তাদেরকে দাওয়াত দেবে যেন তারা এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। যদি এতে তারা তোমার আনুগত্য করে (অর্থাৎ তোমার কথা মেনে নেয়), তাহলে তাদেরকে জানাবে যে আল্লাহ তাদের জন্য দিন ও রাতে মোট পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। যদি তারা এই বিষয়েও তোমার আনুগত্য করে, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের জন্য যাকাত ফরয করেছেন যা তাদের ধনীদেব থেকে নেয়া হবে আর গরিবদের দেয়া হবে। যদি তারা এতেও তোমার আনুগত্য করে, তাহলে তাদের সম্পদের সবচাইতে উৎকৃষ্ট অংশকে (যাকাত হিসেবে) নেবে না, আর মজলুমের দু’আকে ভয় করবে। কেননা, তার ও আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা থাকে না।’-সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ১৪৯৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১৯

وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الدِّينِ

‘এবং আমরা প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতাম।’

অর্থাৎ এই আয়াতে এমন মানুষদের কথা বলা হচ্ছে, যারা আখিরাতকে অস্বীকার করত। আর যে আখিরাত অস্বীকার করবে সে অবশ্যই কাফির।

কাজেই কুরআন থেকে আমরা জানতে পারছি, এই ব্যক্তিদের এমন কিছু বিষয়ের কারণে জাহান্নামে শাস্তি দেয়া হবে যেগুলো ইসলামের সেকেন্ডারি বিষয়। বোঝা গেল এমন কিছু সেকেন্ডারি বিষয় আছে যেগুলোর ক্ষেত্রে কাফিরদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অন্যদিকে কিছু বিষয় আছে কাফিররা যেগুলোর আওতাভুক্ত না। যেমন ধরুন, ইসলামের বিস্তারিত জ্ঞান। এটা কাফিরের জন্য প্রযোজ্য না। একজন কাফির হচ্ছে যেতে বাধ্য না। আমরা কাফিরদের হত্ব করতে বলি না। আমরা কাফিরদের সালাত আদায় করতে বলি না। কারণ সালাত গৃহীত হবার চাবি হলো শাহাদাহ, তাওহিদের সাক্ষ্য, ঈমান। ঈমান আনার আগে কেউ যতই সালাত আদায় করুক না কেন, তা গ্রহণ করা হবে না। যেহেতু একজন কাফিরের ঈমান নেই, তাই এ কথা তার জন্য প্রযোজ্য না। ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য আমরা তাদের এ ব্যাপারগুলো জানাতে পারি, কিন্তু ঈমান আনার আগে আমরা তাদেরকে এই ইবাদাতগুলো করতে বলি না।

প্রথম বিষয় : তাওহিদ আর-রুবুবিয়াহ

লেখক বলছেন,

(الأُولَى) أَنَّ اللَّهَ خَلَقَنَا

(প্রথম বিষয়) আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

এ বিষয়টি নিয়ে আমরা এখন বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ।

তাওহিদ আর-রুবুবিয়াহ : কুরআন ও সুন্নাহ থেকে

আল্লাহ (ﷻ) যে আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তা নিয়ে কুরআন ও হাদীসে অনেক দলিল আছে। মানুষ তার বুদ্ধি বা চিন্তার ক্ষমতা ব্যবহার করেও এ সত্য বুঝতে পারে। এ বিষয়ে আসলে এত বেশি আয়াত আছে, সবগুলোর আলোচনা করতে গেলে মাসের পর মাস কাবার হয়ে যাবে, আলোচনা শেষ হবে না।

যেমন আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

‘নিশ্চয় আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে

বোধসম্পন্ন লোকদের জন্যে।’ [সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৯০]

তিনি বলেছেন,

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

‘অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমরা যা নির্মাণ করছ সবাইকে সৃষ্টি করেছেন।’ [সূরা সাফফাত, ৩৭: ৯৬]

তিনি বলেছেন,

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا

‘তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন কাদামাটি থেকে তারপর নির্ধারণ করেছেন একটি কাল।’ [সূরা আন’আম, ৬: ২]

লক্ষ্য করুন, এই আয়াতে ব্যবহৃত আযালা (أَجَلًا) শব্দটির মানে হলো, আল্লাহ আমাদের জন্য একটি সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি আমাদের আয়ু নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আপনার আয়ুর একটা নির্দিষ্ট অংশ বাকি আছে। আপনি হয়তো আর বিশ, পঞ্চাশ অথবা এক বছর বাঁচবেন—এটাই হলো আযালা।

তিনি বলেছেন,

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ

‘আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এরপর আকার-অবয়ব তৈরি করেছি। অতঃপর আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছি, আদমকে সিজদা করো।’ [সূরা আরাফ, ৭: ১১]

এই আয়াতে মানুষ সৃষ্টির একদম শুরুর সময়কার কথা এসেছে—বিশেষ করে আমাদের পিতা আদম আলাইহিস সালামের কথা বলা হচ্ছে। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ

‘আর অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুকনো ঠনঠনে, কালচে মাটি থেকে।’ [সূরা আল হিজর, ১৫: ২৬]

আবার আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কেও আলোচনা এসেছে। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَشِيرُونَ

‘আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমরা মানুষ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছ।’ [সূরা আর রুম, ৩০: ২]

সূরা আর রহমানে আল্লাহ (ﷻ) বলছেন,

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ

‘তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন শুষ্ক ঠনঠনে মাটি থেকে, যা পোড়া মাটির ন্যায়।’

[সূরা রহমান ৫৫:১৪]

এ রকম অসংখ্য আয়াত আছে। সূরা আয যুমায়ে আল্লাহ বলছেন, তিনি সবকিছুরই সৃষ্টিকর্তা। ইরশাদ হচ্ছে,

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

‘আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা।’ [সূরা আয যুমায়ে, ৩৯: ৬২]

সমগ্র কুরআনজুড়ে এ রকম অসংখ্য আয়াত এসেছে। আমরা আপাতত এখানেই থামছি। আল্লাহ যে আমাদের সৃষ্টিকর্তা, এ বিষয়টি কতটা স্পষ্ট তার একটা উদাহরণ দিই। মক্কার মুশরিকরা ছিল চরম অহংকারী। তাদের অহংকারের কোনো সীমা ছিল না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দাওয়াত তারা ফিরিয়ে দিয়েছিল। তাঁকে (ﷺ) নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছিল, হুমকিধমকি দিয়েছিল। এমনকি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পবিত্র দেহ মুবারকে হাত তোলার স্পর্ধাও দেখিয়েছিল। সাহাবী (رضي الله عنه)-দের ওপরও তারা অত্যাচার-নির্যাতন করেছিল অনেক। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং সাহাবী (رضي الله عنه)-দের কষ্ট দেবার সুযোগ পাওয়ামাত্র তারা সেটা লুফে নিত।

কিন্তু এই চরম উদ্ধত, চরম অহংকারী, নিকৃষ্ট মুশরিকরাও বিশ্বাস করত, আল্লাহ সবকিছুর একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। আল্লাহ কুরআনের পাঁচটি স্থানে এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ

‘আর আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, ‘কে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে অনুগত করেছেন?’ তবে তারা অবশ্যই বলবে, ‘আল্লাহ’। তাহলে তারা কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে?’ [সূরা আনকাবুত, ২৯: ৬১]

সূরা লুকমানে তিনি বলেছেন,

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

‘আর আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘কে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন?’ তারা অবশ্যই বলবে, ‘আল্লাহ’। বলো, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর;

কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।’ [সূরা লুকমান, ৩১: ২৫]

সূরা যুমায়ে বলেছেন,

وَلَيْنُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ

‘আর আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘কে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন?’ তারা অবশ্যই বলবে, ‘আল্লাহ’।’ [সূরা আয যুমায়ে, ৩৯: ৩৮]

সূরা যুখরুফে বলেছেন,

وَلَيْنُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ

‘আর আপনি যদি জিজ্ঞাসা করেন, ‘আসমানসমূহ ও যমীন কে সৃষ্টি করেছেন?’ তারা অবশ্যই বলবে, ‘মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞই কেবল এগুলো সৃষ্টি করেছেন’।’ [সূরা আয যুখরুফ, ৪৩: ৯]

وَلَيْنُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ

‘আর আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে?’ তারা অবশ্যই বলবে, ‘আল্লাহ’। তবু তারা কীভাবে বিমুখ হয়?’ [সূরা আয যুখরুফ, ৪৩: ৮৭]

অর্থাৎ মক্কার মুশরিকদেরকে যখন সৃষ্টিকর্তার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হতো, তখন তারা জবাব দিত—আল্লাহই হলেন সৃষ্টিকর্তা। শুধু তাই না, সূরা যুখরুফের একটি আয়াতে আমরা দেখছি, তারা আল্লাহর গুণবাচক কিছু নামের ওপরও ঈমান এনেছিল। কারণ তারা বলেছে,

وَلَيْنُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ

‘আর আপনি যদি জিজ্ঞাসা করেন, ‘আসমানসমূহ ও যমীন কে সৃষ্টি করেছেন?’ তারা অবশ্যই বলবে, ‘মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞই কেবল এগুলো সৃষ্টি করেছেন’।’ [সূরা আয যুখরুফ, ৪৩: ৯]

তারা আল্লাহকে এখানে সম্বোধন করেছে, আল আযীয ও আল আলীম নামে। আল আযীয অর্থ মহাপরাক্রমশালী এবং আল আলীম অর্থ সর্বজ্ঞ। তার মানে এই মুশরিকদেরও এক অর্থে আসমা ওয়াস সিফাতের ওপরও কিছুটা বিশ্বাস ছিল।

সাধারণত আল্লাহর গুণবাচক নামসম্পন্ন এই আয়াতগুলো ঈমানকে জোরদার করে। আল্লাহর কালাম মানুষের মনে মুহূর্তের মধ্যে কী আলোড়ন তুলতে পারে, তা নিয়ে অত্যন্ত চমৎকার একটি ঘটনার বর্ণনা এসেছে সহীহ বুখারীতে।

যুবাইর ইবনু মুত'ইম (رضي الله عنه) বদরের যুদ্ধে বন্দী হয়েছিলেন। তিনি তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি। মাগরিবের সালাতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। মুঞ্চ হয়ে তা শুনছিলেন যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে থাকা যুবাইর (رضي الله عنه)। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সূরা আত তুর থেকে তিলাওয়াত করছিলেন। একসময় তিনি (ﷺ) এই আয়াতে পৌঁছুলেন,

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿٣٥﴾ أَمْ خُلِقُوا مِنَ الْأَرْضِ وَالْأَرْضُ مِنْ لَدُنْهُمْ أَمْ يُوْقِنُونَ ﴿٣٦﴾ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصْطَبِرُونَ ﴿٣٧﴾

‘তারা কি স্রষ্টা ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে, না তারাই স্রষ্টা? তারা কি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছে? বরং তারা (সত্যকে) দৃঢ় বিশ্বাস করে না। আপনার রবের গুপ্তভান্ডার কি তাদের কাছে আছে, না তারা সবকিছু নিয়ন্ত্রণকারী?’ [সূরা তুর, ৫২: ৩৫-৩৭]

যুবাইর ইবনু মুত'ইম (رضي الله عنه) বলেন, ‘এই আয়াত শোনামাত্র আমার অন্তর গলে গেল, আমার অন্তরে তখন প্রথমবারের মতো ঈমান বাসা বাঁধল।’^[২]

সুবহান আল্লাহ! আল্লাহর কালামের কী অসাধারণ শক্তি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসে বন্দী হয়েছে, এমন চরম অবিশ্বাসী লোকের অন্তরে ঈমান বসে গেল শুধু একটি আয়াত শুনে। ঘোরতর শত্রু মুহূর্তের মধ্যে শত্রুতা ভুলে পরিণত হলেন একনিষ্ঠ সাহাবীতে।

এখানে আমরা আরেকটি হাদীসের দিকে তাকাতে পারি। এ ঘটনাটি বর্ণনা করছেন আনাস ইবনু মালিক (رضي الله عنه)।

একটা সময় ছিল যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে প্রশ্ন করার ব্যাপারে সাহাবী (رضي الله عنه)-দের নিষেধ বা নিরুৎসাহিত করা হয়েছিল। উপযুক্ত কারণ বা প্রয়োজন ছাড়া প্রশ্ন করা হলে, এমন অনেক বিষয় হারাম হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল; প্রশ্ন না করলে যেটা জায়েজ থাকত। এ কারণে সাহাবীরা পারতপক্ষে প্রশ্ন করতেন না।

এমন অবস্থায় মদীনার বাইরে থেকে এক বেদুইন এসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে প্রশ্ন করতে শুরু করল। সাধারণত বেদুইনরা হতো নীরস কাঠখোঁটা স্বভাবের। তারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে গিয়ে, আগপিছ না ভেবে সরাসরি প্রশ্ন করা শুরু করত। সাহাবীরা (رضي الله عنه) এতে খুশিই হতেন। কারণ, বেদুইন এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রশ্নোত্তর থেকে তাঁরা (رضي الله عنه) নতুন নতুন বিষয় শিখতে পারতেন।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে নবী হিসেবে গ্রহণ করবে কি না, তাঁর (ﷺ) ওপর ঈমান আনবে কি না, এই বেদুইন তা যাচাই করতে চাচ্ছিল। তার কথাবার্তার ধরন খেয়াল করুন।
বেদুইন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এসে বলল,

‘আপনি আমাদের এলাকায় একজন লোক পাঠিয়েছেন, সে বলছে আপনি নাকি দাবি করেন, আল্লাহ আপনাকে নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন?’

রাসূলুল্লাহ (ﷺ): ‘হ্যাঁ, সে সত্য বলেছে।’

বেদুইন: ‘তাহলে বলুন, আসমান কে সৃষ্টি করেছে?’

রাসূলুল্লাহ: ‘আল্লাহ’।

বেদুইন: ‘যমীন কে সৃষ্টি করেছে?’

রাসূলুল্লাহ (ﷺ): ‘আল্লাহ’।

বেদুইন: ‘পাহাড়-পর্বত এবং এগুলোর নিচে যা আছে সেগুলো কে সৃষ্টি করেছে?’

রাসূল (ﷺ): ‘আল্লাহ’।

বেদুইন এবার উপসংহারে এল। সে বলল,

قَالَ فَبِأَلَيْسَ خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الْأَرْضَ وَنَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ اللَّهُ أَرْسَلَكَ

তাঁর শপথ! যিনি আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং তা সমুন্নত করেছেন। যিনি যমীন সৃষ্টি করেছেন, যিনি পাহাড়-পর্বত আর এর ভেতরের সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন—বলুন আপনাকে কি আল্লাহ পাঠিয়েছেন?’

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উত্তর দিলেন, ‘হ্যাঁ।’^[৩]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং বেদুইনের কথোপকথনটা একটু খুঁটিয়ে দেখুন।

এ বেদুইন উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না। কথোপকথনের শুরুতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে সম্বোধন করেছিলেন সরাসরি ‘মুহাম্মাদ’ বলে। আল্লাহর একজন রাসূলের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয় সে জ্ঞানটুকু তার ছিল না। কিন্তু তিনি জানতেন যে, এই আসমান-যমীন, পাহাড়-পর্বতের সৃষ্টিকর্তা হলেন আল্লাহ (ﷻ)।

তিনি এটা কীভাবে জানতেন? নিজের ফিতরাহ থেকেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এসব সৃষ্টির একজন স্রষ্টা আছেন।

[৩] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১০। এই বেদুইন ছিলেন বনু সা'দ বিন বকর গোত্রের যিমাম ইবনু সালাবাহ (ؓ)।

তাওহিদ আর-রুবুবিয়াহর বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ

এবার তাকানো যাক কিছু বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণের দিকে।

ইমাম আহমাদ

ইমাম আহমাদ^[৪] (رحمہ اللہ)-কে আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলো। তিনি বললেন,

ডিমের কথা চিন্তা করো। ডিম আকারে ছোটখাটো, কিন্তু শক্তিশালী দুর্গের মতো। দরজা নেই, জানালা নেই, ভেতরে ঢোকানো কোনো পথ নেই। এমনকি বাতাস চলাচলেরও কোনো রাস্তা নেই। বাইরের দিকে ডিমের খোসা চকচকে রূপার মতো। আর ভেতরের কুসুম জ্বলজ্বলে স্বর্ণের মতো। একদিন হঠাৎ করে এই ডিম ফেটে যায়। তারপর এই আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে আসে অপূর্ব এক সৃষ্টি। যে শুনতে পায়, দেখতে পায়। এই সৃষ্টি তখন মিষ্টি সুরে গান গাইতে গাইতে যমীনের বুকে হেঁটে বেড়ায়। এ সবকিছু ঘটে এক আবদ্ধ ডিমের খোলসের ভেতর থেকে।

আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ কি এমন কিছু সৃষ্টি করতে পারে?

আল্লাহ কুরআনে প্রশ্ন করছেন,

أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ

‘আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্য আছে কি?’ [সূরা আন নামল, ২৭: ৬০]

ইমাম শাফে'ঈ

আল্লাহর অস্তিত্ব বোঝানোর জন্য ইমাম শাফে'ঈ^[৫] (رحمہ اللہ) কী উদাহরণ দিয়েছেন

[৪] ইমাম আহমাদ (رحمہ اللہ) : ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল আশ শাইবানী ছিলেন ফকীহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, যাহিদ, আবিদ, রিজাল শাস্ত্রবিদ, হাফিযুল হাদীস এবং আকীদাহর ইমাম। তিনি মুসলিম উম্মাহর ৪ জন প্রসিদ্ধ ইমামের অন্যতম এবং হাম্বলী মায়হাবের প্রবর্তক। মু'তায়িলী ফিতনার বিরুদ্ধে তাঁর অবিচল অবস্থানের সূত্রে তিনি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ এর ইমাম হিসেবে প্রসিদ্ধ। তাঁর জন্ম ১৬৪ হিজরি সনের রবিউল আওয়াল মাসে। জন্মস্থান নিয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে বিতর্ক আছে। হয় তাঁর জন্ম তাঁর পিতার কর্মস্থল তুর্কমেনিস্তানের মার্ড শহরে, অথবা তাঁর মা সেখান থেকে গর্ভবতী অবস্থায় বাগদাদ আসার পর তাঁর জন্ম হয়। প্রাথমিক শিক্ষা বাগদাদে অর্জন করার পর ইলম অর্জনের জন্য ইসলামী দুনিয়ার বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে সফর করেন। তাঁর যুগেই মু'তায়িলীরা রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যে দাবি করে, কুরআন আল্লাহর সৃষ্ট বস্তু। তিনি এর বিপক্ষে দৃঢ়ভাবে অবস্থান নেন। ফলে খলীফা মা'মুন, মু'তাসিম ও ওয়াসিক তাঁর ওপর অকথ্য অত্যাচার ও নির্যাতন চালায়। অতঃপর ২৩২ হিজরিতে মুতাওয়াক্কিল খলীফা হবার পর এই অত্যাচারের অবসান ঘটে। তিনি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকীদাহর প্রচার করেন। ২৪১ হিজরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

[৫] ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইদ্রিস আশ শাফে'ঈ (رحمہ اللہ), মুসলিম উম্মাহর প্রখ্যাত ইমাম,

দেখুন।

তিনি উদাহরণ দিয়েছিলেন তুঁত গাছের পাতার। গজলা হরিণ, সাধারণ হরিণ, ভেড়া, মৌমাছি—অনেক ধরনের প্রাণী এই পাতা খায়। কিন্তু এই প্রাণীগুলোর কাছ থেকে আপনি ভিন্ন ভিন্ন জিনিস পাবেন। গজলা হরিণের কথা ধরুন। তার কাছ থেকে আপনি পাচ্ছেন মেশক^৬। খাঁটি মেশক আসে পূর্ণবয়স্ক গজলা হরিণের পেট থেকে। আমার যতদূর মনে পড়ে এই মেশক থাকে গজলা হরিণের জননেন্দ্রিয় এবং নাভির মাঝ বরাবর একটা জায়গায়। আজকে আমরা অনেক দাম দিয়ে যে মেশক কিনি সেগুলো আসল মেশক না। খাঁটি মেশক পাওয়া যায় গজলা হরিণ থেকে। আবার দেখুন, রেশমপোকাও এই একই গাছের পাতা খায়। কিন্তু সে আপনাকে দেয় রেশম। ওদিকে মৌমাছিও একই পাতা খায়; কিন্তু তার কাছ থেকে আপনি পাচ্ছেন মধু। ভেড়া আর গরুও এ পাতা খাচ্ছে, কিন্তু তাদের কাছ থেকে আপনি পাচ্ছেন দুধ।

সবগুলো প্রাণী একই গাছের পাতা খাচ্ছে। কিন্তু কেউ দিচ্ছে মধু, কেউ দুধ এবং মাংস, কেউ দিচ্ছে সিল্ক, কেউ দিচ্ছে মেশক।

যদি কোনো সৃষ্টিকর্তা না থাকতেন, যদি এর পেছনে একজন কারিগর না থাকতেন, যদি সবকিছু র‍্যানডমলি ঘটত, তাহলে একই গাছের পাতার নির্যাস থেকে একই জিনিস বের হতো। সবগুলো প্রাণীই একই রকম জিনিস উৎপন্ন করত। তুঁত গাছের পাতা খেয়ে রেশমপোকা রেশম আর মৌমাছি মধু উৎপন্ন করত না। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْشَأَ كُلَّ شَيْءٍ

‘এটি আল্লাহর কারিগরি, যিনি সবকিছুকে করেছেন সুসংহত।’ [সূরা নামল, ২৭: ৮৮]

শাফে'ঈ মাযহাবের প্রবর্তক, আইন শাস্ত্রবিদ, হাদীস বিশারদ, উসুলুল ফিকহ বা ইসলামী আইন বিজ্ঞানের মূলনীতির প্রবর্তক ও কবি। তাঁর প্রখ্যাত কিতাব হচ্ছে আর রিসালাহ, আল উন্ম, আল মুসনাদ প্রভৃতি। জন্ম ১৫০ হিজরিতে ফিলিস্তিনের গাজায়, মৃত্যু ২০৪ হিজরিতে মিসরের ফুসতাতো। [৬] মেশক : মেশক বা কস্তুরী মূলত পুরুষ হরিণের পেটে অবস্থিত গ্রন্থিঃসূত সুগন্ধীর নাম। মিলন ঋতুতে পুরুষ হরিণের পেটের কাছের কস্তুরী গ্রন্থি থেকে সুগন্ধ বের হয়, যা মেয়ে হরিণকে আকৃষ্ট করে। ঋতুর শেষে তা হরিণের দেহ থেকে খসে পড়ে যায়। সেটা সংগ্রহ করে রোদে শুকিয়ে কস্তুরী তৈরি করা হয়। এ ছাড়া শিকারিরা এ সময় হরিণ শিকার করেও কস্তুরী সংগ্রহ করে। তবে সকল হরিণে কস্তুরী থাকে না, কস্তুরী থাকে যে হরিণে এদের বলে কস্তুরী মৃগ। এটা দিয়ে প্রাণিজ পরিবার বা Family: Moschidae এর অন্তর্ভুক্ত জেনাস: Moschus এর অন্তর্ভুক্ত ৭টি প্রজাতিকে বোঝায়। এই ৭টি প্রজাতির হরিণ থেকেই কস্তুরী পাওয়া যায়। কস্তুরীকে বাজারজাত করতে এর সাথে আরও বেশ কিছু উপাদান যুক্ত করা হয়।

ইমাম আবু হানিফা

আল-আকীদাহ আত-ত্বাহুইয়াতে ইমাম আবু হানিফা^[৭] (ؒ)-এর একটি কাহিনি এসেছে। আমরা এটি পড়েছিলাম শাইখ সাফর আল-হাওয়ালির কাছে। আমার মনে আছে, পড়ানোর সময় তিনি এই ঘটনার বিশুদ্ধতা নিয়ে কিছুটা সন্দেহান ছিলেন। কারণ এ বর্ণনা অনুযায়ী, একদল লোক ইমাম আবু হানিফা (ؒ)-কে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়ার চ্যালেঞ্জ করেছিল। শাইখ সাফর আল হাওয়ালির সন্দেহটা এখানেই! খিলাফাহর ভূমিতে কীভাবে একদল লোক আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে চ্যালেঞ্জ করার দুঃসাহস দেখায়!

তবে এ ব্যাপারে আরও বিশদভাবে পড়ার পর আমার মনে হয়েছে, এই লোকগুলো সম্ভবত ক্বাদরিয়াহ ছিল। ক্বাদরিয়াহরা হলো একটা বাতিল ফিরকা। তারা তাক্বদীরের সঠিক আকীদাহ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। ইমাম আবু হানিফাকে যারা প্রশ্ন করেছিল তারা সম্ভবত ক্বাদরিয়াহ ছিল।^[৮]

আরেকটা সম্ভাবনা হলো, এরা হয়তো মুতাফালসিফ বা দার্শনিক ফিরকার ছিল। সেই সময়ে এই ফিরকার বেশ দৌরাত্ম্য ছিল। নিজেদের সীমিত জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে এরা কুরআন-সুন্নাহকে মাপতে চাইত।

কাজেই যারা ইমাম আবু হানিফাকে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণের ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিল তারা ক্বাদরিয়াহ বা মুতাফালসিফ হয়ে থাকতে পারে। কারণ এ বিষয়ে এই

[৭] ইমাম আবু হানিফা (ؒ) : ইমাম আবু হানিফা নু'মান বিন সাবিত ছিলেন তাবিঈ, ফক্বীহ, মুহাদ্দিস, হাফিয়ুল হাদীস, আবিদ, যাহিদ ও উম্মতের মহান ইমাম। ইসলামের প্রসিদ্ধ ৪ ইমামের একজন এবং হানাফী মাযহাবের প্রবর্তক। তাঁর জন্ম ৮০ হিজরিতে ইরাকের কুফা শহরে। কুফাতেই প্রাথমিক ইলম অর্জন করেন। অতঃপর কুফার তৎকালীন প্রধানতম আলিম ইমাম হাম্মাদ বিন আবি সুলাইমান (ؒ)-এর সুদীর্ঘ সাহচর্য লাভ করেন। তিনি আনাস বিন মালিক (ؒ)-এর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন বিধায় তাঁকে তাবিঈদের মাঝে গণ্য করা হয়। তিনি ১৫০ হিজরিতে মারা যান। ইমাম আবু হানিফার ফিকহ সংকলন তাঁর ছাত্র ইমাম মুহাম্মাদ ও আবু ইউসুফ (ؒ)-এর কিতাবাদিতে সংরক্ষিত রয়েছে। এ ছাড়া তাঁর বর্ণিত হাদীস গ্রন্থও ছাত্রদের কিতাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যেমন : ইমাম মুহাম্মাদের মুওয়াত্তা, ইমাম আবু ইউসুফের আল আসার প্রভৃতি।

[৮] ক্বাদরিয়াহরা একটা গোমরাহ ফিরকা। এরা বিশ্বাস করে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকে তৈরি করার পর সৃষ্টি নিজের মতোই চলে। অর্থাৎ মানুষ তার নিজ ভাগ্যের স্রষ্টা। তাদের মতে, আল্লাহ তা'আলা আগে থেকে জানেন না যে বান্দা কী করতে যাচ্ছে বা ভবিষ্যতে কী করবে। বান্দা কিছু করে ফেলার পরই কেবল আল্লাহ তা'আলা জানতে পারে। আধুনিক কালে যারা তাক্বদীর অস্বীকার করে তাদের সাথে এদের মিল রয়েছে। এদের প্রথম উদ্ভব ঘটে উমাইয়া খলীফা উমার ইবনু আব্দিল আযিয (ؒ)-এর শাসনামলে। প্রথম ক্বাদরিয়াহ নেতা ছিল গাইলান আদ দিমাশকী (মৃত্যু: ১০৬ হি.)। তাকে খলীফা হিশাম বিন আব্দিল মালিক দামেস্কের গেটে শূলবিদ্ধ করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন। এদের বারোটোর মতো উপদল রয়েছে।

দুই ফিরকার মধ্যে কিছু সাদৃশ্য ছিল।

ইমাম আবু হানিফা (ؒ)-এর ঘটনাটি শুনুন।

ইমাম আবু হানিফার কাছে এক লোক এল। দজলা নদী পাড়ি দিয়ে। লোকটি ছিল আহলুস সুন্নাহর একজন। সে অভিযোগ করে বলল, নদীর ওপারে একদল লোক আপনার সাথে আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে বিতর্ক করতে চায়। তারা আপনাকে চ্যালেঞ্জ করেছে।

ইমাম আবু হানিফা বললেন, ‘ঠিক আছে। তাদেরকে জানাও, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে নদী পাড় হয়ে আমি তাদের কাছে পৌঁছে যাব।’

লোকটি খুশিমনে ফিরে গেল। সবাইকে জানিয়ে দিলো, আবু হানিফা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন। তিনি রওনাও দিয়েছেন। শীঘ্রই এসে পৌঁছবেন। জনতা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু অনেক সময় পার হবার পরও ইমাম আবু হানিফা আসলেন না।

বেলা বাড়তে বাড়তে দুপুর হয়ে গেল। তারপর দুপুর গড়িয়ে বিকেল, বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা। ইমাম আবু হানিফার দেখা নেই। রাতের প্রথম প্রহরও পার হয়ে গেল। তবু ইমামের দেখা নেই। বিরুদ্ধপক্ষের লোকজন এবার হাসিঠাট্টা করতে শুরু করল। মুসলিমরা পড়ে গেল দুশ্চিন্তায়। তাঁরা খুব ভালো করেই জানেন আবু হানিফা এক কথার মানুষ! কথা দিলে যেকোনো মূল্যে তিনি সেই কথা রাখেন। নিশ্চয় তিনি কোনো কঠিন বিপদে পড়েছেন। যে কারণে তিনি এখনো আসছেন না।

শেষ পর্যন্ত ইমাম আবু হানিফা যখন এসে পৌঁছালেন তখন পার হয়ে গেছে মধ্যরাত। সবাই প্রশ্ন করা শুরু করল।

কী হয়েছিল আপনার? আপনি কেন দেরি করলেন? কোনো সমস্যা হয়েছিল কী?

এবার ইমাম আবু হানিফা কথা শুরু করলেন। তিনি বললেন,

‘আচ্ছা... আমি যদি বলি, এখানে আসার সময় নদীর তীরে এসে আমি কোনো মাঝি বা নৌকা পেলাম না। তখন আমি দেখলাম গাছ থেকে কিছু ডাল আপনা-আপনি বের হয়ে এল। তারপর নিজে থেকে নিখুঁতভাবে তক্তাতে পরিণত হলো। তারপর পানির নিচ থেকে বের হয়ে এল পেরেক। পেরেকগুলো নিজে নিজে তক্তাতে গেঁথে গেল। তারপর তক্তাগুলো নিজে নিজে জুড়ে গিয়ে একটা নৌকার আকৃতি নিল। নৌকার ছিদ্রগুলো বন্ধ হয়ে গেল নিজে নিজেই। তারপর নৌকাটা নিজে নিজেই পানিতে ভেসে পড়ল। তারপর আবার এপারে এসে নৌকা সুন্দরমতো ঘাটে ভিড়ল।

আমি যদি এমন বলি, তোমরা বিশ্বাস করবে?’

বিতর্কের জন্য যারা চ্যালেঞ্জ করেছিল, এ কথা শুনে তারা হাসতে শুরু করল।

আরে! এমন হওয়া তো অসম্ভব! কারিগর ছাড়াই এভাবে নিজে নিজে নৌকা তৈরি হয় নাকি? অসম্ভব। এই লোক পাগল নাকি? ইনি নাকি সবচেয়ে বড় আলিম! তার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

ইমাম আবু হানিফা (ؒ) এবার বললেন,

‘কোনো কারিগর ছাড়া সামান্য একটা নৌকা তৈরি হতে পারে, এটাই তোমরা বিশ্বাস করতে পারছ না! তাহলে তোমরা কীভাবে বিশ্বাস করো যে এই বিশাল মহাবিশ্ব, চাঁদ, সূর্য, নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র, এইসব কোনো স্রষ্টা ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে? কারিগর ছাড়া নৌকা সৃষ্টি হয়েছে, এটা তোমাদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়। তাহলে স্রষ্টা ছাড়া এই বিশাল মহাবিশ্ব তৈরি হয়েছে—এটা কীভাবে তোমরা বিশ্বাস করো?’

আসলেই তো। আপনারা নিজেরাই চিন্তা করে দেখুন। ঘরবাড়ি, দালানকোঠা, রাস্তাঘাট, কোনো কিছু কি শূন্য থেকে আপনা-আপনি তৈরি হতে পারে? এমন কথা বললে লোকে আপনাকে পাগল বলবে। মানুষ তাহলে কীভাবে বলে, এই মহাবিশ্ব শূন্য থেকে আপনা-আপনি তৈরি হয়েছে?

তাওহিদ আর-রুবুবিয়াহ সম্পর্কে জানার গুরুত্ব

দ্বিধাদ্বন্দ্ব, সংশয় প্রতিরোধ করার জন্য তাওহিদ আর-রুবুবিয়াহর জ্ঞান জরুরি। শয়তান যখন আপনাকে ওয়াসওয়াসা দেবে, যখন সে অন্তরে সংশয় তৈরি করার চেষ্টা করবে, তখন তাওহিদ আর-রুবুবিয়াহর জ্ঞান দিয়ে আপনি তাকে কাবু করবেন। যখন মনে দূশ্চিন্তা আসবে, যখন বালা-মুসিবত বেড়ে যাবে, সব ভুলে একাগ্রচিত্তে আল্লাহকে ডাকবেন। তাঁর বড়ত্বের কথা ভাববেন। তিনিই আঁধার দূর করে দেবেন।

কয়েক সপ্তাহ আগের এক ঘটনা বলি। একটা কাজে আমি গিয়েছিলাম অন্য এক শহরে। সেখানে এক ভাই আমাদের একটা ট্রিপে নিয়ে গেলেন। জাহাজে চেপে শহর দেখার ট্রিপ। চমৎকার একটা জাহাজে উঠলাম। সেদিন খুব ঠান্ডা পড়েছিল। আর আমাদের একটু দেরিও হয়ে গিয়েছিল। আমরা ছাড়া আর কেউ সেখানে তখন ছিল না। ট্রিপটা ছিল এক ঘণ্টার মতো। জাহাজটা শহরের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল আর সাথে থাকা গাইড বিভিন্ন স্থাপত্যকর্ম আর দালানকোঠার খুঁটিনাটি বিভিন্ন তথ্য জানাচ্ছিল আমাদের। শহরের একেক বিল্ডিং একেক স্টাইলে, একেক ধাঁচে বানানো। প্রত্যেকটির নানান বিশেষত্ব।

এভাবে ঘুরতে ঘুরতে আমরা একটা ছোট গাছ দেখতে পেলাম। গাইড সবাইকে গাছটার দিকে মনোযোগ দিতে অনুরোধ করল। বলল, ‘১৩ বছর ধরে আমি গাইডের

কাজ করছি। এতসব বিল্ডিংয়ের জটিল সব নকশা আমার কাছে পরিষ্কার। কিন্তু কীভাবে নিরেট সিমেন্টের ওপরে এই গাছ জন্মাল, আজও আমি সেটা বুঝতে পারিনি। ১৩ বছর ধরে আমি এই রহস্যের জট খোলার চেষ্টা করছি। কিন্তু পারছি না।’

সুবহান আল্লাহ! এই হলো আল্লাহর সৃষ্টির মহিমা। আল্লাহর সৃষ্টির বিস্ময়ে এ কথাগুলো তার মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছে।

এ জন্যই আমরা আকীদাহ শিখি। অন্তরকে সজীব করতে, ঈমানকে মজবুত করতে আকীদাহ নিয়ে ব্যাপক পড়াশোনা করা উচিত। আকীদাহর জ্ঞান আপনার ঈমানকে চাঙা করবে। অন্তরের সংশয়, দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর করবে। আর যখন এগুলো থেকে আপনি নিজেকে মুক্ত করতে পারবেন, তখন ঈমানের এক নতুন স্তরে পৌঁছাবেন। যখন আপনি সব সংশয়ের প্রতিরোধ করবেন এবং অন্তরে তাওহিদ ধারণ করবেন, তখন আপনার তাওহিদ পৌঁছাবে ঈমানের স্তরে। আর এই স্তর পার হতে পারলে আপনি পৌঁছাবেন ‘ইহসানের’ স্তরে। এমন অবস্থায় যখন আপনি দু’আ করবেন, যখন আপনি সত্যই বিশ্বাস করবেন যে আপনি নিজের রবের সাথে কথা বলছেন, তখন আপনার দু’আতে প্রাণ থাকবে। আপনি তখন নিশ্চিতভাবে জানবেন, মরুভূমির বৃকে কিংবা সিমেন্টের ওপরে যে আল্লাহ গাছ জন্মাতে পারেন, সেই আল্লাহ আপনাকে যেকোনো কিছু দিতেও পারেন। আমাদের কাছে যা অসম্ভব, সেটা তাঁর জন্যে কিছুই না।

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ
مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَلَمْ يَكُنْ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ٦٠ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ
قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رُؤُوسَی وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَلَمْ يَكُنْ مَعَ اللَّهِ بَلْ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٦١ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ
الْأَرْضِ أَلَمْ يَكُنْ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا ٦٢ مَا تَذَكَّرُونَ ٦٢

‘তিনিই কি শ্রেষ্ঠ নন, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন? অতঃপর আমি তার সাহায্যে সুন্দর সুন্দর বাগান উৎপন্ন করেছি। তোমরা তার (বাগানের) গাছপালা উৎপন্ন করতে পারতে না। আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্য আছে কি? বরং তারা তো এমন এক জনগোষ্ঠী যারা আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করায়।

তিনিই কি শ্রেষ্ঠ নন—যিনি পৃথিবীকে একটি বাসস্থান বানিয়েছেন, তার মাঝে নদ-নদী তৈরি করেছেন, তাতে সুদৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছেন এবং (লোনা ও মিঠা পানির) দুই সমুদ্রের মাঝে অন্তরায় রেখেছেন? আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্য আছে কি? বরং তাদের অধিকাংশই (সত্য) জানে না।

তিনিই কি শ্রেষ্ঠ নন—যিনি আতের ডাকে সাড়া দেন, বিপদ দূর করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করেন? আল্লাহর সাথে আর কোনো উপাস্য আছে কি? বরং তোমরা অল্লই উপদেশ গ্রহণ করো।’ [সূরা নামল, ২৭: ৬০-৬২]

এক বেদুইনকে একবার জিজ্ঞাসা করা হলো, ‘আল্লাহ যে আছেন এটা তুমি কীভাবে জানলে?’

বিশুদ্ধ ফিতরাতে অধিকারী সরলমনা সেই বেদুইন উত্তরে বলল,

‘এই যে দেখো উটের বিষ্ঠা আর ওই যে গাধার বিষ্ঠা। এগুলো থেকেই প্রমাণিত হয়, এখানে উট আর গাধা ছিল। আর বালিতে থাকা পায়ের ছাপ দেখে বোঝা যায়, এখানে একজন পথিক ছিল। তাহলে এত নক্ষত্র ভরা আকাশ আর এই বিশাল সমুদ্র কি প্রমাণ করে না যে, একজন সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা আছেন?’

আলহামদুলিল্লাহ, এই আলোচনার মাধ্যমে আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম দারস শেষ করলাম।

গত দারসে আমরা উসুল আস-সালাসার দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু করেছিলাম। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরুতে বলা হয়েছে,

(اعْلَمُ) رَحِمَكَ اللهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ تَعْلُمُ هَذِهِ الثَّلَاثِ مَسَائِلَ وَالْعَمَلُ بِهِنَّ
জেনে রাখুন, আল্লাহ আপনার ওপর রহমত বর্ষণ করুন। নারী ও পুরুষ, প্রত্যেক মুসলিমের একান্ত দায়িত্ব এবং কর্তব্য হলো এই তিনটি বিষয় সম্পর্কে জানা এবং সে অনুযায়ী আমল করা।

তারপর লেখক (ﷺ) বলেছেন,

(الْأُولَى) أَنَّ اللَّهَ خَلَقَنَا وَزَرَعَنَا

‘(প্রথম বিষয়) আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং রিয়ক দান করেছেন।’

গত দারসে আমরা তাওহিদ আর-রুবুবিয়াহ তথা সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহর কথা আলোচনা করেছিলাম। আজ আমাদের আলোচনা হবে রিয়ক নিয়ে।

আল্লাহ আমাদের রিয়কদাতা

রিয়ক! জীবনভর এই বিষয়টি নিয়েই বোধহয় সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তা করে মানুষ। রিয়কের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা অনেক সময় তাওহিদ এবং আকীদাহয় ঢ্রুটি তৈরি করার পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

কুরআন এবং সুন্নাহয় বারবার রিয়কের আলোচনা এসেছে। মানুষকে আশ্বস্ত করার জন্য। প্রশান্তি দেয়ার জন্য। সাহস জোগানোর জন্য। তবে কুরআন-হাদীসে বারবার রিয়কের আলোচনা আসার প্রধান উদ্দেশ্য মানুষের তাওহিদকে পূর্ণতা দেয়া। আল্লাহ যেমন তাঁর রুবুবিয়াহতে সার্বভৌম-রব হিসেবে, মালিক হিসেবে এক ও অদ্বিতীয়-তেমনিভাবে রিয়ক দেয়ার ক্ষেত্রেও তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনিই সার্বভৌম। আল্লাহ

যেমন সমগ্র বিশ্বজগতের একমাত্র রব, ঠিক তেমনি তিনি একমাত্র রিয়কদাতা। রিয়ক প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। বরং বিশ্বের সবকিছুই তাঁর মুখাপেক্ষী। গত সপ্তাহে আমরা এমন ৫টি আয়াতের আলোচনা করেছিলাম, যেখানে আল্লাহ বলেছেন:

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ

যদি আপনি তাদের জিজ্ঞেস করেন...

রুবুবিয়াহর ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে চরম উদ্ধত কুরাইশরাও স্বীকার করত, রব হলেন আল্লাহ। রিয়কের ক্ষেত্রেও এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে।

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَيُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ

‘তুমি জিজ্ঞেস করো, কে রিয়ক দান করে তোমাদেরকে আসমান থেকে ও যমীন থেকে, কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? তা ছাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করেন এবং কেই-বা মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন? কে করেন কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপনা? তখন তারা বলে উঠবে, আল্লাহ! তখন তুমি বলো, তারপরেও তোমরা ভয় করছ না?’ [সূরা ইউনুস, ১০: ৩১]

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

‘বলো, আসমান ও যমীন হতে কে তোমাদেরকে রিয়ক দান করেন? বলো, আল্লাহ। হয় আমরা, না হয় তোমরা অবশ্যই সৎপথে পরিচালিত অথবা স্পষ্ট গুমরাহিতে পতিত।’ [সূরা সা’বা, ৩৪: ২৪]

এ দুটি আয়াতের সাথে আগের পাঁচটি আয়াতের মিল আছে। আল্লাহ এখানে নবী (ﷺ)-কে কুরাইশদের রিয়কের ব্যাপারে প্রশ্ন করতে বলছেন—কে রিয়ক দান করেন? রিয়কের মালিক কে? চরম উদ্ধত মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও কুরাইশের লোকেরা স্বীকার করে নিয়েছিল, আল্লাহ তাদের রিয়ক দেন।

আর-রাযিক এবং আর-রাযযাকের মধ্যে পার্থক্য

আল্লাহর পবিত্র নামগুলো কত অর্থবহ, কতটা নিখুঁত তা আমাদের পক্ষে পরিপূর্ণভাবে বোঝা সম্ভব না। আর-রাযযাক এবং আর-রাযিক, দুটোই আল্লাহর গুণবাচক নাম। দুটোই যুক্ত রিয়ক দানের সাথে। দুটো নাম থেকেই আমরা বুঝতে পারছি, তিনিই

একমাত্র রিয়কদাতা। তাহলে কেন একই বিষয়ে দুটো নাম? আর-রাযিক (الرازق) আর আর-রাযযাক (الرازق) এর মধ্যে পার্থক্য কী?

আর রাযিক দ্বারা বোঝানো হয় সমগ্র সৃষ্টির জন্য রিয়ক নির্ধারণের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ সব সৃষ্টির জন্য তাঁর চিরন্তন ও পরিপূর্ণ জ্ঞানে রিয়ক নির্ধারণ করেছেন। তিনি আমাদের রিয়ক ঠিক করে দিয়েছেন আমাদের জন্মের আগেই। আসমান-যমীন সৃষ্টি হবার পঞ্চাশ হাজার বছর আগে তিনি কলমকে নির্দেশ দিয়েছেন সবার রিয়ক লেখার। আর এর আগেও আপনার-আমার রিয়ক কী হবে তা আল্লাহর পরিপূর্ণ ও চিরন্তন ইলমে জ্ঞাত ছিল। এটাই হলো ‘আর-রাযিক’ এর অর্থ। অর্থাৎ রিয়ক নির্ধারণ করা।

‘নির্ধারণ করা’ আর ‘দান করা’ কিন্তু এক না। এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে। আর-রাযিক দ্বারা নির্ধারণ করাকে বোঝানো হয়।

এবার দেখা যাক ‘আর-রাযযাক’ এর অর্থ কী।

আর-রাযযাক হলেন এমন একজন যিনি রিয়ক বিতরণ করেন। যিনি অবিরত রিয়ক বণ্টন করেন সুবিন্যস্ত ও পরিপূর্ণভাবে। তিনি আমাদের মধ্যে রিয়ক বণ্টন করেন প্রতিনিয়ত। ‘প্রতি মুহূর্তে’ বলেও আসলে ব্যাপারটা বোঝানো সম্ভব না। প্রতি ন্যানোসেকেন্ড বা তার চেয়েও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সময়ের ব্যবধানেও আল্লাহ রিয়ক বিতরণ করা বন্ধ করেন না। আর-রাযযাক অর্থ, সৃষ্টির জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তা বণ্টনে তিনি উদার। তিনি সবচেয়ে মহানুভব, সর্বাধিক দানশীল, নিরন্তর দাতা। তিনি তাঁর সৃষ্টিকে রিয়কের পর রিয়ক, নিয়ামাতের পর নিয়ামাত দান করেন।

তাহলে আমরা বুঝলাম, আর-রাযিক মানে হলো, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির রিয়ক নির্ধারণ করেন। এবং আর-রাযযাক মানে হলো, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির জন্যে নির্ধারিত রিয়ক বণ্টন করেন।

রিয়ক কী?

রিয়ক কী? আমরা সবাই ভাবি এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের জানা। কিন্তু আসলেই কি তাই?

ইবনু মানযুর^[৯] (رحمته) বলেন, রিয়ক মাদিয়াহ এবং মা’নাউয়িয়া। অর্থাৎ রিয়ক বস্তুগত হতে পারে আবার অবস্তুগতও হতে পারে।

কাজেই রিয়ক শুধু বস্তুগত জিনিসপত্রে সীমাবদ্ধ না। রিয়ক মানে শুধু খাওয়া, ধনসম্পদ,

[৯] প্রখ্যাত আরবী ভাষাবিদ ও ইমাম। জন্ম ৬৩০ হিজরি এবং মৃত্যু ৭১১ হিজরি। তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ معجم لسان العرب في اللغة.

টাকা-পয়সা, পোশাক-আশাক, আলিশান বাড়ি, ব্র্যান্ড নিউ গাড়ি না। রিয়কের সীমানা আরও বিস্তৃত। আল্লাহ আপনাকে ইসলাম দিয়েছেন, ঈমান দিয়েছেন—এটা রিয়ক। এই যে আপনি তাওহিদ সম্পর্কে পড়ছেন, শেখার সুযোগ পাচ্ছেন—এটাও রিয়ক। আপনার চোখ শীতলকারী স্ত্রী, আপনার সন্তানও রিয়ক। আপনার স্বাস্থ্য, আপনার ধনসম্পদ, রাতের ঘুম—এগুলোও রিয়ক। মানসিক প্রশান্তিও রিয়ক। আপনি যদি জান্নাতে যান—আর আমরা আন্তরিকভাবে চাই আপনি জান্নাতুল ফিরদাউসের অধিবাসী হন—তাহলে জান্নাতে আপনার জন্য যে পুরস্কার অপেক্ষা করছে তার সবকিছুও রিয়ক।

আকাশের মাঝে রয়েছে তোমাদের রিয়ক

তাওহিদ বিশুদ্ধ হতে হলে, তাওহিদে বিশ্বাস পরিপূর্ণ করতে হলে আমাদের অবশ্যই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে হবে, কেবল আল্লাহই হলেন আর-রাযযাক—রিয়কদাতা। এই বিশ্বজগতে আর কারও রিয়ক দেবার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা নেই। এ কথাটা অন্তরে খোদাই করে নিন। হৃদয়ের গভীরে বসিয়ে নিন। এটা কখনোই ভোলা যাবে না। আপনার রিয়কের মালিক আল্লাহ; শুধুই আল্লাহ। এর বিপরীত যা কিছু অন্তরে আছে সেগুলোকে বের করে ফেলে দিতে হবে খুঁড়ে খুঁড়ে।

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন, আমাদের রিয়ক আসমানে। তিনি বলেছেন,

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ

‘আকাশের মাঝে রয়েছে তোমাদের রিয়ক। তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত সবকিছু।’

[সূরা যারিয়াত, ৫১: ২২]

আমাদের এই আয়াতে বিশ্বাস রাখতে হবে। অনেকে হয়তো বলতে পারে, ‘ভাই, বাস্তবতা বোঝার চেষ্টা করো! আমার রিয়ক আকাশে কীভাবে থাকে? আমার অফিস তো এখানে! আমার রিয়ক কীভাবে আসমানে থাকবে? আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তো এই রাস্তার মাথায়! আমার রিয়ক কীভাবে আকাশে থাকবে? আমার সব টাকা তো ব্যাংকে? আমার টাকা-পয়সা, বাড়ি-গাড়ি সবকিছু তো আমার সাথেই আছে। আমার চোখের সামনেই আছে! তাহলে আমার রিয়ক আসমানে কীভাবে হয়?’

দেখুন, এগুলো রিয়ক অর্জনের মাধ্যম (আসবাব)। আল্লাহ এগুলো সৃষ্টি করেছেন যেন আপনি নির্ধারিত রিয়ক অর্জন করতে পারেন। সপ্ত আসমানের ওপর থেকে আল্লাহ আপনার বসকে চালিত করেছিলেন বলেই, মাসে মাসে বস আপনাকে একগাদা টাকা দিচ্ছে। রিয়ক আসছে আল্লাহর তরফ থেকে, আপনার বস একটা মাধ্যম মাত্র। ক্রেতার যখন হাটতে হাটতে আপনার দোকানে ঢুকে পড়ে, তখন তারা আসমানের ইশারাতেই আপনার রিয়ক নিয়ে আসে।

আপনার রিয়ক নিয়ন্ত্রণ করেন আল্লাহ। আপনার বস কিংবা দোকানের ক্রেতা না। এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের বলছেন, আপনার রিয়ক তিনি দেন—এটি সম্পূর্ণভাবে তাঁর নিয়ন্ত্রণে। আমাদের রিয়ক আকাশে, এ পৃথিবীতে না।

আল-আসমাঈ এবং বেদুইন

ইবনু কুদামাহ (رحمہ اللہ) এবং আল-কুরতুবি (رحمہ اللہ) সনদসহ একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

বসরার বিখ্যাত আলিম আল-আসমাঈ^[১০] (رحمہ اللہ) বলেন,

‘একদিন আমি মসজিদ থেকে বের হয়ে নগরীর অলিগলিতে হাঁটছিলাম। এমন সময় আমার দিকে এগিয়ে এল রুম্ম ও কঠোর চেহারার এক বেদুইন। এক হাতে থালা আরেক হাতে তলোয়ার। আমাকে জিজ্ঞাসা করল, ‘তুমি কোন গোত্রের লোক?’ আমি বললাম, ‘আসমা গোত্রের।’

বেদুইন এবার প্রশ্ন করল, ‘তুমি কি আল-আসমাঈ?’

‘হ্যাঁ। আমিই সেই লোক।’

বেদুইন আল-আসমাঈকে সালাম দিয়ে বসে পড়লো। তারপর আবার প্রশ্ন করল, ‘তুমি কোন অঞ্চল থেকে এসেছ? কোন এলাকা? আমাকে বিস্তারিত বলো।’

আল-আসমাঈ দাওয়াহর সুযোগটা কাজে লাগাতে চাইলেন। এমনভাবে উত্তর দিলেন, যেন আলোচনার মোড় ঘুরে যায় ইসলামের মৌলিক বিষয়ের দিকে। তিনি বললেন, ‘আমি এমন এক ভূমি থেকে এসেছি, যেখানকার অধিবাসীরা রাহমানের কালাম পাঠ করে।’

বেদুইন অবাক হয়ে গেল। বলল, ‘আর-রাহমানের এমন কালাম আছে যা মানুষের মুখে উচ্চারিত হয়? কী সেটা! আমাকে শোনাও!’

আল-আসমাঈ কুরআন তিলাওয়াত শুরু করলেন। সূরা আয-যারিয়াত। ২২ নম্বর আয়াতে পৌঁছালেন—

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ

‘আকাশের মাঝে রয়েছে তোমাদের রিয়ক। তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত সবকিছু।’

[সূরা যারিয়াত, ৫১:২২]

‘যথেষ্ট হয়েছে! এবার থামো!’ বেদুইন বলে উঠল।

[১০] ইমাম আসমাঈর নাম ছিল আবু সাঈদ আব্দুল মালিক। জন্ম : ১২১ হিজরি, মৃত্যু : ২১৬ হিজরি। তিনি ছিলেন বসরার প্রসিদ্ধতম আরবী ব্যাকরণবিদদের একজন, ভাষা বিজ্ঞানী, কবি, বংশবিদ্যা বিশারদ এবং জীব বিজ্ঞানী। তিনি খলীফা হারুনুর রশীদের সভাসদ ছিলেন।

আল-আসমাঈ বললেন, ‘এটা আল্লাহর কলাম। এগুলো আল্লাহর কথা।’

‘এগুলো আল্লাহর কথা?’ বেদুইন প্রশ্ন করল।

আল-আসমাঈ বললেন, ‘হ্যাঁ। এগুলোই আল্লাহর কথা। তিনি তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর কাছে তা নাযিল করেছিলেন।’

বিস্মিত বেদুইন উঠে দাঁড়াল। কোনো কথা না বলে সোজা গিয়ে তার উট জবাই করে ফেলল। চামড়া ছাড়াল। তারপর আল-আসমাঈ (ﷺ)-কে বলল, ‘এসো, গরিব মানুষের মধ্যে এই মাংস বিলিয়ে দিতে আমাকে সাহায্য করো।’

মাংস বিলানোর পর বেদুইন তার তলোয়ার আর ধনুক ভেঙে ফেলল। তারপর বারবার সেই আয়াত তিলাওয়াত করতে করতে চলে গেল মরুভূমির দিকে...

وَيَا السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ

‘আকাশের মাঝে রয়েছে তোমাদের রিয়ক। তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত সবকিছু।’

[সূরা যারিয়াত, ৫১: ২২]

আল আসমাঈ নিজেকে দোষ দিতে শুরু করলেন, ‘আমার ঈমান কেন এই বেদুইনের মতো শক্ত না’?^[১১]

বেদুইনদের অনেকেরই আরবী ভাষার ওপর বেশ দক্ষতা থাকত। আয-যারিয়াতের ২২ নম্বর আয়াত শোনামাত্রই বেদুইন নিজের অন্তরে তা গোঁথে নিয়েছিল। আল-আসমাঈর সাথে দেখা হবার আগে সে রিয়ক নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকত, রিয়কের খোঁজে ছুটে বেড়াত সব সময়। এই আয়াত শোনামাত্র তাঁর সব দুশ্চিন্তা দূর হয়ে গেল।

‘আরে! আমি রিয়ক নিয়ে এত কেন পেরেশান হচ্ছি—যেখানে আল্লাহ (ﷻ) সাত আসমানের ওপর থেকে আমাকে রিয়কের নিশ্চয়তা দিচ্ছেন?’

আসমান থেকে রিয়ক আসছে এটা জানার পর তার দুশ্চিন্তা দূর হয়ে গেল। অন্তরে প্রশান্তি এল।

বেদুইনের কাহিনি এখানেই শেষ না। অনেক বছর পরের কথা।

আল-আসমাঈ (ﷺ) খলীফা হারুনুর রশীদের সঙ্গে হজ্ব করতে মক্কা গিয়েছেন। পেছন থেকে তার নাম ধরে ডাকল কেউ একজন। বসরার গলিতে দেখা সেই বেদুইন। বেদুইন বৃদ্ধ হয়েছে। চেহারায় বয়সের ছাপ। পুরোনো দিনের মতোই তাঁরা আবার একসঙ্গে বসলেন। বেদুইন তাঁকে অনুরোধ করল কুরআন থেকে কিছু তিলাওয়াত করে শোনাতে। আল-আসমাঈ আবার সূরা আয-যারিয়াত তিলাওয়াত শুরু করলেন।

[১১] ইমাম কুরতুবী (رحمہ اللہ), আল জামি লি-আহকামিল কুরআন : ১৭/৪২

একের পর এক আয়াত তিলাওয়াত করে যাচ্ছেন। অবশেষে পৌঁছালেন সূরা আয-যারিয়াতের সেই ২২ নম্বর আয়াতে,

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ

‘আকাশের মাঝে রয়েছে তোমাদের রিয়ক। তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত সবকিছু।’

[সূরা আয-যারিয়াত, ৫১: ২২]

পুরোনো দিনের মতোই বেদুইন তাঁকে থামিয়ে দিলো। বলল, ‘আল্লাহর প্রতিশ্রুতি আমি সত্য পেয়েছি। তিনি যা বলেছেন তা অবশ্যই সত্য। আমাকে আরও কিছু আয়াত তিলাওয়াত করে শোনান।’

আল-আসমাঈ তিলাওয়াত করলেন,

فَو رَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلٍ مَّا أَنْتُمْ تَنْطِفُونَ

‘অতএব এ আসমান ও যমীনের মালিকের শপথ, এসব কথা তোমাদের কথাবার্তার মতোই নিশ্চিত সত্য।’ [আয যারিয়াত, ৫১: ২৩]

আল্লাহ এখানে নিজের নামে শপথ করছেন। তিনি বলেছেন,

‘...এ আসমান ও যমীনের মালিকের শপথ’

আর এই শপথের ঠিক পরেই এসেছে (لِ حَقِّ) ‘লা হাক্ক’। ‘লা হাক্ক’ এর এই লাম হলো লাম-আত-তাওকিদ। লাম-আত-তাওকিদের মাধ্যমে নিশ্চয়তা, গুরুত্ব, সত্যায়ন এবং দৃঢ়তা প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ এখানে আল্লাহ জোর দিয়ে, দৃঢ়ভাবে বলছেন—নিশ্চিতভাবেই, কোনো সন্দেহ ছাড়াই, অবশ্যই, অবশ্যই রিয়ক আসে আসমানের ওপর থেকে।

এই আয়াত শোনার পর বিস্মিত হয়ে গেল বেদুইন। চিৎকার করে বলল,

‘কারা সেই নির্বোধ, যারা মহান আল্লাহর ওয়াদা অবিশ্বাস করেছিল? কারা সেই নির্বোধ যারা আল্লাহকে এতটাই ক্রোধান্বিত করেছে, যার কারণে তিনি—আল-জালীল, আল-কারীম, আল-কাইয়ূম—নিজের নামে শপথ করলেন? কারা সেই মূর্খ?’

বেদুইন আল-আসমাঈর সামনেই সূরা আয-যারিয়াতের ২৩ নম্বর আয়াতটি তিলাওয়াত করতে থাকল এবং তৃতীয়বার তিলাওয়াত করার সময়ে সেই স্থানেই মৃত্যুবরণ করল! সে মৃত্যুবরণ করল এই আয়াতের ওজনে, এর গভীরতায়।^[১২]

আল্লাহ (ﷻ) এ আয়াতে বলেছেন,

مِثْلَ مَا أَنْتُمْ تَطْفُونَ

‘যেভাবে তোমরা একে অন্যের সাথে কথাবার্তা বলো।’

কেন রিয়কের কথা বোঝাতে গিয়ে আল্লাহ মানুষের একে অপরের সাথে কথোপকথনের উপমা দিলেন?

এর পেছনে দুটি কারণ আছে।

আল্লাহ বলছেন, আমরা একে অপরের সাথে কথা বলতে পারি, তা নিয়ে যেমন সন্দেহ নেই, তেমনি এ ব্যাপারেও সন্দেহ নেই যে রিয়ক আসমান থেকে আসে। আপনি যে কথা বলতে পারেন, এ নিয়ে কি আপনার কোনো সন্দেহ আছে? নেই। তেমনিভাবে আপনার রিয়ক যে আসমান থেকে আসে সেটা নিয়েও কোনো সন্দেহের জায়গা নেই। দ্বিতীয়ত ধরুন, আপনার জিহ্বা, আপনার মুখ, আপনার ভোকাল কর্ড কেউ আপনার কাছ থেকে কেড়ে নিল। এখন সেগুলো ব্যবহার করে সে কি কথা বলতে পারবে? নিশ্চয়ই না। একইভাবে আপনার রিয়ক আসে আকাশ থেকে। এই রিয়ক আপনার জন্য বরাদ্দ। আর কেউ, আর কোনো শক্তি এই রিয়ক নিতে পারবে না। যেটা আপনার সেটা আপনারই থাকবে। তাই এত দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। আপনার জন্য বরাদ্দ রিয়ক আপনার কাছে আসবেই।

এখানে একটা প্রশ্ন চলে আসে। রিয়ক সংশ্লিষ্ট অজস্র আয়াত এবং হাদীসগুলোতে কেন বারবার শপথ করা হয়েছে? একটু মনোযোগ দিয়ে আমাদের আলোচনা শুনলে ইতিমধ্যেই আপনার তা বুঝে ফেলার কথা। রিয়ক হলো এমন এক বিষয় যেখানে অনেক মানুষের তাওহিদ দুর্বল হয়ে যায়। রিয়কের দুশ্চিন্তা মানুষকে কাপুরুষ বানিয়ে দেয়। মানুষ তাওহিদ ভুলে যায়, কিংবা তার তাওহিদে ফাটল ধরে। টাকা, ঘরভাড়া, খাবার, রিটারারমেন্ট, সঞ্চয়—রিয়কের দুশ্চিন্তা আচ্ছন্ন করে ফেলে মানুষের চিন্তাকে। রিয়ক সংশ্লিষ্ট আয়াত এবং হাদীসগুলোতে ঘনঘন শপথ করার মাধ্যমে বক্তব্যকে শক্তিশালী করা হয়েছে। আশ্বস্ত করা হয়েছে। আল্লাহ চান আমরা নিশ্চিত হয়ে, প্রশান্ত মনে বিশুদ্ধ তাওহিদে পরিপূর্ণ জীবনযাপন করি এবং একনিষ্ঠভাবে সীরাতুল মুস্তাক্কিমের ওপর থাকি।

রিয়ক আল্লাহর কাছ থেকে আসে

মহান আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

‘পৃথিবীতে চলমান সকল প্রাণীর জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর। তিনি তাদের

অবস্থানস্থল ও সংরক্ষণস্থল জানেন। সবকিছুই এক স্পষ্ট গ্রন্থে (লিপিবদ্ধ) আছে।’ [সূরা হুদ, ১১: ৬]

রিয়ক কার ওপর নির্ভর করে?

عَلَى اللَّهِ

আল্লাহর ওপর।

আপনার বসের ওপর? বাবা-মায়ের ওপর? চাকরির ওপর? সরকার, দেশ বা কোনো সংস্থার ওপর?

না। রিয়ক নির্ভর করে আল্লাহর ওপর। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

‘তিনি তাদের অবস্থানস্থল ও সংরক্ষণস্থল জানেন।’

মানুষ অন্য মানুষকে রিয়ক দেয় না, দিতে পারে না। মানুষ মাধ্যম কেবল। দুঃখকষ্টের সময়, বিশেষ করে অর্থ কষ্টে পড়লে অনেকে ভাবে, আল্লাহ বোধহয় তাকে ভুলে গিয়েছেন। মুখে হয়তো বলে না। কিন্তু মনের ভেতর এই চিন্তা কাজ করে। এই চিন্তার উত্তর আছে সূরা হুদের এই আয়াতের দ্বিতীয়াংশে।

‘তিনি তাদের অবস্থানস্থল ও সংরক্ষণস্থল জানেন।’

আল্লাহ আপনার আবাসস্থল সম্পর্কে জানেন, আপনার সমাধিস্থল সম্পর্কেও জানেন। জন্মের আগে আপনি কোথায় ছিলেন, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কোথায় থাকবেন তা আল্লাহ জানেন। মৃত্যুর পর আপনার স্থান কোথায় সেটাও তিনি জানেন। আল্লাহ এখানে আবারও তাঁর বান্দাদের আশ্বস্ত করছেন। আল্লাহর ওপর ভরসা করুন। শান্ত হোন। দুশ্চিন্তা বাদ দিন। যখন মায়ের গর্ভে ছিলেন তখনো আল্লাহ আপনার অবস্থান জানতেন, যখন অন্ধকার কবরে যাবেন তখনো জানবেন। কেবল তিনিই সব সময়, সর্বাবস্থায় আপনার জন্য নিয়ামাত, রিয়ক দিয়ে গেছেন। তিনি আপনাকে ভুলে যাননি। তিনি কখনো ভুলে যান না।

আল্লাহ পশুপাখির জন্য রিয়কের ব্যবস্থা করেন। সেই আল্লাহ কেন তাঁর সম্মানিত সৃষ্টি মানুষের জন্য রিয়কের ব্যবস্থা করবেন না? আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

‘আর আমরা আদমসন্তানদের সম্মানিত করেছি।’ [সূরা আল ইসরা, ১৭: ৭০]

আল্লাহ পশুপাখির জন্য রিয়কের ব্যবস্থা করেন। যারা আল্লাহর নামে জঘন্য অপবাদ দেয়, যারা দাবি করে আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন—সেই জঘন্য অপরাধীদের জন্যও রিয়কের ব্যবস্থা করেন তিনি। তাহলে যারা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলে তাঁদের জন্য

আল্লাহ রিয়ক পাঠাবেন না? পশুপাখি, কাফির, মুসলিম—সবারই রিয়কের ব্যবস্থা করেন আল্লাহ।

ইব্রাহীম (ﷺ) আল্লাহর কাছে দু'আ করেছিলেন যেন তিনি মক্কাকে নিরাপদ শহর বানিয়ে দেন এবং যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে শুধু তাদের রিয়কের ব্যবস্থা করে দেন।

رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
'হে মালিক, এ শহরকে তুমি একটি নিরাপদ শহর বানিয়ে দাও এবং এখানকার অধিবাসীদের মাঝে যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা এবং পরকালে বিশ্বাস করে, তুমি তাদের ফলমূল দিয়ে জীবিকার ব্যবস্থা করে দাও।' [সূরা আল বাক্বারাহ, ২: ১২৬]

আল্লাহ যেন ইব্রাহীম (ﷺ)-এর দু'আ সংশোধন করে জানিয়ে দিলেন, তিনি বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সবাইকেই রিয়ক দান করেন।

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
'যে ব্যক্তি (আমাকে) অস্বীকার করবে তাকেও আমি অল্প কয়েকদিন জীবনের উপায়-উপকরণ সরবরাহ করতে থাকব, অতঃপর অচিরেই আমি তাদের আগুনের আযাব ভোগ করতে বাধ্য করব, যা সত্যিই বড় নিকৃষ্টতম গন্তব্য।'
[সূরা আল বাক্বারাহ, ২: ১২৬]

নিজের অন্তরে কথাগুলো গোঁথে নিন। খোদাই করে নিন। আপনার রিয়ক কেবল আল্লাহর হাতে। বস, ব্যবসা, চাকরি কিংবা সরকারের হাতে না।

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ
'নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলাই জীবিকা সরবরাহকারী, তিনি প্রবল ক্ষমতার অধিকারী, মহাশক্তিমান।' [সূরা আয যারিয়াত, ৫১: ৫৮]

আল্লাহর কাছে চান, কোনো সৃষ্টির কাছে চাইবেন না।

রিয়ক নির্ধারিত এবং অপরিবর্তনীয়

আমরা আগেই বলেছি, রিয়ক অপরিবর্তনশীল। মায়ের পেটে থাকা অবস্থাতেই আপনার রিয়ক লেখা হয়ে গেছে। দিন-রাত এক করে দুনিয়ার পেছনে ছোটা, দুশ্চিন্তায়

পেরেশান হয়ে যাওয়া কিংবা নিরুদ্বেগ জীবনযাপন—যা-ই করুন না কেন, আপনার জন্য আল্লাহ যতটুকু রিয়ক বরাদ্দ রেখেছেন ঠিক ততটুকুই আপনি পাবেন। এক চুল পরিমাণ কমবে না, বাড়বেও না।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর একটি সহীহ হাদীসে এসেছে,

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ وَكَّلَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا

আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা একজন ফেরেশতাকে মাতৃগর্ভের দায়িত্বে নিয়োজিত রাখেন। যখন বান্দা গর্ভে আসে তখন এই ফেরেশতা বলে,

أَيُّ رَبِّ نُطْفَةٍ

হে আল্লাহ, নুতফা (বীৰ্য)?

অর্থাৎ আমি কি নুতফা অবস্থা থেকে একে আগে বাড়াব?

তারপর ফেরেশতা বলে,

أَيُّ رَبِّ عِلْقَةٍ

হে আমার রব, আলাক্কা (জমাটবদ্ধ রক্ত)?

এবার কি জমাটবাঁধা রক্তপিণ্ডে পরিণত হবার সময় এসেছে? ফেরেশতা আল্লাহর কাছে অনুমতি চাইবেন।

তারপর ফেরেশতা বলবেন,

أَيُّ رَبِّ مُضْغَةٍ

হে আমার রব, মুদ্ব্বাহ (মাংসখণ্ড)?

সে কি এখন মাংসখণ্ডে পরিণত হবে?

فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقًا قَالَ: قَالَ الْمَلَكُ: أَيُّ رَبِّ ذَكَرٌ، أَوْ أُنْثَى؟

আল্লাহ যখন গর্ভস্থিত জ্রণের সৃষ্টি সম্পন্ন করার ইচ্ছা করেন তখন ফেরেশতা প্রশ্ন করে—সে কি পুরুষ হবে, নাকি নারী হবে?

তারপর সে প্রশ্ন করবে?

شَقِيٌّ، أَوْ سَعِيدٌ؟

‘সে কি দুর্ভাগা হবে নাকি সৌভাগ্যবান হবে?’

অর্থাৎ প্রতিটি ধাপে এই ফেরেশতা মহান আল্লাহর কাছ থেকে অনুমতি নেবে।

সবশেষে ফেরেশতা প্রশ্ন করবে,

فَمَا الرِّزْقُ؟ فَمَا الْأَجَلُ؟ فَيَكْتُبُ كَذَلِكَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ

‘ইয়া আল্লাহ, এর আয়ু এবং রিয়ক কী হবে?’ এরপর (আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী) এই সবকিছু মায়ের পেটে থাকা অবস্থাতেই লিখে ফেলা হবে।’^[১৩]

অথচ ওই ভ্রূণ তখনো ভূমিষ্ঠ হয়নি। সে তখনো মায়ের গর্ভে। লক্ষ করুন, আমি কিন্তু বলছি না, মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় আপনার রিয়ক নির্ধারিত হয়েছে। না আপনার রিয়ক নির্ধারিত হয়েছে তারও অনেক আগে। আপনি যখন ধীরে ধীরে মাতৃগর্ভে একটু একটু করে আকৃতি পাচ্ছিলেন তখন ফেরেশতারা আপনার রিয়ক সম্পর্কে জানতে পেরেছে। এই সময় ফেরেশতারা এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ পেতে শুরু করে। কিন্তু আপনার রিয়ক নির্ধারিত হয়েছে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে। আমি আপনার জন্মের পঞ্চাশ হাজার বছর আগে বলছি না। আপনার, আমার, আমাদের সবার রিয়ক নির্ধারিত হয়ে গেছে আসমানসমূহ ও যমীন তৈরি হবার পঞ্চাশ হাজার বছর আগে। সবকিছু লিখিত আছে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। বাদ দেয়া হয়নি খুঁটিনাটি কিছুই। আপনার জন্য নির্ধারিত প্রতিটি ফোঁটা পানির কথা লেখা আছে। এক ফোঁটা পানি তো অনেক বড়, এর চেয়েও ক্ষুদ্র-অণু, পরমাণুর চেয়েও ছোট-কোনো রিয়ক; ইলেক্ট্রন, প্রোটন, নিউট্রন বা তার চেয়েও ছোট যেমন কোয়ার্ক, লেপটন পর্যায়ের কোনো রিয়কও যদি আপনার জন্য নির্ধারিত হয়ে থাকে, তাহলে তা লিখিত আছে। নিশ্চিত থাকুন সেটা আপনার কাছে আসবেই। যত ক্ষুদ্র হোক, সেটা আপনার কাছে আসবে। কোনো হেরফের হবে না। আল্লাহ্ আকবার! মহান আল্লাহ প্রত্যেকের জন্য রিয়ক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং তা লেখা হয়ে গেছে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগেই। আর এটা লেখা হবার আগেও তা আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা’আলার চিরন্তন গাইবী জ্ঞানে ছিল।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

‘আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে আল্লাহ সৃষ্টিসমূহের তাকদীর লিখে রেখেছেন।’^[১৪]

জীবন ও রিয়কের ক্ষেত্রে আল্লাহ পথচলার উপমা দিয়েছেন। রিয়ক আপনার জন্য অপেক্ষা করে আছে। আপনি ধীরেসুস্থে এগিয়ে যান। তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই। দৃষ্টিভ্রমের কারণ নেই। রিয়ক আপনার পথে অপেক্ষা করছে। আপনার রিয়ক আপনারই

[১৩] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৩১৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৬৪৬; মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং : ১২৪৯৯

[১৪] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৬৫৩

থাকবে। অন্য কারও কাছে যাবে না।

ধরুন, আপনাকে একটা বইয়ের শেলফ দেখিয়ে বলা হলো এই সবগুলো বই আপনার। বইগুলোতে আর কেউ হাত দেবে না। সব আপনার। আজ থেকে শত শত বছর পরও এগুলো আপনার থাকবে। যতদিন, যত বছর যাক না কেন, এগুলো এভাবেই সংরক্ষিত থাকবে এখানে। কেউ একবার ধরেও দেখবে না।

আপনি কি এটা শোনার পরপরই লাফ দিয়ে উঠবেন? ছুটে গিয়ে হাত ভর্তি করে একেবারে বাসায় নিয়ে যাবেন সব বই? নিশ্চয় না। রিয়কের ব্যাপারটিও এ রকমই। আপনার জন্য নির্ধারিত রিয়ক আপনার কাছে আসবেই আসবে। পৃথিবীর কোনো শক্তির বিন্দুমাত্র সামর্থ্য নেই আপনার রিয়কে ভাগ বসানোর, বা আপনার কাছ থেকে নির্ধারিত রিয়ক কেড়ে নেবার। এত পেরেশান হবার, দুশ্চিন্তায় ভোগার, ছোট্টাছুটির দরকার নেই। শান্ত হোন। আপনার রিয়ক আপনার কাছে আসবেই।

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ الْأَنْشُورُ
‘তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি ভূমিকে তোমাদের অধীন করে বানিয়েছেন, তোমরা (যখন যেভাবে চাও) এর অলিগলির মধ্য দিয়ে চলাচল করো এবং আল্লাহর দেয়া রিয়ক তোমরা আহ্বার করো; তাঁর কাছেই হবে পুনরুত্থান।’ [সূরা মূলক, ৬৭: ১৫]

আল্লাহই যমীনকে আমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। আর আমাদের জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছেন নির্ধারিত রিয়কের। কাজেই এত চিন্তা কিসের? রিয়কের পেছনে, দুনিয়ার পেছনে ক্রমাগত ছোট্টার কিছু নেই। সারাক্ষণ দুনিয়া নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। বরং মৃত্যুর পরের অনন্ত জীবনের কথা ভাবুন। দুনিয়াতে আপনার রিয়ক নিশ্চিত। আল্লাহ আপনার রিয়কের গ্যারান্টি দিয়েছেন। কিন্তু আখিরাতে কী হবে, তার কোনো নিশ্চয়তা আপনার কাছে নেই। রিয়কের গ্যারান্টি আছে, কিন্তু আখিরাতে মুক্তির গ্যারান্টি নেই। তাই আখিরাতে পেছনে ছুটুন। দুশ্চিন্তা করুন কিয়ামাতের দিন নিয়ে। আপনার হিসেব নিয়ে দুশ্চিন্তা করুন। কীভাবে জান্নাতে ঢোকা যায়, কীভাবে জান্নাতের উঁচু স্তরে পৌঁছানো যায় সেটা নিয়ে চিন্তা করুন।

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
‘তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণপানে ছুটে আসবে।’ [সূরা জুমআহ, ৬২: ৯]
خَتَامُهُ مِنكَ، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ

‘তার মোহর হবে কস্তুরীর ঘ্রাণ, আর প্রতিযোগিতাকারীদের উচিত এ বিষয়ে প্রতিযোগিতা করা।’ [সূরা আল-মুতাফফিন, ৮৩: ২৬]

এই পুরস্কারের পেছনে দৌড়ান।

আর-রাযযাক রিয়ক দানে বিচক্ষণ

বান্দার রিয়ক প্রদানের ব্যাপারে আল্লাহ (ﷻ) অত্যন্ত কৌশলী, অত্যন্ত বিচক্ষণ। এ বিষয়টি আর-রাযযাক নামের অর্থ জানা এবং মহান আল্লাহর এই বৈশিষ্ট্যের ওপর ঈমান আনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অনেক লোক দিন-রাত বলে, আল্লাহ সর্বজ্ঞানী। কিন্তু এটা তাদের মুখের কথা। এ কথা তাদের অন্তরে প্রবেশ করে না। দিনে তারা এই কথা বলে, কিন্তু রাতে সৃষ্টির কাছে রিয়কের ব্যাপারে অভিযোগ করে। তারা মুখে বলে আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, আল্লাহ আর-রাযযাক, আল্লাহ সর্বাপেক্ষা বিচক্ষণ। কিন্তু অভাবের ব্যাপারে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা মানুষের কাছে গিয়ে অভিযোগ করে। কী আশ্চর্য! আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ

‘যদি আল্লাহ তা’আলা তাঁর (সব) বান্দাদের রিয়কের প্রাচুর্য দিতেন, তাহলে তারা নিঃসন্দেহে যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করত; (তাই) তিনি পরিমাণমতো যাকে (যতটুকু) চান তার জন্যে (ততটুকু রিয়কই) নাযিল করেন। [সূরা আশ শূরা, ৪২: ২৭]

আল্লাহ আর-রাযযাক, আল-হাকীম। এবং আর-রাযযাক এবং আল-হাকীম জানেন আপনাকে তিনি যদি কিছুটা বেশি দেন, তাহলে আপনি সেটার অপব্যবহার করবেন। এটা আপনার জন্য কল্যাণকর হবে না। তাই তিনি আপনাকে পরিমাণমতো রিয়ক দেন। আর-রাযযাক এবং আল-হাকীমের ওপর ঈমান আনার একটি অংশ হচ্ছে এটি বিশ্বাস করা। আল্লাহ আপনাকে যা দেবেন আপনি তা মাথা পেতে মেনে নেবেন, আকীদাহ হতে হবে এমন। আল্লাহ আপনাকে ধনী বা গরিব যে অবস্থায় রাখুন না কেন, আপনি সেটা মেনে নেবেন। কারণ আপনার অবস্থা বদলালে আপনি কি সুখী হতেন নাকি অনিষ্টকারী হতভাগ্যদের একজন হতেন, তা আপনি জানেন না। অবস্থার পরিবর্তন কীভাবে আপনাকে, আপনার ঈমানকে প্রভাবিত করবে, সেটা আপনি জানেন না। আমরা কেউ জানি না। তাই আমরা আল্লাহর ফয়সালা মাথা পেতে নিই। তাঁর ফয়সালা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকি। কারণ আমি জানি না, কিন্তু আমার আল্লাহ জানেন। আল্লাহ জানেন কোনটা আমার জন্য উত্তম, তিনিই আর-রাযযাক, আল-হাকীম।

আমি যদি আপনার ব্যক্তিগত বিষয়ে প্রশ্ন করা শুরু করি তাহলে কেমন লাগবে?

ধরুন, আপনি ২০ হাজার ডলার দিয়ে গাড়ি কিনেছেন। এখন আমি যদি আপনার

কাছে কৈফিয়ত চাই, তুমি কেন শুধু শুধু গাড়ির পেছনে ২০ হাজার ডলার খরচ করলে? তুমি তো ১০ হাজার, ৫ হাজার বা তার চেয়েও কম দামে চলনসই একটা গাড়ি পেয়ে যেতে, এত খরচ করতে গেলে কেন?

অথবা ধরুন, আপনি আইফোন কিনলেন আর আমি আপনাকে গিয়ে প্রশ্ন করলাম, তুমি আইফোন কিনলে কেন? সাধারণ ফোন—যেগুলো দিয়ে শুধু কল আর মেসেজ করা যায়—সেগুলো দিয়েও তো কাজ চালানো যায় তাই না? কিংবা আমি যদি বলি, তোমার স্ত্রীকে শপিং এর জন্য ৫০০ ডলার কেন দিলে? তখন আপনার কেমন লাগবে? আপনি হয়তো ক্ষেপে যাবেন। আমার সিদ্ধান্ত নিয়ে কথার বলার তুমি কে? আমি কোন গাড়ি কিনব, আইফোন কিনব নাকি নোকিয়া ১১০০ ব্যবহার করব সেটা আমার ব্যাপার। আমার স্ত্রীকে আমি কত টাকা দেবো সেটা আমার ব্যাপার। তুমি এখানে নাক গলাবার কে?

আপনি এ কথা বলতেই পারেন। সেই অধিকার আপনার আছে। আমি কে আপনার একান্ত ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক ব্যাপারে নাক গলানোর? এ অধিকার আমার নেই। তাহলে বলুন তো, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানী, আল্লাহ, আর-রায্যাক, আল-হাকীমের কর্মপদ্ধতি, হিকমাহ নিয়ে প্রশ্ন করার আপনি কে? কে আপনাকে এই অধিকার দিয়েছে?

আল্লাহ (ﷻ) প্রশ্ন করেছেন,

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

‘তারা কি তোমার রবের রহমত ভাগ-বণ্টন করে? আমিই দুনিয়ার জীবনে তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বণ্টন করে দিই এবং তাদের একজনকে অপরজনের ওপর মর্যাদায় উন্নত করি, যাতে একে অপরকে অধীনস্থ বানাতে পারে। আর তারা যা সংগ্রহ করে তোমার রবের রহমত তা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।’ [সূরা আয যুখরুখ, ৪৩: ৩২]

আল্লাহ কোন বান্দাকে কতটুকু রিয়ক দেবেন, রহমত নাযিল করবেন নাকি করবেন না, করলে কতটুকু, এ ব্যাপারগুলোতে নাক গলানোর আপনি কে? কে আপনাকে এই অধিকার দিয়েছে? একমাত্র আল্লাহই তাঁর সৃষ্টির মধ্যে রিয়ক বণ্টন করেন। এটা কেবল তাঁরই এখতিয়ার। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

‘এবং তাদের একজনকে অপরজনের ওপর মর্যাদায় উন্নত করি, যাতে একে অপরকে অধীনস্থ বানাতে পারে।’

সমাজের সব মানুষ সমান না। কেউ ধনী, কেউ মধ্যবিত্ত, কেউ গরিব। অনেক লোক বলে, কেন যে আল্লাহ আমাকে ধনী বানালেন না? তাহলে আমি মসজিদ বানাতাম। মজলুমের পাশে দাঁড়াতে পারতাম...

রিয়কের কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেউ কিছুটা হতাশা বোধ করতে পারেন। যদি এই হতাশার কারণ হয় সম্পদের অভাবে দ্বীনের খেদমত করতে না পারা, তাহলে সেটা ভিন্ন ব্যাপার। কিন্তু হতাশা যদি অসম্ভবত্বের রূপ নেয়, তাহলে সমস্যা। আমাদের মনে রাখতে হবে—আল্লাহ আর-রাযযাক, সর্বজ্ঞানী, সবচেয়ে বিচক্ষণ। তিনি খুব ভালো করে জানেন, আপনাকে কী কী দিতে হবে, কতটুকু দিতে হবে, কখন দিতে হবে, কেন দিতে হবে। এ পৃথিবীতে ক্বারুনের মতো অনেকেই আছে।

ক্বারুনের কাহিনি জানেন তো? ক্বারুনকে আল্লাহ অনেক ধনসম্পদ দিয়েছিলেন। সেই যমানার লোকেরা প্রশ্ন করেছিল, ‘আল্লাহ ক্বারুনকে এত ধনসম্পদ দিয়েছেন, আমাদের যে কেন দিলেন না?’ কিন্তু ক্বারুন যখন ঔদ্ধত্য আর সীমালঙ্ঘনের কারণে ধনসম্পদের নীচে চাপা পড়ল তখন তাদের চোখ খুলে গেল। ‘আল্লাহ আমাদের বাঁচিয়েছেন, ভাগ্যিস তিনি আমাদেরকে ক্বারুনের মতো ধনসম্পদ দেননি’।

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰثَرَ اِلٰهَ لٰئِنِ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ

‘তাদের মধ্যে কেউ কেউ রয়েছে যারা আল্লাহ তা’আলার সাথে ওয়াদা করেছিল, তিনি যদি আমাদের অনুগ্রহ করে দান করেন, তবে অবশ্যই আমরা সাদাকাহ করব এবং নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হব।’ [সূরা তাওবাহ, ৯: ৭৫]

খেয়াল করলে দেখবেন অনেক লোক বলে, ‘কেন আল্লাহ আমাদের বেশি বেশি ধনসম্পদ দেন না? আমাদের ধনসম্পদ থাকলে আমরা বেশি বেশি দান-সাদকাহ করতে পারতাম। নেককার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারতাম।’ কিন্তু ধনসম্পদ পাওয়ার পর তাদের অবস্থা কী হয়? আল্লাহ (ﷻ) আমাদের তা জানিয়ে দিচ্ছেন,

فَلَمَّآ اٰتٰهُمْ مِنْ فَضْلِهِ خٰلَوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ

‘অতঃপর যখন আল্লাহ নিজ অনুগ্রহ থেকে তাদের (ধনসম্পদ) দান করলেন, তখন তারা (দান করার বদলে) কার্পণ্য করতে শুরু করল এবং (আল্লাহকে দেয়া ওয়াদা থেকে) তারা মুখ ফিরিয়ে নিল।’ [সূরা তাওবাহ, ৯: ৭৬]

যখন আল্লাহ তাদের দিলেন তখন তারা কিপটেমি শুরু করল। আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরে গেল। রিয়ক নিয়ে আল্লাহর ফয়সালা নিয়ে প্রশ্ন তোলার শেষ পরিণতি কী হলো?

فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

‘এর শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ তাঁর সাথে সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত তাদের অন্তরে মুনাফিকী সঞ্চার করেন, কারণ তারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করেছিল এবং মিথ্যা বলত।’ [সূরা তাওবাহ, ৯: ৭৭]

এই আয়াতগুলো জানার পর এটা একদম স্পষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত যে, আল্লাহ আপনার জন্য যে রিয়কের ফয়সালা করেছেন তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন করা একদমই উচিত না। এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার, এই আয়াতগুলো সা’লাবাহ (ﷺ) নামের একজন সাহাবীর ধনী হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছে বলে একটা কথা প্রচলিত আছে। এটা ভুল। এই আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিল ইবনু ওয়াহিব এবং ইবনু যাইদ নামক দুইজন মুনাফিকের কর্মকাণ্ডের ওপর ভিত্তি করে। ইবনু হাজার (رحمته) এটা উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে সা’লাবাহ (ﷺ) ছিলেন এমন একজন সাহাবী যিনি বদরের দিন জিহাদের ময়দানে অবিচল ছিলেন।^[১৫]

আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকুন

আল্লাহর ফয়সালা নিয়ে অসন্তুষ্ট হবেন না। সাবধান! আল্লাহ আপনার জন্য যে রিয়ক নির্ধারণ করে দিয়েছেন তার ওপর সন্তুষ্ট থাকুন। আল্লাহর কাছে বেশি বেশি রিয়ক বৃদ্ধির দু’আ করতে থাকুন। নিজের জায়গা থেকে সাধ্যমতো দুনিয়াবি চেষ্টা চালান। কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু অসন্তুষ্ট হওয়া যাবে না। গরিব, মধ্যবিত্ত কিংবা বিত্তবান যা-ই হোন না কেন, আল্লাহ আপনার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তা নিয়ে অসন্তুষ্ট হওয়া যাবে না। এমন অসন্তুষ্ট আপনার তাওহিদ ও ঈমানে ত্রুটি নিয়ে আসবে, তৈরি করবে অপূর্ণতা। ফলে আপনি আর-রাযযাকের ওপর পরিপূর্ণরূপে ঈমান আনতে পারবেন না। আল্লাহ আল-আলীম, আর-রাযযাক যখন আপনার জন্য কিছু নির্ধারণ করেছেন, তখন অবশ্যই সেটার পেছনে উপযুক্ত কারণ আছে। যখন আল্লাহ আল-হাকীম, আর-রাযযাক, কোনো কিছু থেকে আপনাকে বঞ্চিত করেছেন, তখন সেটার পেছনেও উপযুক্ত কারণ আছে। কাজেই অসন্তুষ্ট হওয়া যাবে না। আপত্তি করা যাবে না।

[১৫] সা’লাবাহ (ﷺ)-এর ঘটনা বেশ কিছু কিতাবে এসেছে এবং অনেক মুফাসসিরের নিকটই এটা বেশ প্রসিদ্ধ। এটি আছে তাফসিরুত তাবারী : ১০/১৩৯; ইমাম বাইহাকী (رحمته), দালাইলুল নবুওয়্যাহ : ৫/২৮৯-৯২; ইমাম তাবারানী (رحمته), আল মু’জামুল কাবীর, হাদীস নং : ৭৮৭৩। ইমাম হাইসামী (رحمته) এর সনদকে দুর্বল বলেছেন।-মাজমাউয যাওয়াইদ : ৭/৩৪; হাফিয ইরাকী (رحمته) দুর্বল বলেছেন।-তাখরিজুল ইহইয়া : ৩/৩৩৪; ইমাম যাইলাঈ (رحمته) দুর্বল বলেছেন।-তাখরিজুল কাশশাফ : ২/৮৫; এ ছাড়া ইমাম বাইহাকী (رحمته) নিজেও এটি উল্লেখ করে এর দুর্বলতার কথা বলেছেন।

আল্লাহ যা রিয়ক দিয়েছেন তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা তাওহিদের অংশ।

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ

‘তাদেরকে যা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছিল তারা যখন তা ভুলে গেল তখন আমি তাদের সামনে প্রতিটি (আনন্দের) জিনিসের দরজা খুলে দিলাম। এভাবে তাদেরকে যা দেয়া হয়েছিল তারা যখন তা নিয়ে আনন্দিত, তখন আমি হঠাৎ তাদেরকে পাকড়াও করি। তখনই তারা নিরাশ হয়ে যায়।’ [সূরা আল আন’আম, ৬: ৪৪]

আল্লাহ দুনিয়াতে সবাইকে দেন। যাদের পছন্দ করেন না, সেই কাফির-মুশরিকদেরও তিনি দুনিয়ার সম্পদ দেন। আবার যাদের তিনি ভালোবাসেন, সেই মুমিনদেরও দেন। দুনিয়াতে কাফির আর মুমিন—দুই দলেরই অংশ আছে। কিন্তু আখিরাত শুধু মুমিনদের জন্য। আখিরাতে আল্লাহর অপছন্দনীয় লোকদের কোনো ভাগ নেই। দুনিয়াতে আল্লাহ কাউকে ধনসম্পদ, সন্তানসন্ততি দেয়ার মানে ওই ব্যক্তি আল্লাহর পছন্দনীয় অথবা সে আখিরাতেও মর্যাদা পাবে, এমন মনে করা ভুল। আজ অনেক মানুষ এভাবে চিন্তা করে। মক্কার মুশরিক কুরাইশরাও এমন মনে করত।

কুরাইশদের ব্যাপারে আল্লাহ (ﷻ) কুরআনে বলেছেন,

وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ

‘তারা আরও বলেছে, আমরা এ দুনিয়ার ধনে জনে তোমাদের চাইতে সমৃদ্ধিশালী এবং পরকালে আমাদের কখনোই আযাব দেয়া হবে না।’ [সূরা সাবা, ৩৪: ৩৫]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং সাহাবী (رضي الله عنه)-দের কাছে এসে কুরাইশরা অহংকার করত, ‘তোমাদের চেয়ে আমরা বেশি অনুগ্রহপ্রাপ্ত। আমাদের অটেল ধনসম্পদ আছে। আমাদের সন্তানসন্ততির সংখ্যা তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি। আমরা কখনোই শাস্তির সম্মুখীন হব না’।

তাদের এই ভুল ধারণা ভেঙে দিয়ে আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

‘হে নবী, তুমি বলো, আমার মালিক যাকে ইচ্ছা করেন তার রিয়ক প্রশস্ত করে দেন, যাকে ইচ্ছা সংকুচিত করে দেন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এটা জানে না।’

[সূরা সাবা, ৩৪: ৩৬]

পছন্দীয় এবং অপছন্দীয়, দুই শ্রেণির বান্দাকেই আল্লাহ এ দুনিয়াতে রিয়ক দেন। সাফল্য দেন। সম্পদ দেন। কিন্তু আখিরাতের সম্পদ, সাফল্য, পুরস্কার কেবল তাঁর ভালোবাসার বান্দাদের জন্য বরাদ্দ।

প্রকৃত তাওয়াক্কুল

হাতিম আল আসম^[১৬] (ﷺ)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো,

‘আপনার তাওয়াক্কুল^[১৭] এত শক্তিশালী হলো কীভাবে? আপনি কীভাবে এত শক্তভাবে আল্লাহর ওপর ভরসা করেন?’

তিনি (ﷺ) বললেন,

‘দেখো, আমি বিশ্বাস করি আমার রিয়কে কেউ ভাগ বসাতে পারবে না। তাই আমার অন্তর দৃষ্টিশ্রুতমুক্ত, পরিতৃপ্ত। আমি জানি মৃত্যু আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে। তাই আমি রসদ জোগাড় করছি পরকালের জন্য। আমি জানি আমার আমলগুলো অন্য কেউ করে দেবে না, আমার কাজ করতে হবে আমাকেই। তাই আমি মনোযোগ দিয়েছি আমলে। আমি জানি আল্লাহ আমাকে সব সময় দেখছেন। আল্লাহ আমাকে দেখছেন এমন অবস্থায় পাপ করতে আমি লজ্জাবোধ করি।’^[১৮]

লোকেরা তাঁকে এত পরিতৃপ্ত, এত প্রশান্ত দেখে অবাক হয়ে গেল। তারপর প্রশ্ন করল, আপনি কোথা থেকে খাবার সংগ্রহ করেন?

[১৬] ইমাম আবু আব্দুর রাহমান হাতিম আল আসম (ﷺ) ছিলেন ৩য় হিজরি শতকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা’আতের প্রখ্যাত ইমাম। মৃত্যু ২৩৭ হিজরি। তিনি মূলত শাক্কীক আল বালখী (ﷺ)-এর ছাত্র ছিলেন এবং তাঁর সুদীর্ঘ সুহবত পান। খুরাসানের বলখ এলাকার লোক ছিলেন। পরে বাগদাদে আসেন। এখানে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (ﷺ)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়।-ইমাম যাহাবী (ﷺ), সিয়াকু আ’লামিন নুবালা : ১১/৪৮৫-৮৭

[১৭] তাওয়াক্কুল : তাওয়াক্কুল শব্দের আভিধানিক অর্থ, Trust, confidence, নির্ভরতা, নির্ভরশীলতা, ভরসা।- Hans Wehr, Dictionary of Modern Written Arabic, p: ১২৮৪, ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আল মু’জামুল ওয়াফী, পৃষ্ঠা : ৩৩৯। পারিভাষিকভাবে তাওয়াক্কুল বলতে কী বোঝায় এর সংজ্ঞায় ইমাম আলী বিন মুহাম্মাদ আল জুরজানী (ﷺ) বলেছেন, ‘তাওয়াক্কুল হচ্ছে আল্লাহর কাছে যা আছে তার ওপর আস্থা রাখা এবং মানুষের হাতে যা রয়েছে তার ব্যাপারে নিরাশ হওয়ার নাম।’-আত তা’রিফাত, পৃষ্ঠা : ৭৪ ইমাম ইবনুল জাওযী (ﷺ) আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলকে ব্যাখ্যা করেছেন, ‘তাঁর ওপর আস্থা রাখো আর তোমার যাবতীয় বিষয়কে তাঁর কাছেই ন্যস্ত করো।’-যাদুল মাসির ফি ইলমিত তাফসির : ৩/৩৫০ যে সকল বিষয়ে আল্লাহর ওপর নির্ভর করে, তাওয়াক্কুল করে তার ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন : ‘যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট।’

[সূরা আত তালাক, ৬৫: ৩]

[১৮] ইমাম যাহাবী (ﷺ), সিয়াকু আ’লামিন নুবালা : ১১/৪৮৫

হাতিম আল আসম (رضي الله عنه) কুরআনের আয়াত দিয়ে জবাব দিলেন,

وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ

‘আর আসমানসমূহ ও যমীনের সমুদয় ধনভান্ডার তো আল্লাহ তা‘আলারই, কিন্তু মুনাফিকরা তা বুঝতে পারে না।’ [সূরা আল মুনাফিকুন, ৬৩: ৭]

আশ শাফে‘ঈ (رحمته الله) বলতেন, ‘রিয়কের জন্য আমি পুরোপুরি আল্লাহর ওপর নির্ভর করি। আমার জন্য নির্ধারিত রিয়ক আমার কাছে আসবেই আসবে। এ নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। গহিন অন্ধকার সাগরের তলদেশ থেকে হলেও আমার রিয়ক আমার কাছে আসবেই। তাহলে কেন আমি রিয়ক নিয়ে হা-হতাশ করব? কেন এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করব? মন খারাপ করব? এ নিয়ে হতাশার, দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। নিশ্চিত থাকো।’

উমার ইবনুল খাত্তাব (رضي الله عنه) নিচের হাদীসটি বর্ণনা করেছেন,

لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، إِلَّا تَرْوْنَ أَنَّهُمْ تَغْدُو خِمَاصًا، وَتَرْوُحُ بِطَانًا.

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ‘যেভাবে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করা উচিত, সেভাবে যদি তোমরা আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করতে, তাহলে তিনি তোমাদেরকে সেভাবে রিয়ক দিতেন যেভাবে তিনি পাখিদের রিয়ক দেন। তোমরা কি দেখো না, পাখিরা সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বের হয়, এরপর সন্ধ্যায় ভরা পেটে বাড়ি ফিরে।’^[১৯]

এই হাদীসে তাগদুহ (تَغْدُو) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ তারা সকালে বাসা থেকে খালি পেটে বের হয়। ‘তারা বের হয়’ বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে তারা কোনো কিছু করতে বের হয়। তারা কাজ করতে বের হয়। এক বর্ণনায় এসেছে ‘ওয়া তা’উদু’ (تَعُودُ), আর আরেক বর্ণনায় ‘তারুহু’ (تَرْوُحُ) এসেছে। যার অর্থ হলো তারা সন্ধ্যার শেষ প্রহরে ঘরে ফিরে। আর বিতা’না (بِطَانًا) শব্দটির অর্থ হচ্ছে ‘পূর্ণ রিয়ক সহকারে’।

প্রকৃত তাওয়াক্কুল কী, এই হাদীস থেকে আমরা বুঝলাম। প্রকৃত তাওয়াক্কুল হলো অন্তরে আল্লাহর ওপর পূর্ণ ও সুনিশ্চিত বিশ্বাস রেখে সম্ভাব্য সব চেষ্টা করা। মনে পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে আপনি সাধ্যমতো চেষ্টা করবেন—এটাই প্রকৃত তাওয়াক্কুল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কিন্তু বলেননি, তাওয়াক্কুল করলে বাসায় বসে থাকা পাখির মতো রিয়ক দেয়া হবে। বরং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তাগদু এবং তা’উদু। অর্থাৎ আমরা

[১৯] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং : ৩৭৩, আল্লামা শু‘আইব আরনাউত্ (رحمته الله)-এর মতে সনদ সহীহ।

যদি সত্যিকারভাবে তাওয়াক্কুল করি, তাহলে আল্লাহ আমাদের ওই পাখিদের মতো রিয়ক দেবেন যারা রিয়কের সন্ধানে সকালে বের হয় আর সন্ধ্যায় ভরা পেটে ঘরে ফিরে আসে। এটাই হলো রিয়কের ব্যাপারে তাওয়াক্কুল করার অর্থ। অনেকেই এ ব্যাপারটা ভুল বোঝে।

ইবনু আবিদ দুনইয়া^[২০] (رحمته) মদীনায় উমরাহ করতে আসা মুসলিমদের সাথে পরিচিত হতে পছন্দ করতেন। আলাপ আলোচনা করতেন তাদের সাথে। একবার ইয়েমেন থেকে আসা একদল লোককে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনারা কারা?’

তিনি তাদের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চাচ্ছিলেন। ইয়েমেনি লোকগুলো জবাব দিলো,

نحن المتوكلون

‘আমরা হচ্ছি মুতাওয়াক্কিল-আমরা আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলকারী।’

ইবনু আবিদ দুনইয়া বললেন, ‘তোমরা মুতাওয়াক্কিলুন না, তোমরা হলে মুতাওয়াক্কিলুন (متوكلون)।’

মুতাওয়াক্কিলুন মানে যারা একে অপরের ওপর নির্ভর করে। আল্লাহর ওপর না। তিনি বললেন,

‘তোমরা হলে মুতাওয়াক্কিলুন। প্রকৃত মুতাওয়াক্কিলুন তো তারা, যারা আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রাখেন এবং জমিতে বীজ বপণ করেন।’

এ সবই আর-রাযযাকের ওপর বিশ্বাস করার অংশ। আপনার অন্তর সব সময় আপনার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর দিকে ঝুঁকে থাকবে। সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন তিনিই। আর-রাযযাকের ওপর ঈমান আনতে হলে আমাদের বিশ্বাস করতে হবে, কোনো আসবাব বা উপকরণ আমাদের লাভ বা ক্ষতি করতে পারে না। আসবাব-উপকরণ আমাদের কিছু দিতেও পারে না, আমাদের কাছ থেকে কিছু নিতেও পারে না। রিয়কের ফয়সালা এবং হুকুম হয় আমাদের মালিকের কাছ থেকে। রিয়ক দেয়ার মালিক আল্লাহ, আর-রাযযাক।

এ বিষয়ে সাহল ইবনু আবদুল্লাহ আত-তুসতারী^[২১] (رحمته) স্বর্ণ দিয়ে বাঁধাই করে রাখার

[২০] ইনি হচ্ছেন ইমাম আবু বাকর আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ (رحمته) যিনি ইবনু আবিদ দুনইয়া নামেই পরিচিত। জন্ম বাগদাদে ২০৮ হিজরিতে, মৃত্যু বাগদাদে ২৮১ হিজরিতে। হাফিযুল হাদীস ছিলেন, বিপুল পরিমাণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।

[২১] ইমাম সাহল বিন আব্দিল্লাহ আত-তুসতারী (رحمته) ছিলেন প্রথম যুগের তাসাওউফের ইমামদের অন্যতম। তাঁর জন্ম ২০৩ হিজরিতে ইরানের খুজিস্তান প্রদেশের শুশতার বা তুসতারে। মৃত্যু ২৮৩ হিজরিতে ইরাকের বসরায়। তাঁর প্রখ্যাত রচনা হচ্ছে এক খণ্ডের সংক্ষিপ্ত তাফসির, ‘তাফসিরুত তুসতারী’।

মতো একটি কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আসবাব বা উপকরণকে অবহেলা করল, সে সুম্মাহকে অবহেলা করল। আর যে তাওয়াক্কুলকে অবহেলা করল, সে ঈমানকেই উপেক্ষা করল। তাওয়াক্কুল করা ঈমানের অংশ আর আসবাব বা উপকরণ ব্যবহার করা নবী (ﷺ)-এর সুম্মাহ। যে নবীর আদর্শ অনুসরণ করতে চায়, সে কোনোভাবেই নবীর সুম্মাহকে পরিত্যাগ করতে পারে না।’

বান্দা সাধ্যমতো চেষ্টা করবে, কিন্তু অন্তর জুড়ে থাকবে আল্লাহর সাথে

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সীরাত পড়ে দেখুন। তিনি আসবাব বা উপকরণ ব্যবহার করেছেন। দুনিয়ার বুকে কে আছে যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর চেয়েও বেশি আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করতে পারে? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তেই আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করতেন। সেই সাথে সম্ভাব্য সব আসবাব তথা উপকরণ ব্যবহার করতেন। মক্কা থেকে মদীনায হিজরতের কথাই ধরুন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং আবু বাকর (রাঃ)-এর মাথার জন্য ১০০ উটের পুরস্কার ঘোষণা করেছিল কুরাইশ। তাদের চোখে ধুলো দিয়ে মদীনার পৌঁছানোর জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। সাধারণ রুটের বদলে ভিন্ন রুট ব্যবহার করেছিলেন। আত্মগোপন করেছিলেন পাহাড়ের গুহায়।

তিনি কি তাঁর সঙ্গী আবু বাকর (রাঃ)-কে বলেছিলেন, ‘আবু বাকর, এই পৃথিবীর বুকে হেঁটে বেড়ানো মানুষদের মধ্যে আমি সর্বশ্রেষ্ঠ। আর নবীদের ঠিক পরেই তোমার স্থান। কুরাইশ আমাদের মাথার জন্য ১০০ করে উট পুরস্কার ঘোষণা করেছে তো কী হয়েছে! আল্লাহ আমাদের রক্ষা করবেন। চলো, এ রকম পালিয়ে বেড়ানোর বদলে আমরা খোলা মরুভূমিতে শুয়ে কিছুটা বিশ্রাম নিই। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করবেন!’

তিনি (ﷺ) কি এ রকম বলেছিলেন? এটা কি আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করা? না, এটা কখনোই তাওয়াক্কুল না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সম্ভাব্য সব কৌশল কাজে লাগিয়েছিলেন। সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না, এমন এক গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং আবু বাকর (রাঃ)-কে সাহস জুগিয়ে বলেছিলেন,

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

‘দুঃখ পেয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন।’ [সূরা আত তাওবাহ, ৯: ৪০]^[২২]

[২২] সহীহ বুখারীর হাদীস নং : ৩৬৫৩ বর্ণনা অনুযায়ী তিনি (ﷺ) বলেছিলেন, ‘হে আবু বাকর, সেই দুজনের ব্যাপারে তোমার কী ধারণা, যাদের সাথে তৃতীয়জন হচ্ছেন আল্লাহ স্বয়ং?’

আমরা আসবাব ব্যবহার করব, উপকরণ ব্যবহার করব, কিন্তু অন্তরে থাকবে আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল। অনেক সময় আমাদের হাতে কোনো উপকরণ না থাকতে পারে। সেই ক্ষেত্রে উপকরণ ব্যবহার করার সুযোগ নেই। কিন্তু যখন সম্ভব হবে, আমরা উপকরণ ব্যবহার করব। দু-ক্ষেত্রেই আমাদের অন্তর জুড়ে থাকবে আল্লাহর সাথে। আসবাব আপনার প্রয়োজন পূরণ করতে পারে না, আপনার প্রয়োজন পূরণ করেন একমাত্র আল্লাহ (ﷻ)। কিন্তু আল্লাহর ওপর ভরসা করে আসবাব বা উপকরণ কাজে লাগাতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন ক্ষুধার্ত হতেন তখন তিনি (ﷺ) কি আসমান থেকে থালা ভর্তি খাবার নেমে আসার আশায় ঘরে বসে থাকতেন? নাকি খাবারের সন্ধান করতেন, তারপর খাবার প্রস্তুত করে খেতে বসতেন?

বদরের যুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাস বদলে দেয়া এক যুদ্ধ। ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ১ হাজার কুরাইশদের বিরুদ্ধে ছিলেন মাত্র ৩১৩ জন সাহাবী (رضي الله عنهم)। এক অসম লড়াই। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কি বদরের প্রান্তে সাহাবীদের জড়ো করে বলেছিলেন, ‘তোমরা অস্ত্র নামিয়ে রাখো, আর আল্লাহর কাছে দু’আ করো। শত্রুরা যত কাছাকাছি আসবে তোমরা তত বেশি করে দু’আ করবে। চিৎকার করে করে দু’আ করবে। এতেই শত্রুরা পরাজিত হয়ে যাবে।’ তিনি (ﷺ) কি এ রকম বলেছিলেন?

না। তিনি লড়াই করেছিলেন। তিনি দু’আ করেছিলেন আবার সব রকম প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন। বদরের দিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দীর্ঘ সময় নিয়ে দু’আ করেছিলেন। দু’আয় মগ্ন থাকা অবস্থায় তাঁর শরীরের উর্ধ্বাংশের কাপড় সরে গিয়েছিল। আবু বাকর (رضي الله عنه) এসে সেই কাপড় তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু দু’আ শেষ হবার পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কী করলেন?

তিনি সাহাবী (رضي الله عنهم)-দেরকে সারিবদ্ধ করলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁদের অবস্থান ঠিক করে দিলেন। এমনভাবে অবস্থান সাজালেন যাতে কুরাইশরা পানির কুয়োগুলোর দখল নিতে না পারে। তারপর সাহাবী (رضي الله عنهم)-দের বললেন, ‘ওদেরকে কাছে আসতে দাও। যতক্ষণ না ওদের চোখের সাদা অংশ তোমরা দেখতে পাবে—ততক্ষণ আক্রমণ করবে না। যখন ওরা কাছে চলে আসবে তখন আক্রমণ শুরু করবে।’^[২৩]

রিয়কের ব্যাপারটিও এ রকম। আপনার পক্ষে যা যা করা সম্ভব সব করবেন এবং পুরোটা সময় জুড়ে আল্লাহর ওপর ভরসা করবেন। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ

[২৩] আল্লামা শফিউর রাহমান মুবারাকপুরী (رحمته الله), আর রাহীকুল মাখতুম

(مع بعض التعديلات والزوائد من د علاء الدين زعتري وغسان محمد رشيد الحموي), পৃষ্ঠা : ১৫৭-৫৮

‘তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি ভূমিকে তোমাদের অধীন করে বানিয়েছেন। তোমরা (যখন যেভাবে চাও) এর অলিগলির মধ্য দিয়ে চলাচল করো এবং এর থেকে উদ্গত রিয়ক তোমরা উপভোগ করো।’ [সূরা আল মুলক, ৬৭:১৫]

লক্ষ করুন, আল্লাহ এই আয়াতে ‘ফামশু’ (فَأْمْسُوا) বলেছেন। এর অর্থ কী? (فَأْمْسُوا) এর অর্থ হলো: হাঁটা, খোঁজা, তালাশ করা। অর্থাৎ রিয়কের খোঁজ করো, চেষ্টা চালাও। আল্লাহ কিম্ব বলেননি, রিয়ক তোমাদের বাসায় নিজেই হাজির হবে। ‘ফামশু’ শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে আল্লাহ (ﷻ) বলছেন তোমরা ঘর থেকে বের হও, রিয়কের তালাশ করো, তোমার নাগালে থাকা উপায়গুলোকে কাজে লাগাও।

আরেকটি বিষয় খেয়াল করুন। (فَأْمْسُوا) এর দ্বারা আল্লাহ বলছেন রিয়কের জন্য তোমরা পৃথিবীর অলিগলিতে ‘হেঁটে’ বেড়াও। তিনি কিম্ব বলেননি তোমরা ছোট্টাছুটি করো। হাঁটা আর ছোট্টাছুটি করার মধ্যে পার্থক্য আছে।

সুবহান আল্লাহ! আল্লাহর কালাম কত সুন্দর! আল্লাহ আমাদের বোঝাতে চাচ্ছেন, তোমরা রিয়কের জন্য চেষ্টা করবে ঠিক আছে। কিম্ব এ নিয়ে পেরেশান হয়ে যেয়ো না। এ নিয়ে বেপরোয়া হয়ে যেয়ো না। সবকিছু ভুলে উদ্ভ্রান্তের মতো রিয়কের পেছনে ছোট্টাছুটি করার প্রয়োজন নেই। রিয়কের জন্য হেঁটে দেখো, কিম্ব তেজি ঘোড়ার মতো ছোট্টাছুটি করবে না। দুনিয়ার জন্য পেরেশান হবে না।

মারইয়াম (ﷺ)-এর যখন প্রসববেদনা উঠল তখন আল্লাহ মারইয়াম (ﷺ)-কে বলেছিলেন,

وَهَٰؤُلَآءِ إِلَيْكَ يَجِدُكَ تَائِيلاً تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا

‘তুমি এ খেজুর গাছের কাণ্ড তোমার দিকে নাড়া দাও, দেখবে তা তোমার ওপর পাকা ও তাজা খেজুর ফেলছে।’ [সূরা মারইয়াম, ১৯: ২৫]

আপনারা যারা খেজুর গাছ দেখেছেন তারা বলুন তো, খেজুর গাছ নাড়িয়ে কি খেজুর পাড়া যায়? খুব শক্তিশালী পালোয়ানও কি খেজুর গাছ ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে খেজুর পাড়তে পারবে? পারবে না। সম্ভব না। তাহলে প্রসববেদনায় কাতরাতে থাকে একজন নারী কীভাবে পারবে? আল্লাহ কেন মারইয়াম (ﷺ)-কে খেজুরের কাণ্ড ধরে নাড়া দিতে বললেন? আল্লাহর পক্ষে কি ঝাঁকুনি দেয়া ছাড়াই মারইয়াম (ﷺ)-এর কাছে খেজুর পৌঁছে দেয়া সম্ভব ছিল না?

আল্লাহ (ﷻ) এখানে মারইয়াম (ﷺ)-কে এবং আমাদের একটি বিষয় শেখাচ্ছেন। শিক্ষাটি তাওয়াক্কুলের। হে মারইয়াম, তুমি আল্লাহর ওপর ভরসা করো। সেই সাথে তোমার সাধ্যমতো চেষ্টা করো। গাছটা ধরে তোমার সাধ্যমতো নাড়া দেয়ার চেষ্টা করো।

বাকিটা আল্লাহর ওপর ছেড়ে দাও।

চাকরির জন্য সিভি জমা দিন, ইন্টারভিউ দিতে যান। ব্যবসা করুন। আপনার সাধ্যমতো যা করার আছে, করুন। কিন্তু সব সময় মাথায় রাখতে হবে, এগুলো আপনার রিয়ক নির্ধারণ করে না। আপনার রিয়ক আসে আসমান থেকে। আপনার জন্য যদি কোনো রিয়ক নির্ধারণ করা থাকে, তাহলে দুনিয়ার কেউ আপনাকে সেই রিয়ক থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না। ঠিক একইভাবে, কোনো রিয়ক থেকে আল্লাহ যদি আপনাকে বঞ্চিত করতে চান, তাহলে দুনিয়ার সবাই চেষ্টা করলেও আপনি সেই রিয়কের নাগাল পাবেন না। আপনি কাজ করবেন, চাকরি করবেন, ব্যবসা করবেন ঠিকই; কিন্তু আপনার পূর্ণ ভরসা থাকবে আল্লাহর ওপর। যদি আপনি মনে করেন আপনার চাকরি আপনাকে খাওয়ায়, আপনার ব্যবসা আপনাকে খাওয়ায়, তাহলে বুঝতে হবে আর-রাযযাকের ওপর আপনি পরিপূর্ণ ঈমান আনতে পারেননি। আপনি ঠিকমতো বিশ্বাস করতে পারেননি যে আল্লাহ হলেন আর-রাযযাক। যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন আপনার ঈমানে অপূর্ণতা রয়ে গেছে।

ইব্রাহীম ইবনু আদহাম (ؒ)^[২৪] একবার মাংস কাটছিলেন। একটা বিড়াল এক টুকরো মাংস মুখে নিয়ে পালাল। ইব্রাহীম ইবনু আদহাম খেয়াল করে দেখলেন বিড়ালটি মাংস খাচ্ছে না। খোলা মাঠের মধ্যে এক গর্তের পাশে মাংসের টুকরো সে রেখে দিয়েছে। ইব্রাহীম ইবনু আদহাম বিড়ালের পিছু পিছু গিয়ে পুরো ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিলেন। বিড়ালটা মাংস খেলো না কেন?

হঠাৎ গর্ত থেকে বের হয়ে এল একটা অন্ধ সাপ। তারপর মাংসের টুকরো মুখে নিয়ে ফেরত গেল গর্তের ভেতরে। সাপ আর বিড়াল একে অপরের শত্রু। তাদের মধ্যে সম্পর্ক শিকার আর শিকারির। অথচ এই বিড়ালকে দিয়ে আল্লাহ সাপের কাছে রিয়ক পাঠালেন। ইব্রাহীম ইবনু আদহাম তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ! সকল প্রশংসা সেই মহান সত্তার, যিনি শত্রুর মাধ্যমেও রিয়কের ব্যবস্থা করে দেন।’

পূর্ববর্তীদের অনেকে দু’আ করতেন,

اللهم يا من يرزق النعاب في عشه ارزقني

‘ইয়া আল্লাহ, আপনি আমাকে সেভাবেই রিয়ক দান করুন, যেভাবে আপনি অসহায়

[২৪] তিনি ছিলেন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা’আতের প্রখ্যাত ইমাম, পুরো নাম আবু ইসহাক ইব্রাহীম বিন আদহাম। তিনি আফগানিস্তানের বলখের লোক ছিলেন। জন্ম ১০০ হিজরি, মৃত্যু ১৬২ হিজরি।

ছোট কাক শাবককে তার বাসায় রিয়ক দান করেন।^[২৫]

আরবীতে কাককে বলা হয় গুরাব। কাকের ছোট বাচ্চাকে বলা হয় নাআ'বাতুন। কাক কিন্তু খুব বুদ্ধিমান প্রাণী। কাকের বাচ্চা ডিম ফেটে বের হবার পর খুব অসহায় থাকে। চোখ ফোটেনি, ওজন ১০ গ্রামের একটু বেশি। ছোট, অসহায় একটা প্রাণী। কাকের বাচ্চার গায়ের ওপর লেপ্টে থাকে গোলাপি চামড়ার একটা পাতলা আবরণ। কাক যখন দেখে তার বাচ্চার রং কালো না, গোলাপি তখন সে দীর্ঘ সময়ের জন্য সেই বাসা থেকে বের হয়ে পড়ে। এর দুটো কারণ হতে পারে। হয় গোলাপি রং দেখে সে ভাবে এটা তার বাচ্চা না, তাই হতাশ হয়ে বের হয়ে যায়। অথবা সে বাচ্চার জন্য খাবার আনতে বের হয়। যে কারণেই বের হোক, বাচ্চা তখন বাসায় একা। আনুমানিক ৩০ মিনিট পরপর তার খাওয়া দরকার। নইলে সে বাঁচবে না। কিন্তু মা তো বের হয়ে গেছে। এখন তাকে কে খাওয়াবে?

এই হলো আন-নাআ'বাহ এর অবস্থা। এই দৃষ্টিহীন, শক্তিহীন, অসহায় শিশুকে কে খাওয়ায়?

আল্লাহ! আর-রাযযাক!

আল্লাহই এই অসহায় নিঃসঙ্গ শিশুর কাছে ছোট ছোট পোকামাকড়, ঘাসফড়িং, মাকড়সা ইত্যাদি পাঠান। ছোট ছানার ঠোঁট দেখে আগ্রহী হয়ে ওরা কাছে চলে আসে। ঠোঁটের সাথে লেগে যায়। এভাবে সে খেতে পায়। তারপর একসময় মা বাড়ি ফিরে আসে, দেখে বাচ্চার পালকের রং কালো। তখন সে বোঝে এটা আসলে তারই বাচ্চা, একে খাওয়াতে হবে। এভাবে আল্লাহ আন নাআ'বাহকে রিয়ক দেন।

এজন্য সালাফদের অনেকে দু'আ করতেন, 'ইয়া আল্লাহ, আপনি আমাকে সেভাবেই রিয়ক দান করুন, যেভাবে আপনি অসহায় ছোট কাক শাবককে রিয়ক দান করেন।'

অবলা, নিঃসঙ্গ, পরিত্যক্ত কাকের ছানার খাবারের ব্যবস্থা করেন কে? কে নিঃসহায় অন্ধ সাপের দোরগোড়ায় মাংসের টুকরো পৌঁছে দেন তার শত্রুর মাধ্যমেই? কে সেই মহান সত্তা?

আর-রাযযাক।

هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَىٰ تَوْفُكُونَ

[২৫] বিভিন্ন গ্রন্থে দু'আটি দাউদ (রাঃ)-এর দু'আ হিসেবে বর্ণিত আছে। যেমন : আদ দিনওয়ারী (রাঃ), আল মাজালিসাহ : ১৩৫৩; ইবনুল আদিম (রাঃ), বুগইয়াতুত তালিব : ৭/৩৪২৯; ইমাম আবু নু'আইম (রাঃ), আল হিলইয়াহ : ৫/১৮৩; ইমাম ইবনু আসাকির (রাঃ), তারিখু দিমাশক : ১৭/১০৭, তবে এগুলোর সনদ দুর্বল। মূলত দু'আটি উমার বিন সাঈদ (রাঃ)-এর করা।

‘আল্লাহ তা’আলা ছাড়া কি তোমাদের আর কোনো স্রষ্টা আছে, যে তোমাদের আসমান ও যমীন থেকে রিয়ক সরবরাহ করে; তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনোই মাবুদ নেই। তারপরও তোমরা কীভাবে ফিরে যাচ্ছ?’ [সূরা ফাতির, ৩৫: ৩]

আল্লাহ ছাড়া কি আর কোনো সৃষ্টিকর্তা আছে? আসমান ও যমীনে কি আর কোনো রিয়কদাতা আছে?

তাহলে কী আমাদের বিভ্রান্ত করল?

রিয়ক শুধু দুনিয়াবি সম্পদ না

মানুষ রিয়ককে খুব সংকীর্ণভাবে ব্যাখ্যা করে। আমরা রিয়ককে দেখি বস্ত্রবাদী চোখে। রিয়ক যেন শুধু টাকা-পয়সা, গাড়ি-বাড়ি। এ কারণে অনেকে দারিদ্র্যের কথা বলে হতাশ করে। নিচের উদাহরণটা লক্ষ করুন।

ইবনুস সাম্মাক^[২৬] (رضي الله عنه) নামে একজন দাঈ ছিলেন খলীফা হারুনুর রশীদের উপদেষ্টা। খলীফা সব সময় তাঁকে নিজের সঙ্গে রাখতেন যাতে ইবনুস সাম্মাকের ইলম থেকে উপকৃত হতে পারেন। খলীফা হারুনুর রশীদের সময় ইসলামী খিলাফাহ এত বিস্তৃত হয়েছিল যে, তিনি মেঘের দিকে তাকিয়ে বলতেন, হে মেঘ, তুমি যেখানে চাও সেখানে গিয়ে বৃষ্টি হয়ে নামো। কারণ, একসময় তোমার সম্পদ আমার কাছেই ফিরে আসবে।

তো হারুনুর রশীদ একগ্লাস ঠান্ডা পানি চাইলেন। তিনি বারবার পানি চাচ্ছিলেন কিন্তু আশেপাশে সাড়া দেবার কেউ ছিল না। ইবনুস সাম্মাক খলীফার সাথেই ছিলেন। শেষ পর্যন্ত ঠান্ডা পানি এল। খলীফা সেই পানি মুখে দেয়ার আগে ইবনুস সাম্মাক প্রশ্ন করলেন,

‘ইয়া আমীরুল মুমিনীন, মনে করুন দুনিয়াতে শুধু এই এক গ্লাস পানিই অবশিষ্ট আছে। পানি পেতে হলে দাম দিতে হবে। এই এক গ্লাস পানির জন্য আপনি কী দাম দেবেন?’

খলীফা উত্তর দিলেন, ‘আমি আমার রাজ্যের অর্ধেক দিয়ে দেবো। প্রয়োজনে আরও বেশি।’

[২৬] তাঁর নাম ছিল আবু আমর উসমান বিন আহমাদ আদ দাক্কাক, তিনি ইবনুস সাম্মাক নামেই পরিচিত। মৃত্যু ৩৪৪ হিজরিতে। তিনি ছিলেন ইরাকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ এবং নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারী। তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ আদ দিবাজ, আল আমালী, ওয়াফাতুশ শুযুখ।

খলীফা পানি পান করলেন। ইবনুস সাম্মাক আবার প্রশ্ন করলেন,

‘ইয়া আমিরুল মুমিনীন, যদি দাম দেয়া ছাড়া এই পানির বর্জ্য দেহ থেকে বের করতে না পারেন, তাহলে কী দাম দেবেন?’

অর্থাৎ যদি আপনি প্রশ্নাব করতে না পারেন, তাহলে প্রশ্নাব করার জন্য আপনি কী দাম দিতে রাজি আছেন?

খলীফা বললেন, ‘তাহলে আমার রাজ্যের বাকি অর্ধেক দিয়ে দেবো। আর যদি এর চেয়ে বেশি থাকে বা দরকার হয়, তাহলে এর চেয়ে বেশিও দেবো।’

খলীফার উত্তর শুনে ইবনুস সাম্মাকের দুচোখ বেয়ে পানি পড়তে শুরু করল। তিনি বললেন,

‘পান করুন ইয়া আমিরুল মুমিনীন, পান করুন। আল্লাহ আপনাকে পান করাক। আফসোস সেই রাজত্বের জন্য, যা এক চুমুক পানিও কিনতে পারে না।’^[২৭]

আমি যখন ছোট ছিলাম তখন শাইখ কিশক^[২৮] (رحمته الله)-এর কবিতা মুখস্থ করতাম। শাইখের বয়ান শুনতাম। আল্লাহ তাঁকে অসাধারণ বাগ্মিতা দিয়েছিলেন। ইরানের শাহ (বাদশাহ) যখন মারা গেল তখন তিনি বলেছিলেন,

‘যা আছে তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকো,

কেবল মনের সন্তুষ্টি নিয়েও তখন নিজেকে রাজা মনে হবে।

যারা জীবনভর শাসন করল তাদের দিকে তাকিয়ে দেখো

কাফনের কাপড় ছাড়া এ দুনিয়া থেকে তারা আর কী নিয়ে গেল?’

আমরা কীভাবে রিয়কের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন মনে করে দেখুন। রিয়ক শুধু দুনিয়াবি সম্পদ না। অর্থকড়ি, ব্যাংক ব্যালেন্সই শুধু রিয়ক না। সবচেয়ে বড় রিয়ক তো হলো আপনার আকীদাহ, আপনার ঈমান, আপনার বিশ্বাস। এর চেয়ে বড় কোনো রিয়ক নেই।

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

‘আর আজ, আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণ করলাম, তোমাদের

[২৭] ঘটনাটি রয়েছে ইমাম ইবনুল ইমাদ আল হাম্বলী (رحمته الله)-এর শাযারাতুয যাহাব ফি আখবারি মান যাহাব : ১/৩৩৬ এ।

[২৮] শাইখ আব্দুল হামীদ কিশক (رحمته الله)-এর জন্ম ১০ মার্চ, ১৯৩৩ সালে মিসরের শুবরা খীতে। মৃত্যু ৬ ডিসেম্বর ১৯৯৬ সালে কায়রোয়। তিনি খতিব হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। সেকালেই তার ২০০০ টেপ প্রচারিত হয়েছিল। এর পাশাপাশি তিনি ৩০টি মূল্যবান গ্রন্থের লেখক।

ওপর আমার অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য একমাত্র মনোনীত জীবনব্যবস্থা হিসেবে নির্ধারণ করলাম।’ [সূরা মায়িদাহ, ৫: ৩]

রিয়কের জন্য তাকদীর মেনে নেওয়া, বিশ্বাস করা আকীদাহর অংশ। যে মুহূর্তে আপনি অন্তরে এ বিষয়টি গেঁথে নিতে পারবেন, সেই মুহূর্ত থেকেই আপনি পাবেন প্রশান্তিময়, মুক্ত, স্বাধীন এক জীবন। আর-রাযযাকের ওপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস না থাকা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

সুনানু আবি দাউদের এক সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

مَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ . وَمَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِاللَّهِ فَيُوشِكُ اللَّهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ

‘কেউ যদি অভাব-অনটনে পড়ে তা মানুষের কাছে উপস্থাপন করে, তাহলে তার অভাব-অনটন দূর হবে না। আর যে ব্যক্তি অভাব-অনটনে পড়ে তা আল্লাহ তা’আলার নিকট উপস্থাপন করে, আল্লাহ তা’আলা অবশ্যই তাকে দ্রুত অথবা বিলম্বে রিয়ক দান করেন।’^[২৯]

রিয়কের ওপর তাদের মিথ্যা উপাস্যদের কোনো মালিকানা নেই

এই আয়াতটির দিকে লক্ষ করুন,

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقٌ أَمِّنَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ
‘এরা কি আল্লাহ তা’আলাকে বাদ দিয়ে তাদের বানানো মাবুদদের উপাসনা করে, যাদের আকাশমণ্ডলী ও যমীনের কোথাও থেকে কোনোপ্রকারের রিয়কের মালিকানা নেই এবং তারা (মালিক হতে) সক্ষমও নয়?’ [সূরা নাহল, ১৬: ৭৩]

মনোযোগ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করুন। দেখুন, আল্লাহ এই আয়াতে রিয়কান (رِزْقٍ) এবং শাইয়্যান (شَيْئًا) এ দুটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। আয়াতে এই দুটি শব্দ না থাকলেও মূল অর্থ একই থাকত। তবু কেন আল্লাহ এই দুটি শব্দ ব্যবহার করলেন? কুরআন সূক্ষ্ম। কুরআনের প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি অক্ষরের অবস্থানের পেছনে কারণ আছে। তাই প্রশ্ন হলো সূরা নাহলের ৭৩ নম্বর আয়াতে এ দুইটি শব্দ ব্যবহারের পেছনে হিকমাহ কী? একমাত্র আল্লাহই রিয়ক দেন—এই বক্তব্যকে এই দুটি শব্দ দিয়ে জোরালো করা হয়েছে এবং সত্যায়ন করা হয়েছে।

উসুলের একটি নিয়ম হলো,

[২৯] সুনানুত তিরমিযি, হাদীস নং : ২৩২৬, ইমাম তিরমিযি (رحمته الله) বলেছেন হাদীসটি হাসান সহীহ গরিব। মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং : ৪২১৯, আল্লামা শু’আইব আরনাউত্ব (رحمته الله)-এর মতে সহীহ।

النكرة فى سياق الإثبات تفيد الإطّاق

‘ইসবাত (সত্যায়নের) ক্ষেত্রে নাকিরাহ প্রয়োগ হলে তা সাধারণকরণের অর্থ বোঝায়।’

এই আয়াতের রিয়ক্কান এবং শাইয়্যান শব্দ দুটো এসেছে ইসমে নাকিরাহ (اسم نكرة) বা অনির্দিষ্টতাবাচক বিশেষ্য হিসেবে। এই দুটো বাড়তি শব্দ অনির্দিষ্টতাবাচক বিশেষ্য। উসুলের নিয়ম হলো কোনো সাধারণ বাক্যে (general statement) কোনো কিছুই ঘোষণা, প্রতিষ্ঠা কিংবা সত্যায়নের জন্যে যখন ইসমে নাকিরাহ বা অনির্দিষ্টতাবাচক বিশেষ্য ব্যবহার করা হয় তখন সেটা চূড়ান্ত, শর্তহীন, সুনিশ্চিত অর্থ প্রকাশ করে।

আমি বিষয়টা ভেঙে বলছি। এই নিয়মগুলো এমনিতেই জটিল। আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় বোঝাতে গেলে ব্যাপারগুলো আরও জটিল হয়ে যায়। তাই আমি ভেঙে ভেঙে বোঝানোর চেষ্টা করছি।

ধরুন, কোনো বাক্যে কোনো কিছুই সত্যায়ন করা হচ্ছে। সাক্ষ্য দেয়া হচ্ছে। ঘোষণা দেয়া হচ্ছে। কোনো বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। এ ধরনের বাক্যে ইসমে নাকিরাহ বা অনির্দিষ্টতাবাচক বিশেষ্য ব্যবহার করা হলে সেটি শর্তহীন এবং পরিপূর্ণ অর্থ ধারণ করবে। অর্থাৎ যা বলা হচ্ছে তা-ই চূড়ান্ত। তা শর্তহীনভাবে সব অবস্থায় প্রযোজ্য।

কোনো বাক্যে ইসমে নাকিরাহ ব্যবহার আবশ্যিক না হওয়া সত্ত্বেও যখন তা ব্যবহার করা হয়, তখন সেটি মূল বক্তব্যকে আরও জোরালো করে। মূল বক্তব্যকে একটি চূড়ান্ত ও শর্তহীন অর্থ দেয়। অর্থাৎ এই বাক্যে যা বলা হচ্ছে তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এর কোনো ব্যতিক্রম হবে না। কাজেই এই আয়াতে রিয়ক্কান ও শাইয়্যান শব্দদুটি বোঝাচ্ছে, আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদাত মুশরিকরা করে, রিয়কের ওপর তাদের কারও কোনো ক্ষমতা নেই। বিন্দুমাত্র, এক চুল পরিমাণও কোনো নিয়ন্ত্রণ তাদের নেই। আল্লাহই রিয়ক নিয়ন্ত্রণ করেন। রিয়কের নিয়ন্ত্রণ যে আল্লাহর হাতে তা পরম, সন্দেহাতীত, সুনিশ্চিত, চিরন্তন বিষয়।

আরেকটু সহজ করে বলা যাক।

শাইয়্যান শব্দের অর্থ হলো, কোনো কিছু (anything)। এ আয়াতের শুরুতে আল্লাহ বলছেন, আল্লাহ ছাড়া যাদের উপাসনা করা হয়, উপাসনাকারীদের দেয়ার মতো কিছু তাদের নেই। আল্লাহ কেন এখানে আবার শাইয়্যান (কোনো কিছু/anything) শব্দটি ব্যবহার করলেন? আল্লাহ তো একবার বলছেন, তাদের কিছু নেই। তিনি আবার শাইয়্যান শব্দটি যোগ করলেন কেন?

ধরুন, ঘরভাড়া, বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি দেয়ার পর আপনার হাতে বেতনের টাকা অবাকি

আছে ১০ হাজার ৪ টাকা ৫০ পয়সা। আমি যদি প্রশ্ন করি, ‘তোমার কাছে এখন কত টাকা আছে?’ আপনি কী জবাব দেবেন?

আপনি বলবেন, ১০ হাজার টাকা। কিংবা বলবেন, ১০ হাজারের মতো। ৪ টাকা ৫০ পয়সা এত ছোট একটা সংখ্যা যে আপনি আলাদা করে এটা বলবেন না।

আরেকটা উদাহরণ দিই। ধরুন আমি প্রশ্ন করলাম, এখন কয়টা বাজে? আপনি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন ৭টা ৫৮ মিনিট ৫৯ সেকেন্ড। আপনি কী বলবেন এখন ৭টা বেজে ৫৮ মিনিট ৫৯ সেকেন্ড?

না! বরং আপনি বলবেন এখন ৮টা বাজে। কারণ দুটোর মধ্যে পার্থক্য এত ছোট যে, সেটা উপেক্ষা করা যায়।

আরেকটি উদাহরণ দেখা যাক। ধরুন একজন মানুষ গরিব। তার বলার মতো তেমন কোনো সম্পদ নেই। হয়তো হাজার বিশেক টাকা জমানো আছে। হঠাৎ তার অসুখ হলো। চিকিৎসার জন্য লাগবে পঞ্চাশ লাখ টাকা। কেউ প্রশ্ন করল, তার ধনসম্পদের কী অবস্থা? তাঁর আর্থিক অবস্থা কেমন? টাকাপয়সা কেমন আছে?

এই ক্ষেত্রে আমরা কী বলি? আমরা বলি, তার কিছুই নেই।

তার যে একেবারেই কিছু নেই, তা না। কিন্তু সেটা এখানে ধরার মতো না। যদিও তার অল্প হলেও আছে, কিন্তু সেই থাকাটা এত কম যে আমরা সেটাকে গোণায় ধরি না। এই ব্যক্তির অল্প কিছু টাকা আছে, কিন্তু সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় সেটি এতটাই ক্ষুদ্র, এতটাই তুচ্ছ যে, আপনি সেটাকে গোণার মধ্যেই ধরবেন না। ১০ হাজার ৪ টাকা ৫০ পয়সা, ৭টা বেজে ৫৮ মিনিট ৫৯ সেকেন্ড, কিংবা সামান্য সঞ্চয়ের মতো সামান্য পরিমাণগুলো আমরা হিসেবে ধরি না।

কিন্তু এই আয়াতে শাইয়্যান যোগ করে আল্লাহ বলছেন, আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদাত করা হয় তাদের কাছে কিছুই নেই। এই যে সামান্য পরিমাণ, যেটাকে আমরা গোণায় ধরি না, সেটুকুও তাদের কাছে নেই। ভগ্নাংশ পরিমাণও নেই। অণু পরিমাণও নেই। এই হলো এই আয়াতে শাইয়্যান ব্যবহারের অর্থ। আল্লাহ সব সন্দেহ, সব সন্তাবনা মুছে দিয়ে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন—রিয়কের মালিক কেবলই তিনি। এবং আল্লাহ চান আমরা যেন পরিপূর্ণভাবে আর-রাযযাকের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করি। আমাদের তাওহিদের মধ্যে যেন কোনো অসম্পূর্ণতা না থাকে। কোনো ফাঁকফোকর, কোনো গলদ যেন না থাকে। তাই বিষয়টি আল্লাহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন। রিয়কের সর্বময় কর্তৃত্ব এক আল্লাহর কাছে।

একইভাবে আয়াতে ‘রিয়কান’ শব্দটি ব্যবহার করে এ অর্থটি আল্লাহ আরও জোরালো করেছেন। অর্থাৎ এই আয়াতে আল্লাহ দুটি ইসমে নাকিরাহ ব্যবহার করেছেন। এভাবে একদম দিনের আলোর মতো স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে, মুশরিকরা যাদের উপাসনা করে, রিয়কের ওপর তাদের কোনো কর্তৃত্ব নেই। ০.০০০০০১ পরিমাণ রিয়কও তাদের কাছে নেই। এতটুকু কর্তৃত্বও তাদের কারও নেই।

আর-রাযযাক হলেন আল্লাহ। কেবল তিনিই রিয়ক প্রদান করেন এবং রিয়কের ওপর একমাত্র কর্তৃত্ব তাঁরই। এই হলো এই আয়াতে রিয়কান ও শাইয়্যান শব্দটি ব্যবহারের অর্থ। আশা করি বিষয়টা বোঝা গেছে।

আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করুন। এই আয়াতের শেষের দিকে বলা হয়েছে,

وَلَا يَسْتَبِغُونَ

‘এবং তারা সক্ষম নয়।’

আল্লাহ এখানে বলছেন, আল্লাহ ছাড়া যাদের উপাসনা করা হয় তারা অক্ষম। তাদের কোনো ক্ষমতা নেই। রিয়ক নিয়ন্ত্রণ করার কোনো সামর্থ্য, সক্ষমতা তাদের নেই।

‘নিয়ন্ত্রণ করে না’, আর ‘নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা নেই’ এই দুটি কথার মধ্যে কিন্তু ব্যাপক পার্থক্য আছে। অনেক সময় আমাদের কোনো কাজ করার ক্ষমতা থাকে কিন্তু সুযোগ থাকে না। সুযোগ পেলে আমি কাজটা করতে পারতাম। কিন্তু আল্লাহ বলছেন তাদের ক্ষমতাই নেই। সুযোগ পেলেও তারা সেটা করতে পারবে না। আল্লাহ আয়াতের শেষাংশে এ বিষয়টিও স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এ আয়াতে তিনি সাফ সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদাত করা হয়— তাদের দেয়ার মতো কিছু নেই। রিয়কের ওপর তাদের বিন্দুমাত্র নিয়ন্ত্রণ নেই। এবং তাদের কোনো সামর্থ্য নেই, ক্ষমতা নেই।

আজ দুঃশ্চিন্তা, হতাশা, ডিপ্রেসন, স্ট্রেস, অস্থিরতা, মানসিক বিপর্যয়ের সবচেয়ে বড় কারণ কী? পরীক্ষার রেসাল্ট, চাকরি, ব্যবসা, ক্যারিয়ার—রিয়ক। এগুলোর সমাধান কী জানেন? তাওহিদকে পরিপূর্ণ করা। আল্লাহ যে আর-রাযযাক তা সত্যিকারভাবে বোঝা, বিশ্বাস করা। একজন মানুষ যখন জানবে, এসব কিছু নির্ধারিত, সবকিছু আল্লাহর হাতে, তখন এই হতাশা-দুঃশ্চিন্তা-স্ট্রেস দূর হয়ে যাবে। মানুষ হৃদয়ে প্রশান্তি অনুভব করবে। তার নিজেকে অনেক হালকা মনে হবে। এগুলো আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিন। দুনিয়ার এসব ছোট ছোট বিষয় নিয়ে এত চিন্তা করার কী আছে? আখিরাত নিয়ে চিন্তা করুন।

আপনি যখন নিশ্চিত জানবেন, রিয়ক আসে একমাত্র আল্লাহর কাছ থেকে। পৃথিবীর

কোনো শক্তি আপনার রিয়কের সামান্যতম অংশও আটকিয়ে রাখতে বা কেড়ে নিতে পারে না। তখন কেউ আপনার অন্তরের শান্তি কেড়ে নিতে পারবে না।

আপনার অন্তর জুড়ে রাখুন আল্লাহর সঙ্গে। সব সময়। তাঁর ওপর আস্থা রাখুন। যদি চাকরির ভাইভাতে বা ভর্তি পরীক্ষায় ব্যর্থ হন, তাহলে হতাশ হবেন না। ভেঙে পড়বেন না। হাসিমুখে ব্যর্থতা গ্রহণ করে সামনে তাকান। ফয়সালা আসমাং হয়। ভাইভাবোর্ডে সূট-টাই পরে যারা আপনার সামনে বসে থাকে, আল্লাহর ফয়সালার বাইরে তারা আঙুলও নাড়াতে পারে না; একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারে না। আপনি ভাইভা দিতে যাচ্ছেন কারণ আল্লাহ আমাদের রিয়কের তলাশ করার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করতে বলেছেন। কিন্তু ভাইভা দিতে যাবার আগে, ভাইভার সময় এবং পরে, পুরোপুরিভাবে আস্থা থাকতে হবে আল্লাহর ওপর। দেহ থাকবে এই দুনিয়ায়, কিন্তু অন্তর যেন আল্লাহর স্মরণে লেগে থাকে।

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ

‘আর জেনে রাখুন, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের মধ্যবর্তী হয়ে থাকেন।’ [সূরা আল আনফাল, ৮: ২৪]

আর-রাযযাক পথ করে দেবেন

আফফান ইবনু মুসলিম আস-সাফফার^[৩০] (رحمته) ছিলেন ইমাম বুখারী (رحمته)-এর শিক্ষকদের একজন। মু'তায়িলা আর খালকে কুরআনের ফিতনা যখন দেখা দিলো তখন আলিমদের এ ব্যাপারে জেরা করা শুরু হলো।^[৩১] খলীফার লোকজন গিয়ে

[৩০] আফফান বিন মুসলিম আস-সাফফার ছিলেন ইরাকের প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ, হাদীসের নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। জন্ম ১৩৪ হিজরিতে মৃত্যু ২২০ হিজরিতে। তাঁর প্রখ্যাত ছাত্রের মধ্যে রয়েছেন আহমাদ বিন হাম্বল, আলী ইবনুল মাদিনী, আল ফালামাস ও ইমাম বুখারী (رحمته)।

[৩১] খলকে কুরআনের মাসআলা মুসলিম উম্মাহর ওপর আপতিত বড় বড় ফিতনাসমূহের একটি। এই পরীক্ষা আব্বাসী খলীফা মামুনের সময় শুরু হয়। এর প্রবর্তক ছিল মু'তায়িলারা। এদের দাবি ছিল, আল্লাহর কালাম মাখলুক বা সৃষ্ট এই হিসেবে কুরআন আল্লাহর সৃষ্ট বস্তু। অথচ কুরআন আল্লাহর নিজের কালাম বা কথা—যা তাঁর সন্তার মতোই অনাদি অনন্ত।

এই প্রসঙ্গে মু'তায়িলাদের ব্যাপারেও জানা দরকার। এই দলটি প্রবর্তন করে ওয়াসিল বিন আতা। এরা গ্রিক দর্শন দ্বারা খুব প্রভাবিত ছিল এবং এর আলোকে যুক্তির কষ্টিপাথরে শরীয়াহ মাপতে চাইত। ফলে যা কিছু অযৌক্তিক লাগত তা প্রত্যাখ্যান করত এবং শরীয়াহর মাঝে আপাতদৃষ্টিতে যা কিছু যুক্তিবিরোধী মনে হতো তাকে তাদের দৃষ্টিতে যৌক্তিক ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করত। এরা কুরআনকে আল্লাহর সৃষ্টি মনে করত, এদের মতে কবিরাত গুনাহগার না মুমিন না কাফির। মু'তায়িলারা পরকালে আল্লাহর দর্শনকে স্বীকার করে না, কবরের আযাব স্বীকার করে না। এ রকম আরও অনেক কুফরি আকীদাহ এদের রয়েছে। প্রসিদ্ধ মু'তায়িলা হচ্ছে আব্বাসী খলীফা মামুন, তাফসিরু কাশশাফের লেখক যামাখশারী, কাযিউল কুযাত আবুল হাসান আব্দুল জব্বার প্রমুখ।

গিয়ে আলিমদের প্রশ্ন করত—কুরআন সৃষ্টি কি না। মু'তাহিলারা বিশ্বাস করত, কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি। এটি বাতিল আকীদাহ এবং কুফর আকবর। সঠিক আকীদাহ হচ্ছে, কুরআন হলো কালামুল্লাহ। আল্লাহর কালাম। যাই হোক, আফফানকে জেরা করা হলো। গর্ভনরের পক্ষ থেকে এক লোক এসে তাকে বলল,

‘আপনাকে আমি কিছু প্রশ্ন করব। ওপরের নির্দেশ আছে। বলুন, কুরআন কি আল্লাহর সৃষ্টি নাকি কুরআন আল্লাহর কালাম?’

আফফান (ﷺ) প্রথম সূরা ইখলাসের প্রথম আয়াত পড়লেন,

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

‘বলুন (হে মুহাম্মাদ) তিনি আল্লাহ, একক/অদ্বিতীয়া।’ [সূরা ইখলাস, ১১২: ১]

তারপর ব্যাখ্যা দিতে শুরু করলেন। তিনি ছিলেন একজন আলিম, তাই তিনি বিস্তারিত বিষয়টা বোঝাতে শুরু করলেন।

প্রশ্নকর্তা তখন তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, ‘দেখুন, আমি আপনার সঙ্গে বিতর্ক করতে আসিনি। আমাকে বলা হয়েছে আপনাকে এই প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করতে। আপনি যা উত্তর দেবেন আমি সেটা লিখে নিয়ে যাব। আমার কাজ এতটুকুই। আপনাকে যখন ওরা জেলে ছুড়ে দেবে তখন ওদের ব্যাখ্যা করে বোঝাবেন। আর আপনার ভালোর জন্য বলি, আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি যেসব লোক বলেছে কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি, তাদেরকে ভালো চাকরি দেয়া হয়েছে। বেতন বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। তারা সুখে শান্তিতে আছে। আর যারা ‘কুরআনকে সৃষ্টি করা হয়েছে’, এই কথা মেনে নেয়নি, প্রথমে তাদের বেতন বন্ধ হয়েছে। তাদের পরিবারসহ উপোস করতে হয়েছে। তারপর আরও খারাপ পরিণতি হয়েছে। এখন বলুন আপনার উত্তর কী?’

আফফান ইবনু মুসলিম বললেন, ‘কুরআন আল্লাহর কালাম। কালামুল্লাহ। কুরআন সৃষ্টি না।’

প্রশ্নকর্তা এবার বলল, ‘আপনি কি জানেন, এই উত্তরের কারণে আপনার কপালে কী জুটবে?’ জবাবে আফফান (ﷺ) কুরআনের একটি আয়াত তিলাওয়াত করলেন। বলুন তো সেটা কোন আয়াত?

আফফান ইবনু মুসলিম সূরা আয-যারিয়াতের ২২ নম্বর আয়াত তিলাওয়াত করলেন। যে আয়াত নিয়ে আমরা কিছুক্ষণ আগে অনেক আলোচনা করেছি।

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ

‘আকাশে রয়েছে তোমাদের রিয়ক এবং তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত সবকিছু।’

এমন সময়েই অন্তরের তাওহিদ আত্মপ্রকাশ করে। এমন পরীক্ষার মুহূর্তে, এমন

নাজুক পরিস্থিতিগুলোতে আপনি বুঝবেন আপনার তাওহিদ আসলে কত মজবুত।

জেরাকারী আফফান ইবনু মুসলিমের উত্তর কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দিলো। তারপর যা হবার তা-ই হলো। তাঁর বেতন বন্ধ করে দেয়া হলো।

গভীর রাতে দরজায় করাঘাতের শব্দে ঘুম ভাঙল আফফানের। কে জানি খুব জোরে দরজায় কড়া নাড়ছে। আফফান ইবনু মুসলিম দরজা খুলে একজন বয়স্ক লোককে দেখতে পেলেন। লোকটি ছিল একজন তেল বিক্রেতা। তাঁর পরনের জামাকাপড় ছিল বেশ নোংরা। যারা তেল বিক্রি করত তাদের পরনের পোশাকে, শরীরে তেল লেগে থাকত। এটাকে খুব সম্মানিত কাজ মনে করা হতো না। কিন্তু এই তেল বিক্রেতাই উম্মাহর খেদমতের দায়িত্ব তুলে নিয়েছিলেন নিজের কাঁধে।

তেল বিক্রেতা আফফান বিন মুসলিমকে প্রশ্ন করলেন, ‘আপনি কে?’

আফফান তাঁর পরিচয় দিলেন। তেল বিক্রেতা এবার প্রশ্ন করলেন,

‘আপনি কি সেই ব্যক্তি, সত্য বলার অপরাধে সরকার আজকে যার বেতন বন্ধ করে দিয়েছে?’

‘হ্যাঁ, আমিই সেই ব্যক্তি।’

তেল বিক্রেতা তখন আফফানে হাতে একটি থলে দিয়ে বললেন, এর মধ্যে ১ হাজার দিনার আছে। যতদিন না আল্লাহ আপনার জন্য অন্য কোনো পথ খুলে না দেন, ততদিন প্রতিমাসের আজকের তারিখে আমি আপনার জন্য এমন একটা থলে নিয়ে আসব।

তেল বিক্রেতা হয়তো মসজিদে, বাজারে বা অন্য কোথাও শাইখ আফফানের ব্যাপারে শুনেছিলেন। আর হকের পক্ষ নেয়া এই আলিমকে সাহায্য করতে ছুটে এসেছিলেন গভীর রাতে। আফফান ইবনু মুসলিম প্রতিমাসে যে বেতন পেতেন তার চেয়ে এই টাকা ছিল বেশি।^[৩২] হকের পক্ষে অবস্থান নেয়ার কারণে এক বান্দা যখন আফফানের বেতন বন্ধ করে দিলো, আল্লাহ তখন আরও বেশি টাকা দিয়ে আরেক বান্দাকে আফফানের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।^[৩৩]

وَيِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ

‘আকাশে রয়েছে তোমাদের রিয়ক এবং তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত সবকিছু।’

[৩২] খলীফা মামুন ইমাম আফফান (رحمته الله)-কে প্রতিমাসে ৫০০ দিরহাম করে মাসোয়ারা দিতেন।- ইমাম যাহাবী (رحمته الله), সিয়াকু আ'লামিন নুবালা : ১০/২৪৪

[৩৩] পুরো ঘটনাটি রয়েছে ইমাম যাহাবী (رحمته الله)-এর সিয়াকু আ'লামিন নুবালা : ১০/২৪৪-৪৫ পৃষ্ঠায়।

আফসোস! আজকে আমাদের উম্মাহর মধ্যে এই তেল বিক্রেতার মতো গাইরাহ^[৩৪] সম্পন্ন মানুষের বড়ই অভাব। তবে নিশ্চিত থাকুন, যেই আল্লাহ আফফান ইবনু মুসলিমের জন্য এই তেল বিক্রেতাকে পাঠিয়েছিলেন, সেই আল্লাহই আপনার জন্য কোনো না কোনো কিছু ব্যবস্থা করে দেবেন। কেননা, তিনি হলেন আর-রাযযাক।

একটি গল্প দিয়ে আমাদের আজকের এই আলোচনা শেষ করব ইনশা আল্লাহ। এই গল্পটা আমাদের সবার জন্যই, তবে বিশেষভাবে আমাদের ওই বোনদের জন্য যাদের স্বামীরা আজ কারাগারে বন্দী। এটা আসলে গল্প না, বাস্তব ঘটনা। আমাদের বর্তমান সময়ের ঘটনা। মনোযোগ দিয়ে শুনুন। আমাদের সবার এই গল্প থেকে শিক্ষা নেয়া উচিত।

মিসরের এক ভাই গ্রেফতার হয়ে জেলে গেলেন। স্ত্রী আর দুই সন্তান নিয়ে গরিব ভাইটির ছোট সংসার। তিনি যখন জেলে গেলেন তাঁর স্ত্রী বাধ্য হলেন দুই সন্তানকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যেতে। আজ পৃথিবীজুড়ে অনেক মুসলিম পরিবারের সাথে এমন হচ্ছে।

এক রাতে আমাদের এই বোনের ছেলের মারাত্মক জ্বর এল। গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে। সেই বোনের অবস্থা একটু চিন্তা করুন। স্বামী জেলে। বাপের বাড়িতে অসহায় দিন কাটাচ্ছেন আশ্রিত হিসেবে। এত রাতে ছেলেকে নিয়ে কোথায় যাবেন তিনি? সাথে কোনো টাকা নেই। ডাক্তারের বিল, ওষুধের দাম, কোনো কিছু দেয়ার মতো সামর্থ্য নেই।

আমাদের বোন আল্লাহ আর-রাযযাককে ডাকতে শুরু করলেন। বুকভরা কষ্ট, আর আকুতি নিয়ে সিজদায় পড়ে মালিককে ডাকতে শুরু করলেন। কিছুক্ষণ ছেলের সেবা করছেন তারপর আবার উঠে গিয়ে সালাত আদায় করছেন। দু'আ করছেন চোখভর্তি পানি নিয়ে।

সন্তান যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে মায়ের মন তখন কেমন করে তা বোধহয় মা হওয়া ছাড়া বোঝা সম্ভব না। আমাদের জন্য তাঁরা যে কষ্ট সহ্য করেছেন, তাঁর বিনিময়ে আমার মা এবং আপনাদের সবার মাকে আল্লাহ জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন। আমাদের সেই বোন একবার ঠান্ডা পানিতে তোয়ালে ভিজিয়ে সন্তানের গা মুছে দিচ্ছেন, মাথায় জলপট্টা দিচ্ছেন। আর ফাঁকে ফাঁকে সালাত আদায় করছেন। গভীর, অন্ধকার রাতে আল্লাহর এই বান্দি আল্লাহকে ডাকছেন, আল্লাহর কাছে ভিক্ষা চাইছেন। এবং এটা

[৩৪] গাইরাহ/গাইরাত : আরবী غيرة বা গাইরাহ শব্দের অর্থ আত্মসম্মান, আত্মসম্মানবোধ, (ইংরেজিতে বলা হয় protective jealousy)। পারিভাষিকভাবে এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ইমাম যাইনুদ্দীন আর রাযী (رحمہ) বলেন, ‘স্বামী হিসেবে একজন পুরুষ তার পরিবার বা স্ত্রীর ব্যাপারে যে ঈর্ষা পোষণ করে তা হচ্ছে গাইরাহ’-মুখতারুস সিহাহ, পৃষ্ঠা : ২৩২

দু'আ করুলের খুব ভালো সময়।

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَّرَّ إِذَا دَعَاہُ

‘কে আতের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে?’ [সূরা আন-নামল, ২৭: ৬২]

হঠাৎ বাইরে করিডোরে পায়ের আওয়াজ। দরজায় ঠকঠক শব্দ। আমাদের বোন হিজাব পরে দরজা খুললেন। দেখলেন সাদা কাপড় পরা ডাক্তার দাঁড়িয়ে আছেন। আমি আবারও বলি, এটি অতীতের কোনো ঘটনা না। কয়েক শতাব্দী আগের কথা না। আমাদের সময়ের ঘটনা। বোন চমকে উঠলেন। এই সময়ে, এখানে একজন ডাক্তার কীভাবে এল? ডাক্তার জিজ্ঞেস করল, রোগী কোথায়?

তিনি ছেলেকে দেখিয়ে দিলেন। ডাক্তার রোগী দেখলেন, প্রেসক্রিপশান লিখলেন। আশ্বস্ত করলেন, গুরুতর কিছু হয়নি, কিছু ওষুধ দিলেই সেরে যাবে। তারপর বিলের কাগজ দিলেন।

‘এই যে, আমার ফী।’

ডাক্তার যখন হাউসকলে আসে তখন তাকে সাথে সাথে টাকা দিয়ে দিতে হয়। আমাদের বোন তখন বললেন, ‘আমার কাছে কোনো টাকা নেই, আমি আপনাকে কীভাবে ফী দেবো?’

ডাক্তার তখন বলল, ‘আপনার স্বামীকে ডাকুন। তিনিই তো আমাকে ফোন করেছিলেন। তিনি কোথায়?’

সেই বোন আরও অবাক হয়ে বললেন, ‘আমার স্বামী আপনাকে ফোন করেননি। তিনি তো আজ অনেক দিন যাবৎ জেলে।’

ডাক্তার ক্ষেপে গেল, ‘এটা কেমন কথা? আপনারা আমাকে এত রাতে ডেকে আনলেন। এখন বলছেন ফী দেয়ার টাকা নেই। আবার বলছেন ঘরে আপনার স্বামীও নেই! এটা কি ১৮ নম্বর ফ্ল্যাট না?’

‘না, এটা তো ১৮ নম্বর ফ্ল্যাট না। ১৮ নম্বর হলো আমাদের পাশের বাসা।’

এবার ডাক্তার অবাক হয়ে গেল।

সুবহান আল্লাহ!

তিনি ভুল দরজায় বেল দিয়েছিলেন। রাতের বেলা অপরিচিত বাসায় এটা হতেই পারে। কিন্তু ভুল করে ডাক্তার এমন এক ফ্ল্যাটেই বেল দিলেন যেখানে রোগী আছে, যার চিকিৎসা দরকার—এটা কীভাবে হলো? তিনি ভুল করে এ বাসাতে বেল দিলেন আর

এই বাসাতেই একজন রোগী পাওয়া গেল?

‘সুবহান আল্লাহ!’ ডাক্তার সাহেব আনমনে বলে উঠলেন।

এবার তিনি সেই বোনকে প্রশ্ন করলেন। আপনার পরিচয় কী? আপনারা আসলে কী ধরনের পরিস্থিতিতে আছেন? সবকিছু খুলে বলুন তো।’

বোন তাঁর অবস্থা খুলে বললেন। বলতে বলতে কাঁদতে শুরু করলেন। ডাক্তারও কাঁদতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, ‘ওয়াল্লাহি! আল্লাহর কসম! আল্লাহই আমাকে বিছানা থেকে উঠিয়ে আপনার ছেলের কাছে পাঠিয়েছেন। আমার গাড়িতে কিছু ওষুধ আছে আমি নিয়ে আসছি। আর এই টাকাগুলো রাখুন। প্রতি সপ্তাহে এসে একবার আপনাদের দেখে যাব।’

এরপর প্রতি সপ্তাহে ডাক্তার সাহেব ভদ্রমহিলার ছেলেকে দেখতে যেতেন এবং আর্থিকভাবে সাহায্য করতেন।

এ ঘটনার পর আমাদের এই বোন কারাগারে তার স্বামীর সাথে দেখা করার সময় মজা করে বলতেন, আপনি হয়তো জেলে আরও কিছুদিন থাকতে চাইবেন। আপনি যেভাবে আমাদের দেখাশোনা করতেন তার চেয়ে অনেক ভালোভাবে আল্লাহ আমাদের দেখাশোনা করছেন।

উসুলুস সালাসা কিতাবের দ্বিতীয় অধ্যায় নিয়ে আমাদের ধারাবাহিক দারস চলছে। গত দারসগুলোতে আমরা আলোচনা করেছি আল্লাহর রুবুবিয়াত নিয়ে। আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা এবং পালনকর্তা, তিনিই এক ও অদ্বিতীয় রিয়কদাতা, এ বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি।

লেখক, অর্থাৎ শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্‌হাব (رحمہ اللہ) এরপর আলোচনা করেছেন সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে। আল্লাহ আমাদের রব, তিনি আমাদের রিয়কদাতা। কিন্তু তিনি কেন আমাদের সৃষ্টি করেছেন? দুনিয়াতে আমাদের উদ্দেশ্য কী? নিশ্চয় মহান আল্লাহ আমাদের কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া সৃষ্টি করেননি। সেই উদ্দেশ্যটি কী?

এটা নিয়েই আমাদের আজকের আলোচনা। শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্‌হাব (رحمہ اللہ) বলেছেন,

أَنَّ اللَّهَ خَلَقَنَا وَرَزَقَنَا وَلَمْ يَتْرِكْنَا هَمَلًا

আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, রিয়ক দান করেছেন এবং তিনি আমাদেরকে দায়িত্বহীনভাবে ছেড়ে দেননি।

আসুন বিষয়টির আরেকটু গভীরে ঢোকা যাক।

হামলা কী?

লেখক বলছেন,

لَمْ يَتْرِكْنَا هَمَلًا

...তিনি আমাদেরকে দায়িত্বহীনভাবে ছেড়ে দেননি।

হামিল (هامل) বা হামলা (همل) শব্দের অর্থ কী?

বর্তমানে আরবীর বিভিন্ন আঞ্চলিক ও কথ্যরূপ তৈরি হয়েছে। তবুও হামিল শব্দটা

অহরহ শোনা যায়। হামিল হলো এমন মানুষ যার কোনো কাজ বা উদ্দেশ্য নেই। আজকাল হামিল বলে এমন কাউকে বোঝানো হয়, যার দুনিয়াবি কোনো সফলতা নেই। তবে আরবের মানুষ এই শব্দ ব্যবহার করছে প্রাচীনকাল থেকে। হামিল শব্দের আদি অর্থ হলো, এমন কোনো উট বা প্রাণী যার রাখাল নেই। যা ঘুরে বেড়ায় নিয়ন্ত্রণহীনভাবে। এই প্রাণীগুলো দিন-রাত বনে-জঙ্গলে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ায়। তাদের দেখার কেউ নেই, নিয়ন্ত্রণ করা কেউ নেই। এমন প্রাণীকে বলা হয় হামিল। আর এমন অবস্থাকে বলা হয় হামালা।

লেখক এখানে হামালা দ্বারা মানুষের কথা বোঝাচ্ছেন। এমন মানুষ যাদের জীবনের কোনো উদ্দেশ্য নেই, কোনো দিকনির্দেশনা নেই। তারা আল্লাহর বেঁধে দেয়া সীমারেখার অনুসরণ করে না। বন্য জন্তু যেমন দিন-রাত নিজের মতো ঘুরে বেড়ায়, এদেরও তেমন অবস্থা। সারা জীবন এরা এলোমেলো ঘুড়ে কাটিয়ে দেয়। দেখুন কুরআনে কীভাবে এই অবস্থার বর্ণনা এসেছে। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

‘আর আমি সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য বহু জিন ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে, তার দ্বারা বিবেচনা করে না; তাদের চোখ রয়েছে, তার দ্বারা দেখে না; আর তাদের কান রয়েছে, তার দ্বারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতো; বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হলো গাফেল।’ [সূরা আল-আরাফ, ৭: ১৭৯]

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

‘তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতো; বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হলো গাফেল।’

সূরা মুহাম্মাদে আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ

‘আর যারা কাফির, তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং চতুষ্পদ জন্তুর মতো আহার করে। তাদের বাসস্থান জাহান্নাম।’ [সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭: ১২]

সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে প্রচলিত ভুল ধারণা

একজন মুমিনকে জানতে হবে, দুনিয়াতে তার উদ্দেশ্য কী। কেন আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করলেন? কেন তিনি আমাদের রিয়ক দেন? এ বিষয়গুলো জানা মুমিন হিসেবে আমার ও আপনার দায়িত্ব।

যদি প্রশ্ন করেন, ‘কেন মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে?’ দেখবেন একেকজন একেক ধরনের উত্তর দিচ্ছে। এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে পাওয়া যায় বিভিন্ন মতবাদ। কেউ বলে, এটা আল্লাহর হিকমাহ, এটা শুধু আল্লাহই জানেন। এ কথা সঠিক না। যারা এমন বলে তারা আসলে অজ্ঞতার ওপর ইসলামী লেবাস পরাচ্ছে। হ্যাঁ, অবশ্যই আল্লাহর হিকমাহর অন্তর্ভুক্ত এমন অনেক বিষয় আছে যে ব্যাপারে আমাদের জানা নেই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ব্যাপারটা তেমন না। কারণ, এই প্রশ্নের উত্তর আল্লাহ তা’আলা আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

أَلَيْسَ الْإِنْسَانُ أَنْ يُرْكَّ سُدَىٰ

‘মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি এমনি ছেড়ে দেয়া হবে?’ [সূরা আল কিয়ামাহ, ৭৫: ৩৬]

মানুষ কি মনে করে, তাকে কোনো হুকুম করা হবে না? কোনো কিছু থেকে নিষেধ করা হবে না? সে কি মনে করে, তাকে দুনিয়াতে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হবে, তার ওপর শরীয়াহর কোনো বিধিনিষেধ থাকবে না, আর সে যা খুশি তা-ই করতে থাকবে? মানুষকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে—এ প্রশ্নের জবাবে অনেকে আরেকটা উত্তর দিয়ে থাকে। গত শতাব্দীর বিখ্যাত এক আরব কবি লিখেছিল,

আমি জানি না কীভাবে এখানে এলাম, কিন্তু এসেছি

সামনে যে পথ পেয়েছি তাতে হেঁটেছি

ভালো লাগুক আর না লাগুক, হেঁটে যাব এ পথেই

কীভাবে এলাম?

কীভাবে পথ খুঁজে পেলাম?

জানি না, কিন্তু আমি এসেছি! [৩৫]

এই ধরনের বিশ্বাস আরব বিশ্বের বহু লোকের মধ্যে জনপ্রিয় ছিল। আজও পৃথিবীর অনেক মানুষ এভাবে চিন্তা করে। এক সময় এই কবিতাকে গান বানানো হয়। ষাটের দশকে এই গান বেশ জনপ্রিয়তা পায়। তখন কবিতার কথাগুলো আরও ছড়িয়ে পড়ে। যে গায়ক এই কবিতার কথাগুলো দিয়ে গান বানিয়েছিল তার নামও ছিল মুহাম্মাদ

[৩৫] কবিতাটির রচয়িতা লেবাননের প্রসিদ্ধ কবি ইলিয়া আবু মাদীর (১৮৯০-১৯৫৭ ইসাযী)। সুরকার মুহাম্মাদ বিন আব্দিল ওয়াহহাবের সুরে কণ্ঠশিল্পী আব্দুল হালীম হাফিযের কণ্ঠে এটি গান হিসেবে প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ সালে।

ইবনু আব্দুল ওয়াহ্‌হাব। আমরা যে বই পড়ছি—উসুলুস সালাসাহ—সেই বইয়ের লেখকের নামও মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্‌হাব। দুজনের নাম এক; কিন্তু কাজে কত পার্থক্য। একজন তাওহিদের শিক্ষা প্রচার করেছেন, আরেকজন নিজের জীবন নষ্ট করেছে গানবাজনা করে।

এই কবিতা এবং গান নিয়ে শাইখ আব্দুল হামিদ কিশক (رحمہ اللہ) সেই সময় একটি খুতবাহ দিয়েছিলেন। ওই গায়কের বয়স ছিল সত্তরের কাছাকাছি। শাইখ কিশক এই গায়ককে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, ‘তোমার এক পা কবরে চলে গেছে। অথচ তুমি এখনো জানো না তোমাকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে। এই অবস্থাতেও তুমি এসব কুফরি কথা বলে যাচ্ছ’। শাইখ কিশক তার খুতবায় লাইন ধরে ধরে এই কবিতার কথাগুলোর সমস্যা তুলে ধরেছিলেন এবং দেখিয়েছিলেন, কেন এই কথাগুলো কুফর।

শাইখ কিশকের খুতবাহ শোনার পর ভেবেছিলাম এই কথাগুলো আসলে ওই গায়কেরই। পরে জানতে পারলাম, এই ফালতু কথাগুলো ইলিয়া আবু মাদীর নামে এক কবির লেখা। তার জন্ম লেবাননে, পরে সে অ্যামেরিকা চলে আসে। আপনারা অনেকেই হয়তো তার নাম শুনেছেন। ১৯১০ সালের দিকে সে অ্যামেরিকাতে চলে আসে এবং স্থায়ীভাবে থেকে যায়।

এই কবি এবং গায়কের মতো লোকগুলো আরব বিশ্বে অনেক জনপ্রিয় ছিল। তাদের ছিল লক্ষ লক্ষ ভক্ত। জনপ্রিয়তার দিক থেকে গায়ক মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্‌হাব ছিল উম্মে কুলসুমের কাছাকাছি। উম্মে কুলসুম কত জনপ্রিয় ছিল সেটা আজ হয়তো আপনারা চিন্তা করতে পারবেন না। তার জানাযায় চল্লিশ লক্ষ মানুষ হয়েছিল। যারা আরব তারা নিজেদের বাবা-মা অথবা দাদা-দাদিকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন, তারা উম্মে কুলসুম কিংবা গায়ক মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্‌হাবকে চেনেন কি না। দেখবেন তারা এক নামে চিনবে।

লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন গায়ক-গায়িকা আর কবিদের অনুসারী হয়, যখন নর্দমার আবর্জনার বসানো হয় সম্মানের আসনে, তখন সেই জাতি তো পরাজিত হবেই। এমন প্রজন্মের পরাজয় আর অপমান ছাড়া আর কিছু জুটবে না। যে প্রজন্ম গায়ক মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্‌হাব আর গায়িকা উম্মে কুলসুমদের মোহে পাগল হয়েছে তারা অপমানিত, পরাজিত আর লাঞ্ছিত হয়েছে বারবার। ১৯৪৮ সালে, পঞ্চাশের দশকে, ৬৭-তে, ৬৯-এ, ৭১-এ ৮০-তে—বারবার তারা পরাজিত হয়েছে। গায়ক মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্‌হাবরা এমন এক প্রজন্ম গড়ে তুলেছিল, যারা অপমানিত। যারা পরাজিত। যারা উদ্দেশ্যহীন—হামাল। নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য কী তা-ই তারা জানে না। আর তাই অপমানিত হয় প্রতি পদেপদে। আর ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল

ওয়াহাব (ﷺ) এমন এক প্রজন্ম গড়ে তুলেছিলেন যারা নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য কী তা স্পষ্ট জানত। তিনি উসুলুস সালাসা আর তাওহিদের শিক্ষা দিয়েছিলেন, তাঁর হাতে গড়া প্রজন্ম এই উম্মাহর মধ্যে তাওহিদের শিক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত করেছিল।

‘মানুষকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে’ এই প্রশ্নের উত্তরে অনেকে বলে, এটা আল্লাহর হিকমাহ যা আমাদের জানার কোনো উপায় নেই। এটি ভুল ধারণা। আল্লাহ এটি আমাদের জানিয়েছেন। আর এই প্রশ্নের উত্তর জানা আমাদের দায়িত্ব। অন্যদিকে অনেক কবি-গায়ক কিংবা এদের অনুসারীরা বলে, তারা দুনিয়াতে কীভাবে এসেছে জানে না, কেন এসেছে সেটাও জানে না। এসব কথা সম্পূর্ণ কুফর।

অনেকে এ প্রশ্নের জবাবে বলে, আল্লাহ আমাদেরকে ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এটাই সঠিক উত্তর। কিন্তু এই উত্তর দেয়া অনেকেরই এ বিষয়ে জ্ঞান এবং বুঝের ঘাটতি রয়েছে। ইবাদাত কী—এই ব্যাপারে তাদের গভীর ও সুষ্ঠু বুঝ নেই। কিন্তু এটাই তাওহিদের আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয়। আমাদের কেন সৃষ্টি করা হয়েছে এটা বুঝতে হলে তাওহিদ ও ইবাদাতকে সঠিকভাবে বুঝতে হবে।

অনেকে আবার অভিশপ্ত গ্রিক দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হবার কারণে বলে, আল্লাহ বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। তারপর বিস্মৃত হয়েছেন। ভুলে গেছেন। আর তাই পৃথিবীতে এত সমস্যা। আস্তাগফিরুল্লাহ। এই ধরনের জঘন্য কথাবার্তার জবাব আল্লাহ (ﷻ) অনেক আগে দিয়ে রেখেছেন। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

‘এবং আপনার পালনকর্তা বিস্মৃত হওয়ার নন।’ [সূরা মারইয়াম, ১৯: ৬৪]

আরেক ধরনের মানুষ বলে, এই সৃষ্টিজগৎ হলো আল্লাহর খেয়ালখুশির ফসল। স্রষ্টার লীলাখেলা। আস্তাগফিরুল্লাহ। এমন জঘন্য মিথ্যাচার থেকে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। এই মিথ্যাচারের জবাবও মহান আল্লাহ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

‘তোমরা কি ধারণা করো যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না?’ [সূরা আল মুমিনুন, ২৩: ১১৫]

আরেক দল লোক বলে, দুনিয়াবি জীবন ছাড়া আর কিছু নেই। মারা গেলে সব শেষ। যদি তা সত্যি হতো, তাহলে মৃত্যুই হতো প্রতিটি জীবের জীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু মৃত্যু কেবল শুরু—এরপরে রয়েছে কবরের জীবন, তারপর পুনরুত্থান, তারপর বিচার, অতঃপর পুলসিরাত পার হয়ে অনন্ত জান্নাত কিংবা জাহান্নামের জীবন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

رَعِمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَذَلِكَ عَلَىٰ
اللَّهِ يَسِيرٌ

‘কাফিররা দাবি করে, তাদেরকে কখনো পুনরুত্থিত করা হবে না। বলুন, অবশ্যই হবে, আমার পালনকর্তার কসম, তোমরা নিশ্চয় পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমাদেরকে অবহিত করা হবে যা তোমরা করতে। এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ।’ [সূরা আত-তাগাবুন, ৬৪: ৭]

মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে

আমাদের একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, আর এই উদ্দেশ্য জানা আমাদের দায়িত্ব। এই দুনিয়ার জীবন একটি পরীক্ষা, যার মাধ্যমে যাচাই করা হবে কে সফল আর কে ব্যর্থ।

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

‘যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন—কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ?’ [সূরা আল মূলক, ৬৭: ২]

কে সৎকর্মশীল আর কে নয়—আল্লাহ চান আমরা সেটা আমাদের আমলের মাধ্যমে এবং পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করি। জীবন কোনো সুপার মার্কেট কিংবা বাজার না যে, আটটা বা নয়টা বাজবে আর বন্ধ হয়ে যাবে। মৃত্যু আসবে আর তারপর সব শেষ হয়ে যাবে না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۚ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ
خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۚ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ

‘আমি কিয়ামাতের দিন ন্যায্যবিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারও প্রতি জুলুম হবে না। যদি কোনো আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহণের জন্যে আমিই যথেষ্ট।’ [সূরা আল-আশ্বিয়া, ২১: ৪৭]

বিচারের দিন আল্লাহ ন্যায্যবিচারের মানদণ্ড স্থাপন করবেন। সেই দিন কারও সাথে বিন্দুমাত্র অবিচার করা হবে না। সরিষার দানার মতো ছোট, অণু পরিমাণ কাজের হিসাবও বাদ যাবে না। সবকিছু মানুষের সামনে হাজির করা হবে—মানুষ দেখবে সে পৃথিবীতে কী কী করেছে। আর হিসাব গ্রহণের জন্যে আল্লাহ যথেষ্ট।

وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَنَا

‘এবং মানুষ বলবে, এর কী হলো?’ [সূরা যিলযাল, ৯৯: ৩]

সেদিন মানুষ বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকবে। পেরেশান হয়ে বলবে, এখানে কী হচ্ছে? আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَكُلُّ إِنْسَانٍ لِّزَمَانِهِ طَائِرَةٌ فِي غُفَّتِهِ وَنُحِرْ لَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ﴿١٣﴾ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

‘আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার গ্রীবালাগ করে রেখেছি। কিয়ামাতের দিন বের করে দেখাব তাকে একটি কিতাব, যা সে খোলা অবস্থায় পাবে। (তাকে বলা হবে) পাঠ করো তুমি তোমার কিতাব। আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্যে তুমিই যথেষ্ট।’ [সূরা আল-ইসরা, ১৭: ১৩-১৪]

হাশরের দিন আমাদের সামনে নিজ নিজ আমলনামা পেশ করা হবে এবং বলা হবে,

اقْرَأْ كِتَابَكَ

‘পাঠ করো তুমি তোমার কিতাব।’

وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَنْطَرٌ

‘ছোট-বড় সবকিছুই লেখা আছে।’ [সূরা আল-কামার, ৫৪: ৫৩]

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

‘মানুষ তা-ই পায় যার চেষ্টা সে করে।’ [সূরা আন-নাজম, ৫৩: ৩৯]

لَمْ يَرْحَمْنَا مَلَا

আল্লাহ আমাদের উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি।

এ সম্পর্কিত অনেক আয়াত কুরআনে রয়েছে।

নিজেকে আগুন থেকে বাঁচান

একবার ইবনু উমার (رضي الله عنه)-এর কাছে এক লোক হাজির হলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,

‘আপনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে আল্লাহ ও বান্দার গোপন কথা সম্পর্কে কী শুনেছেন?’

ইবনু উমার (رضي الله عنه) বললেন ‘আমি রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, মুমিনদেরকে কিয়ামাতের দিন আল্লাহ (ﷻ)-এর নিকটবর্তী করা হবে। আল্লাহ তার ওপর পর্দা ঢেলে দেবেন। তারপর তাকে গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন।

আল্লাহ তাকে বলবেন, ‘তুমি তোমার পাপের সম্পর্কে জানো কি?’

বান্দা বলবে, ‘হে আমার রব, আমি জানি।’

বান্দা তাঁর ভুল স্বীকার করে নেবে। সেই দিন অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ তখন বলবেন, ‘তোমার এ পাপ দুনিয়ায় আমি লুকিয়ে রেখেছিলাম। আজ এ পাপগুলোকে আমি মাফ করে দিলাম।’

এরপর তার নেকির আমলনামা তার কাছে দেয়া হবে। এরপর উপস্থিত সকল মানুষের সামনে কাফির ও মুনাফিকদের ডেকে বলা হবে, এরাই তারা যারা আল্লাহ তা’আলার ওপর মিথ্যা আরোপ করেছিল।^[৩৬]

তিরমিযিতে এসেছে, আদি বিন হাতিম (رضي الله عنه) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

‘তোমাদের মাঝে এমন কোনো ব্যক্তি নেই যার সাথে তার রব কিয়ামাতের দিন কথা বলবেন না। তখন তার এবং তার রবের মাঝে কোনো অনুবাদকও থাকবে না। পরে সে তার ডানপাশে তাকাবে, কিন্তু যা সে আগে করে পাঠিয়েছিল তা ছাড়া অন্য কিছুই সে দেখবে না। এরপর সে তার বাম দিকে তাকাবে, কিন্তু যা সে আগে করে পাঠিয়েছিল তা ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। অতঃপর সে তার সামনের দিকে তাকাবে—সামনে তখন জাহান্নামকে পাবে।

একটি খেজুরের সামান্য অংশ দান করে হলেও তোমাদের যে ব্যক্তি নিজেকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করতে পারে, সে যেন তা করে।’^[৩৭]

অর্থাৎ আপনি সেই দিন আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলবেন। আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর এই মুহূর্তের কথা চিন্তা করুন। এই পরিস্থিতির ওজনের কথা চিন্তা করুন। ওয়াল্লাহিল আযীম সেই দিন আমাদের অতি সন্নিহিতে। তাই সেই দিনের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করুন। আল্লাহ কারও সাথে বিন্দুমাত্র অবিচার করবেন না। চিন্তা করুন, একজন মানুষ মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সে ডান দিকে তাকাবে, আর শুধু তার উত্তম আমল দেখতে পাবে। তারপর সে তার বাম দিকে তাকাবে। সেখানে সে শুধু নিজের গুনাহগুলো দেখতে পাবে। ওয়াল্লাহি, এটি এমন এক দৃশ্য যা হৃদয় ভেঙে দেয়। ডান দিকে তার উত্তম আমলগুলো। তার বাম দিকে তার গুনাহ। আর সে যখন সামনে তাকাবে তখন দেখবে জাহান্নাম। পালানোর কোনো রাস্তা নেই। ভালো, মন্দ, সফল অথবা ব্যর্থ সবাই জাহান্নামের দিকে এগিয়ে যাবে।

সৎকর্মশীল ব্যক্তির জাহান্নামের ওপর দিয়ে নিরাপদে চলে যাবেন। আর কাফিররা,

[৩৬] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৭৬৮

[৩৭] সুনানুত তিরমিযি, হাদীস নং : ২৪১৫, ইমাম তিরমিযি (رضي الله عنه)-এর মতে হাসান সহীহ।

আল্লাহর অবাধ্য লোকেরা যাবে জাহান্নামের ভেতরে। কিছু মানুষ থাকবে, জাহান্নামের ওপর দিয়ে যাবার সময় যাদেরকে জাহান্নামে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। আমরা আল্লাহর কাছে এ থেকে আশ্রয় চাই। একটি বিখ্যাত হাদীস থেকে আমরা জানি, বিভিন্ন মানুষ পুলসিরাত পার হবে বিভিন্ন গতিতে। হাদীসে এসেছে, সবাই তাদের সামনে জাহান্নামকে দেখতে পাবে। তারপর কেউ জাহান্নামে পড়ে যাবে, আর কেউ তা পার হয়ে চলে যাবে।^[৩৮]

আমাদের উদ্দেশ্য হলো নিজেদের জাহান্নাম থেকে রক্ষা করা। এই জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। একটু খেজুর থাকলে সেটাও দান করে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে। যাতে হাশরের দিন অন্তত কিছু নিয়ে আমরা আল্লাহর সামনে হাজির হতে পারি। ক্ষুদ্র কোনো জিনিস হলেও তা দান করে আমাদের জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে।

মহান আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

فَمَنْ رُحِزَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

‘তারপর যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে-ই হবে সফল। আর পার্থিব জীবন তো ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়।’

[সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৮৫]

আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির মুখাপেক্ষী নন

আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহকে আমাদের প্রয়োজন। কখনো মনে করবেন না যে, আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর সৃষ্টির সংখ্যা বাড়ানোর জন্য। অথবা তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর প্রয়োজনে। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি আল গনী। অর্থাৎ তিনি সার্বভৌম, সৃষ্টি থেকে অমুখাপেক্ষী। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে কুদসিতে এসেছে, আল্লাহ (ﷻ) বলছেন,

[৩৮] হাদীসটি ইমাম বুখারী (رحمہ اللہ) আস সহীহতে (হাদীস নং : ৭৪৩৯) উল্লেখ করেছেন। এটি একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ। সেখানে আছে, ‘এমন সময় জাহান্নামের ওপর পুল স্থাপন করা হবে।’ সাহাবী (رضی اللہ عنہ)-গণ জিজ্ঞেস করলেন, ‘সে পুলটি কেমন হবে, হে রাসূলুল্লাহ?’ তিনি উত্তরে বললেন, ‘দুর্গম পিচ্ছিল স্থান। এর ওপর আংটা ও হুক থাকবে। শক্ত চওড়া উল্টো কাঁটাবিশিষ্ট হবে, যা নজদ এলাকার সাদান বৃক্ষের কাঁটার মতো হবে। সে পুলের ওপর দিয়ে ঈমানদারগণ কেউ পার হবে চোখের পলকে, কেউ পার হবে বিদ্যুতের গতিতে, কেউ পার হবে বাতাসের মতো, আবার কেউ দ্রুতগামী ঘোড়া ও সাওয়ারের মতো। তবে মুক্তিপ্রাপ্তরা কেউ নিরাপদে চলে আসবেন, আবার কেউ জাহান্নামের আগুনে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে। সবার শেষে যে লোকটি পুল অতিক্রম করবে, সে হেঁচড়িয়ে কোনোভাবে পার হয়ে আসবে।’

يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرْبِي فَتَضُرُّوْنِي وَلَنْ تَبْلُغُوا تَفْعِي، فَتَقْعُوْنِي، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ
أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَأَنْسَكُمْ وَجَنَّتْكُمْ كَانُوا عَلَى أَتَقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذَلِكَ فِي
مُلْكِي شَيْئًا،

‘হে আমার বান্দাগণ, তোমরা কখনো আমার এমন অনিষ্ট করতে পারবে না যাতে
আমি ক্ষতিগ্রস্ত হব এবং তোমরা কখনো আমার এমন উপকার করতে পারবে না
যাতে আমি আসলেই উপকৃত হব। হে আমার বান্দারা, তোমাদের শুরু থেকে শেষ
পর্যন্ত সকল মানুষ ও জ্বিনের অবস্থা যদি এমন হয়, তারা সেই ব্যক্তির মতো হয়ে
যাবে, যে আমাকে সবচাইতে বেশি ভয় করে তাতেও আমার রাজত্ব সামান্যতমও
বাড়বে না।’

আল্লাহ আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন, আমাদের ইবাদাত আল্লাহর সাম্রাজ্যের তিল
পরিমাণ বৃদ্ধি করবে না। কখনো ভাববেন না, আমরা ইবাদাত করে আল্লাহর
উপকার করছি।

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ (ﷻ) আরও বলেছেন,

يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَأَنْسَكُمْ وَجَنَّتْكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، مَا
تَقْصَرُ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَأَنْسَكُمْ وَجَنَّتْكُمْ قَامُوا فِي
صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، مَا تَقْصَرُ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا
يَقْصُرُ الْخَيْطُ إِذَا أُذْخِلَ الْبَحْرُ،

‘হে আমার বান্দারা, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তোমাদের সকল মানুষ ও জ্বিন মিলে
সবার অন্তর যদি সেই ব্যক্তির মতো হয়ে যায়, যার অন্তর সবচাইতে পাপিষ্ঠ,
তাহলেও আমার রাজত্বে সামান্যতম হ্রাস হবে না।

হে আমার বান্দাগণ, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তোমাদের সকল মানুষ ও জ্বিন যদি
কোনো বিশাল মাঠে দাঁড়িয়ে সবাই আমার কাছে আবদার করে আর আমি প্রত্যেক
ব্যক্তির চাহিদা পূরণ করি, তাহলে আমার কাছে যা আছে তা কেবল অতটুকুই কমবে
যতটা সাগরের মাঝে সুই ডোবালে সেই সুই (সাগর থেকে) কমাতে পারে।’

আটলান্টিক মহাসাগরে গিয়ে একটা সুই পানিতে ডুবিয়ে আবার তুলুন। কতটুকু পানি
আপনি সরাতে পারবেন? আল্লাহ এই মহাবিশ্ব পরিচালনা করেন এবং তিনিই এর
মালিক। তিনিই একচ্ছত্র অধিপতি। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন।

তারপর এই হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ কী বলছেন লক্ষ করুন। এই হলো উপসংহার :

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أَخْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أَوْفَيْكُمْ بِهَا، فَمَنْ وَجَدَ

خَيْرًا، فليَحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ، فلا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

‘হে আমার বান্দারা, আমি কেবল তোমাদের আমলসমূহই তোমাদের জন্য সংরক্ষিত রাখি। এরপর পুরোপুরিভাবে তার বিনিময় প্রদান করে থাকি। সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো কল্যাণ অর্জন করে সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে। আর যে অন্য কিছু পায় সে যেন নিজেকেই দোষারোপ করে।’^[৩৯]

আল্লাহ (ﷻ) কুরআনে বলেছেন,

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

‘দুনিয়ায় শাস্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনের পর বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না।’ [সূরা আল-আরাফ, ৭: ৫৬]

অর্থাৎ পুরো দুনিয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর ইবাদাতের জন্য। এই সৃষ্টিজগতের আসল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর ইবাদাত করা; আর কেউ যখন তা পরিত্যাগ করে তখন সেটাকে বলা হয় বিপর্যয়। এটাই হলো এই আয়াতের অর্থ। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

‘মানুষ কি মনে করে, তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে?’ [সূরা আল-কিয়ামাহ, ৭৫: ৩৬]

মানুষ কি মনে করে তাকে কোনো হুকুম করা হবে না? কোনো কিছু থেকে নিষেধ করা হবে না? সে কি মনে করে তাকে দুনিয়াতে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হবে, তার ওপর শরীয়াহর কোনো বিধিনিষেধ থাকবে না আর সে যা খুশি তা-ই করতে থাকবে? আপনি জীবনভর আল্লাহর দেয়া নিয়ামাত ব্যবহার করবেন তারপর মারা গেলে সব শেষ হয়ে যাবে?

এর পরের আয়াতে আল্লাহ মানুষকে এক ফোঁটা বীর্য থেকে সৃষ্টি করার কথা বলেছেন। তারপর আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى

‘তবুও কি সেই আল্লাহ মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম নন?’ [সূরা আল-কিয়ামাহ, ৭৫: ৪০]

আল্লাহ মানুষকে সামান্য এক ফোঁটা নিষ্কিপ্ত বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তারপর পূর্ণ আকৃতি দান করেছেন জমাটবাঁধা রক্ত থেকে। সেই একই আল্লাহ কি আমাদের পুনরায়

সৃষ্টি করতে পারবেন না? আমাদের পুনরুত্থিত করে বিচার করতে পারেন না?

আশা করি এতক্ষণের আলোচনায় এটা পরিষ্কার যে, আমাদের জীবনের একটি স্পষ্ট উদ্দেশ্য আছে—আর তা হলো জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা করা এবং জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান হাসিল করা। এই হলো আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য।

আল্লাহ মানবজাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছেন

উসুলুস সালাসাহর লেখক তারপর বলছেন,

(الأُولَى) أَنَّ اللَّهَ خَلَقَنَا وَرَزَقَنَا وَلَمْ يَتْرِكْنَا هَمَلًا بَلْ أَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولًا

আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, রিয়ক দান করেছেন এবং তিনি আমাদেরকে দায়িত্বহীনভাবে ছেড়ে দেননি। (বরং হিদায়াতের জন্য) তিনি আমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছেন।

আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের রিয়ক দিয়েছেন। তিনি সকল প্রয়োজনের জোগান দিচ্ছেন। কেন? যাতে আমরা তাঁর ইবাদাত করতে পারি।

আর ইবাদাত কীভাবে করব তা শিখিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহ অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। নবী-রাসূল (ﷺ)-গণ ছিলেন সুসংবাদ দানকারী এবং জাহান্নাম থেকে সতর্ককারী। আল্লাহর সন্তুষ্টি কীভাবে অর্জন করতে হবে তারা সেটা শিখিয়েছেন। এটা আমাদের নিজেদের পক্ষে জানা সম্ভব না। তাই আল্লাহ নবী-রাসূল (ﷺ)-এর মাধ্যমে তা আমাদের জানিয়েছেন। বর্তমানে আমরা বসবাস করছি প্রযুক্তির উৎকর্ষের যুগে। যোগাযোগ, চিকিৎসাসহ অনেক ক্ষেত্রে মানুষ অভাবনীয় উন্নতি করেছে। আমাদের ঘরে ঘরে কম্পিউটার, হাতে হাতে আইফোন। কিন্তু আজও আল্লাহর সন্তুষ্টির অর্জনের পথ কী, উপায় কী, পদ্ধতি কী—সেটা জানতে হলে আমাদের যেতে হবে নবী-রাসূল (ﷺ)-এর আনা বার্তার কাছে।

মানবজাতিকে সঠিক পথ দেখিয়ে দেয়ার জন্য নবী-রাসূলগণের কোনো বিকল্প নেই। আল্লাহ (ﷻ) তাঁর অসীম দয়া এবং রহমতের কারণে আমাদেরকে হাতেকলমে শেখানোর জন্য নবী ও রাসূলদের পাঠিয়েছেন। মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে পাঠিয়ে আল্লাহ এ উম্মাহকে সম্মানিত করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে জাহিলিয়াত থেকে আলোর পথ দেখিয়েছেন, আমাদের কুরআন শিখিয়েছেন। কুরআনের আলো আসার আগে সমগ্র মানবজাতি ডুবে ছিল জাহিলিয়াতের ভয়ংকর আবর্জনায়।

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ

وَالْحِكْمَةُ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

‘তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে তাদের থেকেই একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমাহ। ইতিপূর্বে তারা ছিল সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।’
[সূরা আল জুমুআ, ৬২: ২]

মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর আগে তাঁর মতো আরও অনেক রাসূলগণকে বিভিন্ন জাতির কাছে পাঠানো হয়েছিল। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

‘এমন কোনো সম্প্রদায় নেই, যাতে সতর্ককারী আসেনি।’ [সূরা ফাতির, ৩৫: ২৪]

এমন কোনো জাতি নেই যাদের কাছে আল্লাহ নবী-রাসূল পাঠাননি এবং তাঁরা মানুষকে জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিক্ষা দেননি। আল্লাহ মানবজাতির নিকট নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন যাতে করে তাঁরা সেসব সম্প্রদায়ের ব্যাপারে সাক্ষী থাকেন। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ۗ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

‘হে আহলে কিতাব, রাসূলদের আগমন দীর্ঘকাল বন্ধ থাকার পর তোমাদের নিকট আমার রাসূল এসে পৌঁছেছে, যে তোমাদেরকে স্পষ্টভাবে (আল্লাহর হুকুম) বলে দিচ্ছে, যেন তোমরা (কিয়ামাতের দিন) বলতে না পারো, তোমাদের নিকট কোনো সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী আগমন করেনি। এখন তো তোমাদের নিকট সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী এসে গেছে, আর আল্লাহ সকল বস্তুর ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।’ [সূরা আল-মায়িদাহ, ৫: ১৯]

আল্লাহ বলেছেন, আমরা তোমাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছি তোমাদের বিষয়গুলো স্পষ্ট করার জন্য। যাতে মানুষ এ কথা বলতে না পারে, আল্লাহ আমাদের কাছে কোনো সতর্ককারী পাঠাননি। তারা যেন অজুহাত দিতে না পারে, জাহান্নামের ব্যাপারে সতর্ক করার জন্য কেউ আমাদের কাছে আসেনি। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কাছেই সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী হিসেবে নবীদের পাঠানো হয়েছে। এটি মহান আল্লাহর প্রজ্ঞা যে, তিনি আমাদের নিকট সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী হিসেবে নবীদের পাঠিয়েছেন। কারণ কীভাবে আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে, কীভাবে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে তা খুঁজে বের করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। এটা আমাদের কাজ না। এবং আমাদের

পক্ষে তা জানা অসম্ভব। নবী-রাসূল (ﷺ)-গণ এ বিষয়গুলো আমাদের হাতেকলমে শিখিয়ে দিয়েছেন। আর নবুওয়াতের ধারা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর মাধ্যমে শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ (ﷻ) কুরআনে বলেছেন,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

‘আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যে সুসংবাদাতা ও সতর্ককারী রূপে পাঠিয়েছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।’ [সূরা সাবা, ৩৪: ২৮]

আল্লাহ মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে প্রেরণ করেছেন শেষ নবী এবং সমস্ত মানবজাতির জন্যে সুসংবাদাতা ও সতর্ককারী রূপে। এমন কোনো সম্প্রদায় নেই যাদের কাছে আল্লাহ নবী প্রেরণ করেননি। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

‘এমন কোনো সম্প্রদায় নেই, যাতে সতর্ককারী আসেনি।’ [সূরা ফাতির, ৩৫: ২৪] এবং তিনি বলেছেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

‘আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো এবং তাগুতকে বর্জন করো।’ [সূরা আন-নাহল, ১৬: ৩৬]

লেখকের বক্তব্য,

بَلْ أَرْسَلْنَا إِلَيْنَا رَسُولًا

...(বরং হিদায়াতের জন্যে) তিনি আমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছেন।

এর পক্ষে এমন অনেক আয়াত আছে। পরে রাসূলগণের ব্যাপারে আমরা আরও বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ।

যে রাসূলের আনুগত্য করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে

লেখক বলেছেন,

فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارَ

যে রাসূলের আনুগত্য করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে আর যে অবাধ্যতা করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

নবী-রাসূলগণের আনুগত্য করা আবশ্যিক। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

‘যে লোক রাসূলের আনুগত্য করল সে যেন আল্লাহরই আনুগত্য করল।’ [সূরা আন-নিসা, ৪: ৮০]

শরীয়াহর উৎস হিসেবে কুরআন এবং সুন্নাহ সমপর্যায়ের

আমরা এখানে নবী-রাসূল (ﷺ)-গণের আনুগত্যের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আলোচনা করব। দ্বীনের কোনো বিধানের ব্যাপারে যদি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়, তাহলে প্রমাণ হিসেবে তার গুরুত্ব কুরআনের সমপর্যায়ের হবে। আপনার সামনে কোনো সহীহ হাদীসকে যদি দলিল হিসেবে পেশ করা হয়, তাহলে তার গুরুত্ব কুরআনের অনুরূপ হবে। হালাল-হারামসহ অন্যান্য সব বিষয়ে এ মূলনীতি অনুসরণ করা হয়।

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ

‘তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস।’ [সূরা আল-মায়িদাহ, ৫: ৩]

দেখুন এই আয়াতে আল্লাহ সব মৃত জীব এবং রক্ত হারাম ঘোষণা করেছেন। যদি আমরা শুধু এতটুকু নিই, তাহলে মাছ হারাম হয়ে যাবে। কারণ এই আয়াতে বলা হচ্ছে সব মৃত জীব হারাম। অনেক ভ্রান্ত ও মূর্খ লোক আছে যারা কুরআনের কোনো আয়াত নিয়ে এসে মনমতো বিভিন্ন কথা বলে আর হাদীসের বক্তব্য উপেক্ষা করে। কিন্তু আমাদের দায়িত্ব হলো কুরআন এবং সুন্নাহকে একসাথে আঁকড়ে ধরা। কুরআন এবং সুন্নাহকে একসাথে বুঝতে এবং অনুসরণ করতে হবে। শুধু কুরআনের বক্তব্যের দিকে তাকালে আমরা দেখি, মাছ হারাম। কিন্তু এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

أَحَلَّتْ لَنَا مَيْتَانِ، وَدَمَانِ؛ فَأَمَّا الْمَيْتَانِ: فَالْحَوْثُ وَالْجُرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ.

‘আমাদের জন্যে দুটি মৃতকে হালাল করা হয়েছে, হালাল করা হয়েছে দুই প্রকার রক্তকে। মৃত দুটি হচ্ছে মাছ ও পঙ্গপাল; আর দুই প্রকারের রক্ত হচ্ছে যকৃৎ ও প্লিহা।’^[৪০]

খাওয়ার মতো দৈনন্দিন কাজের ব্যাপারেও পুরো শরীকুম পেতে হলে আমাদের কুরআন এবং হাদীস দুটোই দেখতে হচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

[৪০] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং : ৫৭২৩, আল্লামা শু‘আইব আরনাউত্ব (ﷺ)-এর মতে হাসান।

أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ

‘আমাকে কুরআন এবং এর অনুরূপ একটি জিনিস দেয়া হয়েছে।’^[৪১]

লক্ষ্য করুন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ‘কুরআনের অনুরূপ’ (مِثْلَهُ) কিছু দেয়া হয়েছে। ‘এর চেয়ে নিচের কিছু’ বা ‘এর অধীনস্থ কিছু’ দেয়া হয়েছে—এমন কিন্তু তিনি (ﷺ) বলেননি।

রাসূলের আনুগত্য করার কথা কুরআনে বহু জায়গায় এসেছে। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ

‘আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবো।’ [সূরা আল-আনফাল, ৮: ৪৬]

এবং তিনি (ﷻ) বলেছেন,

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

‘তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, এবং রাসূলের আনুগত্য করো।’ [সূরা আল-মায়িদাহ, ৫: ৯২]

দেখুন আল্লাহ এখানে বলেছেন আত্বি’উল্লাহ ওয়া আত্বি’উর রাসূল। আল্লাহ বলছেন, আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করো। তিনি কিন্তু বলেননি আত্বি’উল্লাহ সুম্মা আত্বি’উর রাসূল—আল্লাহর ইবাদাত করো, তারপর রাসূলের আনুগত্য করো। তিনি বলেছেন, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, এবং রাসূলের আনুগত্য করো। ওয়া অর্থ ‘এবং’। ‘সুম্মা’ অর্থ ‘তারপর’। আল্লাহ এই ক্ষেত্রে সব সময় ওয়া বলেছেন। কখনো সুম্মা বলেননি।

অনেকে এই বক্তব্যের বিরোধিতা করার জন্য একটি বহুল প্রচলিত হাদীসের উদ্ধৃতি দেন। উসূলের খুব কম এমন বই আছে, যেখানে এই হাদীসটি নেই। বিশেষ করে উসূলের আগেকার বইগুলোতে। এই বর্ণনাটি আপনারা সবাই হয়তো শুনে থাকবেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুয়ায (رضي الله عنه)-কে ইয়েমেনে পাঠিয়েছিলেন। হাদীসের এই অংশটুকু ঠিক আছে। পরের অংশে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুয়ায (رضي الله عنه)-কে জিজ্ঞেস করলেন,

كيف تقضي إذا عرض لك قضاء

‘বিচার করতে হলে তুমি কীভাবে বিচার ফয়সালা করবে?’

মুয়ায (رضي الله عنه) উত্তরে বললেন,

[৪১] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং : ১৭১৭৪, আল্লামা শু’আইব আরনাউত্ (رحمته الله)-এর মতে সহীহ।

أقضي بكتاب الله

‘আমি কুরআন দিয়ে ফয়সালা করব।’

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন,

فإن لم تجد في كتاب الله

‘যদি (এই বিধান) কুরআনে না পাও, (তাহলে) কী করবে?’

তিনি (ﷺ) উত্তরে বললেন,

فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

‘তাহলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাহ অনুযায়ী বিচার করব।’

এরপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন,

فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله

‘যদি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাহ ও আল্লাহর কিতাবে খুঁজে না পাও (তাহলে কী করবে)?’

তিনি (ﷺ) উত্তর দিলেন,

أجتهد رأيي

‘তাহলে আমি আমার চিন্তা অনুযায়ী ইজতিহাদ করব।’^[৪২]

হাদীসের এই দ্বিতীয় অংশটিতে কুরআনের কথা এসেছে তারপর হাদীসের কথা এসেছে। আমরা এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম, এই হাদীসের বক্তব্য তার বিপরীত। কিন্তু এই হাদীসের দ্বিতীয় অংশের সমস্যা হলো, সনদসূত্রে তা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পর্যন্ত পৌঁছায় না। এই বর্ণনা যদি সঠিক হয়, তাহলে এটি আমাদের কথার বিরুদ্ধে শক্ত একটি দলিল হবে। কিন্তু সমস্যা হলো হাদীসের এই অংশের সনদ এবং মতন মুনকার। বিধানের ক্ষেত্রে—হালাল এবং হারামের ব্যাপারে—কুরআন এবং হাদীসের গুরুত্ব সমান। আকীদাহগত বিষয়গুলোতে কুরআন এবং সুন্নাহর গুরুত্ব সমান। ইবাদাতের নিয়মকানুন এবং পদ্ধতিগত বিষয়গুলোতেও কুরআন এবং হাদীসের মর্যাদা একই। লেনদেন এবং মুয়ামালাতের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে বক্তব্য মেনে চলার গুরুত্ব একই। যদি সহীহ হাদীস থেকে কোনো নির্দেশ পাওয়া যায়, তাহলে সেটা কুরআন থেকে পাওয়া নির্দেশের সমান গুরুত্ব বহন করে। আল্লাহ কোনো কিছু নির্দেশ দেয়া বা কিছু থেকে বিরত থাকতে বলা, আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কোনো কিছু নির্দেশ দেয়া

বা কোনো কিছু থেকে বিরত থাকতে বলার গুরুত্ব একই। কারণ, কুরআন এবং সুন্নাহ দুটোই আল্লাহর কাছ থেকে নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর মাধ্যমে আমাদের কাছে এসেছে। তিনি (ﷺ) আমাদের তা শিক্ষা দিয়েছেন। কুরআন এবং সুন্নাহতে আপনাকে যা করতে বলা হয়েছে তা করতে আপনি বাধ্য। এ ব্যাপারে আমাদের নীতি হবে ‘শুনলাম এবং মানলাম’। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

‘এটা তো ওয়াহি, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।’ [সূরা আন-নাজম, ৫৩: ৪]

নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) নিজে থেকে কিছু বলেন না। তিনি যা বলেন তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই বলেন।

হাদীসের ওপরে কুরআনের অগ্রাধিকার

তবে এমন অনেক বিষয় আছে যেখানে হাদীসের ওপর কুরআনের প্রাধান্য আছে। কুরআন সরাসরি আল্লাহর কালাম। কুরআন এবং হাদীস দুটোর অর্থ বা বক্তব্য আল্লাহর পক্ষ থেকে, তবে হাদীসের শব্দগুলো রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পক্ষ থেকে; মূল বক্তব্য আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর কুরআন হলো সরাসরি আল্লাহর কালাম।

আরেকটি দিক আছে যেখানে হাদীসের ওপর কুরআনের প্রাধান্য আছে, তা হলো তিলাওয়াত। কুরআন তিলাওয়াত করলে প্রতিটি অক্ষরের জন্য আপনি দশটি করে সওয়াব পাবেন। কিন্তু হাদীসের জন্য এটা প্রযোজ্য না।

তৃতীয় আরেকটি ক্ষেত্রে কুরআন অগ্রাধিকার পাবে। সেটি হলো, কুরআন স্পর্শ করার বিধান। অনেক আলিমের মতো ওয়ু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা যাবে না। যদিও এ মতটি নিয়ে মতভেদ রয়েছে, তবে অধিকাংশের মতো হলো ওয়ু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা যাবে না। কিন্তু হাদীসের ব্যাপারে এ ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায় না। আমাদের হাদীসের কিতাবকে অবশ্যই সম্মান করতে হবে, তবে ওয়ু ছাড়া হাদীসের কিতাব স্পর্শ করা যাবে।

রাসূল (ﷺ)-এর পূর্ণ আনুগত্য করতে হবে

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি আমাদের আনুগত্য হতে হবে পূর্ণ এবং প্রশ্নাভীত। বাহ্যবিচারের কোনো সুযোগ এখানে নেই। আমি মসজিদে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আনুগত্য করব আর বাইরে করব না—কেউ এমন বললে, সেটা আনুগত্য হবে না। আমি ব্যক্তিগত জীবনে কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ মানব, কিন্তু সামাজিক পর্যায়ে মানব না। এটা হবে না। আমি ব্যক্তিগত জীবনে মানব, কিন্তু রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মানব না। এমন

আপনি সালাত এবং সাওম পালন করেন, হিজাব করেন। কিন্তু বিয়ের অনুষ্ঠানে বা সামাজিক কোনো অনুষ্ঠানে শরীয়াহর আদেশ মানলেন না। জাহিলিয়াতের অনুসরণ করলেন। এটাও পূর্ণ আনুগত্য হলো না। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোনো ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর জন্য ভিন্ন কিছু করার অবকাশ থাকে না। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয়, সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট।’ [সূরা আল-আহযাব, ৩৩: ৩৬]

কোনো বিষয়ে যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷻ)-এর ফয়সালা হয়ে যায় তখন কোনো মুমিনের—নারী কিংবা পুরুষ—সেখানে নিজস্ব কোনো মত থাকার সুযোগ নেই। ভিন্ন কোনো মত অনুসরণ করার সুযোগ নেই। সে বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য করতেই হবে। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷻ)-এর অবাধ্য হয়, সে গোমরাহ হয়েছে এবং ভুলে নিমজ্জিত হয়েছে।

দেখুন আল্লাহ (ﷻ) এখানে বলেছেন,

‘ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর জন্য ভিন্ন কিছু করার অবকাশ থাকে না।’

এখানে শুধু মুমিন বললেই যথেষ্ট হতো। কিন্তু আল্লাহ এখানে আলাদা আলাদাভাবে বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারী বলেছেন। আল্লাহ এভাবে বলেছেন বিষয়টির ওপর গুরুত্বারোপ করার জন্য। অর্থাৎ কোনো বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷻ)-এর পক্ষ থেকে ফয়সালা চলে এলে তা মেনে চলা প্রত্যেকের জন্য বাধ্যতামূলক।

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَسْتَلْلُونَ مِنْكُمْ لَوْ آذَاءً فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

‘রাসূলের আহ্বানকে তোমরা তোমাদের একে অপরকে আহ্বানের মতো গণ্য করো না। আল্লাহ তাদেরকে জানেন, যারা তোমাদের মধ্যে চুপিসারে সেরে পড়ে। অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।’

[সূরা আন-নূর, ২৪: ৬৩]

যারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আদেশ অমান্য করবে তাদেরকে আল্লাহ ভয়ানক আযাবের

সংবাদ দিয়েছেন। ফিতনাই তাদের গ্রাস করবে। এখানে ফিতনাইর একটি অর্থ হতে পারে কুফর। আবার ফিতনাইর অর্থের মধ্যে ভূমিকম্প, বিভিন্ন দুর্যোগ, অত্যাচারী শাসকদের শাসন এবং শত্রুর চড়াও হওয়াও অন্তর্ভুক্ত।

এগুলো কখন ঘটবে? কাদের সাথে ঘটবে?

যারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অবাধ্য হবে, তারা এসবের সম্মুখীন হবে।

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
'রাসূল তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন—এই উদ্দেশ্যে যখন তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয়—তখন মুমিনদের কথা হয় এটাই যে, তারা বলে, আমরা শুনেছি ও মেনে নিয়েছি।' [সূরা আন-নূর, ২৪: ৫১]

অনেক মানুষ নিজেদের ঈমানদার বলে দাবি করে কিন্তু সত্যিকারের ঈমানদার তো তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর পক্ষ থেকে যা কিছু এসেছে তা শুনে বলে, 'আমরা শুনলাম এবং মানলাম'। যখন তাদেরকে শরীয়াহ অনুযায়ী ফয়সালা করার ব্যাপারে আহ্বান করা হয় তখন তারা বলে, আমরা শুনলাম ও মানলাম। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) যে ব্যাপারে ফয়সালা করে দিয়েছেন সে ব্যাপারে অন্য কোনো কিছু তারা গ্রহণ করতে রাজি না। অন্য কোনো বক্তব্য তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য না।

জুলাইবিব (৷)-এর কাহিনি

আবি বারযাত আল-আসলামী (৷)-এর বর্ণিত একটি হাদীস শুনুন। হাদীসটির সারাংশ সহীহ মুসলিমে এসেছে। এই হাদীসের ওপর ইমাম মুসলিম একটি অধ্যায়ের নামকরণ করেছেন। সহীহ মুসলিমের এই অধ্যায়ের নাম,

بَابُ مِنْ فُضَائِلِ جُلَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

অর্থাৎ জুলাইবিব (৷)-এর ফযিলত বিষয়ক অধ্যায়।

সাহাবী জুলাইবিব (৷)-এর নামানুসারে ইমাম মুসলিম এই অধ্যায়ের নাম দিয়েছেন। এ ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে হাদীসের অন্যান্য গ্রন্থেও। একই সনদে মুসনাদু আহমাদে একটি বর্ণনা এসেছে যা আরও বিস্তারিত। এই বর্ণনার সনদ এবং সহীহ মুসলিমের আসা বর্ণনার সনদ এক। কাজেই মুসনাদু আহমাদের এই বর্ণনাও সহীহ।^{১০১} সাহাবী জুলাইবিব (৷) দেখতে খুব একটা সুদর্শন ছিলেন না। তার চেহারার বর্ণনা

থেকে জানা যায়, তিনি সম্ভবত খাটো আকৃতির ছিলেন এবং গরিব ছিলেন। এসব তথ্য থেকে বোঝা যায়, সম্ভবত তিনি সমাজের একজন উপেক্ষিত মানুষ ছিলেন। এমন মানুষ, যার কাছে সাধারণত কেউ মেয়ে বিয়ে দিতে চায় না। এমনকি তাঁর নাম—অর্থাৎ জুলাইবিব—ছিল জিলবাব বা বড় চাদর শব্দের তাসগীর বা ক্ষুদ্র রূপ।^[৪৪]

কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এই মানুষটিকে ভালোবাসতেন। তাঁর দিকে মনোযোগ দিতেন। তাঁর কথা শুনতেন, তাঁর ব্যথায় ব্যথিত হতেন—যেভাবে তিনি অন্যান্য সাহাবীদের ক্ষেত্রে হতেন। সবাই মনে করতেন, জুলাইবিব (ﷺ) হলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষদের একজন।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মজলিসে একদিন এক আনসারী সাহাবী (ﷺ) উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, ‘তোমার মেয়ের জন্য আমার পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব আছে।’

আনসারী ব্যক্তিটি খুশি হয়ে বললেন,

تَعْمَ وَكَرَامَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَتُعْمَ عَيْنِي،

‘নিশ্চয়, হে রাসূলুল্লাহ, আমি এতে সম্মানিত; এতে তো আমার চোখ জুড়িয়ে যাবে।’

কিন্তু তারপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন,

إِنِّي لَسْتُ أُرِيدُهَا لِنَفْسِي

‘বিয়ের প্রস্তাব আমার জন্য না।’

সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন,

فَلَمَنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

‘তাহলে কার জন্য হে রাসূলুল্লাহ?’

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন، جَلْبِيبٍ

‘জুলাইবিবের জন্য।’

জুলাইবিব (ﷺ)-এর চেহারা এবং সামাজিক স্ট্যাটাসের ব্যাপারে যে বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা বললাম তার যেকোনো একটির কারণে প্রস্তাব বাতিল করে দেয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল। আর এ সবগুলো একসাথে জুলাইবিব (ﷺ)-এর মধ্যে ছিল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মুখে এই কথা শুনে সেই আনসারী সাহাবী একটু ইতস্তত করলেন। তারপর

[৪৪] অর্থাৎ জুলাইবিব মানে হলো ছোট চাদরের মতো স্বল্প বর্ধিত বা খাটো লোক। উনি অতিমাত্রায় খাটো হওয়ায় এই নামে ডাকা হতো।

বললেন,

يا رسول الله، أَسْأَلُكَ أُمَّهَا

‘হে রাসূলুল্লাহ, আমি মেয়ের মায়ের সাথে পরামর্শ করব।’

স্ত্রীর কাছে যাবার পর এই সাহাবী ঠিক একইভাবে কথাটা বললেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তোমার মেয়ের জন্য বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন।

তাঁর স্ত্রী তখন বললেন, ‘এটা কে চাইবে না? এই প্রস্তাবে কে না করবে?’

তারপর সেই সাহাবী বললেন, তিনি নিজের জন্য প্রস্তাব দেননি; জুলাইবিবের জন্য প্রস্তাব দিয়েছেন। বুঝতেই পারছেন, সাথে সাথে তাঁর স্ত্রীর প্রতিক্রিয়া বদলে গেল। মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগে তিনি জামাতা হিসেবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে পাবার কথা ভাবছিলেন, এখন শুনছেন জুলাইবিব!

তাঁর স্ত্রী তখন বললেন,

أَجْلَسْتُ إِلَيْهِ؟ أَجْلَسْتُ إِلَيْهِ؟ أَجْلَسْتُ إِلَيْهِ؟

‘জুলাইবিব! ছি!’

তিনবার এ কথা বললেন। ইনইয়াহ (إِنِّي) মানে ছি! ইয়াক!

তারপর তাঁর স্ত্রী বললেন,

لا، لَعَمْرُ اللَّهِ لَا نَزَوَّجُهُ

‘ওয়াল্লাহি, আমরা জুলাইবিবের কাছে আমাদের মেয়েকে বিয়ে দেবো না।’

আমাদের মেয়ের জন্য আরও অনেক ভালো পাত্র আছে। আর তুমি আমাদের মেয়েকে জুলাইবিবের কাছে দিতে চাও? সেই সাহাবী রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে তাঁর স্ত্রীর সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য উঠলেন। এই সময় তাঁর মেয়ে প্রশ্ন করল, ‘রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কার সাথে আমাকে বিয়ে দিতে চেয়েছেন?’

আনসারী সাহাবীর স্ত্রী সবকিছু খুলে বললেন। মেয়েটি তখন বলল,

أَتَرَدُّونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ؟ ادْفَعُونِي؛ فَإِنَّهُ لَمْ يُضَيِّعْنِي

‘রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে নির্দেশ দিয়েছেন তা তোমরা প্রত্যাখ্যান করতে চাও? আমার জন্য এই প্রস্তাব গ্রহণ করো। কেননা, তিনি তো আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবেন না।’

কী দৃঢ় ঈমান ছিল এই নারীর! আমরা এই পুরো দারসে যা শিখতে চাচ্ছি এই নারীর সিদ্ধান্ত হলো তার দৃষ্টান্ত। এ ঘটনা থেকে আমাদের শিক্ষা নেয়া উচিত। আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর ইচ্ছার কাছে সেই মেয়েটি যেভাবে নিজেকে সমর্পণ করেছেন সেটাই হলো

তাওহিদ, সেটাই হচ্ছে ঈমান এবং ইহসান। এটাই হলো সেই আনুগত্য যা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি আমাদের থাকতে হবে।

এইটুকু যদি আমরা মানতে পারি, তাহলেই যথেষ্ট। আজকের পুরো আলোচনা থেকে যদি শুধু এটুকু আপনি মনে রাখেন, তাহলে সেটা যথেষ্ট। যদি আপনি এই শিক্ষার ওপর আমল করতে পারেন, শক্ত থাকতে পারেন, তাহলে আপনি সফল মানুষদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

এই নারী আল্লাহর ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর আনুগত্য করার মাঝেই জীবনের আনন্দ দেখতে পেয়েছিলেন। কারণ, আনন্দ হলো রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আনুগত্য করা। আল্লাহকে খুশি করার চেষ্টা করলে, রাসূল (ﷺ)-এর আনুগত্য করলে আপনাকে সুখের পেছনে ছুটতে হবে না। সুখ তখন আপনার পেছনে ছুটবে। এই নারী তা ভালোমতোই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

এই নারী কি জানতে চেয়েছিল, এটা ওয়াজিব কি না? তিনি কি প্রশ্ন করেছিলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কি ওয়াজিব বুঝিয়েছেন? ফরয বুঝিয়েছেন? নাকি শুধু মুস্তাহাব বুঝিয়েছেন? এই প্রস্তাব গ্রহণ করা কি বাধ্যতামূলক? তিনি কি বলেছিলেন, আমি তো কুরআনে এমন কিছু খুঁজে পাইনি যে তিনি আমাকে বিয়ের জন্য বাধ্য করতে পারেন।

আনসারদের সম্ভ্রান্ত পরিবারের একজন সুন্দরী নারী জুলাইবিবকে বিয়ে করবে, এ প্রস্তাব শুনে তিনি কি ঠোট বাঁকা করে হেসেছিলেন? তিনি কি বলেছিলেন, এটা আমার জন্য প্রযোজ্য না?

না; রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রস্তাব দিয়েছিলেন, এবং তিনি সানন্দে মেনে নিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আজ আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তাঁর সুন্নাহ আমাদের মাঝে আছে। সুন্নাহ মেনে চলার ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এই মহীয়সী নারীর মতোই হওয়া উচিত। এভাবেই আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুন্নাহ মেনে চলা উচিত।

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ

‘নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ।’ [সূরা আল-আহযাব, ৩৩: ৬]

মুমিনদের কাছে তাদের জীবনের চেয়েও নবী (ﷺ) বেশি প্রিয়। বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বিয়ের মোহর কত হবে? বিয়ের পর কোন বাসায় তারা উঠবে? মদিনার কোন এলাকায় তারা থাকবে? ছেলের আয়ের উৎস কী? এ ধরনের কোনো প্রশ্নই সেই মেয়েটির মাথায় আসেনি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এই পাত্রকে তাঁর জন্য পছন্দ করেছেন—এটাই তাঁর জন্য

যথেষ্ট ছিল। আর কোনো প্রশ্ন তিনি করেননি। তিনি যেন তাঁর পিতা-মাতাকে বলছেন, আমি আপনাদের ভালোবাসি, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা অন্য সবার কথার ওপর অগ্রাধিকার পাবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা প্রাধান্য পাবার হুকুমদার।

এই হাদীসটি বর্ণনা করার সময় অনেকে একটি বিষয় এড়িয়ে যায়—মেয়েটির জন্য জুলাইবিবকে বিয়ে করা কি বাধ্যতামূলক ছিল?

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এখানে সরাসরি আদেশ করেননি; বরং প্রস্তাব দিয়েছেন। মতামত জানতে চেয়েছেন। এটি তাঁর পক্ষ থেকে নির্দেশ ছিল না। এটি ছিল খিতবাহ (خطبة) বা প্রস্তাবনা মাত্র, অর্থাৎ তিনি জানতে চেয়েছেন।

কিন্তু এই নারী বুঝতে পেরেছিলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রস্তাব কিংবা রেকোমেন্ডেশনও প্রত্যাখ্যান করার মতো না। এই নারীর ঈমান ও তাঁর অবস্থান এমন ছিল, যা কিছু হোক না কেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথার অনুসরণ করতে হবে। সেটা যদি নিছক প্রস্তাব কিংবা রেকোমেন্ডেশন হয় তবুও।

অথচ আমাদেরকে আজ সহজ কোনো সুন্নাহর ব্যাপারে বললেও আমরা নানা রকম অজুহাত দেয়া শুরু করি। অনেকে তো এ কথাও বলে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন এটি ওয়াজিব, কিন্তু কুরআনে তো এটা নেই। তারা আপনার সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এ নিয়ে তর্ক করে যাবে। আফসোস! অথচ এই নারী এমন এক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যেটা তাঁর সারা জীবনকে প্রভাবিত করবে। এটাই হলো তাওহিদের সারকথা—আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ইচ্ছার কাছে নিজেকে সমর্পণ করা।

আজ এমন অনেক মানুষ দেখা যায়, যারা বহু বছর অথবা সারা জীবন ধরে মদ কিংবা অন্য কোনো আসক্তি কাটাতে পারে না। বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে মদ্যপান করা যে একধরনের আসক্তি। গবেষকরা এটাও বলেছেন, এই রোগের কোনো চিকিৎসা নেই। মদে আসক্ত ব্যক্তির যতই মদ থেকে দূরে থাকুক না কেন, যেকোনো সময় আবার মদ্যপান করা শুরু করতে পারে। এই আসক্তি থেকে বের হয়ে আসা খুবই কঠিন।

এবার সাহাবী (رضي الله عنه)-দের দৃষ্টান্তের দিকে তাকানো যাক। ইসলামের শুরুর দিকে যখন মদকে নিষিদ্ধ করা হয়নি তখন অনেক সাহাবী মদ পান করতেন। মদ্যপান করা ছিল আরবের সংস্কৃতির অংশ। দৈনন্দিন জীবনের অংশ। মদ পান করত না, এমন মানুষ ছিল বিরল। যেসব সাহাবী (رضي الله عنه) ইসলামের আগে মদ্যপান করতেন না তাদের নাম আলাদাভাবে সংরক্ষিত আছে। কারণ, মদ্যপান না করাটা সে যুগে ছিল অস্বাভাবিক। তখনকার মানুষ সপ্তাহে এক দিন মদ্যপান করত না। মদ্যপান চলত প্রতিদিন। এমনও না যে, শুধু রাতে মদ খাওয়া চলত। দিন বা রাত, মদ চলত যেকোনো সময়।

সামাজিকভাবে মদ্যপান ছিল প্রতিষ্ঠিত একটা ব্যাপার। অধিকাংশ মানুষ মদে আসক্ত ছিল।

যখন মদ হারাম হবার বিধান এল এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পক্ষ থেকে বার্তাবাহক মদিনার রাস্তায় এসে চিৎকার করে এ কথা জানিয়ে দিলেন, তখন কী হলো?

কী মনে হয়, সাহাবায়ে কেরাম (رضي الله عنهم)-এর অনুভূতি তখন কেমন ছিল? মনে রাখবেন, আজ মদের প্রতি আসক্তিকে একটা অসুখ মনে করা হয়। যখন মদ হারাম হবার বিধান তারা জানতে পারলেন তখন তাঁদের কারও কারও মুখে মদ ছিল। কেউ কেউ চুমুক দিতে যাচ্ছিলেন। আল্লাহর আয়াত তাঁরা শুনতে পেলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

‘হে মুমিনগণ, এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কাজ। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাকো—যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও।’ [সূরা আল-মায়িদাহ, ৫: ৯০]

এবং পরের আয়াতে আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

فَهَلْ أَنتُم مُّتَّبِعُونَ

‘অতএব, তোমরা কি নিবৃত্ত হবে না?’ [সূরা আল-মায়িদাহ, ৫: ৯১]

তাঁরা (رضي الله عنهم) নিবৃত্ত হলেন। পুরো সমাজ সাথে সাথে মদ ত্যাগ করল। কিছুদিন গ্যাপ দেয়ার পর কেউ আবার মদ্যপান শুরু করলেন না। কেউ এই হুকুম নিয়ে প্রশ্ন তুলল না। কেউ এটুকুও জানতে চাইলো না যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পক্ষ থেকে যে বার্তাবাহক এই বিধান ঘোষণা করেছে সে কি আদৌ ঠিক বলছে না ভুল। সবাই বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিলেন।

কেন কেউ কোনো প্রশ্ন করলেন না? আসলেই কি এই হুকুম এসেছে? মদ্যপান কি হারাম করা হয়েছে, নাকি মাকরুহ? এটুকুও কেন জানতে চাইলেন না কেউ?

এই হলো তাওহিদ। এই হলো তাওহিদের নির্যাস। তাঁরা (رضي الله عنهم) শুনলেন ও মেনে নিলেন। দীর্ঘ সময় ধরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁদের অন্তরে প্রোথিত করেছিলেন এই তাওহিদকে, এই ঈমানকে। বছরের পর বছর ধরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁদের শিক্ষা দিয়েছিলেন, যাতে সাহাবী (رضي الله عنهم)-দের হৃদয় ঈমানে পূর্ণ থাকে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ মানতে তাঁদের অন্তরে কোনো দ্বিধা না থাকে। আল্লাহর আদেশ মেনে নিয়ে তাঁরা তৎক্ষণাৎ মদ্যপান ছেড়ে দিলেন। কোনো ধরনের নজরদারি, জোর-জবরদস্তি, জেল-জরিমানা ছাড়াই তাঁরা আল্লাহর এই হুকুম মেনে নিলেন আনন্দের সাথে। তাঁরা

এই ভেবে সম্মানিত বোধ করতেন যে, তাঁরা নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উম্মত।

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُخَرِّمُوا فِيكُمُ الْمَالَ فَبِمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

‘না, তোমাদের মালিকের শপথ! এরা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের যাবতীয় মতবিরোধের ফয়সালায় তোমাকে শর্তহীনভাবে বিচারক মেনে নেবে। অতঃপর তুমি যা ফয়সালা করবে সে ব্যাপারে তাদের মনে আর কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকবে না; বরং তোমার সিদ্ধান্ত সর্বান্তঃকরণে মেনে নেবে।’ [সূরা আন-নিসা, ৪: ৬৫]

মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ সন্তুষ্টচিত্তে মেনে না নেয়। শুধু আল্লাহ ও রাসূল (ﷺ)-এর নির্দেশ মেনে নিলেই হবে না; বরং তা মানতে হবে কোনো রকম তর্ক ছাড়া। কোনো রকম অসন্তুষ্টি ছাড়া। সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

সেই মেয়েটির বাবা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে ফিরে আসলেন। এসে বললেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার সিদ্ধান্তে আমরা রাজি।’ তারপর, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সে মেয়েটির সাথে জুলাইবিব (ﷺ)-এর বিয়ে দিলেন। তাদের বিয়ের কয়েকদিন পর জিহাদের ডাক চলে এল। মাত্র বিয়ে হয়েছে। আপনার কি মনে হয়, জুলাইবিব (ﷺ) এই সময় জিহাদের ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য ইতস্তত করছিলেন? আপনার কি মনে হয়, এমন শক্ত ঈমানের অধিকারিণী নারীর স্বামী হানিমুনে যাওয়া নিয়ে হা-হতাশ করবে? এই নারীর মতো এত উঁচু ঈমানের অধিকারী একজনের স্বামীর কি সে পরিস্থিতিতে ইতস্তত করার কথা?

না, জুলাইবিব ছিলেন তাঁর স্ত্রীর মতোই—ইম্পাতকঠিন ঈমানের অধিকারী।

وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ

‘সচ্চরিত্রা নারীকুল সচ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্যে এবং সচ্চরিত্র পুরুষকুল সচ্চরিত্রা নারীকুলের জন্যে।’ [সূরা আন-নূর, ২৪: ২৬]

আমাদের এ মজলিসে অনেক ভাই আছেন যারা এখনো বিয়ে করেননি। অনেকে উন্নত ঈমানের অধিকারী পাত্রী পাচ্ছেন না। আসলে আমাদের প্রথমে নিজেদের নিয়ে কাজ করতে হবে। আমরা যদি আমাদের ঈমানের লেভেল উঁচু করতে পারি, তাহলে ইন শা আল্লাহ, আল্লাহ আমাদের জন্য সে রকম নারী মিলিয়ে দেবেন—যেভাবে তিনি জুলাইবিব (ﷺ)-এর জন্য মিলিয়ে দিয়েছিলেন।

জুলাইবিব (ؓ) জিহাদের ডাকে সাড়া দিলেন। রাসূল (ﷺ) সাধারণত যুদ্ধ শেষে প্রশ্ন করতেন,

هل تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ؟

‘তোমাদের মধ্যে কেউ কি হারানো গিয়েছে?’

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রশ্ন করলেন। সাহাবীরা জবাব দিলেন, অমুক অমুককে পাওয়া যাচ্ছে না। রাসূল (ﷺ) বললেন, ‘তোমরা যাঁদের নাম বলেছ তাঁরা ছাড়া আর কি কেউ আছে যাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না?’ তাঁরা বললেন, ‘না, ইয়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ)।’

জুলাইবিব (ؓ)-এর নামটা বাদ পড়ে গিয়েছিল। জুলাইবিব (ؓ) সমাজে কিছুটা উপেক্ষিত ছিলেন, একাকী ছিলেন। কিন্তু জুলাইবিব (ؓ) পেয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বন্ধুত্বের সম্মান। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে উপেক্ষা করেননি। রাসূল (ﷺ) তখন বললেন,

لَكِنِّي أَفْقِدُ جُلَيْبِيًّا

‘কিন্তু আমি জুলাইবিবকে খুঁজে পাচ্ছি না।’

সাথে সাথে সাহাবীরা জুলাইবিব (ؓ)-কে খুঁজতে বেরিয়ে পড়লেন।

তাঁরা জুলাইবিব (ؓ)-কে খুঁজে পেলেন। তিনি যুদ্ধে লড়াই করে শহীদ হয়েছেন। সাতজন কাফিরের বিরুদ্ধে লড়াই করে তিনি তাদের হত্যা করেছিলেন। আর তাদের আঘাতে নিজেও শহীদ হয়েছিলেন। সাহাবীরা রাসূল (ﷺ)-কে জানালেন, জুলাইবিব (ؓ) মারা গিয়েছেন। রাসূল (ﷺ) তখন বললেন,

قَتَلَ سَبْعَةٌ وَقَتَلُوهُ، هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا،

‘জুলাইবিব সাতজনকে হত্যা করেছে এবং তারা জুলাইবিবকে হত্যা করেছে। সে আমার আমি তাঁর, সে আমার আমি তাঁর, সে আমার আমি তাঁর—এভাবে তিনবার বললেন।’

সাহাবীরা যখন কবর খুঁড়ছিলেন তখন জুলাইবিব (ؓ)-এর দেহ ছিল রাসূল (ﷺ) এর হাতে। কল্পনা করা যায়? এই বিরল সম্মানের কথা একটু চিন্তা করুন। তারপর রাসূল (ﷺ) তাঁর নিজের বরকতময় দুহাত দিয়ে জুলাইবিবকে কবরে শুইয়ে দিলেন। জুলাইবিব, সেই মানুষটিকে যিনি ছিল সমাজে উপেক্ষিত এবং যাঁর নাম ছিল অসম্পূর্ণ।

আর সেই নারীর, জুলাইবিব (ؓ)-এর স্ত্রীর কী হলো?

সাবিত (ؓ) বলেছেন,

فَمَا كَانَ فِي الْأَنْصَارِ أَيْمٌ أَنْفَقَ مِنْهَا

‘আনসারদের মধ্যে আর কোনো বিধবা তাঁর মতো অধিক দানশীল ছিল না।’

তিনি দুহাত ভরে দান করতেন। তিনি দারিদ্র্যের পরোয়া করতেন না। বিয়ের প্রস্তাব কবুল করে তিনি যা বলেছিলেন সেটা শোনার পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দু’আ করেছিলেন,

اللَّهُمَّ صُبَّ عَلَيْهَا الْخَيْرَ صَبًّا، وَلَا تَجْعَلْ عَيْشَهَا كَذَا كَذَا

‘ইয়া আল্লাহ, আপনি মেয়েটির ওপর আপনার রহমত ঢেলে দিন এবং তাঁর জীবনকে কঠিন করবেন না।’

অন্য বর্ণনা থেকে পাওয়া যায়, জুলাইবিব (رضي الله عنها)-কে কবরে নামানোর সময় কবরের পাশে এমন কোনো সাহাবী ছিলেন না যিনি জুলাইবিবের জায়গায় নিজেকে দেখতে চাচ্ছিলেন না।^[৪৫]

[৪৫] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং : ১৯৭৮৪, আল্লামা শু’আইব আরনাউত্ব (رحمته الله)-এর মতে ইমাম মুসলিম (رحمته الله)-এর শর্তে সহীহ।

তাওহিদের তিনটি মূলনীতির প্রথমটিকে আমরা ছয় ভাগে ভাগ করেছিলাম।

এই ছয়টি ভাগের মধ্যে প্রথম দুটি হলো, আল্লাহ একমাত্র মালিক এবং তিনি সবকিছুর জোগানদাতা। আল্লাহই আমাদের রব এবং তিনিই আমাদের রিয়কদাতা। তৃতীয় ভাগের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল, আল্লাহ (ﷻ) কেন আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং কীভাবে আমরা আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারি। চতুর্থ ভাগ ছিল, নবী-রাসূল (ﷺ) পাঠিয়ে আল্লাহ (ﷻ) আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন কীভাবে ইবাদাত করলে আমরা লক্ষ্য পূরণ করতে পারব। এটি হলো আলোচনার মধ্যভাগ।

আর আলোচনার উপসংহারে থাকবে নিচের দুটি বিষয়ের আলোচনা :

فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارَ

যে রাসূলের আনুগত্য করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে অবাধ্যতা করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

কুরআন ও সুন্নাহর আসা আদেশের প্রকারভেদ

কুরআন ও সুন্নাহর তিন প্রকারের আদেশ এসেছে।

প্রথম প্রকার : এমন আদেশ যা দলিল দ্বারা ওয়াজিব হিসেবে প্রমাণিত। অর্থাৎ আদেশটি এমন প্রমাণসহ এসেছে, যা ওই আদেশের বাধ্যতামূলক হওয়া নির্দেশ করে। ইসলামের কিছু কিছু নিয়মকানুন আছে যেগুলোর আদিষ্ট হবার ধরন থেকেই বোঝা যায় যে, বাধ্যতামূলকভাবে সবাইকে এই নিয়মকানুনগুলো মেনে চলতে হবে। যেমন আল্লাহ (ﷻ) সূরা বাক্বারাহতে বলেছেন,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

‘আর সালাত আদায় করো।’ [সূরা আল-বাক্বারাহ, ২: ৪৩]

এটি একটি আদেশ। এই আদেশ পালন করা যে আবশ্যিক তার প্রমাণও কুরআনে এসেছে। কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমার প্রমাণ দ্বারা এটি সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত যে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কায়েম করা বাধ্যতামূলক। এখানে কোনো ছাড় নেই। এ বিষয়ে কোনো মতপার্থক্যও নেই।

দ্বিতীয় প্রকার : এমন আদেশ, যেটি বাধ্যতামূলক না হবার দিকে দলিল ইঙ্গিত করে। এটি প্রথম প্রকারের বিপরীত। অর্থাৎ এমন আদেশ যা কুরআন-সুন্নাহয় এসেছে। আবার ওই আদেশ বাধ্যতামূলক না, এটা কুরআন-সুন্নাহর দলিল দ্বারাই প্রমাণিত। যেমন সহীহ বুখারীর হাদীসে এসেছে,

صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ . . . قَالَ فِي الثَّلَاثَةِ

‘মাগরিবের পূর্বে সালাত আদায় করো, এটা (নবী ﷺ) তিনবার বলেছেন।’

হাদীসটি এখানেই শেষ হলে এটি ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক হয়ে যেত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বক্তব্য এখানে শেষ না। কথাটি তিনবার বলার পর তিনি বলেছেন,

لِمَنْ شَاءَ

‘যার ইচ্ছে হয় (সে পড়বে)।’^[৪৬]

মানে তিনি (ﷺ) বলছেন, ‘যাদের ইচ্ছা হয় তারা মাগরিবের পূর্বে সালাত (নফল সালাত) আদায় করো।’

হাদীসের শেষে ‘যার ইচ্ছে হয়’ অংশটি আসার কারণে মাগরিবের আগে সালাত আদায়ের বিষয়টি ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক হলো না। কাজেই এটা এমন আদেশ, যে আদেশের সাথেই এমন কিছু এসেছে যার দ্বারা ওই আদেশটি বাধ্যতামূলক না হবার ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ।

এই প্রকারের আদেশের ক্ষেত্রে অনেক সময় ওই আদেশটি ওয়াজিবের বদলে সুন্নাহ হিসেবে গণ্য হবে। ওয়াজিবের বদলে সুন্নাহ গণ্য করার বিষয়টিও প্রমাণের ভিত্তিতে হবে। তবে অনেক সময় সেই প্রমাণ একই হাদীসে না এসে অন্য কোনো হাদীসে আসতে পারে।

যেমন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমরা ইহুদীদের চেয়ে ভিন্ন রকম হও। জুতা পরে সালাত আদায় করো। ইহুদীরা ইবাদাত করার সময় জুতা বা খুফ পরে না। তাই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نَعَالِهِمْ وَلَا خِفَافِهِمْ

‘তোমরা ইহুদীদের বিরোধিতা করো, কেননা তারা স্যান্ডেল ও খুফ^[৪৭] পরে সালাত আদায় করে না (কাজেই তোমরা এগুলো পরে সালাত আদায় করো)’^[৪৮]

এই হাদীস থেকে আমরা একটি আদেশ পাচ্ছি। এ বিষয়ে বক্তব্য শুধু এটুকুতে সীমাবদ্ধ হলে জুতা পরে সালাত আদায় করা বাধ্যতামূলক হতো। ওয়াজিব হতো। কুরআনে এই ব্যাপারে কোনো আদেশ এলে সেটা যেমন আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক হতো, এই হাদীসের ক্ষেত্রেও একই কথা। কিন্তু আমরা জানি, সুনানু আবি দাউদে আবু সাঈদ খুদরী (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস আছে। সেখানে বলা হচ্ছে, ‘রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জুতা অপবিত্র থাকার কারণে জুতা খুলে সালাত আদায় করেছিলেন’^[৪৯] ইবনু মাজাহতেও এ নিয়ে সহীহ একটি হাদীস এসেছে। আব্দুল্লাহ বিন আমর (رضي الله عنه) বলেছেন,

وَرَأَيْتُهُ يَصَلِّي حَافِيًا وَمُتَعَلًّا

‘আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জুতা পরা অবস্থায় এবং জুতা না পরা অবস্থায় দুই অবস্থাতেই সালাত আদায় করতে দেখেছি’^[৫০]

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে জুতা পরে সালাত আদায় করতে বলেছেন ইহুদীদের চেয়ে আলাদা হওয়ার জন্য। অন্য হাদীস থেকে আমরা জানছি, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জুতা পরে সালাত আদায় করেছেন, জুতা খুলেও সালাত আদায় করেছেন। আবার আরেক হাদীস থেকে আমরা জানছি, জুতায় নাপাকি লেগে থাকার কারণে তিনি জুতা খুলে সালাত আদায় করেছেন^[৫১] ফলে জুতা পরে সালাত আদায়ের বিষয়টি আর ওয়াজিব থাকছে না; সুন্নাহ হয়ে যাচ্ছে।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করতে হবে, জুতা পরে সালাত আদায়ের বিষয়টি দাড়ির বিধানের মতো না। দাড়ির ব্যাপারেও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

[৪৭] ‘খুফ’ বলতে এমন ধরনের জুতা বা স্লিপারকে বোঝায় যা পাতলা চামড়ায় তৈরি এবং এর কোনো হিল থাকে না।-Hans Wehr, Dictionary of Modern Wittern Arabic, p: 289, মাদ্দাহ خف

[৪৮] সুনানু আবি দাউদ, হাদীস নং : ৬৫২, আল্লামা শু’আইব আরনাউত্ব (رحمته الله)-এর মতে সনদ হাসান।

[৪৯] সুনানু আবি দাউদ, হাদীস নং : ৬৫০, আল্লামা শু’আইব আরনাউত্ব (رحمته الله)-এর মতে সনদ সহীহ।

[৫০] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং : ৬৯২৮, আল্লামা শু’আইব আরনাউত্ব (رحمته الله)-এর মতে সনদ সহীহ লি-গাইরিহ।

[৫১] সুনানু আবি দাউদ, হাদীস নং : ৬২০, আল্লামা শু’আইব আরনাউত্ব (رحمته الله)-এর মতে সনদ সহীহ। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কেন স্যান্ডেল খুলে সালাত আদায় করেছেন সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি সাহাবীদের বলেন, ‘জিব্রিল (رحمته الله) আমার কাছে এসে আমাকে জানিয়েছে যে এগুলোতে (স্যান্ডেলে) ময়লা ছিল।’ এ কারণে তিনি সেগুলো খুলে দেখেছিলেন।

خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَخْفُوا الشُّوَارِبَ، وَأَوْفُوا اللَّحَى.

‘মুশরিকদের বিরোধিতা করো, গোঁফ ছাঁটো আর দাড়ি বৃদ্ধি করো।’^[৫২]

বিভিন্ন হাদীসে দাড়ি রাখার ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা এসেছে। হাদীসগুলো থেকে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, দাড়ি রাখা ওয়াজিব। এমন কোনো হাদীস নেই যেখানে দাড়ি কামানোর কথা বলা হয়েছে। এমন কিছু পাওয়া গেলে বলা যেত, দাড়ি রাখা ওয়াজিব না; সুন্নাহ। কিন্তু এমন কোনো বর্ণনা নেই। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর পুরো সীরাহ তন্নতন্ন করে খুঁজলেও এমন কোনো ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায় না যেখানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দাড়ি কামিয়েছিলেন। পুরো সীরাহ ঘেঁটে এমন কোনো ঘটনা খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কাউকে দাড়ি ছাড়া দেখেছেন আর কিছু বলেননি। এমনকি দাড়ি কামানো কাফির-মুশরিকদের দেখলেও তিনি (ﷺ) তাদেরকে দাড়ি রাখার জন্য এবং দাড়ি কামানোর বিরুদ্ধে বলতেন।

কাজেই জুতা পরে সালাত আদায়ের হুকুমটি ওয়াজিবের বদলে সুন্নাহ গণ্য করা হয়, কারণ অন্য হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জুতা খুলে সালাত আদায় করেছেন। অন্যদিকে দাড়ি রাখার হুকুম ওয়াজিব, কারণ এর বিপরীত কোনো অবস্থান কোনো হাদীসে আসেনি।

তাহলে আমরা দেখলাম, দ্বিতীয় প্রকারের আদেশ হলো এমন আদেশ যেগুলো বাধ্যতামূলক না হবার বিষয়টি অন্য কোনো দলিল দ্বারা প্রমাণিত। অনেক সময় আদেশ বাধ্যতামূলক না হবার বিষয়টি ওই হাদীসেই আসতে পারে। যেমন মাগরিবের আগে সালাতের হাদীসের ক্ষেত্রে এসেছে। অনেক সময় তা অন্য কোনো হাদীসে আসতে পারে। যেমন জুতা পরে সালাত আদায়ের ব্যাপারে আমরা দেখলাম।

তৃতীয় প্রকার : সাধারণ আদেশ। তৃতীয় প্রকারকে বলা হয় আমর আল-মুতলাক (الأمر المطلق)। এ ক্ষেত্রে শুধু আদেশ এসেছে; কিন্তু সেগুলো বাধ্যতামূলক কি না, তা নিয়ে অতিরিক্ত কোনো ইঙ্গিত আসেনি।

আগের দুই প্রকারের আদেশের ক্ষেত্রে তাদের বাধ্যতামূলক হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে দলিল আছে। প্রথম প্রকারের আদেশের ক্ষেত্রে দলিল দিয়ে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে, এগুলো অবশ্যই মেনে চলতে হবে। কোনো মাফ নেই। দ্বিতীয় প্রকারের আদেশের ক্ষেত্রে দলিল দিয়েই বলা দেয়া হয়েছে, এগুলোর ওপর আমল করা বাধ্যতামূলক নয়।

কিন্তু তৃতীয় প্রকারের আদেশের ক্ষেত্রে এমন কিছু নেই। কুরআন-সুন্নাহয় শুধু

এগুলোর আদেশ এসেছে। আর কিছু আসেনি। শুধু আল্লাহ অথবা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পক্ষ থেকে আদেশ। বাড়তি কিছু আমরা পাই না। এমন আদেশের ক্ষেত্রে করণীয় কী? এগুলোকে কি ওয়াজিব ধরা হবে নাকি সুন্নাহ ধরা হবে?

এ ব্যাপারে কিছু মতপার্থক্য আছে, তবে সঠিক অবস্থান হলো এ ধরনের আদেশকে ওয়াজিব ধরা হবে। যদি কুরআন বা হাদীস থেকে স্বতন্ত্রভাবে কোনো আদেশ পাওয়া যায়, আর এর সাথে যদি অন্য কোনো ইঙ্গিত বা নির্দেশনা না থাকে, তাহলে উক্ত আদেশকে ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক গণ্য করতে হবে। এটাই চার মাযহাবের অধিকাংশ আলিমের মত। এ বিষয়ে অনেক বিস্তারিত আলোচনা পাবেন শারহু কাওকাবিল মুনীর গ্রন্থে।^[৫৩] এ নিয়ে আরও আলোচনা পাবেন শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহর^[৫৪] মাজমু আল ফাতাওয়াতে এবং ইমাম আন-নাওয়াযীর সহীহ মুসলিম নিয়ে ব্যাখ্যা গ্রন্থে। কাজেই আমাদের অবস্থান হলো, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যদি আমাদের কোনো কাজের

[৫৩] হাম্বলী ফিকহ অনুযায়ী উসূলে ফিকহের একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এর মূল নাম মুখতাসারুত তাহরির। লেখক প্রখ্যাত হাম্বলী আলিম ইমাম ইবনুন নাজ্জার (رحمہ اللہ), জন্ম ৮৯৮ হিজরি, মৃত্যু ৯৭২ হিজরি। তাঁর মূল নাম আবুল বাকা তাকিউদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল হাম্বলী। শারহু কাওকাবিল মুনীর গ্রন্থটি সৌদির ওয়াকফ মন্ত্রণালয়ের অধীনে শাইখ মুহাম্মাদ আয যুহাইলী ও নাযিহ হাম্মাদের সম্পাদনায় ১৯৯৩ সালে ৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

[৫৪] ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (رحمہ اللہ) : শাইখুল ইসলাম ইমাম তাকিউদ্দীন আহমাদ বিন আব্দিল হালিম ইবনু তাইমিয়াহর জন্ম ১২৬৩ সালের ২২ জানুয়ারি। তিনি ছিলেন একাধারে হাফিযুল হাদীস, মুহাদ্দিস, ফকীহ, আকীদাহ বিশারদ, ভাষাবিদ, কাযি, মুফাসসির এবং মুজাহিদ ফি সাবিলিল্লাহ। তিনি ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম ও উসূলবিদ এবং মুজাদ্দিদ। ছিলেন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মুখপাত্র। তিনি তাঁর সময়কার প্রসিদ্ধ দুই শ আলিম হতে ইলম অর্জন করেন। তাঁর প্রসিদ্ধ ছাত্রদের মাঝে রয়েছেন : ইমাম ইবনু কায়্যিমিল জাওয়িয়্যাহ, ইমাম শামসুদ্দীন যাহাবী, ইমাম মুহাম্মাদ আব্দিল হাদী, ইমাম জামালুদ্দীন মিয়যি, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু মুফলিহ (رحمہ اللہ) প্রমুখ। ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ মংগলদের সাথে সরাসরি জিহাদে অংশ নেন। সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার, শিরক, কুফর ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। তিনি শিয়াদের বিরুদ্ধে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মুখপাত্রের পরিণত হন। ইসলামের বিশুদ্ধ ও সরল আকীদাহকে যুক্তির ঘোড়েল বেড়া জালে আবদ্ধ করা বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধেও তিনি কলম ধরেন এবং সালাফুস সালিহ-এর ধারায় ও পদ্ধতিতে আকীদাহর ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন।

বিরুদ্ধবাদী গোষ্ঠী বিভিন্ন ঠুনকো অভিযোগে তাঁকে একের পর এক কারাগারে আটক করায়। জীবনের এক বিশাল অংশ তিনি কারাগারেই কাটিয়ে দেন। এবং তিনি কারাগারেই মারা যান। শাইখুল ইসলামের কারাবন্দী জীবনের ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন নবী ইউসুফের (عليه السلام) পাঠশালা, ইলমহাউস পাবলিকেশন।

তাঁর প্রসিদ্ধ রচনাবলির মাঝে রয়েছে : ১) কিতাবুল ঈমান, ২) তালবিসুল জাহমিয়াহ, ৩) দারউ তা'আরিদ্বিল আক্বল ওয়ান নাক্বল, ৪) মিনহাজুস সুন্নাতিন নাওয়াযিয়াহ, ৫) আর রিসালাতুত তাদমুরিয়াহ, ৬) আল জাওয়াবুস সাহিহ লিমান বাদ্দালা দীনালা মাসিহ, ৭) আস সারিমুল মাসলুল আলা শাতিমির রাসূল, ৮) আল কাওয়াইদুন নুরানিয়াহ, ৯) মাজমুউল ফাতাওয়া প্রভৃতি।

আদেশ দিয়ে থাকেন, তাহলে সেটা কুরআনে থাকার মতোই। কুরআনে আসা আদেশ আর হাদীসে আসা আদেশের মধ্যে পার্থক্য নেই। দুটোই আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াহি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজের প্রবৃত্তির অনুগত হয়ে কোনো কথা বলতেন না। তাই কখনো বলবেন না, ‘ইসলামের এই বিধিনিষেধগুলো তো কুরআনে নেই, আমি কেন এগুলো মানব? আমাকে আগে কুরআনের দলিল দাও, নাহলে আমি ওয়াজিব বলে মানব না’।

কুরআন ও সুন্নাহতে আসা আদেশের তিনটি প্রকার নিয়ে সংক্ষেপে আরেকবার বলি। প্রথম প্রকার হলো এমন কোনো আদেশ বা নিষেধ যা কুরআন অথবা সুন্নাহতে এসেছে। এবং কুরআন-সুন্নাহর অন্য কোনো বক্তব্য দ্বারা সেই আদেশ বা নিষেধ বাধ্যতামূলক হবার বিষয়টি প্রমাণিত।

দ্বিতীয় প্রকার হলো এমন কোনো আদেশ বা নিষেধ যা কুরআন অথবা সুন্নাহতে স্বতন্ত্রভাবে এসেছে। সেই সাথে এই ইঙ্গিত আছে যে, এই বিধানটি বাধ্যতামূলক না। এই ইঙ্গিত ওই একই হাদীসেই আসতে পারে বা অন্য কোনো হাদীসের মাধ্যমে আসতে পারে।

তৃতীয় প্রকার হলো কুরআন বা সুন্নাহতে আসা এমন কোনো আদেশ বা নিষেধ যেগুলো মেনে চলার কথা এসেছে, কিন্তু এগুলো ওয়াজিব না সুন্নাহ তা নিয়ে কিছু বলা হয়নি। এই ধরনের আদেশ-নিষেধকে ওয়াজিব গণ্য করা হবে।

কুরআন এবং সুন্নাহর মধ্যে সম্পর্ক

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হলে, তাঁর পূর্ণ আনুগত্যে করতে হলে কুরআন এবং সুন্নাহর পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আমাদের অবশ্যই জানতে হবে। এই সম্পর্ককে তিনভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য

কুরআন এবং সুন্নাহর বক্তব্য অনেক সময় সাদৃশ্যপূর্ণ হয়। একই বক্তব্য, একই অর্থ ভিন্ন শব্দে কুরআন ও হাদীসে আসে। যেমন : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলছেন,

كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ ، إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا

‘আশা করা যায় আল্লাহ প্রত্যেক গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন, তবে যে মুশরিক হয়ে মারা যাবে তাকে ক্ষমা করবেন না।’^[৫৫]

[৫৫] সুনানু আবি দাউদ, হাদীস নং : ৪২৭০, আল্লামা শু’আইব আরনাউত্ব (رحمته) বলেন এর সনদ সহীহ বুখারী ও মুসলিমের সনদ।

এই হাদীসের বক্তব্য কুরআনের এই আয়াতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ

‘আল্লাহর সাথে শিরক করাকে আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমা করবেন না।’ [সূরা আন-নিসা, ৪: ৪৮]

আবার কুরআনে আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

‘(হে নবী), আমি তো তোমাকে সৃষ্টিকুলের জন্য রহমত বানিয়েই পাঠিয়েছি।’ [সূরা আশ্বিয়া, ২১: ১০৭]

অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُّهِدَاةٌ

‘হে মানবজাতি, আমি তো মানবজাতির জন্য নিবেদিত রহমত।’^[৫৬]

হাদীস এবং কুরআনের আয়াতগুলোর বক্তব্য লক্ষ করুন। মূল বক্তব্য প্রায় হুবহু এক; যদিও শব্দ আলাদা। কাজেই কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য অনেক সময় সাদৃশ্যপূর্ণ হয়।

সূরার মাধ্যমে বিশদ বর্ণনা, ব্যাখ্যা বা সুনির্দিষ্টকরণ

অনেক সময় দেখা যায়, কুরআনে কোনো বিষয়ের মূলনীতি বলে দেয়া হয়েছে আর তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে হাদীসে। হাদীসের মাধ্যমে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, কিংবা কুরআনের বক্তব্য সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। যেমন কুরআনে আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

‘সালাত আদায় করো।’ [সূরা আল-বাক্বারাহ, ২: ৪৩]

এই আয়াত পড়ার পর অবধারিতভাবেই কিছু প্রশ্ন আসে, কীভাবে সালাত আদায় করব? কখন কখন সালাত আদায় করব?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর এসেছে হাদীসে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي

‘আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছ, ঠিক সেভাবেই তোমরা সালাত

[৫৬] ইমাম বাইহাকী (رحمته الله), শু'আবুল ইমান : ২/৫৯৬; দালাইলুন নবুওয়াহ : ১/১৫৭; আল্লামা শু'আইব আরনাউত্ব (رحمته الله)-এর মতে সহীহ-তাখরিজু শারহিস সুন্নাহ : ১৩/২১৩

আদায় করো।’^[৫৭]

আল্লাহ (ﷻ) হজ পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

‘ওই ঘর (কা’বা) পর্যন্ত যাওয়ার সামর্থ্য আছে এমন মানুষের জন্য আল্লাহর (সম্ভষ্টির) উদ্দেশ্যে সেখানে (হজ করতে) যাওয়া অবশ্যকর্তব্য।’ [সূরা আলে ইমরান, ৩: ৯৭]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের বলছেন,

خذوا عني مناسككم

‘হজের সময় পালনীয় কর্তব্যসমূহ আমার কাছ থেকে জেনে নাও।’^[৫৮]

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

‘হে ঈমানদার ব্যক্তিরূপে, তোমরা যখন নামাযের জন্য দাঁড়াবে—তোমরা তোমাদের পুরো মুখমণ্ডল ও কনুই পর্যন্ত তোমাদের হাত দুটো ধুয়ে নেবে, অতঃপর তোমাদের মাথা মাসেহ করবে এবং পা দুটো গোড়ালি পর্যন্ত ধুয়ে নেবে।’ [সূরা আল-মায়িদাহ, ৫: ৬]

কীভাবে ওয়ু করতে হবে তা কুরআনে বলা হয়েছে। সুন্নাহ এসে এই তথ্যকে আরও সুনির্দিষ্ট করেছে। যারা অসুস্থ তাদের জন্য ওয়ুর বিশেষ ব্যবস্থা জানানো হয়েছে সুন্নাহতে। যারা তায়াম্মুম করতে পারবে না তারা কী করবে, বা একজন ব্যক্তি কখন কখন তায়াম্মুম করার উপযোগী হবে, তা-ও জানানো হয়েছে সুন্নাহর মাধ্যমে।

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

‘মানুষ যা করে (ভালো বা মন্দ) তা ছাড়া আর কিছুই তার জন্য নয়।’ [সূরা আন-নাজম, ৫৩: ৩৯]

মানুষের নিজের আমল ছাড়া আর কিছু থাকবে না—এই হলো মূলনীতি। তবে সুন্নাহতে

[৫৭] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৬০০৮, ৭২৪৬

[৫৮] ইমাম ইবনুল মুলাক্কীন (رحمته الله), আল বাদারুল মুনীর : ৬/১৮৩, সনদ সহীহ; ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী (رحمته الله), ফাতহুল বারী : ৩/৬৭৫; আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (رحمته الله), সহিহুল জামি, হাদীস নং : ৭৮৮২, সনদ সহীহ।

এই মূলনীতির তিনটি ব্যতিক্রম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আদমসন্তান যখন মারা যায় তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি ব্যতিক্রম থাকে—সাদাকায়ে জারিয়াহ, নেককার সন্তান অথবা উপকারী জ্ঞান যা সে মানুষকে শিখিয়েছিল।^[৫৯] এটি আমরা জানছি সুন্নাহ থেকে।

আবার কুরআনে এসেছে,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ

‘আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের (উত্তরাধিকারের) ব্যাপারে আদেশ দিচ্ছেন।’ [সূরা আন-নিসা, ৪: ১১]

উত্তরাধিকারের সম্পদ আপনি কার কার মধ্যে কতটুকু বণ্টন করবেন সেটি আল্লাহ (ﷻ) কুরআনে বলে দিয়েছেন। উত্তরাধিকারের হকদাররা সবাই একটি নির্দিষ্ট অংশ পাবে। সুন্নাহর মাধ্যমে মাধ্যমে আরও কিছু তথ্য যোগ করা হয়েছে। যেমন: রাসূলগণ উত্তরাধিকার গ্রহণ করেন না এবং উত্তরাধিকার হিসেবে সম্পদ রেখে যান না।^[৬০]

কাফির-মুশরিকদের কাছ থেকে কোনো মুসলিম উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পদ পায় না। একইভাবে একজন মুসলিমের সম্পদ উত্তরাধিকারসূত্রে কাফিরের কাছে যাবে না।^[৬১] হত্যাকারীরাও উত্তরাধিকারের সম্পদে কোনো ভাগ পায় না।^[৬২] এই তথ্যগুলো কুরআনে আসেনি। আমরা এগুলো জানছি সুন্নাহ থেকে।

তাহলে আমরা দেখলাম, কুরআন এবং সুন্নাহর পারস্পরিক সম্পর্কের আরেকটি

[৫৯] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১৬৩১; সুনানু আবি দাউদ, হাদীস নং : ২৮৮০; হাদীসটি হচ্ছে, ‘মানুষ মারা গেলে তার সকল আমলই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে তিনটি আমল ব্যতিক্রম—চলমান সাদকাহ, এমন ইলম যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং এমন নেক সন্তান যে তার জন্য দু’আ করে।’

[৬০] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন

إِنِّي لَا تَرِثُ مَا تَرَكَتُ صَدَقَةٌ.

‘আমরা (নবীরা) ওয়ারিশ দেখে যাই না, আমরা যা (দুনিয়ায়) ছেড়ে যাই তা সাদকাহ।’-সহীহ ইবনু হিব্বান, হাদীস নং : ৬৬০৭, আল্লামা শু’আইব আরনাউত্ব (رحمته الله)-এর মতে সহীহ। মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং : ৩৩৬, আল্লামা শু’আইব আরনাউত্ব (رحمته الله)-এর মতে ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ।

[৬১] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

‘মুসলিম কখনো কাফিরের ওয়ারিশ হয় না আর কাফিরও কখনো মুসলিমের ওয়ারিশ হয় না।’-সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদীস নং : ২২২৩, সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৬৭৬৪

[৬২] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, الْفَاتِلُ لَا يَرِثُ

‘ঘাতক ওয়ারিশ হয় না।’- সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদীস নং : ২৭৪৭, শাইখ যুবাইর আলী বাই (رحمته الله)-এর মতে হাসান; আস সুনানুল কুবরা : ৬/২২০

দিক হলো, সুন্নাহর মাধ্যমে কুরআনে উল্লেখিত বিষয়ের বিশদ বর্ণনা, ব্যাখ্যা, কিংবা নির্দিষ্টকরণ করা হয়েছে।

হাদীস শরীয়াহর স্বতন্ত্র উৎস

কুরআন এবং সুন্নাহর পারস্পরিক সম্পর্কের আরেকটি দিক হলো, হাদীস স্বতন্ত্রভাবে শরীয়াহর বিধানের উৎস হতে পারে। এ বিষয়টি নিয়ে অজ্ঞদের অনেক আপত্তি থাকে। কিছু লোক আছে যারা সুন্নাহকে পুরোপুরি অস্বীকার করে। এদেরকে বলা হয় কুরানিয়্যুন বা কুরানিস্ট। এরা সরাসরি বলবে, তারা হাদীস স্বীকার করে না। আবার কিছু লোক আছে যারা হাদীস সরাসরি অস্বীকার করে না, ইনিয়-বিনিয় করে। এরা আরও বেশি বিষাক্ত। এদের মধ্যে কেউ কেউ আসলেই অজ্ঞ। এরা বলে, হাদীস তো অনেক ধরনের আছে। কিছু হাদীস দুর্বল, কিছু হাদীস জাল, কিছু হাদীস মুনকার। আমরা সাধারণ মানুষরা কীভাবে বুঝব কোনটা কোন ধরনের হাদীস? তার চেয়ে আমরা সব হাদীসকে অস্বীকার করব।

তাদের এই কথার জবাব দেয়ার আগে, হাদীস কীভাবে স্বতন্ত্রভাবে শরীয়াহর বিধানের উৎস হতে পারে তার কিছু উদাহরণ দিই।

একজন ব্যক্তি একই সাথে ভাগনি-খালা কিংবা ভাতিজি-ফুপুকে বিয়ে করতে পারবে পারবে না। এটি শরীয়াহতে জায়েজ না। এই বিধান আমরা কোথা থেকে জানছি? হাদীস থেকে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

‘কোনো নারীকে তার ফুপুর সাথে এবং কোনো ফুপুকে তার ভাতিজির সাথে একত্রে বিয়ে করা যাবে না। একইভাবে কোনো নারী ও তার খালা এবং কোনো খালা ও তার ভাগনিকে একত্রে বিয়ে করা যাবে না।’^[৬৩]

রমাদ্বান মাসে স্ত্রীর সাথে অন্তরঙ্গতার কারণে যদি কারও সিয়াম ভেঙে যায়, তাহলে কাফফারা হিসেবে দুই মাস রোযা রাখতে হবে। এটা আমরা কোথা থেকে পাচ্ছি? সুন্নাহ থেকে।^[৬৪] এটা আমরা স্বতন্ত্রভাবে কেবল সুন্নাহ থেকেই পাচ্ছি, কুরআন থেকে

[৬৩] সুনানু আবি দাউদ, হাদীস নং : ২০৬৫, আল্লামা শু‘আইব আরনাউত্ব (رحمته الله)-এর মতে সনদ সহীহ।

[৬৪] আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) বলেন, ‘একজন লোক নবী (ﷺ)-এর কাছে এসে বলল আমি তো ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘কোন জিনিস তোমায় ধ্বংস করল?’ সে উত্তর দিলো, ‘আমি রমাদ্বানে স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলেছি।’ তখন নবী (ﷺ) বললেন, ‘তাহলে (এর কাফফারা হিসেবে) একজন দাস মুক্ত করো।’ সে বলল, ‘আমি এটা পারব না।’ নবী (ﷺ) বললেন, ‘তাহলে লাগাতার দুই মাস সিয়াম পালন করো।’ সে বলল, ‘আমি এতে সমর্থ নই।’ তিনি বললেন, ‘তাহলে ৬০ জন মিসকিনকে খাওয়াও।’ সে বলল, ‘আমি পারব না।’ তখন তিনি (ﷺ) তাকে বললেন,

না। ওযু করার সময় চামড়ার মোজার ওপর মাসেহ করার বিধান আমরা সুন্নাহ থেকে পাচ্ছি।^[৬৫] এ ব্যাপারে কুরআনে কিছু নেই। রমাদান মাসে আমরা যে যাকাতুল ফিতর দিই—যেটা অনেক দেশে ফিতরাহর টাকা নামে পরিচিত—সেটা আমরা কেবল সুন্নাহ থেকেই পাচ্ছি।^[৬৬]

ইমাম আশ শাফে'ঈ (رحمته) বলেন,

أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لم يكن له أن يدعها لقول أحد

‘মুসলিমরা এই বিষয়ে একমত (ইজমা রয়েছে) যে, কোনো কিছুকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাহ স্পষ্ট করলে তা অপর কারও কথায় বাদ দেয়া যাবে না।’^[৬৭]

সুন্নাহতে এমন অনেক কিছু এসেছে যা স্বতন্ত্রভাবে শরীয়াহর বিধানের উৎস। এ ক্ষেত্রে হাদীসের অবস্থান কুরআনের অনুরূপ।

একবার এক মহিলা আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (رضي الله عنه)-এর কাছে গিয়ে বলল, ‘আপনিই তো সেই ব্যক্তি, যিনি বলে বেড়াচ্ছেন, ‘নামিসাহদের (نامصة) ওপর আল্লাহর অভিশাপ নাযিল হোক?’

নামিসাহ হলো ঐসব নারী যারা নিজেদের ভ্রু কামায় বা ভ্রুপ্লাক করে। ইবনু মাসউদ (رضي الله عنه) বলতেন, ‘নামিসাহদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ পড়ুক।’ তাঁর এই কথা লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এই মহিলা তাই প্রশ্ন করেছিল, আপনি কি সেই ব্যক্তি নন যিনি মানুষদের মাঝে বলে বেড়াচ্ছেন, যারা ভ্রুপ্লাক করে তাদের ওপর যেন

‘বসো।’ তখন সে বসল। এর মধ্যে এক ঝুড়ি খেজুর আনানো হলো। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, ‘যাও, এটা দান করে দাও।’ সে তখন বলল, ‘হে আল্লাহর রাসূল, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর কসম! এই দুই লাভা প্রান্তরের মাঝে (অর্থাৎ মদীনায়ে) এমন কোনো পরিবার নেই, যে এই দানের জন্য আমাদের চেয়ে অধিক মুখাপেক্ষী।’ তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, ‘যাও, এটা তোমার পরিবারকে খাওয়াও।’-ইমাম ইবনু মাজাহ (رحمته), আস সুনান, হাদীস নং : ১৩৬৪, আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (رحمته)-এর মতে সনদ সহীহ। সামান্য শব্দ-পার্থক্যসহ আছে সহীহ মুসলিমে, হাদীস নং : ১১১১

[৬৫] সাফওয়ান বিন আসসাল (رحمته) বলেন, ‘নবী (ﷺ) আমাদের আদেশ দিতেন, আমরা যেন সফরে থাকাবস্থায় বা মুসাফির থাকাবস্থায় তিন দিন তিন রাত জানাবাত (ফরয গোসলের কারণ) ব্যতীত চামড়ার মোজা না খুলি, এমনকি প্রস্রাব-পায়খানা ও ঘুমের জন্যও নয়।’-সুনানুত তিরমিযি, হাদীস নং : ৩৫৩৫। ইমাম তিরমিযি (رحمته)-এর মতে হাসান সহীহ।

[৬৬] আব্দুল্লাহ বিন উমার (رضي الله عنه) বলেছেন, ‘রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আদেশ করেছেন, যেন লোকেরা ঈদের সালাতে যাবার পূর্বেই সাদাকাতুল ফিতর আদায় করে।’ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৯৮৬; সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ১৫০৯

[৬৭] ইমাম আশ শাফে'ঈ (رحمته), আর রিসালাহ, পৃষ্ঠা : ১০৪

আল্লাহর অভিশাপ নাযিল হয়?

তিনি (ﷺ) উত্তর দিলেন, ‘হ্যাঁ, আমিই সেই ব্যক্তি।’

মহিলাটি বলল, ‘আমি আগাগোড়া কুরআন পড়ে দেখেছি। কোথাও এমন কিছু পাইনি। আমি গোটা কুরআন তন্নতন্ন করে খুঁজেও এ রকম কোনো আয়াত পেলাম না।’

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (رضي الله عنه) বললেন, ‘তুমি যদি খোঁজার মতো করে খুঁজতে, তাহলে ঠিকই পেতে।’

‘আপনি কিসের ভিত্তিতে এটা বললেন?’ মহিলা প্রশ্ন করল।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (رضي الله عنه) বললেন,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

‘রাসূল তোমাদের যা দেন তা তোমরা গ্রহণ করো, আর যা থেকে বিরত থাকতে বলেন তা থেকে বিরত থাকো।’ [সূরা হাশর, ৫৯: ৭]^[৬৮]

নামিসাহদের ওপর অভিশাপের কথা এসেছে সুন্নাহতে। আর কুরআনে বলা হচ্ছে সুন্নাহতে যা গ্রহণ করতে বলা হবে তা গ্রহণ করতে, যা বর্জন করতে বলা হবে তা বর্জন করতে।

মহিলা বলল, ‘হ্যাঁ, আমি কুরআনে এই আয়াত পড়েছি।’

তখন আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (رضي الله عنه) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি,

لعن الله... والنامِصَاتِ

‘যেসব নারীরা তাদের ভ্রূ প্লাক করে তাদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ।’

এটি সহীহ হাদীস। বুখারী এবং মুসলিম এই দুই হাদীস গ্রন্থেই এই বর্ণনা এসেছে।^[৬৯]

দেখুন আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (رضي الله عنه) বলছেন, ওই মহিলা যদি ঠিকমতো খুঁজত, তাহলে কুরআনে এটি পেত। কিন্তু আমরা জানি, কুরআনে এই ব্যাপারে বক্তব্য আসেনি; সুন্নাহয় এসেছে। তাহলে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (رضي الله عنه) কেন এমন বললেন? কারণ আল্লাহ (ﷻ) কুরআনেই আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, রাসূল যা গ্রহণ করতে আদেশ দিয়েছেন তা গ্রহণ করো। যা থেকে বিরত থাকতে আদেশ করেছেন তা থেকে বিরত থাকো।

[৬৮] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২১২৫

[৬৯] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২১২৫; সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৫৯৪৮

আপনারা সবাই জানেন বোধহয়, হজ্ব করার সময় হাজীদের এক বিশেষ ধরনের পোশাক পরতে হয়। এই কাপড়ের নিচে অন্য কোনো কাপড় মানে আন্ডারগার্মেন্টস বা অন্তর্বাস পরা নিষেধ। স্বাভাবিকভাবে যে কাপড় পরে আমরা অভ্যস্ত সেই কাপড় পরে হজ্ব করা যায় না। হজ্বের জন্য নির্দিষ্ট কাপড় আছে। আবদুর রহমান ইবনু ইয়াযিদ (رحمته الله) একবার দেখলেন এক লোক সাধারণ পোশাক পরেই হজ্ব করছে। তিনি ওই লোকটিকে বললেন, এই পোশাক পরে হজ্ব করলে চলবে না। ওই লোকটি আবদুর রহমান ইবনু ইয়াযিদকে চ্যালেঞ্জ করে বসল, ‘কুরআনের কোথায় লেখা আছে যে, আমি ইহরামে এই পোশাক পরতে পারব না?’

আবদুর রহমান ইবনু ইয়াযিদ (رحمته الله) তখন সেই আয়াতটিই তিলাওয়াত করলেন যা আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (رحمته الله) তিলাওয়াত করেছিলেন,

وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

‘রাসূল তোমাদের যা দেন তা তোমরা গ্রহণ করো, আর যা থেকে বিরত থাকতে বলেন তা থেকে বিরত থাকো।’ [সূরা হাশর, ৫৯: ৭]

সুন্নাহ অস্বীকারকারীরা

একটু আগে আমরা বলেছি, এমন কিছু লোক আছে যারা হাদীস অস্বীকার করে। এদের মধ্যে কেউ কেউ বলে, হাদীস তো অনেক ধরনের আছে। কিছু হাদীস দুর্বল, কিছু হাদীস জাল, কিছু হাদীস মুনকার। আমরা সাধারণ মানুষরা কীভাবে বুঝব কোনটা কোন ধরনের হাদীস? তাই হাদীস আসলে মানা সম্ভব না।

এই ধরনের লোকেরা সরাসরি হাদীস অস্বীকার করে না। ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে করে। সায়্যিদিনা আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক (رحمته الله)-এর উচ্চারিত একটি বাক্য দিয়েই এসব আপত্তির জবাব দেয়া যায়।

আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক (رحمته الله)-এর কাছে এসে বলা হলো,

قيل لعبد الله بن المبارك: هذه الأحاديث الموضوعة

‘এই যে এই জাল হাদীস (এখন করণীয় কী)?’

তিনি উত্তরে বললেন,

نعيش لها الجهادة!

‘পণ্ডিত ব্যক্তির তো এ জন্যই বেঁচে আছেন।’^[৭০]

অর্থাৎ এইসব ফিতনাই মোকাবেলার জন্যই তো উম্মাহর মহান আলিমগণ আছেন, হাদীস বিশারদগণ আছেন।

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

‘আমিই এই যিকর নাযিল করেছি এবং আমিই তার সংরক্ষণকারী।’ [সূরা আল-হিজর, ১৫: ৯]

এই আয়াতে ‘যিকর’ শব্দের দ্বারা কুরআন এবং সুন্নাহ, দুটিকেই বোঝানো হয়েছে। কুরআনের পাশাপাশি সুন্নাহর সংরক্ষণের দায়িত্বও আল্লাহ নিয়েছেন। অর্থাৎ কিছু মানুষ হয়তো হাদীসের সাথে মনগড়া কথা জুড়ে দেয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু তাদের মোকাবেলার জন্য উপযুক্ত মানুষও উম্মাহর মধ্যে থাকবে। জাল, বানোয়াট, ভিত্তিহীন হাদীস বানিয়ে, মূল হাদীসের কোনো অংশ বাদ দিয়ে বা কোনো মনগড়া কথা জুড়ে দিয়ে ফিতনাই করার লোক যেমন থাকবে, তেমনি এই ফিতনাইর মোকাবেলার জন্য মহিরুহরাও থাকবেন। কোন হাদীস সঠিক আর কোন হাদীস সঠিক না, হাদীসের মান যাচাই সংক্রান্ত এই শাস্ত্র এতই চমৎকার যে, অনেক ওরিয়েন্টালিস্ট এতে মুগ্ধ হয়ে যায়। এই শাস্ত্র আয়ত্ত করার পেছনে কাটিয়ে দেয় সারা জীবন। হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের প্রক্রিয়া শেখে, প্রয়োগ করার চেষ্টা করে।

তাই ‘দুর্বল ও জাল হাদীস আছে, তাই হাদীস মানা যাবে না’ এ ধরনের কথা কেবল মূর্খদের পক্ষেই বলা সম্ভব। হাদীসের বিশুদ্ধতা বিশ্লেষণের ওপর ইতিহাস জুড়ে এত এত কাজ হয়েছে যে, শুধু অজ্ঞ জাহেল লোকেরাই এমন বলতে পারে। আলিমদের কাছে যান, তাঁরা আপনাকে পথ দেখাবেন। তাঁরা জানিয়ে দেবেন কোন হাদীস সহীহ আর কোনটা দুর্বল। এগুলো নিয়ে বিভ্রান্ত হবার কিছু নেই।

হাদীস অস্বীকার করার এই বিষয়টি মুসলিম উম্মাহর মাঝে আজ মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়েছে। আমি এখানে সেকুলার রাষ্ট্রগুলোর কথা বলছি না যেখানে খোলাখুলি ঘোষণা দিয়ে কুফর দিয়ে শাসন করা হয়। বরং আমি ওইসব ভূখণ্ডের কথা বলছি, যারা বড় গলায় নিজেদেরকে তাওহীদের রক্ষক বলে দাবি করে। আমি ওইসব ভূখণ্ডের কথা বলছি, যারা নিজেদেরকে সালাফিয়াহর রক্ষক দাবি করে থাকে।

হাসান আল মালিকি নামে এক লোক আছে। সে নিজেকে দা’ঈ, শাইখ এবং মুজাদ্দিদ হিসেবে উপস্থাপন করে। লোকেরা তাকে বলে ‘মুফাক্কির’। এগুলো নতুন আমদানি হওয়া শব্দ। টেলিভিশন, ইউটিউব, টুইটার সবখানেই এই হাসান আল মালিকির দাপট। লাখ লাখ ফলোয়ার। এই লোক ওই ভূখণ্ডে থাকে, যে ভূখণ্ডের শাসকরা

নিজেদেরকে ‘তাওহিদের রক্ষক’ বলে দাবি করে। সেই ভূখণ্ডে বসেই এই লোক প্রকাশ্যে, খোলাখুলিভাবে এবং চরম উদ্ধতের সাথে হাদীস অস্বীকার করে। সে টিভিতে গিয়ে বলে, ‘ইরানের খোমেনি মুনাফিক মুয়াবিয়ার চেয়ে উত্তম!’

আউযুবিল্লাহ। আমি এখানে তার কথা উদ্ধৃত করলাম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহাবী, ওয়াহি লেখক সায্যিদিনা মুয়াবিয়া (رضي الله عنه)-এর ব্যাপারে সে এমন কথা বলেছে। এটা কিছুদিন আগের ঘটনা। সৌদি আরবের উইসাল নামের এক টিভি চ্যানেলে এসে হাসান আল মালিকি বলেছে, সাহাবী মুয়াবিয়া (رضي الله عنه) নাকি একজন মুনাফিক এবং জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্থানে আছেন! আর ইরানের অভিশপ্ত খোমেনি নাকি মুয়াবিয়া (رضي الله عنه)-এর চাইতে শতগুণে ভালো!’

রাহিয়াল্লাহু আন’ মুয়াবিয়া। সাহাবীদের মর্যাদা এবং প্রশংসা করে নাযিল হওয়া কুরআনের সব আয়াত এবং হাদীসকে সে এই এক দাবির মাধ্যমে অস্বীকার করে বসল। সে একবার টুইটারে লিখেছিল, ‘সুন্নাহ মানার কোনো দরকার নেই, কুরআনের অনুসরণ করাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।’

এই লোকটি সরাসরি হাদীস অস্বীকার করল। চিন্তা করা যায়! কত বড় স্পর্ধা! এসব কথা সে প্রকাশ্যে বলে বেড়ায়। জানেন এই লোকের বিরুদ্ধে কে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন? কে এই কুফরি কথাবার্তার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন?

শাইখ নাসির আল ফাহাদ^[৭১]।

আজ থেকে ১৪-১৫ বছর আগে^[৭২] শাইখ নাসির আল ফাহাদ (আল্লাহ তাঁর মুক্তি ত্বরান্বিত করুক) হাসান আল মালিকির ফিতনাহর মোকাবেলায় একটি বই লেখেন। কাশফুশ শুবুহাত। তিনিই হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি সর্বপ্রথম হাসান আল মালিকির ফিতনাহ মোকাবেলায় মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রায় ১২ বছর আগে আমি চেষ্টা করেছিলাম শাইখ নাসির আল ফাহাদ আর হাসান আল মালিকির মধ্যে আকীদাহ নিয়ে একটি বিতর্কের আয়োজন করতে। আসলে শাইখ নাসির আল ফাহাদ (আল্লাহ তাঁর মুক্তি ত্বরান্বিত করুক) আমাকে অনুরোধ করেছিলেন এই বিতর্ক আয়োজন করার জন্য। আমি হাসান আল মালিকিকে আমন্ত্রণ জানালাম। বলাবাহুল্য যে, সে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা না করে এড়িয়ে গেল।

হাসান আল মালিকির মতো অনেক লোক আজ ওই ভূখণ্ড থেকে নিজেদের গোমরাহি

[৭১] শাইখ নাসির আল ফাহাদের ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন নবী ইউসুফের (ﷺ) পাঠশালা, ইলমহাউস পাবলিকেশন।

[৭২] শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল এই বক্তব্য দিয়েছেন ২০১৩-১৪ সালে।

ছড়াচ্ছে, যে ভূখণ্ড তাওহিদের রক্ষকদের ভূমি হবার কথা। অথচ তাওহিদের ভূখণ্ড থেকে এই লোক প্রকাশ্যে বলছে আমাদের সুন্নাহ মানার দরকার নেই। কুরআন মানলেই হবে। সে সাহাবী (رضي الله عنه)-দের আক্রমণ করছে, ইসলামের বিধিবিধান নিয়ে তাচ্ছিল্য করছে। অন্যান্য দেশগুলোতেও এই ধরনের এবং এরচেয়ে আরও নিকৃষ্ট লোক দেখা যায়।^[৭৩]

সৌদি আরবেই থাকে এমন আরেকজন হলো তুর্কি আল হামাদ। এই লোক লিখেছিল, ‘আল্লাহ আর শয়তান হলো একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।’

সে আরও লিখেছিল, ‘আল্লাহ বড় অসহায়। আমাদের পাপ আর ভুলভ্রান্তির বোঝা তার ওপর চাপিয়ে দিয়ে আমরা বেচারাকে বিপদে ফেলে দিয়েছি।’

আরেক জায়গায় এই লোক লিখেছিল, ‘কোথায় আল্লাহ? কেউ দেখেছ? তাকে পেলে আমার ভ্রয়ারে লক করে রাখতাম।’

নিঃসন্দেহে এগুলো কুফর। এগুলো সোজাসাপ্টা কুফরি। নাউযুবিল্লাহ। নাস’আলুল্লাহা সালা মাহ।

এ ধরনের ঔদ্ধত্যপূর্ণ কুফরি কথাবার্তার জন্য তুর্কি আল হামাদকে কোনো বিচারের মুখোমুখি হতে হয়নি। কোনো শাস্তি পেতে হয়নি। সে ওই ভূমিতে বসে এসব কথা বলেছে, যার শাসকরা তাওহিদের রক্ষক দাবি করে। আজ থেকে পনেরো বছর আগে তুর্কি আল হামাদের এই তিনটি বক্তব্য সম্পর্কে শাইখ হামুদ আল উক্বলাহ^[৭৪] (رحمته الله)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি ফতোয়া দিয়েছিলেন, যে এ রকম কথা বলে হয় সে হয় পাগল অথবা সে যদি নিজেকে মুসলিম হিসেবে দাবি করে থাকে, তাহলে সে নিশ্চিত মুরতাদ।

পাঁচ-ছয় মাস আগে সে আবারও চরম সীমালঙ্ঘন করল। টুইটারে লিখল,

[৭৩] হাসান ফারহান আল মালিকির জন্ম ১৯৬৯ বা ৭০ সালে সৌদি আরবের জাযানে। ১৯৯১ সালে সে রিয়াদের ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স সম্পন্ন করে। আহলে কুরআনী চিন্তাধারা দীর্ঘদিন প্রচার করলেও ইয়েমেনের হুথিদের সমর্থন করার কারণে ২০১৭ সাল থেকে কারাবন্দী আছে।

[৭৪] উস্তাযুল আসাতিয়া শাইখ হামুদ বিন উক্বলা আশ শু’আইবীর আল খালিদীর জন্ম ১৩৪৬ হিজরি মোতাবেক ১৯২৭ বা ২৮ সালে সৌদি আরবের আল কাসিমে। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত খালিদ গোত্রের লোক। তাঁকে বলা হয় مدفع التوحيد বা তাওহিদের কামান। তিনি ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম আব্দুল লতিফ বিন ইবরাহীম আলুশ শাইখ ও মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আলুশ শাইখের ছাত্র। আরবের প্রখ্যাত অনেক আলিমই তাঁর ছাত্র ছিলেন। যেমন : শাইখ আলী বিন খুদাইর আল খুদাইর, শাইখ আব্দুল্লাহ আল গুনাইমান, শাইখ সালমান বিন ফাহাদ আল আউদাহ, শাইখ আব্দুল আযিয আলুশ শাইখ প্রমুখ। তিনি ২০০১ সালে ইস্তিকাল করেন।

وجاء زمن نحتاج فيه إلى من يصحح عقيدة محمد بن عبد الله

‘আমরা এমন এক যুগে এসে পৌঁছেছি, এখন মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহর আকীদাহ সংশোধন করা প্রয়োজন।’

নাউযুবিল্লাহ। সৌদি আরবে বসেই সে এটা লিখল। এ কথার পর হাতেগোনা কয়েকজন মুসলিম এই নরাধামের কথায় তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ক্রোধান্বিত মুসলিমদের শাস্ত করার জন্য সৌদি সরকার তুর্কি আল হামাদকে বন্দী করে। এগুলো পাঁচ-ছয় মাস আগের ঘটনা।

সৌদি সরকার যখন তুর্কি আল হামাদকে গ্রেফতার করল, তখন আমি টুইট করলাম, ‘তুর্কি আল হামাদকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে সত্য, তবে খুব শীঘ্রই তাকে মুক্তি দেয়া হবে।’ আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। গত সপ্তাহে তাকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। মনে হয় ছয় মাসও জেল খাটতে হয়নি। তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনা হয়নি। কোনো বিচার হয়নি। ছয় মাস যেতে না যেতেই সে জেলের বাইরে এসে বুক ফুলিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে।

এইসব কুফরের বিরুদ্ধে কারা গর্জে উঠেছিলেন? সেইসব সিংহপুরুষ, যারা তাঁদের পুরো জীবন উৎসর্গ করেছেন তাওহিদের শিক্ষা ও দাওয়াহর পেছনে। যারা মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্‌হাব এবং উলামায়ে নাজদের ইলমের ধারক ও বাহক। তারাই সত্যিকার অর্থে তাওহিদের প্রহরী। মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্‌হাবের ইলমের প্রকৃত উত্তরসূরি। তাওহিদের সাথে আপস না করার কারণে, হকের প্রশ্নে ছাড় না দেয়ার কারণে আজ তাঁরা বন্দী। বছরের পর বছর তাঁরা কারাগারের অন্ধকারে দিন কাটাচ্ছেন। ১০ বছর... ১৫ বছর... ২০ বছর... কেউ কেউ তার চেয়েও বেশি।

আমি খুব স্পষ্টভাবেই জানতাম, সৌদি সরকার তুর্কি আল হামাদকে ছেড়ে দেবে। আমি ধাইব জানি না আর জ্যোতিষীর কাছেও যাই না। জ্যোতিষীর কাছে যাওয়ায় আমরা বিশ্বাস করি না, মাআযআল্লাহ। কিন্তু আমরা অজ্ঞতার ওপর ভর করেও কথা বলি না। আমরা ওখানকার শাসকদের বাস্তবতা জানি। তাদের প্রকৃত চেহারা আমাদের কাছে পরিষ্কার। তারা কী দিয়ে শাসন করে, কীভাবে শাসন করে তা আমাদের কাছে পরিষ্কার। আমরা বিশ্বাস করি, অন্ধ অনুসরণ শুধু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্য। আর এটা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ এরই দাবি। যে সপ্তাহে তুর্কি আল হামাদকে ওরা মুক্তি দিলো সেই সপ্তাহেই তাওহিদের পক্ষে কথা বলার কারণে বন্দী করা উম্মাহর সিংহ পুরুষদের কোর্টে হাজির করা হয়। ডান্ডাবেড়ি পরিয়ে, হাত বেঁধে।

শাইখ আলী আল-খুদাইরের ছেলে তাকে দেখে প্রশ্ন করেছিল, ‘আব্বু তুমি মোজা

পরে আছো কেন?’

তিনি উত্তর দিলেন, ‘আমাদের পায়ের শেকলগুলো খুব শক্ত করে বাঁধা।’^[৭৫]

দশ বছরের বেশি সময় ধরে আজ তাঁরা ওখানকার জেলে বন্দী। আর ইলহাদ প্রচার করা, কুফর ও নাস্তিকতা প্রচার করা তুর্কি আল হামাদরা ছয় মাসের মধ্যে জেল থেকে বের হয়ে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়।^[৭৬]

‘রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অবাধ্যতাকারী নিশ্চিত জাহান্নামে প্রবেশ করবে’

উসুলুস সালাসাহর লেখক বলছেন,

وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارَ

যে (রাসূলুল্লাহ ﷺ এর) অবাধ্যতা করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

এখানে প্রশ্ন হলো, রাসূল (ﷺ)-এর অবাধ্য প্রত্যেক ব্যক্তিই কি জাহান্নামের আগুনে পুড়বে? তারা সবাই চিরকালের জন্য জাহান্নামী হবে?

আসলে এ বিষয়গুলো নির্ভর করে তাদের গুনাহর প্রকৃতি ও মাত্রার ওপর। এ ক্ষেত্রে তিনটি ঘটনা ঘটতে পারে।

অবাধ্যতার প্রকারভেদ

রাসূল (ﷺ)-এর অবাধ্যতা তিন ধরনের হতে পারে।

শিরক আকবর বা কুফর আকবর

যদি কেউ শিরক আকবর কিংবা কুফর আকবর করে—এবং এর ওপরই মৃত্যবরণ করে—তাহলে সন্দেহাতীতভাবে সে ব্যক্তি চিরকাল জাহান্নামের আগুনে পুড়বে। আল্লাহ (ﷻ) বলছেন,

[৭৫] শাইখ আলী বিন খুদাইর আল খুদাইরের জন্ম ১৯৫৪ সালে সৌদি আরবের রিয়াদে। ১৯৮৩ সালে আল কাসিমের জামিয়াতুল ইমাম থেকে উসুলুদ্দীন বিভাগে অনার্স সম্পন্ন করেন। তিনি শাইখ হামুদ বিন উক্বলা আশ শু’আইবি, শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল মানসুর, শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমিন, শাইখ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল হুসাইন প্রমুখের ছাত্র ছিলেন।

[৭৬] তুর্কি আল হামাদের জন্ম ১৯৫২ সালে জর্দানের কারাকে। যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অভ সাউথ ক্যালিফোর্নিয়া থেকে পিএইচডি করে। পেশায় সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। তাঁর লেখা নাস্তিকতা, যৌন উত্তেজনাপূর্ণ। আল কারাদিব উপন্যাস প্রকাশ পেলে শাইখ আলী আল খুদাইর তাকে মুরতাদ ঘোষণা দেন। ধর্ম সম্পর্কে কটাক্ষ করার অভিযোগে তাকে ২০১২ সালের ২৪ ডিসেম্বর আটক করা হয়, এরপর ২০১৩ সালেই ছেড়ে দেয়া হয়। শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল এখানে ২০১২-১৩ সালের ঘটনার কথাই বলছেন। শাইখের লেকচার সে সময়ে দেয়া। বর্তমানে তুর্কি আল হামাদ বেশ সক্রিয় এবং সৌদির সাথে ইসরাইলের লিয়াজো করার অন্যতম অনুঘটক।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ
أَفْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

‘নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা’আলা তাঁর সাথে শিরক করার গুনাহ মাফ করবেন না, এ ছাড়া অন্য সব গুনাহ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। আর যে আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরীক করে, নিঃসন্দেহে সে এক বিরাট পাপ করে।’ [সূরা নিসা, ৪: ৪৮]

সূরা নিসারই আরেকটি আয়াতে আল্লাহ (ﷻ) বলছেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ
ضَلَالًا بَعِيدًا

‘আল্লাহ তা’আলা এ বিষয়টি ক্ষমা করবেন না যে, তাঁর সাথে কোনো রকম শরীক করা হবে, এ ছাড়া অন্য সকল গুনাহ তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে ক্ষমা করে দেন। যে ব্যক্তিই আল্লাহ তা’আলার সাথে কাউকে শরীক করল, সে মূলত চরমভাবে গোমরাহ হয়ে গেল।’ [সূরা নিসা, ৪: ১১৬]

যদি কেউ মৃত্যুর আগে কুফর বা শিরক ত্যাগ না করে, তাওবা না করে এবং ওই অবস্থাতেই মারা যায়, তাহলে সে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।

আরেকটি আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে,

مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ

‘...মূলত যে কেউই আল্লাহর সাথে শরীক করবে, আল্লাহ তা’আলা তার ওপর জান্নাত হারাম করে দেবেন, আর তার স্থায়ী ঠিকানা হবে জাহান্নাম...’। [সূরা আল-মায়িদাহ, ৫: ৭২]

আল্লাহ ফয়সালা করে দিয়েছেন এবং ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, মুশরিকের জন্য জান্নাত হারাম। আল্লাহ তাঁর নবী এবং সবচেয়ে প্রিয় আদমসন্তান রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে সতর্ক করে বলেছেন,

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ
الْخَاسِرِينَ

‘অথচ (হে নবী) তোমার কাছে এবং সেসব (নবীদের) কাছেও—যারা তোমার আগে অতিবাহিত হয়ে গেছে—এ মর্মে ওয়াহি পাঠানো হয়েছে, যদি তুমি আল্লাহ তা’আলার সাথে (অন্যদের) শরীক করো, তাহলে অবশ্যই তোমার সব আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তুমি মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্তদের দলে शामिल হবো।’ [সূরা

আল্লাহ এখানে তাঁর রাসূলকে জানিয়ে দিচ্ছেন, হে মুহাম্মাদ, যদি তুমিও শিরক করো, তবে তোমার সব আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে। এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

দেখুন বিষয়টি কত স্পষ্ট, কত পরিষ্কার। তবু অনেক মূর্খ একে বিভ্রান্তির উপলক্ষ্য বানায়। অনেকে এই বিষয়ে আপস করে, ছাড় দেয়। আবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়টি নিয়ে অজ্ঞতায় ভোগে অনেকে। মনে রাখবেন, যদি কোনো অ-মুসলিম ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ গ্রহণ করা ছাড়া, বিশ্বাস করা ছাড়া, ঘোষণা করা ছাড়া মারা যায়, তাহলে সে কাফির। এ সত্য অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

ইবনু মাসউদ (رضي الله عنه) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ

‘যে আল্লাহর কাছে কোনো কিছুকে শরীক না করে মারা যাবে, সে জান্নাতে যাবে; আর যে আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরীক করে মারা যাবে, সে জাহান্নামে যাবে।’^[৭৭]

এটিই তাওহিদ। এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই, এটি সুস্পষ্ট। আনাস (رضي الله عنه) একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যেখানে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا، وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ: أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا، فَأَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تُشْرِكَ بِي.

‘জাহান্নামে সর্বনিম্ন আযাব পাওয়া ব্যক্তিকে আল্লাহ তা’আলা কিয়ামাতের দিন জিজ্ঞাসা করবেন, ‘দুনিয়ায় যা কিছু আছে যদি তোমার সে পরিমাণ সম্পদ থাকত, তাহলে কি তুমি তা (আজ) মুক্তিপণ হিসেবে দিতে?’ সে বলবে, ‘হ্যাঁ।’

আল্লাহ (ﷻ) তখন বলবেন, ‘তুমি যখন আদমের পৃষ্ঠদেশে ছিলে তখন এর চাইতেও অনেক কম জিনিস আমি তোমার কাছ থেকে চেয়েছিলাম যে, তুমি আমার সাথে কোনো কিছু শরীক করবে না, কিন্তু তুমি তা অস্বীকার করেছ এবং আমার সাথে শিরক করেছ।’

এই হাদীসটি আছে সহীহ আল-বুখারীতে।^[৭৮]

[৭৭] মুসনাদু আহমাদ : ১/২৩০, এই সনদটি মুদরাজ। অন্যদিকে জাবির (رضي الله عنه) থেকে হব্ব একই কথা সহীহ সনদে পাওয়া যায়।-সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৯৩; ইমাম ইবনু খুযাইমাহ (رحمته الله), আত তাওহিদ : ২/৮৫৫; ইমাম ইবনু মান্দাহ (رحمته الله), আল ইমান, হাদীস নং : ৪৬

[৭৮] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৬৫৫৭

ইন্টারফেইথ^[৭৯] বা আন্তঃধর্মীয় কর্মকাণ্ড এই স্পষ্ট বিষয়টিকে মুছে দিতে চায়। কিংবা ঘোলাটে করতে চায়। এটা আন্তঃধর্মীয় সংলাপ এবং কর্মকাণ্ডের বিপজ্জনক দিকগুলোর অন্যতম। আন্তঃধর্মীয় সংলাপ মানে শুধু গির্জা কিংবা সিনাগগে যাওয়া, গল্পগুজব করা, আর হাসিমুখে ছবি তোলা না। এর আসল বাস্তবতা অনেক ভয়ংকর। আদতে ইন্টারফেইথ বা আন্তঃধর্মীয় সংলাপ স্বতন্ত্র একটা ধর্মের মতো। এটা হলো কুফরের ওপর কুফর। অথচ একে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়, মুসলিম যুবকরা বুঝতেই পারে না কখন ইন্টারফেইথের মাধ্যমে তারা তাদের ঈমান হারিয়ে ফেলেছে। মুসলিমদেরকে একেবারে ইসলাম থেকে বের করে আনা কষ্টসাধ্য, তাই আল্লাহর দূশমনরা উম্মাহর মাঝে ইন্টারফেইথের এই বিষ ঢুকিয়ে দিচ্ছে। মুসলিমরা নিজেদের মুসলিম বলুক সমস্যা নেই, কিন্তু তাদেরকে প্রকৃত ইসলামের বদলে ইন্টারফেইথ ইসলাম দাও। আন্তঃধর্মীয় সংলাপের ইসলাম দাও। তাহলে ওরা নিজেদের মুসলিম দাবি করবে ঠিকই, কিন্তু ওদের ভেতরে ইসলামের কিছুই থাকবে না।

কোনো খ্রিষ্টানকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, সে আপনাকে নির্দিধায় বলবে, কেউ যদি ঈসা (ﷺ)-কে আল্লাহর পুত্র এবং ত্রাণকর্তা হিসেবে স্বীকার না করে, তাহলে সে নিশ্চিত জাহান্নামে যাবেন। খ্রিষ্টানদের মধ্যে যারা সত্যবাদী তারা সরাসরি এ কথা বলবে। বাইবেলে স্পষ্ট বলা আছে, ঈসা (ﷺ) ছিলেন ত্রাণকর্তা এবং কেবল তাঁর মাধ্যমেই আখিরাতের মুক্তি সম্ভব—এ কথা কেউ অবিশ্বাস করলে সে জাহান্নামী।^[৮০] বাইবেলে যা লেখা আছে সেটা স্পষ্টভাবে বলতে খ্রিষ্টানরা লজ্জাবোধ করে না। কিন্তু কুরআনে যা বলা আছে সেটা বিশ্বাস করতে আজ কিছু মানুষের লজ্জা লাগে! আবার তারা নিজেদের মুসলিমও দাবি করে!

[৭৯] ইন্টারফেইথ বা ইন্টারফেইথ ডায়ালগ : আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি বা সংলাপ। এ-জাতীয় কার্যকলাপকে ঘিরে বিভিন্ন ধরনের মুখস্থ বুলি প্রচলিত থাকলেও আদতে আন্তঃধর্মীয় সমাবেশ, সম্প্রীতি ও সংলাপের মূল উদ্দেশ্য হলো : ‘সকল ধর্ম সমান’, ‘সকল ধর্ম সঠিক’, ‘সকল পথই একই গন্তব্যে পৌঁছে দেয়’, ‘সকল ধর্ম এক’ এমন একটি দর্শনের প্রচার। এটি নির্জলা কুফর ও শিরক। বর্তমানের ইন্টারফেইথ আন্দোলন মূলত ‘এক ধর্ম, এক বিশ্ব’ এজেন্ডার বাস্তবায়ন। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, ইসলাম ছাড়া আর কোনো সঠিক ধর্ম নেই। ঈমান ও কুফর, তাওহিদ ও শিরক, মুসলিম ও কাফির কখনো সমান হতে পারে না। আলিমদের মতে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি বা সংলাপের এ আহ্বান হলো মূলত রিদ্দার আহ্বান। এ ব্যাপারে আরও জানতে দেখুন : <https://islamqa.info/en/10213> এবং লাজনাহ আদ দাইমাহর ফাতওয়া নম্বর ১৭,৩০০

[৮০] জন ৩:৩৬ বলছে Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains on them.

‘যে কেহ পুত্রে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পাইয়াছে; কিন্তু যে কেহ পুত্রকে অমান্য করে, সে জীবন দেখিতে পাইবে না, কিন্তু ঈশ্বরের ক্রোধ তাহার উপরে অবস্থিতি করিবে।’ [ইংরেজি: New International Version; বঙ্গানুবাদ: বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটির পবিত্র বাইবেল]

শিয়াদের মৌলিক একটি আকীদাহ হলো, কেউ যদি তাদের বারো ইমামের ওপর ঈমান না আনে, তাহলে সে কাফির। ওই ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে। শিয়াদের গুরুত্বপূর্ণ একটি বই, হাক্কুল ইয়াক্বিন ফি মা'রিফাতি উসুলিদ্দীন^[৮১]। এ বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে বলা হয়েছে,

اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة و جحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر مستحق للخلود في النار

‘সকল ইমামিয়া একমত, যে ব্যক্তি (বারো ইমামের) কোনো একজন ইমামের ইমামতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহ তা'আলা তার জন্য যেসকল আমলকে ফরয করেছেন তা অস্বীকার করবে, সে কাফির—চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।’^[৮২]

এটা হলো তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বইগুলোর একটির বক্তব্য।

বারো ইমামের হক্ক আদায় বলতে তারা কী বোঝায়? শিয়াদের আকীদাহর ব্যাপারে যারা ধারণা রাখেন তারা জানেন, তাদের বারো ইমামের ওপর শিয়ারা এমন কিছু বৈশিষ্ট্য এবং হক্ক আরোপ করে, যা কেবল আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। যেমন: তারা বিশ্বাস করে তাদের ইমামদের ঋইবের জ্ঞান আছে। অথচ ইলমুল ঋইব বা গায়েবের জ্ঞান কেবল আল্লাহর। আপনি যদি বিশ্বাস করেন ঋইবের জ্ঞান শুধু আল্লাহর কাছে, তাহলে শিয়াদের মতে আপনি কাফির। তাদের মতে, মুসলিম হতে হলে আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে, ইমামদের ঋইবের জ্ঞান আছে। এ ছাড়া তারা মনে করে বারো ইমাম মাসুম বা নিষ্পাপ।

আর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহর কী অবস্থা? আজ পথভ্রষ্ট, দ্বীন বিক্রি করা বিভ্রান্ত, পরাজিত মানসিকতার এমন অনেক লোক আছে যারা নিজেদের আহলুস সুন্নাহ দাবি করে আর বলে, ‘কিছু মানুষ হলো মুমিন। কিছু মানুষ হলো কাফির। আর এর বাইরে তৃতীয় আরেকদল মানুষ আছে।’

অথবা তারা বলে, ‘কুরআনে বলা হয়েছে, অবিশ্বাসীরাও জান্নাতে যাবে।’ আজ দেখবেন অনেক প্রফেসর, চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার...সমাজের অভিজাত, শিক্ষিত হবার দাবিদার লোকেরা এ রকম দাবি করে। আফসোসের বিষয় হলো, এ ধরনের কথা অনেক আলিম নামধারীর কাছ থেকেও আজ শোনা যায়।

আমরা স্পষ্টভাবে বলি, তাওহিদ ও রিসালাতকে গ্রহণ না করে যে মারা যাবে,

[৮১] বইটির লেখক ইরাকের প্রখ্যাত শিয়া আলিম সায্যিদ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ রিদ্বা আলু শুব্বার, তাঁর জন্ম ১১৮৮ হিজরিতে, মৃত্যু ১২৪২ হিজরিতে। বইটি দুই খণ্ডে বিভক্ত। বাইরুতের মুওয়াসাসাতুল আলামী লিল মাতবু'আহ এটি ১৯৯৭ সালে ছেপেছে। এতে দুখণ্ডই একত্রে ছাপা হয়েছে।

[৮২] হাক্কুল ইয়াক্বিন ফি মা'রিফাতি উসুলিদ্দীন, পৃষ্ঠা : ৫১২

আখিরাতে তার আবাসস্থল হলো জাহান্নাম। মডার্নিস্ট আর আন্তঃধর্মীয় সংলাপের ফেরিওয়ালাদের কথায় বিভ্রান্ত হবেন না। তাদের হাতের পুতুলে পরিণত হবেন না। তাদের মিষ্টি কথায় ভুলবেন না। নিজেদের গোমরাহিকে জায়েজ করার জন্য তারা কুরআনের আয়াতের অর্থকে বিকৃত করে। তারা বলে, কুরআনের কিছু আয়াতে বলা হয়েছে ইহুদী, খ্রিষ্টান এবং সাবাইরা সবাই জান্নাতে যাবে।

হ্যাঁ, আমরাও বলি যে কিছু ইহুদী এবং খ্রিষ্টান জান্নাতে যাবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই। এটা কুরআনেই বলা হয়েছে। আর আল্লাহর কালাম নিয়ে কে প্রশ্ন তুলবে? কিন্তু প্রশ্ন হলো, কোন ইহুদীরা জান্নাতে যাবে? কোন খ্রিষ্টানরা জান্নাতে যাবে?

যেসব ইহুদী মুসা (ﷺ)-এর জীবদ্দশায় তাঁকে আল্লাহর রাসূল হিসেবে গ্রহণ করেছিল, তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করেছিল, পালন করেছিল—তাঁরা জান্নাতে যাবে। যেসব খ্রিষ্টান ঈসা (ﷺ)-কে আল্লাহর নবী হিসেবে মেনে নিয়েছিল এবং তাঁর শিক্ষা অনুসরণ করেছিল, কুফর ও শিরক থেকে বিরত ছিল—তাঁরা জান্নাতে যাবে। আর আমরা তাঁদের সবাইকে মুসলিমই বলি। কারণ, তাঁরা মুসা (ﷺ) এবং ঈসা (ﷺ)-এর শিক্ষার অনুসরণ করেছিল। যারা মুসা (ﷺ) এবং ঈসা (ﷺ)-এর প্রকৃত অনুসারী ছিলেন, তাঁদের কথায় ঈমান এনেছিলেন—তাঁদের তো আমরা মুসলিমই বলি। আর এই মানুষগুলোই হবেন জান্নাতী।

আজকের কোনো ইহুদী কিংবা খ্রিষ্টান যদি সত্যিকার অর্থে মুসা (ﷺ) ও ঈসা (ﷺ)-এর শিক্ষা মেনে চলে, তাঁদের ওপর অবতীর্ণ হওয়া কিতাব মেনে চলে, তাহলে তারা নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর অনুসরণ করবে। যদি মুসা কিংবা ঈসা আজ দুনিয়াতে থাকতেন—আলাইহিমুস সালাম—তাহলে তাঁরাও মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর শিক্ষা এবং তাঁর আনীত শরীয়াহ অনুসরণ করতেন।

মহান আল্লাহ প্রত্যেক রাসূলের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন, মুহাম্মাদ (ﷺ) তাদের জীবদ্দশায় প্রেরিত হলে তাঁরা তাঁকে অনুসরণ করবেন। প্রত্যেক রাসূল মহান আল্লাহর কাছে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ জানতেন তিনি মুসা, ঈসা, ইয়াহইয়া, ইসমাইল, ইসহাকের জীবদ্দশায় মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে পাঠাবেন না। আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম। তবু তিনি তাদের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে সম্মানিত করার জন্য।

আল্লাহ (ﷻ) বলছেন,

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، قَالَ أَأَقْرَضْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، قَالُوا أَقْرَضْنَا، قَالَ فَاشْهَدُوا، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ

‘মনে করে দেখুন, আল্লাহ (সুবহানু ওয়া তা’আলা) যখন তাঁর নবীদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, এ হচ্ছে কিতাব ও তার ব্যবহারিক জ্ঞান কৌশল, যা আমি তোমাদের দান করলাম। অতঃপর তোমাদের কাছে যখন আমার কোনো রাসূল আসবে (মুহাম্মাদ ﷺ), যে তোমাদের কাছে রক্ষিত আগের কিতাবের সত্যায়ন করবে, তখন তোমরা অবশ্যই তাঁর (আনীত বিধানের) ওপর ঈমান আনবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে। আল্লাহ (সুবহানু ওয়া তা’আলা) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি এ কথার ওপর এ অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে? তারা বলল, হ্যাঁ, আমরা মেনে চলার অঙ্গীকার করছি। আল্লাহ বললেন, তাহলে তোমরা সাক্ষী থেকে এবং আমিও তোমাদের সাথে এ অঙ্গীকারে সাক্ষী হয়ে রইলাম।’ [সূরা আলে ইমরান, ৩: ৮১]

আল্লাহ (ﷻ) তাঁর নবী-রাসূলদের স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন, যদি তোমাদের জীবদ্দশায় মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে পাঠানো হয়, তাহলে তোমাদের সবাইকে তাঁর অনুসরণ করতে হবে এবং তাঁকে সাহায্য করতে হবে। তারপর আল্লাহ (ﷻ) নবী-রাসূলদের কাছে জানতে চাইছেন, ‘তোমরা কি এ কথার ওপর এ অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে?’

তাঁরা উত্তর দিয়েছিলেন, ‘আমরা মেনে নিলাম।’

এভাবে নবী-রাসূলগণ (ﷺ) তাঁদের নবুওয়াতের স্বীকৃতি পেয়েছিলেন।

ঈসা (ﷺ) যখন পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করবেন, তখন তিনি পরিপূর্ণভাবে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর আনীত শরীয়াহ অনুসরণ করবেন। ঈসা (ﷺ) যখন ফিরে আসবেন তখন মুসলিম উম্মাহর একজন আমীর থাকবেন। তিনি হবেন একজন সাধারণ মানুষ এবং নেতা—কোনো নবী নন। ঈসা (ﷺ) যখন এসে পৌঁছাবেন তখন মুসলিমরা থাকবে সালাত আদায় করার অবস্থায়। ঈসা (ﷺ)-কে দেখার পর মুসলিমদের আমীর তাঁকে ইমামতি করার জন্য অনুরোধ করবেন। কিন্তু ঈসা (ﷺ) ইমামতি করবেন না; বরং মুসলিমদের আমীরের পেছনে সালাত আদায় করবেন। এই হাদীস সহীহ।^[৮০] এই হাদীস নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে ইবনুল জাওয়যি (রহ.) বলেছেন,

‘যদি ঈসা (ﷺ) ইমামতি করতেন, তাহলে জাটিলতা সৃষ্টি হতো। লোকে প্রশ্ন করত,

[৮০] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, قال لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة ، قال : فينزل عيسى ابن مريم - صلى الله عليه وسلم - فيقول أمرهم : تعال صل لنا ، فيقول : لا إن بعضكم على بعض أمراء نكرمة الله هذه الأمة ‘আমরা উম্মাতের একটি দল কিয়ামাত পর্যন্ত হকের পথে প্রকাশ্যে যুদ্ধ (কিতাল) করতে থাকবে। এরপর ঈসা বিন মারইয়াম (ﷺ) অবতরণ করবেন। তখন (মুসলিমদের) আমীর তাঁকে বলবেন, এগিয়ে আসুন, আপনি আমাদের সালাত পড়ান। তিনি বলবেন, না, তোমরা একে অন্যের আমীর। আল্লাহ এই উম্মাতকে এই সম্মান দিয়েছেন।’-সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১৫৬

তিনি কি প্রতিনিধি হিসেবে এগিয়েছেন নাকি নতুন শরীয়াহর প্রবর্তক হিসেবে? তিনি মুক্তাদী হবেন যেন সন্দেহের ধুলায় কলুষিত না হন।^[৮৪]

ইসলাম কোনো পুরোনো আসবাব না যা বছর বছর মেরামত করতে হবে। যার ২০২০ সংস্করণ বের করতে হবে। ইসলামের নানান রূপ নেই। ইসলাম একটিই, যা ১৪০০ বছর আগে নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) নিয়ে এসেছিলেন, শিখিয়েছিলেন, পালন করেছিলেন। এটিই আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দীন। একমাত্র ধর্ম। একমাত্র জীবনব্যবস্থা। এর কোনো সংস্কার, কোনো ঘষামাজার দরকার নেই।

আজ কিছু কিছু মানুষ নিজেদেরকে আল্লাহর চেয়ে বেশি দয়ালু দাবি করতে চায়। দয়ার নামে তারা অদ্ভুত সব যুক্তি আনে। তারা বলতে চায় কাফির-মুশরিকরাও জান্নাতে যেতে পারে।

যেমন তারা বলে, কেউ অনেক হাসপাতাল তৈরি করেছে। লক্ষ লক্ষ কিংবা কোটি কোটি অসহায়, এতিম বাচ্চার দেখাশোনা করেছে। যুদ্ধের সময় পুঁতে রাখা ল্যান্ডমাইন সরিয়েছে। অসংখ্য দরিদ্র মানুষকে সাহায্য করেছে। সে সারা জীবন মানুষের ভালো করেছে, কখনো কাউকে আঘাত করেনি। কারও ক্ষতি করেনি। কিন্তু সে আল্লাহ ও তাঁর নবী (ﷺ)-এর ওপর ঈমান আনেনি। সে মারা গেছে কাফির কিংবা মুশরিক হিসেবে। এমন একজন মানুষ কি এতসব ভালো কাজের পরও জাহান্নামে যাবে? শুধু কাফির কিংবা মুশরিক হবার কারণে তার সব ভালো কাজ নিষ্ফল হয়ে যাবে?

এটা হলো তাদের কথা।

আমরা স্পষ্টভাবে বলি, হ্যাঁ, এমন সব লোক জাহান্নামে যাবে। যে তাওহিদ ও রিসালাত গ্রহণ করবে না—সে যা-ই করুক না কেন—আখিরাতে তার স্থান হবে জাহান্নামে।

যারা দয়ার নামে কাফির ও মুশরিকদের জান্নাতী বানাতে চায় তারা আসলে মনে করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর চেয়ে তারা বেশি বোঝে। তারা মনে করে তারা আর-রাহমান, আর-রাহীমের চেয়ে বেশি দয়ালু। আল্লাহ তাঁর দয়ার মাত্র ১ ভাগ সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছেন। বাকি ৯৯ ভাগ রেখে দিয়েছেন নিজের কাছে। এই এক ভাগ দয়ার কারণেই মা সন্তানকে ভালোবাসে, স্বামী তার স্ত্রীকে ভালোবাসে, ভাই ভালোবাসে ভাইকে। জগতের সকল ভালোবাসা আর দয়া আল্লাহর মোট দয়ার মাত্র একভাগ।^[৮৫] আর এই একভাগ দয়ার খুব সামান্য একটু অংশ পেয়ে আল্লাহর এই

[৮৪] উস্তাদ ড. মূসা শাহীন লাশীন, ফাতহুল মুনঈম শরহ সহীহ মুসলিম : ১/৫০৩

[৮৫] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ‘আল্লাহ দয়াকে এক শ ভাগে বিভক্ত করেছেন। এরপর ৯৯ ভাগ নিজের কাছে রেখেছেন আর দুনিয়ায় এক ভাগ নাযিল করেছেন। এই এক ভাগ থেকেই সৃষ্টিকুল পরস্পর দয়া প্রদর্শন করে। এমনকি চতুষ্পদ জন্তু তার সন্তানের ওপর খুর তুলে ধরে, যেন সে আঘাত

নাদান সৃষ্টি মনে করে তাদের দয়া আল্লাহর চেয়ে বেশি! কতবড় ধৃষ্টতা!

কিছু মানুষ এ ধরনের কথা বলে কাফিরদের সমালোচনা থেকে বাঁচার জন্য। কাফিরদের সামনে নিজেদের মানবিক ও গ্রহণযোগ্য হিসেবে উপস্থাপন করার জন্য। জাতে ওঠার জন্য। এসব কথা বললে আজ খুব সহজে জনপ্রিয় হওয়া যায়, প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। দ্বীন বেচে দিন কাটানো এই লোকেরা এ ধরনের কথাবার্তা বলে আল্লাহর শত্রুদের কাছ থেকে ‘মডারেট’ হবার সার্টিফিকেট পায়। এরা মডারেট হবার সার্টিফিকেট কেনে দ্বীন বিক্রি করে। ইসলামের শত্রুরা তখন বলে, হ্যাঁ অমুক ব্যক্তি একজন ভালো মুসলিম। সে একজন মডারেট মুসলিম।

এই ধরনের লোকেরা খুব সহজে অনেক অনুসারীও জুটিয়ে ফেলতে পারে। অসংখ্য জাহেল, মূর্খ লোক এদের অনুসরণ করে। মহান আল্লাহ আমাদের পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন,

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

‘ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা কখনোই তোমার ওপর খুশি হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি তাদের মিল্লাতের অনুসরণ করো।’ [সূরা বাক্বারাহ, ২: ১২০]

অনেকে এই আয়াতের অর্থ ভুল বোঝে। তারা মনে করে ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের মিল্লাতের অনুসরণ করার মানে হলো রাস্তায় গিয়ে চিৎকার করে বলা, ‘আমি একজন ইহুদী, আমি একজন খ্রিষ্টান!’

এই আয়াতের অর্থ, চিৎকার করে নিজেকে ইহুদী, খ্রিষ্টান, হিন্দু কিংবা নাস্তিক ঘোষণা করা, অথবা এমন কথা বলে প্রবন্ধ লেখার মধ্যে সীমিত না। কাফিররা যে শুধু এসবেই সন্তুষ্ট হয়, তা না। আন্তঃধর্মীয় সংলাপের অংশ হয়ে যেসব কুফর উচ্চারণ করতে হয়, যেসব কুফরের স্বীকৃতি দিতে হয়—সেগুলোও তাদেরকে সন্তুষ্ট করে। কারা জান্নাতে যাবে আর কারা জাহান্নামী হবে সেটা আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর ফয়সালাকে বাদ দিয়ে সেখানে নিজের মতকে প্রাধান্য দেয়া, আল্লাহর বক্তব্যের বদলে নিজের মতকে প্রচার করার কাজও এই আয়াতের বক্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের কাজও কাফিরদের সন্তুষ্ট করে।

সুতরাং সাধারণ মূলনীতি হলো, যদি কেউ কুফর এবং শিরকের ওপর মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তার চিরস্থায়ী ঠিকানা জাহান্নাম। কেউ কেউ এখানে সূরা ইসরার ১৫ নং আয়াত উল্লেখ করে জল ঘোলা করার চেষ্টা করে। এ আয়াতে আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

‘আর রাসূল পাঠানোর আগে আমি কোনো জাতিকে আযাব দিই না।’ [সূরা আল ইসরা, ১৭: ১৫]

সতর্ককারী না পাঠিয়ে আল্লাহ (ﷻ) কোনো জাতিকে আযাবের মুখোমুখি দাঁড় করান না। এটি সত্য, তবে এটি আমাদের এখানকার আলোচনার মূল বিষয় নয়। ইবনু কাসির (رحمته) তাঁর তাফসীর ইবনু কাসিরে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আগ্রহীরা দেখে নিতে পারেন।

তবে সতর্কবার্তা তাদের কাছে পৌঁছেনি এই দাবি করা করতে পারে, কাদের কাছ থেকে এই দাবি এলে তা গ্রহণযোগ্য হবে—সেটা আমাদের ভাবা দরকার। অ্যামাযন জঙ্গলের গভীরে, অন্ধকার কোনো এক প্রান্তে থাকা গোত্রের লোকেরা হয়তো এ কথা বলতে পারে। কোনো দুর্গম পাহাড়ের ভেতরে গুহায় বসবাস করা, বাকি পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো গোত্র হয়তো এমন দাবি করতে পারে। কিন্তু আজকে গুগলের যুগে, স্যাটেলাইট টিভি আর ইন্টারনেটের যুগে, সব তথ্য যার হাতের নাগালে আছে, সে যদি দাবি করে ইসলামের দাওয়াহ তার কাছে পৌঁছেনি—তাহলে সেটা গ্রহণযোগ্য না।

ইমাম আহমাদ (رحمته) বলেছিলেন,

لا أعرف اليوم أحدا يدعى

‘আজকের দুনিয়ায় এমন কোনো ব্যক্তির কথা আমার জানা নেই যাকে দাওয়াহ দিতে হবে।’^[৮৬]

ইমাম আহমাদ কত শত বছর আগে এ কথা বলেছিলেন চিন্তা করুন! তাহলে আজকের ‘গ্লোবাল ভিলেজের’ যুগে কেউ এমন অজুহাত দিলে তার যৌক্তিকতা কতটুকু?

কিছু লোক আছে যারা এখানে আপত্তি করতে চাইবে। তারা বলবে, আপনারা যেটা বলছেন সেটা ভুল। আজকের দুনিয়ায় সবাই হয়তো ইসলামের কথা শুনেছে, কিন্তু তাদের কাছে প্রকৃত ইসলাম পৌঁছায়নি। তাদের কাছে ইসলামের একটা বিকৃত ছবি পৌঁছেছে। ইসলামের মাহাত্ম্য, ইসলামের সৌন্দর্য সম্পর্কে জানার সুযোগ তারা পায়নি। বরং মিডিয়ার অপপ্রচার আর বিকৃতির কারণে অধিকাংশ লোকই ইসলাম সম্পর্কে মারাত্মক ভুল ধারণা পেয়েছে। অপপ্রচারের কারণে তারা ইসলামকে বর্বরদের ধর্ম মনে করে। মুসলিম মানেই যেন সম্ভ্রাসী।

তাদের এ দাবির যৌক্তিকতা যাচাই করা যাক। আসুন ১৪০০ বছর পেছনে ফিরে যাই।

মক্কা। ইসলাম দাওয়াহ মাত্র ছড়াতে শুরু করেছে। তাওহিদের দাওয়াহকে অন্ধুরে নষ্ট করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে মক্কার কুরাইশ মুশরিকরা। সমগ্র আরবের সামনে ইসলামকে বিকৃত করে তুলে ধরার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ওরা। শুধু তাই না, তারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ব্যাপারেও কুৎসা রটাচ্ছে।

এতকিছুর পরও, আপনি কি এমন কোনো হাদীস শুনেছেন যেখানে রাসূল (ﷺ) বলেছেন, অমুক ব্যক্তি জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পাবে কারণ সে প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারেনি?

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কি কখনো বলেছেন, কুরাইশ ইসলামের ব্যাপারে মিথ্যা রটাচ্ছিল, আর অমুক ব্যক্তি সেই বিকৃত রটনাই শুনেছিল। প্রকৃত ইসলামের খোঁজ সে পায়নি। তাই ইসলাম গ্রহণ করেনি। এ কারণে সে জাহান্নাম থেকে মাফ পাবে। এটি তার জন্য গ্রহণযোগ্য ওজর।

এমন কোনো হাদীস শুনেছেন?

না শুনেছি। যারা কুরাইশের প্রোপাগান্ডা শুনে প্রভাবিত হয়েছিল তাদের জন্য এ অজুহাত কাজে লাগেনি। তাহলে আজকে মিডিয়ার প্রোপাগান্ডা শুনে যারা ইসলাম থেকে দূরে থাকে তাদের জন্য কেন এই অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে? কীভাবে ইসলাম বিকৃতির খোঁড়া অজুহাত দিয়ে তাহলে আপনি কাফির-মুশরিকদের পক্ষে সাফাই গাচ্ছেন?

মুমিন হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হলো আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াহ পৌঁছে দেয়া। আর কাফিরদের দায়িত্ব হলো সত্য দ্বীনের সন্ধান করা। সত্যের খোঁজ করা। তাদের এই দায়িত্ব আমাদের দায়িত্বের চেয়েও অনেক বড়। শরীরে শক্তি বা পুষ্টি জোগান দেবার জন্য তারা যেমন খাদ্যের সন্ধান করে, তেমনি আত্মার পুষ্টির জন্য, আত্মার খোরাকির জন্য তাদেরকে আল্লাহর দ্বীনের সন্ধান করতে হবে। খাবার পানি ছাড়া জনশূন্য, পরিত্যক্ত কোনো বাড়িতে কাউকে একা ফেলে রেখে এলে সে কী করবে? বাড়ির মধ্যে পায়ের ওপর পা তুলে আয়েশ করবে? কখন তার মুখে কেউ খাবার তুলে দেবে, তার জন্য অপেক্ষা করবে? নাকি সে খাবার আর পানির জন্য আশপাশ তন্নতন্ন করে খুঁজবে?

যেভাবে দেহের খোরাকি খুঁজতে হয়, সেভাবে আত্মার খোরাকিও খুঁজতে হয়। যেভাবে দুনিয়ার জন্য জীবিকা সন্ধান করা হয়, তেমনিভাবে আখিরাতের রাস্তাও বেছে নিতে হয়। ইসলামের খোঁজ করা প্রত্যেকের ওপর আবশ্যিক।

গুনাহগার মুসলিম

যারা জাহান্নামে যাবে তাদের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণি হলো গুনাহগার মুসলিম।

মুসলিম কাদের বলা হবে, মুসলিমের সংজ্ঞা কী, আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ কাদের কাদের মুসলিম বলেছে তা নিয়ে আমরা আগে আলোচনা করেছি। সে আলোচনাটি দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।^[৮৭]

গুনাহগার কোনো মুসলিম যদি সত্যিকার অর্থে গুনাহ থেকে তাওবাহ করে এবং এমন অবস্থায় আল্লাহর মুখোমুখি হয়, তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল। তিনি আর রাহমানুর রাহীম, গাফুরুর রাহীম। তিনি শুধু ক্ষমাই করেন না, বরং যারা তাওবাহ করে তিনি তাঁদের ভালোও বাসেন। তিনি তাওবাহকারীদের ভালোবাসেন এবং তাদের আমলনামার সব পাপ মুছে তা নেকী দিয়ে পূর্ণ করে দেন।

যদি কোনো গুনাহগার মুসলিম মৃত্যুর আগে তাওবাহ না করে, তাহলে কী হবে? সে মুসলিম। সে তাওহিদ ও রিসালাতে বিশ্বাসী ছিল। সে কুফর ও শিরক আকবর করেনি। কিন্তু সে গুনাহ করেছে। তার কিছু গুনাহ হয়তো কবীরা গুনাহ ছিল, আর কিছু হয়তো অপেক্ষাকৃত কম গুরুতর গুনাহ।

এমন ব্যক্তির আমলের হিসাব হবে। মিয়ানে তার নেক আমল ও গুনাহর ওজন করা হবে। যদি তার নেক আমলের ওজন গুনাহর চেয়ে বেশি হয়, তাহলে সে জান্নাতে যাবে। কিন্তু তাঁর গুনাহ যদি নেক আমলের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে কী হবে?

আমাদের এই আলোচনা এমন মুসলিমদের নিয়েই।

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ ۱۰۲ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ۝ ۱۰۳

‘সুতরাং যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, তারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে।’ [সূরা আল-মুমিনুন, ২৩: ১০২-১০৩]

তিনি আরও বলেছেন,

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ

‘আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারা হবে সেইসব লোক, যারা নিজেদের ধ্বংস

ও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। কারণ, তারা আমার নিদর্শনসমূহকে (আয়াত) প্রত্যাখ্যান করত।’ [সূরা আল-আরাফ, ৭: ৯]

এবং তিনি বলেছেন,

﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾ ﴿٦﴾ ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ ﴿٧﴾ ﴿وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾ ﴿٨﴾ ﴿فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ﴾

‘অতঃপর যার পাল্লা ভারী হবে সে তো লাভ করবে এক চিরসুখের জীবন। আর যার পাল্লা হালকা হবে, তার আবাস হবে হাবিয়াহ (জাহান্নাম)।’ [সূরা আল-কুরিয়াহ, ১০১: ৬-৯]

কুরআনে এমন বহু আয়াত আছে, যেখানে মুসলিম বান্দার পাপ-পুণ্যের পরিমাণ কমবেশি হলে তার শেষ গন্তব্য কী হবে, আল্লাহ (ﷻ) তা পরিকার জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা আছে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ (رحمته الله)-এর ফতোয়াসমগ্রের দশম খণ্ডে। আগ্রহীরা দেখে নিতে পারেন ইনশা আল্লাহ।

যদি আপনার পুণ্যের পরিমাণ বেশি হয়, তাহলে আপনি জান্নাতী হবার সৌভাগ্য লাভ করবেন। আর যদি কবীরা ও সগীরা গুনাহর পরিমাণ পুণ্যের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে শরীয়াহর পরিভাষায় আপনি হবেন এমন একজন, যাদের বলা হয় ‘মাসীআহ’ (مُسِيئَةً)। তাদের পরিণতি নির্ভর করবে মহান আল্লাহর ইচ্ছার ওপর। অবশ্য সবকিছুই মহান আল্লাহর ইচ্ছাধীন। তবে এখানে আলাদা করে বলার অর্থ হলো, এমন মানুষদের আল্লাহ চাইলে মাফও করে দিতে পারেন আবার মাফ না করে জাহান্নামেও পাঠাতে পারেন। এটাই হলো ‘মাসীআহ’ এর অর্থ।

এমন লোকেরা আল্লাহর ক্ষমা পেতে পারে, কিংবা শাস্তি পেতে পারে। আল্লাহর শাফা’আত পেতে পারেন, অথবা আল্লাহর ইচ্ছায় রাসূলদের শাফা’আত পেতে পারেন। রাসূলগণকে শাফা’আত দেয়া হয়েছে।^[৮৮] এমনকি কুরআনুল কারীমও কারও পক্ষে শাফা’আত করতে পারে। সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে সূরা বাক্বারাহ এবং সূরা আলে ইমরান তিলাওয়াত করত, শেষ বিচারের দিন এই দুইটি সূরা তার পক্ষে শাফা’আত করার জন্য বিশাল মেঘের মতো হাজির হবে। অন্য বর্ণনায় এসেছে এই দুটি সূরা পাখির মতো কলরব করতে করতে তাদের পাঠকারীদের পক্ষে

[৮৮] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ‘নিশ্চয় কিয়ামাতের দিন আমার উম্মতের কবীরা গুনাহগারদের জন্য আমার শাফা’আত থাকবে।’-সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদীস নং : ৩৪৯৮, আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (رحمته الله)-এর মতে সহীহ।

হাজির হবে।^[৮৯]

তাহলে কার কার তরফ থেকে শাফা'আত পাওয়া যাবে বিচারের দিনে? অবশ্যই আল্লাহ (ﷻ) শাফা'আত দেবেন। সেই সাথে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং কিছু পুণ্যবান মুমিন বান্দা আল্লাহর ইচ্ছায় শাফা'আত করবেন। ফেরেশতাগণ, শহীদগণ এবং কিছু সাধারণ নেককার মুসলিম শাফা'আত করবেন। এ ছাড়া শিশুরা তাদের পিতামাতার জন্যে শাফা'আত করবে। সাওম, হাজারে আসওয়াদ পাথর শাফা'আত করবে। শাফা'আত করবেন আরাফার ময়দানে হাজির হওয়া ব্যক্তির। এর সবগুলোই সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।^[৯০]

[৮৯] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'তোমরা আয যাহরাওয়াইন অর্থাৎ সূরা বাক্বারাহ ও আলে ইমরান পড়ো। কেননা, এ দুটি সূরা কিয়ামাতের দিন দুটি মেঘ বা দুটি ছায়ার মতো হয়ে আসবে; কিংবা পাখির ঝাঁকের দুটি সারি হয়ে আসবে এবং এদের তিলাওয়াতকারীর পক্ষে বাদানুবাদ করবে।' -সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৮০৪

[৯০] ক) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, শহীদের ছয়টি বিশেষত্ব রয়েছে। এর মাঝে একটি হচ্ছে, 'সে তার নিকটজনের মাঝে সন্তরজনের জন্য শাফা'আত করবে।' -সুনানুত তিরমিযি, হাদীস নং : ১৬৬৩, তাঁর মতে হাদীসটি হাসান সহীহ গরিব।

খ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এক দীর্ঘ হাদীসে একপর্যায়ে বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলবেন, 'ফেরেশতারা শাফা'আত করেছে, নবীগণ শাফা'আত করেছে, মুমিনরা শাফা'আত করেছেন, এখন কেবল আরহামুর রাহিমীনের ক্ষমা বাকি আছে।' -সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১৮৩

গ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'অবশ্যই নবী এমন এক ব্যক্তির শাফা'আতে রাবিয়া ও মুদ্বার গোত্রের সমপরিমাণ বা কোনো একটির সমপরিমাণ লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে।' -মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং : ২২২১৫; আল্লামা শু'আইব আরনাউত্ব (ﷺ) -এর মতে সহীহ।

ঘ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'যেসকল মুসলিমের তিনটি সন্তান বালিগ হবার পূর্বেই মারা যায়, যখন আল্লাহ সেসব সন্তানকে স্বীয় অনুগ্রহ ও দয়ায় জান্নাতে প্রবেশ করাবেন তখন তাদের বলা হবে, জান্নাতে প্রবেশ করো। তারা বলবে, আমাদের বাবা-মা না আসা পর্যন্ত প্রবেশ করব না। তাদেরকে তিনবার একই কথা বলা হবে, তারাও তিনবার একই উত্তর দেবে। এরপর তাদের বলা হবে, তোমরা ও তোমাদের পিতা-মাতা একত্রে জান্নাতে প্রবেশ করো।' -মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং : ১০৬২২, আল্লামা শু'আইব আরনাউত্ব (ﷺ) -এর মতে ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ।

ঙ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'কিয়ামাতের দিন বান্দার জন্য সিয়াম ও কুরআন শাফা'আতকারী হবে। সিয়াম বলবে, হে আমার রব, আমি তাকে খাদ্য ও প্রবৃত্তি থেকে বিরত রেখেছিলাম, কাজেই তার জন্য আমার শাফা'আত কবুল করুন। আর কুরআন বলবে আমি তাকে রাতে ঘুমানো থেকে বিরত রেখেছিলাম, কাজেই তার জন্য আমার শাফা'আত কবুল করুন। ফলে তাদের উভয়ের শাফা'আত কবুল করা হবে।' -মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং : ৬৬২৬; ইমাম আহমাদ শাকির (ﷺ) -এর মতে সনদ সহীহ, আল্লামা শু'আইব আরনাউত্ব (ﷺ) এই সনদকে দ্বীফ বললেও অপর এক সনদকে শক্তিশালী বলেছেন যা রয়েছে ইমাম যাহাবী (ﷺ) -এর সিয়াকু আ'লামিন নুবালা : ১৪/৪৩৪-৪৩৫

চ) হাজারে আসওয়াদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'আল্লাহর কসম, আল্লাহ কিয়ামাতের দিন একে উত্থিত করবেন। এর দুটি চোখ থাকবে যা দ্বারা সে দেখবে, এর জবান থাকবে যা দ্বারা কথা বলবে। সে সেই লোকের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে, যে সঠিকভাবে একে স্পর্শ করেছিল।' -সুনানুত তিরমিযি,

এতসব শাফা'আত পাবার পরও যদি কোনো ব্যক্তি রক্ষা না পায় (আমরা দু'আ করি আমাদের কারোরই যেন এমন পরিণতি না হয় এবং আমরা আশা রাখি, ইন শা আল্লাহ আমরা সবাই এই করুণ পরিণতির হাত থেকে রেহাই পাব) তাহলে আল্লাহ (ﷻ) তাকে নির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্য জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। জাহান্নামের আগুনে পুড়ে পুড়ে সে তার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করবে, তার গুনাহ মাফ হবে। তারপর একসময় আল্লাহ (ﷻ) তাঁকে জাহান্নাম থেকে তুলে চিরসুখের জান্নাতে স্থান দেবেন। নাসআলুল্লাহ সালামাহ।

যে ব্যক্তি ছোট শিরক নিয়ে আল্লাহর মুখোমুখি হবে

এটি একটি বিপজ্জনক শ্রেণি। ছোট শিরক নিয়ে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়া ব্যক্তিদের পরিণতি কী হবে? বড় শিরকের মতো ছোট শিরক ব্যক্তিকে ইসলামের গাঙি থেকে বের করে দেয় না। একজন মুসলিম যদি ছোট শিরক করে বসেন, তারপরেও তিনি মুসলিম থাকবেন। তার ঈমান চলে যাবে না।

ছোট শিরক বা (الشرك الأصغر) হলো এমন সবকিছু যা মানুষকে বড় শিরকের দিকে নিয়ে যায়। যা বড় শিরকের রাস্তা খুলে দেয়। কুরআন ও সুন্নাহতে যা কিছুকে শিরক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, কিন্তু যেগুলো বড় শিরকের পর্যায়ে পড়ে না, সেগুলোকে ছোট শিরক গণ্য করা হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিভিন্ন বিষয়কে ছোট শিরক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। খুব স্পষ্টভাবে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন, এই কাজগুলো ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত। যেসব শিরকের আলোচনায় হাদীসে নির্দিষ্টতা বোঝাতে 'আল' যুক্ত হয়নি, সাধারণত সেগুলো ছোট শিরকের মধ্যে পড়ে। আর যেসব ক্ষেত্রে নির্দিষ্টভাবে আল যুক্ত হয়ে 'আশ-শিরক' বলা হয়েছে, সাধারণত সেখানে শিরক আকবর বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যেসব হাদীসে শুধু শিরক বলা হয়েছে, সাধারণত সেখানে ছোট শিরকের কথা বোঝানো হয়েছে।

সাহাবায়ে কেরাম (رضي الله عنهم) যেসব কাজকে ছোট শিরক গণ্য করেছেন, আমরাও সেগুলোকে ছোট শিরক গণ্য করি। এ ব্যাপারে আমরা তাদের ব্যাখ্যা ও বুঝ গ্রহণ করি। ছোট শিরকের একটি উদাহরণ হলো আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে শপথ করা। এর আগে আমরা এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম।^[৯১] এ ছাড়া 'মা শা আল্লাহ ওয়া শি'তা' এর মতো বক্তব্যগুলোও ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

ما شاء الله وشئت

হাদীস নং : ৯৬১, তাঁর মতে হাসান।

[৯১] দ্রষ্টব্য : তাওহীদের মূলনীতি, প্রথম খণ্ড, ইলমহাউস পাবলিকেশন।

অর্থাৎ এমন বলা যে, যা আল্লাহর ইচ্ছা এবং আপনার ইচ্ছা..., অথবা

لولا الله وأنت

আপনি এবং আল্লাহ না থাকলে...

توكلت على الله وعليك

আমি ভরসা করছি আল্লাহর ওপর এবং আপনার ওপরও

এই ধরনের বক্তব্যগুলো ছোট শিরক। যদি কেউ বলে আমি আল্লাহর ওপর ভরসা করছি এবং আপনার ওপর। এবং এর মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বোঝায়, তাহলে সেটা ছোট শিরক। অন্যদিকে কেউ যদি বলে, আমি বৃষ্টির জন্য আল্লাহর ওপর নির্ভর করি এবং আপনার ওপর। তাহলে সেটা বড় শিরক, অর্থাৎ শিরক আকবর।

এটি একটি বিপজ্জনক বিষয়। তাই এ বিষয়ে আরও কিছু উদাহরণ দিচ্ছি। অনেকেই তাদের ঘরের ভেতরে এমন পোস্টার, ছবি, ক্যালিগ্রাফি বা ফ্রেইম রাখেন যেখানে আল্লাহ এবং মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নাম পাশাপাশি রাখা হয়। এটা এক ধরনের ছোট শিরক।

কুরআনের আয়াত, আল্লাহর নাম কিংবা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নাম দেয়ালে বা অন্য কোথাও ঝোলানোর বৈধতা নিয়ে সমসাময়িক ওলামায়ে কেরাম আলোচনা করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন এমন করা জায়েজ না। এটি হারাম। এর দ্বারা কুরআনের আয়াতের বা আল্লাহর নামের অসম্মান করা হচ্ছে। কারণ, ঘরে ঝুলিয়ে রাখা হলে এমন ফ্রেম বা ছবিকে অবহেলা করার আশঙ্কা থাকে। অনেকে বলেছেন, এগুলো পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে—এটিও বিবেচনা করা দরকার।

আবার কেউ কেউ বলেছেন এমন কিছু ঝোলানো মুবাহ। অর্থাৎ বৈধ। আবার কেউ বলেছেন এমন করা উত্তম।

এ ধরনের কিছু ঝোলানো যাবে কি না, এটা একটা ফিকহি প্রশ্ন। এ প্রশ্নে কে কোন মত গ্রহণ করছে সেটা তার অবস্থানকে প্রভাবিত করবে। আমার মতে, যারা হারাম মনে করেন তাদের দলিল অতটা শক্ত না। কেউ হয়তো বলতে পারেন, আপনি বলছেন দলিল শক্ত নয়, কিন্তু অমুক অমুক আলিমরা তো একে হারাম বলেছেন। উত্তরে আমি তাঁদের সমতুল্য এমন আলিমদের কথা দেখাতে পারব, যারা এটার অনুমতি দিয়েছেন; কোনো আপত্তি করেননি।

আমি বলি, কুরআনের আয়াত বা হাদীস দেয়ালে টাঙিয়ে কেউ যদি রিমাইন্ডার হিসেবে ব্যবহার করতে চায়, তাহলে ইন শা আল্লাহ তা উত্তম। হারাম না।

তাহলে এমন করা উত্তম হলে কেন এখানে আমি এ নিয়ে আলোচনা করছি? আমরা

আসলে আল্লাহ (ﷻ)-এর নাম এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নাম পাশাপাশি, একই সাথে উল্লেখ করার ব্যাপারে ফোকাস করতে চাই।

আজকাল আপনি এমন অনেক ছবি, ফ্রেমের ডিজাইন, কফির মগ, ঘড়ি ইত্যাদি দেখবেন যেখানে আল্লাহ (ﷻ) এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নাম পাশাপাশি লেখা। এটি এক ধরনের ছোট শিরক। এভাবে চলতে থাকলে এক সময় মানুষের মনে এমন একটা ধারণার সৃষ্টি হয় যে, আল্লাহ (ﷻ) এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) একই ধরনের মর্যাদার অধিকারী!

আল্লাহ এবং আপনার ওপর ভরসা করি,

আপনি এবং আল্লাহ না থাকলে,

আল্লাহর ইচ্ছা আর আপনার ইচ্ছা হলে...

এ ধরনের কথাগুলো বলা যেমন ছোট শিরক তেমনিভাবে আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নাম পাশাপাশি লেখাও ছোট শিরক। তবে এক দিকে আল্লাহর নাম ও অন্য দিকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নাম লেখা যাবে। অথবা আল্লাহর নামের নিচে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নাম লেখা যাবে। কিন্তু পাশাপাশি না, একই সাথে না, একই পর্যায়ে না।

একজন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলল,

ما شاء الله و شئت

যা আল্লাহর ইচ্ছা এবং আপনার ইচ্ছা...

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রতিবাদ করে বললেন,

أَجْعَلَنِي لِلَّهِ نِدًّا؟ قُلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ

‘তুমি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানাচ্ছ? বলো, কেবল যা এক আল্লাহ চেয়েছেন...।’^[৯২]

আরেকটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله، ثم شاء فلان

‘তোমরা কখনো বলবে না যে, যা আল্লাহ চেয়েছেন এবং অমুক চেয়েছে; বরং তোমরা বলবে, যা আল্লাহ চেয়েছেন, অতঃপর অমুক চেয়েছে।’^[৯৩]

এখানে ওয়াও (و) হলো মুসাওয়াহ (مساواة)। মুসাওয়াহ অর্থ সমতুল্য। অর্থাৎ এখানে

[৯২] ইমাম ইবনুল কায়্যিম (رحمته الله)، يادول ما'আদ : ২/৪২৯, আল্লামা শু'আইব আরনাউত্ব (رحمته الله)-এর মতে সনদ সহীহ।

[৯৩] সুনানু আবি দাউদ, হাদীস নং : ৪৯৮০; আল্লামা শু'আইব আরনাউত্ব (رحمته الله)-এর মতে সহীহ।

‘ওয়াও’ এর দ্বারা সমান বোঝানো হচ্ছে এবং ভাষাগতভাবে এর মাধ্যমে সমতুল্যতা বোঝানো হচ্ছে। যদি আপনি এখানে ‘সুম্মা’ ব্যবহার করেন, তাহলে সেটা একটি তারতীব বা ক্রমধারা প্রকাশ করে। সমতুল্যতা প্রকাশ করে না। সুম্মা অর্থ : ‘আর তারপর’। এর ফলে ক্রমধারা প্রকাশ করা হয়। কাজেই ‘সুম্মা’ ব্যবহার করে বলার অর্থ, যা আল্লাহর ইচ্ছা আর তারপর আপনার ইচ্ছা (যদি তা উক্ত ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন হয়)।

ইমাম বুখারী (رحمہ اللہ) বুখারী শরীফের একটি অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন,

باب لا يقال: ما شاء الله و شئت

অর্থাৎ ‘আল্লাহ যা চেয়েছেন এবং তুমি যা চাও এটা বলা যাবে না’ বিষয়ক অধ্যায়।

ইমাম বুখারী (رحمہ اللہ) কত প্রস্তার সাথে অধ্যায়গুলোর শিরোনাম ঠিক করতেন তা নিয়ে এর আগে আমরা আলোচনা করেছিলাম, মনে আছে?^[৯৪] ইমাম বুখারী শিরোনামের মাধ্যমে অনেক কিছু প্রকাশ করতেন। তাঁর বাছাই করা শিরোনামগুলোর মধ্যে অনেক ইলম লুকিয়ে আছে। ‘মা শা আল্লাহ ওয়া শি’তা—যা আল্লাহর ইচ্ছা এবং আপনার ইচ্ছা’ এই ধরনের কথা কেন বলা যাবে না তা নিয়ে ইমাম বুখারী একটি আলাদা অধ্যায় করেছেন।

ছোট শিরকের আরেকটি উদাহরণ হলো রিয়া। যেমন: মানুষকে দেখানোর জন্য ইবাদাত করা। অন্যকে দেখানোর জন্য সুন্দর করে দীর্ঘ সময় নিয়ে সালাত আদায় করা। অন্যকে শোনানোর জন্য সালাতে নিজের তিলাওয়াতকে সুন্দর করা। এগুলো ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

যারা ছোট শিরক করে তারা কী মাসীআহর অন্তর্ভুক্ত হবে?

ছোট শিরক করা ব্যক্তি কি মাসীআহর অন্তর্ভুক্ত হবে?

আসলে এ প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যেই আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম। উত্তর যেন সহজে বোঝা যায় সেজন্য এতক্ষণ আমরা বেসিক আলোচনাটা দেখলাম। এখন প্রশ্ন হলো, গুনাহগার মুসলিমরা যেভাবে মাসীআহ হিসেবে বিবেচিত হবে সেভাবে ছোট শিরককারীরাও কি মাসীআহর অন্তর্ভুক্ত হবে? যেসব লোকেরা ছোট শিরকের গুনাহ নিয়ে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে তাদের পরিণতি কী হবে?

ধাপে ধাপে এই প্রশ্নের উত্তর দেয়া যাক। মনোযোগ দিয়ে শুনুন। বিষয়টি একটু জটিল তাই ভালোভাবে লক্ষ করুন।

[৯৪] তাওহিদের মূলনীতি, প্রথম খণ্ড, দারস ১৪ দ্রষ্টব্য।

আমরা কাদের মাশীআহ বলেছিলাম আরও একবার মনে করিয়ে দিই। হাশরের ময়দানে কোনো মুসলিমের আমল হিসেব-নিকেশ করার পর যদি দেখা যায় তার গুনাহর চেয়ে নেক আমল অনেক বেশি, তাহলে সে জান্নাতে যাবে। কিন্তু যদি গুনাহর পরিমাণ নেক আমলের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে তাকে ‘মাশীআহ’ গণ্য করা হবে। হয় একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জাহান্নামের আগুনে পুড়ে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে তারপর জান্নাতে যাবে; অথবা আল্লাহ (ﷻ) তাকে ক্ষমা করে দেবেন, অথবা কোনো শাফা’আতকারীর শাফা’আতের মাধ্যমে সে মুক্তি লাভ করবে, ইনশা আল্লাহ।

এখন আমাদের মূল প্রশ্নে ফিরে আসি। যেসব মুসলিম ছোট শিরক করে তারা কি মাশীআহর অন্তর্ভুক্ত?

ইজমা হলো, যেসব মুসলিম ছোট শিরক করে তারা কাফির না; মুসলিম। একই ভাবে এটাও ইজমা যে, ছোট শিরকের কারণে যে মুসলিম জাহান্নামে যাবে, সে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না—গুনাহ মাফ হয়ে গেলে সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ (ﷺ)-এর বইগুলো পড়লে আপনি দেখতে পাবেন, তিনি কিছু জায়গায় বলেছেন, ছোট শিরককারীকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। ছোট শিরককারী মাশীআহর অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তাকে শাস্তি পেতেই হবে।^[৯৫] অবশ্যই, সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছাধীন। আল্লাহ চাইলেই যে কাউকে মাফ করে দিতে পারেন। কিন্তু আল্লাহ আমাদের তাঁর কিছু ফয়সালার ব্যাপারে ইতিমধ্যে সুস্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন। যেমন: তিনি আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন, যারা শিরক করবে তাদের শাস্তি হলো জাহান্নামের আগুন। সুতরাং ইবনু তাইমিয়াহ (ﷺ) এবং অন্যান্য আরও আলিমদের মত হলো, ছোট শিরককারীদের অবশ্যই শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। সগীরা এবং কবীরা গুনাহকারীরা মাশীআহর অন্তর্ভুক্ত হলেও ছোট শিরককারীরা মাশীআহর অন্তর্ভুক্ত না।

তাঁদের এই দাবির প্রধান দলিল হচ্ছে কুরআনের এই আয়াত,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ শিরক করার গুনাহ ক্ষমা করেন না। তবে এর চেয়ে ছোট গুনাহকারী যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেবেন।’ [সূরা আন-নিসা, ৪: ৪৮]

[৯৫] ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (ﷺ) বলেছেন, ‘আল্লাহর নিকট সবচাইতে বড় গুনাহ হচ্ছে তাঁর সাথে শিরক করা। তিনি তাঁর সাথে শিরক করাকে ক্ষমা করবেন না, তবে এর চেয়ে ছোট গুনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেবেন। আর এই শিরকের মাঝে বিরাট, সূক্ষ্ম, গোপন ও প্রকাশ্য সকল শিরকই অন্তর্ভুক্ত।’-জামিউর রাসাইল : ২/২৫৪

এই আয়াতে আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন, তিনি তাঁর সাথে শিরক করার গুনাহ ক্ষমা করবেন না; শিরকের চেয়ে ছোট অন্যান্য যেকোনো গুনাহ তিনি মাফ করে দেবেন। ইবনু তাইমিয়াহ (رحمہ اللہ) সহ অন্যান্য আলেমগণ মনে করেন, এই আয়াতে আল্লাহ (ﷻ) শিরক বলতে বড় শিরক এবং ছোট শিরক দুটিকেই বুঝিয়েছেন। পার্থক্য হলো ছোট শিরককারীদের আল্লাহ (ﷻ) একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জাহান্নামের আযাব ভোগ করাবেন তারপর জান্নাতে ঠাই দেবেন। কিন্তু বড় শিরককারীদের কোনো ক্ষমা নেই। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন, ‘তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।’ সিদ্দিক খান, আবদুর রহমান ইবনু কাসিম, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাবের কিছু ছাত্র ও অনুসারী উলামাও এই মত পোষণ করতেন।

তবে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (رحمہ اللہ) তাঁর ফতোয়া গ্রন্থেরই আরেক জায়গায় ছোট শিরককে কবীরা গুনাহর সমতুল্য হিসেবে গণ্য করেছেন। এবং বলেছেন, ছোট শিরককারী মারীআহর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ (ﷻ) এদেরকে ক্ষমা করতেও পারেন আবার ক্ষমা নাও করতে পারেন। বড় শিরককারীদের ব্যাপারে আল্লাহ যেমন ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন যে, তাদেরকে তিনি কখনোই ক্ষমা করবেন না, তাদের চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে, ছোট শিরককারীদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি তেমন নয়। আল্লাহ (ﷻ) চাইলেই তাদের শাস্তি দিতে পারেন আবার চাইলেই তাদের মাফ করে দিতে পারেন।^[৯৬] মুহাম্মাদ ইবনু আলি ইবনু গারীব^[৯৭] (رحمہ اللہ) এ মত গ্রহণ করেছেন। তাফসির আস সা’দি অধ্যয়ন করলে মনে হবে আস-সা’দি^[৯৮] (رحمہ اللہ)-ও এ মত পোষণ করতেন। ইবনু তাইমিয়াহ (رحمہ اللہ) যে মুসলিম ছোট শিরককারীদের যে মারীআহর অন্তর্ভুক্ত হিসেবে গণ্য করেছেন তার দলিল হিসেবেও উপস্থাপন করা হয় এই আয়াতটি,

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ শিরক করার গুনাহ ক্ষমা করেন না।’ [সূরা আন-নিসা, ৪: ৪৮]

[৯৬] শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ (رحمہ اللہ) বলেছেন, ‘আর ছোট শিরকের ব্যাপার হচ্ছে, যদি মুসলিম অবস্থায় ছোট শিরক করে মারা যায়, তাহলে তাকে এজন্য শাস্তি দেয়া হবে। আর হয়তো এরপর জান্নাতে প্রবেশ করতে দেয়া হবে।’-আল ইস্তিগাসা, পৃষ্ঠা : ১৪৬

[৯৭] তাঁর পুরো নাম মুহাম্মাদ বিন আলি বিন গারীব আন নাজদী আল হাম্বলী (رحمہ اللہ), তিনি ইবনু গারীব নামেই প্রসিদ্ধ। জন্ম ১৭৩৭ ঈসাব্দ সনে, মৃত্যু ১৭৯৪ সালে। তিনি দিরিয়ায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম সৌদি ইমারতের (বর্তমানে ৩য় ইমারত প্রতিষ্ঠিত আছে) অন্যতম প্রধান আলিম এবং ইমামুদ দাওয়াহ মুহাম্মাদ বিন আব্দিল ওয়াহহাবের মেয়ের জামাই ছিলেন।

[৯৮] শাইখ আব্দুর রাহমান বিন নাসির আস-সা’দির জন্ম ১৮৮৯ সালে, মৃত্যু ১৯৫৬ সালে। তিনি উয়াইনার জামে মসজিদের খতিব ছিলেন এবং কিছুকাল সেখানকার কাযিও ছিলেন। তাঁর ছাত্রদের মাঝে সৌদির ১৪০ জন প্রখ্যাত আলিম রয়েছেন। এর মাঝে রয়েছেন শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমিন (رحمہ اللہ) ও শাইখ আব্দুল্লাহ আকীল। তাঁর প্রখ্যাত তাফসির হচ্ছে তাইসিরুল কারিমির রাহমান যা তাফসিরুস সা’দি নামে প্রসিদ্ধ।

তাঁরা বলেন, এই আয়াতে শিরক আকবরের কথা বলে হচ্ছে। কারণ এই আয়াতের আগের ও পরের আয়াতগুলোতে আল্লাহ (ﷻ) মুশরিক, মুনাফিক এবং আহলে কিতাবদের কথা বলেছেন। এ ছাড়া এ আয়াতে শেষাংশ থেকে মনে হয়, সেখানে বড় শিরকের ব্যাপারে বলা হচ্ছে। কাজেই এ আয়াতের বক্তব্য মূলত শিরক আকবর বা বড় শিরকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

‘ছোট শিরককারী মাসীআহর অন্তর্ভুক্ত হবে কি হবে না’ এই বিষয়ের ওপর গভীর ও বিস্তারিত পর্যালোচনাসমূহ একটি মাস্টার্স থিসিস হয়েছিল বলে শুনেছিলাম বেশ কিছু সময় আগে। যদিও সেটা পড়ার সুযোগ হয়নি, আর সম্ভবত ওটা এখনো প্রকাশিতও হয়নি। তবে আমাদের বোঝা দরকার, এটি এমন একটি বিষয় যেখানে ইবনু তাইমিয়াহর মতো মহান ইমামের দুটি আপাতভাবে সাংঘর্ষিক মত আছে বলে দেখা যাচ্ছে। একইভাবে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্‌হাবের ছাত্র ও অনুসারী আলিমগণের—অর্থাৎ নাজদী দাওয়াহর ইমামগণের—মধ্যেও এ ব্যাপারে মতপার্থক্য আছে। আমি দুটি মত এখানে আপনাদের জানিয়ে রাখলাম। আপাতত আমরা কোনো একটি মত বাছাই করব না।

আশা করি এই আলোচনা থেকে আপনারা ছোট শিরকের ভয়াবহতা বুঝতে পারছেন। আলিমদের একাংশের মতে, কেউ ছোট শিরক নিয়ে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হলে, সে মাসীআহর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। অর্থাৎ মাফ পেয়ে যেতে পারে, অথবা কিছুকাল শাস্তি ভোগ করে তারপর মাফ পেতে পারে। আবার আলিমদের আরেক অংশের মতে ছোট শিরক নিয়ে মহান আল্লাহর সামনে উপস্থিত হলে কিছু সময় জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করতেই হবে। কাজেই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর।

কিছুদিন আগে আমরা ইবনু মাসউদ (رضي الله عنه)-এর একটি উক্তি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। তিনি (رضي الله عنه) বলেছেন,

لَأَنْ أَخْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَخْلِفَ بغيرِهِ وَأَنَا صَادِقٌ

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নামে সত্য কসম করার চেয়ে আল্লাহর নামে মিথ্যা কসম করা আমার নিকট অধিক প্রিয়।^[৯৯]

কারণ, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে কসম করা ছোট শিরক। আর মিথ্যা কথা বলা হলো গুনাহ। কাজেই ছোট শিরকের চেয়ে গুনাহ অপেক্ষাকৃত কম গুরুতর। কাজেই ইবনু মাসউদ (رضي الله عنه)-এর এই উক্তি থেকেও মনে হয়, ছোট শিরককারী মাসীআহর অন্তর্ভুক্ত হবে না। কাজেই এ ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকা দরকার।

[৯৯] ইমাম হাইসামী (رحمته الله), মাজমাউয যাওয়াইদ : ৪/১৪০, তাঁর মতে এর রিজাল সহীহ।

ছোট শিরক থেকে নিজেকে রক্ষা করার দু'আ

উসুলুস সালাসাহর লেখক বলেছেন,

وَمَنْ غَصَّاهُ دَخَلَ النَّارَ

যে (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর) অবাধ্যতা করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

আশা করি তাঁর এ কথার তাৎপর্য আপনারা এখন বুঝতে পেরেছেন। ছোট শিরক অত্যন্ত বিপজ্জনক ও ভয়ংকর। এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলে শ্রোতারা খুব ভয় পেয়ে যান। ভয়ে তাদের চেহারার রং বদলে যায়, মুখে নেমে আসে অন্ধকার। ছোট শিরক কতটা ভয়ংকর এ ব্যাপারে একটি হাদীস উল্লেখ করে আমি শেষ করব। আবু বাকর (رضي الله عنه) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

يَا أَبَا بَكْرٍ، لَلشِّرْكَ فَيْكُمْ أَحْقَى مِنْ دَيْبِ النَّمْلِ

‘হে আবু বকর, তোমাদের মাঝে (এই উম্মতে) শিরক পিপড়ার হামাগুড়ি দিয়ে চলার চাইতেও গোপনীয়।’^[১০০]

ঘোর অন্ধকার রাতে একটা কালো পাথরের ওপর দিয়ে যদি ছোট্ট একটা পিপড়ে হেঁটে যায়, তাহলে তা যেমন দেখা যাবে না, অদৃশ্য থাকবে, ঠিক তেমনিভাবে খুব গোপনে, চুপিসারে উম্মাহর মধ্যে শিরক প্রবেশ করবে। এভাবে গোপনে, ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবেই এই উম্মাহর ভেতরে শিরক প্রবেশ করবে। আর অল্প কিছু মানুষই এটা থেকে রক্ষা পাবে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মুখ থেকে এ কথা শোনার পর আবু বাকর (رضي الله عنه) ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে তখন ঠিক সেই প্রশ্নটিই করেছিলেন, যে প্রশ্নটি এখন আপনার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। আবু বাকর (رضي الله عنه) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন,

‘কীভাবে আমি এই শিরক থেকে বাঁচব, ইয়া রাসূলুল্লাহ?’

তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ছোট শিরকের হাত থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখার একটি দু'আ শিখিয়ে দেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ

‘হে আল্লাহ, আমি জ্ঞাতসারে আপনার সাথে শিরক করা থেকে আপনার নিকট

[১০০] ইমাম বুখারী (رحمته الله)، আল আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং : ৭১৬, আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (رحمته الله)-এর মতে সনদ সহীহ।

আশ্রয় চাই এবং অজ্ঞাতসারে শিরক হয়ে গেলে তার জন্য ক্ষমা চাই।’[১০১]

কারণ ছোট শিরক একদম চুপিসারে, খুব গোপনে মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে। তার আমলের মধ্যে ঢুকে পড়ে। এ হাদীসের দুটি বর্ণনা আবু বাকর (রাঃ) থেকে আছে। এই দু’আটি মুখস্থ করে নিন। লিখে রাখুন। এই দু’আ আপনার প্রাত্যহিক আমলের অংশ বানিয়ে নিন। আপনার অভ্যাসে পরিণত করুন। নিয়মিত এ দু’আ পড়ুন।

আল্লাহ কেন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে মুসা (সঃ)-এর তুলনা করলেন?

উসুলুস সালাসাহর লেখক এখানে একটি আয়াত উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ (সঃ) বলেছেন,

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا

‘আমি তোমাদের নিকট পাঠিয়েছি রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ, যেমন রাসূল পাঠিয়েছিলাম ফিরআউনের নিকট।’ [সূরা মুযযাম্মিল, ৭৩: ১৫]

আল্লাহ (সঃ) বলছেন, আমি তোমাদের নিকট সাক্ষী হিসেবে রাসূল পাঠিয়েছি। তিনি হয় তোমাদের হয়ে হাশরের ময়দানে সুপারিশ করবেন অথবা তোমাদের বিপরীতে সাক্ষ্য দেবেন। ফিরআউনের নিকট আমরা যেমন রাসূল পাঠিয়েছিলাম, ঠিক তেমনি তোমাদের কাছেও একজন রাসূল পাঠিয়েছি।

فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا

‘কিন্তু ফিরআউন সেই রাসূলকে অমান্য করেছিল, ফলে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছিলাম।’ [সূরা মুযযাম্মিল, ৭৩: ১৬]

আমরা জানি ফিরআউনের কাছে পাঠানো হয়েছিল মুসা (সঃ)-কে। কিন্তু ফিরআউন তার কাছে প্রেরিত রাসূলকে মানেনি, তাঁর কথা শোনেনি। এ কারণে আল্লাহ (সঃ) তাকে কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন। আল্লাহ এখানে মক্কার কুরাইশদের বলছেন, যেভাবে আমি ফিরআউনের কাছে মুসাকে পাঠিয়েছিলাম সেভাবে তোমাদের কাছেও একজন নবীকে পাঠিয়েছি।

আল্লাহ (সঃ) কেন মুসা (সঃ)-এর উদাহরণ দিলেন? আরও তো অনেক নবী-রাসূল ছিলেন। কেন তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে তুলনা দেয়ার জন্য নির্দিষ্টভাবে মুসা (সঃ)-কেই বেছে নিলেন?

[১০১] পাঠকরে সুবধির জন্য এখানে দু’আর বাংলা উচ্চারণ দয়া হলো :

আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা আন উশরিকা বিকা ওয়া আনা আ’লামু, ওয়া আসতাগফিরুকা লিমা লা আ’লামু।

এ ব্যাপারে মুকাতিল (ؓ)-এর মত হলো, মুসা (ؑ) ও মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর মধ্যে একটি সাদৃশ্য হলো তাঁদের দুজনের সম্প্রদায় তাঁদেরকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছিল। অবজ্ঞা ও ঘৃণা করেছিল। কারণ, তাঁরা দুজনেই ওইসব লোকের হাতে লালিতপালিত হয়েছিলেন যাদেরকে তাঁরা পরে ইসলামের দিকে আহ্বান করেছিলেন। ফিরআউন নিজে মুসা (ؑ)-কে সৎবাবা হিসেবে লালনপালন করে বড় করেছিল। আল্লাহ (ﷻ) কুরআনে আমাদের জানিয়েছেন,

قَالَ أَلَمْ تُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ

‘ফিরআউন বলল, আমরা কি তোমাকে শৈশবে আমাদের মধ্যে লালনপালন করিনি? এবং তুমি তো তোমার জীবনের বহু বছর আমাদের মধ্যে কাটিয়েছ।’

[সূরা আশ-শু'আরা, ২৬: ১৮]

একইভাবে শৈশবে মুহাম্মাদ (ﷺ)-কেও লালনপালন করেছিল তাঁর কুরাইশী পরিবার। পরে তিনি তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেন এবং তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে। তাঁর দাওয়াহ অস্বীকার করে।

আজকেও এমনটা দেখা যায়। অনেক বাবা-মা আমাকে ফোন করে বলেন, ‘আপনি কি আমার ছেলের সাথে একটু কথা বলবেন? ও আপনার কথা শুনবে।’

অথবা অনেক ছাত্রছাত্রী আমাকে বলে, ‘আপনি কি আমার বাবার সাথে কথা বলবেন, যাতে তিনি আমার বিয়ের ব্যবস্থা করেন?’

কেন এমন হয়?

এটা হতে পারে যে, একজন মানুষ বাইরের মানুষের সাথে যতটা ফরমাল থাকে, নিজ পরিবারের সাথে তেমন থাকেন না। এটা স্বাভাবিক। কিন্তু এর ফলে পারস্পরিক আলোচনা, পরামর্শ কিংবা তর্কের ক্ষেত্রে ওই সংযম, গাভীর্য কিংবা পরিমিতিবোধ কাজ করে না যেটা বাইরের মানুষের ক্ষেত্রে কাজ করে। অনেক সময় অশ্রদ্ধা এবং অসম্মানের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং মুসা (ؑ)-এর ক্ষেত্রেও এমনটা হয়েছিল। তাঁদের পরিবার তাঁদের এমনভাবে তচ্ছিল্য ও অসম্মান করেছিল, যেটা হয়তো বাইরের লোকেরা ওইভাবে করত না।

এ দিক দিয়ে তাঁদের দুজনের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। এ কারণেই আল্লাহ এখানে মুসা (ؑ)-এর উদাহরণ দিয়েছেন। আবার ফিরআউনের ব্যাপারে আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا

‘ফলে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছিলাম।’ [সূরা মুযায্মিল, ৭৩: ১২]

মুসা (ؑ)-কে অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করার কারণে আল্লাহ ফিরআউনকে তীব্র শাস্তি

দিয়েছিলেন। ফিরআউন আর তার সঙ্গীসাথীদের আল্লাহ শাস্তি দিয়েছিলেন প্রচণ্ড বৃষ্টির মাধ্যমে। এই আয়াতের ব্যাপারে ইবনু আব্বাস (রাঃ) এবং মুজাহিদ (রাঃ)^[১০২] বলেন, ‘আল্লাহ (স্বঃ) বৃষ্টির মাধ্যমে ফিরআউনকে কঠিনভাবে পাকড়াও করেছিলেন এবং ধ্বংস করেছিলেন। এবং আয়াতের মাধ্যমে তিনি কুরাইশকে সতর্ক করে দিচ্ছেন—তোমরা যদি মুহাম্মাদ (স্বঃ)-কে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করো, প্রত্যাখ্যান করো, তাহলে এর চাইতেও কঠোরভাবে আমি তোমাদের পাকড়াও করব।

কারণ, আল্লাহ মুহাম্মাদ (স্বঃ)-কে আরও বেশি ভালোবাসেন। মুসা (স্বঃ)-কে প্রত্যাখ্যান করার কারণে যদি ফিরআউনের শাস্তি এত কঠোর হয়, তাহলে কুরাইশ যদি বারবার সীমালঙ্ঘন করে মুহাম্মাদ (স্বঃ)-এর দাওয়াহকে অবহেলা করতে থাকে, তাদের শাস্তি কেমন হবে।’

[১০২] ইমাম মুজাহিদ বিন জাবর (রাঃ) ছিলেন তাবিঈ ও সাহাবীদের পর কুরআনের প্রসিদ্ধতম ব্যাখ্যাকার। জন্ম ২১ হিজরিতে মৃত্যু ১০৪ হিজরিতে। তিনি রঈসুল মুফাসসিরিন ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর ছাত্র ছিলেন এবং তাঁর নিকট তিনবার আগাগোড়া গোটা কুরআন অধ্যয়ন করেন। এ ছাড়া তিনি আইশাহ, আবু হুরাইরাহ, সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস, জাবির বিন আব্দুল্লাহ, আব্দুল্লাহ বিন উমার ও আবু সাঈদ খুদরি (রাঃ)-এর ছাত্র ছিলেন।

গত দারসগুলোতে উসুলুস সালাসাহর দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত প্রথম বিষয়ের আলোচনা শেষ হয়েছিল। ইনশা আল্লাহ আজ আমরা আলোচনা শুরু করব দ্বিতীয় বিষয়টি নিয়ে।

দ্বিতীয় বিষয় : ইবাদাতে শিরক

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্‌হাব (رحمته الله) বলেছেন,

(الثَّانِيَةُ) أَنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ فِي عِبَادَتِهِ أَحَدٌ لَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ

(দ্বিতীয়ত) ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ কাউকে তাঁর অংশীদার বা শরীক হিসেবে পছন্দ করেন না—চাই তা কোনো নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা হোন কিংবা কোনো প্রেরিত রাসূলই হোন না কেন।

অতঃপর লেখক সূরা জ্বিনের নিচের আয়াতটি উল্লেখ করেছেন,

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} [الجن: ٨١]

‘এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ তা’আলার বাণী, ‘আর মসজিদসমূহ তো কেবল আল্লাহর জন্য, এতে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না।’ [সূরা জ্বিন, ৭২: ১৮]

ইনশা আল্লাহ সূরা জ্বিনের এই আয়াত নিয়ে এই দারসের শেষে আমরা আলোচনা করব।

তাওহিদ ও শিরক নিয়ে আলোচনার ভূমিকা

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

‘প্রত্যেক জাতির কাছে আমি রসূল পাঠিয়েছি (এ সংবাদ দিয়ে) যে, আল্লাহর

ইবাদাত করো আর তাগুতকে বর্জন করো।’ [সূরা নাহল, ১৬: ৩৬]

আল্লাহর প্রেরিত সব নবী ও রাসূলের দাওয়াতে যে বিষয়টি সব ক্ষেত্রে এবং সব সময় উপস্থিত ছিল, তা হলো তাওহিদ। সূরা নাহলের এ আয়াতে আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ

‘আর আমি প্রত্যেক উম্মতের কাছে পাঠিয়েছি...’

অর্থাৎ প্রত্যেক রাসূল এই তাওহিদের দাওয়াহ নিয়ে এসেছেন। নবীদের দাওয়াহর ধরন এবং এবং তাঁদের আনা শরীয়াহর মধ্যে পার্থক্য ছিল। যেমন অনেক নবী সিয়ামের অংশ হিসেবে কথা বলাও বন্ধ রাখতেন।^[১০৩] কিন্তু আমাদের শরীয়াহতে—মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)—এর শরীয়াহতে—এমন করা বৈধ না। কাজেই এমন খুঁটিনাটি পার্থক্য ছিল। কিন্তু মূল যে দাওয়াহ—তাওহিদের যে দাওয়াহ—তা সব সময় ছিল। এবং অপরিবর্তিত ছিল। তাই এখানে লেখক শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহহাব (رحمته الله) বলেছেন, মহান আল্লাহ কুফর ও শিরকে সন্তুষ্ট নন। আর যে বিষয় নিয়ে মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট নন, মুমিন কখনো তা নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারে না। মুমিনের সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি নির্ধারিত হবে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি অনুসারে। একজন প্রকৃত মুমিন তা-ই ভালোবাসে, যা মহান আল্লাহ ভালোবাসেন। সে এমন সবকিছু ঘৃণা করে, যা মহান আল্লাহ ঘৃণা করেন।

যখন কেউ ইবাদাতে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে, তখন সেটাকে বলা হয় শিরক আল-উলুহিয়াহ। যদিও উদ্ধৃত বক্তব্যে তিনি সরাসরি ‘শিরক আল-উলুহিয়াহ’ শব্দগুলো ব্যবহার করেননি, কিন্তু স্পষ্টতই তিনি এখানে শিরক বলতে শিরক আল-উলুহিয়াহকে বুঝিয়েছেন। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

ثَالِلَهُ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

‘আল্লাহর শপথ! আমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিলাম।’ [সূরা আশ-শুআরা, ২৬: ৯৭]

মহান আল্লাহ এ আয়াতে জাহান্নামবাসীদের কথোপকথন উদ্ধৃত করেছেন। জাহান্নামবাসীরা একপর্যায়ে বলবে,

‘আল্লাহর কসম, আমরা সত্যই মহা এবং স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে ছিলাম।’

[১০৩] যেমন বনী ইস্রাইলের লোকেরা এভাবে সিয়াম পালন করত। মারইয়াম (رحمته الله)-এর ঘটনা রয়েছে যে, তিনি বলেছেন, إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ‘আমি আর রাহমানের জন্য সাওম পালনের মানত করেছি, তাই আজ কোনো মানুষের সাথে কথা বলব না।’-[সূরা মারইয়াম, ১৯: ২৬]

কেন তারা এ কথা বলবে? আল্লাহ (ﷻ) পরের আয়াতে আমাদের জানাচ্ছেন যে, জাহান্নামবাসীরা বলবে,

إِذْ نُسَوِّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ

‘...যখন আমরা তোমাদেরকে জগৎসমূহের রবের সমকক্ষ মনে করতাম।’ [সূরা আশ-শুআরা, ২৬: ৯৮]

অর্থাৎ তারা তাদের উপাসিত মিথ্যা ইলাহদের বলবে, আমরা তোমাদেরকে রাব্বুল আলামীনের সমকক্ষ হিসেবে গ্রহণ করেছিলাম। এটা ছিল মহাব্রান্তি। এই আয়াতে যেসব জাহান্নামীদের কথা উঠে এসেছে তারা কিন্তু তাদের মিথ্যা ইলাহদের স্রষ্টা, রিযিকদাতা, রক্ষাকর্তা, জীবন ও মৃত্যুর মালিক হিসেবে মহান আল্লাহর সমকক্ষ বা তাঁর রাজত্বে অংশীদার মনে করত না। অর্থাৎ আল্লাহর রুবুবিয়াহর ক্ষেত্রে তারা শিরক করেনি। এসব প্রশ্নে তারা আল্লাহকে রব হিসেবে স্বীকার করত। তারা শিরক করেছিল উলুহিয়াতের প্রশ্নে। ইবাদাতের প্রশ্নে। আর এ বিষয়টি নিয়েই আমাদের আজকের আলোচনা।

সূরা আশ-শুআরার এই আয়াতে ওইসব লোকের কথা বলে হচ্ছে, যারা আল্লাহর ইবাদাতের ক্ষেত্রে অন্যদের অংশীদার করেছিল। তারা আল্লাহর জন্য যে কাজ করত সেই কাজে অন্যদের শরীক করত। তারা শিরক করেছিল আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, সমর্পণ, বিনয়াবনত হওয়া, ভালোবাসা, সিজদাহ এবং শাফা’আতের প্রশ্নে। শিরক হলো দুনিয়াতে সংঘটিত সবচেয়ে বড় বিপর্যয়। সব জায়গা এবং সব যুগের ক্ষেত্রে এটি সত্য। শিরক সবচেয়ে বড় যুলুম। সবচেয়ে গুরুতর অজ্ঞতা। শিরকের বিপরীত হলো তাওহিদ, যা ইনসাফ ও আদলের চূড়া। জ্ঞান ও শাস্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত হলো তাওহিদের জ্ঞান। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

‘নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করা ক্ষমা করবেন না। এর চেয়ে ছোট গুনাহ যাকে ইচ্ছা মাফ করবেন।’ [সূরা আন-নিসা, ৪: ৪৮]

এবং তিনি বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না, এর চেয়ে ছোট গুনাহ যাকে ইচ্ছা মাফ করবেন।’ [সূরা আন-নিসা, ৪: ১১৬]

আল্লাহ কখনোই তাঁর সাথে শরীক করার গুনাহ ক্ষমা করবেন না। সূরা নিসাতে আল্লাহ দুবার এ কথা জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি (ﷻ) আরও বলেছেন,

وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

‘তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওয়াহি পাঠানো হয়েছে, যদি শিরক করো তাহলে অবশ্যই তোমার আমলসমূহ নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো।’ [সূরা আয-যুমার, ৩৯: ৬৫]

এ কথাগুলো কার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে চিন্তা করুন। আমাকে কিংবা আপনাকে না, এ হুঁশিয়ারি দেয়া হয়েছে নবী (ﷺ)-কে উদ্দেশ্য করে। মুহাম্মাদ (ﷺ) সহ প্রত্যেক নবীকে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, যদি তাঁরা শিরক করে তাহলে তাঁদের সব আমল মুছে যাবে এবং তাঁরা হবেন ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। তাহলে আমি আর আপনি শিরক করলে তার পরিণতি কেমন হতে পারে?

তাওহিদ থাকা আবশ্যিক। সুনানুত তিরমিযির একটি সহীহ হাদীসে এবং মুসলিমের একটি হাদীসে কিছু ভিন্ন শব্দে এসেছে, মহান আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فَيْكَ وَلَا أَبَايَ، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغْتَ ذَنْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ، وَلَا أَبَايَ، يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقَرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تَشْرِكَ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقَرَابِهَا مَغْفِرَةً

‘হে আদমসন্তান, যতক্ষণ আমাকে তুমি ডাকতে থাকবে এবং আমার কাছে (ক্ষমা পাওয়ার) আশায় থাকবে—তোমার গুনাহ যত অধিক হোক—তোমাকে আমি ততক্ষণ ক্ষমা করব, এতে আমি কোনো কিছুর পরোয়া করব না। হে আদমসন্তান, তোমার গুনাহর পরিমাণ যদি আসমানের কিনারা বা মেঘমালা পর্যন্তও পৌঁছে যায় তারপর তুমি আমার নিকট যদি ক্ষমা প্রার্থনা করো, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেবো—এতে আমি কোনো কিছুর পরোয়া করব না। হে আদমসন্তান, তুমি যদি সম্পূর্ণ পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়েও আমার কাছে আসো এবং আমার সাথে কাউকে শরীক না করে থাকো, তাহলে আমিও তোমার কাছে পৃথিবীপূর্ণ ক্ষমা নিয়ে হাযির হব।’^[১০৪]

এটি একটি হাদীসে কুদসী।

তাওহিদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অত্যন্ত ভারী। যদি এক বিন্দু তাওহিদকে গুনাহর পাহাড়ের ওপর রাখা হয়, তাহলে সেই এক বিন্দু তাওহিদ পুরো পাহাড়কে মিটিয়ে দেবে। মুছে দেবে। সুনানুত তিরমিযিতে আব্দুল্লাহ বিন আমর (رضي الله عنه) থেকে আরেকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে,

[১০৪] সুনানুত তিরমিযি, হাদীস নং : ৩৪৭০, তাঁর মতে হাসান গরিব; আল্লামা শু’আইব আরনাউত্ (رحمته الله)-এর মতে হাসান।-তাখরিজু রিয়াদিস সলিহীন, হাদীস নং : ৪৪২

‘আল্লাহ (ﷻ) কিয়ামাত দিবসে আমার উম্মতের একজনকে সমস্ত সৃষ্টির সামনে আলাদা করে এনে উপস্থাপন করবেন। তিনি তার সামনে নিরানব্বইটি আমলনামার খাতা খুলে ধরবেন। প্রতিটি খাতা দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। তারপর তিনি প্রশ্ন করবেন, ‘তুমি কি এগুলো হতে কোনো একটি (গুনাহ) অস্বীকার করতে পারো? আমার লেখক ফেরেশতারা কি তোমার ওপর যুলুম করেছে?’ সে বলবে, ‘হে আমার রব, না, করেনি।’

তিনি আবার প্রশ্ন করবেন, ‘তোমার কোনো অভিযোগ আছে কি?’

সে বলবে, হে আমার রব, নেই।’

তিনি বলবেন, ‘আমার কাছে তোমার একটা সাওয়াব আছে। আজ তোমার ওপর সামান্য যুলুমও করা হবে না।’ তখন ছোট একটি কাগজের টুকরা বের করা হবে। তাতে লেখা থাকবে, **أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ**

‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল।’

তিনি তাকে বলবেন, ‘দাঁড়িপাল্লায় সামনে যাও।’

সে বলবে, ‘হে রব, এতগুলো খাতার বিপরীতে এই সামান্য কাগজটুকুর কী আর ওজন হবে?’

তিনি বলবেন, ‘তোমার ওপর কোনো যুলুম করা হবে না।’

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অতঃপর বললেন, তারপর খাতাগুলো এক পাল্লায় আর সেই টুকরাটি আরেক পাল্লায় রাখা হবে। ওজনে খাতাগুলোর পাল্লা হালকা হবে এবং কাগজের টুকরার পাল্লা ভারী হবে। আর আল্লাহ তা’আলার নামের বিপরীতে কোনো কিছুই ভারী হতে পারে না।^[১০৫]

তাওহিদের কালেমার ওজন সবকিছুর চেয়ে বেশি। এই তাওহিদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ, অনেক ভারী। আর তাই আমরা তাওহিদ অধ্যয়ন করি। তাওহিদ হলো সবচেয়ে উজ্জ্বলের চেয়েও উজ্জ্বল। আর শিরক হলো সবচেয়ে কালো।

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ ۖمَعَ الْغَافِرِينَ
‘নাকি তিনিই (শ্রেষ্ঠ), যিনি আতের আহ্বানে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে

[১০৫] সুনানুত তিরমিযি, হাদীস নং : ২৬৩৯, তাঁর মতে এটি হাসান গরিব; সহীহ ইবনু হিব্বান, হাদীস নং : ২২৫, আল্লামা শু’আইব আরনাউত্ব (ﷺ)-এর মতে সনদ সহীহ।

এবং দুঃখ-কষ্ট দূর করেন, আর তোমাদেরকে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করেন?
আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো ইলাহ আছে কি?’ [সূরা আন নামল, ২৭: ৬২]

আল্লাহ এখানে প্রশ্ন করছেন, আর কেউ কি এ কাজগুলো করতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তর সবার জানা। এটি একটি রেটোরিকাল প্রশ্ন। এই প্রশ্নের মাধ্যমে মহান আল্লাহ আসলে আমাদের উত্তরটি জানিয়ে দিচ্ছেন। আল্লাহর কসম! মহান আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো রব নেই, যে বিপর্যস্তকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে, অনিষ্ট দূর করতে পারে। সবচেয়ে অন্ধকার রাতে, কালো পাথরের ওপর কালো পিঁপড়ের পদধ্বনি কে শুনতে পারে? কেবল আল্লাহই পারেন।

তাওহিদ হলো শুধু আল্লাহর কাছে চাওয়া, শুধু আল্লাহর কাছে দু’আ করা। সাহাবী ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) যখন ছোট ছিলেন তখন নবী (ﷺ) তাঁকে শিখিয়েছিলেন,

وَأَعْلَمُ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْقَعُوا بِشْيٍ إِلَّا بِشْيٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشْيٍ إِلَّا يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشْيٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ

‘জেনে রাখো, যদি গোটা জাতি তোমার কোনো উপকার করতে একত্র হয়ে যায়, তাহলেও—আল্লাহ যদি সেটা তোমার জন্য (তাকদিরে) লিখে না থাকেন—তারা তোমার উপকার করতে পারবে না। আর যদি গোটা জাতি তোমার কোনো ক্ষতি করতে একত্র হয়ে যায়, তাহলেও—আল্লাহ যদি সেটা তোমার জন্য লিখে না থাকেন—তারা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।’^[১০৬]

এই বিশ্বাস থাকার নাম তাওহিদ। এটুকু জানা যথেষ্ট যে, প্রত্যেক মুমিনের অন্তরে শিরকের ভয় আছে। তাওহিদ এতটাই গুরুত্বপূর্ণ। মূর্তি ধ্বংসকারী যে মহান ব্যক্তির পথকে আমরা মিল্লাতু ইব্রাহীম বলি, তিনিও শিরকের ভয় করেছিলেন। আলাইহিস সালাম।

মহান আল্লাহ (ﷻ) আমাদের কুরআনে জানিয়েছেন,

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ

‘(আর স্মরণ করো) যখন ইব্রাহীম বলল, ‘হে আমার রব, আপনি এ শহরকে নিরাপদ করে দিন এবং আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখুন।’ [সূরা ইব্রাহীম, ১৪: ৩৫]

ইনি হলেন ইব্রাহীম, হানিফ। আলাইহিস সালাম। তিনিও শিরক থেকে বাঁচতে আল্লাহর কাছে দু’আ করেছেন।

[১০৬] সুনানুত তিরমিযি, হাদীস নং : ২৫১৬, তাঁর মতে হাসান সহীহ।

ইব্রাহীম আত-তাইমি^[১০৭] (رحمته) বলেছেন,

مَنْ يَأْمَنُ الْبَلَاءَ بَعْدَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ وَابْنَيْهِ إِنَّ تَعْبُدَ الْأَصْنَامَ؟

যখন ইব্রাহীম (رحمته)-ই এই দু'আ করলেন, 'হে আল্লাহ, আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখুন', তারপর এই বিপদ থেকে কে আর নিরাপদ থাকে?^[১০৮]

আমি আপনাদের আল্লাহর নামে জিজ্ঞেস করছি, আপনাদের মধ্যে কয়জন শিরক আল-উলুহিয়াহ থেকে রক্ষা পাবার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করেছেন? ইয়াকুব (رحمته) মৃত্যুশয্যা তঁর বংশধরদের নিয়ে শঙ্কিত ছিলেন। আল্লাহ আমাদের জানিয়েছেন,

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهُاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

‘তোমরা কি সে সময় উপস্থিত ছিলে, যখন ইয়াকুবের মৃত্যু এসে পৌঁছেছিল? তখন সে তার পুত্রদেরকে জিজ্ঞেস করেছিল, ‘আমার পরে তোমরা কার উপাসনা করবে?’ পুত্রগণ উত্তর দিয়েছিল, ‘আমরা আপনার এবং আপনার পূর্বপুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাইল ও ইসহাকের উপাস্যের উপাসনা করব। যিনি অদ্বিতীয় উপাস্য এবং আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পিত।’ [সূরা আল বাক্বারাহ, ২: ১৩৩]

মৃত্যুশয্যা ইয়াকুব (رحمته) তাঁর সন্তানদের প্রশ্ন করেছিলেন, আমার পর তোমরা কার ইবাদাত করবে? মানুষ তাঁর মৃত্যুশয্যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, গুরুতর বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলে। চিন্তা করুন, ইয়াকুব (رحمته) একজন রাসূল এবং মৃত্যুশয্যা তাঁর সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা হলো, তাঁর সন্তানেরা তাওহিদের ওপর থাকবে কি না। তাঁর সন্তানেরা জবাব দিলো,

قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهُاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

‘পুত্রগণ উত্তর দিয়েছিল, ‘আমরা আপনার এবং আপনার পূর্বপুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাইল ও ইসহাকের উপাস্যের উপাসনা করব। যিনি অদ্বিতীয় উপাস্য এবং আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পিত।’

এ জবাব শুনে ইয়াকুব (رحمته) প্রশান্ত হলেন। মৃত্যুশয্যা এই ছিল তাঁর শেষ চাওয়া। তাওহিদ এতটাই গুরুত্বপূর্ণ।

[১০৭] ইব্রাহীম বিন ইয়াযিদ বিন শারিক আত-তাইমী (رحمته), প্রখ্যাত তাবিঈ, হাদীসের নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। মৃত্যুশয্যা নিয়ে বিতর্ক আছে—৯২ বা ৯৫ হিজরিতে কারাপ্রকোষ্ঠে মারা যান।

[১০৮] ইমাম ইবনু আবি হাতিম (رحمته), তাফসিরুল কুরআনিল আযীম, বর্ণনা : ১২২৮৭

শিরক আল-উলুহিয়াহ

শিরকের বিভিন্ন ধরন আছে। আল্লাহর রুবুবিয়াহর ক্ষেত্রে শিরক হতে পারে। আল্লাহর আসমা ওয়াস সিফাতের ক্ষেত্রে শিরক হতে পারে। আবার শিরক হতে পারে উলুহিয়াতের ক্ষেত্রে। মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহহাব (رحمہ اللہ)-এর সময় সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে শরীক করার বিষয়টি। ইবাদাতে শিরক মানে হলো শিরক আল-উলুহিয়াহ। সম্ভবত এ কারণে তিনি উসুলুস সালাসার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশেষভাবে শিরক আল-উলুহিয়াহ নিয়ে আলোচনা করেছেন।

ইবাদাত হতে পারে অন্তরের মাধ্যমে, মুখের উচ্চারণের মাধ্যমে এবং আমলের মাধ্যমে। সব ক্ষেত্রেই ইবাদাত হবে এক আল্লাহর জন্য। ইবাদাতের কোনো অংশ যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য নির্ধারণ করে, সে শিরক আকবরে পতিত হয়েছে।

এখন আমরা শিরক আল-উলুহিয়াহ নিয়ে আলোচনা করব। এ ধরনের শিরককে আমরা তিনভাবে ভাগ করব।

প্রথম প্রকার : আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা

ধরুন, কেউ মনে করে আল্লাহ (ﷻ) ইবাদাতের যোগ্য সত্তা। আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে। কিন্তু সে আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করে। সে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে। যেমন : খ্রিষ্টানরা বলে ঈসা (ﷺ) হলেন আল্লাহর পুত্র। নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক। এটি শিরক। যে এমন কাজ করবে সে শিরক করল। এই ধরনের শিরকের বিষয়টি সহজ সরল, উম্মাহর সবাই এ বিষয়টিকে স্পষ্টভাবে শিরক হিসেবে জানে। এটি হলো শিরক আল-উলুহিয়াহর প্রথম প্রকার।

দ্বিতীয় প্রকার : ইবাদাতের কিছু অংশ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য নির্ধারণ করা

এই ধরনের শিরকের ব্যাপারটা কিছুটা জটিল। এই শিরকের বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং খুঁটিনাটির ক্ষেত্রে উম্মাহর অনেকে সমস্যাজনক অবস্থায় পড়েছে। সহজভাবে এ ধরনের শিরক হলো, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য ইবাদাতের কিছু অংশ নির্ধারণ করা। যেমন: কারও অন্তরের কিছু অংশ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও ইবাদাত করে। অথবা কেউ তার কথা, অর্থ অথবা তার ইবাদাতের আমলের কিছু অংশ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও জন্য করে। এটি বিভিন্নভাবে হতে পারে। এখানে আমরা কিছু উদাহরণ দেবো, যাতে বিষয়টি সঠিকভাবে আপনারা বুঝতে পারেন।

দু'আ আত-তালাবের (دعاء الطلب) ক্ষেত্রে শিরক

প্রথম উদাহরণ হলো দু'আর ক্ষেত্রে শিরক। দু'আ হলো আল্লাহর কাছে চাওয়া। যখন বান্দা সরাসরি আল্লাহর কাছে চায় তখন সেটাকে বলা হয় দু'আ আত-তালাব। মহান আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

‘তোমার প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি (তোমাদের ডাকে) সাড়া দেবো...’ [সূরা আল গাফির, ৪০: ৬০]

কাজেই দু'আ আত-তালাব হলো বান্দা যখন সরাসরি আল্লাহর কাছে কিছু চায় এবং সেটা মুখে উচ্চারণ করে। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

‘আর, মসজিদগুলো কেবল আল্লাহরই জন্য, কাজেই তোমরা (সেখানে) আল্লাহর সঙ্গে অন্য আর কাউকে ডেকো না।’ [সূরা জিন, ৭২: ১৮]

এই আয়াতটি লেখক শুরুতে উল্লেখ করেছিলেন এবং সামনে এ নিয়ে আমরা আরও আলোচনা করব।

কল্যাণকর যা কিছু আমরা চাই তা পাবার এবং অনিষ্ট থেকে নিজেদের রক্ষা করার সবচেয়ে বড় উপায় হলো দু'আ। দু'আর ক্ষেত্রে যে আল্লাহর কাছে চায় না, অবধারিতভাবেই সে সৃষ্টির কাছে চায়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

‘দু'আ হলো ইবাদাত।’^[১০৯]

দু'আ এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, রাসূলুল্লাহ এখানে দু'আকে ‘আল-ইবাদাহ’ বলেছেন। যেন দু'আই হলো সব ইবাদাত। দু'আর গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তিনি এভাবে বলেছেন।

ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه)-কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ

‘যখন চাইবে, তখন আল্লাহর কাছে চাইবে।’^[১১০]

[১০৯] সুনানু আবি দাউদ, হাদীস নং : ১৪৭৯; সুনানুত তিরমিযি, হাদীস নং : ৩২৪৭, ইমাম তিরমিযি (رحمته الله)-এর মতে হাসান সহীহ।

[১১০] সুনানুত তিরমিযি, হাদীস নং : ২৫১৬, ইমাম তিরমিযি (رحمته الله)-এর মতে সহীহ।

একজন শিশুকে তাওহিদের ওপর বড় করার জন্য তিনি (ﷺ) এই শিক্ষা দিয়েছেন।
আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَاؤُاَ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّيَهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ
'তারা যখন নৌযানে আরোহণ করে তখন বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে একনিষ্ঠ হয়ে তারা
আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে নিরাপদে স্থলে পৌঁছে দেন,
তখন তারা শিরকে লিপ্ত হয়।' [সূরা আল আনকাবুত, ২৯: ৬৫]

আগেকার যুগে জাহাজে চেপে সমুদ্র পাড়ি দেয়া ছিল দুঃস্বপ্নের মতো। তখনকার
জাহাজগুলো আজকের মতো এত শক্তপোক্ত ছিল না। বাতাসে, শ্রোতে থরথর করে
জাহাজ কাঁপত। উল্টে যাবার কিংবা ডুবে যাবার উপক্রম হতো। এমন অবস্থায় মুশরিকরা
একমনে মহান আল্লাহকে ডাকত। তাঁর কাছে দু'আ করত। শুধু তাঁকেই রক্ষাকর্তা
মনে করে তাঁরই কাছে চাইত। তারা মুশরিক ছিল, কিন্তু সমুদ্রে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে
তারা শিরক ভুলে একমনে এক আল্লাহকে ডাকত। মহান আল্লাহ তাদের ডাকে সাড়া
দিতেন। যদিও তিনি তাঁর পরিপূর্ণ ইলমে জানেন যে বিপদ থেকে বাঁচার পর, তীরে
পৌঁছানোর পর এই মুশরিকরা আবারও ইবাদাতে আল্লাহর সাথে অন্যদের শরীক
করবে। এ কথা জানা সত্ত্বেও, তাদের শিরকমুক্ত দু'আর জবাব রাব্বুল আলামীন
দিতেন। বিপদের মুহূর্তে তারা তাদের ঈমান ও তাওহিদকে শিরক থেকে মুক্ত করেছিল।
যদিও এটা ছিল সাময়িক তবু আল্লাহ তাদের দু'আতে সাড়া দিতেন। তাহলে তিনি কি
আপনার দু'আতে সাড়া দেবেন না? যখন আপনার নিয়্যাত সঠিক হবে, যখন আপনি
সাময়িকভাবে না বরং সারা জীবন তাওহিদ আঁকড়ে থাকবেন, তখন তিনি কি আপনার
দু'আতে সাড়া দেবেন না?

মহান আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ
'আর আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুকে ডেকো না, যা তোমার উপকার করতে পারে না
এবং তোমার ক্ষতিও করতে পারে না। অতএব তুমি যদি করো, তাহলে নিশ্চয়
তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' [সূরা ইউনুস, ১০: ১০৬]

আল্লাহ তাঁর নবীকে বলেছেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে দু'আ না করতে। যারা
আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে দু'আ করে আল্লাহ তাদেরকে সর্বনিকৃষ্ট বলেছেন।
আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ
غَفْلُونَ

‘তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে, যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কাউকে ডাকে, যে কিয়ামাত দিবস পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দেবে না? আর তারা তাদের ডাকাডাকি সম্পর্কেও উদাসীন।’ [সূরা আল আহকাফ, ৪৬: ৫]

দু’আর ক্ষেত্রে শিরকের চারটি ধরন বা উদাহরণ আছে।

প্রথমটি হলো সৃষ্টির কাছে এমন কিছু চাওয়া যা দেয়ার ইখতিয়ার কেবল আল্লাহর। এটি শিরক আকবর। এভাবে সৃষ্টির কাছে চাওয়া বিভিন্নভাবে হতে পারে। জীবিত কিংবা মৃত কোনো ব্যক্তির কাছে হতে পারে। কোনো রাসুলের কাছে হতে পারে। এমন কোনো ব্যক্তির কাছে হতে পারে, যার ব্যাপারে মানুষ মনে করে সে আল্লাহর ওলী। অথবা কোনো রাজা-বাদশাহ বা জ্বিনের কাছে হতে পারে।

সুস্থতার জন্য মৃত কোনো ব্যক্তির কাছে দু’আ করা স্পষ্ট শিরক আকবর। শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়, বিপর্যয় থেকে মুক্তি, বৃষ্টি, ইত্যাদির জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে চাওয়া শিরক আকবর। একইভাবে এ রকম অন্য যেকোনো কিছু—যা কেবল মহান আল্লাহ করার ক্ষমতা রাখেন—তা অন্য কারও কাছে চাওয়া শিরক আকবর। যে এমন করবে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। কারণ সে বিশ্বাস করে, যে ক্ষমতাগুলো কেবল আল্লাহর জন্য নির্ধারিত সেগুলো সৃষ্টিরও আছে। ইবাদাতের কিছু অংশ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য নির্ধারণ করার কারণে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। দু’আর ক্ষেত্রে শিরকের প্রথম প্রকার হলো এভাবে জীবিত কারও কাছে চাওয়া।

দ্বিতীয় প্রকার হলো মৃত কারও কাছে চাওয়া। এই মৃত ব্যক্তি হতে পারে কোনো ওলী অথবা অন্য যে কেউ।

তৃতীয় প্রকার হলো, এমন কারও কাছে চাওয়া, যে ওই স্থানে অনুপস্থিত। অথচ যে দু’আ করছে সে বিশ্বাস করছে ওই ব্যক্তি কোনোভাবে তার অবস্থান জানে এবং সে তাকে সাহায্য করতে সক্ষম। যে ব্যক্তি অনুপস্থিত বা যে মৃত, সে শুনবে কীভাবে? জানবে কীভাবে? সে কীভাবে সাহায্য করবে? যে এমন কারও কাছে চায়, সে শিরক আকবর করছে।

চতুর্থ প্রকার হলো, বান্দার দু’আ আর আল্লাহর মধ্যে মধ্যস্থতাকারী বসানো। উসীলা বসানো। এমন মনে করা যে, বান্দা সরাসরি আল্লাহর কাছে দু’আ করলে সেই দু’আর উত্তর আল্লাহ দেবেন না। তাই বান্দা আর আল্লাহর মাঝে একজন উসীলা, একজন মধ্যস্থতাকারী লাগবে। এটিও শিরক আকবর। মক্কার কুরাইশদের শিরক ছিল এই ধরনের। কুরাইশরা দাবি করত, তারা যেসব মূর্তির ইবাদাত করত তারা আগে নেক বান্দা ছিল। এরা আল্লাহ আর কুরাইশের মুশরিকদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী। মূর্তিগুলোর ইবাদাত করে কুরাইশ আসলে এই নেক বান্দাদের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে তাদের দু’আ

পৌঁছাচ্ছে। তারা আসলে আল্লাহর কাছেই চায়, মূর্তির কাছে না।

দুঃখজনকভাবে উম্মাহর মধ্যেও এ বিষয়টি প্রচলিত আছে। এটি অস্বীকার করার উপায় নেই। ছোটবেলায় আমরা মদিনাতে থাকতাম। তখন মাসজিদুন নববী পরিষ্কার করার দায়িত্ব দেয়া হতো বিভিন্ন কোম্পানীকে। ত্রিশ-চল্লিশজন লোক হারাম পরিষ্কার করার কাজ করতেন। এদের মধ্যে একজনের কথা আমার আজও মনে আছে। মানুষটি ছিলেন ইয়েমেনের। কিছুটা খোঁড়া ছিলেন। আমি আর বাবা সালাতের আগেপরে মাসজিদুন নববীতে সময় কাটাতাম। আমি বসে কুরআন হিফয করতাম। বাবা থাকতেন পাশে। অনেক সময় লোকটি এসে আমার বাবার সাথে কথা বলত। এই মানুষটির দায়িত্ব ছিল নবী (ﷺ)-এর হুজরাহ পরিষ্কার করা।^[১১১] নবী (ﷺ)-এর হুজরাহয় যে পিতলের দরজা আছে, সেটার ভেতরে পরিষ্কার করার দায়িত্বও উনার ছিল।

আমার আজও মনে আছে, এই মানুষটি আমার বাবাকে বলত, হুজরাহ পরিষ্কার করার সময় তাকে সেখান থেকে অসংখ্য চিরকুট আর কাগজ পরিষ্কার করতে হতো। এত কাগজ হতো যে, কয়েকটা ব্যাগ ভরে যেত। এসব কাগজে কী থাকত? মানুষ এসব কাগজে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে উদ্দেশ্য করে চিঠি লিখত। তাঁর কাছে দু'আ করত। চিঠির সাথে নিজের এবং নিজের সন্তানদের ছবি লাগিয়ে দিত। অনেকে নিজের মেয়ের ছবি দিয়ে চিঠি লিখত, নবী (ﷺ) যেন মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করে দেন। এই দু'আগুলো করা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে। নিঃসন্দেহে এটি শিরক আকবর।

মহান আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ

‘জেনে রেখো, আল্লাহর জন্যই বিশুদ্ধ ইবাদাত-আনুগত্য। আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে, তারা বলে, ‘আমরা কেবল এজন্যই তাদের ইবাদাত করি, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে।’

[সূরা আয যুমার, ৩৯: ৩]

ইবাদাত এবং আনুগত্য কেবল আল্লাহর জন্য। আল্লাহ চান ইবাদাত ও আনুগত্য বিশুদ্ধ হবে। শিরক থেকে মুক্ত হবে। কুরআনে আল্লাহ ওইসব মানুষের কথা উদ্ধৃত করেছেন, যার বলত, আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যদের আমরা শুধু আউলিয়া (রক্ষাকারী ও সাহায্যকারী) হিসেবে গ্রহণ করি। যাতে করে তাদের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারি।

আল্লাহ ছাড়া অন্যদের তারা আউলিয়া হিসেবে গ্রহণ করেছিল আল্লাহর নৈকট্য

[১১১] অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কবর যে প্রকোষ্ঠে রয়েছে, যা আমাদের দেশে রওজা নামে প্রসিদ্ধ।

অর্জনের জন্য। কিন্তু তবু আল্লাহ একে বৈধতা দেননি। তিনি আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন, এই কাজ শিরক এবং শিরকের গুনাহ তিনি কখনো ক্ষমা করবেন না। এটা ছিল কুরাইশের শিরক। কিন্তু আজকের অনেক শিয়া, সুফি এবং সাধারণ অজ্ঞ মানুষ তাদের ইমামদের কাছে, কথিত আউলিয়ার কাছে, কিংবা কবরবাসীদের কাছে দু'আ করে। দু'আ, ভালোবাসা এবং আশার ক্ষেত্রে তাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করে। দুঃখজনক বাস্তবতা হল, এদের অনেকের তুলনায় কুরাইশের মুশরিকদের শিরক কম গুরুতর ছিল।

দু'আ আল-ইবাদাহর (الدعاء العبادة) ক্ষেত্রে শিরক

শিরক আল-উলুহিয়ার দ্বিতীয় শ্রেণি হলো দু'আ আল-ইবাদাহ। এর বিভিন্ন ধরন আছে। দু'আ আত-তালাব হলো সরাসরি আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়া এবং মুখে উচ্চারণ করা। যেমন কেউ বলল, হে আল্লাহ, আমাকে মাফ করে দিন। হে আল্লাহ, আমাকে সুখী করে দিন। আমাকে অমুক জিনিসটি দিন। আমাকে অমুক কষ্ট থেকে মুক্তি দিন। ইত্যাদি। এটি হলো দু'আ আত-তালাব।

আল্লাহর প্রতি ইবাদাতের বাকি যত প্রকার আছে তার সবকিছু দু'আ আল-ইবাদাহর অন্তর্ভুক্ত। আলেমদের কিতাবে আপনারা এই পরিভাষাগুলো পাবেন।

দু'আ আত-তালাব হলো মানুষ যখন আল্লাহর কাছে কিছু চায়। দু'আ আল-ইবাদাহ হলো যখন মানুষ জাহান্নামের শাস্তির ভয়ে কিংবা জান্নাতের আশায় সালাত আদায় করে। দু'আ আত-তালাব হলো মানুষ যখন দু'আ করার জন্য দুহাত তুলে। দু'আ আল-ইবাদাহ হলো বাকি সব ধরনের ইবাদাত।

অন্তরের ইবাদাত, মুখের উচ্চারণ, ইবাদাতের আমল, আল্লাহর প্রতি ভয়, আশা, ভালোবাসা, সালাত, সিয়াম, কুরবানী, কুরআন তিলাওয়াত, আল্লাহর প্রশংসা করা—এ সবই দু'আ আল-ইবাদাহর অন্তর্ভুক্ত।

একটি প্রশ্ন আসতে পারে। এগুলোকে দু'আ বলা কারণ কী? কারণ, এই ইবাদাতগুলোর মাধ্যমে বান্দা আসলে আল্লাহর কাছ থেকে কিছু না কিছু চাইছে। দু'আ আত-তালাবের মতো সরাসরি না চাইলেও এই ইবাদাতগুলো করার মাধ্যমে মানুষ হয় আল্লাহর কাছে পুরস্কার চাচ্ছে, বা আল্লাহর শাস্তি থেকে মুক্তি চাচ্ছে।

এখন আমরা দু'আ আল-ইবাদাহর কিছু প্রকার নিয়ে আলোচনা করব।

নিয়্যাতের শিরক

দু'আ আল-ইবাদাহর ক্ষেত্রে শিরকের প্রথম প্রকার হলো নিয়্যাতের বা উদ্দেশ্যের শিরক। মহান আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا ثَوَفَ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يَبْخُسُونَ
 ‘যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবন ও তার জৌলুস কামনা করে, আমি সেখানে তাদেরকে তাদের আমলের ফল পুরোপুরি দিয়ে দিই এবং সেখানে তাদেরকে কম দেয়া হবে না।’ [সূরা হুদ, ১১: ১৫]

এ ধরনের শিরক পাওয়া যায় মুনাফিকদের মধ্যে। আমরা ওই নিফাকের কথা বলছি না, যা তুলনামূলক ছোট কিছু বিষয়ে অনেক মুমিনের মধ্যে থাকে। এখানে নিফাক বলতে আমরা বড় নিফাক বোঝাচ্ছি, যা কুফর। অর্থাৎ ওইসব মানুষের নিফাক, যাদেরকে জনসম্মুখে বা বাহ্যিকভাবে মুসলিম মনে হয়, কিন্তু তাদের অন্তরে কোনো ইসলাম নেই। এই ধরনের মানুষের যে নিফাক, তা বড় নিফাক। ঈমানের মৌলিক বিষয়ের ব্যাপারে তারা মুনাফিক। এই ধরনের মুনাফিকদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شُيُطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَءُونَ

‘আর যখন তারা মুমিনদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে ‘আমরা ঈমান এনেছি’ এবং যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে মিলিত হয়, তখন বলে, ‘নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথে আছি। আমরা তো কেবল উপহাসকারী।’ [সূরা আল বাক্বারাহ, ২: ১৪]

এই ধরনের লোকেরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর ব্যাপারে নিফাক করে। আবার এদের অনেকের মধ্যে হয়তো ছোট নিফাকের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যও (মিথ্যা বলা, আমানতের খিয়ানত ইত্যাদি) থাকতে পারে। নিয়্যাতের ক্ষেত্রে শিরকের পাশাপাশি এই ধরনের মুনাফিকদের অনেকে ইবাদাতের খুঁটিনাটির ক্ষেত্রেও শিরক করতে পারে। যেমন আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَءَوْْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

‘নিশ্চয় মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দিতে চায়। কিন্তু আসলে তিনি তাদেরকে ধোঁকায় ফেলেন। আর যখন তারা সালাতে দাঁড়ায় তখন অলসভাবে দাঁড়ায়, তারা লোকদেরকে দেখায় এবং তারা আল্লাহকে কমই স্মরণ করে।’ [সূরা আন-নিসা, ৪: ১৪২]

তারা যখন সালাতের জন্য দাঁড়ায় তখন আলস্যভরে দাঁড়ায়। এবং তা মানুষ দেখতে পায়, মানুষের চোখে পড়ে। এরা হলো ওই ধরনের মানুষ যাদের মধ্যে শিরক এবং

নিফাকের মিশ্রণ ঘটেছে। তাদের মধ্যে শিরক আছে, কিন্তু সেই শিরকের মধ্যে বড় নিফাকের বৈশিষ্ট্যও আছে।

এটা হলো নিয়্যাতের শিরকের ব্যাপারে সাধারণ বক্তব্য। তবে এখানে কিছু বিষয় জানা এবং লক্ষ করা প্রয়োজন। এমন অনেক মুসলিম আছে যারা তাওহিদে বিশ্বাসী। তারা আল্লাহর জন্য কিছু আমল করে থাকে, কিন্তু এই আমলের জন্য দুনিয়াবী কিছু প্রতিদান বা পুরস্কারও সে আশা করে। সেটা হতে পারে সম্পদ, নিরাপত্তা, সুখ কিংবা সন্তানের আরোগ্য। সে ইবাদাত করছে আল্লাহর জন্য। প্রতিদানও চাচ্ছে আল্লাহর কাছে। এটা ঠিক আছে। কিন্তু সে এই ইবাদাতের মাধ্যমে শুধু আখিরাতের পুরস্কার চায় না, দুনিয়াবী কিছুও চায়। অর্থাৎ সে শিরক করেনি। তার ইবাদাত সম্পূর্ণভাবেই আল্লাহর জন্য ছিল। কিন্তু আখিরাতের পুরস্কারের বদলে সে দুনিয়ার কিছু চেয়েছে। সে চেয়েছে দুনিয়াতে তার নেক আমলের পুরো ফল পেতে। এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে হুকুম হলো, সে দুনিয়ার জীবনে পুরস্কার এবং সাওয়াব পাবে। সে আল্লাহর কাছে দুনিয়ার যা-ই চাক না কেন, আখিরাতের পুরস্কারের তুলনায় তা অতি নগণ্য। এই নগণ্য পুরস্কার তাকে দুনিয়াতে দেয়া হবে। যেহেতু সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করেনি, তাই সে মুসলিম গণ্য হবে।

আরেক ধরনের মানুষ আছে, এদের অবস্থা তুলনামূলক খারাপ। এই ধরনের মানুষ ইবাদাত করে, কিন্তু উদ্দেশ্য থাকে রিয়া। তারা ইবাদাত করে লোক দেখানোর জন্য। দুনিয়াবী কোনো কিছু আল্লাহর কাছ থেকে পাবার আশায় তারা ইবাদাত করে না; তারা ইবাদাত করে নিজেদের নেককার, পরহেজগার মানুষ হিসেবে জাহির করার জন্য। এটি শিরক আল-আসগর, অর্থাৎ ছোট শিরক।

তৃতীয় আরেক ধরনের ব্যক্তি আছে যারা ইবাদাত করে সম্পদ আর লাভের জন্য। যেমন তারা কারও জন্য বদলা হজ্ব করে শুধুই টাকা কামানোর জন্য। অথবা কেউ এক অঞ্চল থেকে গিয়ে আরেক অঞ্চলে হিজরত করে বসবাস করে। কিন্তু সেটা করে কোনো নারীকে বিয়ে করার জন্য। এই ধরনের লোক দ্বিতীয় শ্রেণির লোকদের চেয়ে কিছুটা বুদ্ধিমান। কারণ, তারা কমপক্ষে দুনিয়া কামাচ্ছে। তবে দিনশেষে এটিও শিরক আসগর বা ছোট শিরক। এ ধরনের লোক দুনিয়াতে তাদের আজর বা প্রতিদান পেয়ে যাবে।

চতুর্থ প্রকার হলো এমন কেউ, যে আন্তরিকভাবে আল্লাহর জন্য আমল করে। তার আমলে ত্রুটি থাকে না। কিন্তু সে অন্য কোনো দিক দিয়ে বড় শিরকের মধ্যে আছে। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে ইন শা আল্লাহ। ধরুন, কোনো ব্যক্তি মনে করে ঈসা (ﷺ) আল্লাহর পুত্র—নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক। সে আন্তরিকভাবে আল্লাহর

সম্ভষ্টির জন্য সাদাকা করে, অথবা অন্য কোনো ভালো আমল করে; কিন্তু একই সাথে সে এমন বিশ্বাসও রাখে। এই ব্যক্তি শিরক আকবরের মধ্যে আছে।

আরেকটি উদাহরণ হলো, ওইসব লোক যারা ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গেছে। তারপর আল্লাহর সম্ভষ্টির জন্য ছোট কোনো নেক আমল করেছে। এ রকম ক্ষেত্রে তারা হয়তো দুনিয়াতে সম্পদ, সম্মান, খ্যাতি বা সুখী জীবনের মাধ্যমে পুরস্কার পাবে; কিন্তু আখিরাতে তাদের জন্য শাস্তি ছাড়া অন্য কিছু থাকবে না।

পঞ্চম প্রকার হলো ওই ধরনের মানুষ যারা আখিরাতের জন্য সালাত, যাকাত এবং হজ্জ আদায় করে। কিন্তু পাশাপাশি কিছু আমল করে দুনিয়ার জন্য। যেমন: সে নিজেকে জাহির করার জন্য কিছু নেক আমল করে। এটিও একধরনের ছোট শিরক। এ ব্যক্তির ফয়সালা নির্ভর করবে তার নেক আমল আর গুনাহর হিসেবের ওপর। গত দারসে আমরা ছোট ও বড় শিরকের মধ্যকার পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করেছিলাম—দরকার হলে তা আবার দেখে নিতে পারেন। সহজ ভাষায়, এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো, যার মধ্যে শিরক আকবর বা বড় শিরক আছে সে তার দীনকে ধ্বংস করে ফেলেছে। চিরকালের জন্য সে জাহান্নামে থাকবে। আর একজন মুমিন যখন শিরক আসগর বা ছোট শিরক করে, তখন সেটা নেক আমলকে ধ্বংস করে ফেলে; কিন্তু সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় না। সে মুমিনই থাকে। অর্থাৎ বড় শিরক মানুষের দীন ধ্বংস করে ফেলে। আর ছোট শিরক আমল নষ্ট করে।

ভালোবাসার শিরক

মহান আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

‘আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে আল্লাহকে ভালোবাসার মতো ভালোবাসে। আর যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহকে অত্যন্ত ভালোবাসে।’ [সূরা আল বাক্বারাহ, ২: ১৬৫]

ইবনু যাইদ^[১১২] (ﷺ) এ আয়াতের ব্যাপারে বলেছেন,

هوؤلاء المشركون. أندادهم: آلهتهم التي عبدوا مع الله، يحبونهم كما يحب الذين آمنوا الله،

[১১২] ইনি হচ্ছেন ইমাম আব্দুর রাহমান বিন যাইদ বিন আসলাম (ﷺ), তিনি প্রসিদ্ধ মুফাসসির তাবে তাবীঈ ছিলেন। তাঁর পিতা হচ্ছেন প্রসিদ্ধ তাবীঈ যাইদ বিন আসলাম (ﷺ)। ইমাম তাবারি, আব্দুর রাযযাক ও সা’লাবি (ﷺ) তাঁদের তাফসিরে ইবনু যাইদের অনেক বর্ণনা যুক্ত করেছেন। তিনি ১৮২ হিজরিতে মারা যান।

‘এরা হলো মুশরিকিন, আর তারা যাদেরকে সমকক্ষ স্থির করেছিল এরা হচ্ছে তাদের সেসব উপাস্য যাদেরকে তারা আল্লাহর পাশাপাশি উপাসনা করত। তারা তাদেরকে ততটাই ভালোবাসত যতটা মুমিনরা আল্লাহকে ভালোবাসে।’^[১১৩]

ভালোবাসার বিভিন্ন ধরন হতে পারে। এ বিষয়টি খেয়াল করা জরুরি।

ভালোবাসার প্রথম প্রকার : মাহাবা ওয়াজিবা (محبة واجبة), অর্থাৎ আবশ্যিক ভালোবাসা। আল্লাহর জন্য ভালোবাসা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্য ভালোবাসা। যা কিছু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) ভালোবাসেন সেসব কিছু ভালোবাসা। এটা মাহাব্বা ওয়াজিবা। এটা আল্লাহর জন্য পরিপূর্ণ ভালোবাসা, যা মুমিনের মধ্যে থাকা আবশ্যিক। যেমন: উসুলুস সালাসাহর লেখক বলেছেন, আল্লাহ শিরক অপছন্দ করেন। এর তাৎপর্য হলো, যেহেতু আল্লাহ শিরক অপছন্দ করেন তাই একজন মুমিন হিসেবে আমাকেও তা অপছন্দ করতে হবে এবং এ থেকে দূরে থাকতে হবে।

ভালোবাসার দ্বিতীয় প্রকার : মাহাব্বা তাবি’ইয়াহ (محبة تبعية), স্বাভাবিক ভালোবাসা। যেমন: ক্ষুধার্ত ব্যক্তি খেতে ভালোবাসে, তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি পানি পান করতে ভালোবাসে। এ ধরনের ভালোবাসা বৈধ। তবে খেয়াল রাখতে হবে, তা যেন ভালোবাসার বস্তুকে মহিমাম্বিত করা, বিনয়াবনত হওয়া এবং একে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার সমান বা ওপরে স্থান দেয়ার দিকে না যায়। অর্থাৎ এ ধরনের ভালোবাসা বৈধ, কিন্তু সীমার মধ্যে।

ভালোবাসার তৃতীয় প্রকার : মাহাব্বা রাহমাহ ওয়া ইশফাক (محبة رحمة و إشفاق)। এটি হলো দয়া, সহমর্মিতা এবং সহানুভূতিজাত ভালোবাসা। যেমন: সন্তানদের প্রতি পিতামাতার ভালোবাসা, পিতামাতার প্রতি সন্তানের ভালোবাসা ইত্যাদি। এই ধরনের ভালোবাসাও বৈধ, তবে খেয়াল রাখতে হবে তা যেন আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার সমান না হয়, বা এর চেয়ে বেশি না হয়। বৈধ ভালোবাসা যদি এমন পর্যায়ে চলে যায় যে, তা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার সমান হয়ে গেছে বা তার চেয়েও বেশি হয়ে গেছে, সে ক্ষেত্রে কুরআনের এই আয়াত প্রযোজ্য হবে:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْتَبِصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

‘বলো, ‘তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাইয়েরা, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর সে ব্যবসা যার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা তোমরা করছ এবং সে বাসস্থান যা তোমরা

পছন্দ করছ, যদি তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা অপেক্ষা করো আল্লাহ তাঁর নির্দেশ নিয়ে আসা পর্যন্ত।’ আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।’ [সূরা আত তাওবাহ, ৯: ২৪]

ভালোবাসার চতুর্থ প্রকার : মাহাব্বা উনস ওয়া উলফ (محبة أنس و ألف)। এটি হলো সৌহার্দ্য ও সন্ডাবের ভালোবাসা। যেমন : দুজন মুসলিম ভাই পরস্পরকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে, একই সাথে তাদের মধ্যে কিছু যৌথ স্বার্থ বা আগ্রহের জায়গাও আছে। যেমন তারা দুজনেই হয়তো ইলম অর্জনে আগ্রহী, অথবা তারা একসাথে সফর করে, অথবা তারা একসাথে ব্যবসা করে ইত্যাদি। এই ধরনের ভালোবাসাও বৈধ।

এখন পর্যন্ত আমরা চার ধরনের ভালোবাসার কথা বললাম। প্রথম প্রকারের ভালোবাসা আবশ্যিক, যা প্রত্যেক মুসলিমের মধ্যে থাকতে হবে। পরের তিন প্রকারের ভালোবাসা বৈধ। এ ধরনের ভালোবাসা থাকাকে শিরক গণ্য করা হয় না। তবে এই ভালোবাসা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকতে হবে। অর্থাৎ, যতক্ষণ তা আল্লাহর জন্য ভালোবাসার সমান না হয়, বা এর চেয়ে বেশি না হয়, ততক্ষণ এ ধরনের ভালোবাসা বৈধ। যেমন: নবী (ﷺ) মিষ্টি ভালোবাসতেন। তিনি মধু ও সুগন্ধী ভালোবাসতেন।^[১১৪] তিনি তাঁর স্ত্রীদের ভালোবাসতেন। তিনি তাঁর সাহাবীদের ভালোবাসতেন এবং সাহাবীদের মধ্য থেকে আবু বাকর আস-সিদ্দিক (رضي الله عنه)-কে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন।^[১১৫]

ভালোবাসার পঞ্চম প্রকার : মাহাব্বা শিরকিয়াহ (محبة شركية)। এমন ভালোবাসা যা শিরক। এমন ভালোবাসা যা কেবল আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। যে ভালোবাসা শুধু আল্লাহর জন্য নির্ধারিত তা যদি অন্য কোনো কিছুর (কোনো বস্তু, মানুষ ইত্যাদি) জন্য হয়, তাহলে সেটা বড় শিরক হবে। এমন শিরক যা আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। মাহাব্বা শিরকিয়াহ-এর মধ্যে আত্মসমর্পণ, বিনয়াবনত হওয়া, মহিমাম্বিত করার মতো

[১১৪] ক) আইশাহ (رضي الله عنها) বলেছেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحُلَاةَ وَالْعَسَلَ.

‘নবী (ﷺ) মিষ্টান্ন ও মধু ভালোবাসতেন।’-সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৫৪৩১, ৫৫৯৯

খ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ‘আমার নিকট তোমাদের দুনিয়া থেকে নারী ও সুগন্ধীকে প্রিয় করা হয়েছে। আর আমার চোখের শান্তি রয়েছে সালাতো’-ইমাম বাইহাকী (رحمته الله), আস সুনানুল কুবরা : ৭/৭৮, আল্লামা শু’আইব আরনাউত্ব (رحمته الله)-এর মতে সনদ হাসান।-তাখরিজু যাদিল মা’আদ : ১/১৪৫

[১১৫] আমরা ইবনুল আস (رحمته الله) (রাসূলুল্লাহ ﷺ)-কে প্রশ্ন করেন, ‘মানুষের মাঝে কে আপনার সর্বাধিক প্রিয়?’ তিনি উত্তরে বলেন, ‘আইশাহ।’ আমরা (رحمته الله) পুনরায় প্রশ্ন করেন, ‘পুরুষদের মাঝে কে?’ তিনি উত্তর দেন, ‘তাঁর পিতা (অর্থাৎ আবু বাকর رضي الله عنه)।’-সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৩৬৬২

বিষয়গুলো থাকে। এ ধরনের ভালোবাসা ইবাদাতের অংশ এবং এ ধরনের ভালোবাসা শুধু আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। যে এ ধরনের ভালোবাসা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে দেয়, সে শিরক করল। মহান আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ

‘আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে আল্লাহকে ভালোবাসার মতো ভালোবাসে।’

[সূরা আল বাক্বারাহ, ২: ১৬৫]

সংক্ষেপে বলা যায়, মাহাব্বা শিরকিয়াহ হলো এমন ভালোবাসা যা পূর্ণ আনুগত্য, সমর্পণ, আন্তরিকতা, কুরবানী দাবি করে। এটি ওই ধরনের ভালোবাসা, যা কেবল আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। মক্কার মুশরিকরা তাদের উপাসিত মূর্তিগুলোর প্রতি এই ধরনের ভালোবাসা রাখত।

ভয়ের শিরক

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا مِنِ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

‘বস্তুত ওই শয়তান তোমাদেরকে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়; তবে যদি তোমরা ঈমানদার হও, তাহলে তাদেরকে ভয় না করে কেবল আমাকে ভয় করবো।’ [সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৭৫]

মক্কার মুশরিকরা এ কাজটা করত। মুশরিকরা চেষ্টা করত তাদের উপাসিত মূর্তি আর তাদের মৃত ব্যক্তিদের (যাদের তারা আউলিয়া মনে করত) ব্যাপারে মুমিনদের মনে ভয় তৈরি করতে।

ভয়ের চারটি ধরন আছে।

ভয়ের প্রথম ধরন : আল-খাউফ আশ শিরকি (الخوف الشرکی)। এমন ভয় যা শিরক। কোনো সৃষ্টিকে এমনভাবে ভয় করা যেভাবে কেবল আল্লাহকে ভয় করা উচিত। এই ধরনের ভয়ের মধ্যে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, বিনীত হওয়া, মহিমান্বিত করা, প্রশংসা করার মতো বিষয়গুলো মিশ্রিত থাকে। যেমন: কোনো মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে বিশ্বাস করা যে, সে কারও উপকার বা ক্ষতি করতে পারে। সে জীবিতদের অভিশাপ দিতে পারে, সম্পদ দিতে পারে কিংবা ছিনিয়ে নিতে পারে, জীবন থেকে কল্যাণ বা নিয়ামাত ছিনিয়ে নিতে পারে ইত্যাদি। এই বিশ্বাসের কারণে সেই মৃত ব্যক্তিকে ভালোবাসা, সম্মান করা এবং ভয় করা শিরক।

মহান আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

إِنَّمَا يَعْزَّمُ مَسْجِدَ اللَّهِ مِنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُتَّقِينَ

‘আল্লাহর মসজিদের আবাদ তো তারাই করবে—যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। আশা করা যায়, তারাই হবে সঠিক পথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।’ [সূরা আত তাওবাহ, ৯: ১৮]

খাশইয়াহ হলো শ্রদ্ধা-মিশ্রিত ভয়। এই ভয়ের মধ্যে শ্রদ্ধা, সমীহ, ভালোবাসা এমনভাবে মিশ্রিত থাকে যা ইবাদাতের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। আল্লাহ ব্যতীত কাউকে এভাবে ভয় করা শিরক। এটি শিরক আকবর যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

ধরুন, কেউ দাবি করল আল্লাহ কোনো জীবিত কিংবা মৃত নেক বান্দাকে শাফা’আতের ক্ষমতা দিয়েছেন।^[১১৬] কিংবা এমন কোনো ক্ষমতা দিয়েছেন যা কেবল আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। যেমন, কেউ বিশ্বাস করল ওই ব্যক্তি মানুষকে দারিদ্র্যে ফেলতে পারে। অথবা মানুষকে অসুস্থ করতে পারে। এটি শিরক আকবর, এবং এটিই হলো আল-খাউফ আশ শিরকি বা ভয়ের ক্ষেত্রে শিরক। কেউ হয়তো বলতে পারে, এই নেক বান্দা নিজে নিজেই এই ক্ষমতা অর্জন করেছে। আবার কেউ বলতে পারে, আল্লাহ এই ব্যক্তিকে এই ক্ষমতা দিয়েছেন। দুই ক্ষেত্রেও ফলাফল একই—দুটোই শিরক।

মক্কার কুরাইশরা, জাহিলিয়াহর সময়কার আরবরা তাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে এমন বিশ্বাস রাখত। দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, আজকের মুসলিম সমাজে এমন কাজ হয় যা জাহিলিয়াহর সময়কার মুশরিকদের এই শিরকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। চাইলে অগণিত উদাহরণ দেয়া সম্ভব। উম্মাহর মাঝে যে কবরপূজারিরা আছে তারা ঠিক এ কাজটাই করে। কিছু ব্যক্তির ব্যাপারে তারা এমন বিশ্বাস ও ভয় রাখে যা কুরাইশের মুশরিকিনরা

[১১৬] অর্থাৎ শাফা’আত তো আল্লাহর অনুমতিক্রমে কিয়ামাতে করা হবে। কিন্তু কেউ যদি মনে করে যে, আল্লাহ কিছু বান্দাকে শাফা’আতের এমন ক্ষমতা আগেই দিয়ে রেখেছেন যে তারা চাইলেই কাউকে শাফা’আত করতে পারে—নিজের মর্জিমতো—এতে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশনার প্রয়োজন নেই, তাহলে এটা শিরক হবে। এই শিরকে পড়েই বহু লোক কথিত পীরদের অনুসারী হয়ে বিভিন্ন গুনাহ করে আর পীরের দরগায় দান করে এই আশায় যে, তিনি তো আমাকে পার করিয়েই দেবেন। অথচ এটা কখনোই হবার নয়। আল্লাহ বলেছেন,

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

‘তার নিকটে তাঁর অনুমতি ব্যতীত কে এমন আছে, যে শাফা’আত করতে পারবে?’—সূরা আল বাক্বারাহ, ২: ২৫৫

তাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে রাখত। এই মানুষগুলো জীবদ্দশায় হয়তো নেককার বান্দা ছিলেন, কিন্তু এখন তারা দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন। অথচ মানুষ বিশ্বাস করছে, তারা তাদের উপকার কিংবা ক্ষতি করতে পারে। এই বিশ্বাসের কারণে তারা তাদের ভয় করছে, ইবাদাত করছে। অনেক ক্ষেত্রে তো এমন কোনো কবরবাসীর ইবাদাত করা হয়, যে জীবদ্দশায় খারাপ লোক ছিল। অনেক সময় এমন কোনো কবরের কাছে ইবাদাত করা হয়, যেই কবরে আদৌ কারও মৃতদেহই নেই। কবরপূজারিরা এসব মৃত ব্যক্তিদের আল্লাহর মতো করে ভয় করে। অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে আল্লাহর চেয়েও বেশি ভয় করে।

আমি আপনাদের একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

এমন অনেক লোক আছে যারা আল্লাহর নাম নিয়ে অহরহ মিথ্যা কসম করে। কিন্তু আপনি যদি তাদেরকে বলেন সিতনা যায়নাবের নামে কসম করো, তাহলে দেখবেন সে কসম করছে না। সিতনা যায়নাবকে তারা আল্লাহর ওলী মনে করে, এবং এই ওলীকে আল্লাহর চেয়ে বেশি ভয় করে। তাই আল্লাহর নাম মিথ্যা কসম করলেও সিতনা যায়নাবের ব্যাপারে তারা মিথ্যা কসম করবে না। তার অন্তরে আল্লাহর চেয়ে এই ওলীর জন্য ভালোবাসা বেশি। আল্লাহর চেয়ে এই ওলীকে এবং ওলীর শাস্তিকে সে বেশি ভয় করে। তাই সে আল্লাহর নামে এক শ বার মিথ্যা কসম করবে; কিন্তু ওলীর নামে কখনো মিথ্যা কসম করবে না। ইরাকের শিয়ারা সিতনা যায়নাবের ব্যাপারে এমন আকীদাহ রাখে। সিতনা যায়নাবের মাজার অর্থাৎ কবরকে রক্ষা করার জন্য ইরাকের অসংখ্য শিয়া জড়ো হয়েছিল। কেন? কারণ তাদের নেতারা এবং লেবাননের হিবুল্লাহর নেতারা তাদের বলেছিল, তাদেরকে যেকোনো মূল্যে এই মাজার রক্ষা করতে হবে।^[১১৭]

ভয়ের দ্বিতীয় ধরন : আল খাউফুল্লাযি ইয়াহমিল ‘আলা তারক ওয়াজিব আও ফিল মুহাররাম। এটি হলো এমন ভয় যার কারণে মানুষ কোনো দায়িত্ব ত্যাগ করে অথবা কোনো নিষিদ্ধ কাজ করে। অনেকে এ ধরনের ভয়কে শিরক মনে করলেও আসলে এটি শিরক না। তবে এটি হারাম। যেমন: মানুষের প্রতিক্রিয়ার ভয়ে কেউ সৎকাজের

[১১৭] সিত যাইনাব দ্বারা যাইনাব বিনতু আলী (رضی اللہ عنہا)-কে বোঝানো হয়। তিনি ছিলেন আলী (رضی اللہ عنہ) ও ফাতিমা (رضی اللہ عنہ)-এর কন্যা এবং আব্দুল্লাহ বিন জাফর (رضی اللہ عنہ)-এর স্ত্রী। কারবালার প্রান্তরে তিনি তাঁর ভাই হুসাইন (رضی اللہ عنہ)-এর সাথে ছিলেন, যুদ্ধোত্তরকালে হুসাইন (رضی اللہ عنہ)-এর পুত্র আলী (رضی اللہ عنہ)-কে রক্ষায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ও সাহসী ভূমিকা পালন করেন। ৬৮২ সালে দামেস্কে মারা যান। তাঁর কবর পরবর্তীকালে মাজারে পরিণত হয় এবং সেই মাজারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা শহর সিত যাইনাব নামেই প্রসিদ্ধি পায়—যা দামেস্ক থেকে ১০ কি.মি. দক্ষিণে অবস্থিত। সিত (سیت) আরবী সাযিদাহ (سيدة) শব্দের বিবর্তিত ও সংক্ষিপ্ত রূপ।

আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করা থেকে বিরত থাকল।

সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করা আমাদের দায়িত্ব। বৈধ ওজর কিংবা কারণ ছাড়া কেবল লোকের ভয়ে যদি কেউ এই দায়িত্ব পালন না করে, তাহলে সেটা হারাম। তবে শিরক না। সাধারণত এই ধরনের ভয় তৈরি হয় মানুষের মনে, আর শয়তান একে আরও উসকে দেয়। অনেক সময় দেখা যায় কাল্পনিক কোনো ভয়ের কারণে মানুষ তার দায়িত্ব ত্যাগ করছে। অথবা দেখা যায় সামান্য আশঙ্কা আছে, কিন্তু তা এত গুরুতর নয় যে এর কারণে দায়িত্ব ত্যাগ করতে হবে।

যেমন: প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার কারণে সত্য বলার দায়িত্ব ত্যাগ করা হারাম, বিশেষ করে আহলুল ইলম বা ইলমসম্পন্ন মানুষদের জন্য। কারণ, তাদের ওপর সত্য বলার বিশেষ দায়িত্ব আছে। মহান আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

‘বস্তুত ওই শয়তান তোমাদেরকে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়; তবে যদি তোমরা ঈমানদার হও, তাহলে তাদেরকে ভয় না করে কেবল আমাকে ভয় করবো।’ [সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৭৫]

আবু সাইদ আল-খুদরি (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ فِي حَقِّ إِذَا رَأَاهُ، أَوْ شَهِدَهُ أَوْ سَمِعَهُ

‘যদি সত্য দেখে থাকো, প্রত্যক্ষ করে থাকো বা শুনে থাকো—তাহলে লোকের ভয় যেন তোমাদের কাউকে সত্য বলা থেকে বিরত না রাখে।’^[১১৮]

এই হাদীসে সত্য বলা থেকে বিরত থাকতে মানা করা হয়েছে এবং এমন করা হারাম হবার বিষয়টি আমরা হাদীস থেকে জানতে পারছি। এ কারণেই আমরা কিছু লোককে ‘উন্মাহর কাপুরুষ’ বলি। কারণ তারা সত্য জানা সত্ত্বেও বেতন হারানোর ভয়ে, কিংবা আঘাতপ্রাপ্ত হবার ভয়ে, কিংবা মানুষের সমর্থন হারানোর ভয়ে সত্য বলা থেকে বিরত থাকে। অথচ এসব ক্ষেত্রেও সত্য বলা থেকে বিরত থাকার সুযোগ নেই। লক্ষ করুন, এই হাদীসে শুধু ওই মানুষদের কথা বলা হচ্ছে যারা সত্য বলা থেকে বিরত থাকে। তাহলে সরাসরি বাতিলের পক্ষ যারা গ্রহণ করে তাদের অবস্থান কেমন, চিন্তা করুন। তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো, এ ধরনের ভয় হারাম হলেও তা শিরকের পর্যায়ে পৌঁছায় না। এটি এমন একটি জায়গা যেখানে অনেকের পা পিছলে যায়। অনেকে ইমাম ইবনু

[১১৮] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং : ১১০১৭; আল্লামা শু‘আইব আরনাউত্ব (رحمته الله)-এর মতে ইমাম মুসলিম (رحمته الله)-এর শর্তে সহীহ।

তাইমিয়াহ (ﷺ) কিংবা শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহুহাব (ﷺ)-এর দু-এক লাইনের কোনো উদ্ধৃতি পড়ে, তারপর উম্মাহর অর্ধেক মানুষকে মুশরিকিন কিংবা কুফফার বলে বসে! যেমনটা বললাম, এই ধরনের ভয় হারাম; কিন্তু এটি শিরক না—যদি না তা পূর্বে উল্লেখিত আল-খাউফ আশ-শিরকির পর্যায়ে না যায়।

ভয়ের তৃতীয় ধরন : আল-খাউফ মিনাল্লাহি তা'আলা (الخوف من الله تعالى)। এটি ভয়ের তৃতীয় প্রকার। আর তা হলো আল্লাহ (ﷻ)-এর ভয়। আল্লাহর প্রতি ভয়-যার মধ্যে শ্রদ্ধা, সমীহ, ভালোবাসা, বিনীতভাব মিশ্রিত থাকে। এই ধরনের ভয় থাকা ওয়াজিব। আর এই ধরনের ভয় শুধু আল্লাহর জন্য থাকাই ওয়াজিব। আল্লাহর শাস্তির ভয় করা এই ভয়ের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ

‘এটা তাদের জন্য, যারা (কিয়ামাতের দিন) আমার সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে; আর ভয় করে আমার (শাস্তির) হুমকিকে।’ [সূরা ইব্রাহীম, ১৪: ১৪]

এবং তিনি বলেছেন,

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ

‘আর যে তার প্রতিপালকের সামনে হাজির হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য আছে দুটো বাগান।’ [সূরা আর রাহমান, ৫৫: ৪৬]

মনের মধ্যে এই ভয় থাকা এবং তা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হওয়া হলো ঈমানের চূড়া। তবে এই ভয় থেকে কেউ যদি হতাশা এবং নিরাশায় পর্যবসিত হয়, তবে সেটা ভুল।

ভয়ের চতুর্থ ধরন : আল-খাউফ আল জিবিল্লি (الخوف الجبلي)। ভয়ের চতুর্থ প্রকার হলো আল-খাউফ আল জিবিল্লি (স্বভাবজাত ভয়)। এটি হলো স্বাভাবিক প্রকৃতিগত ভয়। কোনো পরিস্থিতিতে যদি ভয়ের সত্যিকার কারণ থাকে, তাহলে এই ধরনের ভয় থাকা মুবাহ। যেমন: শত্রু আপনার সামনে খোলা তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আপনার সামনে একটি সিংহ এসে দাঁড়িয়েছে, আপনি যে নৌকায় চড়েছেন তা ডুবতে বসেছে, অথবা আপনার ঘর হঠাৎ করে কাঁপতে শুরু করেছে, ধসে পড়ার উপক্রম হয়েছে—এসব ক্ষেত্রে ভয় পেলে তাতে কোনো দোষ নেই। নিন্দনীয় কিছু নেই।

সূরা আল-ক্বাসাসে মুসা (ﷺ)-এর আলোচনায় মহান আল্লাহ এ ধরনের ভয়ের কথা বলেছেন,

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ

‘তখন সে ভয়ে ভয়ে সেখান থেকে বের হয়ে চারপাশের ঘটনাবলি পর্যবেক্ষণ

করতে থাকে।’ [সূরা আল-ক্বাসাস, ২৮: ২১]

এই ধরনের ভয় হারাম না, শিরকও না। তবে এর আরেকটি দিক আছে। একজন মুমিনের ঈমান যত শক্ত হবে তার অন্তর থেকে এ ধরনের ভয় তত কমতে থাকবে। যেমন: সালাফদের অনেকের ব্যাপারে এমন ঘটনা ঘটেছে যে, তাঁরা সালাতে ছিলেন। সুজুদে গেছেন, এমন অবস্থায় তাদের পাশে সিংহ এসে দাঁড়িয়েছে। তাঁরা সিজদাহ দিচ্ছেন আর মাথার ঠিক ওপরে সিংহ নিশ্বাস ফেলছে। তবু তাঁরা বিন্দুমাত্র ভয় পাননি।^[১১৯]

আল্লাহ যেমন মুসা (ﷺ)-এর ভীত হবার কথা বলেছেন, তেমনিভাবে আরেকটি ঘটনার কথাও জানিয়েছেন, যখন বনী ইস্রাইল ভয়ের কারণে ইতস্তত করছিল। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

أَلْ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ سَيِّدِينَ

মুসা বলল, ‘কক্ষনো নয়; আমার সাথে আমার রব রয়েছেন। নিশ্চয় অচিরেই তিনি আমাকে পথনির্দেশ দেবেন।’ [সূরা আশ শুআরা, ২৬: ৬২]

বনী ইস্রাইল ভয় পেলেও মুসা (ﷺ) ভয় পাননি, কারণ এই সময়ে তিনি ঈমানের সর্বোচ্চ অবস্থানে ছিলেন।

আশার ক্ষেত্রে শিরক

শিরকের আরেকটি ধরন হলো শিরক আর-রাজা (شرك الرجاء), অর্থাৎ আশার ক্ষেত্রে শিরক। এটি হলো সৃষ্টির কাছ থেকে এমন কিছু আশা করা যা কেবল মহান আল্লাহর কাছ থেকে—আশা করা যায়। এই ধরনের শিরক ওই মানুষদের মধ্যে দেখা যায়, যারা সৃষ্টির কাছ থেকে এমন কিছু পাবার আশা করে যা দেয়ার ক্ষমতা কেবল আল্লাহর। যেমন: সৃষ্টির কাছে সন্তান কামনা করা অথবা আরোগ্য কামনা করা; অথচ এ বিষয়গুলো শুধু আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণাধীন। এটি শিরক আকবর, যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

লক্ষ করুন, ডাক্তারের কাছে যাওয়া হলো আসবাব, উপায়। ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার

[১১৯] প্রখ্যাত তাবিঈ সিলাহ বিন আইশাম আবু সাহবা আল’আদাউই (ﷺ)-এর এমন ঘটনা আছে। তিনি ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। কাবুল আক্রমণকালে তিনি সেনাদলের সদস্য ছিলেন। রাতে সবাই ঘুমালে তিনি বের হয়ে পাশের জঙ্গলে সালাত আদায় করতে থাকেন। এমন সময় একটা সিংহ আসে। কিন্তু তিনি একনিষ্ঠভাবে সালাতে রত থাকেন। সালাত শেষ করার পর তিনি সিংহকে উদ্দেশ্য করে বলেন, اطلب الرزق بمكان آخر. ‘হে সিংহ, তুমি অন্যত্র তোমার রিয়ক অন্বেষণ করো’। সিংহও চুপচাপ চলে যায়। ঘটনাটি ইমাম যাহাবি (رحمته الله) উল্লেখ করেছেন।-সিয়াকু আ’লামিন নুবালা : ৩/৪৯৯

জন্য যাওয়া শিরক না। এর মাধ্যমে ডাক্তারকে আল্লাহর সমকক্ষ ভাবা হচ্ছে না। আপনি যখন ডাক্তারের কাছে যান তখন এই বিশ্বাস নিয়ে যান না যে, ডাক্তার নিজে আপনাকে আরোগ্য দিতে পারে, বা তার কোনো অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতা আছে। অথবা ডাক্তার তার ইচ্ছামতো যেকোনো অবস্থান থেকে যে কাউকে সুস্থ করার সক্ষমতা রাখে। যদি এমন বিশ্বাস কেউ রাখে, তাহলে সেটা শিরক হবে। কিন্তু ডাক্তারের কাছে গিয়ে তার কথামতো কোনো ওষুধ খেলে সেটা শিরক না।

রুকু এবং সিজদাহয় শিরক

শিরকের আরেকটি ধরন হলো রুকু এবং সিজদাহতে শিরক করা। যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উদ্দেশে সমর্পণ, আনুগত্য, দাসত্ব, ইবাদাত ও ভালোবাসা নিয়ে রুকু বা সিজদাহ করে, সে শিরক আকবর করল।

মহান আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَمِنْ عَائِيهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ
الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

‘আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চাঁদ। তোমরা না সূর্যকে সিজদাহ করবে, না চাঁদকে। আর তোমরা আল্লাহকে সিজদাহ করো যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদাত করো।’ [সূরা ফুসসিলাত, ৪১: ৩৭]^[১২০]

তিনি আরও বলেছেন,

قُلْ إِن صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ ١٦٢ لَا شَرِيكَ لَهُ

‘বলো, ‘নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য—যিনি সকল সৃষ্টির রব। তাঁর কোনো শরীক নেই।’ [সূরা আল আন’আম, ৬: ১৬৩-১৬২]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তাঁকে সিজদাহ করা যাবে কি না? জবাবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

مَا يَنْبَغِي لِأَخٍ أَنْ يَسْجُدَ لِأَخٍ

‘এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে সিজদাহ করবে এটা কাম্য নয়।’^[১২১]

[১২০] এটি সিজদাহর আয়াত।

[১২১] সহীহ ইবনু হিব্বান, হাদীস নং : ৪১৬২, আল্লামা শু’আইব আরনাউত্ব (ﷺ)-এর মতে, হাদীস সহীহ সনদ হাসান।

লক্ষ করুন, আমরা শুরুতে বলেছি কেউ যদি ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য কোনো কিছু করে, তাহলে সে শিরক আকবর করল। শিরকের সংজ্ঞার আলোচনাতে আমরা এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছিলাম। কাজেই কেউ যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও প্রতি সিজদাহ করে, তাহলে সেটি সুস্পষ্ট শিরক।^[১২২]

সুজুদ, রুকু এবং ক্রিয়ামের মধ্যে পার্থক্য

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও উদ্দেশে সিজদাহ করা এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও জন্য রুকু, ক্রিয়াম বা এ ধরনের অন্য কিছু করার মধ্যে পার্থক্য আছে। তাওহীদের ওপর সুগভীর জ্ঞান অর্জন করা উলামায়ে কেরাম তাঁদের আলোচনায় এ পার্থক্যের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উদ্দেশে সিজদাহ করে এবং এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য হয় সিজদাহর মাধ্যমে ইবাদাত করা, তাহলে সে শিরক আকবর করেছে। সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেছে। আবারও শুনুন। খেয়াল করে শুনুন। কেউ যখন আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও প্রতি এভাবে সিজদাহ করে তখন সে অটোম্যাটিকালি শিরক আকবর করেছে।

কিন্তু রুকুর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কিছুটা আলাদা। সুজুদ বা সিজদাহ একটি স্বতন্ত্র ইবাদাত। সালাতের বাইরেও আমরা সিজদাহ করি। যেমন: সুজুদ আত-তिलाওয়াহ-কুরআনের কিছু আয়াত আছে যেগুলো তিলাওয়াত করার পর আমরা সিজদাহ দিই। একই ভাবে সুজুদ আশ-শোকর-আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের জন্য আমরা সিজদাহ দিই। এই ধরনের সিজদাহ আমরা সালাতের বাইরেও করে থাকি। তাই সিজদাহ সালাতের ভেতরে হতে পারে, সালাতের বাইরেও হতে পারে। কিন্তু রুকু শুধু সালাতের ভেতরে হয়ে থাকে। সালাতের বাইরে স্বতন্ত্রভাবে রুকু করার কোনো ইবাদাত ইসলামে নেই।

আপনি যদি দেখেন কেউ সালাত আদায় করছে না কিন্তু সিজদাহ দিচ্ছে, তাহলে আপনি কী ভাববেন? হয়তো সে সুজুদ আত-তिलाওয়াত করছে। সে কুরআন পড়ার

[১২২] শাইখ নাসির বিন হামাদ আল ফাহাদ (ফা. আ) এক প্রশ্নের জবাবে জানান, গাইরুল্লাহকে সিজদাহ করার বিধান নিয়ে দুটি মত রয়েছে :

- ১) সব ধরনেরই সিজদাহই শিরক,
- ২) সম্মান ও ইবাদাতের সিজদাহর বিধানে পার্থক্য আছে। সম্মানের সিজদাহ হারাম, শিরক নয়; ইবাদাতের সিজদাহ শিরক। শাইখ বলেন,

‘আগে আমি প্রথম মত প্রকাশ করতাম যে, গাইরুল্লাহর সব সিজদাহই শিরক। তবে যখন সকল দলিল জানলাম, তখন দ্বিতীয় মতের দিকেই ঝুঁকলাম। আল্লাহই সর্বোত্তম জ্ঞাত।’-আল ফাতাওয়াউল হাইরিয়্যাহ, পৃষ্ঠা : ৩৫

সময় সিজদাহর কোনো আয়াত পড়েছে, তাই সে সিজদাহ দিচ্ছে। অথবা সে সুজুদ আশ-শোকর করছে। হয়তো সে কোনো সুসংবাদ শুনেছে, তাই আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের জন্য সিজদাহ করছে।

অন্যদিকে যদি দেখেন, কেউ সালাত আদায় করছে না, কিন্তু রুকু করছে, তাহলে কী ভাববেন? হয় এই লোক পাগল অথবা সে বিদআতি। কারণ, ইসলামে সালাতের বাইরে রুকুর কোনো নিয়ম নেই। রুকু স্বতন্ত্রভাবে কোনো ইবাদাত নয়।

ধরুন, কেউ সালাত আদায় করছে না, কিন্তু রুকু করছে। মানুষ তাকে প্রশ্ন করবে, তুমি কী করছ? সে বলবে, আমি আল্লাহর ইবাদাতের জন্য রুকু করছি।

কিন্তু এটা কি আসলে ইবাদাত হচ্ছে? না, কারণ ইসলামে এমন কোনো ইবাদাত নেই। সালাতের বাইরে রুকুর কোনো নিয়ম ইসলামে নেই। সে নিজে বানিয়ে বানিয়ে এটা করছে। সে একজন বিদআতি।

রুকু আর ক্বিয়াম (দাঁড়ানো)-এর ব্যাপারটা অনেকটা একই রকম। সালাতের ভেতরে দাঁড়ানো একটি ইবাদাত। কিন্তু সালাতের বাইরে দাঁড়ানো হলে সেটাকে ইবাদাত গণ্য করা হয় না। আমি বা আপনি যদি এই মুহূর্তে উঠে দাঁড়াই এবং দশ মিনিট আল্লাহর জন্য দাঁড়িয়ে থাকি, তাহলে কি সেটাকে ইবাদাত বলা যাবে? না। ইসলামে এমন কোনো ইবাদাত নেই। যদি কেউ এভাবে দাঁড়িয়ে থেকে সেটাকে ইবাদাত দাবি করে, তাহলে সেটা একটা বিদআত। দ্বীনের মধ্যে নব-উদ্ভাবিত বিষয়।

কেউ এল, আর আপনি তার জন্য দাঁড়ালেন—এটা শিরক হিসেবে গণ্য হবে না। চাইনিয় এবং জাপানিয়ারা মাথা নিচু করে ঝুঁকে একে অপরকে সম্ভাষণ জানায়। এটাকে দেখতে অনেকটা রুকুর মতো মনে হয়। কেউ যদি এমন করে, তাহলে সেটাকে শিরক বলা যাবে না। হ্যাঁ, এমন করা যথাযথ না। নিঃসন্দেহে এমন করা সঠিক না। সাহাবায়ে কেরাম (رضي الله عنهم) তো সর্বশ্রেষ্ঠ মানব রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্য দাঁড়াননি। যদি কারও সম্মানে দাঁড়ানো যৌক্তিক হতো, তাহলে সেটা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর জন্যই হতো। কিন্তু তাঁর জন্য সাহাবারা দাঁড়াননি। তাহলে আজকের পৃথিবীর রাজা-বাদশাহ কিংবা অন্যান্যদের সম্মানের জন্য দাঁড়ানোর কী আছে?

তবে অনেক সময় মানুষ সম্মান প্রদর্শনের জন্য দাঁড়ায় না। ধরুন, অনেক দিন পর প্রিয় কোনো ভাই বা বন্ধুকে দেখলেন। আপনি তাকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন, জড়িয়ে ধরলেন—এতে কোনো সমস্যা নেই। তবে মানুষকে সম্ভাষণ জানানোর জন্য দাঁড়ানো, একে রীতি বা প্রথা বানিয়ে ফেলা উচিত না। সঠিক না।

একইসাথে মনে রাখতে হবে, এটাকে শিরক বলা যাবে না। আমি ক্লাসে ঢুকলাম, আমার ছাত্ররা আমার সম্মানে উঠে দাঁড়াল। এটা কি শিরক? নিঃসন্দেহে এমন করা

সঠিক না, তবে এটাকে শিরকও বলা যাবে না। কারণ, দাঁড়ানো (কিয়াম) কিংবা রুকু কোনো স্বতন্ত্র ইবাদাত না।

তাই কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য এই কাজগুলো করে, তবে সে মুশরিক হয়ে যাবে না। তবে এখানে শর্ত হলো, সে ইবাদাতের নিয়্যাতে এই কাজগুলো করতে পারবে না। কেউ যদি কোনো নেতা বা রাজা-বাদশাহর জন্য দাঁড়ায় এবং তার অন্তরে ইবাদাতের নিয়্যাৎ থাকে, তাহলে সেটা শিরক। কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উদ্দেশ্যে ইবাদাতের নিয়্যাতে এ কাজগুলি করে, তাহলে সে মুশরিক হয়ে গেছে।

অন্যদিকে সুজুদের ক্ষেত্রে পার্থক্য হবে, কারণ সুজুদ একটি স্বতন্ত্র ইবাদাত। সালাতের বাইরেও সুজুদ হতে পারে। যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য সিজদাহ করবে, তার আপাত হুকুম হবে, সে মুশরিক। যে ব্যক্তি কোনো মূর্তি, কোনো বাদশাহ কিংবা কোনো প্রধানমন্ত্রী-প্রেসিডেন্টের উদ্দেশ্যে সিজদাহ করে, সে মুশরিক। তার ওপর শিরকের হুকুম প্রযোজ্য হবে, যদি না তার কোনো বৈধ ওজর থাকে। যেমন : কেউ সিজদাহ দেয়ার সময় সে তার সামনে একটা ইট বা এ ধরনের কিছু দেখল। সে ভাবল এটা সাধারণ কোনো পাথর, তাই সেটাকে সুতরাহ হিসেবে নিল। কিন্তু দেখা গেল, এই পাথরটা আসলে একটা মূর্তি। এ ক্ষেত্রে এই ব্যক্তির ওপর শিরকের হুকুম আসবে না।

কাজেই এ আলোচনার উপসংহার হলো, কোনো লোক যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উদ্দেশ্যে রুকু বা কিয়াম করে, কিন্তু সে রুকু-কিয়ামকে ইবাদাত মনে করে না, তাহলে আমরা তাকে মুশরিক বলতে পারব না। যেহেতু রুকু স্বতন্ত্র কোনো ইবাদাত নয়।

অন্যদিকে সুজুদ স্বতন্ত্র একটি ইবাদাত। সালাতের বাইরে সুজুদ হতে পারে, কিন্তু সালাতের বাইরে কোনো রুকু নেই। তাই কেউ যখন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উদ্দেশ্যে সিজদাহ করল, তখন সে এমন কিছু করল যা শুধু আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। তাই এটি শিরক আকবর বলে গণ্য হবে।

গত দারসে আমরা শিরকের বিভিন্ন প্রকার নিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলাম। আজকের আলোচনায় আমরা ইবাদাতের ক্ষেত্রে শিরকের আরও কিছু প্রকারের দিকে তাকাব।

কুরবানীর ক্ষেত্রে শিরক

কুরবানী বলতে আমরা এখানে পশু যবেহ করাকে বোঝাচ্ছি। কুরবানী বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। আমরা এখানে সংক্ষেপে কিছুটা বলছি।

প্রথম ধরনের কুরবানী হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কিছু কুরবানী করা। যেমন: হজ্বের পর ঈদুল আজহার সময় পশু যবেহ করা। আমরা এটা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করি। এটি একটি ইবাদাত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এভাবে পশু কুরবানী দেয়া শ্রেষ্ঠতম ইবাদাতসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় প্রকার হলো, কোনো অতিথি বা অনুষ্ঠানের জন্য পশু যবেহ করা। যেমন: ওয়ালিমা অথবা আকিকাহর জন্য পশু কুরবানী করা। এটিও আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয়, একই সাথে এর সাথে বাড়তি কোনো উত্তম লক্ষ্য যুক্ত থাকে। যেমন: অতিথি বা আত্মীয়স্বজনদের আপ্যায়ন করা।

তৃতীয় প্রকার হলো, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য পশু যবেহ করা। এটা হতে পারে জীবিত কিংবা মৃত কোনো মানুষের জন্য, জ্বিনের জন্য অথবা অন্য কোনো সৃষ্টির জন্য। এ কাজের মাধ্যমে এমন বিনীত ভাব ও আনুগত্য প্রদর্শন করা হয়, যা কেবল আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। এ কাজ শিরক আকবর। এভাবে যবেহ করা পশুর গোস্ত হালাল না। আজ অনেক কথিত মাজারে এ ধরনের কুরবানী করা হয়। মানুষ, জ্বিন, জীবিত, মৃত, কোনো মূর্তি, কোনো কবর—যা কিছুর উদ্দেশ্যেই এ ধরনের কুরবানী হোক না কেন, এটি শিরক আকবর। এবং এই গোস্ত খাওয়া হারাম। এটা ইজমা। মহান আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

‘বলো, ‘নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টির রব।” [সূরা আল আন’আম, ৬: ১৬২]

এই আয়াতে নুসুকি (نُسُكِي) শব্দটি এসেছে। নুসুকি মানে আল্লাহর জন্য কুরবানী। মহান (ﷻ) বলেছেন,

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ

‘অতএব তোমার রবের উদ্দেশ্যেই সালাত পড়ো এবং নহর করো।’ [সূরা আল কাউসার, ১০৮: ২]

এই আয়াতে নহর—ওয়ানহার (وَأَنْحَرْ)—অর্থ কুরবানী।

সহীহ মুসলিমে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছে,

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ

‘ওইসব লোকের ওপর আল্লাহর লানত হোক, যারা গায়রুল্লাহর জন্য যবেহ করে।’^[১২০]

তাওয়াফের ক্ষেত্রে শিরক

তাওয়াফ বা কাবার চারপাশে প্রদক্ষিণ করা একটি ইবাদাত। এই আমল আল্লাহ ছাড়া আর কারও উদ্দেশ্যে করা যাবে না। এটা ইজমা। যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য তাওয়াফ করল, সে শিরক আকবরে পতিত হয়েছে। আজ এ ধরনের শিরক হয়। এটা দুর্লভ কোনো ঘটনা না। অনেক জায়গায় এমন ঘটে। ভেবে দেখুন, কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উদ্দেশ্যে কাবার চারপাশেও তাওয়াফ করে, তাহলে সেটাও শিরক আকবর হবে। তাহলে কেউ যদি কোনো ওলীর কবর তাওয়াফ করে, তাহলে সেটা কি শিরক আকবর না? অবশ্যই সেটা বড় শিরক। আজ পৃথিবীর অনেক মুসলিমপ্রধান দেশেও মানুষ এভাবে কবরের চারপাশে তাওয়াফ করে।

আমার মনে আছে, একবার আমরা মিসরে গিয়েছিলাম। আমার বয়স তখন ১৩-১৪ এর মতো হবে। সালাত আদায়ের জন্য একটা মসজিদে গেলাম। পরে দেখা গেল সেই মসজিদের ভেতরে একটা কবর। এটা দেখে আমরা মসজিদ থেকে বের হয়ে আসছিলাম। তখন লক্ষ করলাম, কিছু লোক সেই কবরের চারপাশে হাঁটছে, যেভাবে মানুষ কাবার চারপাশে প্রদক্ষিণ করে। আমার বাবা খুব ঠান্ডা মেজাজের মানুষ। অল্পতে রাগেন না, আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু এ দৃশ্য দেখে তিনি উত্তেজিত হয়ে গেলেন।

মানুষগুলোর হাত ধরে বোঝানোর চেষ্টা শুরু করলেন, তারা যা করছে তা শিরক আকবর। কারণ, তাওয়াফ একটি স্বতন্ত্র ইবাদাত এবং এটি আল্লাহ ছাড়া আর কারও জন্য করা যাবে না।

তাওয়াক্কুলের ক্ষেত্রে শিরক

মহান আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

‘আর আল্লাহর ওপরই তাওয়াক্কুল করো, যদি তোমরা মুমিন হও।’ [সূরা আল-মায়িদাহ, ৫: ২৩]

আল্লাহর ওপর ভরসা করা, তাওয়াক্কুল করা একটি ইবাদাত এবং এই আয়াত তার দলিল। যেমনটা আমরা বারবার বলেছি, ইবাদাত হতে হবে শুধু আল্লাহর জন্য। তা না হলে এটা শিরক হয়ে যাবে। ইবাদাতের কোনো অংশ যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য করা হয়, তাহলে সেটা শিরক আকবর হবে।

মহান আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

‘মুমিন তো তারা, যাদের অন্তরসমূহ কেঁপে ওঠে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। আর যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং যারা তাদের রবের ওপরই ভরসা করে।’ [সূরা আল আনফাল, ৮: ২]

তাওয়াক্কুল দুই ধরনের হতে পারে।

প্রথমটি হলো এমন কোনো কিছুর জন্য সৃষ্টির ওপর ভরসা বা নির্ভর করা, যা দেয়ার বা করার ক্ষমতা কেবল আল্লাহর। যেমন: অনেকে প্রয়োজন পূরণ, সুস্বাস্থ্য, বিজয়, রিয়ক এমনকি শাফা’আতের জন্য কবরবাসী মৃত কোনো ব্যক্তির ওপর ভরসা করে। এটা স্পষ্ট শিরক।

তাওয়াক্কুলের দ্বিতীয় প্রকার হলো আপাতভাবে ভরসা। যেমন : আপনি কোনো কিছুর জন্য এমন কারও ওপর ভরসা করলেন, যার সেই কাজটি করার সক্ষমতা আছে। যেমন আপনার বন্ধু অফিসে যাওয়া-আসার সময় আপনাকে সাথে করে নিয়ে যায়। আপনি অফিসে যাওয়া-আসার জন্য তার ওপর নির্ভর করেন। এটা শিরক না। যদি কারও কোনো কাজ করার সক্ষমতা থাকে, তাহলে তার কাছে সেই ব্যাপারে সাহায্য

চাওয়া বা ভরসা করা শিরক না। আপনি জানেন যে, আপনার বন্ধু সকাল ৮টার সময় গাড়ি নিয়ে আসতে পারবে। আপনাকে অফিসে নামিয়ে দিতে পারবে। এ ক্ষেত্রে তার ওপর ভরসা করা শিরক না। তবে একজন মানুষের ঈমান যত শক্ত হবে তত সে সৃষ্টির ওপর ভরসা করা কমিয়ে দেবে। যদিও সেটা জায়েয।

একটা উদাহরণ দিয়ে এ দুই ধরনের তাওয়াক্কুলের পার্থক্য পরিষ্কার করা যাক।

ধরুন, একজন মানুষ পানিতে ডুবে যাচ্ছে। এমন সময় পাশ দিয়ে একটা নৌকা যাচ্ছে। সাহায্যের জন্য সে নৌকার যাত্রীদের ডাকল। এই যে সাহায্যের জন্য ডাকা, তা অনেকটা দু'আর মতো। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এটা শিরক না। কারণ, ওই নৌকার যাত্রীদের তাকে বাঁচানোর সক্ষমতা আছে। তাঁরা ওখানে উপস্থিতও আছে। কিন্তু একই লোক যদি এমন কাউকে ডাকে যাকে সে ওলী মনে করে (জীবিত বা মৃত, মানুষ বা জ্বিন)–যদিও সে ওখানে উপস্থিত নেই–তাহলে এটি শিরক আকবর হবে।

এই হলো সংক্ষেপে শিরক আল-উলুহিয়াহর আলোচনা।

তাওহিদের শ্রেণি কি ৩টি নাকি ৪টি?

তাওহিদুল উলুহিয়াহ নিয়ে পরবর্তী আলোচনাতে যাবার আগে একটা প্রশ্নের মীমাংসা করা দরকার। অনেকেই এ প্রশ্ন করে থাকে। আমাদের ক্লাসেও এ প্রশ্নটা বারবার এসেছে। প্রশ্নটি হলো, তাওহিদের শ্রেণি কি ৩টি নাকি ৪টি?

আমি একদম প্রথম দারসে বলেছিলাম ‘বাসমালাহ’-এর মাঝে আপনি তাওহিদের ৩টি প্রকার খুঁজে পাবেন।^[১২৪] সূরা ফাতিহাতেও আপনি তাওহিদের ৩টি প্রকার পেয়ে যাবেন,

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

‘আল্লাহরই জন্য সমস্ত প্রশংসা, যিনি বিশ্বজগতের রব।’ [সূরা আল ফাতিহা, ১: ১]

এটি আল্লাহর রুবুবিয়াহর সাক্ষ্য।

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

‘আর রাহমান আর রাহীম।’ [সূরা আল ফাতিহা, ১: ২]

এটি তাওহিদ আসমা ওয়াস সিফাতের সাক্ষ্য।

إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

[১২৪] দ্রষ্টব্য : তাওহিদের মূলনীতি, প্রথম খণ্ড, ইলমহাউস পাবলিকেশন।

‘আমরা কেবল তোমারই ইবাদাত করি এবং কেবল তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।’

[সূরা আল ফাতিহা, ১: ৪]

তাওহিদুল উলুহিয়াহর সাক্ষ্য।

কুরআনের অন্য কিছু সূরার দিকে তাকানো যাক। সূরা নাসে আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

‘বলো, আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের রবের।’ [সূরা আন নাস, ১১৪: ১]

এখানে আল্লাহর রুবুবিয়াহর কথা চলে এসেছে। রব হিসেবে আল্লাহ একক।

مَلِكِ النَّاسِ

‘মানুষের অধিপতিরা।’ [সূরা আন নাস, ১১৪: ২]

মালিক-আল্লাহর একটি সিফাত তথা বৈশিষ্ট্য। এটি তাওহিদ আসমা ওয়াস সিফাত। আল্লাহ তাঁর বৈশিষ্ট্যসমূহে একক ও অদ্বিতীয়।

إِلَهِ النَّاسِ

‘মানুষের ইলাহের কাছে।’ [সূরা আন নাস, ১১৪: ৩]

এটি তাওহিদ আল উলুহিয়াহ। ইবাদাত শুধু আল্লাহর জন্য।

সূরা মারইয়ামের এক আয়াতে তাওহিদের তিনটি দিকের কথা আপনি পাবেন। মহান আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ۚ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا

‘তিনি আকাশ, যমীন আর এ দুয়ের মাঝে যা আছে তার প্রতিপালক। কাজেই তুমি তাঁর ইবাদাত করো, আর তাঁর ইবাদাতে অবিচল থাকো। তুমি কি তাঁর সমতুল্য কাউকে জানো?’ [সূরা মারইয়াম, ১৯: ৬৫]

দেখুন এই আয়াতে আছে,

‘তিনি আকাশ, যমীন আর এ দুয়ের মাঝে যা আছে তার প্রতিপালক...’

এখানে আল্লাহর রুবুবিয়াহর কথা বলা হচ্ছে।

‘কাজেই তুমি তাঁর ইবাদাত করো, আর তাঁর ইবাদাতে অবিচল থাকো...’

এক আল্লাহর ইবাদাতের কথা বলা হচ্ছে। তাওহিদ আল উলুহিয়াহ।

‘তুমি কি তাঁর সমতুল্য কাউকে জানো?’

আল্লাহ (ﷻ) তাঁর গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যে অনন্য। এটি তাওহিদ আসমা ওয়াস সিফাত।

এই এক আয়াত থেকে আমরা তাওহিদের তিনটি দিক সম্পর্কে জানতে পারছি।

এভাবে কুরআনের অন্যান্য আরও সূরাতে তাওহিদের তিনটি দিক পাবেন। আবার অনেক সূরাতে তাওহিদের কোনো নির্দিষ্ট দিকের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। যেমন সূরা আল-কাফিরুনে উলুহিয়াহর কথা বিশেষভাবে এসেছে। সূরা ইখলাসে আসমা ওয়াস সিফাতের কথা এসেছে। তেমনিভাবে সূরা নাসের মূল নির্ধারিত হলো রুবুবিয়াহ।

এভাবে তাওহিদের প্রকারভেদের উদ্দেশ্য হলো তাওহিদের শিক্ষা সহজভাবে ব্যাখ্যা করা। বোঝানো। আগেরকার দিনে ছেঁড়াফাটা পোশাক পরা, মেষ চড়ানো বেদুইন ও আরবী ভাষার ওপর এমন জ্ঞান রাখত, যাতে কুরআনের আয়াত শুনেই সে তাওহিদের সবগুলো দিক বুঝতে পারত। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে আরবী ভাষার ওপর আমাদের দখল কমেছে। তা ছাড়া উম্মাহর বিরাট অংশ আরবী বোঝে না। তাই মানুষকে বোঝানোর সুবিধার্থে এভাবে তাওহিদের শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে।

এই শ্রেণিবিভাগ নিয়ে অনেকে খুব বিচিত্র কিছু কথা বলে। যেমন অনেকে বলে, তাওহিদকে এভাবে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা নাকি খ্রিষ্টানদের ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করার মতো! খ্রিষ্টানরা ট্রিনিটিতে বিশ্বাস করে—পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা। তাওহিদের শ্রেণিবিভাগ নাকি ট্রিনিটিতে বিশ্বাস করার মতো। আমি নিজে অনেকে এমন কথা বলতে শুনেছি। কী বিচিত্র কথাবার্তা! আসলে এটা ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ এবং শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্‌হাব (رحمهم الله)-এর প্রতি তাদের ঘৃণার ফল, রহমাতুল্লাহি আলাইহিম। তারা এসব কথা বলে ঘৃণার বশবতী হয়ে। অথচ এই দুজন স্পষ্টভাবে বলেছেন, এই শ্রেণিবিভাগের উদ্দেশ্য মানুষের সামনে সহজভাবে তাওহিদের শিক্ষা ব্যাখ্যা করা।

তাওহিদের শ্রেণিবিভাগ সর্বপ্রথম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্‌হাব করেননি, ইবনু তাইমিয়াহও করেননি। আরও অনেক আগে উলামায়ে কেরাম তাওহিদের শ্রেণিবিভাগ করেছেন। শ্রেণিবিভাগের বিষয়টি সম্ভবত সর্বপ্রথম এসেছে ইমাম আবু হানিফা (رحمهم الله)-এর রচনায়। হ্যাঁ, তিনি সুনির্দিষ্টভাবে এভাবে শ্রেণিবিভাগ করেননি। কিন্তু তিনি আলাদাভাবে রুবুবিয়াহ এবং উলুহিয়াহর কথা বলেছেন। যেমন তাঁর কিতাব আল ফিকহুল আবসাতে আপনি দেখবেন তিনি বলেছেন^[১২৫],

وَاللهُ تَعَالَى يَدْعَى مِنْ أَعْلَى لَا مِنْ أَسْفَلٍ لَيْسَ مِنْ وَصْفِ الرُّبُوبِيَّةِ وَالْأَلُوْهِيَّةِ فِي شَيْءٍ

‘আর আল্লাহ তা’আলাকে ওপরের দিকে আহ্বান করা হয়, নিচের দিকে নয়।

[১২৫] ইমাম আবু হানিফাহ (رحمهم الله), আল ফিকহুল আবসাৎ, পৃষ্ঠা : ১৩৫, এই বাক্যাংশটি إِبْنَاتُ الْعُلُوِّ বা আল্লাহর সুউচ্চতার প্রতিপাদন শীর্ষক অধ্যায় রয়েছে। আগ্রহী পাঠক যদি এ গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ পড়তে চান, তাহলে নিম্নোক্ত লিংকে যেতে পারেন : <https://nidaaulhaqq.files.wordpress.com/2017/04/al-fiqh-al-absat.pdf>

নিম্নগামিতার সাথে রুবুবিয়াহ ও উলুহিয়াহর কোনো সম্পর্ক নেই।’

তাঁর ছাত্র আবু ইউসুফ^[১২৬] (رحمته الله)-ও এ ধরনের আলোচনা করেছেন। ইবনু মান্দাহ^[১২৭] (رحمته الله) তাঁর রচিত কিতাবুত তাওহিদ গ্রন্থে এভাবে আলোচনা করেছেন। এসব ইবনু তাইমিয়াহর জন্মের শত শত বছর আগে কথা।

সূরা মুহাম্মাদের ১৯ নম্বর আয়াত :

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ

‘কাজেই জেনে রেখো, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোনো ইলাহ নেই, ক্ষমা প্রার্থনা করো তোমার ভুলত্রুটির জন্য।’ [সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭: ১৯]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসির আত-তাবারিতে শ্রেণিবিভাগের ইঙ্গিত এসেছে।^[১২৮] ইবনু জারীর আত-তাবারি (رحمته الله)-এর মৃত্যু হয় ৩১০ হিজরির দিকে। আবু জাফর আত-ত্বহাউয়ি^[১২৯] (رحمته الله)-এর জন্ম ২৩৮ হিজরির দিকে, তিনি আকীদাহ আত-ত্বহাউইয়াহতে তাওহিদের শ্রেণির কথা উল্লেখ করেছেন।^[১৩০] ইবনু বাত্তাহ আল-

[১২৬] ইমাম আবু ইউসুফ (رحمته الله) ছিলেন ইমাম আবু হানীফার প্রধানতম ছাত্র। তাঁর মূল নাম ইয়াকুব বিন ইব্রাহীম আল আনসারি। জন্ম ১১৩ হিজরি, মৃত্যু ১৮২ হিজরি। ছিলেন ইমাম, মুজতাহিদ, ফকীহ, মুহাদ্দিস ও আব্বাসী খিলাফাতের প্রধান বিচারপতি। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আল খারাজ, আল আসার ও ইখতিলাফু আবি হানীফাহ ওয়ান ইবনু আবি লাইলা।

[১২৭] ইমাম ইবনু মান্দাহ (رحمته الله)-এর মূল নাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসহাক ইবনু মান্দাহ। ছিলেন হাফিযুল হাদীস। জন্ম ৩১০ হিজরি, মৃত্যু ৩৯৫ হিজরি। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ : আল ইমান, আত তাওহিদ, আত তারিখ, মা’রিফাতুস সাহাবাহ, আল কুনা।

[১২৮] ইমাম তাবারি (رحمته الله) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

فاعلم يا محمد أنه لا معبود تنبغي أو تصلح له الألوهة، ويجوز لك وللخلق عبادته، إلا الله الذي هو خالق الخلق، ومالك كل شيء، يدين له بالربوبية كل ما دونه

‘হে মুহাম্মাদ, জেনে রাখুন, সৃষ্টির স্রষ্টা ও সবকিছুর মালিক আল্লাহ ব্যতীত এমন আর কোনো মাবুদ নেই যার জন্য উলুহিয়াহ উপযুক্ত বা যার জন্য উলুহিয়াহ সঠিক। এমন কোনো মাবুদ নেই যার ইবাদাত করা আপনার ও অন্যান্য সৃষ্টির জন্য জায়েয। রুবুবিয়াতের ক্ষেত্রে বাকি সকলে তাঁর নিকট নতি স্বীকার করে।’-ইমাম ইবনু জারির আত-তাবারি (رحمته الله), জামিউল বায়ান : ২২/১৭৩

[১২৯] ইমাম আবু জাফর আত-ত্বহাউই (رحمته الله) ছিলেন হানাফী ফিকহের প্রখ্যাত ইমাম ও মুহাদ্দিস, আকীদাহ বিশারদ ও মুফাসসির। তিনি ইমাম শাফে’ঈ (رحمته الله)-এর ঘনিষ্ঠতম ছাত্র ইমাম মুযানী (رحمته الله)-এর ভাগিনা ছিলেন। জন্ম মিসরে ২৩৮ হিজরিতে মৃত্যু ৩২১ হিজরিতে। তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রে বিপুল পরিমাণ রচনা রেখে গিয়েছেন যার মাঝে অন্যতম হলো : আল আকীদাহ, ইখতিলাফুল উলামা, শরহ মুশকিলুল আসার, শরহ মা’আনিল আসার, আহকামুল কুরআন।

[১৩০] ইমাম ত্বহাউই (رحمته الله)-এর লেখায় সরাসরি উলুহিয়াহ, আসমা ওয়াস সিফাতের নাম পাওয়া যায় না। তবে রুবুবিয়াহ পাওয়া যায়। তিনি বলেন,

لَهُ مَعْنَى الرُّبُوبِيَّةِ

উকবারি^{১৩১} (ﷺ) তাঁর আল-ইবানাহ গ্রন্থেও এমন আলোচনা করেছেন। তারপর ইবনু তাইমিয়াহ (ﷺ) এ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর ছাত্র ইবনুল কাইয়্যিম (ﷺ) আলোচনা করেছেন। তাঁদের পর আয-যুবাইদী^{১৩২} (ﷺ) তা'জুল আরুস গ্রন্থে এ নিয়ে আলোচনা করেছেন। আশ শানকীতি^{১৩৩} (ﷺ)-ও আদ্বওয়াউল বায়ান গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

কাজেই ইবনু তাইমিয়াহর আগেও অন্যান্য উলামায়ে কেবাম তাওহিদ ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে শ্রেণিবিভাগের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। এই শ্রেণিবিভাগ ইবনু তাইমিয়াহর আবিষ্কার না। বরং তাওহিদ ভেঙে ভেঙে বোঝানোর ক্ষেত্রে আগে থেকেই এ প্রবণতা ছিল।

একটা উদাহরণ চিন্তা করুন। আগেকার যুগে সাধারণ মানুষের আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান ছিল। সময়ের সাথে সাথে তা কমতে থাকে। বিশেষ করে

‘তাঁর জন্যই রয়েছে রুবুবিয়াহ’; পয়েন্ট : ১৫।

উলুহিয়ার আলোচনায় তিনি বলেন,

ولا إله غيره

‘আর তিনি ব্যতীত অপর কোনো ইলাহ নেই’; পয়েন্ট : ৪।

এরপর লাগাতার কয়েকটি ধারায় তিনি সিফাত সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। দেখুন : তাখরিজুল আকীদাতিত ত্বহাউইয়াহ (মতন), তাহকীক : মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (ﷺ)।

[১৩১] ইমাম ইবনু বাত্তাহ (ﷺ)-এর জন্ম ৩০৪ হিজরিতে, মৃত্যু ৩৮৭ হিজরিতে। তিনি হাম্বলীদের প্রধানতম আলিমদের একজন। মূল নাম উবাইদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ। জন্মস্থান উকবারার দিকে সম্পৃক্ত করে উকবারী বলা হয়। উকবারা টাইগ্রিস নদীর পূর্ব পারে বাগদাদ ও সামাররার মাঝে অবস্থিত একটি প্রাচীন জনপদের নাম, যা বহুকাল আগেই নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব আস সুনান, আল ইবানাতুল কুবরা, আল ইবানাতুস সুগরা।

[১৩২] ইমাম মুর্তাদা আয যুবাইদী (ﷺ) ছিলেন ভাষাবিদ, অভিধানবেত্তা, মুহাদ্দিস ও বংশলতিকা বিশেষজ্ঞ। জন্ম ১৭৩২ সালে ভারতের উত্তর প্রদেশের বিলগ্রামে। প্লেগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান ১৭৯০ সালে মিসরের কায়রোয়। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ : তা'জুল আরুস মিন জাওয়াহিরিল কামুস, আসানিদু কুতুবিস সিত্তাহ, ইতহাফু সাদাতিল মুত্তাকীন ফি শারহি ইহইয়া উলুমুদ্দীন।

[১৩৩] ইমাম মুহাম্মাদ আমীন আশ শানকীতি (ﷺ)-এর জন্ম ১৯০৫ সালে মৌরিতানিয়ার শানকীতে। মৃত্যু ১৯৭৪ সালে মক্কা মুকাররামায়। তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক শিক্ষকদের একজন। এ ছাড়া রাবিতাতুল আলামিল ইসলামী ও হাইয়াতুল কিবারিল উলামার সদস্য ছিলেন। তাঁর প্রসিদ্ধ ছাত্রদের মাঝে আছেন : শাইখ আব্দুল আযিয বিন বায, আতিয়াহ মুহাম্মাদ সালিম, হামুদ বিন উক্বলা আশ শু'আইবী, হাম্মাদ আল আনসারি, আব্দুর রাহমান বিন আউদাহ, মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমিন, আব্দুর রাহমান আল বাররাক, বাকার আবু যাইদ (ﷺ)। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ : আদ্বওয়াউল বায়ান ফি ইদ্বাহিল কুরআন বিল কুরআন, আল আসমা ওয়াস সিফাত নাক্বলান ওয়া আক্বলান, মুযাক্করাতু উসুলিল ফিকহ আলা রাওদ্বাতিন নাযির। ইমাম আশ-শানকীতির ব্যাপারে আরও বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন : তাওহিদের মূলনীতি, প্রথম খণ্ড, দারস ১২, ইলমহাউস পাবলিকেশন।

সাধারণ আরবদের ক্লাসিকাল আরবী বা ফুসহা (فصحى)-এর সাথে দূরত্ব বাড়তে থাকে। এমন অবস্থায় আরবী ভাষা এবং ব্যাকরণের নিয়মগুলো সাধারণ মানুষের সামনে বোধগম্যভাবে উপস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এমন না যে, নিয়মগুলো নতুন করে বানানো হয়েছে। নিয়মগুলো আগে থেকেই ছিল; পরে মানুষকে বোঝানোর জন্য সেটা সহজভাবে সূত্র আকারে আনা হয়েছে।

উসুলুল ফিকহের ক্ষেত্রে ঠিক এ বিষয়টিই হয়েছে। উসুলুল ফিকহের যে কিতাব ও নীতিগুলো এখন আমাদের সামনে আছে, সেভাবে কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম (رضي الله عنهم)-এর সময়ে ছিল না। কারণ, তখন এর দরকার ছিল না।

তাজউয়ীদের ক্ষেত্রেও একই জিনিস ঘটেছে। ইযহার, ইখফা, ইকলাব, ইদখাম, আল মুদুদ-তাজউয়ীদের এসব নিয়ম প্রথম প্রজন্মে দরকার ছিল না। তাঁদের কাছে এ বিষয়গুলো স্পষ্ট ছিল। তারা এগুলো জানতেন। এই বিষয়গুলো আলাদা আলাদা করে, ভেঙে ভেঙে শেখানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় পরে। ঠিক একই কথা তাওহিদের শ্রেণিবিভাগের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এখানে নতুন কিছু যুক্ত করা হয়নি। বরং বোঝার ও ব্যাখ্যার সুবিধার্থে এই শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, তাওহিদের শ্রেণি কি ৩টি নাকি ৪টি?

আমরা তিনটি শ্রেণিবিভাগের কথা জানি:

১. তাওহিদুর রুবুবিয়াহ।
২. তাওহিদ আল আসমা ওয়াস সিফাত।
৩. তাওহিদুল উলুহিয়াহ।

চতুর্থটি হলো তাওহিদুল হাকিমিয়াহ। অর্থাৎ শাসনের ক্ষেত্রে তাওহিদ।

আমি প্রথমে যে উলামায়ে কেরামের নাম বললাম (অর্থাৎ আবু হানিফা, ইবনু মান্দাহ, ইবনু জারীর), তাঁদের রচনাবলি থেকে মনে হয়, তারা তাওহিদের ৩টি শ্রেণির দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। তবে ইবনুল কাযিমের কিতাবাদিতে দেখবেন তিনি স্বতন্ত্রভাবে তাওহিদুল হাকিমিয়াহর কথা বলেছেন। আমার মনে হয়, তাওহিদুল হাকিমিয়াহ স্বতন্ত্র একটি শ্রেণি হিসেবে যারা চিহ্নিত করেছেন, তিনি তাঁদের মধ্যে প্রথম দিককার একজন। এমনকি তাঁর কিতাবে আমি সরাসরি ‘আল-হাকিমিয়াহ’ শব্দও পেয়েছি। পরবর্তীকালে রচিত আরও কিছু কিতাবে আপনি তাওহিদুল হাকিমিয়াহর কথা পাবেন।

তাওহিদুল হাকিমিয়াহ নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয় যখন কেউ কেউ এটাকে স্বতন্ত্র একটি শ্রেণি উপস্থাপন করতে শুরু করেন। সম্ভবত, আল্লাহর আইন ব্যতীত শাসনের বিষয়টি মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ার কারণে বিষয়টির ওপর বিশেষভাবে জোর দেয়ার

জন্য অনেকে একে পৃথক একটি শ্রেণি হিসেবে উপস্থাপন করতে শুরু করেন। অর্থাৎ তাওহিদুল হাকিমিয়াহকে স্বতন্ত্র, চতুর্থ শ্রেণি হিসেবে উপস্থাপন করার কারণ ছিল আল্লাহর আইন দিয়ে শাসনের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা। তাওহিদের কোনো একটি দিকের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপের জন্য আলাদা শ্রেণিবিভাগ করার বিষয়টিও নতুন না। আগেকার প্রজন্মেও এমন ঘটেছে। যেমন: অতীতের অনেক উলামায়ে কেরাম তাওহিদকে দুই শ্রেণিকে বিভক্ত করেছিলেন। পরে প্রেক্ষাপট ও প্রয়োজনের কারণে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে।

তাওহিদের শ্রেণি আসলে কি ২টি নাকি ৩টি, এ প্রশ্ন সুলাইমান ইবনু আদিল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্‌হাবেকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। সুলাইমান ছিলেন মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্‌হাবের নাতি। এ প্রশ্নের জবাবে তিনি খুব দামি একটা কথা বলেছিলেন। সুলাইমান ইবনু আদিল্লাহ (رحمته) বলেছিলেন,

‘যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি পূর্ণাঙ্গ তাওহিদ পাচ্ছ, ততক্ষণ একে দুই শ্রেণিতে ভাগ করছ না তিন শ্রেণিতে ভাগ করছ তা গুরুত্বপূর্ণ না।’

যারা তাওহিদকে তিন শ্রেণির বদলে চার শ্রেণিতে ভাগ করেন, সমসাময়িক অনেক আলিম তাঁদেরকে মুবতাদি বা বিদআতি মনে করেন। আমার মতে, এমন মনে করা ভুল। তিনের বদলে চার শ্রেণিতে ভাগ করা বিদআত নয়। আমি নিজে যখন শেখাই তখন তাওহিদের তিনটি শ্রেণির কথা বলি। যেমনটা আপনাদের বলেছি। একজন শিক্ষকের দায়িত্ব হলো তার ছাত্রদের উপযোগী করে উপস্থাপন করা। এটা শুধু তাওহিদের ক্ষেত্রে না; বরং সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আমি আমার ছাত্র ও শ্রোতাদের উপযোগী করে বিষয়গুলো উপস্থাপনের চেষ্টা করি। আরেকজন অন্যভাবে উপস্থাপন করতেই পারেন। এজন্য তাকে বিদআতি মনে করার কিছু নেই।

আমার মতে, রুবুবিয়াহ, উলুহিয়াহ, আসমা ওয়াস সিফাত এই তিন শ্রেণিতে ভাগ করা অধিক উপযুক্ত। কারণ আল-হাকিমিয়াহর বিষয়টি এক দিক থেকে রুবুবিয়াহর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, আবার আরেক দিক থেকে উলুহিয়াহর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আপনি যদি বলেন আল্লাহ (ﷻ) হলেন সমগ্র সৃষ্টির শাসনকর্তা, তাহলে এটি তাওহিদুর রুবুবিয়াহর অধীনে চলে আসে। আবার কেউ যদি বলে আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করা, একমাত্র আইন ও বিধান হিসেবে আল্লাহর শরীয়াহকে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা আবশ্যিক, তাহলে এটি তাওহিদুল উলুহিয়াহর অধীনে চলে আসে। কাজেই আল-হাকিমিয়াহর মধ্যে আল্লাহর রুবুবিয়াহর কিছু দিক আছে আবার উলুহিয়াহর কিছু দিকও আছে। এটা অনেকটা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর নিয়মের মতো। অনেক আলিম বলেছেন ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর দাবি ৭টি। কেউ কেউ বলেছেন

৮টি। তাগুতের ওপর অবিশ্বাস তথা কুফর বিত-তাগুত যদিও ৭-এর অন্তর্ভুক্ত, তবুও অনেক আলিম একে আলাদাভাবে এনেছেন।^[১৩৪]

আসলে দাওয়াহ এবং আকীদাহর শিক্ষা উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সময় ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী কিছু বিষয়ে জোর দিতে হয়। সময়ের দাবিকে মাথায় রাখতে হয়। যেমন ইসলামী ইতিহাসের শুরুর দিকে সালাফগণ বলতেন, ঈমান হলো আমল, মুখের স্বীকৃতি ও অন্তরের বিশ্বাস। আমলের মধ্যে কথা ও কাজ দুটোই অন্তর্ভুক্ত। এর সাথে মুখে ঈমানের স্বীকৃতি ও অন্তরে বিশ্বাস—এই হলো ঈমান।

পরে যখন মুরজিয়া^[১৩৫] ফিরকার দৌরাভ্য দেখা দিলো, তখন সালাফগণ বলতেন

[১৩৪] কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর ৮টি দাবি হচ্ছে :

- (১) জ্ঞান—যাতে থাকবে না অজ্ঞতার লেশমাত্র, অর্থাৎ জেনেবুঝে কালিমার সাক্ষ্য দিতে হবে।
- (২) সুদৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে এই সাক্ষ্য দিতে হবে।
- (৩) এতে ইখলাস থাকতে হবে, যাতে থাকবে না শিরকের গন্ধমাত্র।
- (৪) বিশুদ্ধ সত্যবাদিতা, যাতে থাকবে না নিফাক (মুনাফিকী) বা কপটতার গন্ধমাত্র।
- (৫) আল্লাহর প্রতি এমন অগাধ ভালোবাসা, যাতে থাকবে না আল্লাহর প্রতি কিংবা আল্লাহর দ্বীনের কোনো বিষয়ের প্রতি সামান্যতম ঘৃণা বা বিদ্বেষ।
- (৬) এই কালিমাকে নির্দিধায় প্রফুল্ল মনে এমনভাবে গ্রহণ করা, যাতে অস্বীকার বা বর্জন করার কোনো অবকাশ থাকবে না।
- (৭) “لا إله إلا الله” এর দাবি ও চাহিদার প্রতি পূর্ণ বিনয় ও আনুগত্য প্রদর্শন, যাতে থাকবে না কোনোরূপ অহংকার বা নাফরমানির লেশমাত্র।
- (৮) তাগুতসমূহকে অস্বীকার ও বর্জন করা। অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্য সকল উপাস্যকে অস্বীকার ও বর্জন করা।

শাইখ বলছেন, কুফর বিত তাগুত বা তাগুতকে অস্বীকার করা, এটি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর দাবি ও চাহিদা’ এর অন্তর্ভুক্ত।

[১৩৫] মুরজিয়া (المرجئة) একটি ফিরকা বা দলের নাম, এরা খারিজীদের বিপরীত দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। এই শব্দের আবির্ভাব হয়েছে إرجاء হতে যার মানে বিলম্বিতকরণ, মূলতবিকরণ, স্থগিতকরণ। মুরজিয়াদের প্রসিদ্ধতম ব্যক্তি হচ্ছে জাহম বিন সাফওয়ান, মুকাতিল বিন সুলাইমান। মুরজিয়াদের সম্পর্কে ইমাম ইবনু উয়াইনাহ (رحمته الله) বলেছেন, فَأَمَّا الْمَرْجِئَةُ الْيَوْمَ فَهُمْ قَوْمٌ يَقُولُونَ: الْإِيمَانُ قَوْلٌ بِلَا عَمَلٍ ‘আজকালকার মুরজিয়া হচ্ছে তারা, যারা বলে ঈমান আমল বিনা কেবল কথার (সাক্ষ্যের) নাম।’-তাহযীবুল আসার :২/৬৫৯; ইরজার বিভিন্ন ধরন ও প্রকার আছে। সংক্ষেপে বিভিন্ন ধরনের মুরজিয়াদের আকীদাহ উল্লেখ করা হলো :

- ১) ঈমান কেবল মারিফাতের নাম। মারিফাত বলতে অন্তরের দ্বারা চেনা।
- ২) ঈমান কেবল মুখের স্বীকৃতির নাম।
- ৩) ঈমান কেবল অন্তরের বিশ্বাসের নাম।
- ৪) ঈমান হচ্ছে অন্তর দ্বারা বিশ্বাস করা (সত্যায়ন করা) এবং মুখে স্বীকার করা।
- ৫) ঈমান আনার পর কুফর করলেও কেউ কাফির হয় না।
- ৬) মুমিন গুনাহর কারণে জাহান্নামে যাবে না।

ঈমান হলো অন্তরে বিশ্বাস, মুখের স্বীকৃতি এবং দ্বীনের আরকানগুলোর আমল অর্থাৎ আমালুন বিল আরকান।^[১৩৬] অর্থাৎ মুরজিয়াদের ফিরকা ও বিভ্রান্তির ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতির কারণে তারা আমলের জায়গায় আমালুন বিল আরকান বলতেন। আগে এটা বলা হতো না, কারণ আগে এ বিষয়টি আলাদা করে স্পষ্ট করার, এ নিয়ে বিশেষভাবে জোর দেয়ার দরকার ছিল না। মুরজিয়াদের আবির্ভাব ও প্রসারের কারণে এ বিষয়টি পরিষ্কার করার এবং মুরজিয়াদের সাথে আহলুস সুন্নাহর পার্থক্য স্পষ্ট করার জন্য এমন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।^[১৩৭]

একইভাবে আজকের যুগে যেহেতু মানবরচিত আইন দিয়ে শাসনের বিষয়টি মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছে, তাই অনেকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এ বিষয়টি আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করেছেন। আর আল্লাহর শরীয়াহর বদলে মানবরচিত আইন দিয়ে শাসনের বিষয়টি যে মহামারির চেয়েও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্‌হাব (رحمہ اللہ)-এর জীবদ্দশায় কবরপূজা, কবরের ওপর সৌধ তৈরি, কবরের অধিবাসীর উদ্দেশ্যে দু'আ করা, পশু যবেহ করার মতো বিষয়গুলো মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই যুগে মূল সমস্যা ছিল কবর-সংক্রান্ত শিরক। আজকের প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে আল্লাহর আইন ব্যতীত অন্য আইন দিয়ে শাসন। মানবরচিত আইন দিয়ে শাসন। নিঃসন্দেহে এ বিষয়টি বিশেষ

৭) আমল ঈমানের অংশ নয়।

৮) জুহুদ (ইচ্ছাকৃত অস্বীকার) ছাড়া কুফর নেই।

৯) তাকযিব (মিথ্যা প্রতিপন্ন করা) ছাড়া কুফর নেই। অর্থাৎ কুফর শুধু এই প্রকারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

১০) কোনো কাজ সত্তাগতভাবে কুফর আকবর নয়।

১১) ঈমান বাড়েও না কমেও না, ইত্যাদি।

সালারুগণ মুরজিয়াদের খুব কঠোরভাবে রদ করেন। সাঈদ বিন জুবাইর (رحمہ اللہ) এদেরকে উন্মত্তের ইহুদী বলেছেন।-আস সুন্নাহ, পৃষ্ঠা : ৩৪১

যখন মুরজিয়া আলিম আব্দুল আযিয বিন আবি রুওয়াদ মারা যায় তখন সুফিয়ান আস সাওরি (رحمہ اللہ)-এর পাশ দিয়ে তার খাটলি নেয়া হয়। কিন্তু সে মুরজিয়া হওয়ায় ইমাম সুফিয়ান ও জনগণ তাঁর জানাযা পড়েননি।-ইমাম উকাইলী (رحمہ اللہ), আদ দু'আফাউল কাবীর : ৩/৬

[১৩৬] অর্থাৎ দ্বীনের রুকনসমূহের ওপর আমল করা। যেমন : সালাত আদায় করা, সিয়াম পালন করা, হজ্জ করা, যাকাত দেয়া।

[১৩৭] যেহেতু মুরজিয়াদের মতে ঈমানের মাঝে আমলের কোনো অংশ নেই, তাই তাদের মতে আমল না করলে ঈমান কমে না; যা ছিল তা-ই থাকে। ফলে কেউ আমল চিরতরে ত্যাগ করলেও ততক্ষণ কাফির হবে না যতক্ষণ না সে মুখে নিজেকে নাস্তিক, খ্রিষ্টান, ইহুদী, হিন্দু বা অন্য কিছু বলে দাবি না করছে। এর ফলে প্রাণ্টিকাল কাফিররা সমাজে অবস্থান করে মুসলিমদের আকীদাহ ও আমল নষ্ট করে। কেননা এরা জীবনেও ইসলামের ওপর আমল করে না, কিন্তু মুখে নিজেদের মুসলিম দাবি করে। তাই তখন থেকেই সালারুগণ এর ওপর জোর দিলেন যে, আরকানুল ইসলামের ওপর আমল জরুরি-আমল ঈমানকে বৃদ্ধি করে, আমল ত্যাগ ঈমানকে কমায়।

গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা এবং সাধারণ মানুষের সামনে স্পষ্ট করা আবশ্যিক। তবে আমি মনে করি তাওহিদের তিন শ্রেণির ভেতরে থেকেই এ বিষয়টি আলাদাভাবে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা যায়। আমি এভাবেই শেখাই। কিন্তু কেউ চাইলে তাওহিদুল হাকিমিয়াহ তাওহিদের চতুর্থ একটি শ্রেণি হিসেবে উপস্থাপন করে শেখাতে পারে। এতে কোনো সমস্যা নেই। যে এমন করছে সে মুবতাদি না। সে কোনো বিদআত করছে না। এটা কেবল শেখানোর আলাদা একটা স্টাইল।

শিরক আল-উলুহিয়াহর তৃতীয় প্রকার : আনুগত্যের ক্ষেত্রে শিরক

শিরক আল-উলুহিয়াহর তৃতীয় প্রকার হলো শিরক আত-তা'আহ অথবা আনুগত্যের ক্ষেত্রে শিরক। এখানেও শিরকের অর্থ হলো এমনভাবে কারও বা কিছু আনুগত্য করা, যা কেবল আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট।

মহান আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

اَتَّخِذُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُءُوبَاتَهُمْ أَزْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا

‘তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়ামপুত্র মাসীহকেও। অথচ তারা এক ইলাহের ইবাদাত করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছে। তিনি ছাড়া কোনো (হক) ইলাহ নেই।’ [সূরা আত তাওবাহ, ৯: ৩১]

আদি ইবনু হাতিম (رحمته) যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন তাঁর গলায় ছিল সোনার একটি ক্রুশ। ইসলাম গ্রহণের আগে তিনি খ্রিষ্টান ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন সূরা তাওবাহর এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন। আদি (رحمته) তখন বললেন, তারা অর্থাৎ ইহুদী-খ্রিষ্টানরা তো ধর্মযাজক আর সন্ন্যাসীদের ইবাদাত করত না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন,

أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه ، وإذا حرّموا عليهم شيئاً حرّموه

‘হ্যাঁ, যদিও তারা তাদের উপাসনা করত না, কিন্তু যখন এসব যাজক তাদের কোনো কিছুকে হালাল করে দিত, তারা সেটাকে হালাল মনে করত; আর যখন এরা কিছুকে তাদের জন্য হারাম করে দিত, ওরাও সেটাকে হারাম মনে করত (এটাই ইবাদাত)।’ [১০৮]

আর অনুসরণ করার মাধ্যমে তারা ধর্মযাজক ও সন্ন্যাসীদের ইবাদাত করেছিল। হারাম ও হালালের বিষয়ে আনুগত্য করা ইবাদাত। ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (رحمہ اللہ) তাঁর মাজমু আল-ফাতাওয়ার ৭ম খণ্ডে এই আয়াত নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

‘তারা তাদের আলিম ও সন্ন্যাসীদেরকে এভাবে রব হিসেবে গ্রহণ করেছিল যে, এসব আলিম ও সন্ন্যাসী আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত জিনিসকে হালাল বললে আর হালালকৃত জিনিসকে হারাম বললে তারা সেটাই মেনে তাদের আনুগত্য করত। এটা দুভাবে হতো। প্রথমত, তারা জানত যে এসব আলিম ও সন্ন্যাসী আল্লাহর দ্বীনকে পরিবর্তন করছে; কিন্তু এরপরও তারা এই পরিবর্তনই কামনা করত এবং তাদের নেতাদের আনুগত্য করে আল্লাহ কর্তৃক হালালকৃত জিনিসকে হারামকরণ ও হারামকৃত জিনিসকে হালালকরণকে বিশ্বাস করত। অথচ তারা জানত যে, এটা রাসূলদের আনীত দ্বীনের বিরোধী। এটা হচ্ছে কুফর, এতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে শিরক করা হয়েছে, যদিও তারা এসব আলিম বা সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করে না, তাদেরকে সিজদাহ করে না।

কাজেই যে ব্যক্তি দ্বীনের বিপরীত কোনো বিষয় অনুসরণ করে—অথচ সে জানে যে এটা দ্বীনের বিরোধী—এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিপরীত বক্তব্যের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে, সে মুশরিকদের মতোই মুশরিক।’^[১৩৯]

এটি হলো এ বিষয়ে ইমাম ইবনু তাইমিয়াহর বক্তব্যের সারাংশ। আমি বর্তমান সময়ের জন্য ইমাম ইবনু তাইমিয়াহর বক্তব্যকে কিছুটা পরিমার্জিত করে বলব,

যে গণতন্ত্র কিংবা অন্য কোনো মানবচরিত আদর্শ কিংবা নিয়মের ভিত্তিতে বিধান প্রণয়ন করে (হালাল-হারাম ঠিক করে) এবং জানে যে, সে আল্লাহর দ্বীনকে পরিবর্তন করছে, সে শিরক করেছে। প্রকৃতপক্ষে সে গণতন্ত্র কিংবা অন্য কোনো মানবচরিত আদর্শের ইবাদাত করছে। এসব আদর্শ ও নিয়মের অনুসরণের মাধ্যমে সে শিরক করেছে, যদিও সে গণতন্ত্র কিংবা মানবচরিত আইনের কাছে দু’আ করে

সনদ মিলিয়ে হাসান।-আস সিলসিলাতুস সহীহাহ, হাদীস নং : ৩২৯৩

[১৩৯] মাজমু আল-ফাতাওয়া : ৭/৭০। মূল আরবী :

وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا أَعْبَادَهُمْ وَرُءُوبَانَهُمْ أَرْبَابًا - حَيْثُ أَطَاعُوهُمْ فِي تَخْلِيلِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَتَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ يَكُونُونَ عَلَى وَجْهَيْنِ: (أَحَدُهُمَا): أَنْ يَعْلَمُوا أَنَّهُمْ يَدُلُّوْنَ بَيْنَ اللَّهِ فَيَتَّبِعُونَهُمْ عَلَى التَّبْدِيلِ فَيَعْتَقِدُونَ تَخْلِيلَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَتَحْرِيمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ اتِّبَاعًا لِرُءُوسَانِهِمْ مَعَ عِلْمِهِمْ أَنَّهُمْ خَالَفُوا بَيْنَ الرُّسُلِ فَهَذَا كُفْرٌ وَقَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ شِرْكًَا - وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا يُصَلُّونَ لَهُمْ وَيَسْجُدُونَ لَهُمْ - فَكَانَ مَنْ اتَّبَعَ غَيْرَهُ فِي خِلَافِ الْبَيْنِ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهُ خِلَافُ الْبَيْنِ وَاعْتَقَدَ مَا قَالَهُ ذَلِكَ دُونَ مَا قَالَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؛ مُشْرِكًا مِثْلَ هَؤُلَاءِ

না, কিংবা সিজদাহ করে না।

দার্শনিক ও মর্ডানিস্টরা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে তাদের নিজস্ব চিন্তা ও যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে। কুরআন ও সুন্নাহর ওপর তারা নিজেদের আকল ও চিন্তাকে প্রাধান্য দেয়। যুক্তি আর মনের মাপকাঠিতে তারা কুরআন ও সুন্নাহর বিচার করে। এ ধরনের লোকেরা আল্লাহর পরিবর্তে নিজেদের আকল, আর বিচারবুদ্ধির ইবাদাত করে। যদিও তারা এগুলোর প্রতি রুকু-সিজদাহ করে না।

শাসনের ক্ষেত্রে শিরকের উদাহরণ

শাসনের ক্ষেত্রে শিরকের কিছু বাস্তব উদাহরণ দেখা যাক।

প্রথম প্রকার : এমন কোনো লোকের কথা চিন্তা করুন, যে মনে করে আল্লাহর আইনের চেয়ে অন্য কোনো আইন উত্তম। এই লোক মুশরিক। সে শিরক আকবর করেছে। তার অবস্থান কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক। মহান আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْتَغُونَ ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

‘তারা কি তবে জাহিলিয়াতের বিধান চায়? আর নিশ্চিত বিশ্বাসী জাতির জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক উত্তম?’ [সূরা আল-মায়িদাহ, ৫: ৫০]

এবং তিনি বলেছেন,

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَكِمِينَ

‘আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম (বিচারক) নন?’ [সূরা আত তীন, ৯৫:

৮]

এগুলো আসলে রেটোরিকাল প্রশ্ন। মহান আল্লাহ এ প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে আমাদেরকে সত্য জানিয়ে দিচ্ছেন।

দ্বিতীয় প্রকার : এমন কোনো ব্যক্তি, যে মনে করে আল্লাহর নাযিল করা আইনের বদলে অন্য আইন দিয়ে শাসন করা জায়েয। লক্ষ করুন, অন্য আইনকে সে আল্লাহর আইনের চেয়ে উত্তম মনে করছে না। সে কেবল মনে করছে অন্য আইন দিয়ে শাসন করা জায়েয। এ ব্যক্তিও শিরক আকবর করল। কারণ আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে শাসন করা নিষিদ্ধ, এটি কুরআনের আয়াত, রাসূল (ﷺ)-এর হাদীস এবং ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।

তৃতীয় প্রকার : কুরআন ও সুন্নাহতে যা এসেছে তার বদলে অন্য কোনো আইন বা শরীয়াহ প্রণয়ন করা। এই আইন দিয়ে বিচার করা জায়েয কিংবা এই আইন আল্লাহর

আইনের সমকক্ষ কিংবা তার চেয়ে উত্তম মনে করা। এটিও শিরক আকবর। আল্লাহ যে আদেশ দিয়েছেন সে তা লঙ্ঘন করে নিজে আইন প্রণয়ন করল।

চতুর্থ প্রকার : যে শাসক আল্লাহর আইনের বদলে অন্য আইন দিয়ে শাসন করে, তাকে স্বেচ্ছায় মেনে নেয়া কিংবা তার আনুগত্য করা। যে এমন করল সে শিরক করল। স্বেচ্ছায়, বুঝে শুনে এমন কারও শাসনকে মেনে নেয়ার অর্থ তাকে কুরআন ও সুন্নাহর ওপর স্থান দেয়া, আল্লাহর আইনের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা, মানবচরিত আইনকে আল্লাহর আইনের সমকক্ষ কিংবা এর চেয়ে উত্তম ভাবা। মহান আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

‘আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, সে অনুযায়ী যারা বিচার ফয়সালা করে না, তারাই কাফির।’ [সূরা আল-মায়িদাহ, ৫: ৪৪]

এবং তিনি বলেছেন,

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَخْبَطَ أَعْمَلَهُمْ

‘তা এজন্য যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তারা তা অপছন্দ করে। অতএব তিনি তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করে দিয়েছেন।’ [সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭: ৯]

এ বিষয়ে আরও অনেক লম্বা আলোচনা করা সম্ভব। তবে আমি এখানে আলিমদের আলোচনার সারমর্ম সংক্ষেপে আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাচ্ছি।

শাসনের ক্ষেত্রে শিরকের আলোচনায় একটা বিষয়ের দিকে খেয়াল রাখা প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ এবং শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহহাব (رحمهم الله)-এর কিছু উদ্ধৃতি পড়েই কেউ কেউ মানুষকে এলোপাথাড়ি কাফির, মুশরিক বলতে শুরু করে। আল্লাহ চাইলে আমার এ ব্যাপারে একটি বই লেখার ইচ্ছা আছে। তবে আমি এখানে সংক্ষেপে বলছি।

পশ্চিমে অবস্থান করা মুসলিমদের অনেক সময় কিছু বিশেষ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। যেমন: চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মোকাবেলার জন্য কেউ আদালতের কাছে গেল। অথবা কেউ তার সন্তানের কাস্টডি পাওয়ার জন্য আদালতের কাছে যেতে বাধ্য হলো। যদি অন্তরে আল্লাহর প্রতি পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস থাকে এবং বাধ্য হয়ে চরম ও দুর্বিষহ বিপর্যয় থেকে নিজের অধিকার রক্ষা করতে কেউ আদালতের দ্বারস্থ হয়, তাহলে পশ্চিমে থাকা কোনো মুসলিম এমন করলে তাকে মুশরিক বলা যাবে না। তবে মনে রাখবেন এটা শুধু এমন অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন ভয়ংকর কোনো দুর্যোগ, মারাত্মক পর্যায়ে কোনো বিপদ তার ওপর এসেছে এবং সে কেবল তাঁর বৈধ শার’ঈ

অধিকার রক্ষার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে।

ধরুন, সোশ্যাল সার্ভিস কারও সন্তান ছিনিয়ে নিচ্ছে। সে জানে, তাঁর সন্তানকে সোশ্যাল সার্ভিস নিয়ে গেলে সে কাফির হিসেবে বেড়ে উঠবে। সে কেবল তাঁর সন্তানকে ফেরত চায়, দ্বীনের ওপর বড় করতে চায়। অভিভাবক হিসেবে তাঁর অধিকার রক্ষা করতে চায়। তাঁর মধ্যে তাগুতকে অস্বীকার এবং এক আল্লাহর ওপর বিশ্বাসের ঈমান পুরোপুরি আছে। এমন অবস্থায় সে যদি বাধ্য হয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়, তাহলে তাকে মুশরিক বলা যাবে না।

স্বয়ং নবী (ﷺ) মুতাইয়্যিবিনের চুক্তির সাক্ষী ছিলেন। তিনি এ চুক্তির প্রশংসা করেছিলেন। এ চুক্তির নাম নেয়া হয়েছে তাইয়্যিব শব্দ থেকে। যার অর্থ ভালো, কল্যাণ। এ চুক্তি হিলফুল ফুযুল নামেও পরিচিত।

নবী (ﷺ) বলেছিলেন,

شَهِدْتُ غُلَامًا مَعَ عُمُومَتِي حِلْفَ الْمُطَيِّبِينَ، فَمَا أَحْبَبُّ أَنْ لِي حُمْرُ النَّعَمِ وَإِنِّي أَنْكُرُهُ

‘আমি আমার চাচাদের সাথে আল মুতাইয়্যিবিনের চুক্তিতে উপস্থিত ছিলাম। তখন আমি ছিলাম বালক। আমার কাছে একটা লাল উট থাকবে আর (এর বিনিময়ে) আমি সেই চুক্তি ভঙ্গ করব, তা আমি মোটেও পছন্দ করি না।’^[১৪০]

এ চুক্তি হয়েছিল নবুওয়্যাতের আগে। চুক্তিটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ইবনু জা’দানের ঘরে, বনু হিশাম এবং বনু যাহরাহ গোত্রের মধ্যে। নবী (ﷺ) এ চুক্তির সময় উপস্থিত ছিলেন। এ চুক্তির বিষয়বস্তু ছিল বঞ্চিত ও মজলুমদের অধিকার রক্ষা করা এবং তাদের ন্যায্য প্রাপ্য তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া। এ চুক্তির মাধ্যমে কিছু আইন তৈরি করা হয়েছিল, যেগুলো মানুষের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও মোকদ্দমা নিষ্পত্তিতে ব্যবহার করা হতো। এবং মানুষ এই ফয়সালা মেনে নিতে বাধ্য ছিল। কিন্তু কেউ এ কথা বলতে পারবে না যে, জাহিলিয়াতের যুগে এই চুক্তির সময় উপস্থিত থাকার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাগুতের আইনকে মেনে নিয়েছিলেন বা পরবর্তী সময় এ চুক্তি প্রশংসা করার মাধ্যমে তিনি (ﷺ) তাগুতের আইনের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

সাহাবায়ে কেরাম (رضي الله عنهم) আবিসিনিয়ায় আন-নাজ্জাশীর আদালতে গিয়েছিলেন। সেটা কি জোরপূর্বক ছিল? না। সাহাবায়ে কেরাম (رضي الله عنهم)-এর মক্কায ফেরত যাবার সুযোগ ছিল। তাঁদের ওপর কোনো জোরজবরদস্তি এখানে ছিল না।

সাহাবী আল-হাজ্জাজ ইবনু আল্লাত আস-সুলামি (رضي الله عنه)-এর ঘটনা আরও স্পষ্ট। এই

[১৪০] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং : ১৬৭৬, আল্লামা শু’আইব আরনাউত্ (رحمته الله)-এর মতে সনদ সহীহ।

সাহাবী ছিলেন অত্যন্ত ধনী ব্যবসায়ী। খাইবারের যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অনুমতি নিয়ে তিনি কিছুদিনের জন্য মক্কায় থাকতে গেলেন। মক্কায় তাঁর অনেক সম্পদ ছিল। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কিছুদিন কুরাইশের মাঝে অবস্থান করে, তাদেরকে নরম করে নিজের সম্পদ ফিরিয়ে আনা। অর্থাৎ নিজের সম্পদ মক্কা থেকে ছাড়িয়ে আনার জন্য তাকে কুরাইশের নেতাদের কাছে গিয়ে কিছু নরম কথা বলতে হবে। তিনি বলেছিলেন,

‘হে রাসূলুল্লাহ, আমাকে অনুমতি দিন যাতে আমি ফিরে গিয়ে আমার স্ত্রীর কাছ থেকে স্বীয় সম্পদ ফিরিয়ে আনতে পারি। কেননা সে যদি আমার ইসলাম গ্রহণের কথা জানতে পারে, তাহলে আর তার কাছ থেকে কিছুই আনতে পারব না।’

এমনকি সাহাবী আল-হাজ্জাজ (رضي الله عنه) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে এও বলেছিলেন,

‘হে রাসূলুল্লাহ, (কুরাইশদের মন জয় করার জন্য) আমাকে অনেক কিছুই বলতে হবে।’ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে যা মন চায় বলার অনুমতি দিলেন।^[১৪১]

আসলে এ ব্যাপারে আরও অনেক আলোচনা করা যায়। এটা একটা স্বতন্ত্র বইয়ের আলোচনা। এ বিষয়ে দুটি মত আছে—সেগুলো নিয়েও আরও অনেক কথা বলা যায়। আমার এ কথাগুলোর বলার উদ্দেশ্য আপনাদের তাগুতের আদালতে বিচার চাইতে যেতে উৎসাহিত করা না। আমি এমন কিছু বলছি না। আমি শুধু অত্যন্ত গুরুতর কিছু ব্যতিক্রমের কথা বলছি। আমি এমন অবস্থার কথা বলছি, যখন ব্যক্তির অন্তরে পরিপূর্ণ ঈমানের বুঝ থাকে, তাওয়াগীতের প্রতি ঘৃণা থাকে এবং অধিকার ছিনিয়ে নেয়ার ফলে সে চরম ও ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়। তাগুতের আদালতে যাওয়া ছাড়া অধিকার আদায়ের আর কোনো বিকল্প তাঁর সামনে থাকে না। এ ক্ষেত্রে কোন কোন পরিস্থিতি দ্বারুহ (ضرورة)—বা একান্ত প্রয়োজন—হিসেবে গণ্য হবে তা নিয়ে ঢালাওভাবে কিছু বলা যাবে না। এ ধরনের ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রগুলোতে প্রত্যেক পরিস্থিতির ফলে সৃষ্ট বিপদ ও বিপর্যয়কে আলাদা আলাদাভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। এ ছাড়া যেকোনো সমস্যা বা বিপদের ক্ষেত্রে এভাবে চিন্তা করা যাবে না। খুব বড় ধরনের কোনো বিপদ হতে হবে। একই সাথে এটাও শর্ত যে, ওই ভয়ানক মোকাবেলার জন্য তাগুতের আদালতে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। যদি ভয়ানক বিপদও তাগুতের আদালতে না গিয়ে কোনোভাবে মোকাবেলা করা যায় অথবা ধৈর্য ধরা সম্ভব হয়, তাহলে আদালতে যাবেন না। সবার করুন, আল্লাহর কাছে প্রতিদান চান।

মহান আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

‘আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে নিষ্কৃতির পথ করে দেবেন।’

[সূরা আত তালাক, ৬৫: ২]

তবে অন্য সব রাস্তা বন্ধ হয়ে গেলে, কোনোভাবেই সহ্য করা সম্ভব না হলে, ব্যক্তির অন্তরে যদি পরিপূর্ণ ঈমানের বুঝ থাকে, তাওয়াগীতের প্রতি ঘৃণা থাকে, এবং তার অধিকার ছিনিয়ে নেয়ার ফলে সে চরম ও ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়, তাহলে সে বাধ্য হয়ে তাগুতের আদালতে গেলে তাকে মুশরিক বা কাফির বলা যাবে না।

মাস কয়েক আগে, কিছু ভাই আমার সাথে যোগাযোগ করলেন। তাঁদের পরিচিত এক ভাই তাঁর মেয়ের কাস্টডি পাওয়ার জন্য আদালতে গিয়েছিলেন। তিনি এমন এক মহিলার কাছ থেকে নিজের মেয়ের কাস্টডি পাওয়ার জন্য লড়ছিলেন, কাস্টডি পেলে যে নিশ্চিত মেয়েকে কাফির হিসেবে বড় করবে। নিজের মেয়ের কাস্টডি পাওয়ার জন্য আদালতে যাওয়ার কারণে এই ভাইকে তাদের পরিচিত আরেক ভাই কাফির-মুশরিক বলছিল। দলিল হিসেবে ব্যবহার করছিল ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ এবং শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহহাবের কিছু উক্তিকে। কিছু ভাই আমার সাথে যোগাযোগ করে তার সাথে কথা বলার অনুরোধ করলেন।

আমি তার সাথে কথা বললাম। সে বারবার সেই উক্তিগুলো পুনরাবৃত্তি করতে থাকল। কুফর আর তাগুতের কথা বলল। কিছু মানুষের ক্ষেত্রে এমন হয় যে, তারা কোনো কিছুর শুধু খোলসটুকু নেয়। খোলসের ভেতরে কী আছে সেটা তারা জানে না। কুফর বিত তাগুতের কথা বারবার বললেও, সে কেবল খোলসটাই দেখছিল। শেষমেশ আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, তুমি কোন আলিমদের অনুসরণ করো? কোন আলিমদের তুমি গ্রহণযোগ্য মনে করো?

সে বলল, প্রথমে আপনি, তারপর শাইখ আলি আল-খুদাইর।

আমি বললাম, আমার কথা বাদ দাও। এ ব্যাপারে শাইখ আলি আল-খুদাইর কী বলেছেন তা ভালোমতো পড়ে দেখো। তিনি তাঁর একটি কিতাবে এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

তাকফিরের ব্যাপারে শাইখ আলি আল-খুদাইরের ফাতওয়া অত্যন্ত সমৃদ্ধ। দলিল দ্বারা পরিপূর্ণ। অত্যন্ত চমৎকার। আল্লাহ (ﷻ) কারাগার থেকে তাঁর কল্যাণময় মুক্তি ত্বরান্বিত করুন। আমাদের সব বন্দী মুসলিম ভাইবোনের কল্যাণময় মুক্তি ত্বরান্বিত করুন।

সাধারণত যেকোনো বিষয়ে ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (ﷺ) এবং শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহহাব (ﷺ)-এর অবস্থান সঠিকভাবে বোঝার জন্য তাঁদের লেখা আর উপস্থাপনার ধাঁচ সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকা প্রয়োজন। তাঁদের সম্পূর্ণ রচনাবলি

গভীরভাবে না পড়ে আউট অফ কনটেক্সট কোনো উদ্ধৃতি দেখে খুব সহজেই ভুল কোনো উপসংহারে পৌঁছে যাওয়া যেতে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় লোকে তাঁদের রচনাবলি থেকে আউট অফ কনটেক্সট কিছু উদ্ধৃতি পড়ে মানুষকে এলোপাথাড়ি তাকফির করা শুরু করেছে। বিশেষ করে ইবনু তাইমিয়াহর ক্ষেত্রে এ বিষয়টা গুরুত্ব দিয়ে মাথায় রাখা দরকার। যে তাঁর পূর্ণাঙ্গ রচনা পড়েনি, তাঁর মাজমু পুরোপুরি পড়েনি, সে ইবনু তাইমিয়াহর রচনাবলি থেকে ইচ্ছেমতো কয়েক লাইন উদ্ধৃত করার পর্যায়ে পৌঁছানি। সে যে-ই হোক না কেন। যত বড় আলিম হোক না কেন। যারা ইবনু তাইমিয়াহর রচনাবলি গভীরভাবে, বিস্তারিতভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে পড়েনি, তাদের কাছে মনে হবে অনেক বিষয়ে তাঁর বক্তব্য সাংঘর্ষিক। যেমন: মধ্য শা'বানের রাতের ব্যাপারে তাঁর অবস্থান। যে বিস্তারিত তাঁর রচনাবলি পড়েনি, তাঁর কাছে মনে হবে এ ব্যাপারে ইবনু তাইমিয়াহর অবস্থান পরস্পর সাংঘর্ষিক।

আজ এমন অনেক লোক পাবেন যারা কখনো ইবনু তাইমিয়াহর মাজমু আল-ফাতাওয়ার একটি খণ্ডও খুলে দেখেনি। কোনো এক খণ্ড আগাগোড়া পড়া তো অনেক দূরের কথা। এমন অনেক লোক আছে যারা আরবী পড়তেও পারে না। কিন্তু সে মাজমু আল-ফাতাওয়ার কিছু উদ্ধৃতির অনুবাদ কিংবা অনুবাদের অনুবাদ পড়ে তাকফির আর শিরক নিয়ে কথা বলতে শুরু করে। এলোপাথাড়ি তাকফির করে। এ কারণেই ইবনু তাইমিয়াহ এবং মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্‌হাবের রচনাবলির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়। যেমনটা আমরা করছি। মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্‌হাবের লেখার স্টাইল, লেখার ধাঁচ নিয়েও বই লেখা হয়েছে। এজন্যই আমি আগেও বলেছি, এমন উলামায়ে কেরাম আছেন যারা তাঁদের জীবনের অনেক বছর এই মহান আলিমদের রচনাবলি অধ্যয়ন ও আত্মস্থ করার কাজে ব্যয় করেছেন। তারা আসলে কী বলেছেন, যেসব বক্তব্য আপাতভাবে সাংঘর্ষিক সেগুলোর মধ্যে সমন্বয় কীভাবে হবে, কোন পরিস্থিতিতে কোন কথা বলা হয়েছিল—এ সবকিছু নিয়ে তারা আলোচনা করেছেন।

উলামায়ে কেরামের কথা উদ্ধৃত করার সময় কোন প্রেক্ষাপটে কোন পরিস্থিতিতে তারা কথাগুলো বলেছিলেন সেটা দেখুন। তাঁদের কথাকে সেই পরিস্থিতির সাথে মেলান। আপনার পছন্দের পরিস্থিতির ওপর জোর করে চাপিয়ে দেবেন না। আর যে বিষয়ে ইলমের মহিরুহদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে, সে বিষয়ে অন্য কোনো মুসলিমকে তাকফির করবেন না। কাজেই কোনো ব্যক্তি যদি চরম বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়, যখন তার অধিকার ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে এবং এই ব্যক্তির অন্তরে পরিপূর্ণ ঈমানের বুঝ আছে, তাওয়াগীতের প্রতি ঘৃণা আছে এবং তাগুতের আদালতে যাওয়া ছাড়া অধিকার আদায়ের আর কোনো উপায় তাঁর নেই, তাহলে সে আদালতে যাওয়ার কারণে তাকে কাফির বলা যাবে না। যারা এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চান তারা শাইখ আলি আল-

খুদাইরের আলোচনা দেখতে পারেন। আর আল্লাহ চাইলে আমি এ ব্যাপারে একটি বই লিখব।

পঞ্চম প্রকার : শাসনের ক্ষেত্রে শিরকের ৪টি ধরনের কথা বলেছি। পঞ্চম উদাহরণ হলো, আল্লাহর শরীয়াহ ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে শাসনের দিকে আহ্বান করা। আজ যেমন এমন আইনের দিকে আহ্বান করা হয়—যা নারীদের হিজাব ছাড়া বাইরে বের হতে দেয়, যা সুদকে বৈধ করে। অথবা এমন আইন যা চার বিয়েকে অবৈধ করে। এ ধরনের কোনো আইনের দিকে আহ্বান করা শিরক আকবর। যে এ কাজ করবে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে। কারণ এ ধরনের আহ্বান কেবল ওই লোকই করতে পারে, যার অন্তরে মানবরচিত আইনের ব্যাপারে মুক্ততা আছে এবং যে এসব আইনকে আল্লাহর আইনের চেয়ে উত্তম মনে করে। এটি আল্লাহর আইনের প্রতি ঘৃণা ও তচ্ছিল্যও প্রকাশ করে। এটি শিরক আকবর। আর যেসব মুসলিম নামধারী লোক এ ধরনের কাজ করে, তারা খুব সম্ভবত মুনাফিকও। কারণ এরা নিজেকে মুসলিম দাবি করবে, মুসলিমদের সাহায্যকারী দাবি করবে, জুমার সালাত আদায় করার ছবি দেখিয়ে নিজের ঈমানের প্রমাণ দেয়ার চেষ্টা করবে। আবার শিরক আকবর করবে।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়। একজন প্রকৃত মুজতাহিদ^[১৪২] যখন শরীয়াহর দলিল-প্রমাণের আলোকে কোনো কিছু হালাল বা হারাম হবার ফাতওয়া দেন, তখন সেটা ভিন্ন ব্যাপার। একজন মুজতাহিদ হয়তো ভুলবশত কোনো হারাম জিনিসকে হালাল বলতে পারেন বা হালালকে হারাম বলতে পারেন। এর অনেক কারণ থাকতে পারে। প্রাসঙ্গিক কোনো হাদীস হয়তো সেই মুজতাহিদের কাছে পৌঁছেনি, তাই হারাম একটি বিষয়কে তিনি হালাল গণ্য করেছেন। একজন মুজতাহিদের এ ধরনের ভুল কুফর বা শিরক না। এটা গুনাহও না, উল্টো একজন মুজতাহিদের ভুল যদি আন্তরিক হয়ে থাকে, তাহলে তিনি এর জন্য একটি পুরস্কার পাবেন।^[১৪৩] কিন্তু যে জেনেশুনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পথ বাদ দিয়ে অন্য কোনো পথ অনুসরণ করে, সে শিরক করেছে।

[১৪২] মুজতাহিদ : মুজতাহিদ শব্দের অর্থ যিনি ইজতিহাদ করেন। ইজতিহাদ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোনো বিষয়ে নিজস্ব শক্তি-সামর্থ্যকে ব্যয় করা।-কাশশাফু ইস্তিলাহাতিল ফুনুন : ১/১৯৭ পারিভাষিকভাবে বোঝায় যম্মী শার'ঈ বিষয়ে অর্থাৎ যে বিষয়ে সুস্পষ্ট সুদৃঢ় সুনিশ্চিত বিধান নেই সে বিষয়ে যখন কোনো ফকীহ নিজস্ব সামর্থ্য তথা জ্ঞানকে ব্যয় করে গবেষণা করেন, তাকে ইজতিহাদ বলে।-আল মাউসুওয়াতুল ফিকহিয়াহ আল কুওয়াইতিয়াহ : ১/৩১৬

[১৪৩] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'যখন কোনো বিচারক ইজতিহাদ করে বিচার করে, এতে যদি সে সঠিক ফয়সালা দেয়, তাহলে তার জন্য রয়েছে দুটি প্রতিদান। আর যখন সে ইজতিহাদ করে বিচার করে, কিন্তু এতে ভুল করে, তখন তার জন্য রয়েছে একটি প্রতিদান।' -সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৭৩৫২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ১৭১৬

মাজমু আল-ফাতাওয়ার তৃতীয় খণ্ডে ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (رحمہ اللہ) বলেছেন,

وَالْإِنْسَانُ مَتَى حَلَّلَ الْحَرَامَ - الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ - أَوْ حَرَّمَ الْحَلَالَ - الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ - أَوْ بَدَّلَ
الشَّرْعَ - الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ - كَانَ كَافِرًا مُرْتَدًّا بِاتِّفَاقِ الْمُفَقَّهَاءِ

‘যখন কোনো মানুষ হারামকে হালাল বানায় এবং এ বিষয়কে গ্রহণ করে নেয়; কিংবা যখন কেউ হালালকে হারাম বানায় এবং তাকে গ্রহণ করে নেয়, সে ফকীহগণের ঐকমত্যে কাফির মুরতাদ।’^[১৪৪]

মাজমু আল-ফাতাওয়ার পঁয়ত্রিশতম খণ্ডে তিনি আলিমদের কথাও এনেছেন।

وَمَتَى تَرَكَ الْعَالِمُ مَا عَلِمَهُ، مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، وَاتَّبَعَ حُكْمَ الْحَاكِمِ الْمُخَالَفِ لِحُكْمِ
اللَّهِ وَرَسُولِهِ.. كَانَ مُرْتَدًّا كَافِرًا! يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

‘যদি কোনো আলিম তার কুরআন ও সুন্নাহর ইলম বাদ দিয়ে এমন শাসকের অনুসরণ করে, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর আইনের বিরোধী, তাহলে সেই আলিম মুরতাদ কাফির। সে দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তি পাবার উপযুক্ত।’^[১৪৫]

আল বিদায়া ওয়ান নিহাযার তেরোতম খণ্ডে ইমাম ইবনু কাসির (رحمہ اللہ) বলেছেন,

مَنْ تَرَكَ الشَّرْعَ الْمَحْكَمَ الْمُنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَتَحَاكَمَ إِلَى غَيْرِهِ
مِنَ الشَّرَائِعِ الْمَنْسُوخَةِ؛ كَفَرَ. فَكَيْفَ يَمُنُ تَحَاكَمَ إِلَى الْيَاسِقِ وَقَدِمَهَا عَلَيْهِ؟ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ
كَفَرَ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ

‘যে ব্যক্তি খাতিমুল আন্বিয়া মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিলকৃত শরীয়াহ দ্বারা পরিচালিত বিচারকে পরিত্যাগ করে এবং এ ছাড়া অন্য কোনো রহিত শরীয়াহ দ্বারা বিচার চাইতে যায়, সে কাফির হয়ে যায়। তাহলে সেই ব্যক্তির বিধান কী হবে, যে ইয়াসিক^[১৪৬] দ্বারা বিচার চাইতে আদালতের দ্বারস্থ হয় এবং একে ইসলামী শরীয়াহর ওপর প্রাধান্য দেয়? যে এই কাজ করবে, মুসলিমদের ইজমা মোতাবেক সে কাফির।’^[১৪৭]

[১৪৪] শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ (رحمہ اللہ), মাজমু আল-ফাতাওয়া : ৩/২৬৭

[১৪৫] শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ (رحمہ اللہ), মাজমু আল-ফাতাওয়া : ৩৫/৩৭২-৭৩

[১৪৬] ইয়াসিক বা ইয়াসসা হচ্ছে চেঙ্গিস খান কর্তৃক জারিকৃত মঙ্গোল সাম্রাজ্যের আইননামা। এটি বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। যেমন : ইয়াসিক, ইয়াসসা, জাযাগ প্রভৃতি। এটি মূলত মৌখিক আইন সংকলন যার নির্দিষ্ট লিখিত কোনো সংকলন পাওয়া যায়নি। বুখারা শহরের চেঙ্গিস খান এই আইন জারি করেন এবং গোটা সাম্রাজ্যে এর বিস্তারের উদ্যোগ নেন। এই কাজে নিয়োগ করা হয় তার দ্বিতীয় পুত্র চাগাতাই খানকে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও কূটনৈতিক হ্যারল্ড ল্যান্স তার *Genghis Khan: The Emperor of All Men* গ্রন্থে এই আইন সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করেছেন।

[১৪৭] ইমাম ইবনু কাসির (رحمہ اللہ), আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১৩/১১৯

ইবনু কাসির (رحمہ اللہ) এখানে কুরআন-সুন্নাহর আইন ছেড়ে তাওরাত ও বাইবেলের আইন গ্রহণ করার কথা বলছিলেন। তিনি বলেছেন, মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর ওপর নাযিলকৃত শরীয়াহ বাদ দিয়ে কেউ যদি বাইবেল বা তাওরাতের আইন অনুসরণ করে, তাহলে সে কাফির। যদিও বিকৃত হবার আগে এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত আইন ছিল। মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর ওপর শরীয়াহ নাযিল হবার পর বাইবেল ও তাওরাতের আইন রহিত হয়ে গেছে। তাই এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়া সত্ত্বেও যে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর শরীয়াহ বাদ দিয়ে এগুলোর অনুসরণ করবে সে কাফির। তাহলে ওই লোকদের কী অবস্থা, যারা মানুষের বানানো অন্য আইন দিয়ে শাসিত হতে চায়? এরা কাফির, এবং এটা ইজমা। এটা হলো ইমাম ইবনু কাসিরের বক্তব্য।

বেশ কিছু দলিল নিয়ে আলোচনা করার পর আদ্বওয়াউল বায়ানে শাইখ আশ-শানকীতি (رحمہ اللہ) চমৎকার একটি কথা বলেছেন। এ কথাটি আমার খুবই পছন্দের। তিনি বলেছেন,

‘সুস্পষ্ট নুসুস দ্বারা প্রমাণিত সন্দেহাতীত সত্য হলো, যারা শয়তানের প্রণীত এবং মানুষের মুখে প্রকাশিত মানবরচিত আইনের অনুসরণ করে ওই আইনের বদলে, যার রচয়িতা হলেন আল্লাহ এবং যা প্রকাশিত হয়েছে তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর মুখে—তাদের কুফর এবং শিরকের ব্যাপারে কারও কোনো সন্দেহ নেই। এ ব্যাপারে শুধু ওই ব্যক্তি সন্দিহান হবে, যার দৃষ্টিশক্তি আল্লাহ ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং যাকে তিনি ওয়াহির উজ্জ্বল আলো থেকে বঞ্চিত করেছেন।’^[১৪৮]

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু ইব্রাহীম (رحمہ اللہ) সূরা নিসার এ আয়াত উল্লেখ করেছেন,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

‘অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে।’ [সূরা আন নিসা, ৪: ৬৫]

তারপর বলেছেন,

وقد نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عمن لم يُحَكِّمُوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيما شجر بينهم، نفياً مؤكداً بتكرار أداة النفي وبالقسم،

‘আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা সেসব লোকের ঈমান থাকাকেই অস্বীকার করেছেন, যারা নিজেদের বিরোধ-মীমাংসায় নবী (ﷺ)-কে বিচারক হিসেবে গ্রহণ

করে না। আল্লাহ (ﷻ) এই নেতিবাচকতার কথা বারবার উল্লেখ করে ও কসম খেয়ে দৃঢ়ভাবে তাদের ঈমান থাকাকে নাকচ করেছেন।^[১৪৯]

এ নিয়ে আরও অনেক কথা বলতে চেয়েছিলাম, তবে আপাতত মূল আলোচনার সারাংশ হিসেবে এটুকু চলবে।

উসুলুস সালাসাহর লেখকের উত্থাপিত প্রমাণ

উসুলুস সালাসাহর লেখক নিচের আয়াতটি উল্লেখ করেছেন,

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

‘আর নিশ্চয় মসজিদগুলো আল্লাহরই জন্য। কাজেই তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না।’ [সূরা আল জিন, ৭২: ১৮]

আমাদের আলোচনায় বেশ কয়েকবার এই আয়াতের কথা এসেছে। তাওহিদুল উলুহিয়াহর মূল নির্যাস এ আয়াতে উঠে এসেছে।

এ আয়াতে আল্লাহ (ﷻ) বলছেন,

وَأَنَّ

ওয়া আন্না।

এখানে ‘আন্না’ হলো তাওকিদ। অর্থাৎ আল্লাহ জোর দিয়ে বলছেন, মসজিদ হলো কেবল আল্লাহর জন্য। প্রশ্ন হলো, এখানে আল্লাহ কেন মসজিদের কথা বললেন? মসজিদ বলার মাধ্যমে এখানে দুই ধরনের ইবাদাতের কথা প্রকাশ পেয়েছে। আমরা বলেছিলাম ইবাদাত দুই ধরনের, সরাসরি আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়া—অর্থাৎ দু’আ আত-তালাব। আরেকটি হলো অন্য সব ধরনের ইবাদাত—দু’আ আল-ইবাদাত। যেমন: সালাত, ইলম শিক্ষা ইত্যাদি। এ দুই ধরনের ইবাদাতই আমরা মসজিদে করে থাকি। অর্থাৎ এ আয়াতে বলা হচ্ছে, মসজিদে কেবল আল্লাহর জন্যই ইবাদাত করবে এবং মসজিদের বাইরেও কেবল আল্লাহরই ইবাদাত করবে।

মহান আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

‘তোমাদের রব বলেছেন, আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের আহ্বানে সাড়া দেবো।’ [সূরা আল গাফির, ৪০: ৬০]

এখানে দু’আ বলতে দু’আ আত-তালাব বা দু’আ আল-মাসআলা (دعاء المسألة)

[১৪৯] রিসালাতু তাহকিমিল কাওয়ানিন।

বোঝানো হচ্ছে। অর্থাৎ কেউ দু'আ করছে, 'হে আল্লাহ, আমাকে অমুক জিনিস দিন'। তবে কিছু আলিম বলেছেন, এ আয়াতে দু'আ বলতে সব ধরনের ইবাদাতকে বোঝানো হয়েছে।

যদি এ আয়াতে দু'আ আত-তালাব উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এখানে বলা হচ্ছে, আমার কাছে চাও—তুমি যা চাও আমি তা দেবো। যদি এখানে দু'আ আল-ইবাদাহ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এ আয়াতে বলা হচ্ছে—আমার কাছে চাও, আমি পুরস্কার দেবো।

সূরা জিনের আয়াতে আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

‘আর নিশ্চয় মসজিদগুলো আল্লাহরই জন্য। কাজেই তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না।’ [সূরা আল জিন, ৭২: ১৮]

এখানে দুই ধরনের ইবাদাতের কথা এসেছে। অন্য ধর্মের লোকেরা তাদের উপাসনালয়ে শিরক করত। তাই আল্লাহ আমাদের বলছেন, ইবাদাতের স্থানে শিরক না করতে এবং এর বাইরেও শিরক না করতে। কোনো কোনো আলিম বলেছেন, এ আয়াতে মসজিদ অর্থ সমগ্র সৃষ্টিজগৎ। কারণ নবী (ﷺ)-এর হাদীসে এসেছে যে, তিনি বলেছেন,

وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ، وَإِنَّمَا رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ

‘সারা পৃথিবীর মাটিকে আমার জন্য মসজিদ (নামাযের জায়গা) এবং পবিত্রতার উপকরণ বানিয়ে দেয়া হয়েছে। সুতরাং আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তির নিকট (যেকোনো স্থানে) নামাযের সময় এসে উপস্থিত হবে, সে যেন সেখানেই নামায পড়ে নেয়।’^[১৫০]

তাহলে এ আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, পুরো পৃথিবী আল্লাহরই (পুরো পৃথিবী মসজিদ), তাই আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদাত করো না।

সাইদ ইবনু যুবাইর^[১৫১] (رضي الله عنه) বলেছেন,

وَأَنَّ الْمَسْجِدَ

‘ওয়া আন্না মাসাজিদ’ বলতে সুজুদের অঙ্গগুলোক বোঝানো হয়েছে। কপাল, দুই হাত, দুই হাঁটু এবং দুই পা। এই অঙ্গগুলো দিয়ে আমরা সিজদাহ করি। ওয়া আন্না

[১৫০] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৪২৯

[১৫১] প্রসিদ্ধ তাবেঈ সাইদ বিন জুবাইর (رضي الله عنه)-এর জন্ম ৪৬ হিজরিতে মৃত্যু ৯৫ হিজরিতে। তিনি আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (رضي الله عنه) ও আইশাহ (رضي الله عنها)-এর ছাত্র ছিলেন। যুগের শ্রেষ্ঠ মুফাসসির ছিলেন। আব্দুর রাহমান বিন আশ'আসের বিদ্রোহে সমর্থন দেয়ায় হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তাঁকে হত্যা করে।

মাসাজিদ বলতে এই অঙ্গগুলোকে বোঝানো হয়েছে। এগুলো কেবল আল্লাহর প্রতি সিজদাহ করার জন্য। তাই অন্য কারও প্রতি সিজদাহর জন্য এগুলো ব্যবহার কোরো না। এটি হলো এই আয়াতের ব্যাপারে তাবেঈ সাইদ বিন যুবাইরের ব্যাখ্যা।

যে ব্যাখ্যাই আমরা গ্রহণ করি না কেন, মূল বক্তব্য এক—ইবাদাতে আল্লাহর জন্য বিশুদ্ধ তাওহিদ প্রতিষ্ঠা করা।

উপসংহার

এই আলোচনার সাথে আমরা আজকের দারস শেষ করব। আল্লাহ (ﷻ) আমাদের উপকারী ইলম দান করুন, এই দারসগুলোতে আমরা যা শিখছি আল্লাহ তা উপকারী জ্ঞানে পরিণত করে দিন। যারা এই দারসগুলোতে উপস্থিত থাকেন, মনোযোগ দিয়ে দারস শোনেন, দু'আ করি আল্লাহ (ﷻ) যেন তাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দেন। বিশেষভাবে যারা অনলাইনে এ দারসগুলো শোনেন আমি তাঁদের জন্য দু'আ করছি। তাওহিদ শেখার ও বাস্তবায়নের জন্য যে সময় আপনার ব্যয় করছেন, আল্লাহ যেন বিচারের দিন তা আপনাদের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী আমল হিসেবে কবুল করুন।

আজ আমরা এখানে তাওহিদের জন্য, আল্লাহর জন্য একত্র হয়েছি। আমি জানি এমন অনেকে আছেন যাদের সাথে আমার হয়তো এ জীবনে কখনোই দেখা করার সুযোগ হবে না। কিন্তু তারা তাওহিদকে ভালোবাসেন। তাওহিদের ইলমকে ভালোবাসেন। তারা পৃথিবীর বিভিন্ন কোনা থেকে এ আলোচনা শুনছেন। আমি তাঁদেরকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি। পৃথিবীর এ অবস্থায়, উম্মাহর এ অবস্থার মাঝেও তারা ইলমের জন্য সময় ও শ্রম দিচ্ছেন। আমি দু'আ করি, তিনি যেন তাঁর আরশের নিচে বিচারের দিনে আমাদের স্থান দেন, একত্রীভূত করেন এবং আমাদের জান্নাতে সুউচ্চ প্রাসাদে একত্র করেন। এই দারসের মাধ্যমে আমাদের কোনো দুনিয়াবী লাভ নেই। তবে আমরা আল্লাহর সাথে ব্যবসা করে নিয়েছি—এবং এ হলো এমন ব্যবসা যা কখনো বিফল হবে না। মহান আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾ لِيُؤْفِقَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ

‘নিশ্চয় যারা আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন করে, সালাত কায়েম করে এবং আল্লাহ যে রিয়ক দিয়েছেন তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসার আশা করে যাতে কখনো লোকসান হবে না। যাতে তিনি তাদেরকে তাদের পূর্ণ প্রতিফল দান করেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরও বাড়িয়ে দেন। নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল, মহাগুণগ্রাহী।’ [সূরা আল ফাতির, ৩৫: ২৯-৩০]

আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করি, আমাদের যেন তাওহিদের শিক্ষার্থী নামে ডাকা হয় এবং আমাদের যেন একসাথে জান্নাতের দিকে ডাকা হয়।

মহান আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا
سَلِّمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ

‘আর যারা তাদের রবকে ভয় করেছে, তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে তারা যখন সেখানে এসে পৌঁছবে এবং এর দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে তখন জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, ‘তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা ভালো ছিলে। অতএব স্থায়ীভাবে থাকার জন্য এখানে প্রবেশ করো।’ [সূরা আয যুমার, ৩৯: ৭৩]

আমি দু'আ করি, আমরা যেন ওই মানুষদের অন্তর্ভুক্ত হই যাদের একত্রে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে তাওহিদের শিক্ষার্থী হিসেবে। যারা দুনিয়াতে তাওহিদ শেখার ও বাস্তবায়নের জন্য একত্র হয়েছিল এবং গুরাবা হয়ে অবস্থান করেছিল।^[১৫২]

[১৫২] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء

‘ইসলাম অপরিচিত অবস্থায় শুরু হয়েছিল, অচিরেই আবার অপরিচিত অবস্থায় ফিরে যাবে। কাজেই গুরাবা (অপরিচিতদের) জন্য রয়েছে সুসংবাদ।’-সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২০৮। অপর এক বর্ণনায় আছে, যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো গুরাবা কারা, তিনি উত্তরে বললেন, إِذَا الَّذِينَ يُضْلِحُونَ إِذَا, ‘লোকেরা নষ্ট হয়ে যাবার পর যারা তাদেরকে সংশোধন করবে।’-ইমাম আবু আমর আদ-দানী (رحمته الله), আস সুনানুল ওয়ারিদাহ ফিল ফিতান : ১/২৫; আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (رحمته الله)-এর মতে সনদ সহীহ।-আস সিলসিলাতুস সহীহাহ : ৩/২৬৭

আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় ‘আল ওয়ালা ওয়াল বারা’। এটি উসুলুস সালাসাহর দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখিত তিনটি বিষয়ের মধ্যে তৃতীয় বিষয়।

‘আল ওয়ালা ওয়াল বারা’ এর কাছাকাছি বাংলা অনুবাদ দাঁড়ায় ‘মৈত্রী ও সম্পর্কচ্ছেদ’। তবে আমরা আরবী ‘ওয়ালা’ এবং ‘বারা’ শব্দ দুটোই ব্যবহার করব। ‘ওয়ালা’ হলো বন্ধুত্ব বা মৈত্রী আর ‘বারা’ হলো শত্রুতা বা সম্পর্কচ্ছেদ।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর প্রতি আনুগত্য এবং তাঁদের আনুগত্য করা মুসলিমদের প্রতি মৈত্রী হলো ওয়ালা।

আর যারা আল্লাহর শত্রু, যারা নিজ কথা, কাজ বা পরিকল্পনার মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীনের বিরোধিতা করে, যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল (ﷺ) এবং মুসলিমদের বিরোধিতা করে—তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ, তাদের প্রতি বিদ্বেষ, শত্রুতা ও ঘৃণা হলো বারা। এই হলো ‘আল ওয়ালা ওয়াল বারা’। খুব সহজ কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কনসেপ্ট।

আল ওয়ালা ওয়াল বারা নিয়ে অনেক বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব। ছোটবেলা থেকে আমার অভ্যাস হল, আমার পড়া সব বইগুলোর বিষয়ভিত্তিক তালিকা করা। আমি এখনো এটা করি। লিস্টগুলো এখনো আমার কাছে আছে। কিছুদিন আগে আমি লিস্টগুলো চেক করছিলাম। দেখলাম আমার তালিকায় এমন ৪৫টি বই কিংবা পুস্তিকার নাম আছে, যেখানে আল ওয়ালা ওয়াল বারা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিছু বই পুরোপুরিভাবে আল ওয়ালা ওয়াল বারা নিয়ে। আর কিছু বইয়ের অংশবিশেষে কিংবা নির্দিষ্ট কোনো অধ্যায়ে এ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিষয়টি বুনিয়াদি এবং গুরুত্বপূর্ণ হবার কারণেই যুগে যুগে অনেক উলামা এ নিয়ে আলোচনা করেছেন। চাইলে আল ওয়ালা ওয়াল বারা নিয়েই একটা লেকচার সিরিয় করা সম্ভব। এ আলোচনা অনেক বিস্তারিত এবং এর অনেক শাখাপ্রশাখা আছে। ‘লা ইলাহা

ইল্লাল্লাহ’-এর তাৎপর্যের যে দিকগুলো আজ উম্মাহর জন্য জানা অত্যন্ত জরুরি, তার মধ্যে আল ওয়ালা ওয়াল বারা অন্যতম।

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্‌হাব (رحمته الله) -এর নাতি এবং তাঁর বরকতময় দাওয়াহ ও মানহাজের সুযোগ্য উত্তরসূরি, শাইখ সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্‌হাব (رحمته الله) আল ওয়ালা ওয়াল বারার ওপর একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা লিখেছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ এ পুস্তিকাটির নাম আওসাক ‘আরাল ইমান’ (أوثق عرى الإيمان)।^[১৫৩]

ইন শা আল্লাহ আমাদের আলোচনাতে আমরা আল ওয়ালা ওয়াল বারার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো আনব। আর আল্লাহ চাইলে পরে কখনো আমরা এ বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

তৃতীয় বিষয় : আল ওয়ালা ওয়াল বারা

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্‌হাব (رحمته الله) বলেন,

(الثَّالِثَةُ) أَنَّ مَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ وَوَحَّدَ اللَّهَ لَا يَجُوزُ لَهُ مَوَالَاةٌ مِنْ حَادِّهِ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبٍ،

(তৃতীয় বিষয়) যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য করে এবং ইবাদাতের জন্য এক আল্লাহকেই বেছে নিয়েছে, তাঁর পক্ষে এমন লোকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব (মুওয়ালাহ) করা মোটেই বৈধ নয়, যারা আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারী। যদিও তারা তাঁর সবচেয়ে আপনজন হয়।

আল ওয়ালা ওয়াল বারার দলিল

ওপরের বাক্য দুটো বলার পর দলিল হিসেবে তিনি নিচের আয়াত উল্লেখ করেছেন,

لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ

‘আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোনো সম্প্রদায় তুমি পাবে না, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতাকারীদেরকে ভালোবাসে (তাদের সাথে মুওয়ালাহ করে); যদিও তারা তাদের পিতা, অথবা পুত্র, অথবা ভাই, অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়...’ [সূরা আল-মুজাদালাহ, ৫৮: ২২]

[১৫৩] পুস্তিকাটি দারুল কাসিম থেকে আরও দুটি পুস্তিকার সাথে ২০০২ সালে প্রকাশিত হয়, যাদের সমন্বিত পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৯।

আল্লাহ (ﷻ) এখানে নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে বলছেন, যারা আল্লাহর ওপর ঈমান রাখে, আখিরাতে বিশ্বাস করে, তাঁরা কখনোই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর বিরোধিতাকারীদের সাথে মৈত্রী করবে না, বন্ধুত্ব রাখবে না। এসব লোকেরা তাঁদের যত আপনজনই হোক না কেন। যাদের মুওয়ালাহ (মৈত্রী) আল্লাহর সাথে, তাঁদের ব্যাপারে আল্লাহ (ﷻ) জানিয়ে দিয়েছেন,

أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ

‘এরাই তারা, যাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে অদৃশ্য শক্তি দ্বারা তাদের শক্তিশালী করেছেন।’ [সূরা আল-মুজাদালাহ, ৫৮: ২২]

সূরা মুমতাহিনাতেও আল ওয়ালা ওয়াল বারার দলিল পাবেন। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ

‘হে ঈমানদারগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করো না; অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তা তারা অস্বীকার করেছে।’ [সূরা মুমতাহিনা, ৬০: ১]

সূরা তাওবাহতে আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

‘তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর সে ব্যবসা যার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা তোমরা করছ এবং সে বাসস্থান যা তোমরা পছন্দ করছ, যদি তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা অপেক্ষা করো আল্লাহর (আযাব) আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।’ [সূরা তাওবাহ, ৯: ২৪]

দুনিয়াতে মানুষের সবচেয়ে প্রিয় হলো তাঁর পরিবার, বংশ, সম্পদ। আল্লাহ বলছেন, পার্থিব এসব কিছু যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর চেয়ে আমাদের কাছে বেশি প্রিয় হয়, তাহলে আমরা যেন অপেক্ষা করি বিপর্যয়, যন্ত্রণা, অপমান, লাঞ্ছনা, ম্যাসাকার আর জেনোসাইডের জন্য।

এগুলো কখন আসবে? যখন আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর চেয়ে অন্য কোনো কিছুকে বেশি ভালোবাসব। আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বিরোধিতাকারীদের তো ভালোবাসা যাবেই না, নিজের পরিবার কিংবা সম্পদকেও আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর চেয়ে বেশি ভালোবাসা যাবে না। আমরা যখন কাউকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর চেয়ে বেশি ভালোবাসব—সেটা হতে পারে আল্লাহর শত্রু, অথবা আমাদের পরিবার, সম্পদ, কিংবা সুবিধাবাদী লাইফস্টাইল—তখন আমাদের ওপর এ বিপর্যয়গুলো আসবে। কোনো কিছুকে আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর চেয়ে বেশি ভালোবাসা যাবে না। ওয়ালার কেন্দ্র হলো ভালোবাসা।

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوءًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
مِن قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ

‘হে মুমিনগণ, আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা মনে করে, তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফিরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।’

[সূরা আল মায়িদাহ, ৫: ৫৭]

কীভাবে এমন কারও সাথে মৈত্রী সম্ভব, যে দীন ইসলাম নিয়ে তাচ্ছিল্য করে? ঠাট্টা-মশকরা করে? অথচ একজন মুমিনের কাছে সবচেয়ে প্রিয় বিষয় তাঁর দীন। না, এমন কাউকে কখনোই বন্ধু বা মিত্র হিসেবে গ্রহণ করা সম্ভব না।

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ
الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تَخْفَىٰ صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ

‘হে ঈমানদারগণ, তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোনো ক্রটি করে না—তোমরা কষ্টে থাকো, তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতাপ্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে বেরোয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরও অনেকগুণ বেশি জঘন্য। তোমাদের জন্যে নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করে দেয়া হলো, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও।’ [সূরা আলে ইমরান, ৩: ১১৮]

এ আয়াতে বিত্বনাহ (بطانة) শব্দটি এসেছে। শব্দটির অর্থ কী? উপদেষ্টা, রক্ষাকর্তা, পরামর্শদাতা। আল্লাহ (ﷻ) আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন, কোনো কাফিরকে পরামর্শদাতা, রক্ষাকারী, উপদেষ্টা হিসেবে গ্রহণ না করতে। আল্লাহ কেন আমাদের মানা করলেন? উত্তর এ আয়াতেই আছে।

لَا يَأْلُوَكُمْ خِبَالًا وُدُّوْا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ

‘তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোনো ঠ্রটি করে না—তোমরা কষ্টে থাকো, তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতাপ্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে বেরোয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরও অনেকগুণ বেশি জঘন্য।’

আমরা যদি এমনটা করি তবে কাফিররা নিশ্চিতভাবেই আমাদের বিশ্বাসকে কলুষিত করে ফেলবে। এগুলো কুরআনের স্পষ্ট আয়াত, যেখানে আল ওয়ালা ওয়াল বারার শিক্ষা উঠে এসেছে। কুরআন, সুন্নাহ এবং সাহাবী (رضي الله عنه)-দের বক্তব্যে আরও অনেক দলিল পাওয়া যায়। ইমাম হামাদ ইবনু আতিক^[১৫৪] (رحمته الله) তাঁর গ্রন্থ সাবিলুন নাজাহ ওয়াল ফিকাকে বলেছেন,

ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم - أى الولاء والبراء - بعد وجوب التوحيد و تحريم ضده

‘আল্লাহর একত্ব এবং তার বিপরীত বিষয়কে (অর্থাৎ শিরক) নিষিদ্ধকরণের হুকুমের পর, দ্বীনের মধ্যে আর এমন কোনো বিধান নেই যেটার ব্যাপারে আল ওয়ালা ওয়াল বারার মতো ব্যাপক, স্পষ্ট ও চূড়ান্ত প্রমাণ আল্লাহর কিতাবে রয়েছে।’

আল ওয়ালা ওয়াল বারার গুরুত্ব

আল ওয়ালা ওয়াল বারার কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? কেন আল ওয়ালা ওয়াল বারার তাওহিদের কালেমা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর প্রধান এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ? আমাদের কীভাবে এ বিষয়টি সহজভাবে বোঝা উচিত?

আসলে আল ওয়ালা ওয়াল বারার গুরুত্ব বোঝানোর জন্যে কুরআনের আয়াত বা হাদীসের প্রয়োজন পড়ে না। ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ এই কালেমাই আল ওয়ালা ওয়াল বারার দলিল হিসেবে যথেষ্ট। এই কালেমা থেকেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মক্কার কুরাইশ মুশরিকরা সুস্পষ্টভাবে বুঝে ফেলেছিল আল ওয়ালা ওয়াল বারার কী জিনিস! তাদের আর কোনো কিছুর দরকার হয়নি। ইসলামের প্রথম যুগে আল ওয়ালা ওয়াল বারার অর্থ সবার কাছে এতটাই স্পষ্ট ছিল যে, তাঁরা ঘুণাঙ্করেও ভাবেননি এটার জন্য পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখতে হবে, ব্যাখ্যা করতে হবে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলতে হবে আর বিভিন্ন যুক্তি খণ্ডন করতে হবে।

[১৫৪] আল্লামা মুহাক্কিক শাইখ হামাদ বিন আতিক (رحمته الله)-এর জন্ম ১৮১২/১৩ সালে দ্বিতীয় আলে সাউদ ইমারতে (বর্তমানে তৃতীয় ইমারত চলমান)। মৃত্যু ১৮৮৩/৮৪ সালে। তাঁর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রচনা রয়েছে। তিনি নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী (رحمته الله)-এর সমসাময়িক ছিলেন, এবং উভয়ের মাঝে পত্রবিনিময় হতো। এগুলো তাঁর গ্রন্থ المراسلات এ সংকলিত হয়েছে।

তারপর এল দার্শনিকের দল। তারা তাদের সীমিত বোধবুদ্ধি, খাপছাড়া চিন্তাভাবনা আর নফসকে কুরআন-হাদীসের ওপর প্রাধান্য দিতে শুরু করল। শুরু করল তাদের বিভ্রান্তিগুলোর প্রচার। ফলে দ্বীনের অনেক মৌলিক বিষয়েও বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং আলোচনা উপস্থাপন করার প্রয়োজন দেখা দিলো। সাহাবায়ে কেলাম (رضي الله عنه), সালাফুস সালাহীন, উম্মাহর আলিমগণ ঠিক কী বুঝিয়েছিলেন, দরকার পড়ল তা ভেঙে ভেঙে বোঝানোর।

খুব সহজে আল ওয়ালা ওয়াল বারার কনসেপ্টটা বোঝাই।

রাগবি নিয়ে আমার তেমন কোনো ধারণা নেই। একসময় এ খেলা শেখার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পারিনি। যদিও আমি অ্যামেরিকাতেই বড় হয়েছি কিন্তু এই খেলার নিয়মকানুনগুলো আমি আজও ঠিকঠাক ধরতে পারি না। অথচ আমার এক ভাতিজা আছে পেশাদার রাগবি খেলোয়াড়। সুবহান আল্লাহ, কোনো এক কারণে আল্লাহ আমার চিন্তাকে এই খেলার নিয়ম বোঝা থেকে বিরত রেখেছেন। তবে রাগবির নিয়মকানুন না জানলেও খেলাধুলার ব্যাপারে একটা বিষয় আমি বেশ ভালোমতো বুঝি।

আপনি কোনো দলের সদস্য হয়ে প্রতিপক্ষ দলকে সমর্থন করতে পারেন না। মেক্সিকোর মতো জায়গায় এ ধরনের কাজের জন্য সাধারণত ধোলাইয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

কেন? কারণ এটাই ফিতরাত। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি।

আপনি একটি টিমের খেলোয়াড় হয়ে কীভাবে অন্য টিমকে সমর্থন করবেন? আপনি যখন কোনো দলে যোগ দিচ্ছেন তখন সেই দলের অংশ হয়ে যাচ্ছেন। আপনার ওপর সেই টিমের হুক হলো আপনি তাদের প্রতি অনুগত থাকবেন, সমর্থন জোগাবেন এবং আপনার দায়িত্ব-কর্তব্যগুলো পালন করবেন। আপনি কখনোই সেই টিমের প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো টিমকে সমর্থন করবেন না। এটা একদম কমনসেন্সের ব্যাপার। প্রতিদ্বন্দ্বী দলের ম্যানেজার বা ক্যাপ্টেনকে আপনি প্রশংসার বন্যায় ভাসাবেন না, তাদের প্রতি অনুগতও থাকবেন না, তাদেরকে কখনো নিজেদের দলের দুর্বলতার কথা বলবেন না। ঠাট্টাচ্ছলেও না। আপনি মনে মনেও চাইবেন না যে, প্রতিদ্বন্দ্বী দল জিতুক। যদি আপনি মনে মনেও এমন চান, তাহলে আপনি নিজের দলের সাথে প্রতারণা করলেন। বিশ্বাসঘাতকতা করলেন।

আচ্ছা এবার আরেকটা দিক দেখুন।

খেলার মধ্যে অনেক ভুল হয়ে থাকে—ভুল পাস, ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় না থাকা, গোল মিস করা ইত্যাদি। এসব নিয়ে খেলোয়াড়দের নিজেদের মধ্যে রাগারাগি হয়, কথা কাটাকাটি হয়। কখনো কখনো সেটা উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় থেকে ধাক্কাধাক্কি, এমনকি হাতাহাতিতেও গড়ায়। খেলার মাঠে এমন অনেক ঘটনা ঘটে। কিন্তু এমন

পরিস্থিতিতে কেউ কি বিপক্ষ দলের ম্যানেজার বা ক্যাপ্টেনের কাছে গিয়ে নিজের টিমমেটের বিরুদ্ধে নালিশ করে, ‘দেখুন না, ওরা আমাকে পাস দেয় না। ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় থাকে না, গোল মিস করে...’!

কেউ কি প্রতিদ্বন্দ্বী দলের ম্যানেজার কিংবা খেলোয়াড়দের অনুরোধ করবে, ‘আমি আমার টিমমেটদের উচিত শিক্ষা দিতে চাই। আপনারা কি আমাকে সাহায্য করবেন?’ আপনি কি বলবেন, ‘আমার টিমমেটদের বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করতে চাই। আমাকে সাহায্য করুন। ওদেরকে মারুন। ম্যাসাকার করুন। জেনোসাইড চালান’?

রাস্তার বখাটে ছেলে কিংবা গুন্ডাদের গ্যাং-এর কথা ধরুন। এই গ্যাংগুলো দাঁড়িয়ে আছে নিজ দলের প্রতি ‘ওয়ালা’ এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতি ‘বারা’, এই মূলনীতির ওপর। বিশ্বের প্রত্যেকটি জাতি দাঁড়িয়ে আছে আল ওয়ালা ওয়াল বারার ওপর।

প্রত্যেকটি দেশে সবচেয়ে ঘৃণ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয় রাষ্ট্রের সাথে, দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করাকে। বিশ্বাসঘাতক, গাদ্দাররা রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্যে সবচেয়ে বড় হুমকি। দেশদ্রোহিতাকে এত বড় অপরাধ হিসেবে দেখার কারণ কী? দেশের ভিত্তিতে ওয়ালা আর বারা। দেশের ভিত্তিতে মৈত্রী ও শত্রুতার নীতি।

তাহলে চিন্তা করুন। সামান্য একটা ফুটবল কিংবা রাগবি টিমের জন্যে যদি ওয়ালা এবং বারা এতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়, যদি একটি দেশের সার্বিক নিরাপত্তা, উন্নয়ন আর সফলতা নির্ভর করে ওয়ালা এবং বারার ওপর, তাহলে সমগ্র মানবজাতির জীবনবিধান, দ্বীন ইসলামের জন্যে আল ওয়ালা ওয়াল বারা কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

তাহলে আজ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর ভিত্তিতে আল ওয়ালা ওয়ালা বারা নির্ধারণে কেন মুসলিমদের এত কষ্ট হয়?

আল ওয়ালা ওয়াল বারা মানুষের ফিতরাত। বোধবুদ্ধিসম্পন্ন প্রতিটি মানুষ সহজাতভাবে এর গুরুত্ব বোঝে। আল ওয়ালা ওয়াল বারার দলিল হিসেবে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ এই কালেমা যথেষ্ট। এ কালেমা থেকেই এর গুরুত্ব সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়। তবু আল্লাহ (ﷻ) কুরআনে এর সমর্থনে বহু আয়াত নাযিল করেছেন। উম্মাহকে আল ওয়ালা ওয়াল বারার গুরুত্ব বোঝানোর জন্যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

কিন্তু বর্তমানে মুনাফিকের দল চায় আপনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর দলে যোগ দেবেন, কিন্তু সর্বাত্মকভাবে সমর্থন করবেন ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর দল’ ছাড়া অন্য সবকিছুকে।

আল ওয়ালা ওয়াল বারাতে ক্রটির বিপদ

আল ওয়ালা ওয়াল বারা হলো মুসলিমের আত্মপরিচয়। আল ওয়ালা আল বারার উপলব্ধি ছাড়া মুসলিম কখনো নিজের পরিচয় খুঁজে পাবে না। তাই মুসলিমদের অবশ্যই ওয়ালা এবং বারা ব্যাপারটি অন্তরে গেঁথে নিতে হবে—বিশেষ করে কাফিরদের দেশে বসবাস করা মুসলিমদের। ওয়ালা এবং বারা এর যথাযথ অনুধাবনে ব্যর্থতা মুসলিমদের জন্যে সংকেত দেয় এক ভয়ংকর ভবিষ্যতের। যে শিশু আজ মুসলিমদের ঘরে ভূমিষ্ঠ হচ্ছে, আল ওয়ালা ওয়াল বারা না থাকলে, তাদের ছেলেমেয়ে বা নাতি-নাতনিদের প্রজন্ম বড় হবে কাফির-মুশরিক হয়ে। নিশ্চিত থাকুন।

জি, আপনি ভুল পড়েননি। মনযোগ দিয়ে শুনুন, ওয়ালা এবং বারা সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা না থাকলে বর্তমান মুসলিম প্রজন্ম (বিশেষ করে কাফির-মুশরিকদের ভূমিতে বসবাসরত মুসলিমরা) এমন এক প্রজন্মের জন্ম দেবে যাদের ছেলেমেয়ে বা নাতি-নাতনি হবে কাফির বা মুশরিক। আমার কথা আপনাদের কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকতে পারে; কিন্তু এটাই বাস্তবতা। আমি কিছু উদাহরণ দিচ্ছি।

১৯২০ সালে জর্ডান থেকে মার্কিন মুলুকে হাজির হলো দুই ভাই। কিছুদিন পর একভাই ফিরে গেল জর্ডানে। অন্যভাই থেকে গেল অ্যামেরিকাতে। এই ব্যক্তির বংশধররা এখনো এই দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। খুব সম্ভবত তারা চতুর্থ বা পঞ্চম প্রজন্ম। যে ভাই জর্ডানে ফিরে গিয়েছিলেন তাঁর বংশধররা এখনো মুসলিম। তারা আন্তরিকতাবে নিজেদের ইসলাম আর মুসলিম পরিচয় নিয়ে গর্ব করে। পরিচয় জিজ্ঞেস করা হলে বলে, ‘আমরা মুসলিম’। হ্যাঁ, তারা নিখুঁত না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ গোমরাহ হয়েছে। কেউ কেউ গুনাহগার। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ, তাঁরা মোটের ওপর মুসলিম। তাঁদের অন্তরগুলোতে তাওহিদ এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ উপস্থিত। ইন শা আল্লাহ যেসব ভুলভ্রান্তি আছে একদিন তাঁরা সেগুলো ছেড়ে পরিপূর্ণভাবে সত্যের ওপর ফিরে আসবে।

আর যে ভাই অ্যামেরিকা থেকে গিয়েছিল?

বোধহয় তার ছেলেমেয়েরাও এখন আর কেউ বেঁচে নেই। এখন খুব সম্ভবত তার পরিবারের চতুর্থ বা পঞ্চম প্রজন্ম চলছে। তাদের বংশ এখন বেশ বড়। সবাই এক শহরে বেড়ে উঠেছিল। তারা সংখ্যায় এত বেশি ছিল, একসময় তাদের পারিবারিক নামে সেই শহরের নামকরণ হয়েছিল। জানলে খুব অবাক হবেন, অ্যামেরিকায় থেকে যাওয়া সেই ভাইয়ের বংশধরদের কেউ এখন আর নিজেকে মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেয় না। তারা সালাত আদায় করে না, তাই মুসলিম না—আমি এমন কিছু বলছি না। তারা নিজেদের মুসলিম হিসেবেই পরিচয় দেয় না। ধর্ম জিজ্ঞাসা করলে তারা বলে আমরা

খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু বা নাস্তিক। তাদের অনেকে এখন নাস্তিক। এটা আমার নিজের চোখে দেখা ঘটনা। সেই পরিবারের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। আল্লাহর কাছে দু'আ করি আল্লাহ (ﷻ) যেন তাদের পুনরায় ইসলামে ফিরিয়ে নেন।

কীভাবে তারা দ্বীন ইসলাম থেকে কুফরে চলে গেল?

আমরা আগে অনেক আলোচনায় বহুবার বলেছি, ইসলাম কখনোই কাফির-মুশরিকদের জোর করে কালেমা পড়ানোর অনুমতি দেয় না। এটা দ্বীন ইসলামে সম্ভব না।

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

‘ধর্মের ব্যাপারে কোনো জোরজবরদস্তি নেই।’ [সূরা আল বাক্বারাহ, ২: ২৫৬]

এমনকি শরীয়াহর বিধান হলো, যে ভূখণ্ড ইসলামী শরীয়াহ দিয়ে শাসিত হবে, সেখানেও কাফিরদের জোর করে মুসলিম বানানো হবে না। খিলাফাহর অধীনে কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হবে না। বরং কাফিররা ভুলের ওপর অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও ইসলামী শরীয়াহ দ্বারা শাসিত ভূখণ্ডে তাদের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দেয়া হবে। আল্লাহর কসম! কাফিররা মুসলিম শাসিত ভূমিতে যে অধিকার ভোগ করেছে, মুসলিমরা কাফির শাসিত ভূমিতে তার কানাকড়িও পায় না। এমনকি মুসলিমদের ভূমিতে, আদর্শ খিলাফাহর ভূমিতে অমুসলিমরা যে অধিকার অতীতে ভোগ করেছে তাদের নিজেদের ধর্মের লোকদের দ্বারা শাসিত ভূমিতেও তারা সেটা পায়নি।

তবে একই সাথে এটাও মনে রাখা দরকার, আমরা তাদের মিথ্যা বিশ্বাসের স্বীকৃতি দিই না। তাদের সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণের মানে এই না, আমরা তাদের ভ্রান্ত, বানোয়াট, মিথ্যা ধর্মকে স্বীকৃতি দেবো।

মুসলিমরা আহলুয যিম্মাকে নিরাপত্তা দেবো। ওইসব কাফিরদের নিরাপত্তা দেয়া হবে, যারা ইসলামী শরীয়াহ দ্বারা শাসিত ভূখণ্ডে অনুগত নাগরিক হিসেবে অবস্থান করবে। তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা মুসলিমদের দায়িত্ব। একই সাথে এটাও মাথায় রাখতে হবে, তাদের ধর্ম ভ্রান্ত ও মিথ্যা। তাই ইসলামী শরীয়াহ দ্বারা শাসিত ভূখণ্ডে মুসলিম শিশুদের অন্তরে গেঁথে দিতে হবে, ইসলাম ছাড়া অন্য সব ধর্ম, সব দ্বীন, সব জীবনবিধান মিথ্যা। যদি কেউ অন্য ধর্মে বিশ্বাস করে, অনুসরণ করে, তারপর তার ওপর মারা যায়, তাহলে তার শেষ পরিণতি জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুন!

কিন্তু আজকাল মুসলিমদের শেখানো হচ্ছে ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মগুলোর মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। তাওহিদ এবং শিরকের পার্থক্যকে এসব কথা বলা লোকেরা খুব ছোট করে দেখায়। ‘আরে দিনশেষে আমরা সবাই জান্নাতে যাব। তোমার

ধর্ম এবং আমার ধর্ম আলাদা হতে পারে, কিন্তু আমাদের সৃষ্টিকর্তা তো এক। পথগুলো আলাদা, কিন্তু গন্তব্য এক। দেখো, আমরা একদিন সবাই জান্নাতে যাব। তাই এত চিন্তার কিছু নেই!’

এদের মধ্যে অনেকে তো এও বলে, ‘খ্রিস্টানরা বলে ঈসা আল্লাহর পুত্র আর আমরা বলি তিনি আল্লাহর রাসূল; কিন্তু আরেকটু গভীরে গেলে দেখবেন দুটার অর্থ একই। আসলে শাব্দিক; ভাষাগত ভিন্নতার কারণে একই জিনিসকে একটু অন্যভাবে বলা আরকি। শেকড়ে ফিরে গেলে আমরা তো সবাই ইব্রাহীমের অনুসারী।’

তারা দাবি করে, কুরআনে নাকি বলা আছে সবাই জান্নাতে যাবে। তারা কুরআনের নামে মিথ্যাচার করে। কখনো সরাসরি আবার কখনো ঘুরিয়ে-প্যাঁচিয়ে বলে, ‘যারা মানুষকে জাহান্নামের ভয় দেখায়, অথবা বলে কেউ জাহান্নামে যাবে—তারা চরমপন্থী, মৌলবাদী।’

ওয়ালা ও বারা-বিহীন এই যুগে অনেকের কাছে জাহান্নাম এক জনশূন্য জায়গায় পরিণত হয়েছে। যেন কেউই জাহান্নামের অধিবাসী হবে না। আল্লাহ (ﷻ) বোধহয় এমনি এমনিই কোনো কারণ ছাড়াই জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন। তাদের কথার মূল উপসংহার এটাই। নাউযুবিল্লাহ। আল্লাহর কাছেই এসব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি, এরা যা বলে আল্লাহ তা থেকে সুউচ্চ, পবিত্র।

এ ধরনের বিকৃত চিন্তাভাবনা আর শিক্ষার শেষ পরিণতি কী হয়?

ওয়ালা এবং বারার শিক্ষাবিহীন মুসলিমদের প্রথম প্রজন্ম ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর অন্তত কিছু অংশ নিজেদের মধ্যে ধারণ করতে পারে। দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রজন্ম কালেমার ঘ্রাণ পায়। আর চতুর্থ, পঞ্চম এবং তার পরের প্রজন্মগুলো হয় নাস্তিক, ইহুদী, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু, মুক্তমনা ইত্যাদি। ওয়ালা এবং বারা-বিহীন মুসলিমদের শেষ পরিণতি এমন করুণই হয়। ওয়ালা এবং বারাকে কখনো ভুলে যাবেন না, ছেড়ে দেবেন না। এটিই আপনার পরিচয়, এটিই আপনার অনন্যতা। এটিই আপনার ব্যক্তিত্ব।

পনেরো বছর আগে একটা সেমিনারে গিয়েছিলাম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একদম প্রথম দিককার মুসলিম এবং মসজিদ নিয়ে খুব চমৎকার আলোচনা করছিলেন নামকরা এক বক্তা। প্রজেক্টর দিয়ে অতীতের মসজিদগুলোর ছবি দেখাচ্ছিলেন। অন্য মহাদেশ থেকে দাস হিসেবে যেসব মুসলিমরা অ্যামেরিকাতে এসেছিলেন এবং এখানে আসার পর যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাদের নিয়ে চমৎকার আলোচনা। অনেক তথ্য-উপাত্ত দিয়ে দিয়ে তিনি প্রমাণ করে দিলেন, অ্যামেরিকাতে মুসলিমদের পা পড়েছিল অনেক আগেই। ১৮০০ সালের আশেপাশের সময়ে তৈরি হওয়া পুরোনো মসজিদগুলোর ছবি দেখে সেমিনারের সবাই বেশ খুশি হয়েছিল।

লেকচার শেষে আমরা বসে খাওয়া-দাওয়া করছিলাম। কথাচ্ছলে আমি সেই খ্যাতিমান বক্তাকে প্রশ্ন করলাম,

‘আচ্ছা, ভালো কথা... পুরোনো মসজিদগুলো না হয় সময়ের সাথে সাথে হারিয়ে গেছে, কিন্তু সেই মসজিদগুলোর মুসল্লিরা কোথায়? অষ্টাদশ বা ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই মুসলিমদের সবাই নিশ্চয় নিঃসন্তান ছিল না? তাঁদের নিশ্চয় সন্তানসন্ততি, বংশধর ছিল। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে আপনি যেসব মুসলিমদের নিয়ে আলোচনা করলেন, তাঁদের বংশধররা আজ কোথায়? তাঁরা কোথায় হারিয়ে গেল?’

আলোচনাতে সেই সময়কার মুসলিমদের যে সংখ্যা তিনি বলেছিলেন, সেটা অনুযায়ী বর্তমানে আফ্রিকান বংশোদ্ভূত অ্যামেরিকানদের অধিকাংশের মুসলিম হবার কথা। অন্যান্য অভিবাসীদের অনেকেরও মুসলিম হবার কথা। সেই হিসেবে এখন অ্যামেরিকাতে মুসলিম থাকার কথা ছিল আরও অনেক বেশি। এটা তো একেবারেই অসম্ভব যে, সেই সময়ের সব মুসলিম নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁদের কোনো ছেলেমেয়ে ছিল না। তাহলে তারা কোথায়?

তিনি বললেন, ‘খুবই ভালো প্রশ্ন। আসলে আমার এ বিষয়ে তেমন কোনো ধারণা নেই। এটা নিয়ে কাজ করা দরকার। এ বিষয়ে গবেষণা করা যেতে পারে।’

আমি বললাম, ‘আমি বরং আপনার কাজ কিছুটা সহজ করে দিই। আপনার কি মনে হয় না যে, এই লম্বা সময়ে তারা ইসলামকে ভুলে গিয়েছে। তাদের মুসলিম পরিচয় হারিয়ে ফেলেছে?’

এই মুসলিমদের অন্তরে ওয়ালা এবং বারা ছিল না। অজ্ঞতার কারণে তারা এর ওপর আমল করতে পারেনি। ফলাফল আপনাদের চোখের সামনে। এবার একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করুন। ওয়ালা এবং বারার ব্যাপারে আজ মুসলিমরা একদম অজ্ঞ। শুধু আল ওয়ালা ওয়াল বারা না, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর শিক্ষার বিরুদ্ধেও আজ সর্বাঙ্গিকভাবে যুদ্ধ চলছে। এ রকম এক অদ্ভুত, প্রতিকূল সময়ে বেড়ে ওঠা প্রজন্মের ভবিষ্যৎ কী? আপনাদের বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ কী?

পুরো পৃথিবীজুড়ে মুসলিমরা আজ নির্যাতনের শিকার। কাফির-মুশরিকদের বোমার আঘাতে অসহায় মুসলিম নারী, পুরুষ আর শিশুরা রক্তাক্ত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। কিন্তু কাফির-মুশরিকদের বোমার আঘাতের চাইতেও বেশি যন্ত্রণা দেয় আমাদের নিজেদের লোকের (যারা নিজেদের মুসলিম দাবি করে, দ্বীনের দাঈ আর শাইখ হিসেবে উপস্থাপন করে) গাদ্দারি। তাদের ক্ষতি বোমার আঘাতের চেয়েও ভয়ংকর। আরও বেশি ধ্বংসাত্মক।

ইসলামের শত্রুরা চিরকাল ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াই করে এসেছে। ওয়ালা এবং বারা নিয়ে তাদের আপত্তি নতুন কিছু না। এতে বিস্মিত হবারও কিছু নেই। কিন্তু সমস্যা তৈরি করছে বর্তমান যামানার মুনাফিক আর গাদ্দাররা। এরা উম্মাহর সাথে প্রতারণা করে প্রচার করে বেড়াচ্ছে ওয়ালা এবং বারার বিকৃত সংস্করণ। তাদের এই বিকৃত ওয়ালা এবং বারা গ্রহণ করে নিলে তা সোজা আপনাকে এই দ্বীন থেকে খারিজ করে দেবে।

আমার বাবা আমাদের এলাকার একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মসজিদটি পরিচালনার দায়িত্বও ছিল তাঁর ওপর। এটি আসলে তৈরি হয়েছিল গত শতাব্দীর তিরিশের দশকে। ষাট এবং সত্তরের দশকে আমার বাবা মসজিদ পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন, আল্লাহ তাঁকে আমলপূর্ণ দীর্ঘ জীবন দান করুন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন একজন ইয়েমেনি শাইখ, যিনি মদীনা ইউনিভার্সিটির একদম প্রথম দিককার গ্র্যাজুয়েট। এ দেশে তিনি এসেছিলেন দাওয়াতের কাজে। কিছুদিন আগে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। আল্লাহ (ﷻ) তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন। আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তখন তিনি আমাকে বেশ কিছু বই উপহার দিয়েছিলেন, যার মধ্যে একটি ছিল কিতাবুত তাওহিদ। যাইহোক, ওই বিল্ডিংয়ের ওপরের তলাতে ছিল মসজিদ। নিচতলাতে হলরুম। সেখানে পার্টি চলত, গানবাজনার ব্যবস্থা করা হতো। মাঝে মাঝে মদ্যপানও করা হতো। আমার বাবা এবং সেই ইয়েমেনি শাইখ সেই বিল্ডিংয়ের বেইসমেন্টকেও মসজিদে পরিবর্তন করে ফেলেন।

আমার এখনো মনে আছে, সালাতের পর বাবা অনেকক্ষণ মসজিদে বসে থাকতেন। মাগরিব থেকে ঈশা পর্যন্ত। এ সময়ে খুব কম মুসল্লি থাকত। কোনো কোনো জুমআর দিনে হয়তো তিন-চারজন বৃদ্ধ থাকতেন। আমার বাবা ছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সী। আর আমি ছিলাম একমাত্র শিশু। মাঝে মাঝে আমরা ওপরে বসে থাকা অবস্থায় নিচতলায় উদ্দাম পার্টি চলত। আমাদের সঙ্গে বৃদ্ধগণ নিচে গিয়ে অনুরোধ করতেন যেন পাঁচ মিনিটের জন্য গানবাজনা বন্ধ করা হয়। এই ফাঁকে তাঁরা মাগরিব বা ঈশার সালাত আদায় করবেন।

তিরিশের দশকে যারা এই মসজিদ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জড়িত ছিলেন আমরা তাঁদের ও তাঁদের পরিবারগুলোকে চিনি। এক কাজ করুন, তাঁদের ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে দেখুন, তাদের বংশধরদের বর্তমান অবস্থা কী? তারা কোথায়? তাদের বর্তমান অবস্থার ব্যাপারে জানলে আপনারা অবাক হয়ে যাবেন। আর এটা নিয়ে কথা না বাড়াই। এ আলোচনাগুলো করতেও কষ্ট হয়।

গল্প বলে বলে আমরা তাওহিদের আলোচনার সময় নিতে চাই না। তবে এগুলো আপনাদের জানা দরকার। ওয়ালা এবং বারা-বিহীন মুসলিম সমাজ বা ত্রুটিপূর্ণ ওয়ালা এবং বারার আকীদাহ মুসলিম সমাজের জন্য কী ভয়ানক পরিণতি অপেক্ষা করে থাকে, এগুলো তার অল্প কিছু উদাহরণ।

আল ওয়ালা ওয়াল বারাকে কলুষিত করার উদ্দেশ্য এবং ফলাফল

ওয়ালা এবং বারাকে বিভ্রান্তির বেড়াজালে বন্দী করা ইসলামের প্রত্যকে শত্রুর একান্ত চাওয়া। মুসলিমরা বাহ্যিকভাবে ইসলাম ধারণ করুক, তাদের মুসলিম নাম থাকুক, নিজেদের মুসলিম হিসেবে পরিচয় দিক—এতে তাদের কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু মুসলিমদের ভেতরটা যেন হয় ফাঁপা। অন্তর যেন হয় ঈমানশূন্য। অনেকটা ওই গাছের গুঁড়ির মতো, যার ভেতরটা ফাঁপা এবং পচা।

সুবিশাল একটা গাছ, ছায়াদায়ক, ঘন। দূর থেকে খুব সুন্দর দেখায়। কিন্তু কাছে গিয়ে আবিষ্কার করলেন গাছের গোড়ায় বেশ বড়সড় একটা ছিদ্র। যেই গাছটাকে দূর থেকে খুব শক্তিশালী, সুদৃঢ় মনে হচ্ছিল, কাছে যাবার পর বুঝতে পারলেন সামান্য একটু বাতাসে বা একটু নাড়াচাড়া করলেই এটি শেকড়সহ উপড়ে যাবে। আল ওয়ালা ওয়াল বারা-বিহীন ঈমানের অবস্থান এই গাছের মত।

ইসলামের শত্রুরা কেন তীব্রভাবে আল ওয়ালা ওয়াল বারাকে ঘৃণা করে? দেখুন, কোনো মুসলিমকে ধর্মান্তরিত করা খুবই কঠিন। প্রায় অসম্ভব। এটা যে কখনোই হয় না, তা না। হয়, তবে খুবই কম। আপনি সচরাচর এমন ঘটনার কথা শুনবেন না। আসলে তাওহিদ প্রোথিত মানুষের অন্তরের গভীরে। মানুষ একবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-তে বিশ্বাসী হলে, যত কিছুই হোক না কেন, রেশ অন্তরে থেকেই যায়।

একজন দাঈ আমাকে একটি ঘটনা বলেছিলেন। এক দুর্ভিক্ষপীড়িত, দরিদ্র মুসলিম এলাকায় মিশনারীরা গিয়েছিল সাহায্য করার নামে। চিকিৎসক, খাবার ওষুধ, বাড়িঘর নির্মাণের সামগ্রী, শ্রমিকের বিশাল বহর নিয়ে মিশনারীরা হাজির হলো। বাচ্চাকাচ্চা অসুস্থ হয়ে পড়লে বাবা-মা অস্থির হয়ে পড়েন—সন্তানের সুস্থতার জন্য তারা যেকোনো কিছু করতে রাজি থাকেন। মিশনারীরা এই সুযোগটাই কাজে লাগাল। অসুস্থ শিশুদের জন্যে তারা প্রাথমিক টিকার ব্যবস্থা করল। তাদের বাবা-মাকে সাহায্য করল। যখন কাউকে সাহায্য করত, তখন তারা একটা ছবি দেখিয়ে বলত, ‘দেখো, ইনি হলেন যীশুখ্রিষ্ট, তোমাদের রব। তিনিই এসব পাঠিয়েছেন।’ দুর্ভিক্ষপীড়িত অভুক্ত মুসলিমদের তারা প্রচুর খাবার-দাবার দিলো, তাদের কাদামাটির ঘরগুলো মেরামত করে দিলো। যতভাবে পারা যায় সাহায্য-সহযোগিতা করতে থাকল। আর সাহায্য করার পর প্রতি পদে পদে তাদের বানানো সেই ছবি দেখিয়ে বললো,

‘এই যে যীশুখ্রিষ্ট। তোমাদের রব। তিনিই এসব সাহায্য পাঠিয়েছেন।’

মিশনারীদের বিদায় নেবার সময় ঘনিয়ে এল। ওই অঞ্চলের মুসলিমদের খ্রিষ্টান বানানো গেছে ভেবে তারা বেশ আনন্দিত। যাবার আগে আয়োজন করা হলো বিদায়ি অনুষ্ঠানের। প্রজেক্টর দিয়ে সিনেমা দেখানোর জন্যে জেনারেটরের ব্যবস্থা করা হলো। ওই এলাকার লোকজন ইলেক্ট্রিসিটি কী তা-ই জানে না, তারা এখন প্রজেক্টরের মাধ্যমে মুভি দেখছে। তাদের মানসিক অবস্থাটা একবার বোঝার চেষ্টা করুন। মিশনারীরা নিশ্চিত ছিল তারা এই লোকগুলোর মগজধোলাই করতে পেরেছে।

প্রজেক্টরে একজন মানুষের ছবি ভেসে উঠল। মিশনারীদের বানানো সেই ছবি। আস্তে আস্তে সেই ছবি বড় হতে থাকল। মিশনারীরা, ক্রুসেইডাররা বলল, ‘ইনিই তোমাদের রব! ইনিই তোমাদের রোগ থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং তোমাদের দুরবস্থার পরিবর্তন করেছেন।’ ঠিক তখন একজন গোত্রপ্রধান লাফ দিয়ে উঠল। বিস্ময়মাখা সুরে প্রশ্ন করল,

‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! ইনিই কি আল্লাহ?!’

প্রচণ্ড বিস্ময় গোত্রপ্রধানের অন্তরে থাকা তাওহিদকে প্রকাশ করে দিলো। মিশন সফল হয়েছে ভেবে মিশনারীরা আত্মতৃপ্তি বোধ করছিল, কিন্তু এই এক প্রশ্নেই তারা বাস্তবতা বুঝতে পারল। আসলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর প্রভাব খুব গভীর। যে অন্তরে একবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর ছাপ পড়ে, সেই অন্তর থেকে এই ছাপ পুরোপুরি মুছে ফেলা খুব কঠিন।

আরেকটি বিষয় মাথায় রাখা দরকার। ইহুদী-খ্রিষ্টানদের মধ্যে এমন অনেক লোক আছে, যারা তাদের বিকৃত কিতাবাদি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখে। নিজেদের কিতাবগুলোর অসামঞ্জস্য, ভুলত্রুটিগুলোর ব্যাপারে তারা জানে। নিজেদের ধর্ম এবং ধর্মগ্রন্থের ওপর তারা ঠিকমতো ভরসা করতে পারে না। তাদের দাবিতে অনেক ফাঁকফোকর আছে, এটা তারা বোঝে। তারা যদি মুসলিমদেরকে ধর্মান্তরিত করে বা আগে মুসলিম ছিল এমন কাউকে তাদের ধর্মে নিয়ে আসে, তাহলে দেখা যাবে এসব জারিজুরি তারা মেনে নিচ্ছে না। তাহলে উপায় কী?

তারা মুসলিম থাকুক এটা আমরা চাই না। আবার আমরা তাদেরকে ইহুদী বা খ্রিষ্টান বানাতেও চাই না। তাহলে উপায় কী? মুসলিমদেরকে আমাদের ধর্মে নিয়ে আসার কোনো দরকার নেই, কিন্তু তাদেরকে ইসলাম থেকে বের করে নিয়ে আসো। মুসলিমদের ইহুদী, খ্রিষ্টান বানানোর কোনো দরকার নেই। তাদেরকে শুধু তাদের ধর্ম থেকে বের করে নিয়ে আসো। ব্যস, এতেই কাজ হবে। তারা উদ্ভ্রান্ত পশুর মতো ছুটে বেড়াবে।

এখন চিন্তা করুন, মুসলিমদের কীভাবে সহজে দীন ইসলাম থেকে বের করে আনা সম্ভব?

মুসলিমদের আল ওয়ালা ওয়াল বারা ভুলিয়ে দেয়া। অন্ততপক্ষে ওয়ালা এবং বারা-সহ ইসলামের সঠিক শিক্ষা ভুলিয়ে দেয়া।

এ কারণেই কাফিররা বারবার মুসলিম দেশগুলোর শিক্ষাব্যবস্থা, সিলেবাস, কারিকুলামে নাক গলায়। বিশেষ করে দুই পবিত্র মসজিদের ভূমিতে। কারিকুলাম থেকে আল ওয়ালা ওয়াল বারার আলোচনা বাদ দেয়ার এবং ভুল ব্যাখ্যা তুলে ধরার জন্য তারা হস্তক্ষেপ করে আসছে বহু দিন ধরে। সুনির্দিষ্টভাবে প্রাইমারী স্কুল এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলাম থেকে আল ওয়ালা ওয়াল বারার আলোচনা তুলে দেয়ার এবং বদলে ফেলার জন্যে কাফিররা হস্তক্ষেপ করেছে। শাসকদের নির্দেশ দিয়েছে।

এগুলো ওপেন সিক্রেট, সবাই জানে। আমি নিজে কিছুই বানিয়ে বলছি না। আপনি একটু ঘাঁটাঘাঁটি করুন। অবাক হয়ে যাবেন। ২০০৩, ২০০৬, ২০০৭ সালে এগুলো নিয়ে মিডিয়ায় ঝড় বয়ে গিয়েছিল। যে কথা আল্লাহর উদ্দেশ্য বলার দায়িত্ব ছিল দুই পবিত্র মসজিদের ভূখণ্ডের দালাল শাসকগোষ্ঠী সেই কথা বলল তাদের পশ্চিমা প্রভুদের আনুগত্য করে। পশ্চিমা কাফিররা নির্দেশ দিলো আর দালাল শাসকগোষ্ঠী বলল, আমরা শুনলাম এবং মানলাম। কোনো সমস্যা নেই, আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি।

অবস্থা এত খারাপ হয়েছিল যে, শাইখ সালিহ আল-ফাওয়ান আর সহ্য করতে না পেরে প্রকাশ্যে বিরোধিতা করতে শুরু করলেন। সিলেবাস পরিবর্তনের বিরোধিতা করে তিনি লিখলেনও।^[১৫৫] সিলেবাস পরিবর্তন করার পর ইসলামের শত্রুদের উদ্দেশ্য কিছুটা পূর্ণ হলো। তার কিছুদিন পর তারা মক্কাতে আন্তঃধর্মীয় কার্যক্রমের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার কাজ শুরু করল। এ কার্যক্রমকে তারা সাধারণ মানুষের সামনে উপস্থাপন করল আলোচনা আর মতবিনিময়ের নামে। এগুলো সব বাকওয়াস। আসলে এটা আন্তঃধর্মীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র।

[১৫৫] এ রকম একটি লেখা যা ২০০৯ সালে শাইখ ফাওয়ান লিখেছিলেন,

<https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/13090>

২০১৭ সালে ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'রিয়াদ সামিটের' পর তৎকালীন মার্কিন সেক্রেটারি অফ স্টেট (পররাষ্ট্রমন্ত্রী) রেঙ্ক টিলারসন, মার্কিন হাউস অফ রিপ্রেসেন্টেটিভসে এক প্রশ্নের জবাবে বলে, 'উগ্রবাদ মোকাবেলার' জন্য সৌদিদের নতুন করে পাঠ্যবই প্রণয়ন করতে বলা হয়েছে। সেই সাথে পুরোনো পাঠ্যবইগুলো ফিরিয়ে আনতে বলা হয়েছে। সৌদি শাসকেরা এতে রাজি হয়েছে।

সূত্র : Saudi Arabia will replace the Wahhabi textbooks taught in schools,

<https://tinyurl.com/y2l5tpsa>

ইসলামের মৌলিক শিক্ষাকে বদলে দেয়ার এ চক্রান্ত আজও চলছে।

আমি অনেকদিন আগে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম, লেখাটা আমাদের আগের ওয়েবসাইটে ছিল। এখন কোথায় পাওয়া যাবে আমার জানা নেই। সেই প্রবন্ধে জাযিরাতুল আরবের ৩০ জন আলিমের বক্তব্য আমি দেখিয়েছিলাম যারা আন্তঃধর্মীয় কর্মকাণ্ডকে কুফর বলেছেন কিংবা যারা এ আদর্শ গ্রহণ করে, বিশ্বাস করে ও প্রচার করে তাদেরকে কাফির বলেছেন। এমনকি সর্বোচ্চ উলামা পরিষদ, হায়াতুল কিবাকুল উলামার ফাতাওয়াতেও একে কুফর বলা হয়েছে। ওয়াল্লাহি, দুই পবিত্র ভূমির মসজিদের একজন আলিম-যুগের মুরজিয়ারা যাকে অনুসরণের দাবি করে—তিনি বলেছেন, ‘যে আন্তঃধর্মীয় কর্মকাণ্ডের দিকে আহ্বান করে সে ইহুদী-খ্রিস্টানদের চেয়েও নিকৃষ্ট’।

تَأْتِي عَلَى النَّاسِ سِنَوَاتٌ خِدَاعَاتٌ يُصَدِّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَيُكَذِّبُ فِيهَا (ﷺ) বলেছেন, 'মানুষের মাঝে এমন কতগুলো প্রতারণাপূর্ণ বছর আসবে যখন মিথ্যাবাদীদের সত্যবাদী বলে প্রত্যয়ন করা হবে, আর সত্যবাদীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হবে। তখন খিয়ানতকারীর ওপর আস্থা রাখা হবে, আর বিশ্বাসী ব্যক্তিকে অবিশ্বস্ত মনে করা হবে। তখন রুওয়াইবিদাহ কথা বলবে।' সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন রুওয়াইবিদাহ কী? তিনি উত্তরে বললেন, الرَّجُلُ الثَّائِفُ يَكَلِّمُ فِي أَمْرِ الْعَائَةِ 'এমন নগণ্য লোক, যে জনসাধারণের কাজের ব্যাপারে কথা বলবে।' -ইমাম হাকিম (رحمته الله), আল মুস্তাদরাক আলাস সহিহাইন, হাদীস নং : ৮৪৩৯; তাঁর মতে এর সনদ সহীহ এবং ইমাম যাহাবি (رحمته الله)-ও সহীহ বলেছেন।

তার উল্টোটা হচ্ছে। দিন দিন তরুণ মুসলিমরা ‘জিহাদি’ হয়ে যাচ্ছে। এটা হলো সেই বিশেষজ্ঞের বক্তব্য। এ কথা বলে সে এসব কুয়াইবিদাহদের নিয়ে ঠাট্টা করছিল।

পাশ্চাত্যের যেসব দাঈ আর শাইখরা আজ উম্মাহকে ওয়ালা এবং বারা ভুলিয়ে দিতে চাচ্ছে, বিভ্রান্তি আর বিকৃতি ছড়াচ্ছে, ইসলামের শত্রুদের পক্ষে কাজ করছে, ১২-১৩ বছর আগে (২০০১ সালের টুইন টাওয়ার হামলার আগে) ঠিক এই লোকগুলোর ব্যাপারেই মনে হতো তারা ওয়ালা এবং বারার প্রশ্নে আপসহীন। লক্ষ করুন, আমি বলেছি, ‘তাদের ব্যাপারে মনে হতো’ যে তারা এ ব্যাপারে আপসহীন। তাদের সেই সময়কার আলোচনা শুনলে দেখবেন তখনকার বক্তব্য দিয়ে তাদের আজকের বক্তব্য খণ্ডন করা যাচ্ছে। তাদের বর্তমান বিভ্রান্ত দাবিগুলোর অসারতা প্রমাণ করার জন্যে ওই সময়ের লেকচারগুলোই যথেষ্ট।

কেন এমন হলো? কেন তাদের এমন পরিবর্তন হলো? কী বদলে গেল? এটা বোঝার জন্যে বিশাল পণ্ডিত হবার প্রয়োজন পড়ে না। উত্তর খুব সহজ। শুধু পাশ্চাত্যে না, ভারতীয় উপমহাদেশ বা আরবেও অনেক দাঈ এবং শাইখ এভাবে বদলে গেছেন। ২০০১ সালের আগে তাদের আকীদাহ আর চেহারা কেমন ছিল খুঁজে দেখুন। আর তাদের বর্তমান আকীদাহ আর বেশভূষা দেখুন। আল ওয়ালা ওয়াল বারাকে তারা ছেঁটে ফেলেছে, তাই চেহারা এবং বেশভূষায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহ (ﷻ) তাদেরকে ছেঁটে ফেলেছেন। তাদের আলোচনা শুনলে দেখবেন তারা আল ওয়ালা ওয়াল বারাকে ছেঁটে ফেলেছে, আর তাদের চেহারার দিকে তাকালে দেখবেন তারা আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাহকে ছেঁটে ফেলেছে। আমার কথা মেনে নেয়ার দরকার নেই, আপনি নিজেই যাচাই করে দেখুন। যাচাই করুন, তুলনা করুন। ভাবুন।

এখন আবার কেউ বলে বসবেন না যে এসব কুয়াইবিদাহরা আজকের যুগের ইমাম শাফে’ঈ। বলা হয়ে থাকে, ভিন্ন প্রেক্ষাপট, স্থান এবং পরিস্থিতির কারণে ইমাম আশ-শাফে’ঈ তাঁর অনেক ফিকহী মত পরিবর্তন করেছিলেন। যখন ইরাকে ছিলেন তখন তিনি এক ধরনের অবস্থান নিয়েছিলেন। কিন্তু মিসরে আসার পর দেখলেন এখানে প্রেক্ষাপট, লোকেদের অবস্থা ভিন্ন। তাই ভিন্ন অবস্থান নিলেন। কিন্তু এসব লোকের পরিবর্তনের সাথে আশ-শাফে’ঈর তুলনা করা যায় না। এটা তাঁর অপমান। যদিও আমি অনেক লোককে এই খোঁড়া অজুহাত দিতে শুনেছি। দয়া করে কেউ দাবি করবেন না, এসকল লোক আমাদের সময়ের ইমাম শাফে’ঈ (ﷺ)। তাদের এই খোঁড়া অজুহাতের বাস্তবতা নিয়ে ইন শা আল্লাহ আমরা পরে আলোচনা করব।^[১৫৭]

যারা নিজেদের বিশ্বাস বদলে ফেলে তাদের নিয়ে দুটো আসার

ইবনু আবি শাইবাহ (ؓ) এবং আল হাকিম (ؓ)-এর সংকলনে হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (ؓ)-এর একটি উক্তি এসেছে। হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (ؓ) ছিলেন এমন একজন সাহাবী যাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এমন কিছু তথ্য জানিয়েছিলেন যা অন্যান্যদের জানাননি। বিশেষ করে ফিতনার ব্যাপারে।^[১৫৮] বিরল এ সম্মানের অধিকারী মহান সাহাবী হুযাইফা (ؓ) বলেছেন,

إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعْلَمَ أَصَابَتُهُ الْفِتْنَةُ أَمْ لَا، فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ كَانَ رَأَى حَلَالًا كَانَ يَرَاهُ حَرَامًا فَقَدْ أَصَابَتُهُ الْفِتْنَةُ، وَإِنْ كَانَ يَرَى حَرَامًا كَانَ يَرَاهُ حَلَالًا فَقَدْ أَصَابَتُهُ

‘তোমাদের মাঝে কেউ যদি জানতে চায়, সে ফিতনায় আক্রান্ত হয়েছে নাকি হয়নি, তাহলে সে যেন খেয়াল করে দেখে, সে যা আগে হালাল ভাবত তা যদি এখন হারাম ভাবে তাহলে সে ফিতনায় পড়েছে। আর আগে যা হারাম ভাবত তা যদি এখন হালাল ভাবে, তাহলেও সে ফিতনায় পড়েছে।’^[১৫৯]

হুযাইফা (ؓ) আমাদের হাতে কষ্টিপাথর তুলে দিয়েছেন। বলেছেন, কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহ (ﷻ) ফিতনায় ফেলেছেন কি না, এই কষ্টিপাথর দিয়েই তুমি যাচাই করে দেখতে পারবে।

একটি বিষয় এখানে বোঝা জরুরি। হুযাইফা (ؓ) এখানে এমন কোনো ব্যক্তির কথা বলছেন না যিনি ইলম অর্জন করছেন এবং একপর্যায়ে কোনো বিষয় হালাল বা হারাম হবার মাস’আলা খুঁজে পেয়ে নিজের মত পরিবর্তন করেছেন। তিনি এমন কোনো আলিমের কথা বলছেন না যিনি আগে কোনো কিছুকে হয়তো কোনো হাদীসের ভিত্তিতে হালাল মনে করতেন, তারপর তিনি জানতে পারলেন ওই হাদীসটি সহীহ না, এ কারণে তাঁর অবস্থান বদলালেন। এ ধরনের কোনো কিছুর কথা হুযাইফা (ؓ) এখানে বলছেন না। এখানে তিনি ওই ধরনের মানুষের কথা বলছেন যারা নিজের খেয়ালখুশি অনুযায়ী, নিজের নফসের সন্তুষ্টির জন্য কিংবা কাফিরদের সন্তুষ্ট করার জন্য হালালকে হারাম আর হারামকে হালালে পরিবর্তন করে।

[১৫৮] হুযাইফা (ؓ)-কে বলা হয় صاحب سر النبي অর্থাৎ নবী (ﷺ)-এর গোপনীয়তার ধারক। তাঁকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুনাফিকীদের কথা জানিয়েছিলেন অর্থাৎ কে কে মুনাফিক তা জানিয়েছিলেন। এ ছাড়া তিনি ফিতনার যুগের হাদীসের ব্যাপারে সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি। বিস্তারিত দেখুন : সহীহুল বুখারীর باب مناقب عمار وحذيفة رضي الله عنهما, অধ্যায় এবং ইমাম যাহাবি (ؒ)-এর সিয়াকু আ’লামিন নুবালা : ২/৩৬১

[১৫৯] ইমাম হাকিম (ؒ), আল মুস্তাদরাক, হাদীস নং : ৮৪৪৩, ইমাম হাকিম (ؒ)-এর মতে ইমাম বুখারী ও মুসলিম (ؒ)-এর শর্তে সহীহ, ইমাম যাহাবি (ؒ)-ও একমত পোষণ করেছেন।

হালাল-হারামের ব্যাপারে এভাবে অবস্থান বদলানো যদি এত গুরুতর বিষয় হয়, তাহলে এভাবে আকীদাহ বদলানোর বিষয়টা কেমন? যারা তাদের আকীদাহ বদলে ফেলেছে তাদের কী অবস্থা? তারা কেমন ফিতনায় পড়েছে?

হঠাৎ করে এইসব লোকের আকীদাহ ২০০১ সালের পর বদলে গেল। কী অবিশ্বাস্য, কাকতালীয় ব্যাপার, তাই না? রাতারাতি তাদের নীতি পালটে গেল। সবার একসঙ্গে! হুট করে! তাদের ওপর কী এমন কোনো ওয়াহি নাযিল হয়েছে যার ব্যাপারে আমরা জানি না? কেন এমন হলো?

প্রাসঙ্গিক আরেকটি বর্ণনা এসেছে মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক এবং সুনানুল বাইহাকীতে। হুযাইফা (رضي الله عنه)-এর কাছে গিয়ে আবু মাসউদ আল আনসারী বললেন, ‘আমাকে কিছু উপদেশ দিন’। হুযাইফা (رضي الله عنه) বললেন,

إياك و التلون في دين الله فإن دين الله واحد

‘আল্লাহর দ্বীনের মাঝে (বারবার খোলস বদলে) বহুরূপী হোয়ো না, কেননা আল্লাহর দ্বীন তো একটাই।’^[১৬০]

মুসলিমরা আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে সাপের মতো বারবার খোলস পালটায় না। কিছু দাঈদের ক্রমাগত খোলস পালটানোর অভ্যাস তাদেরকে কাফির-মুশরিক সাংবাদিক এবং বিশেষজ্ঞদের হাসির খোরাকে পরিণত করেছে। সঠিক পথের ওপর, সঠিক আদর্শের ওপর জমে থাকা সম্মানের। গর্বের। সঠিক আদর্শের ওপর টিকে থাকতে পারলে আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। আল্লাহর কসম! এর চেয়ে বড় নিয়ামাত আর কিছু হতে পারে না।

মহান আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

‘আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করলাম, আর তোমাদের ওপর প্রতিশ্রুত নিয়ামাতও আমি পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের জন্যে জীবনবিধান হিসেবে আমি ইসলামকেই মনোনীত করলাম।’ [সূরা মায়িদাহ, ৫: ৩]

ইসলামের বিশুদ্ধ আকীদাহর জ্ঞান অর্জন করার সৌভাগ্য অনেকেরই হয়েছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ তাদেরকে এ সম্পদের অযোগ্য মনে করলেন, তাদের কাছ থেকে এই সম্মান সরিয়ে নিলেন। আজ খুব অল্প মানুষকে আল্লাহ এই সম্মান দিয়েছেন। আজ

[১৬০] ইমাম ইবনু বাত্তাহ (رحمته الله), আল ইবানাহ, হাদীস নং : ৫৭২, সকল রাবী সিকাহ। আবু মাসউদ আল আনসারীকে কেউ কেউ মাজহুল মনে করেছেন। তবে ইবনু হিব্বান (رحمته الله) তাঁকে সিকাহদের তালিকায় উল্লেখ করেছেন।-তাহযিব : ১০/১১৬; তাফরিব : ৪৬২

এমন অনেক লোক আছে যারা সাংবাদিকদের কাছে রীতিমতো সাক্ষাৎকার দিয়ে, গর্ব করে বলে, এক সময় তারা সাহাবায়ে কেরাম (رضي الله عنهم)-এর আকীদাহর ওপর ছিল, এখন সেই আকীদাহ ছেড়ে এসেছে। এ রকম এক ব্যক্তিকে আজ অনেক বড় দাঈ, বক্তা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। অনেক বড় আলিমও বলা হয়। এই লোককে গুরুত্ব দেবেন না। ওয়াল্লাহিল আযীম! সাহাবী (رضي الله عنهم)-দের পদচিহ্নের অনুসারী হতে পারা আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক বড় সম্মান। অনেক বড় নিয়ামাত। আল্লাহ (ﷻ) এই লোকের কাছ থেকে সেই সম্মান সরিয়ে নিয়েছেন।

কে মানুষকে বিশুদ্ধ আকীদাহর পথে পরিচালিত করে আবার কেই-বা তাকে বিশুদ্ধ আকীদাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে? আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَلَوْلَا أَنْ تُبَيِّنَكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا

‘আমি আপনাকে দৃঢ়পদ না রাখলে আপনি তাদের প্রতি কিছুটা ঝুঁকেই পড়তেন।’
[সূরা আল ইসরা, ১৭: ৭৪]

আল্লাহ (ﷻ) এই কথাগুলো বলছেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে উদ্দেশ্যে করে। তিনি বলছেন, আমি যদি তোমাকে সরল পথের সন্ধান না দিতাম, সরল পথের ওপর তোমাকে দৃঢ় না রাখতাম, তাহলে তুমি পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে পারতে। চিন্তা করুন একবার। আল্লাহ (ﷻ) সাহায্য না করলে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পথ হারিয়ে ফেলতেন! তাহলে আমাদের কী ভয়াবহ অবস্থা হতে পারে! এক আরব কবি তাঁর সময়ের কিছু আলিমদের গিরগিটির মতো রং বদলাতে দেখে মনের দুঃখে লিখেছিলেন,

‘তোমার বন্ধুরা আর আগের মতো নেই।

কেটে গেছে পরিবর্তনের অনেক প্রহর, বহুবার বদলেছে খোলসা।

একে একে ধেয়ে আসা ফিতনায় তাদের মুখোশ গলে পড়ে,

যেভাবে গলে পড়ে বরফ।’

উম্মাহ যে বিশাল ফিতনা আর বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে আজ যাচ্ছে তার একটা সুবিধা হলো, বরফ গলে যাচ্ছে, আর মুখোশের নিচে থাকা সত্যিকার চেহারাগুলো সবার কাছে পরিষ্কার হচ্ছে। মহান আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

لَيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

‘যাতে পৃথক করে দেন আল্লাহ অপবিত্র ও নাপাককে পবিত্র ও পাক থেকে। আর যাতে একটির পর একটিকে স্থাপন করে সমবেত স্তূপে পরিণত করেন এবং পরে দোযখে নিক্ষেপ করেন। এরাই হলো ক্ষতিগ্রস্ত।’ [সূরা আল আনফাল, ৮: ৩৭]

যারা ২০০১ সালের আগে তাওহিদ, শিরক আর আল ওয়ালা ওয়াল বারা শেখাত, আজ তারা অস্থির হয়ে গেছে কাফিরদের মিডিয়ার বিশ্লেষকদের মতো হবার জন্যে। এই বাস্তবতা আপনাদের সামনেই আছে। তবু কি আপনারা দেখবেন না? আপনার দুপাশে তাকান। সামনে তাকান। পেছনে তাকান। হকপন্থীরা কোথায়? যাটের দশকে বলা শাইখ কিসক (رحمہ اللہ)-এর একটি কথা আমার বারবার মনে পড়ে। শাইখ বলতেন, ‘প্রকৃত ইসলামের দেখা তুমি পাবে কারাগারের চার দেয়ালের ভেতরে।’

ইলম বহনকারীদের একটি বিশেষ শ্রেণি

হক আঁকড়ে থাকা মানুষ আজও আছে। তবে তারা সংখ্যায় নগণ্য। তাঁরা এক বিরল প্রজাতিতে পরিণত হয়েছেন। এর মাধ্যমে অবশ্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণী ফলে যায়। আমরা কিছুক্ষণ পরে সেই হাদীসটি নিয়ে কথা বলব ইন শা আল্লাহ। এই হাদীসটির বর্ণনাসূত্র বা সনদের বিশুদ্ধতা নিয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন তোলেন, কিন্তু হাদীসশাস্ত্রের অনেক বড় আলিম এই হাদীসকে বিশুদ্ধ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (رحمہ اللہ)। ইবনুল কাইয়িম (رحمہ اللہ)-ও তাঁর মিস্যতাহ দারীস সা’আদাহ গ্রন্থে এই হাদীস উল্লেখ করেছেন। এই হাদীসের বর্ণনাসূত্রের ওপর আপনি খুব চমৎকার একটি আলোচনা পাবেন তাখরিজু আহাদিসিল মিশকাতিল মাসাবিহ (تخریج أحادیث مشکاة المصابيح) গ্রন্থে।^[১৬১]

এবার হাদীসটি উল্লেখ করা যাক। হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে উসামাহ ইবনু যাইদ, আবু হুরাইরাহ, ইবনু মাসউদ, আলি বিন আবি তালিব, ইবনু উমার, মুয়ায (رحمہ اللہ)-সহ আরও অনেক সাহাবী থেকে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এই হাদীসের মাধ্যমে এক বিশেষ শ্রেণির মানুষদের সম্মানিত করেছেন। আল্লাহ (ﷻ) আমাদের সেই সৌভাগ্যবান মানুষদের অন্তর্ভুক্ত হবার তৌফিক দান করুক। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمُ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عُذُولُهُ يَتَّقُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْعَالِينَ وَاتِّخَالَ الْمُبْطِلِينَ وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ

‘প্রত্যেক আগত জামা’আতের মধ্যে নেক, তাকওয়াবান ও নির্ভরযোগ্য মানুষ (কিতাব ও সুন্নাহর) এই জ্ঞান বহন করবে। তারা বাড়াবাড়ি করা লোকদের বিকৃতিকে খণ্ডন করবে, বাতিলপন্থীদের মিথ্যা দাবিকে প্রত্যাখ্যান করবে এবং অজ্ঞদের অপব্যাক্যাকে খণ্ডন করবে।’^[১৬২]

[১৬১] এটি আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (رحمہ اللہ) কৃত মিশকাতুল মাসাবিহ কিতাবের তাহকীক ও তাখরিজ।

[১৬২] ইমাম ইবনু আসাকির (رحمہ اللہ), তারিখু দিমাশক : ৭/৩৯; ইমাম বাইহাকীর (১০/২০৯) সূত্রে

কোনো কাটছাঁট, সংযোজন-বিয়োজন, অতিরঞ্জন ছাড়া বিশুদ্ধ দ্বীনের শিক্ষা যারা বহন করে, এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁদের প্রশংসা করেছেন। যারা ইসলামকে ঠিক ওইভাবে মানে যেভাবে প্রথম রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ওপর তা নাযিল হয়েছিল। এ হাদীসে তাদের প্রশংসা করা হয়েছে। এই প্রশংসিত মানুষদের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী হবে? তাদের প্রধান দায়িত্বগুলো কী হবে?

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁদের তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। এ বৈশিষ্ট্যগুলোর কারণেই তাঁরা সম্মান ও প্রশংসার উপযুক্ত হয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْعَالِينَ

‘তাঁরা বাড়াবাড়ি করা লোকদের বিকৃতিকে খণ্ডন করবে।’

এটি প্রথম বৈশিষ্ট্য। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের জানাচ্ছেন, এই প্রশংসিত মানুষগুলোর প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো তাঁরা বাড়াবাড়ির হাত থেকে দ্বীন ইসলামকে রক্ষা করবেন। বাড়াবাড়ির মাধ্যমে দ্বীনের যেন কোনো বিকৃতি না হয়, সেটা নিশ্চিত করার জন্যে তাঁরা কাজ করে যাবেন। হাদীসে উল্লেখিত প্রথম বৈশিষ্ট্য (الغل) ‘খাল’-এর কথা এসেছে। খাল হলো এমন কেউ, যে সীমালঙ্ঘন করে। এখানে এর অর্থ হলো এমন কেউ, যে দ্বীনের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করে, চরম অবস্থান নেয়। যেমন: খাওয়ারিজ। খারিজিরা দ্বীনের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করে। কুরআন-হাদীসে কাফিরদের ব্যাপারে যে কথা এসেছে সেগুলো তারা গুনাহগার মুসলিমদের ওপর প্রয়োগ করে। এ ক্ষেত্রে তারা বাড়াবাড়ি করে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইবাদাতের ক্ষেত্রেও খুলু (غلو) তথা বাড়াবাড়ির ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। এ বিষয়ে একটি বিখ্যাত হাদীসও আছে।

তাকফির এবং আল ওয়ালা ওয়াল বারার আলোচনাতেও অনেকে সীমালঙ্ঘন করে। বাড়াবাড়ি করে। চেইন তাকফির করে অনেক সময় তারা কোনো ভূখণ্ডের সব মুসলিমকে একসাথে কাফির ঘোষণা করে। কেউ যে আদৌ এমন করতে পারে নিজের কানে না শুনলে সেটা আমি বিশ্বাস করতাম না। আল ওয়ালা ওয়াল বারার ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক সময়ে এমন সীমালঙ্ঘন দেখা যাচ্ছে। কেউ কেউ অত্যন্ত চরম অবস্থানে চলে যাচ্ছে। এমন হবার বড় একটা কারণ হলো, আল ওয়ালা ওয়াল বারার আলোচনা থেকে আলিমগণের মুখ ফিরিয়ে নেয়া। উম্মাহর সামনে আল ওয়ালা ওয়াল বারার সঠিক শিক্ষা আলিমগণ তুলে ধরছেন না। পাশ্চাত্যে এ বিষয়ে আলোচনা করা নিষিদ্ধ, আর মুসলিম অধ্যুষিত ভূমিগুলোতেও আলিমদের এ বিষয় আলোচনা করতে দেয়া হয়

না। এর ফল কী হলো?

অনেক তরুণ নিজে নিজে ইবনু তাইমিয়াহ (رحمہ اللہ) এবং শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্‌হাব (رحمہ اللہ)-এর লেখা পড়তে শুরু করল। কিন্তু তাদের অধিকাংশ যেহেতু আরবী জানে না, তাই তারা নির্ভর করল মূল আরবীর খণ্ডিত অনুবাদের ওপর। এর ফলে তাদের মধ্যে অল্প কয়েকজন এ ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করল। অনেকে ইবনু তাইমিয়াহর লেখা থেকে ছাড়া ছাড়া কিছু উদ্ধৃতি নিয়ে এসে কোনো একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশের জনগণকে ঢালাওভাবে কাফির ঘোষণা করে। অথচ তারা মূল আরবীতে ইবনু তাইমিয়াহর রচনাবলি জীবনে পড়েও দেখেনি। কেউ যে আসলে এমন করতে পারে তা বিশ্বাস করাই মুশকিল। কিন্তু আমি নিজের কানে এমন কথা বলতে শুনেছি।

ইবনু তাইমিয়াহর কিতাবগুলো আগাগোড়া বেশ কয়েকবার পড়ার সুযোগ আল্লাহ (ﷻ) আমাকে দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ। ইবনু তাইমিয়াহর রচনাবলি যত পড়বেন আপনার মুগ্ধতা তত বাড়বে। ইমাম ইবনু তাইমিয়াহর কথার গভীরতা খুব বেশি। তাঁর বক্তব্য সার্বিকভাবে অনুবাধনের জন্য যথেষ্ট যোগ্যতার প্রয়োজন। আপনাকে মনোযোগ দিতে হবে, ইবনু তাইমিয়াহর লেখার স্টাইল সম্পর্কে জানতে হবে। তাঁর সব রচনা পড়া থাকতে হবে। অন্তত যে বিষয়ে তাঁর লেখা পড়ছেন সে বিষয়ের ওপর তাঁর সব লেখা আপনাকে পড়তে হবে। বিশেষ করে, গুরুত্বপূর্ণ এবং সেনসিটিভ কোনো বিষয়ে তাঁর ফতোয়া বুঝতে হলে তাঁর মাজমু আল-ফাতাওয়া গ্রন্থের ইতস্তত ছড়ানো-ছিটানো সব ফতোয়া এক করে গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। ঠিক কখন, কোন সময়ে, কোন পরিস্থিতিতে, কোন ঘটনার প্রেক্ষাপটে, কোন ভূমিতে, কাকে উদ্দেশ্যে করে তিনি ফতোয়াগুলো দিয়েছিলেন সেটিও জানতে হবে। তবেই আপনি বর্তমান প্রেক্ষাপটে সেগুলোর সঠিক ব্যবহার করতে পারবেন।

আজকাল কিছু কিছু লোক দেখা যায় (যদিও এদের সংখ্যা খুব বেশি না, আলহামদুলিল্লাহ) যারা ইবনু তাইমিয়াহ (رحمہ اللہ)-এর মূল আরবী কিতাবের ধারেকাছেও না গিয়ে, কিতাবের খণ্ডিত অংশের অনুবাদ পড়ে পুরো একটা জাতিকে কাফির হিসেবে ঘোষণা দেয়! এভাবে প্রেক্ষাপট বিবেচনায় না নিয়ে বক্তব্য নেয়া শুরু করলে, উলামায়ে নাজদের এমন বক্তব্য দেখানো সম্ভব, যার ওপর ভিত্তি করে পাশ্চাত্যে বসবাসরত প্রায় সব মুসলিমকে কাফির ঘোষণা করা যাবে। মা'আযআল্লাহ! অবশ্যই, আমরা এমন বলি না এবং ইলমসম্পন্ন কেউ এ ধরনের কথা বলে না। প্রেক্ষাপট, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা না করে আউট অফ কনটেক্সট উদ্ধৃতি আনলে চরমভাবে বিভ্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই আমরা বলি, এসব ভারী ভারী ইলমের কিতাব আলিমদের সান্নিধ্যে এসে অধ্যয়ন করা উচিত।

যাইহোক, হাদীস অনুযায়ী ওইসব প্রশংসিত ব্যক্তিদের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো তাঁরা বাড়াবাড়ির হাত থেকে দ্বীন ইসলামকে রক্ষার ব্যাপারে সদা সচেতন থাকবেন।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো,

وَأَنْتَحَالَ الْمُبْطِلِينَ

‘বাতিলপন্থীদের মিথ্যা দাবিকে প্রত্যাখ্যান করবো।’

সুবহান আল্লাহ! এই হাদীস শুনে মনে হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যেন আজ আমাদের মাঝে এই কথাগুলো বলছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নবুওয়্যাতের সত্যতার উৎকৃষ্ট প্রমাণ এই হাদীস। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে।

আজ এমন অনেক লোক আছে, যারা কুরআন-সুন্নাহর বক্তব্যকে প্রেক্ষাপট, প্রাসঙ্গিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে, নিজেদের খেয়ালখুশি অনুযায়ী বিকৃত করে। ফটোশপ দিয়ে যেমন ইচ্ছেমতো ছবি বদলানো যায়, এরা তেমনি নিজেদের খেয়ালখুশি চরিতার্থ করার জন্য ইচ্ছেমতো কুরআন-সুন্নাহর বক্তব্যকে বদলে ফেলে।

ওয়ালা এবং বারার কথাই ধরুন। কিছু লোক ওয়ালা এবং বারার কিছু অংশ গ্রহণ করে, বাকি অংশ ছেঁটে ফেলে। তারপর সেই খণ্ডিত অংশকে প্রচার করে আদি ও অকৃত্রিম ওয়ালা এবং বারার হিসেবে। আমরা এগুলো নিয়ে পরে আলোচনা করব ইন শা আল্লাহ।

যেমন ধরুন, অনেক উলামায়ে কেরাম বলেছেন আল ওয়ালা ওয়াল বারার অংশ হলো যিম্মি অমুসলিমদের সাথে শান্তিপূর্ণ ও দয়াদ্র আচরণ করা। অনেক ক্ষেত্রে মুসলিমদের অধীনস্থ আহলুয যিম্মাহর নিরাপত্তার ব্যাপারে মুসলিমদের আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে প্রয়োজনে মুসলিমদের জীবন বিপন্ন করতেও হতে পারে। আল ক্বাররাফি তাঁর আল-ফুরুক কিতাবে এ নিয়ে আলোচনা করেছেন। আরও অনেক আলিমও আলোচনা করেছেন। এটা নিঃসন্দেহে আল ওয়ালা ওয়াল বারার অংশ। তবে এটা পুরো আল ওয়ালা ওয়াল বারার না। এটা একটা অংশ। এমন আরও অংশ আছে। কিন্তু বর্তমান যামানার মডার্নিস্টরা ওয়ালা এবং বারার বাকি সবকিছু বাদ দিয়ে শুধু এই অংশটুকু গ্রহণ করে, তারপর এটাকেই পূর্ণাঙ্গ ওয়ালা ওয়াল বারার হিসেবে প্রচার করে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যাদের প্রশংসা করেছেন সেই সৌভাগ্যবান মানুষগুলোর তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো,

وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ

‘এবং অজ্ঞদের অপব্যাক্যার খণ্ডন করবো।’

বৈশিষ্ট্যগুলো প্রথম থেকে আরেকবার দেখা যাক। প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো, তাঁরা বাড়াবাড়ির হাত থেকে দীন ইসলামকে রক্ষা করবেন। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, যারা নিজেদের খায়েশাত পূরণ এবং তাদের প্রভুদের মনোরঞ্জননের জন্য দীন ইসলামকে কাটছাঁট করে, বিকৃত করে তাদের হাত থেকে ইসলামকে রক্ষায় তাঁরা নিবেদিত থাকবেন। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, তাঁরা অজ্ঞ-জাহেলদের অপব্যাক্যার হাত থেকে দীন ইসলামকে রক্ষা করবেন।

এমন অনেক লোক আছে যারা জাহেল, অজ্ঞ। অজ্ঞ হবার পরও তাঁরা দীনের ব্যাপারে কথা বলে। কুরআন-হাদীসের ভুল ব্যাক্য্য করে। তাদের কোনো ইলম নেই, দূরদর্শিতাও নেই। তারা গড়গড় করে তোতাপাখির মতো মুখস্থ কুরআনের আয়াত, হাদীস বলে যায়। তর্ক করে। অথচ আলিমগণ এই আয়াত বা হাদীসগুলোর ব্যাপারে কী অভিমত পোষণ করেছেন, কোনটা রহিত হয়েছে, কোনো কিছু নিয়ে এদের কোনো ধারণা নেই। এই লোকগুলো চূড়ান্ত অজ্ঞ। এদের মধ্যে অনেকে হয়তো দীনের ক্ষতি করতে চায় না। কিন্তু কাজের মাধ্যমে তারা দীন ও মুসলিমদের ক্ষতি করে। আবার এদের মধ্যে এমন অনেকে আছে যারা আসলেই খারাপ লোক। সৎ বা অসৎ যা-ই হোক না কেন, এই লোকগুলোর সবাই কোনো কিছু না জেনেই সে বিষয়ে কথা বলে। এবং এটা অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ।

মদ, শূকর এগুলো খাওয়া হারাম। কিন্তু বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে জীবন বাঁচানোর জন্য এগুলো খাওয়ার সুযোগ আছে।^[১৬৩] কিন্তু আল্লাহর ব্যাপারে অজ্ঞতাপ্রসূত কথা বলা কোনো অবস্থায়ই জায়েয না।

এতক্ষণ আমরা যে হাদীসের ব্যাপারে কথা বললাম, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (رحمہ اللہ) সেই হাদীসের ওপর মন্তব্য করেছেন,

‘আলহামদুলিল্লাহ! প্রত্যকে যুগেই আল্লাহর এমন অল্পসংখ্যক কিছু বান্দা থাকে, যারা লোকেদের হকের দিকে আহ্বান করে এবং অসৎপথ থেকে নিবৃত্ত করেন।

[১৬৩] সূরা বাক্বারার ১৭৩ নং আয়াতে আল্লাহ তা’আলা বলেছেন,

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنَازِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرٌ بَاغٍ وَلَا عَادِمٌ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

‘তিনি তোমাদের ওপর হারাম করেছেন মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস এবং সেসব জীবজন্তু যা আল্লাহ ব্যতীত অপর কারও নামে উৎসর্গ করা হয়। অবশ্য যে লোক অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমানী ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়, তার জন্য কোনো পাপ নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহান, ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু।’

এজন্য এই বিধান দেয়া হয়েছে যে, যদি কোনো ব্যক্তি খাদ্যাভাবে মরে যাবার মতো অবস্থায় উপনীত হয়, তাহলে জীবন বাঁচাতে যতটা দরকার ততটা শূকরের মাংস বা মদ সে খেতে পারবে।

ইবলিসের আক্রমণে প্রাণহীন কতজনের প্রাণ তাঁরা ফিরিয়ে এনেছেন। ইবলিসের হাতে যবেহ হওয়া কতজন তাঁরা ফিরিয়ে এনেছেন। কত পথভ্রান্ত এবং গোমরাহ মানুষকে তাঁরা সঠিক পথে এনেছেন। কতই-না চমৎকার তাদের প্রভাব। তাঁরা হলেন এই দ্বীনের সম্মানিত রক্ষক।’

দারসের উপসংহার

আলোচনার শেষে আমি বলব, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর মূলে রয়েছে ওয়ালা এবং বারার শিক্ষা। তাওহিদের পর কালেমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার অন্যতম হলো আল ওয়ালা ওয়াল বারার শিক্ষা। ওয়ালা এবং বারা মুসলিমের পরিচয়। দুর্ভেদ্য এক ঢাল, যা পরবর্তী মুসলিম প্রজন্মদের তাওহিদের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া থেকে রক্ষা করে। ওয়ালা এবং বারার আকীদাহতে আপনার সুগভীর বিশ্বাস থাকতে হবে। একে হালকাভাবে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। ওয়ালা এবং বারা আপনি কীভাবে জীবনে বাস্তবায়ন করবেন, সন্তানদের শেখাবেন তা নিয়ে আপনার স্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট প্ল্যান থাকতে হবে। কাফির-মুশরিকরা ওয়ালা এবং বারাকে চরমভাবে ঘৃণা করে, কারণ তারা আমাদের ইসলামকে, আমাদের পরিচয়কে ঘৃণা করে। তারা চায় আমাদের দ্বীনকে আমরা যেন অন্য ধর্ম আর নানা তন্ত্রমন্ত্রের সাথে মিশিয়ে বিকৃত করে ফেলি।

দারসের শুরুতে আমরা খেলার উদাহরণ দিয়েছিলাম। ধরুন চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুটি দলের খেলা চলছে। ব্রাজিল বনাম আর্জেন্টিনা। আমি ব্রাজিলের হয়ে খেলছি। কিন্তু আমি ইচ্ছে করে বারবার আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়দের পাস দিচ্ছি। তাহলে আমাকে কী বলা হবে? স্টেডিয়ামের হাজার হাজার দর্শক আমাকে কী বলবে?

অথবা চিন্তা করুন, আমি ব্রাজিলের রিজার্ভ বেঞ্চে বসে আছি। বেঞ্চে বসে পানি বা জুস খাচ্ছি। কিন্তু যতবার আর্জেন্টিনা বল পাচ্ছে বা আক্রমণে যাচ্ছে, আমি আনন্দে ফেটে পড়ছি। আর্জেন্টিনা গোল করলে আমি তালি দিচ্ছি, শিস দিচ্ছি, চিৎকার করে উৎসাহ দিচ্ছি। লোকে আমার ব্যাপারে কী মনে করবে?

আবার সাংবাদিকরা যখন আমার সাক্ষাৎকার নিতে আসছে, তখন আমি আর্জেন্টিনার প্রশংসা করছি। ‘তারা সেরা দল, শ্রেষ্ঠ দল। সবচেয়ে শক্তিশালী, সবচেয়ে পরিশ্রমী। তাদের সাথে অন্য কোনো দলের তুলনাই হয় না’, এসব বলছি।

আমাকে কী বলা হবে? আপনি আমাকে কী বলবেন?

গাদ্দার, বিশ্বাসঘাতক, প্রতারক... তাই না ?

কারণ, এগুলো একজন গাদ্দারের বৈশিষ্ট্য। একজন বিশ্বাসঘাতকের বৈশিষ্ট্য। এ কথাটা আমরা সবাই খুব সহজে বুঝি, তাই না? এটাই আল ওয়ালা ওয়াল বারা।

আজকের বিভ্রান্ত উলামা আর দাঈরা চায় আপনি নিজেকে মুসলিম বলবেন, কিন্তু সমর্থন করবেন মুসলিমদের বাদ দিয়ে কাফিরদের দলকে। তারা চায় আপনি নিজেকে মুসলিম বলবেন, কিন্তু কালেমার বাহিনীর বদলে কুফরের বাহিনীগুলোকে সমর্থন করবেন। তাদের উৎসাহ দেবেন, ভালোবাসবেন।

পুরো বিশ্ব আজ আমাদের অন্তর থেকে আল ওয়ালা ওয়াল বারা ছিনিয়ে নিতে চায়। এটা এ জন্য না যে, আল ওয়ালা ওয়াল বারা তাদের ক্ষতির কারণ। কারণটা ভিন্ন। মহান আল্লাহ সেই কারণ আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ
بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

‘আহলে কিতাবদের অনেকেই প্রতিহিংসাবশত চায় যে, মুসলমান হওয়ার পর তোমাদেরকে কোনো রকমে কাফির বানিয়ে দেয়। তাদের কাছে সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর (তারা এটা চায়)। যাক, তোমরা আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত তাদের ক্ষমা করো এবং উপেক্ষা করো। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।’ [সূরা আল বাক্বারাহ, ২: ১০৯]

আমরা আল ওয়ালা ওয়াল বারা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। আসলে আমরা যে পয়েন্টগুলো নিয়ে আলোচনা করছি তার প্রত্যেকটি নিয়ে আলাদা দারস, এমনকি আলাদা সিরিয়ও করা সম্ভব। বিষয়গুলো এতটাই গভীর। তবু সময়ের দিকে তাকিয়ে আমরা অতটা বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না। আমরা এখানে শুধু মূল ভিত্তি তৈরি করে দিচ্ছি, যাতে বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আপনারা বুঝতে পারেন।

গত দারসের পর অনেকেই ইন্টারফেইথের বিষয়টি নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করার অনুরোধ করেছেন। ইন্টারফেইথ বা আন্তঃধর্মীয় কর্মকাণ্ড আসলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল ওয়ালা ওয়াল বারার দিকে তাক করা একটি কামানের মতো। তাই এ বিষয়ে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক এবং প্রশ্ন আসা উচিত। তাই আমরা এখানে ইন্টারফেইথ নিয়ে আরও কিছুটা আলোচনা করছি।

ইন্টারফেইথ অংশগ্রহণ করা লোকের ধরন

আন্তঃধর্মীয় সম্মেলন বা আন্তঃধর্মীয় ব্যানারের অধীনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দেয়া লোকেরা সাধারণত দুই ধরনের হয়।

প্রথম শ্রেণি: এমন লোক যারা দাওয়াহকে ভালোবাসে, কিন্তু তারা দ্বীনের ব্যাপারে অজ্ঞ। তারা ইসলাম প্রচার করতে ভালোবাসে, আর অজ্ঞতার কারণে মনে করে আন্তঃধর্মীয় কাজকর্ম দিয়ে ইসলামের প্রচার করা যাবে। এরা মনে করে, আন্তঃধর্মীয় কর্মকাণ্ড হলো দাওয়াহর আদর্শ পদ্ধতি; অথবা কমসেকম দাওয়াহর অন্যতম পদ্ধতি। এ ধরনের লোকদের উচিত কিছুদিন দাওয়াতী কাজ থেকে বিরতি নিয়ে আগে ভালোভাবে ইসলাম শেখা। তা না হলে তারা মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে থাকবে এবং সাওয়াব তো দূরে থাক, দিন দিন তাদের পাপের বোঝা ভারী হতে থাকবে।

এখানে ভুল বোঝার কোনো অবকাশ নেই, আমরা দাওয়াহর বিরোধিতা করছি না। আমরা দাওয়াহকে ভালোবাসি। মুসলিম হিসেবে আমাদের জীবন আবর্তিত হয় দাওয়াহকে কেন্দ্র করে। আমরা আগেও বলেছি, যতটুকু বিশুদ্ধ ইলম আপনার কাছে আছে, আপনি ততটুকুই মানুষের কাছে পৌঁছে দিন। আপনার বিশুদ্ধ ইলমের পরিমাণ সামান্য হলেও সমস্যা নেই, মানুষের মাঝে তা-ই ছড়িয়ে দিন। হিকমাহ ও সহানুভূতির সাথে কীভাবে মানুষের মাঝে ইসলামের দাওয়াহ প্রচার করতে হবে তা নিয়েও আমরা আলোচনা করেছি। আমরা দাওয়াহর বিরোধিতা করছি না। কিন্তু ইন্টারফেইথ এবং দাওয়াহ সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী বিষয়।

মুসলিমদের ভেতর থেকে যারা ইন্টারফেইথের প্রবক্তা, যারা আন্তঃধর্মীয় প্ল্যাটফর্মে সভা-সমিতিতে অংশগ্রহণ করে, তারা ইসলামের ব্যাপারে জাহেল ও অজ্ঞ। এরা মনে করে দাওয়াহ হলো খ্রিষ্টান পাদরি আর ইহুদী র‍্যাবাইয়ের সাথে ছবি তোলা। দাঁড়িয়ে-বসে সেলফি তোলা, তারপর দিনশেষে ঘরে ফিরে পেট পুরে খাওয়া-দাওয়া করা। এরা মনে করে এভাবে তারা ইসলাম আর দাওয়াহর বিশাল খেদমত করে ফেলেছে, বিশাল কিছু অর্জন করেছে। আসলে একুল-ওকুল হারানো ছাড়া আর কিছুই তারা অর্জন করতে পারেনি। তারা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবার দুর্ভাগ্য অর্জন করেছে। সাত আসমানের ওপর থেকে আল্লাহ (ﷻ) জানিয়ে দিয়েছেন,

قُلْ هَلْ تُنْتِكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ ٣٠١ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝ ٤٠١

‘বলো, ‘আমি কি তোমাদেরকে এমন লোকদের কথা জানাব, যারা আমলের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত?’ তারা হলো সেসব লোক, দুনিয়ার জীবনে যাদের চেষ্টা-সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেছে আর তারা নিজেরা মনে করছে যে, তারা সঠিক কাজই করেছে।’ [সূরা আল কাহাফ, ১৮: ১০৪-১০৩]

আল্লাহ (ﷻ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলছেন, ওই লোকেরা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত, যাদের সব কৃতকর্ম বিফলে গেছে; অথচ তারা ভাবছে তারা তাদের কাজের বিনিময়ে উত্তম পুরস্কার পাবে। তারা মনে করছে যে, আমরা বেশ ভালো ভালো কাজ করছি, এর বিনিময়ে আমরা অনেক পুরস্কার পাব। অথচ কৃতকর্মের মাধ্যমে তারা শুধু নিজেদের পাপের বোঝা বাড়িয়েছে। এরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত।

এই লোকগুলো ইন্টারফেইথ এবং দাওয়াহকে গুলিয়ে ফেলে। এ দুইয়ের মধ্যকার পার্থক্য তারা ধরতে পারে না। ইন্টারফেইথ বা আন্তঃধর্মীয় কার্যক্রমের ইতিহাস সম্পর্কেও এরা অজ্ঞ। ইহুদী-খ্রিষ্টানদের মধ্যে কীভাবে এসব কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছিল, তাদের এজেন্ডা কী ছিল, তারপর কিছু কথিত মুসলিম কীভাবে এর প্রচারণা শুরু

করল—এগুলো তারা জানে না। তাদেরকে ইন্টারফেইথের ইতিহাস জিজ্ঞাসা করুন। দেখবেন বলতে পারছে না। এসব কিছু না জেনে এই মূর্খরা ইন্টারফেইথকে দাওয়াহ ভেবে বসে আছে। ইন্টারফেইথ নিয়ে কিছু বললে এই লোকগুলো তেড়ে আসে—
কেন এসব বলছ? আমরা তো দাওয়াহ করছি!

এরা আসলেই ক্ষতিগ্রস্ত। তারা মনে করছে তারা নেক আমল করছে, কিন্তু আসলে তারা গুনাহ কামাচ্ছে। এরা অজ্ঞ, এবং এদের উচিত দাওয়াহর মাঠ থেকে অবসর নিয়ে আগে ভালোভাবে দ্বীন শেখা এবং ইতিহাস জানা।

এরা হলো প্রথম শ্রেণি।

দ্বিতীয় শ্রেণি: এরা হলো ওইসব লোক যারা জেনেবুঝে আন্তঃধর্মীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে, প্রচার করে, পৃষ্ঠপোষকতা করে। এই লোকগুলো ইন্টারফেইথের ইতিহাস জানে, এর আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কেও এরা অবগত। অথবা এরা এর কিছু দিক সম্পর্কে জানে এবং সেই উদ্দেশ্যে বিশ্বাস করে।

এরা বর্তমান সময়ে এই উম্মাহর রুয়াইবিদাহ এবং মুনাফিক। তারা ইন্টারফেইথের আদর্শের ওপর ঈমান এনেছে এবং দ্বীন ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার প্রচার রোধে ইসলামের শত্রুদের সর্বাঙ্গিক সাহায্য-সহযোগিতা করছে। তারা দ্বীন ইসলামের এমন এক সংস্করণ চায় যা নিয়ে ইসলামের শত্রুরা সন্তুষ্ট। অথচ তাদের উচিত ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা।

ইহুদী খ্রিষ্টানরা কখনোই তোমাদের ওপর সন্তুষ্ট হবে না

মহান আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

‘(হে মুহাম্মাদ) আর ইয়াহুদী ও নাসারারা কখনো তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের মিল্লাতের অনুসরণ করো।’ [সূরা আল বাক্বারাহ, ২: ১২০]

আল্লাহ (ﷻ) তাঁর রাসূল (ﷺ)-কে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন, ইহুদী-খ্রিষ্টানরা কখনোই তোমার ওপর সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্ম অনুসরণ করো।

অন্য কোনো ধর্ম, আদর্শ বা মতবাদের অনুসারীরা যদি এখন বলে অমুক শাইখ, অমুক দাঈ, অমুক দল খুব ভালো, তাহলে আমরা কী বুঝব? হয় কাফির-মুশরিকরা মিথ্যা বলছে। আসলে তারা ওই ব্যক্তি, দল বা দাঈকে ভালো মনে করে না। অথবা তারা যে শাইখ, দাঈ বা গ্রুপের প্রশংসা করছে তারা হক পথে নেই। তারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর

দেখানো পথে নেই। কারণ স্বয়ং আল্লাহই বলে দিয়েছেন,

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

‘ইয়াহুদী ও নাসারারা কখনো তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের মিল্লাতের অনুসরণ করো।’ [সূরা আল বাক্বারাহ, ২: ১২০]

আর আল্লাহ (ﷻ) কখনো মিথ্যা বলেন না।

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا

‘আর কথায় আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী কে?’ [সূরা আন নিসা, ৪: ১২২]

ইহুদী-খ্রিষ্টানরা যদি কখনো আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট না হয়, তাহলে আমাদের করণীয় কী হবে? আমরা কি তাদের সাথে যোগ দেবো? আল্লাহ আমাদের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। সূরা আল বাক্বারাহর ১২০ নম্বর আয়াতের ঠিক পরের অংশে আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ

‘বলো, ‘নিশ্চয় আল্লাহর হিদায়াতই হিদায়াত।’ [সূরা আল বাক্বারাহ, ২: ১২০]

তাদেরকে বলুন যে, আল্লাহর নির্দেশিত পথই একমাত্র সঠিক পথ। বিশুদ্ধ তাওহিদই একমাত্র মুক্তির পথ। কোনোমতেই ইন্টারফেইথের আদর্শ বা কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা যাবে না। ইন্টারফেইথ একটা কুফরি মতবাদ। অন্যদিকে দাওয়াহ হলো আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অনুসৃত পদ্ধতি। ইন্টারফেইথ এবং দাওয়াহকে এক মনে করার মানে একটা তাজা আপেল আর একটা পচা কমলালেবুকে এক মনে করা।

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

‘বলে দিন, অপবিত্র ও পবিত্র সমান নয়; যদিও অপবিত্রের প্রাচুর্য তোমাকে বিস্মিত করে। অতএব হে বুদ্ধিমানগণ, আল্লাহকে ভয় করো—যাতে তোমরা মুক্তি পাও।’ [সূরা আল মায়িদাহ, ৫: ১০০]

ভালো এবং মন্দ কখনোই সমান হতে পারে না। ইন্টারফেইথের মতো ঘৃণিত, নোংরা আবর্জনা কী করে দ্বীনের দাওয়াতের মতো মহান বিষয়ের সমান হতে পারে!

আয়াতের পরের অংশে আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ

‘যদিও অপবিত্রের আধিক্য তোমাকে মুগ্ধ করে।’

অর্থাৎ মন্দের আধিক্য, এর জাঁকজমক অনেক সময় আমাদের মুগ্ধ করতে পারে। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে, মন্দ মন্দই। খেয়াল করলে দেখবেন, আজকাল দাঈদের মধ্যে অনেকে মন্দের মাধ্যমেই জনপ্রিয়তা অর্জনের প্রতিযোগিতা করছে।

আবু ওয়াফা ইবনু আকিলের বক্তব্য

আবু ওয়াফা ইবনু আকিল (رحمته الله) ৫১৩ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। ওয়ালা এবং বারা নিয়ে তাঁর অসাধারণ একটি উক্তি রয়েছে। তিনি বলেন,

إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان، فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع، ولا ضجيجهم في الموقف بلبك، وإنما انظر إلى مواطنهم أعداء الشريعة

‘কোনো যুগে ইসলামের প্রকৃত অবস্থা বুঝতে চাইলে মসজিদের দরজায় সৃষ্ট ভিড়ের দিকে তাকিয়ে না, হজ্জের সময় লাববাইক ধ্বনির শোরগোলের দিকেও তাকিয়ে না, বরং তুমি দেখো যে তারা শরীয়াহর দুশমনদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ নিচ্ছে।’^[১৬৪]

আবু ওয়াফা (رحمته الله) বলছেন, মসজিদে মুসল্লিদের সংখ্যা বা আরাফাতের ময়দানে হাজীদের আধিক্যে প্রমাণ করে না যে, সে যুগে ব্যাপক আকারে ইসলাম পালন করা হচ্ছে। বরং ইসলামের প্রকৃত অবস্থা বোঝা যায় ওয়ালা এবং বারার ওপর ওই যুগের মুসলিমরা কেমন আমল করছে, সেটা দেখে। ওয়ালা এবং বারা হলো একটি লিটমাস টেস্ট। আগেই বলেছি, ওয়ালা এবং বারার মূল বিষয়টি অত্যন্ত সহজ সরল। বিদআতি গোষ্ঠী, বিশেষ করে দার্শনিক ফিরকার লোকেরা তাদের ভ্রান্ত ধ্যানধারণা প্রচার করার আগে এ বিষয়ে আলোচনাও সহজ সরল ছিল। আলিমগণ সংক্ষেপে, সহজ সরলভাবে তা ব্যাখ্যা করতেন। কিন্তু মডার্নিস্টরাহ বিভিন্ন ধরনের বাতিল লোকেরা এখন এ বিষয়ে বিভ্রান্তি তৈরি করেছে। তাদের সবগুলো বিভ্রান্তির জবাব দিতে গেলে আমাদের সপ্তাহের পর সপ্তাহ এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হবে। ইন্টারফেইথের ওপর শাইখ বাকর আবু যাইদের একটি অসাধারণ বই আছে। বইটি অনুবাদ হয়েছে কি না আমার জানা নেই। যারা আরবী পারেন এবং এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিত আলোচনা পড়তে আগ্রহী তারা বইটি পড়ে ফেলুন।^[১৬৫] আল্লাহ শাইখকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন। ইন্টারফেইথের ওপর এর চেয়েও ভালো আরেকটি বই আছে। চার খণ্ডের এই বইটি লিখেছিলেন প্রফেসর আল ক্বাদি নামের একজন আরব গবেষক। খুব চমৎকার এ বইতে বেশ গভীরে গিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

[১৬৪] ইমাম ইবনু মুফলিহ (رحمته الله), আল আদাবুশ শারঈয়াহ : ১/২৬৮

[১৬৫] শাইখের কিতাবটির নাম الأديان من الإسلام وغيره من الخلط بين الإسلام (নাযিরাতুল খালত বাইনাল ইসলাম ওয়া গাইরিহ মিনাল আদইয়ান)।

আশ-শাফে'ঈর মতো হবার দাবির জবাব

আমরা গত দারসে বলেছিলাম অনেকে ২০০১ সালের পর আল ওয়ালা ওয়াল বারার ব্যাপারে তাদের আকীদাহ ও দৃষ্টিভঙ্গি আমূল বদলে ফেলেছে। সাপের মতো খোলস বদলে পরিণত হয়েছে অন্য মানুষ। এ রকম ঘটনা পাশ্চাত্যে যেমন ঘটেছে, তেমনি মুসলিম অধ্যুষিত ভূখণ্ডগুলোতেও ঘটেছে।

কেন তাদের এমন পরিবর্তন হলো?

তাদের অনেকেই ইমাম শাফে'ঈ (رحمته الله)-কে অজুহাত হিসেবে টেনে আনে। তারা দাবি করে, ইমাম শাফে'ঈ (رحمته الله) যেমন তাঁর মাযহাবের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এনেছিলেন, একইভাবে তারাও পরিবর্তন এনেছে। এই কথার অর্থ কী?

ইমাম শাফে'ঈর ব্যাপারটি একটু ব্যাখ্যা করা যাক। ইমাম শাফে'ঈ (رحمته الله) হলেন শাফে'ঈ মাযহাবের ইমাম। জীবনকালে তাঁর দুটি মাযহাব ছিল বলা যায়। জীবনের প্রথমার্শে তিনি ছিলেন ইরাকে। ইরাকে থাকা অবস্থায় তিনি বিভিন্ন ফতোয়া দিয়েছেন, লিখেছেন, ছাত্রদের শিখিয়েছেন। জীবনের পরবর্তী অংশে তিনি পাড়ি জমান মিসরে। মিসরে থাকা অবস্থায়ও তিনি বিভিন্ন ফতোয়া দিয়েছেন, লিখেছেন, ছাত্রদের শিখিয়েছেন। ইরাকে থাকা অবস্থায় ইমাম শাফে'ঈর অবস্থানের সাথে তাঁর মিসরে থাকাকালীন অবস্থানের পার্থক্য ছিল।

তো যারা আজ তাদের আকীদাহ বদলে ফেলেছে, তারা বলে আশ-শাফে'ঈ তাঁর অবস্থান বদলেছিলেন, আমরাও বদলেছি।

আসলে কী হয়েছিল? কেন ইমাম শাফে'ঈ (رحمته الله) তাঁর মাযহাব পরিবর্তন করেছিলেন? আর তিনি কতটুকুই বা নিজেকে পরিবর্তন করেছিলেন? এ ব্যাপারে সংক্ষেপে কিছু কথা বলি, যাতে করে এসব খোঁড়া অজুহাতে কেউ বিভ্রান্ত না হন।

ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন গ্রন্থে ইমাম ইবনুল কাইয়িম (رحمته الله) বলেছেন,

‘একজন ফকীহ যখন কোনো বিষয়ের ওপর ফতোয়া দেন তখন কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমার জ্ঞানের পাশাপাশি তাঁকে সেই স্থানের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, প্রথা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সময় ইত্যাদির জ্ঞান রাখতে হয়। একজন ফকীহকে অবশ্যই এগুলো জানতে হবে।’^[১৬৬]

[১৬৬] ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে উরফ বা প্রথার গুরুত্ব বিষয়ে ইমাম ইবনুল কাইয়িম (رحمته الله) ব্যাপক আলোচনা করেছেন। শাইখ মূলত এখানে এ রকম আলোচনাকে সংক্ষেপে উত্থাপন করেছেন। যেমন ই'লামের ৩য় খণ্ডে একটি অধ্যায় আছে **فَضْلُ مُوجِبَاتِ الْإِيمَانِ وَالْإِقْرَارِ وَالنُّدُورِ وَغَيْرِهَا**, এখানে ইমাম ইবনুল কাইয়িম বলেন, **فَيُنْفَعِي فِي كُلِّ بَلَدٍ بِحَسَبِ عُرْفِ أَهْلِهِ**.

কিন্তু লক্ষ করুন, এ কথা বলা হচ্ছে ফিকহের ক্ষেত্রে। ফিকহের ক্ষেত্রে এসব নিয়ামকের কথা বিবেচনা করার কথা বলা হচ্ছে। আকীদাহর ক্ষেত্রে না। আকীদাহ বদলায় না। আবার ফিকহের ক্ষেত্রেও পরিবেশ, প্রেক্ষাপট, ঐতিহ্য, প্রথা ইত্যাদির বিবেচনায় কিছু কিছু বিষয়ে পরিবর্তন আসে। সম্পূর্ণ মাযহাব বদলায় না।

তাহলে ইমাম আশ-শাফে'ঈর ক্ষেত্রে কী হয়েছিল?

ইমাম শাফে'ঈর অবস্থানে এত ব্যাপক পরিবর্তন আসার কারণ হলো নতুন দলিল পাওয়া। ইরাক থেকে মিসরে যাবার পর তিনি নতুন অনেক শার'ঈ দলিল সংকলন করেছিলেন। সেগুলোর ওপর ভিত্তি করে তাঁর অবস্থানে পরিবর্তন এসেছিল। ইমাম শাফে'ঈর জীবনী এবং তাঁর মাযহাব বিশ্লেষণ করলে দেখবেন মিসরে যাবার পর তাঁর পরিবর্তন শুরু হয়নি। বরং তাঁর অবস্থানে পরিবর্তন আসতে শুরু করে ইরাক ছেড়ে যাবার ঠিক আগে আগে। কারণ এ সময় তাঁর কাছে নতুন দলিল এসে পৌঁছাচ্ছিল। নতুন দলিলের সন্ধান পাবার পর তিনি নিজের অবস্থান পরিবর্তন করেছেন। শাসক বা কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিবাসী, কিংবা নফসকে সন্তুষ্ট করার জন্যে তিনি নিজের অবস্থান বদলাননি। তিনি অবস্থান বদলেছেন শার'ঈ দলিলের ভিত্তিতে। এবং তাঁর এই পরিবর্তন শুরু হয়েছিল মিসরে আসার আগেই, ইরাকে থাকা অবস্থাতেই।

দ্বিতীয় পয়েন্ট হলো, ইমাম শাফে'ঈ (رحمہ اللہ) যদি শাসকদের সন্তুষ্ট করার জন্য বা অন্য কোনো কারণে (সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে) দুটি মাযহাব তৈরি করার ইচ্ছাই করে থাকতেন, তাহলে তিনি বলতেন,

আমি ইরাকে থাকতে এটা লিখেছি, এটা ইরাকের জন্য।

আমি মিসরে থাকতে ওটা লিখেছি, ওটা মিসরের জন্য।

এমন কথা বললে আমরা বুঝতাম, প্রত্যেক ভূখণ্ড বা দেশের জন্য কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী আলাদা আলাদা নিয়ম হবে। কিন্তু ইমাম আশ-শাফে'ঈ এমন বলেননি। বরং তিনি এর বিপরীত কথা বলেছেন বলে উদ্ধৃতি আছে। আল বাহরুল মুহিত গ্রন্থে ইমাম আশ-শাফে'ঈকে উদ্ধৃত করে আয-যারকাশি (رحمہ اللہ) লিখেছেন,

ليس في حلٍّ من روى عنى القديم

‘কারও জন্য আমার পুরাতন মাযহাব বর্ণনা করা হালাল নয়।’^[১৬৭]

وَيُفْتَى كُلُّ أَحَدٍ بِحَسَبِ عَادَتِهِ ‘প্রত্যেক ভূখণ্ডের জনগোষ্ঠীর পালিত বৈধ প্রথা মোতাবেক ফতোয়া দেয়া হবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির অভ্যাস মোতাবেক ফতোয়া প্রদান করা হবে।’-ই’লামুল মুওয়াক্কিঈন :

অর্থাৎ তিনি বলেছেন, ইরাকে থাকাকালীন তিনি যে মাযহাবের অনুসরণ করতেন সেই মাযহাবের নিয়মকানুন যেন কারও কাছে বর্ণনা করা না হয়। কাজেই ইমাম শাফে'ঈ তাঁর অবস্থানে এত ব্যাপক পরিবর্তন প্রেক্ষাপট, পরিস্থিতি, ঐতিহ্যের কারণে আনেননি। শাসক, জনগণ কিংবা নফসকে সন্তুষ্ট করার জন্যেও তিনি অবস্থান বদলাননি। তিনি অবস্থান বদলেছেন শার'ঈ দলিলের ভিত্তিতে। তাঁর কাছে আরও হাদীস, আরও আসার এসে পৌঁছানোর কারণে তিনি অবস্থান বদলেছিলেন। এবং স্পষ্টতই তিনি তাঁর পুরোনো অবস্থানকে পুরোপুরি ত্যাগ করেছিলেন।

তৃতীয় পয়েন্ট হলো, ভিন্ন ভিন্ন ভূখণ্ডের অধিবাসীদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ফতোয়া আর নিয়মকানুন প্রযোজ্য—এই ধারণায় তিনি বিশ্বাসী হলে তাঁর যেসব ছাত্র ইরাকে রয়ে গিয়েছিল, তারা তাঁর আগের অবস্থানগুলোই প্রচার করত। কিন্তু তাঁরা এটি করেননি।

চতুর্থ পয়েন্ট, ইমাম শাফে'ঈ (رحمہ اللہ)-কে যারা খুব ভালোমতো চিনতেন, জানতেন, যারা তাঁর সত্যিকারের অনুসারী ছিলেন, তাঁর সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ছাত্র ছিলেন, তাঁরা কখনোই দাবি করেননি ইমাম শাফে'ঈ তাঁর মাযহাব পরিবর্তন করেছিলেন দেশ, জনগণ, পরিবেশ, পরিস্থিতি ইত্যাদি বদলে যাবার কারণে। সেই সময়ের ইতিহাস ঘেঁটে দেখুন। ইমাম শাফে'ঈর যে ছাত্ররা তাঁর পুরোনো কিছু অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা ছিলেন মুজতাহিদ। অর্থাৎ তাঁরা ইজতিহাদ হিসেবে ইমাম শাফে'ঈর দুই অবস্থানের মধ্য থেকে প্রথম অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। আর এই অবস্থানগুলো প্রচার বা প্রয়োগ করার সময় তারা এগুলোকে ইমাম শাফে'ঈর মত বলে এগুলো প্রচার করতেন না। কারণ আশ-শাফে'ঈ এ অবস্থানগুলো ত্যাগ করেছিলেন। নিজস্ব ইজতিহাদ হিসেবে তারা এই অবস্থানগুলো গ্রহণ করেছিলেন।

পঞ্চম পয়েন্ট হলো, যদি ইমাম শাফে'ঈ দলিলের ওপর ভিত্তি না করে জনগণ, দেশ, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে, কিংবা অন্য কোনো কারণে তাঁর মাযহাব পরিবর্তন করতেন, তাহলে তিনি বলতেন,

‘আমি ইরাকে থাকাকালীন যে মাযহাব অনুসরণ করতাম, কেবল ইরাকের অধিবাসীরা সেই মাযহাবের অনুসরণ করো। আমি মিসরে থাকা অবস্থায় যে মাযহাব গ্রহণ করেছি, সেটা কেবল মিসরের অধিবাসীরা অনুসরণ করো। আর কেউ না।’

অর্থাৎ ইরাক আর মিসরের বাইরে আর কেউ এই মাযহাবগুলো অনুসরণ করবে না। ইরাকের অবস্থান শুধু ইরাকের লোকেরা অনুসরণ করবে। মিসরের অবস্থান শুধু মিসরের লোকেরা অনুসরণ করবে। কিন্তু তিনি এমন বলেননি। ইমাম আন নাওয়াউই (رحمہ اللہ)—যিনি নিজে শাফে'ঈ মাযহাবের একজন ইমাম—তাঁর ‘আল মাজমু’ গ্রন্থে বলেছেন,

كل مسألة فيها قولان للشافعي رحمه الله قديم وجديد، فالجديد هو الصحيح وعليه العمل
'যেসকল মাস'আলায় শাফে'ঈ (ﷺ)-এর দুটি মত পাওয়া যায়-অর্থাৎ পুরাতন
মত ও নতুন মত-সেসকল মাস'আলায় নতুন মতটিই সঠিক এবং এর ওপরই
আমল করা হবে (অর্থাৎ তার সর্বশেষ মত)।^[১৬৮]

ষষ্ঠ পয়েন্ট, আমাদের যুগের যেসব লোক তাদের পরিবর্তনের পক্ষে ইমাম শাফে'ঈর
উদাহরণ টানছে তাদের পরিবর্তন এসেছে ২০০১ সালের পর। তাদের আকীদাহ ও
অবস্থানে পরিবর্তনের কারণ হলো হক থেকে বিচ্যুত হওয়া, অথবা দ্বীনের বিষয়কে
নফস কিংবা জনগণের কাছে পছন্দনীয় করা। তারা বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ওই মত
গ্রহণ করে, যেটা ওই সময়ে জনপ্রিয়। এটা তারা করছে অন্যদের সন্তুষ্ট করার জন্য।
জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার জন্য। প্রয়োজনে কুরআন-সুন্নাহর বিপরীতে
গিয়েও মানুষ কিংবা শাসককে সন্তুষ্ট করার জন্য তারা এমন করে। তার ওপর তাদের এ
পরিবর্তন শুধু ফিকহে না; বরং মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য নিজেদের আকীদাহও তারা
পালটে ফেলেছে। কিন্তু ইমাম আশ-শাফে'ঈর দুই অবস্থানের পর্যালোচনা করলে দেখা
যাবে তাঁর পরবর্তী মাযহাব-অর্থাৎ মিসরের মাযহাব-সামষ্টিকভাবে তুলনামূলকভাবে
বেশি শক্ত ও কঠোর। অর্থাৎ ইমাম আশ-শাফে'ঈ শক্ত অবস্থান থেকে সহজ অবস্থানে
আসেননি; বরং তিনি তুলনামূলক সহজ অবস্থান থেকে কঠিন অবস্থানে গেছেন।
অন্যদিকে আকীদাহর ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর উসুল বা মূলনীতিসমূহে কোনো পরিবর্তন
আনেননি। মাযহাব পরিবর্তনের পর আশ-শাফে'ঈর অবস্থানে কী কী পরিবর্তন
এসেছিল তা দেখা যাক।

ক) নতুন মাযহাবে তিনি সতর্কতার মূলনীতির ভিত্তিতে অনেক মত গ্রহণ
করেছিলেন। আপনি যখন বেশি সতর্কতা অবলম্বন করবেন তখন স্বভাবতই বিষয়টি
কঠিন হবে।

খ) তিনি নতুন মাযহাবে মাসালিহুল মুরসালাহ^[১৬৯] বা বৃহত্তর জনস্বার্থের নীতি

[১৬৮] ইমাম আন নাওয়াউই (ﷺ), আল মাজমু : ১/৬৬

[১৬৯] এটি দুটি শব্দের সমন্বয়, المصلحة মানে কল্যাণ, আর المرسلة মানে ব্যাপক, অর্থাৎ المصالح المرسلة
মানে ব্যাপক কল্যাণ। পারিভাষিকভাবে মাসালিহুল মুরসালাহ মানে এমন কল্যাণ যার বিধান শার'ঈ
নস তথা কুরআন ও সুন্নাতে সরাসরি আসেনি, এসব কল্যাণ গ্রহণের বিধান যেমন আসেনি তেমনি
বাতিল করার কথাও আসেনি। তাই এগুলোর ওপর আমল করা যায়। যেমন : উমার (رضي الله عنه) রেজিস্ট্রার
চালু করেন, কারাগার বানান। এগুলোর নির্দেশনা কুরআন ও হাদীসে নেই কিন্তু এগুলো করা যাবে না
তা-ও বলা নেই। জনকল্যাণে তাই এগুলো প্রবর্তন করা হয়েছে।-বিস্তারিত দেখুন : উস্তায ড. মুস্তাফা
আয যুহাইলী, আল ওয়াজিয ফি উসুলিল ফিকহিল ইসলামী: ১/২৫৩

হানাফী ও শাফেয়ী মাযহাবে মাসালিহুল মুরসালাহ কোনো স্বতন্ত্র দলিলযোগ্য কিছু নয়।-উস্তায আল্লামা

ব্যবহার করেননি। যদিও এই নীতির ব্যবহার বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিথিলতা বা তুলনামূলক সহজ অবস্থান তৈরি করে।

গ) তাঁর নতুন মাযহাবে তিনি উরফের চেয়ে নুসুস বা দলিলকে প্রাধান্য দিয়েছেন। উরফ হলো কোনো অঞ্চলের প্রথা-প্রচলন, ঐতিহ্য ইত্যাদি। অর্থাৎ বিভিন্নভাবে তাঁর নতুন অবস্থান তাঁর পুরোনো অবস্থানের তুলনায় কঠোর ছিল। আসলে বিষয়টি কঠোরতার না, বরং সঠিক হবার। তাঁর পরবর্তী অবস্থান অধিকতর সঠিক ছিল।

তাঁর মত পরিবর্তনের কিছু উদাহরণ দেখা যাক।

ইরাকে থাকাবস্থায় ইমাম শাফে'ঈ স্বর্ণের এবং রূপার থালা ব্যবহার করা অপছন্দ করতেন। অর্থাৎ মাকরুহ মনে করতেন। মিসরে তিনি স্বর্ণ এবং রূপার থালা ব্যবহারকে হারাম বললেন। ইরাকে যেটি মাকরুহ ছিল, মিসরে যাবার পরে সেটা হারাম বললেন। তুলনামূলক কঠোর মত গ্রহণ করলেন।

ইরাকে তাঁর মত ছিল, কেউ সালাতে সূরা ফাতিহা পড়তে ভুলে গেলেও তাঁর সালাত আদায় হয়ে যাবে। নতুন করে আবার সেই সালাত আদায় করতে হবে না। কিন্তু মিসরে যাবার পরে বললেন, না! কেউ যদি সূরা ফাতিহা পড়তে ভুলে যায়, তাহলে তার সালাত হবে না। তাকে আবার সালাত আদায় করতে হবে। অর্থাৎ পরে তিনি তুলনামূলক কঠোর মত গ্রহণ করেছিলেন।

ইরাকে থাকাবস্থায় তিনি ফতোয়া দিয়েছিলেন, কুকুরের লالا লাগলে ধুয়ে ফেলা ওয়াজিব না। মিসরে যাবার পর তিনি বললেন, এটা ধোয়া ওয়াজিব। মিসরে যাবার পর তাঁর মত আরও কঠোর হলো।

তাহলে আকীদাহ বদলে ফেলা আজকের এই লোকগুলো কীভাবে তাদের জঘন্য পরিবর্তনের পক্ষে শাফে'ঈ (ﷺ)-কে দলিল হিসেবে টেনে আনে?

আরও অনেক উদাহরণ দেয়া যায়।

ইরাকে থাকতে তিনি বলতেন, কেউ যদি ওয়ুর ক্রমধারা অনুসরণ না করে (যেমন হাত ধোয়ার আগে পা ধোয়) তাহলেও ওয়ু হয়ে যাবে। এমন করা পছন্দনীয় না, কিন্তু এভাবে করলেও ওয়ু হয়ে হবে। মিসরে যাবার পর তিনি এ ব্যাপারে কঠোর হলেন। বললেন, কেউ ওয়ুর ক্রমধারা না মানলে তার ওয়ু হবে না। তাকে আবার ওয়ু করতে হবে। ইরাকে থাকতে তিনি বলতেন, ঘুমিয়ে গেলে ওয়ু ভেঙে যায় না; কিন্তু মিসরে যাওয়ার পরে বললেন, ঘুমিয়ে পড়লে ওয়ু ভেঙে যায়।

ইরাকে থাকা অবস্থায় ইমাম আশ-শাফে'ঈর ফতোয়া ছিল, কোনো মহিলার স্বামী সফর থেকে ফিরে না এলে স্বামীর জন্য সে চার বছর অপেক্ষা করবে। চার বছর পরও স্বামী ফেরত না এলে তাকে মৃত ধরে নিয়ে ইদ্দত পালন করবে। ইদ্দত শেষে অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারবে। মিসরে যাবার পর এই মত পরিবর্তন করে তিনি বলেছিলেন, স্বামী ফিরে না এলেও কোনো নারী চার বছর পরে ইদ্দত পালন করতে পারবে না, বিয়েও করতে পারবে না। স্বামী ফিরে আসা পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হবে। এই অপেক্ষা হতে পারে কমপক্ষে ১০ বছর বা তার চেয়েও বেশি।

এই ব্যাপারে অবশ্য আরও কিছু বিষয় আছে। যেমন : এমন নারী খলীফা বা ক্বাযীর কাছে যেতে পারবে, ইত্যাদি। তবে এখানে পয়েন্ট হলো, ইরাকে তিনি বলেছিলেন ৪ বছর অপেক্ষা করলে তা যথেষ্ট হবে, কিন্তু পরে বলেছেন ১০ বছরের বেশি হতে হবে। অর্থাৎ তিনি তুলনামূলক কঠিন মত গ্রহণ করেছেন। নিরুদ্দেশ স্বামীর এ ব্যাপারটি নিয়ে সাহাবী (رضي الله عنه)-এর থেকে ২টি মত আছে। ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) মনে করতেন স্বামী ফিরে না এলে স্ত্রীকে চার বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। অর্থাৎ ইমাম শাফে'ঈ (رضي الله عنه) ইরাকে থাকাকালীন ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه)-এর এই মতটি গ্রহণ করেছিলেন। অন্যদিকে আলী ইবনু আবি তালিব (رضي الله عنه) এই বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তাঁর মত ছিল, স্বামী ফিরে না এলে স্ত্রীকে অনির্দিষ্টকালের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। ইবনু আব্বাসের তুলনায় আলীর মত তুলনামূলকভাবে কঠোর, রাব্বিয়াল্লাহু আনহুম। ইমাম শাফে'ঈ (رضي الله عنه) যেকোনো একটি গ্রহণ করতে পারতেন, যেহেতু দুইটি মতই সাহাবীদের। কিন্তু তুলনামূলক সহজ ফতোয়াটি গ্রহণ না করে তিনি কঠিনটি গ্রহণ করেছিলেন।

কাজেই এসব বাজে অজুহাত দিয়ে ইমাম আশ-শাফে'ঈর অপমান করবেন না। দুনিয়ার জন্য, জনপ্রিয়তার জন্য, নফসের জন্য কিংবা শাসকের ভয়ে নিজেদের আকীদাহ বদলে ফেলে এই দাবি করবেন না যে, 'আমরা শাফে'ঈর মতো'।

ইমাম শাফে'ঈ (رضي الله عنه) ইরাক থেকে মিসর গিয়েছিলেন, মক্কা এবং হিজায় পাড়ি দিয়ে। এই সফরে বিভিন্ন শহর পাড়ি দেয়ার সময় তিনি নতুন করে বিভিন্ন দলিল পেয়েছিলেন, যেগুলোর আলোকে তিনি তাঁর অবস্থান বদলেছিলেন। এ ছাড়া তাঁর পরিবর্তন ছিল ফিকহে-আকীদাহতে না, আল ওয়ালা ওয়াল বারাতে না। অথচ আজকের এসব লোকে আল ওয়ালা ওয়াল বারার আকীদাহ বদলে ফেলে দাবি করছে যে, তারা নাকি শাফে'ঈর মতো!

সেই সময়ে ইলম এখনকার মতো এত সহজলভ্য ছিল না। তথ্য এত সস্তা ছিল না। তাদের হাতে আইফোন ছিল না। চোখের পলক ফেলার আগে লাখ লাখ রেফারেন্স

থেকে সার্চ করে সঠিক তথ্য বের করার কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবত না। একটি বা দুটি হাদীসের জন্য তাঁদের মাসের পর মাস দীর্ঘ সফর করতে হতো। দেশ-মহাদেশ পাড়ি দিতে হতো। আল বাইহাকী তাঁর মানাকিব আশ শাফে'ঈ গ্রন্থে ইমাম শাফে'ঈ (رحمته الله)-এর মাযহাব পরিবর্তনের বিষয়ে তাঁর ছাত্র ইমাম আহমাদ (رحمته الله)-এর একটি মন্তব্য আলোচনা করেছেন। ইমাম আহমাদ বলেছেন,

عليك بالكتب التي وضعها بمصر؛ فإنه وضع هذه الكتب بالعراق ولم يُخَيِّمْهَا. ثم رجع إلى مصر فأخكم ذلك

‘তুমি আশ শাফে'ঈর সেসব কিতাব অনুসরণ করবে যা তিনি মিসরে প্রণয়ন করেছেন। কেননা তিনি এসব কিতাব ইরাকে প্রণয়ন করেছেন, কিন্তু এগুলো যথাযথ করেননি। এরপর তিনি মিসরে গিয়েছিলেন এবং সেগুলো মজবুত করেছেন।’^[১৭০]

এটি হলো ইমাম আহমাদের বক্তব্য। যিনি আশ-শাফে'ঈর ছাত্র ছিলেন।

ইমাম শাফে'ঈ নতুন দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে তাঁর মাযহাব পরিবর্তন করেছিলেন। নিফাকী থেকে বা ইসলামের শত্রুদের খুশি করার জন্যে না। আর তিনি শুধু মাযহাব (ফিকহ, মাস'আলা-মাসায়েল) পরিবর্তন করেছিলেন। আকীদাহ না।

ইসলামী পরিভাষা বদলে দেয়ার যুদ্ধ

ইসলামের শত্রুরা আজ বিশ্বজুড়ে কাজ করে যাচ্ছে ইসলামী পরিভাষাগুলোর অর্থ বদলে দেয়া, বিকৃত করা এবং পুরোপুরি মুছে ফেলার লক্ষ্যে। আল ওয়ালা ওয়াল বারাকে আজ সঠিকভাবে বুঝতে হলে আগে এটা বুঝতে হবে। শয়তান এবং ফিরআউন, দুজনেই এ কৌশল ব্যবহার করেছিল। আজকের মুনাফিকরা এ দুজনের পদাঙ্কই অনুসরণ করছে। তারা ইসলামী পরিভাষাগুলো বদলাচ্ছে, সেগুলোর অর্থ এবং সংজ্ঞা বদলে দিচ্ছে, অথবা সেগুলো পুরোপুরি মুছে ফেলার চেষ্টা চালাচ্ছে।

শয়তান আদম (عليه السلام)-কে নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়াতে চাচ্ছিল। কিন্তু সে সরাসরি আদম (عليه السلام)-কে বলেনি, ‘ওই গাছের ফল খাও’। মূল উদ্দেশ্যকে আড়াল করে সে একে উপস্থাপন করেছিল সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। সে এমন ভাব দেখাচ্ছিল, যেন সে আসলে আদম (عليه السلام)-এর উপকার করতে চায়। আল্লাহ (ﷻ) কুরআনে আমাদের জানিয়েছেন,

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ

‘অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিলো, বলল, ‘হে আদম, আমি কি তোমাকে

বলে দেবো অনন্ত জীবনপ্রদ গাছ এবং অক্ষয় রাজত্ব সম্পর্কে?” [সূরা ত্বহা, ২০: ১২০]

খেয়াল করে দেখুন, শয়তান কীভাবে ওই গাছের পরিচয় দিচ্ছে। সে শুধু গাছ বলেনি। সে বলেছে ‘অনন্ত জীবনদায়িনী গাছ’। সে বিষয়টিকে সুন্দর, উত্তম, উপকারী হিসেবে তুলে ধরেছে। এটা হলো শয়তানের কৌশল, শয়তানের ধোঁকা। এগুলো হলো শয়তানী পরিভাষা। অভিশপ্ত, ক্ষতিকর বিষয়কে সে উপকারী এবং সুন্দর হিসেবে তুলে ধরে। সে কথার পসরা সাজিয়ে বলেছে, এই গাছটি সাধারণ কোনো গাছ না। এই গাছের ফল খেলে তুমি এই চিরসুখের জাল্লাতে অনন্তকাল ধরে বসবাস করতে পারবে। পাবে অক্ষয় রাজত্ব। ক্ষতিকর একটা জিনিসকে সে ভালো হিসেবে উপস্থাপন করেছে। আজ ছবছ এ পদ্ধতি অনুসরণ করে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো বদলে ফেলা হচ্ছে। বদলে ফেলা হচ্ছে ইসলামী পরিভাষাগুলো।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ ব্যাপারে আমাদের এই ব্যাপারে সতর্ক করে গেছেন। সুনানু আবি দাউদে বর্ণিত হয়েছে,

لَيْشَرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا

‘অবশ্যই আমার উম্মাহ থেকে একদল লোক মদ পান করবে। তারা মদকে এর নিজের নাম ব্যতীত অন্য নামে নামকরণ করবে।’^[১৭১]

সুনান ইবনু মাজাহর আরেকটি বর্ণনাতে এসেছে,

لَا تَذْهَبُ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامُ حَتَّى تَشْرَبَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا

‘ততদিন পর্যন্ত দিন ও রাতের অবসান ঘটবে না, যতদিন না আমার উম্মাহের একদল লোক মদ পান করবে আর একে ভিন্ন নামে নামকরণ করবে।’^[১৭২]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এই হাদীসে মূলত বলেছেন, এই উম্মাহর কিছু লোক মদ পান করবে, কিন্তু তারা সেটাকে অন্য নাম দেবে। তারা মদ খাবে কিন্তু মদকে ‘মদ’ না বলে অন্য কিছু বলবে। তারা রিবা বা সুদ খাবে, কিন্তু সেটাকে রিবা না বলে অন্য কিছু বলবে। ইন্ট্রেস্ট, লভ্যাংশ, মুনাফা ইত্যাদি।

এখন আরবে মদকে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়। যেমন : (مشروبات روحية) মাশরুবাতে রুহিয়াহ। হাদীসে মদের জন্য ব্যবহৃত শব্দ হলো ‘খামর’। খামর শব্দটা এখন ব্যবহার

[১৭১] সুনানু আবি দাউদ, হাদীস নং : ৩৬৮৮, আল্লামা শু’আইব আরনাউত্ব (رحمته الله)-এর মতে সহীহ লি গাইরিহ।

[১৭২] সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদীস নং : ৩৩৮৪, আল্লামা শু’আইব আরনাউত্ব (رحمته الله)-এর মতে সহীহ লি গাইরিহ।

করা হয় না। মদকে যখন মাশরুবাদ রুহিয়্যাহ বলা হবে তখন সেটা মনে আলাদা ধরনের একটা প্রভাব ফেলবে। আপনি যখন মদকে অন্য কোনো নামে ডাকবেন তখন হারাম-হালালের অনুভূতির তীব্রতা কমে যাবে। মদকে যখন মদ বলা হবে, যখন ‘খামর’ শব্দটা ব্যবহার হবে তখন এর সাথে যুক্ত সব হাদীসের কথা চলে আসবে। এমন অবস্থায় মদ পান করার সময় অন্তর থেকে একটা বাধা কাজ করবে, মন খচখচ করবে। কিন্তু মদকে যখন বিয়ার, রাম, ভদকা, জিন, ওয়াইন, টাকিলা কিংবা মাশরুবাৎ রুহিয়্যাহ ডাকা হবে, তখন প্রভাবটা ভিন্ন হবে। মদ খাচ্ছেন, হারাম কাজ করছেন এই অনুভূতিগুলোর তীব্রতা কমে আসবে।

ইসলামী পরিভাষার অর্থ বদলে দেয়ার আধুনিক একটা উদাহরণ দেখা যাক।

শূরা। শূরার অর্থ পালটে দেয়ার জন্য আজ কিছু লোক খুব মন দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। তারা বলছে শূরা হলো গণতন্ত্র, গণতন্ত্র হলো শূরা। কেন এমন বলা হচ্ছে? এই কথা বলে কুফরি গণতন্ত্রকে ইসলামের লেবাস পরানো হচ্ছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার যত কুফর আছে সেগুলোকে বৈধ হিসেবে, ইসলামী হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। এটা একধরনের মাইন্ডগেম। তারা প্রথমে গণতন্ত্রকে শূরা হিসেবে কিংবা শূরার একটি সংস্করণ হিসেবে উপস্থাপন করছে। এটা করে শুরুতেই তারা সাধারণ মানুষের চিন্তাকে প্রভাবিত করছে। সাধারণ মুসলিম ভাবছে, শূরা তো ইসলামে আছে। তার মানে অবশ্যই সেটা ভালো। আর গণতন্ত্র যদি শূরা হয়, তাহলে গণতন্ত্রও নিশ্চয় ভালো।

আজকাল এমন অনেক লোকের কথা শুনবেন যারা সংস্কার আর পরিবর্তনের কথা বলে। তারা দাবি করে, ‘ইসলামই আমাদের সংস্কার করতে বলে। আমরা আসলে আমাদের ভাষা, আমাদের বক্তব্যের সংস্কার করছি। এখানে আপত্তির কী আছে?’

কিন্তু ভালোভাবে খেয়াল করলে দেখবেন, দাওয়াহর পদ্ধতি বা উপস্থাপনার ক্ষেত্রে সংস্কারের কথা বললেও তারা আসলে ইসলামের মৌলিক শিক্ষাকে বদলে ফেলছে।

দাওয়াহর ক্ষেত্রে প্রশস্ততা আছে। দাওয়াহর ক্ষেত্রে নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহারে কোনো সমস্যা নেই। দাওয়াহর সময় সবাইকে ছবছ একই কথা, একই বাক্য ব্যবহার করতে হবে, কিংবা একই বিষয় নিয়ে ইসলামের আলোচনায় যেতে হবে—এমন কোনো কথাও নেই। বিভিন্ন প্রযুক্তি, ভাষা, মাধ্যম, প্ল্যাটফর্ম ইত্যাদি ব্যবহারের সুযোগ এখানে আছে। কিন্তু ইসলামকে সংস্কার করার, ইসলামের শিক্ষাকে বদলাবার কোনো সুযোগ নেই। যারা আজ সংস্কারের কথা বলে, তারা ইসলামের শিক্ষাকে বদলাতে চাচ্ছে; কিন্তু মুখে বলছে, ‘আমরা শুধু উপস্থাপনার ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনছি’।

ফিরআউন অনেক প্রতাপশালী শাসক ছিল। কিন্তু সেও শুধু গায়ের জোরে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অর্জন করতে পারেনি। তাকে বিভিন্ন কূটকৌশলের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। ফিরআউন তার অধীনস্থদের উদ্দেশে বলত,

وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ

‘ফিরআউন বলল, আমি তোমাদেরকে কেবল সঠিক পথই দেখাই।’ [সূরা ঋফি, ৪০: ২৯]

ফিরআউন দাবি করেছিল, আমি তোমাদের সঠিক রাস্তা দেখাচ্ছি। তার এ কথার কারণে লোকেরা ধরে নিল, সঠিক পথ হলো ফিরআউনের পথ। যদিও বাস্তবতা ছিল উল্টো। ফিরআউন ‘সাবিলুর রশীদ’ অর্থাৎ সঠিক পথের অর্থ বদলে দিলো। সে বলল, সাবিলুর রশীদ মানে আমার পথ। যেটা আমার পথ, সেটাই সঠিক পথ। সাধারণ মানুষ তার এ কথা বিশ্বাস করল। এটা তাদের মনে গেঁথে গেল।

একইভাবে ফিরআউন ভ্রান্ত পথের সংজ্ঞা আর অর্থও বদলে দিলো। সে বলল, মুসা (ﷺ) আর হারুন (ﷺ)-এর পথ হলো ভ্রান্ত পথ। সে আরও অগ্রসর হয়ে বলল,

إِنْ هَٰذِهِ لَسِحْرُنِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكَ مِنْ أَرْضِكَ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكَ الْمُعْلَىٰ

‘এ দুজন অবশ্যই জাদুকর। তারা চায় তাদের জাদুর মাধ্যমে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবনপদ্ধতি ধ্বংস করে দিতো।’ [সূরা ত্বাহা, ২০: ৬৩]

এবং,

فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يُمُوسَىٰ مَسْحُورًا

‘ফিরআউন তাকে বলল, ‘ওহে মুসা, আমি তোমাকে অবশ্যই জাদুগ্রস্ত মনে করি।’ [সূরা আল ইসরা, ১৭: ১০১]

এভাবে ফিরআউন ভ্রান্ত পথকে সঠিক আর সঠিক পথকে ভ্রান্ত হিসেবে তুলে ধরল। সাধারণ মানুষ তার কথা বিশ্বাস করল। তারা সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য বলে ধরে নিল। মুসা ও হারুন (ﷺ)-কে দেখে তারা ভাবল, এরা তো জাদুগ্রস্ত! এদের কথা আমরা কেন শুনব? ফিরআউনের মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ, তার শব্দের খেলা এখানে থামেনি। চরম ঔদ্ধত্য নিয়ে সে ‘রব’ শব্দের অর্থই বদলে দিলো। সে দাবি করল, সে নিজেই রব! আল্লাহ (ﷻ) কুরআনে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। ফিরআউন দাবি করেছিল,

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ

‘সে বলল, ‘আমিই তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ রব।’ [সূরা আন-নাযিয়াত, ৭৯: ২৪]

শব্দের সংজ্ঞা আর অর্থ বদলে দেয়া, বিকৃত করা, শয়তান আর ফিরআউনের কূটকৌশল। এ কৌশল ব্যবহার করেই আজকের মুনাফিকরা ইসলামী পরিভাষাগুলোর অর্থ বিকৃত করে। সত্যের সাথে মিথ্যে মিশিয়ে বদলে ফেলে ইসলামের মৌলিক শিক্ষাকে। নিফাককে সত্য আর সত্যকে নিফাক হিসেবে অভিহিত করে। আল্লাহর আনুগত্যকে ফিসক আর ফিসকে আনুগত্য হিসেবে উপস্থাপন করে। আর সাধারণ মানুষ বাস্তবতা বুঝতে পারে না, কারণ শব্দের অর্থ আর সংজ্ঞা মুনাফিকরা বদলে দিয়েছে।

আল ওয়ালা ওয়াল বারার ক্ষেত্রে ইসলামী পরিভাষা বদলে ফেলা

আকীদাহ এবং আল ওয়ালা ওয়াল বারার ক্ষেত্রে বিচ্যুতির অন্যতম প্রধান কারণ হলো শব্দ ও পরিভাষার অর্থ বদলে দেয়া। অর্থ বদল, বিকৃতি আর মুছে দেয়ার এই কৌশল আজ বিশ্বে—বিশেষ করে পশ্চিমে আল ওয়ালা ওয়াল বারার আকীদাহর বিরুদ্ধে একটি প্রধান হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।

একটি উদাহরণ দেয়া যাক। রাফিদি শিয়াদের মধ্য থেকে আহলুস সুন্নাহর সাথে যাদের দূরত্ব তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে কম, এমন কোনো ধারার সত্যিকারের জ্ঞানসম্পন্ন কোনো রাফিদি শিয়াকে যদি বলেন, ‘আমি তোমাদের বারো ইমামে বিশ্বাস করি না। তোমরা তাদের ব্যাপারে যে আকীদাহ রাখো, আমি তা রাখি না।’ তাহলে সে আপনাকে কাফির বলবে। সে যদি প্রকৃত রাফিদি শিয়া হয়, নিজেদের আকীদাহর ব্যাপারে জ্ঞান রাখে এবং সত্য গোপন না করে, তাহলে সে নির্দিধায় আপনাকে কাফির বলবে। এখানে জ্ঞানসম্পন্ন শিয়া বলতে বোঝাচ্ছি, এমন কোনো ব্যক্তি যে এ ব্যাপারে তাদের নিজস্ব কিতাবাদি পড়েছে এবং ভালো ধারণা রাখে।

তাদের মুখ থেকে এ কথা শুনতে না চাইলে সরাসরি তাদের কিতাবাদি খুলে দেখুন। তাদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় গ্রন্থ আল কাফি খুলুন। আল কাফি আপনাকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেবে, তাদের বারোজন ইমামের ব্যাপারে যারা তাদের মতো আকীদাহ রাখে না, তারা কাফির।^[১৭৩] রাফিদি শিয়াদের মতে, মুমিন হতে হলে ওই বারোজন ইমামের ব্যাপারে তারা যেমন আকীদাহ রাখে তেমন আকীদাহ থাকতে হবে।

একইভাবে আপনি যদি কোনো খ্রিষ্টানের কাছে গিয়ে বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি যে, ঈসা (ﷺ) আল্লাহর একজন নবী; কিন্তু তিনি সৃষ্টিকর্তা নন। আখিরাতে নাজাত

[১৭৩] আল কাফি শিয়াদের নিকট সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য হাদীসের কিতাব। এর লেখক মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব আল কুলাইনী। এটি ৩ অংশে বিভক্ত—উসুলুল কাফি, ফুরু'উল কাফি ও রাওদাতুল কাফি। এতে মোট ১৬,১৯৯টি বর্ণনা রয়েছে। এর লেখক আল কুলাইনীর জন্ম ২৫০ হিজরিতে ইরানের রায় এলাকার কুলায়ন গ্রামে, মৃত্যু ৩২৯ হিজরিতে।

তিনি দেবেন না। আমি বিশ্বাস করি যে, তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়নি।’ তাহলে তাদের কাছে আপনি একজন কাফির। তারা আপনাকে কাফির গণ্য করবে। তাদের মধ্যে যারা সত্যবাদী তারা নির্দিধায় আপনাকে এটা জানিয়ে দেবে। কারণ ওরা বিশ্বাস করে কেউ যদি সম্ভাব্য সব গুনাহ করে, সে যদি পাপের সাগরে হাবুডুবু খায়, কিন্তু বিশ্বাস করে যে ঈসা (ﷺ) মানবজাতির রক্ষক, আখিরাতে রক্ষাকারী, তাহলে সেই ব্যক্তি আখিরাতে মুক্তি পেতে পারে। কিন্তু কেউ যদি অত্যন্ত সংকর্মপরায়ণ হওয়ার পরও ঈসা (ﷺ)-এর ব্যাপারে এই আকীদাহ না রাখে, তাহলে সে কাফির এবং সে আখিরাতে জাহান্নামে থাকবে। এটা হলো খ্রিষ্টানদের আকীদাহ।

কিন্তু আজ আমাদের কী অবস্থা? বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্বে থাকা মুসলিমদের কী অবস্থা? যে শব্দ মহান আল্লাহ ব্যবহার করেছেন সেটা আজ এসব মুসলিমদের কাছে কঠোর মনে হচ্ছে! অথচ আল্লাহ হলেন পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু। তিনি আর রাহমান। আর রাহীম। বিশাল এ পৃথিবীর মাঝে দয়ার যত নিদর্শন আমরা দেখি, যত দয়া অতীতের গহ্বরে জমা হয়েছে, যা অজানা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত আছে, সৃষ্টির শুরু থেকে কিয়ামাত পর্যন্ত, জ্ঞাত ও অজ্ঞাত যে দয়া বিরাজমান থাকবে, তা মহান আল্লাহর দয়ার এক শ ভাগের এক ভাগ মাত্র। বাকি ৯৯ ভাগকে মহান আল্লাহ সঞ্চিত করে রেখেছেন বিচার দিবসের জন্য।^[১৭৪] আমরা দু’আ করি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা যেন শেষ দিবসে তাঁর রহমত থেকে আমাদের বঞ্চিত না করেন।

কাফির শব্দটি ব্যবহার করেছেন এই দয়াময় আল্লাহ, পরম করুণাময় আল্লাহ। সেখানে মানুষ এসে বলছে, এই শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। আবার এরা নিজেদের মুসলিম দাবি করছে!

কেউ যখন ‘কাফির-মুশরিক’ শব্দ দুটো বাদ দিতে চায়, তখন তারা আসলে এই শব্দ এবং এর সাথে যুক্ত ধারণাকে বিকৃত করছে। সেই সাথে আকারে ইঙ্গিতে দাবি করছে, তারা মহান আল্লাহর চেয়ে বেশি দয়াশীল। নাউযুবিল্লাহ। মহান আল্লাহ যাদেরকে কুফরার বলেছেন, এরা বলছে তাদেরকে কুফরার বলা যাবে না। আমাদের আরও সহানুভূতিশীল হতে হবে, আরও দয়াশীল হতে হবে!

কাফির শব্দটি মানুষের চিন্তার জগৎ থেকে আনা কোনো শব্দ না। এটা আমরা পেয়েছি কুরআন থেকে। কাফির, কুফর, কাফিরিন, কুফরার, আল্লায়িনা কাফারু—এ শব্দগুলো

[১৭৪] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ‘আল্লাহ দয়াকে এক শ ভাগে বিভক্ত করেছেন। এরপর ৯৯ ভাগ নিজের কাছে রেখেছেন আর দুনিয়ায় এক ভাগ নাযিল করেছেন। এই এক ভাগ থেকেই সৃষ্টিকূল পরস্পর দয়া প্রদর্শন করে। এমনকি চতুষ্পদ জন্তু তার সন্তানের ওপর খুর তুলে ধরে, যেন সে আঘাত না পায়।’—সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৭৫২

কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে চার শ বারেরও বেশি। মুশরিক, শিরক এবং এর সাথে যুক্ত শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে দুই শ বারের বেশি।

কুফ্যার শব্দটি এসেছে ১৪ বার।

এর বহুবচন কাফিরিন শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে ৫৫ বার।

আল্লাহিনা কাফারু এসেছে ১৫২ বার।

এই শব্দগুলো কেন এতবার কুরআনে এসেছে? যাতে আমরা বুঝতে পারি, যার ঈমান আছে সে মুমিন আর যার ঈমান নেই সে কাফির। মুমিন ও কাফিরের মাঝে পার্থক্য জানা, এ দুইকে শ্রেণিকে আলাদা করতে পারা আল ওয়ালা ওয়াল বারার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মুমিন ও কাফিরের যে বৈশিষ্ট্য আল্লাহ আমাদের জানিয়েছেন সেগুলো অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে। আল্লাহর ব্যবহৃত শব্দগুলোকেও বিশ্বাস করতে হবে। আল্লাহ (ﷻ) যাদেরকে কাফির বলেছেন তাদের কাফির হিসেবে বিশ্বাস করতে হবে এবং যাদেরকে বিশ্বাসী বলেছেন তাদেরকে বিশ্বাসী হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

কাশশাফুল কিনা কিতাবে আল-বাহতি (ﷺ) বলেছেন,

(أَوْ لَمْ يُكْفِرْ مَنْ دَانَ) أَي تَدَيَّنَ (بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ كَالنَّصَارَى) وَالْيَهُودِ (أَوْ شَكَّ فِي كُفْرِهِمْ أَوْ صَحَّحَ مَذْهَبَهُمْ) فَهُوَ كَافِرٌ

‘ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মের (যেমন: খ্রিষ্টধর্ম বা ইহুদী ধর্মের) অনুসারীদেরকে যারা কাফির বলবে না বা তাদের কুফরে সন্দেহ পোষণ করবে বা তাদের ধর্মকে সঠিক মনে করবে, সে কাফির।’ [১৭৫]

শুধু আল বাহতি নন, অন্য আরও অনেকে একই কথা বলেছেন। যেসব লোকেরা অভিধান থেকে কাফির শব্দটি মুছে ফেলতে চায় বা এর মৌলিক সংজ্ঞা বদলে দিতে চায় তারা প্রকারান্তরে এটাই দাবি করছে যে, তারা আল্লাহর চেয়েও বেশি দয়ালু। সেই সাথে মনে করছে তারা কুরআনের প্রফরিড আর সম্পাদনা করার যোগ্য। নাউযুবিল্লাহ। আল্লাহ (ﷻ) স্পষ্ট বলে দিয়েছেন,

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

‘আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দীন গ্রহণ করতে চাইবে কক্ষনো তার সেই দীন কবুল করা হবে না এবং আখিরাতে সে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।’ [সূরা আলে ইমরান, ৩: ৮৫]

যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন বা অন্য কোনো পথ অনুসরণ করবে, সে কাফির।

এটা আল্লাহর সিদ্ধান্ত। এখানে সংযোজন, বিয়োজন, সম্পাদনার কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ যে শব্দ ব্যবহার করেছেন আল্লাহর বান্দা হিসেবে তা বাদ দেয়ার, মুছে ফেলার কোনো অধিকার আমাদের নেই।

দেখুন আল্লাহ (ﷻ) কুরআনে কী বলেছেন,

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

‘তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ কাফির, কেউ মুমিন; তোমরা যা করো আল্লাহ তা দেখেন।’ [সূরা আত তাগাবুন, ৬৪: ২]

আল্লাহ (ﷻ) তাঁর সৃষ্টিকে দুই দলে ভাগ করেছেন। কেউ মুমিন, কেউ কাফির। এখানে তৃতীয় কোনো ভাগ নেই। তৃতীয় কোনো দলের কথা তিনি বলেননি। যেসব লোক এ দুই দলের বাইরে তৃতীয় কোনো দলের কথা বলে তারা কী করছে? নিষ্কিপ্ত, ঘৃণিত বীর্য থেকে সৃষ্ট মানুষ বলছে, ‘ইয়া আল্লাহ, আমার ধারণা আপনি ভুল করছেন!’

তাদের কাজকর্মের মাধ্যমে তারা ঠিক এ কথাই বলছে। যখন কেউ বলে আল্লাহ যাদেরকে কাফির বলেছেন তাদেরকে কাফির বলা উচিত না, বা তাদের কাফির মনে করা উচিত না, তখন সে তার এ কথার মাধ্যমে দাবি করছে যে মহান আল্লাহ ভুল করেছেন। মা’আযআল্লাহ ওয়া তা’আল-আল্লাহ্ আন যালিকা উলুওয়্যান কাবীরা।

আজ থেকে বহু শতাব্দী আগে ইমাম ইবনুল কাইয়িম^[১৭৬] (رحمته) এ ধরনের মানুষদের নিয়ে লিখে গেছেন। দ্বীন ইসলামের পরিভাষা নিয়ে যারা লুকোচুরি করে, ছলচাতুরী করে, তাদের ব্যাপারে তিনি বলেছেন,

‘তারা তো গুনাহ করেছেই, তার ওপর আল্লাহর সঙ্গে ছলনা করার মাধ্যমে আরেকটি গুনাহ যুক্ত করছে।’^[১৭৭]

তিনি বলেছেন এটি হলো খিদ’আ (خداع), ঘীশ (غش) এবং নিফাক। অর্থাৎ প্রতারণা, ছলচাতুরী এবং মুনাফিকী। ইবনুল কাইয়িম এ কথাগুলো বলেছেন তার সময়ের লোকদের ব্যাপারে। তারা আকীদাহর শব্দ আর পরিভাষা নিয়ে ছলচাতুরী, প্রতারণা করছিল না। তারা এ ধরনের ছলচাতুরী করছিল হালাল-হারামের ব্যাপারে।

[১৭৬] তাঁর মূল নাম মুহাম্মাদ বিন আবি বাকর বিন আইয়্যুব। তিনি ইবনু কায়্যিমিল জাওযিয়াহ নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি ছিলেন হাম্বলী মায়হাবের প্রখ্যাত ইমাম, ফকিহ, মুহাদ্দিস, আকীদাহ বিশেষজ্ঞ, আবিদ, যাহিদ, সীরাতকার। তিনি শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ (رحمته)-এর প্রধানতম ছাত্র ও আজীবন সহচর। তাঁর প্রখ্যাত কিতাব মাদারিজুস সালিকীন, যাদুল মা’আদ, ই’লামুল মুওয়াক্কিঈন, ইগাসাতুল লাহফান, আহকামু আহলিয় যিন্মাহ প্রভৃতি।

[১৭৭] ইমাম ইবনুল কায়্যিম (رحمته) এই আলোচনা ই’লামুল মুওয়াক্কিঈনের ৩য় খণ্ডে مَا أَثَرُ مَا أَثَرُ مَا أَثَرُ এ আলোচনা করেছেন।

যেমন মদের নাম বদলে দিয়ে তারা একে হালাল করতে চাইত। এই ধরনের লোকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন,

‘তারা তো গুনাহ করেছেই, তার ওপর আল্লাহর সঙ্গে ছলনা করার মাধ্যমে আরেকটি গুনাহ যুক্ত করেছে।’

নিঃসন্দেহে হালাল-হারাম নিয়ে এ ধরনের প্রতারণা করা অনেক গুরুতর সীমালঙ্ঘন। কিন্তু আকীদাহর ব্যাপারে এমন করা আরও অনেক বেশি গুরুতর ব্যাপার। হালাল-হারামের ব্যাপারে যারা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করতে চায় তাদের ব্যাপারে যদি ইবনুল কাইয়্যিম এত শক্ত কথা বলেন, তাহলে যারা আজ শুধু হালাল-হারাম পরিবর্তন করেনি, বরং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ আর কুরআনের উল্লেখিত শব্দের অর্থ বদলে ফেলছে, তাদের ব্যাপারে তিনি কী বলতেন?

আইয়্যুব (ؑ) বলেছিলেন,

يُخَادِعُونَ اللَّهَ كَمَا يُخَادِعُونَ الصَّبِيَّانَ

‘যেভাবে শিশুদের ধোঁকা দেয়া হয়, তারা সেভাবে আল্লাহর সাথে প্রতারণা করতে চায়।’^[১৭৮]

এখানে আইয়্যুব (ؑ)^[১৭৯] সেই লোকগুলোর কথা বলেছেন যারা হালাল-হারামের ব্যাপারগুলো নিয়ে প্রতারণা করে। চিন্তা করুন, আজকের এসব লোকদের অবস্থা দেখলে তারা কী বলতেন? আল ওয়ালা ওয়াল বারার আকীদাহ সার্বিকভাবে ইসলামী পরিভাষার প্রতিরক্ষা করে। একই সাথে আল ওয়ালা ওয়াল বারার সাথে সুনির্দিষ্টভাবে যুক্ত পরিভাষার অর্থ রক্ষা করাও আল ওয়ালা ওয়াল বারার আকীদাহর অংশ। কাজেই আল ওয়ালা ওয়াল বারার একই সাথে আম এবং খাস।

আল ওয়ালা ওয়াল বারার শ্রেণিবিভাগ

এখন আমরা সংক্ষেপে এবং সহজভাবে আল ওয়ালা ওয়াল বারার শ্রেণিবিভাগ নিয়ে আলোচনা করব। এ শ্রেণিবিভাগ বোঝা এবং মনে রাখা অত্যন্ত জরুরি। অনেকেই ওয়ালা এবং বারার কিছু অংশের ওপর আমল করে আর বাকিটা ছেড়ে দেয়। এভাবেই তারা গোমরাহ হয়।

[১৭৮] ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (ؑ), ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন : ৩/৯৯

[১৭৯] আইয়্যুব সিখতিয়ানি (ؑ) প্রবীণ তাবিঈদের অন্যতম। জন্ম ৬৬ হিজরিতে মৃত্যু ১৩১ হিজরিতে। ইলম আমল সকল দিক দিয়েই তিনি ছিলেন অগ্রগণ্য। প্রখ্যাত ইমাম ইবনু সিরিন (ؑ) যখন আইয়্যুব সিখতিয়ানির বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করতেন তখন বলতেন, حدثني الصدوق আমার কাছে সত্যবাদী ব্যক্তি হাদীস বর্ণনা করেছে।-হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৩/৪

প্রথম শ্রেণি: তাওয়াল্লি

কাফিরদের সাথে সম্পর্ক ও আচরণের প্রথম শ্রেণি হলো তাওয়াল্লি (تَوَلَّى)। তাওয়াল্লি একজন ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। অর্থাৎ এটি কুফর আকবর। তাওয়াল্লি কুফর আকবর হবার অনেক দলিল আছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো এই আয়াত :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آلِ يَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ
مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنَّهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

‘হে মুমিনগণ, ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয় তাদেরই একজন। নিশ্চয় আল্লাহ যালিম কওমকে হিদায়াত দেন না।’

[সূরা মায়িদাহ, ৫: ৫১]

আল্লাহ আমাদের এখানে বলছেন, কেউ যদি কাফিরদের, ইহুদী-খ্রিষ্টানদের আওলিয়া হিসেবে গ্রহণ করে তাহলে সে তাদের একজন হিসেবে গণ্য হবে। মুমিনকে অবশ্যই আল্লাহর শত্রুদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে হবে, তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে। তারা যেসব মিথ্যা ইলাহের উপাসনা করে তাদের সাথেও সব ধরনের সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে।

আমরা সাহাবী হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (رضي الله عنه)-কে নিয়ে আগের একটি দারসে কথা বলেছিলাম।^[১৮০] হুযাইফা (رضي الله عنه) বলেছেন,

لَيَتَّقِي أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَهُوَ لَا يَشْعُرُ

‘তোমাদের প্রত্যেকের সতর্ক হতে হবে, নয়তো কেউ হয়তো ইহুদী বা খ্রিষ্টান হয়ে যাবে; অথচ সে টেরও পাবে না।’^[১৮১]

তারপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন,

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنَّهُمْ

‘আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয় তাদেরই একজন।’ [সূরা আল মায়িদাহ, ৫: ৫১]

তাওয়াল্লি বলতে কোন ধরনের আচরণ, অনুভূতি ও লেনদেনকে বোঝানো হচ্ছে? কিছু উদাহরণ দেখা যাক। বিষয়টি ভালোভাবে খেয়াল করবেন। একটি শব্দ এদিক-ওদিক হলে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা দেখা দেবে।

[১৮০] দারস ৭ দ্রষ্টব্য।

[১৮১] ইমাম সুয়ুতী (رحمته الله), আদ দুররুল মানসুর : ৫/৩৪৬

প্রথম উদাহরণ: শিরকের প্রতি ভালোবাসা। শিরকের প্রতি ভালোবাসা একটি ঈমান বিধ্বংসী বিষয়, এর আগে আমরা এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি। একই সাথে এটি আল ওয়ালা ওয়াল বারার ক্ষেত্রে ত্রুটি। আল ওয়ালা ওয়াল বারার ক্ষেত্রে কমতি না থাকলে কেউ শিরককে ভালোবাসতে পারে না।

দ্বিতীয় উদাহরণ: মুশরিকদেরকে তাদের শিরকের কারণে ভালোবাসা। অর্থাৎ মুশরিকরা শিরক করে, এই কারণে কেউ তাদের ভালোবাসে। এটিও ঈমান বিধ্বংসী একটি বিষয়।

তৃতীয় উদাহরণ: কুফরকে ভালোবাসা। এটি শিরককে ভালোবাসার মতোই। যে কুফরকে ভালোবাসে সে কাফির। যার অন্তরে কুফরের প্রতি ভালোবাসা আছে সে যদি কাবার পাশে দাঁড়িয়ে, কাবার গায়ে হাত রেখে দু'আ করতে থাকতে, তবুও সে কাফির। সে যদি সালাত আদায়রত অবস্থাতেও থাকে কিন্তু তার অন্তরে কুফরের প্রতি ভালোবাসা থাকে, তাহলে সে তার দ্বীনকে নাকচ করে দিয়েছে। আমরা এ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। উল্লেখ্য, এখানে কুফরের প্রতি ভালোবাসা বলতে কুফর বিশ্বাসের প্রতি ভালোবাসা বোঝাচ্ছি।

চতুর্থ উদাহরণ: কাফিরদেরকে তাদের কুফরি বিশ্বাসের কারণে ভালোবাসা। এটিও মানুষকে দ্বীন থেকে বের করে দেয়। কোনো ব্যক্তি তার বিছানায় শুয়ে আছে, অথবা সালাতে দাঁড়িয়েছে, অথবা কাবার গিলাফ ধরে আছে, কিন্তু তার অন্তরে কাফিরদের প্রতি তাঁদের কুফরের কারণে ভালোবাসা আছে। তাহলে এই ভালোবাসা তাকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেবে। আল ইয়াযুবিল্লাহ।

বুঝতে পারছেন হুযাইফা (رضي الله عنه) কেন এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন? আপাতভাবে এটা খুব ছোট ব্যাপার। এই লোক কিন্তু কিছু করছে না। সে কাফিরদের সাহায্য করছে না। কুফরি প্রচার করছে না। সে কাফিরদের সাথে তাদের উপাসনালয়ে গিয়ে ইবাদত করছে না। সে কেবল কুফরের কারণে কাফিরদের ভালোবাসছে—এটুকুর জন্য সে কাফির হয়ে যাবে।

পঞ্চম উদাহরণ: ইসলামের শত্রুরা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, ইসলামের ওপর কুফরের বিজয়ের জন্য, অথবা কুফর প্রতিষ্ঠার জন্য। এমন কাজে তাদেরকে সাহায্য করা কুফর আকবর। যে এমন করবে, সে কাফির হয়ে যাবে। মুরতাদ হয়ে যাবে। ভালোভাবে খেয়াল করুন, ইসলামের পরাজয় কিংবা কুফরের প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত কাফিরকে সহায়তা করা স্বতন্ত্রভাবে কুফর আকবর। কেউ মনে মনে কুফর ও শিরককে ঘৃণা করে, কিন্তু কুফরের প্রতিষ্ঠা কিংবা ইসলামের ওপর কুফরের বিজয়ের জন্য সে কাফিরদের সাহায্য করে, তাহলে এ কাজের মাধ্যমে নিজের ঈমানকে সে নাকচ করে দিয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে অনেকে বাড়তি একটি শর্ত এখানে যুক্ত করেছেন। তারা বলেছেন, ইসলামের শত্রুদের ইসলামের বিরুদ্ধে বিজয় কিংবা ও কুফর প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা কুফর আকবর হবে, যদি কাফিরদের সাহায্য করা ওই ব্যক্তির অন্তরে কুফর বা শিরককের প্রতি ভালোবাসা থাকে। আর সে যদি মনে মনে কুফর বা শিরককে ভালো না বাসে, তাহলে শুধু এই কাজ করার কারণে সে কাফির হবে না। অর্থাৎ তারা বলছেন, এই কাজটি স্বতন্ত্রভাবে কুফর আকবর গণ্য হবে না। যদি কুফর ও শিরকের প্রতি অন্তরে ভালোবাসা থাকে, তাহলে কাজটি কুফর গণ্য হবে।

এ অবস্থান সঠিক না। এ ধরনের কাজ কুফর আকবর হবার জন্য অন্তরে কুফর-শিরকের প্রতি ভালোবাসা থাকা আবশ্যিক না। শর্ত না। তারা হাতিব ইবনু আবি বালতা'আ (رضي الله عنه)-এর একটি ঘটনাকে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেন। যদিও এ ঘটনা দিয়েই তাদের এ দাবিকে ভুল প্রমাণ করা যায়। এ দাবিকে যারা ভুল প্রমাণ করেছেন তারাও এ ঘটনাকে দলিল হিসেবে আনেন।^[১৮২] এ নিয়ে আলোচনা অনেক দীর্ঘ। এখানে সেই আলোচনাতে যাবার সুযোগ নেই। মোদাকথা হলো, কেউ যদি ইসলামের শত্রুদের ইসলামের বিরুদ্ধে বিজয়ে বা কুফরের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে, এবং একই সাথে কাফিরদের কুফরকে ভালোবাসে, তাহলে সে দুটি ঈমান বিধ্বংসী কাজে পতিত হয়েছে। সে দুটো কুফর করেছে। কুফরকে ভালোবাসা স্বতন্ত্রভাবে কুফর। যে কুফরকে ভালোবাসে, সে কোনো কিছু না করলেও কাফির। কুফরকে ভালোবাসার মাধ্যমে সে কুফর আকবর করেছে। আমরা ইতিমধ্যে এ নিয়ে আলোচনা করেছি।

আবার ইসলামের শত্রুদের ইসলামের বিরুদ্ধে বিজয়ের জন্য সাহায্য করা স্বতন্ত্রভাবে কুফর আকবর। কাজেই ইসলামের শত্রুদের সাহায্য করা এবং কুফর-শিরককে ভালোবাসা দুইটি আলাদা আলাদা কুফরি কাজ। একটি অপরটির জন্য পূর্বশর্ত না।

[১৮২] হাতিব বিন আবি বালতা'আ (رضي الله عنه) ছিলেন একজন বদরি সাহাবী। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মক্কা বিজয়ের অভিযানের প্রস্তুতি নেবার সময় নিষেধ করেছিলেন যেন এই খবর কোনোভাবেই মক্কার মুশরিকরা না জানে। ফলে তাদেরকে একদম অপ্রস্তুত অবস্থায় ধরা যাবে। কিন্তু হাতিব (رضي الله عنه)-এর পরিবার-পরিজন সবাই ছিল মক্কায়। অন্যদিকে তিনি মক্কার কোনো গোত্রের লোক ছিলেন না। তিনি ভয় পেয়েছিলেন, মুসলিমরা মক্কায় আক্রমণ করলে তাঁর পরিবারের কোনো ক্ষতি না হয়ে যায়। কেননা অন্য সাহাবীদের নিজস্ব গোত্র মক্কায় আছে, তারা তাঁদের স্ত্রী-পরিজনের ক্ষতি করবে না। তাই মুশরিকদের আনুকূল্য পেয়ে নিজের পরিবারকে নিরাপদ রাখতে তিনি মক্কা আক্রমণের প্রস্তুতির খবর দিয়ে তাঁর দাসীকে একটি চিঠিসহ মক্কায় পাঠান। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তা জানতে পেরে আলী (رضي الله عنه)-কে পাঠিয়ে ওই চিঠি উদ্ধার করেন। উমার (رضي الله عنه) তাঁকে হত্যা করতে চাইলেও তিনি বদরি সাহাবী হওয়ায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে ক্ষমা করেন, কেননা আল্লাহ তা'আলা বদরি সাহাবীদের ব্যাপকভাবে ক্ষমা করেছেন। দেখুন : সহীহুল বুখারী, হাদীস নং : ৬৯৩৯ মুসনাদু আহমাদ : ২/১৪৩

ইবনু হাযম (رحمته الله) তার আল মুহাল্লা গ্রন্থে এ ব্যাপারে ইজমা উল্লেখ করেছেন। সূরা মায়িদাহর আয়াত উল্লেখ করে তিনি বলেছেন,

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ

‘আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয় তাদেরই একজন।’ [সূরা আল মায়িদাহ, ৫: ৫১]

এ আয়াত উল্লেখ করে ইবনু হাযম (رحمته الله) বলেছেন,

إِنَّمَا هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ بَأَنَّهُ كَافِرٌ مِنْ جُمْلَةِ الْكُفَّارِ فَقَطُّ - وَهَذَا حَقٌّ لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ اثْنَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

‘এই বিধান আয়াতের বাহ্যিক অর্থের মতোই অর্থাৎ সে সার্বিকভাবে কাফিরদের মতোই কাফির হবে। এটাই হক্ কথা—মুসলিমদের মাঝে দুজন ব্যক্তিও এতে মতপার্থক্য করবে না।’^[১৮৩]

লক্ষ করুন, আমরা এখানে ইজমার কথা বলেছি। ইজমা শরীয়াহর একটি দলিল। তবে এটি শুধু দলিল না এটি সিদ্ধান্তমূলক (decisive) দলিল। শরীয়াহর তিনটি প্রধান দলিল হলো কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমা। ইজমা অর্থ ঐকমত্য। কোনো বিষয়ে ইজমা থাকলে সেটা ওই ব্যাপারে স্পষ্ট ও সিদ্ধান্তমূলক দলিল। এ বিষয়ে কথা বলতে গেলে উসুলের কিছু আলোচনা চলে আসে। অনেক বরণ্য আলিম তাদের লেখায় শরীয়াহর দলিল হিসেবে কুরআন ও সুন্নাহর আগে ইজমার কথা এনেছেন। যেমন : আশ-শাওকানি তার কিতাব ইরশাদুল ফুহুলে (إرشاد الفحول), একইভাবে ইমামুল হারামাইন এবং আল-মিনহাজের লেখকও^[১৮৪] এমন বলেছেন। কেন?

কারণ, কুরআন এবং সুন্নাহর দলিলের তাউয়ীল বা ব্যাখ্যা থাকতে পারে। অথবা তা মানসুখ হতে পারে। কেউ হয়তো বুখারী থেকে কোনো হাদীস বের করে সেটাকে দলিল হিসেবে কোনো আলিমের সামনে উপস্থাপন করল। হাদীসটি সহীহ। কিন্তু আলিম তাঁকে জানালেন, এই হাদীস পরবর্তী কোনো আয়াত বা হাদীস দ্বারা রহিত বা মানসুখ হয়ে গেছে। অথবা তিনি জানালেন, আপনি এর যে অর্থ ভাবছেন আসলে এখানে তা বোঝানো হচ্ছে না; এর ব্যাখ্যা ভিন্ন। কাজেই কুরআন ও হাদীসের অনেক দলিলের ক্ষেত্রে তাউয়ীল এবং মানসুখ হবার বিষয়টি বিবেচনা করতে হয়।

কিন্তু ইজমার ব্যাপারটি ভিন্ন। ইজমা সুস্পষ্ট, নিরৈট ও সুনির্দিষ্ট অবস্থান। কোনো বিষয়ে

[১৮৩] ইমাম ইবনু হাযম (رحمته الله), আল মুহাল্লা : ১২/৩৩, কিতাবুল হুদুদ।

[১৮৪] অর্থাৎ ইমাম নাওয়াউই (رحمته الله)।

ইজমা থাকার অর্থ সবাই এ ব্যাপারে একমত হয়েছে। এখানে তাউযীলের কথা আসছে না। মানসুখ হবার কথা আসছে না। এ কারণে অনেকে তাদের বইয়ে শরীয়াহর দলিল হিসেবে কুরআন ও সুন্নাহর আগে ইজমার কথা উল্লেখ করেছেন। পূর্বযুগের অনেকে আলিমের কিতাবে এবং বর্তমানের অনেকের কিতাবে আপনারা এমন দেখবেন।

এখানে মনে রাখা দরকার, কুরআন-হাদীসের আগে ইজমার কথা আনার মানে কুরআন-হাদীসের চেয়ে ইজমাকে বেশি পবিত্র বা গুরুত্বপূর্ণ মনে করা না। প্রথমে ইজমা উল্লেখ করার কারণ হলো ইজমা সরাসরি, সুনির্দিষ্ট, নিরোট প্রমাণ। কোনো ব্যাপারে ইজমা থাকলে এ ব্যাপারে আর গবেষণা না করলেও চলবে। কারণ, উপসংহার আপনি পেয়ে গেছেন। অন্যদিকে কুরআন-সুন্নাহর দলিলের ক্ষেত্রে তাউযীল (تأويل), খুসুস (خصوص), উমুম (عموم) এবং নাসখের (نسخ) দিকগুলো বিবেচনা করতে হবে। এ কারণেই অনেক আলিম এমনসব বিষয়ের কথা একত্র করেছেন যেগুলোর ব্যাপারে ইজমা আছে।

যাইহোক, আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রে এর প্রাসঙ্গিকতা হলো, যে তাওয়াল্লি করে তার কুফরের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসের দলিলের পাশাপাশি শক্ত ইজমা আছে। তাওয়াল্লি হলো কুফর বা কাফিরদের সাথে সম্পর্কের এমন যেকোনো দিক, যা দলিল দ্বারা কুফর আকবর হিসেবে প্রমাণিত।

দ্বিতীয় শ্রেণি : আল মুওয়াল্লাহ

ওয়াল্লা এবং বারার দ্বিতীয় প্রকার হলো মুওয়াল্লাহ। এটি হলো কাফিরদের ব্যাপারে এমনসব অনুভূতি বা আচরণ যা দলিল-প্রমাণ দ্বারা হারাম হিসেবে প্রমাণিত। অর্থাৎ এ বিষয়গুলো কুফর নয়, এ কাজগুলো করলে কেউ ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে না। তবে এ কাজগুলো হারাম।

যেমন: কোনো কাফিরকে ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ’ বলা হারাম। এটি কেবল মুসলিমদের জন্য নির্দিষ্ট। কাফিরকে এ সালাম দেয়া যাবে না। এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট হাদীস আছে। বিষয়টি আল ওয়াল্লা ওয়াল বারার সাথে যুক্ত। তবে কোনো মুসলিম কোনো কাফিরকে সালাম দিলে সেটা হারাম হবে, কুফর আকবর হবে না। একটা বিষয় এখানে পরিষ্কার করে বলা দরকার। আপনি কাফির-মুশরিকদের সালাম দিতে পারবেন না। কিন্তু তাদের অন্য কোনো উপায়ে সন্তাষণ জানানোর সুযোগ আছে। আস-সালাম এবং আত-তাহিয়াহ (التحية) এর মধ্যে পার্থক্য আছে।

আস-সালাম হলো, ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু’। এটি শুধু মুসলিমদের জন্য নির্দিষ্ট। আত-তাহিয়াহ হলো অন্যান্য সাধারণ সন্তাষণ।

যেমন : হাই, মারহাবান, আহলান ও সাহলান, স্বাগতম ইত্যাদি। কাফির-মুশরিকদের সন্তোষজনক জানানো যাবে। আপনি কোনো কাফিরকে ‘হাই’, ‘আহলান ওয়া সাহলান’ বা এমন কিছু বলতে পারবেন। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য করে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলতে পারবেন না।

মুওয়ালাহর আরেকটি উদাহরণ হলো ইচ্ছাকৃতভাবে কাফির-মুশরিকদের এমন কোনো আচরণের অনুকরণ করা যেগুলো কুফর না। যেমন : কাফির-মুশরিকদের তাদের এমন কোনো বিশেষ দিনে স্বাগত জানানো যার সাথে কুফর বা শিরক যুক্ত নেই। ইবনুল কাইয়্যিম তার আহকামু আহলিয় যিম্মাহ (أحكام أهل الذمة) গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এটি ইত্তিফাক (অর্থাৎ এ ব্যাপারে ইজমা আছে) যে এমন করা হারাম।

আবার অনেক সময় কাফির-মুশরিকদের কিছু বিষয়ে স্বাগত বা শুভেচ্ছা জানানো কুফর হতে পারে।^[১৮৫] তবে সাধারণভাবে কাফিরদের সন্তোষজনক জানানো হারাম, কুফর না। এর প্রধানতম দলিলের অন্যতম হলো সূরা মুমতাহিনাহর আয়াত। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ثَلُثُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ

‘হে ঈমানদারগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তাদের কাছে বন্ধুত্বের খবর পাঠাও, অথচ যে সত্য তোমাদের কাছে এসেছে তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে।’ [সূরা আল মুমতাহিনা, ৬০: ১]

এখানে আল্লাহ (ﷻ) বলছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا

হে ঈমানদারগণ

তারপর বলছেন,

[১৮৫] যেমন যদি কেউ কাফিরদের উৎসবে যোগ দেয় এবং এর জন্য শুভেচ্ছা জানায়, তাহলে তা নাজায়েয এবং কখনো কুফর হবে। উল্লেখিত কিতাবের ৩য় খণ্ডে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (رحمته) فصلٌ নাজায়েয এবং কখনো কুফর হবে। উল্লেখিত কিতাবের ৩য় খণ্ডে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (رحمته) فصلٌ অধ্যায় এনেছেন, অর্থাৎ আহলে কিতাবদের উৎসবে উপস্থিত হবার বিধান সংক্রান্ত অধ্যায়। এখানে ইমাম শাফে’ঈ (رحمته)-এর বক্তব্য আছে যে, কাফিরদের উৎসবে উপস্থিত হওয়া মুসলিমদের জন্য নাজায়েয। আর একদম শেষে ইমাম আবু হানীফা (رحمته)-এর বক্তব্য আছে যে, কাফিরদের উৎসবকে সম্মান জানিয়ে কেউ যদি তাদেরকে উপহার দেয়, তাহলে সে কুফর করল।

ثَلْفُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ

তোমরা তাদের কাছে বন্ধুত্বের খবর পাঠাও...

যারা কাফিরদের প্রতি মাওয়াদাহ তথা অনুরাগ প্রদর্শন করে, এই আয়াতে আল্লাহ তাদেরকে এমন করতে নিষেধ করেছেন। তবে তিনি তাদেরকে মুমিন বা ঈমানদার হিসেবে সম্বোধন করেছেন। অর্থাৎ কাফিরদের প্রতি মাওয়াদাহ প্রদর্শন^[১৮৬], অনুরাগ বা বন্ধুত্ব প্রদর্শন করতে তিনি মানা করেছেন। কিন্তু এ কাজকে কুফর বলেননি। যারা এ কাজ করেছে তাদের মুমিন বলেছেন।

তৃতীয় শ্রেণি : কাফির-মুশরিকদের সাথে বৈধ সম্পর্কের সীমানা

কাফির-মুশরিকদের সাথে সম্পর্কের তৃতীয় পর্যায় হলো বৈধ আচরণ ও লেনদেন। অর্থাৎ ওইসব আচরণ ও সম্পর্ক যা শরীয়াহ অনুযায়ী বৈধ।

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتُلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

‘দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়িঘর থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে এবং তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করছেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন।’ [সূরা আল মুমতাহিনা, ৬০: ৮]

এই আয়াতের বক্তব্য সুস্পষ্ট। অনেকে আল ওয়ালা ওয়াল বারার প্রথম দুটি শ্রেণিকে অস্বীকার করে শুধু এই তিন নম্বর শ্রেণি আঁকড়ে ধরতে চায়। আবার মুদ্রার উল্টো পিঠও আছে। অনেকে আল ওয়ালা ওয়াল বারার এই তৃতীয় শ্রেণিকে অস্বীকার করে। অনেকে মনে করে, মুসলিমের যদি কোনো কাফির প্রতিবেশী থাকে তাহলে প্রতিদিন সেই প্রতিবেশীর মুখে থুতু ছিটাতে হবে, অথবা তার ঘরের সামনে গিয়ে ময়লা ফেলে আসতে হবে, অথবা তার গাড়ির জানালা ভেঙে দিতে হবে। এটা ভুল ধারণা। মূলত ওয়ালা এবং বারার খণ্ডিত বুঝ থেকেই তারা এমনটি করে থাকে।

আল্লাহ (ﷻ) যেভাবে ওয়ালা এবং বারার ওপর আমল করতে বলেছেন, আমাদের ঠিক সেভাবেই আমল করতে হবে। বাড়াবাড়িও করা যাবে না, ছাড়াছাড়িও করা

[১৮৬] এখানে مودة শব্দের অর্থ হচ্ছে বন্ধুত্ব, বন্ধুত্ব রাখা।-জাদীদ লুগাতুল কুরআন, পৃষ্ঠা : ৯৪০। এখানে কাফিরদের কুফর নয় বরং ব্যক্তি হিসেবে কাফির বন্ধুদের প্রতি ঝুঁকে পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। কাফিরদের প্রতি সাধারণ বন্ধুত্বকেও প্রগাঢ় করে নেয়া জায়েয নয়। স্বাভাবিক হাই-হ্যালো সম্পর্ক থাকতে পারে। সাধারণ মাত্রায় ক্লাসমেট, ব্যাচমেট, রুমমেট বা কলিগদের সাথে যে সুসম্পর্ক থাকে এতে দোষ নেই। কিন্তু সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতায় নিয়ে যেতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন।

যাবে না। কিছু ক্ষেত্রে কাফির-মুশরিকদের সাথে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা অনুসারে সৌজন্যমূলক আচরণ করতে হবে। যেমন : তাদের খোঁজখবর নেয়া, উপহার দেয়া, সুন্দরতম উপায়ে ইসলামের দিকে আহ্বান করা।

পরবর্তী দারসে আল ওয়ালা ওয়াল বারার তৃতীয় শ্রেণির ব্যাপারে আমরা আরও কিছু আলোচনা করব, যাতে করে মূর্থদের ভ্রান্তি সৃষ্টি করার সুযোগ না থাকে।

গত দারসে আমরা ইসলামী পরিভাষাগুলোর অর্থ মুছে ফেলা আর বিকৃতি নিয়ে কথা বলেছিলাম। তারপর আলোচনা করেছিলাম আল ওয়ালা ওয়াল বারার প্রকারভেদ নিয়ে। ওয়ালা এবং বারার প্রথম প্রকার হলো আত-তাওয়াল্লি। এটি সরাসরি কুফর। যদি কোনো ব্যক্তি এর সাথে জড়িত হয়, তাহলে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। কুরআনে এসেছে,

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ

‘তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।’ [সূরা আল মায়িদাহ, ৫: ৫১]

আল্লাহর শত্রু এবং তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের উপাসনা করে তাদের সাথে কোনো রকম সম্পর্ক রাখা যাবে না। তাওয়াল্লির অন্তর্ভুক্ত হলো:

- কুফর বা শিরকের প্রতি ভালোবাসা থাকা।
- কুফর ও শিরকের অনুসারীদের তাদের কুফর ও শিরকের কারণে ভালোবাসা।
- ইসলামের শত্রুদের ইসলামের ওপর বিজয়ী হতে সাহায্য করা, যদিও সাহায্যকারী মনে মনে তাদের কুফর বা শিরককে ঘৃণা করে।

এর প্রতিটি স্বতন্ত্রভাবে কুফর আকবর।

আল ওয়ালা ওয়াল বারার দ্বিতীয় যে প্রকার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল তা হলো, আল মুওয়ালাহ। এটা সুস্পষ্ট হারাম। আল মুওয়ালাহর অন্তর্ভুক্ত কাজগুলো কুফর নয়; কিন্তু তা হারাম। যেমন: কাফিরদের সালাম দেয়া। সালাম শুধু মুসলিমদের জন্য বরাদ্দ। এমন কোনো বিষয়ে কাফির-মুশরিকদের অনুসরণ করা যা তাদের একান্ত বৈশিষ্ট্য, এটিও মুওয়ালাহর অন্তর্ভুক্ত। কাফিরদের কোনো বিশেষ দিনে শুভেচ্ছা জানানোও মুওয়ালাহর অন্তর্ভুক্ত, এবং হারাম। তবে অনেক ক্ষেত্রে এটি আরও গুরুতর পর্যায়ে

পৌঁছাতে পারে।

আল ওয়ালা ওয়াল বারার তৃতীয় প্রকার হলো কাফির ও মুশরিকদের সাথে যেসব আচরণ ও সম্পর্ক রাখা বৈধ। আজ এ বিষয়ে আমরা আরও কিছু আলোচনা করব।

কাফির-মুশরিকদের সাথে বৈধ সম্পর্কের সীমানা

আল ওয়ালা ওয়াল বারার তৃতীয়ের প্রকারের ব্যাপারে প্রধান দলিল হলো কুরআনের এই আয়াত:

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقْتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبْرُوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

‘দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়িঘর থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে এবং তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করছেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন।’ [সূরা আল-মুমতাহিনা, ৬০: ৮]

এর স্বপক্ষে আরও দলিল আছে, কিন্তু সূরা মুমতাহিনার এই আয়াতটিই প্রধানতম দলিল। ইনশা আল্লাহ আমরা এখন এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

আমরা আগেই বলেছি, ওয়ালা এবং বারা নিয়ে আমাদের সমাজে চরম বিভ্রান্তি ছড়িয়ে আছে। কেউ ছাড়াছাড়ি করতে গিয়ে ওয়ালা এবং বারাকেই বাতিল করে দিয়েছে। বিশেষ করে বর্তমান যুগের মডার্নিস্টরা। মডার্নিস্টরা এবং কাফিররা যাদেরকে ‘মডারেট মুসলিম’ বলে, তারা আল ওয়ালা ওয়াল বারার প্রথম দুটি প্রকারকে একেবারে অস্বীকার করে। তাদের আকীদাহ অনুযায়ী কাফিরদের সাথে এমন কোনো আচরণ বা সম্পর্ক নেই যা হারাম কিংবা কুফর। ওয়ালা এবং বারার প্রথম দুই প্রকারকে মুছে দিয়ে এরা কেবল শেষেরটি অর্থাৎ কাফির-মুশরিকদের সাথে উত্তম আচরণের ওপর জোর দেয়। তাদের কাছে এটাই আল ওয়ালা ওয়াল বারা। আবার অনেকে এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি করে। যেসব ক্ষেত্রে কাফির-মুশরিকদের সাথে আল্লাহ (ﷻ) উত্তম আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন সেটা তারা বেমালুম ভুলে যায়। তারা মনে করে দিনরাত এক করে সব কাফির-মুশরিককে উত্থাপন করে বেড়াতে হবে।

এই দুই ধরনের আচরণই ভুল। সঠিক অবস্থান হলো, প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন তা মেনে চলা। আমাদের ওয়ালা এবং বারার ওপর আমল করতে হবে ঠিক সেভাবে যেভাবে আল্লাহ (ﷻ) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। দলিলসহ কিছু উদাহরণ আলোচনা করা যাক।

কাফিরদের প্রতি দাওয়াহ

আমরা ওয়ালা এবং বারার ওপর আমল করব এবং একই সাথে কাফির-মুশরিকদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করব। এ দুইয়ের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। এ কাজগুলোর মধ্যে কোনো অসামঞ্জস্য নেই। আমাদের আবেগ-অনুভূতি, কাজকর্ম সবই আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী, তাঁর নির্ধারিত সীমার ভেতরে পরিচালিত হয়। প্রজ্ঞা ও হিকমাহর সাথে দাওয়াহ করার সাথে আল ওয়ালা ওয়াল বারার কোনো দ্বন্দ্ব নেই। দাওয়াহ শুধু মানুষের কাছে গিয়ে ইসলামের কথা বলা না। এটি দাওয়াহর একটি অংশ। মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করে তার মনকে ইসলামের প্রতি নরম করাও দাওয়াহর অন্তর্ভুক্ত। এ কাজগুলো কোনোভাবেই আল ওয়ালা ওয়াল বারার মূল আকীদাহর সাথে সাংঘর্ষিক না।

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدْ لَهُم بِآيَاتِي هِيَ أَحْسَنُ

‘তুমি তোমরা রবের পথে প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান করো এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক করো।’ [সূরা আন নাহল, ১৬: ১২৫]

এবং তিনি বলেছেন,

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

‘উত্তম পন্থা ছাড়া কিতাবধারীদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করো না...’ [সূরা আল আনকাবুত, ২৯: ৪৬]

মুসা (ﷺ)-কে ফিরআউনের কাছে পাঠানোর সময় তিনি (ﷻ) বলেছেন,

أَذْهَبْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۖ ٣٤ فَقَوْلَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّاَعْلَهُ يُذَكِّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

‘তোমরা দুজন ফিরআউনের নিকট যাও, কেননা সে তো সীমালঙ্ঘন করেছে। তোমরা তার সাথে নরম কথা বলবে। হয়তো-বা সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে।’ [সূরা ত্বাহা, ২০: ৪৪-৪৬]

এবং তিনি বলেছেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

‘অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের কারণে তুমি তাদের জন্য নম্র হয়েছিলে। আর যদি তুমি কঠোর স্বভাবের, কঠিন হৃদয়সম্পন্ন হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়ত।’ [সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৫৯]

এবং তিনি বলেছেন,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

‘আর আমি তো তোমাকে বিশ্বাসীর জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি।’

[সূরা আল আশ্বিয়া, ২১: ১০৭]

কুরআনে এ রকম আরও অনেক আয়াত রয়েছে যা থেকে বোঝা যায়, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দাওয়াহর ক্ষেত্রে কোমল ছিলেন বা তাঁকে কোমল আচরণ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাসূল (ﷺ) ছিলেন সমগ্র বিশ্ববাসীর প্রতি রহমতস্বরূপ; শুধু মানুষ বা জ্বিনজাতির জন্য না। আল্লাহ তাঁকে মানুষের সাথে উত্তম ভাষায় কথা বলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এমনকি মুসা (ﷺ)-কেও আল্লাহ ফিরআউনের মতো সীমালঙ্ঘনকারীর সাথে উত্তম ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

আহলুল কিতাবের যবেহ খাওয়া

কাফিরদের সাথে বৈধ আচরণের আরেকটি উদাহরণ হলো ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের যবেহ করা পশু খাওয়ার বৈধতা।^[১৮৭]

আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ

‘আহলে কিতাবদের খাদ্য তোমাদের জন্যে হালাল এবং তোমাদের খাদ্য তাদের জন্য হালাল।’ [সূরা আল মায়িদাহ, ৫: ৫]

আহলুল কিতাবের সাথে বিয়ে

আরেকটি উদাহরণ হলো ইহুদী-খ্রিষ্টান নারীদের মুসলিমরা বিয়ে করতে পারবে। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ

‘সচ্চরিত্রা মুমিন নারী এবং তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য হালাল করা হলো...’ [সূরা আল মায়িদাহ, ৫: ৫]

[১৮৭] আহলে কিতাবদের জবাইকৃত পশু খাওয়া এজন্য হালাল করা হয়েছিল, তারা আল্লাহর নামেই জবাই করত; কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপট ভিন্ন। বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্বে। বর্তমানে এরা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র দিয়ে জবাই করে, আল্লাহর নাম নেয় না, এ ছাড়া এখন প্রকৃত আহলে কিতাব পাওয়াও দুষ্কর। অধিকাংশই একধরনের নাস্তিক জীবনযাপন করে। তাই গবেষক আলিমগণ বর্তমান যুগের আহলে কিতাবদের জবাইকৃত পশু খাওয়া জায়েয বলেন না। কেননা, জায়েয হবার শর্ত এখানে পাওয়া যাচ্ছে না।

তবে এ বিষয়টির আরও কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। এ দারসের শেষের দিকে আমরা ইনশা আল্লাহ সেই আলোচনাতে যাব।

উপহার বিনিময়

কাফিরদের সাথে বৈধ আচরণের চতুর্থ উদাহরণ হলো, ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য তাদের উপহার দেয়া বা তাদের দেয়া উপহার গ্রহণ করা। এটা সাধারণভাবে প্রযোজ্য। তবে তাদের কোনো উৎসবের দিন উপহার বিনিময় করা যাবে না। যেমন: ক্রিসমাসের দিন কোনো খ্রিষ্টানের সাথে উপহার বিনিময় করা যাবে না। এর জন্য এ দাওয়াহর অজুহাতও দেয়া যাবে না। একই সাথে মাথায় রাখতে হবে, উপহার হিসেবে এমন কোনো জিনিস আদান-প্রদান করা যাবে না যা হারাম। আমরা একটি আয়াত উল্লেখ করেছিলাম,

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتُلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

‘দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়িঘর থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে এবং তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করছেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন।’ [সূরা আল-মুমতাহিনা, ৬০: ৮]

ইমাম বুখারী (رحمته الله) তাঁর গ্রন্থে একটি পরিচ্ছেদের নাম দিয়েছেন,

بَابُ الْهَدِيَّةِ لِلْمُشْرِكِينَ

‘মুশরিকদেরকে উপহার দান বিষয়ক অনুচ্ছেদ।’

ইমাম বুখারীর দেয়া শিরোনামের পেছনের হিকমাহ নিয়ে আমরা আগে আলোচনা করেছি। ইমাম বুখারী কীভাবে বিভিন্ন পরিচ্ছেদের নামকরণ করেছেন অনেক আলিম সেটা তাদের আলোচনায় উপস্থাপন করেন। বুখারিতে ইবনু উমার (رحمته الله) এর সূত্রে একটি ঘটনার বর্ণনা এসেছে। একবার উমার ইবনুল খাত্তাব (رحمته الله) দেখলেন এক ব্যবসায়ী রেশমের জুব্বা বিক্রি করছে। উমার (رحمته الله) তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে রেশমের জুব্বা কিনতে অনুরোধ করলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যেন বিভিন্ন গোত্র ও সাম্রাজ্যের দূতদের সাথে দেখা করার সময়, কোনো মজলিসে, অথবা জুমআর খুতবার সময় এই চমৎকার রেশমের জুব্বা পরিধান করতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন,

إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَا مَنْ لَا خِلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ

‘এ পোশাক কেবল ওই লোকেরা পরে, যাদের জন্য আখিরাতে কিছু নেই।’

পরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে উপহার হিসেবে কিছু রেশমের পোশাক এল। তিনি তা থেকে একটি উমার (রাঃ)-এর কাছে পাঠালেন। উমার (রাঃ) তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে এসে জানতে চাইলেন,

كَيْفَ أَلْبَسَهَا وَقَدْ قُلْتُ فِيهَا مَا قُلْتُ؟

‘আমি কীভাবে এ পোশাক পরতে পারি; অথচ আপনি পূর্বে এ সম্পর্কে এই এই বলেছেন?’

إِنِّي لَمْ أَكُسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا تَبِيعُهَا، أَوْ تَكْسُوَهَا»، فَأَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ إِلَى أَخٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, ‘আমি তো এটা তোমাকে পরিধান করার জন্য দিইনি। এজন্য দিয়েছি, যাতে তুমি তা বিক্রয় করো বা অন্য কাউকে দিয়ে দাও।’ এরপর উমার (রাঃ) এটি মক্কায় তাঁর ভাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দিলেন—যিনি তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি।^[১৮৮]

লক্ষ করুন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন কাপড়টি তিনি বিক্রি বা উপহার হিসেবে দেয়ার জন্য উমার (রাঃ)-কে দিয়েছেন। সিল্কের পোশাক পরা কোনো মুসলিম পুরুষের জন্য বৈধ না। তাহলে এখানে কাদেরকে উপহার হিসেবে দেয়ার কথা বলা হচ্ছে? কাফিরদের। মূলনীতি হলো, সাধারণভাবে কাফিরদের সাথে উপহার আদান-প্রদান করা জায়েয। তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এটি হারাম হতে পারে।

উমার (রাঃ) সেই রেশমের পোশাকটি মক্কায় থাকা তাঁর ভাইয়ের কাছে পাঠালেন। তাঁর এই ভাই তখনো ইসলাম কবুল করেনি এবং হিজরতও করেনি। অর্থাৎ উমার (রাঃ) তাঁর মুশরিক ভাইকে উপহার দিয়েছিলেন। আর এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না, উমার (রাঃ) ছিলেন আল ওয়ালা ওয়াল বারার প্রতিমূর্তি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা থেকে উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বুঝে নিয়েছিলেন, তিনি কোনো কাফিরকে উপহার হিসেবে এ পোশাক দিতে পারবেন। এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ কাজে তাঁকে কোনো নিষেধ করেননি।

কাফিরদের সাথে দেখা করা

দাওয়াহর উদ্দেশ্যে কাফিরদের সাথে দেখা করা বা তাদের বাসায় যাওয়া বৈধ। সহীহ বুখারীর একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর একজন ইহুদী বালক খাদিম ছিল। সে অসুস্থ হলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে দেখতে গেলেন। তারপর তাঁর মাথার

কাছে বসে বললেন, ‘তুমি ইসলাম গ্রহণ করো।’ সে তাঁর পিতার দিকে তাকাল। তাঁর পিতা বলল আবুল কাসিমের (ؓ) আনুগত্য করো। তখন সে ইসলাম কবুল করল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) খুশি হয়ে বললেন,

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَثَقَّه مِنَ النَّارِ

‘আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ ছেলেটিকে জাহান্নামের আগুন থেকে উদ্ধার করলেন।’

দুটি বর্ণনায় এ ঘটনার কথা এসেছে।^{১১১} দেখুন, এটিও আল ওয়ালা ওয়াল বারার অংশ। এর মধ্যে তাওয়াল্লি এবং মুওয়ালাহ যেমন আছে, তেমনি এ বিষয়গুলোও আছে। কিন্তু কিছু মানুষ শুধু এই শেষের বিষয়গুলো আঁকড়ে ধরতে চায়, আর বাকিটা অস্বীকার করে। তারা ওয়ালা এবং বারার কিছু অংশ নেয় আর কিছু অংশ প্রত্যাখ্যান করে। তারা এই একটি মাত্র অংশকেই ওয়ালা আর বারার মূল বিষয় বানিয়ে ফেলেছে। কাফির-মুশরিকদের সাথে সেভাবেই আচরণ করতে হবে যেভাবে আল্লাহ (ﷻ) আমাদের আদেশ দিয়েছেন। তারা আল্লাহর ওপর মিথ্যারোপ করেছে এবং সীমালঙ্ঘন করেছে। তাদের বিশ্বাসের মাধ্যমে তারা আল্লাহর শত্রুতে পরিণত হয়েছে। তাই আমরা তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করি এবং বিদ্বেষ পোষণ করি। তারা আল্লাহ ছাড়া যা কিছুর ইবাদত করে এবং ইসলাম ছাড়া যা কিছুর অনুসরণ করে, আমরা তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করি এবং বিদ্বেষ পোষণ করি। এ বিষয়গুলো আমাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে থাকতে হবে। একই সাথে তাদের মধ্যে যারা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করেনি, তাদের সাথে আমাদের আচার-আচরণ এবং লেনদেন হবে সংযত; ঠিক যেমনটি আল্লাহ (ﷻ) আদেশ করেছেন।

কাফিরদের সাথে আচরণ

আল-কাররাফি (ؒ) তাঁর আল-ফুরুক গ্রন্থে বলেছেন, ইসলামী শাসনের অধীনে বসবাস করা কাফিরদের মুসলিমদের ওপর অধিকার আছে যেগুলো নিশ্চিত করা মুসলিমদের দায়িত্ব। কারণ এ ধরনের কাফিররা আমাদের প্রতিবেশী, তারা আমাদের নিরাপত্তায় এবং আমাদের যিন্মায় আছে। এই নিরাপত্তা তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) দিয়েছেন। কাজেই এই নিরাপত্তা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। আমরা তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করব, কিন্তু একই সাথে আমাদের অন্তরগুলোকে মাওয়াদ্দাহ থেকে মুক্ত রাখব। লক্ষ রাখতে হবে, আমাদের অন্তর যেন তাদের প্রতি মাওয়াদ্দাহ দ্বারা কলুষিত না হয়।

আল-কাররাফি (ﷺ) বলেছেন, কাফিরদের সাথে লেনদেন ও সম্পর্কের কারণে কারও অন্তরে যদি মাওয়াদ্বাহ তৈরি হয়—সে যদি কাফিরদের সম্মানিত মনে করে অথবা তাদের কুফর বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানকে পবিত্র মনে করতে শুরু করে—তাহলে সময়ের সাথে তা অত্যন্ত বিপজ্জনক রূপ নেবে। অন্তরের একটি অংশ যদি এভাবে কলুষিত হয়, তাহলে ধীরে ধীরে তা একসময় পুরো অন্তরকেই গ্রাস করে ফেলবে। একসময় তা মুওয়ালাহতে পরিণত হবে।

তিনি আরও বলেছেন, যেসব বিষয় কাফিরদের সাথে এবং তাদের বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ও বিদ্বেষের মধ্যে ত্রুটি সৃষ্টি করে না, সেগুলো জায়েয। তারপর এমন বৈধ আচরণের বিভিন্ন উদাহরণ তিনি দিয়েছেন। এ ধরনের উদাহরণগুলো কিছুক্ষণ আগে আমরা আলোচনা করেছি। একই সাথে তিনি কাফিরদের বৃদ্ধদের সাথে কোমল আচরণ এবং ক্ষুধার্তদের খাবার দেয়ার কথা বলেছেন। একই সাথে এটাও বলে দিয়েছেন যে, অন্তরের দিকটাতে আপস করা যাবে না।

তাদের গরিব-দুস্থদের পোশাক দিন, সহমর্মিতা ও দয়ার সাথে তাদের সাথে কথা বলুন। কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু তা যেন ভয় কিংবা হীনম্মন্যতার কারণে না হয়। আল-কাররাফি (ﷺ) এটাও বলেছেন, কাফির-মুশরিক প্রতিবেশী যদি কোনো মুসলিমের ক্ষতি করে—তাহলে বাধা দেয়ার এবং শাস্তি দেয়ার পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও—ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য তাকে ক্ষমা করে দেয়া কিংবা তার সাথে নরম আচরণ করা জায়েয। তবে, এই নমনীয়তা ভয় বা হীনম্মন্যতার কারণে হলে হবে না। এটা হতে হবে ইসলামের দিকে আহ্বান করার জন্য।

আহলুয যিম্মাহ^[১১০]; অর্থাৎ ইসলামী শাসনের অধীনে বসবাস করা কাফিরদের প্রতি

[১১০] আহলুয যিম্মাহ বিষয়টা পরিষ্কারভাবে বোঝা দরকার। কেননা, হাদীসে যাদের অধিকার রক্ষা করতে বলা হয়েছে তারা আহলুয যিম্মাহ বা যিম্মি। এটা একটা পরিভাষা এর সংজ্ঞা হচ্ছে,

أَهْلُ الذِّمَّةِ هُمُ الْكُفَّارُ الَّذِينَ أُقْرِئُوا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ عَلَى كُفْرِهِمْ بِالتَّيْمَانِ الْحَرْبِيَّةِ وَتُقَوِّدُ أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ فِيهِمْ
'আহলুয যিম্মাহ হচ্ছে সেসকল কাফির, যারা দারুল ইসলাম অর্থাৎ ইসলামী আইনের শাসন আছে এমন ভূখণ্ডে তাদের কুফরি বিশ্বাস পালন করে অবস্থান করে; তবে তারা জিয়া আদায় করে এবং তাদের ওপর ইসলামী বিধানাবলির কার্যকর হওয়াকে মেনে নেয়।'—জাওয়াহিরুল ইকলীল : ১/১০৫; কাশশাফুল ফিনা : ১/৭০৪; আল মাওসুয়াতুল ফিকহিয়াহ আল কুওয়াইতিয়াহ : ৭/১০৪

এর পাশাপাশি আরেকটি শব্দ আসে, তা হলো মু'আহাদ (معاهد)। এর মানে হচ্ছে চুক্তিবদ্ধ। অর্থাৎ ওই কাফির যার সাথে ইসলামী শাসন কার্যকর আছে এমন দেশের মাঝে চুক্তি রয়েছে যে, মুসলিমরা তাদের ওপর আক্রমণ চালাবে না আর তারাও মুসলিমদের ওপর আক্রমণ চালাবে না। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়, আহলুয যিম্মাহ মু'আহাদ এদেরকে দেয়া নিরাপত্তা বা আমান চিরস্থায়ী নয়। মু'আহাদের সাথে নির্দিষ্ট চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে আমানও লুপ্ত হয়ে যায়। এ ছাড়া যিম্মি, মু'আহাদ এরা যদি ইসলাম ও ইসলামী হুকুমাতের জন্য ক্ষতিকর কোনো কর্মে লিপ্ত হয়, তাহলেও নিরাপত্তা

আচরণের সীমানা নিয়েও আলিমগণ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছেন। কারণ, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ বিষয়টি নিয়ে বলেছেন। যেমন বুখারীতে কিতাবুদ দিয়াতে একটি পরিচ্ছেদ আছে,

بَابُ إِثْمِ مَنْ قَتَلَ ذِمِّيًّا بِغَيْرِ جُرْمٍ

বিনা অপরাধে যিস্মিকে হত্যা করার গুনাহ বিষয়ক পরিচ্ছেদ।

ইমাম বুখারী এখানে একটি হাদীস এনেছেন। এ হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

مَنْ قَتَلَ تَفْسًا مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنْ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

‘যদি কোনো (মুসলিম বিনা কারণে) মুসলিমদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোনো অমুসলিমকে হত্যা করে, তাহলে সে জান্নাতের সুব্রাণ পাবে না; যদিও জান্নাতের ঘ্রাণ চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়।’[১৯১]

ইসলামী শাসনের অধীনে থাকা কাফিরদের নিরাপত্তার ব্যাপারে কেন এত জোর দেয়া হয়েছে? কারণ, তারা যখন ইসলামী শাসনের অধীনে থাকে তখন তারা থাকে দুর্বল ও অসহায় অবস্থায়। কিন্তু যেখানে কুফরি শাসন চালু থাকে সেখানে তারা থাকে পরিবার-পরিজন, বন্ধুবান্ধব পরিবেষ্টিত শক্তিশালী অবস্থায়।

মুশরিকদের ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য সাহায্যে কেলাম (ﷺ) তাদেরকে দান-খয়রাত দিতেন। ইবনু আব্বাস (ﷺ) ও ইবনু উমার (ﷺ) এভাবে দান করতেন। মুসনাদু আহমাদ এবং তিরমিযির একটি বিখ্যাত হাদীসে এসেছে, একবার এক ইহুদী মহিলা, আইশাহ (ﷺ)-এর কাছে এসে কিছু সাদাকা চাইলো। আইশাহ (ﷺ) তাকে কিছু দান করার পর ইহুদী মহিলাটি বলল, আল্লাহ আপনাকে কবরের আযাব থেকে

লুপ্ত হয়। যেমন ইমাম হাসকাফী (ﷺ) উল্লেখ করেছেন,

(ويؤدب الذمي ويعاقب على سبه دين الاسلام أو القرآن أو النبي (ص)).

‘যিস্মি ধীন আল ইসলাম, কুরআন বা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালিগালাজ বা অবমাননা করলে তাকে শিক্ষা দেয়া হবে ও সাজা দেয়া হবে।’

ইমাম আইনী (ﷺ) বলেছেন, ‘অবমাননার ক্ষেত্রে আমার নিকট গ্রহণযোগ্য মত হলো, তাকে হত্যা করা হবে।’ ইমাম কামাল ইবনু হুমাম (ﷺ)-ও এই মত দিয়েছে। [আদ দুররুল মুখতার, পৃষ্ঠা: ৩৪৩]

ইমাম ইবন আব্বাদীন শামী (ﷺ) কী সাজা হবে এর সম্পর্কে বলেন, وَعَاقِبَةُ بِالْقَتْلِ

‘তার সাজা হবে মৃত্যুদণ্ড।’-রাদ্দুল মুহতার : ৪/২১৪

যিস্মি ও মু’আহাদের আমান রহিত হওয়া সম্পর্কিত এই আলোচনা সকল মাযহাবের কিতাবেই রয়েছে।

ইমাম ইবন কুদামা (ﷺ)-এর আল মুগনিতে কিতাবুল জিয়ইয়ায় এ সম্পর্কিত আলোচনা আছে, বিশেষ করে (وَمَنْ تَقَضَّى الْعَهْدَ، بِمُخَالَفَةِ شَيْءٍ، يَمَّا صُوِّلُوا عَلَيْهِ، حُلَّ ذِمَّتِهِ وَمَالُهُ) বিশেষ করে

[১৯১] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ৬৯১৪

রক্ষা করুন। ইহুদী মহিলার মুখে এমন দু'আ শুনে আইশাহ (رضي الله عنها) খুব অবাক হলেন এবং রাসূল (ﷺ)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূল (ﷺ) বললেন,

اسْتَعِيدُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَإِنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ حَقٌّ

‘আল্লাহর কাছে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাও, কেননা নিশ্চয় কবরের আযাব সত্য।’^[১৯২]

ইহুদী মহিলাকে দান করা নিষিদ্ধ হলে রাসূল (ﷺ) আইশাহ (رضي الله عنها)-কে তা জানিয়ে দিতেন। কিন্তু তিনি (رضي الله عنها) কিছু বলেননি-নিষেধ করেননি। এবং আমরা জানি কোনো ব্যাপারে তাঁর (ﷺ) নীরবতাই হলো সম্মতি। তাই কাফিরদের সাথে কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনা অনুযায়ী ইনসাফপূর্ণ আচরণ করা তাওয়াল্লি বা মুওয়ালাহর নীতির সাথে সাংঘর্ষিক না।

আমি অ্যামেরিকাতে বড় হয়েছি। আমরা বিভিন্ন এলাকা, পাড়ায় থেকেছি। এমন কোনো প্রতিবেশীর কথা আমার মনে পড়ে না, যারা একসময় আল্লাহর ইচ্ছায় আমার বাবার কাছে ইসলাম গ্রহণ করেনি। আলহামদুলিল্লাহ। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময়ের কথা। আমাদের একজন বৃদ্ধ প্রতিবেশী ছিলেন। একসময় অ্যামেরিকান নেভিতে ছিলেন, ততদিনে রিটায়ার করেছেন। উনি আমার বাইসাইকেল ঠিক করে দিতেন। অ্যামেরিকায় ইসলাম তখন এখনকার মতো এতটা পরিচিত ছিল না। মুসলিম বা ইসলাম সম্পর্কে জানে, এমন মানুষ সচরাচর চোখে পড়ত না। সেই বৃদ্ধ প্রতিবেশী, আলহামদুলিল্লাহ, ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আমার মনে আছে, তার মৃত্যুশয্যায় আমার বাবা তার কাছছাড়া হননি। এই সৌভাগ্যবান মানুষটি মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে ইসলাম গ্রহণ করেন। একদম শেষ মুহূর্তে যখন তার জবান বন্ধ হয়ে গেল তখন বাবা তাঁর হাত ধরে বললেন, আপনি কেমন বোধ করছেন? যদি আনন্দ অনুভব করেন, তাহলে আমার হাতে চাপ দিন। উনি বাবার হাতে আলতো করে চাপ দিচ্ছিলেন। সুবহান আল্লাহ! উনার মৃত্যুর পর পাড়ার আরও কিছু মুসলিমকে নিয়ে বাবা তাঁকে শরীয়াহর নিয়ম অনুযায়ী দাফন করেন।

এটা তো কয়েক দশক আগের কথা। কয়েক সপ্তাহ আগের একটা ঘটনা বলি। আমি শুক্রবারে বাবার বাসায় ঢুকছিলাম। পাশের বাড়ির বৃদ্ধা মহিলা বললেন, তোমার বাবাকে আমার ধন্যবাদ জানিয়ে। আমি অবাক হয়ে এর কারণ জানতে চাইলাম। তিনি

[১৯২] প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনাটি বিভিন্ন হাদীসের কিতাবে একাধিক সনদে একাধিক মতনের বর্ণিত হয়েছে এবং শাইখ (হাফিযাউল্লাহ) সবগুলো মিলিয়ে বর্ণনা করেছেন। দেখুন : মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং : ২৪৫২০, আল্লামা শু'আইব আরনাউত্ (رحمته الله عليه)-এর মতে ইমাম বুখারী ও মুসলিমের (رحمته الله عليه) শর্তে সহীহ; সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ১৩৭২; সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ২৬৬৩

বললেন, তোমার বাবা প্রতি শুক্রবার আমার দরজার সামনে কিছু কাঁচাবাজার আর গ্রোসারি রেখে যান।

ওয়াল্লাহি! আমি বা আমাদের পরিবারের অন্য কেউই এ ব্যাপারে কিছুই জানতাম না। অথচ বাবা অনেকদিন ধরে এ কাজ করছেন।

আমি সেই বৃদ্ধার সাথে আরও কিছুক্ষণ কথা বললাম। তিনি একদম একা থাকেন। নিজের পরিবারের লোকেরাই তাঁকে দেখতে আসে না। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। দ্বীন নিয়ে শেখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বাবা দীর্ঘদিন এ বৃদ্ধা মহিলার জন্য বাজার করে দিয়েছেন। কাউকে না জানিয়ে। এই দয়া, এই দাওয়াহ কি আল ওয়ালা ওয়াল বারার সাথে সাংঘর্ষিক?

কখনো না। এ জন্য আল ওয়ালা ওয়াল বারার ব্যাপারে সঠিক আকীদাহ রাখতে হলে, এর তিনটি প্রকারকে সঠিকভাবে বুঝতে হবে। ধারণ করতে হবে। কোনোটা বাদ দেয়া যাবে না।

- তাওয়াল্লি,
- মুওয়ালাহ,
- কাফিরদের সাথে জায়েয আচরণ,

এ তিনটি মিলেই আল ওয়ালা ওয়াল বারা।

আল ওয়ালা ওয়াল বারার কেন্দ্র হলো ভালোবাসা ও ঘৃণা

আল ওয়ালা ওয়াল বারার কেন্দ্র হলো ভালোবাসা ও ঘৃণা। পুরো কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্য কাউকে ঘৃণা করার কনসেপ্টের ওপর।

দেখুন রাসূল (ﷺ) কী বলেছেন,

وَلَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ، وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

‘তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার সন্তান, বাবা-মা এবং অন্যান্য সকল কিছুর চাইতে আমাকে বেশি ভালোবাসবে।’^[১৯৩]

আমাদের ভালোবাসা আবর্তিত হবে আল্লাহকে কেন্দ্র করে। আমাদের ভালোবাসার মাপকাঠি হবেন আল্লাহ। আর নবী (ﷺ)-কে ভালোবাসা আল্লাহকে ভালোবাসার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ (ﷻ) আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

‘বলো, ‘যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’ [সূরা আলে ইমরান, ৩: ৩১]

যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে রাসূল (ﷺ)-এর অনুসরণ করো। স্পষ্ট কথা। ভালোবাসার উল্টো পিঠে থাকে ঘৃণা। যখন ভালোবাসার প্রশ্ন আসে তখন ঘৃণা কিংবা বিদ্বেষের কথাও চলে আসে। যে আল্লাহকে ভালোবাসে তাকে অবশ্যই ওইসব লোকদের ঘৃণা করতে হবে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-কে ঘৃণা করে। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর শত্রু, তারা আমাদেরও শত্রু। তারাই ঘৃণা ও বিদ্বেষ পাবার সর্বাধিক উপযুক্ত।

ঈমানের সবচেয়ে শক্তিশালী বন্ধন হলো আল ওয়ালা ওয়াল বারা। মুসনাদু আহমাদে বর্ণিত হয়েছে, মুজাহিদ (رحمته الله) বলেছেন,

أَوْثَقُ عُرَى الْإِيمَانِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبَغْضُ فِيهِ

‘ঈমানের সবচেয়ে শক্তিশালী বন্ধন হলো আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্যই ঘৃণা করা।’^[১৯৪]

এখানে একটি কথা বলে রাখা দরকার। এ বক্তব্যটি সহীহ সনদে মুজাহিদ (رحمته الله) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তবে আল বারা ইবনু আযিবের সূত্রে এর সনদ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পর্যন্ত পৌঁছে। অর্থাৎ এ কথাটি মুজাহিদ (رحمته الله) বলেছেন তা তো নিশ্চিত। তবে আরেকটি সূত্রে এটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা হিসেবেও এসেছে। তবে সেই সনদের ব্যাপারে কিছু কথা আছে।^[১৯৫]

হৃদয়ে আল ওয়ালা ওয়াল বারা প্রতিষ্ঠা করা ঈমান চাঙা করার সবচেয়ে শক্তিশালী উপায়গুলোর অন্যতম। হৃদয়ে যদি ঈমান কিছুটা টালমাটাল হয়ে যায়, তাহলে আল ওয়ালা ওয়াল বারার আকীদাহ চর্চার মাধ্যমে তা দৃঢ় হয়। যখন আপনার ভালোবাসার ভিত্তি হবে আল্লাহ এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, তখন অবশ্যই আপনি ঈমানের সৌন্দর্য ও মধুর স্বাদ অনুভব করতে পারবেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের সেই গ্যারান্টি দিয়ে গেছেন। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) বলেছেন,

[১৯৪] ইবনু আবি শাইবাহ, আল ঈমান, হাদীস নং : ১১১; ইমাম মুহাম্মাদ বিন নাসর (رحمته الله), তা’যিমু ক্বাদরিস সালাহ, হাদীস নং : ৪৪০

[১৯৫] বারা বিন আযিব (رحمته الله)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীস হিসেবে এসেছে মুসনাদু আহমাদে, হাদীস নং : ১৮৫২৪। আল্লামা শু’আইব আরনাউত্ব (رحمته الله)-এর মতে শাহেদের জন্য হাসান; আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (رحمته الله)-এর মতেও হাসান।-সহীহুত তারগিব, হাদীস নং : ৩০৩০

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَذَّفَ فِي النَّارِ

‘যার অন্তরে তিনটি জিনিস থাকবে সে ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পারবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল দুনিয়ার সবকিছুর চাইতে তার নিকট অধিক প্রিয় হবে। দ্বিতীয়টি, যখন কোনো লোককে ভালোবাসলে তা কেবল আল্লাহর জন্যই হবে। তৃতীয়টি, পুনরায় কুফরিতে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতো অপছন্দ করবে।’^[১৯৬]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন যে, এই তিনটি গুণের অধিকারী হলে আমরা ঈমানের মধুর স্বাদ অনুভব করতে পারব।

হুব (حب) বা ভালোবাসা হলো ওয়ালা এবং বারার প্রাণ, নিঃশর্ত আনুগত্যের মূলভিত্তি। একইভাবে ‘বারা’ বা সম্পর্কচ্ছেদের নিউক্লিয়াস হলো কুফর ও কাফিরের প্রতি ঘৃণা। আল্লাহর সাথে অবাধ্যতা এবং অবাধ্যতাকারীর প্রতি ঘৃণা। কোনো মানুষের সাথে বারা করতে হলে তাকে এবং তার কুফরকে আপনার অবশ্যই ঘৃণা করতে হবে। ভালোবাসা বা ঘৃণা হলো আল ওয়ালা ওয়ালা বারার নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্র। আল ওয়ালা ওয়ালা বারা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা ছাড়া ঈমান পরিপূর্ণ হবে না। মুস্তাদরাক, আবু দাউদ, আহমাদ, আত-তিরমিযি এবং সহীহ আল জামিতে এসেছে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

من أحبَّ الله ، وأبغضَ الله ، وأعطى الله ، ومنع الله ، فقد استكمل الإيمان

‘যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসে এবং আল্লাহর রাহে ঘৃণা করে, যে আল্লাহর জন্য দান করে এবং আল্লাহর জন্য বিরত থাকে—সে নিজের ঈমানকে পরিপূর্ণ করেছে।’^[১৯৭]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ঈমান পরিপূর্ণ হতে হলে আল্লাহর রাহে ঘৃণা করতে হবে। কিন্তু আজকে আল্লাহর রাহে ঘৃণা করাকে অধিকাংশ লোক দ্বীন ইসলাম থেকে বাদ দিতে চায়। আল্লাহর জন্য ঘৃণা বা সম্পর্কচ্ছেদ করাকে কেউ যদি ইসলামের অংশ মনে না করে, তাহলে ইসলামের সঠিক বুঝ তার নেই। আল্লাহর নবী (ﷺ)-এর কথা হলো দলিল। যদি আল্লাহর রাহে ঘৃণা করা আমার-আপনার ইসলামের অংশ না হয়, তাহলে অবশ্যই আমরা ভুল পথে আছি। ইসলামের সঠিক বুঝ আমাদের কাছে নেই।

[১৯৬] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ১৬, ৬৯৪১

[১৯৭] সুনানু আবু দাউদ, হাদীস নং : ৪৬৮১; আল্লামা শু’আইব আরনাউত্ব (رحمته الله)-এর মতে হাদীস সহীহ সনদ হাসান; আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (رحمته الله)-এর মতে সহীহ।-সহীহুল জামি, হাদীস নং : ৫৯৬৫

আল ওয়ালা ওয়াল বারা ব্যতীত ঈমান কখনোই পূর্ণতা পায় না। ওয়ালা এবং বারা নিয়ে ইবনু তাইমিয়াহ (رحمہ اللہ) এত এত আলোচনা করেছেন, সেগুলো উল্লেখ করতে গেলে রাতের পর রাত কাবার হয়ে যাবে। শুধু তাঁর একটি বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করা যাক। ইবনু তাইমিয়াহর এ উক্তি পড়ার সময় ইজমা নিয়ে আমাদের আলোচনা মাথায় রাখবেন। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ (رحمہ اللہ) বলেছেন,

وَمَنْ لَمْ يُحَرِّمِ التَّدْيِينَ - بَعْدَ مَبْعَثِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِدِينِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى بَلْ مَنْ لَمْ يُكْفِرْهُمْ وَيَبْغِضْهُمْ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ.

‘নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর রিসালাতের পর যে ব্যক্তি (ইসলাম ব্যতীত) অন্য কোনো ধর্ম (যেমন: ইহুদী ও খ্রিষ্টধর্মের) অনুসরণকে হারাম মনে করে না, এবং যে ব্যক্তি মুসলিম ব্যতীত অন্য ধর্মের অনুসারীদের কুফফার মনে করে না, তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না—সে মুসলিমদের ঐকমত্যে নিজেই মুসলিম নয়।’^[১৯৮]

নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর দ্বীন ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন অনুসরণ করা যাবে না। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি সহজ করে বোঝানো যাক।

আপনি আপনার বাবাকে ভালোবাসেন। সারা জীবন ধরে তিনি আপনার জন্য যা করেছেন তার জন্য আপনি কৃতজ্ঞ। ধরুন, তিনি আপনাকে তার একটি দোকান দেখাশোনা করতে বললেন। আপনার বাবার নিজের একটি দোকান আছে। আর তিনি আপনার জন্য একই রকম আরেকটি দোকান খুলে দিলেন।

এখন মনে করুন একজন কর্মচারী দুজনের দোকানেই কাজ করে। এই লোক আপনার বাবার সাথে খুবই বাজে ব্যবহার করে। তাকে অভিশাপ দেয়। অসম্মান করে, বেয়াদবি করে, ক্যাশ থেকে টাকা সরায়। নানাভাবে তার ক্ষতি করে। অন্যদিকে আপনার সাথে তার আচরণ খুবই অমায়িক। আপনার সাথে সে খুব ভালো ব্যবহার করে। আপনার সব কাজ ঠিকমতো করে দেয়। স্যার স্যার করে। আপনার বাবার কাছে সে একজন মিথ্যাবাদী, সীমালঙ্ঘনকারী, বেয়াদব এবং প্রতারক। কিন্তু আপনার কাছে সে ভালো।

এখন এ লোকের ব্যাপারে আপনার মনোভাব কেমন হবে? আপনার সাথে ভালো আচরণ করার কারণে আপনি কি আপনার বাবার সাথে তার বেয়াদবি আর প্রতারণাকে মেনে নেবেন? আপনি কি ভাববেন, ‘বাবার সাথে যা ইচ্ছে করুক, আমার কী! আমার সাথে তো তার আচরণ ভালো!’

আপনি কি এই লোককে পছন্দ করবেন? করতে পারবেন? নাকি বাবার প্রতি ভালোবাসার কারণে এই লোককে আপনি অপছন্দ করবেন? তার প্রতি রাগ, ক্ষোভ,

ঘৃণা পোষণ করবেন? এই লোককে অপছন্দ করা আসলে আপনার বাবার প্রতি আপনার ভালোবাসার অন্তর্ভুক্ত।

বিষয়টা এতটাই সহজ সরল। কিন্তু এই সহজ বিষয়টা বোঝা অধিকাংশের জন্য সহজ না। এটা কেবল তাঁদের জন্য সহজ যাদেরকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেছেন।

একজন কাফির আপনার সাথে ভালো ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু সে আল্লাহর সাথে নাফরমানি করছে। সে আল্লাহকে অস্বীকার করছে, কিংবা তাঁর ওপর মিথ্যা আরোপ করছে, কিংবা তাঁর সাথে শরীক করছে। আল্লাহর প্রতি আপনার আনুগত্য, আপনার ভালোবাসা যদি শক্ত হয়, তাহলে আপনি কোনো দিন এমন লোককে ভালোবাসা তো দূরে থাক, অলস্বল্প পছন্দও করতে পারবেন না।

কাকে ভালোবাসবেন কাকে ঘৃণা করবেন, কাকে পছন্দ করবেন কাকে অপছন্দ করবেন সবকিছু আল্লাহ ঠিক করে দিয়েছেন। তিনি (ﷻ) বলেছেন,

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

‘আর যারা কুফরি করে তারা একে অপরের বন্ধু। যদি তোমরা তা না করো (অর্থাৎ মুমিনরা একে অপরের সাহায্যে এগিয়ে না আসো) তাহলে দুনিয়াতে মহাবিপর্ষয় দেখা দেবে।’ [সূরা আনফাল, ৮: ৭৩]

এই আয়াতটির দিকে লক্ষ করুন। আল্লাহ (ﷻ) বলছেন,

‘যারা কুফরি করে তারা একে অপরের বন্ধু। যদি তোমরা তা না করো (অর্থাৎ তোমরা পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে এগিয়ে না আসো)...’

এ কথা কাদের বলা হচ্ছে? এ কথা কাদের জন্য?

আপনার জন্য। আমার জন্য। মুসলিমদের জন্য। মুসলিমরা যদি পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত ও অনুগত না হয়, তাহলে কী হবে? আল্লাহ (ﷻ) জানিয়ে দিয়েছেন,

‘তাহলে দুনিয়াতে মহাবিপর্ষয় দেখা দেবে।’

আজ ফিতনা, ফাসাদ, যুলুমে দুনিয়া ভরে গেছে। কাফির ও মুশরিকরা বিজয়ী অবস্থায় আছে। এর সমাধান কী? সমাধান দেয়া আছে ওই কিতাবে যা আমরা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেছি। মুসলিমদের পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত হতে হবে। অনুগত হতে হবে। আল ওয়ালা ওয়ালা বারার সঠিক আকীদাহ পালন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

কুফর ও কাফিরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ

আজ অনেকে কুফর ও কাফিরের প্রতি ঘৃণাকে ইসলাম থেকে, কুরআন ও সুন্নাহ থেকে মুছে দিতে চায়। আবার অনেকে এর অর্থ বদলে দিতে চায়। অনেকে বলে,

‘বারা-অর্থাৎ সম্পর্কচ্ছেদ-হলো শুধু ওই কাফিরদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা, যারা মুসলিমদের ওপর গণহত্যা চালায়। কেবল ওইসব কাফিরের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে, যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।’

এটা সুস্পষ্ট ভ্রান্তি এবং আকীদাহর ক্ষেত্রে স্পষ্ট গোমরাহি। মুনাফিক, কুয়াইবিদাহ, মূর্থ এবং ইন্টারফেইথের সাথে যুক্ত লোকেরা এই ধরনের কথা বলে। যারা বলে সম্পর্কচ্ছেদ ও বিদ্বেষ কেবল মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত কাফিরদের ক্ষেত্রে হবে, তারা আসলে কী বলছে দেখা যাক।

তারা বলছে, কাফির যদি কোনো মুসলিমের ক্ষতি করে, তার পরিবার, সম্পদ কিংবা ভূখণ্ডের ওপর আগ্রাসন চালায়, তাহলে সেটা গুরুতর ব্যাপার। তখন সেই কাফিরের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে। কিন্তু সে যখন আল্লাহর সাথে শিরক করে, আল্লাহর ওপর মিথ্যারোপ করে, কিংবা আল্লাহকে অস্বীকার করে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর বিরোধিতা করে-তখন তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদের প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ এই লোকগুলোর কাছে আল্লাহর বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘনের চেয়ে মুসলিমের বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘন গুরুতর অপরাধ!

যারা এভাবে ‘বারা’-কে সংজ্ঞায়িত করে, তারা মূলত বলছে, আমাদের ব্যাপারে যে সীমালঙ্ঘন করে, আমরা তার প্রতি বিদ্বেষ রাখি। তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করি। কিন্তু যে আল্লাহর ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করে, তার প্রতি আমাদের বিদ্বেষ নেই। তার সাথে সম্পর্ক রাখা যাবে।

যারা তাওহিদ এবং মুওয়াহহিদিনকে (তাওহিদবাদীদের) ভালোবাসে, শিরক ও মুশরিকদের প্রতি বিদ্বেষ তাঁদের হৃদয়ে সহজাতভাবে কাজ করে। আপনার মা-বাবাকে আপনি ভালোবাসেন। যে আপনার মাকে গালি দেয় আপনি সহজাতভাবে তার প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ অনুভব করবেন। তার সাথে কোনো ধরনের সম্পর্ক আপনি রাখবেন না। আপনি যদি আপনার সম্পদকে ভালোবাসেন, তাহলে যারা আপনার সম্পদের ক্ষতি করার চেষ্টা করে তাদের সাথে আপনি সম্পর্কচ্ছেদ করবেন। আপনি আপনার স্ত্রীকে ভালোবাসেন। যে আপনার স্ত্রীর ব্যাপারে, তার চরিত্র ও সম্মানের ব্যাপারে কুৎসা রটায়, আপনি সহজাতভাবে তাকে ঘৃণা করবেন।

ভালোবাসার স্ত্রীকে যদি কেউ ‘বেশ্যা’ বলে গালি দেয়, তাহলে এমন কোনো পুরুষ কি আছে, যে ওই গালি দেয়া লোককে ভালোবাসবে? এমন কোনো পুরুষ আছে, যে তার স্ত্রীকে বলবে, ‘ওই লোক তোমাকে পতিতা বলেছে, কিন্তু আমি তাকে ভালোবাসি। আমি তার বিরুদ্ধে যাব না’।

যে পুরুষ এমন কথা বলে তাকে আপনারা কী বলবেন? আর তার স্ত্রীর প্রতিক্রিয়া

কী হবে? স্ত্রী বাস্পপেটরা গুছিয়ে বাপের বাড়ি চলে যাবে। আর বলবে, তুমি দিনরাত যে ভালোবাসার কথা বলো, তা আসলে নির্জলা মিথ্যে। তোমার কথা আর তোমার ভালোবাসার কোনো মূল্যই নেই।

আপনার ভালোবাসার সন্তানের ক্ষতি যে করতে চায়, আপনি কি তাকে ভালোবাসতে পারবেন? তার সাথে সম্পর্ক রাখতে পারবেন? তার বন্ধু হতে পারবেন? নিজের মা-বাবা, সম্পদ, সম্মান, পরিবার, সন্তান কারও ব্যাপারে আপনি ছাড় দেবেন না। কিন্তু আল্লাহর ব্যাপারে ছাড় দেবেন? রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ব্যাপারে ছাড় দেবেন? কোন মুখে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসার দাবি করেন? সহীহ আল-বুখারীতে এসেছে,

يَسْتَمْنِي ابْنُ آدَمَ، وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَمْنِي، وَيُكَذِّبُنِي وَمَا يَنْبَغِي لَهُ، أَمَا شَتْمُهُ فَقَوْلُهُ: إِنَّ لِي وَلَدًا، وَأَمَا تَكْذِيبُهُ فَقَوْلُهُ: لَيْسَ يُعِيدُنِي كَمَا بَدَأُنِي.

হাদীসে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ (ﷻ) বলছেন,

‘আদমসন্তান আমাকে গালি দেয়, অথচ আমাকে গালি দেয়া তার উচিত না। আর সে আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, অথচ এটা করা তার উচিত না। আমাকে গালি দেয়া হচ্ছে তার এই উক্তি যে, আমার নাকি সন্তান আছে। আর তার মিথ্যা মনে করা হচ্ছে তার এ উক্তি, যেভাবে আল্লাহ আমাকে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন সেভাবে কখনো তিনি আমাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন না।’[১৯৯]

কীভাবে একজন মুসলিম ওই কাফিরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ না করে থাকতে পারে, যারা আল্লাহকে অভিশাপ দেয় এবং তাঁর একত্ববাদে শরীক করে? স্ত্রীকে কেউ গালি দিলে মানুষ তার সাথে সব সম্পর্ক শেষ করে ফেলে। যারা আল্লাহকে গালি দেয় তাদের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান কেমন হওয়া উচিত? আজ যারা নিজেদের মুসলিম দাবি করে, তাদের অনেকে তুলনায় জড়বস্তুদের মধ্যে আল ওয়ালা ওয়াল বারার বোধ বেশি কাজ করে। আল্লাহ (ﷻ) আমাদের জানিয়েছেন,

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۚ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۚ ٨٨ تَكَادُ السَّمُوتُ يَنْفَطِرُنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۚ ٨٩ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۚ ٩٠

‘আর তারা বলে, ‘পরম করুণাময় সন্তান গ্রহণ করেছেন।’ অবশ্যই তোমরা এক জঘন্য বিষয়ের অবতারণা করেছ। এতে আসমানসমূহ ফেটে পড়ার, যমীন বিদীর্ণ হওয়ার এবং পাহাড়সমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হবে। কারণ, তারা পরম করুণাময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করে।’ [সূরা মারইয়াম, ১৯: ৮৮-৯১]

যে কথায় নভোমণ্ডল ফেটে পড়ার, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হবার আর পাহাড়-পর্বত চূর্ণ-বিচূর্ণ হবার উপক্রম হয়, সেই কথা আপনার গায়েই লাগে না? সেই কথা আপনার কাছে গুরুতর কিছু মনে হয় না? যারা এমন জঘন্য কথা বলে তাদের সাথে আপনি বন্ধুত্ব করেন, তাদেরকে ভালোবাসেন? তারপর আবার মুসলিম হবার, আল্লাহকে ভালোবাসার দাবি করেন? কীভাবে?

এ ব্যাপারে ইমাম আহমাদ (رحمہ اللہ), ইবনু তাইমিয়াহ (رحمہ اللہ) এবং অন্যান্য আলিমগণের খুব জোরালো বক্তব্য আছে যা বিস্তারিত আলোচনা করার সময় আমাদের হবে না। আমি এ বক্তব্যগুলোর সারমর্ম তুলে ধরার চেষ্টা করছি। আর এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার আসলে দরকার নেই। কারণ আল ওয়ালা ওয়াল বারার আকীদাহ নিয়ে যাদের সমস্যা, যারা এই নীতি মেনে নিতে পারে না, তাদের সমস্যা আসলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা নিয়েই। তারা কুরআন ও সুন্নাহর কথা মেনে নিতে পারছে না। যাদের আল ওয়ালা ওয়াল বারা নিয়ে আপত্তি আছে, তাদের আপত্তি আসলে কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য নিয়ে। শরীয়াহ নিয়ে। কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্যের ওপর এরা নিজেদের অপরিণত ও সীমাবদ্ধ বুদ্ধিকে প্রাধান্য দিয়েছে। প্রথম প্রজন্মের মতো করে তারা কুরআন ও সুন্নাহকে বুঝতে ও মানতে চায় না। নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো কুরআন-সুন্নাহকে ব্যাখ্যা করতে চায়।

মানুষের মন যেমন নিজের খেয়ালখুশি অনুযায়ী চলতে চায়, তেমনি আকল বা বুদ্ধিও খেয়ালখুশি অনুযায়ী চলতে চায়। মনের খেয়ালখুশির ফলাফল হলো কামনা-বাসনা। আর আকলের খেয়ালখুশির ফলাফল হলো নুসুসকে অস্বীকার করা। বিকৃত করা। ইচ্ছেমতো ব্যাখ্যা করা।

যে অন্তরে আল ওয়ালা ওয়াল বারা নেই তা দূষিত, কলুষিত। অসুস্থ। এমন অন্তর মুনাফিকের অন্তর। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ
وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

‘হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের পিতা ও ভাইদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কোরো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরিকে প্রিয় মনে করে। তোমাদের মধ্য থেকে যারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই যালিম।’ [সূরা আত-তাওবাহ, ৯: ২৩]

আল্লাহ (ﷻ) আমাদের এই আয়াতে নাম ধরে ধরে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন,

لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ

‘তোমরা নিজেদের পিতা ও ভাইদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কোরো না...’

তিনি এখানে তাদের ভেতরে থাকা কুফরের কথা বলেননি, বরং প্রথমে সুনির্দিষ্টভাবে পিতা ভাই ইত্যাদি ব্যক্তির কথা বলেছেন। কারণ, কুফর কোনো আলাদা জীব না যা দুপায়ে হেঁটে বেড়ায়। কুফর থাকে মানুষের ভেতরে। যার মধ্যে কুফর থাকবে, সে যে মানুষই হোক না কেন, তাকে আউলিয়া হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। তারপর আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

إِنْ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ

‘যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে প্রাধান্য দেয়’

কেউ যদি শুধু কুফরকে ঈমানের ওপর প্রাধান্য দেয়, তাহলে তাদেরকে আউলিয়া হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। যদিও তারা আমাদের পিতা কিংবা ভাই হয়। লক্ষ্য করুন, আল্লাহ (ﷻ) বলেননি যে,

তোমরা স্বীয় পিতা ও ভাইদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ কোরো না...

যদি তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে...

যদি তারা তোমাদের হত্যা করে...

যদি তারা তোমাদের ক্ষতি করে...

তিনি (ﷻ) বলেছেন,

যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে প্রাধান্য দেয়

কেউ যদি কেবল এটুকু করে, তাহলে তাকে আউলিয়া হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। তাহলে কীভাবে কুরআনুল কারীমের এই স্পষ্ট আয়াতকে মানুষ অস্বীকার করে? এবং দাবি করে, আল্লাহ (ﷻ) শুধু মুসলিমদের সাথে যুদ্ধরত কাফিরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে বলেছেন? কেউ কীভাবে দাবি করে, আল্লাহ কাফিরদের সাথে নয় বরং কুফরের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে বলেছেন?

নিচের আয়াতটি দেখুন। ভালোভাবে দেখুন। আল্লাহ (ﷻ) বলছেন,

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُوكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَخَدَّهٖ

‘ইব্রাহীম ও তার সাথে যারা ছিল তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। তারা যখন স্বীয় সম্প্রদায়কে বলছিল, ‘তোমাদের সাথে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যা কিছুর উপাসনা করো তা হতে আমরা সম্পর্কমুক্ত। আমরা

তোমাদেরকে অস্বীকার করি। এবং উদ্রেক হলো আমাদের-তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো।” [সূরা আল-মুমতাহিনা, ৬০: ৪]

আসুন আমরা ধাপে ধাপে আগাই। আল ওয়ালা ওয়াল বারার পুরো শিক্ষার ওপর এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আয়াত। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

‘ইব্রাহীম ও তার সাথে যারা ছিল তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ।’

আল্লাহ (ﷻ) এই আয়াতে শুধু ইব্রাহীম (ﷺ)-এর কথা বলতে পারতেন। আল্লাহ বলতে পারতেন, তোমরা ইব্রাহীমের অনুসরণ করো। ইব্রাহীমের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ আছে। এ কথা তো অবশ্যই সত্য। কারণ, আমরা তাওহিদের অনুসরণ করি। আর ইব্রাহীম (ﷺ)-এর পথ হলো বিশুদ্ধ তাওহিদের পথ। এ জন্য আমরা তাওহিদের পথকে বলি ‘মিল্লাতু ইব্রাহীমা হানিফা’। ইব্রাহীম (ﷺ) তাওহিদের শিক্ষাকে পুনরুজ্জীবিতকারী এবং যমীনে তাওহিদের প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু আল্লাহ এখানে শুধু ইব্রাহীম (ﷺ)-এর কথা বলেননি। বরং তিনি বলেছেন,

‘ইব্রাহীম ও তার সাথে যারা ছিল তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ।’

এর দ্বারা আল্লাহ তাঁর এ বক্তব্যকে আরও জোরালো করেছেন। কী সেই চমৎকার আদর্শ? তারা কী উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল?

তারা যখন স্বীয় সম্প্রদায়কে বলছিল, ‘তোমাদের সাথে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যা কিছু উপাসনা করো তা হতে আমরা সম্পর্কমুক্ত।’

অর্থাৎ কুফর ও কাফিরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ। ‘বারা’। লঙ্ঘন করুন, আয়াতে এসেছে,

তোমাদের সাথে এবং তোমরা যা কিছু ইবাদত করো, তার সাথে।

কাজেই ‘কুফরকে ঘৃণা করা, কাফিরকে নয়’ এমন বলার কোনো সুযোগ আল্লাহ রাখেননি। অথচ আজকের মডার্নিস্টরা ঠিক এ কথাই দাবি করে। তারপর দেখুন ইব্রাহীম ও তাঁর অনুসারীরা কী বলেছিলেন। তারা বলেছেন,

‘আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি। এবং উদ্রেক হলো আমাদের-তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য।’

এ আয়াতে বাখ্দ্দা (بغضاء) শব্দটি এসেছে। বাখ্দ্দা অর্থ ঘৃণা। ঘৃণা কেন? ঘৃণা করার কারণ কী? কত দিন এই ঘৃণা থাকবে? কত দিন এই বিদ্বেষ বজায় থাকবে? কত কাল ধরে এই শত্রুতা জারি থাকবে?

যতদিন তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বন্ধ না করো?

যতদিন তোমরা আমাদের ভূখণ্ড ফেরত না দাও?

না, শত্রুতার কারণ আমাদের যুদ্ধ না। শত্রুতার কারণ কোনো ভূমি না। শত্রুতার কারণ ভিন্ন। এই শত্রুতা জারি থাকবে,

حَتَّى تَتُومِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ.

‘যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো।’

যতক্ষণ তোমরা আল্লাহর সাথে শিরক করবে, কুফর করবে, ততক্ষণ এই শত্রুতা জারি থাকবে। যতক্ষণ তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবে, আল্লাহর ওপর মিথ্যারোপ করবে, তাঁর দ্বীনের বিরোধিতা করবে—এই শত্রুতা জারি থাকবে। কিন্তু তোমরা যদি ইসলাম গ্রহণ করো, তাওহিদকে গ্রহণ করো, তাহলে এই শত্রুতা এক মুহূর্তে ভালোবাসায় পরিণত হবে। এটাই ইসলামের সৌন্দর্য। কাফির-মুশরিকরা যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তাদের প্রতি সকল শত্রুতা এবং বিদ্বেষ ভালোবাসায় পরিণত হবে। কিন্তু তার আগ পর্যন্ত তাদের জন্য ঘৃণা এবং শত্রুতা ছাড়া আর কিছুই বরাদ্দ নেই। কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট দলিল দেয়ার পরেও অনেকেই এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারে না।

আমাদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ ইসলামের বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত

অনেকে এ ব্যাপারটা বুঝতে পারে না। ঘৃণা নিয়ন্ত্রিত হয় কীভাবে?

হ্যাঁ, আমরা কাফির-মুশরিকদের ঘৃণা করি; কিন্তু এই ঘৃণা শরীয়াহর নিয়মাধীন। আমাদের ঘৃণার সীমানা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা নির্ধারিত। এটা পশুর মতো জান্তব ঘৃণা না। পশু যখন ঘৃণা করে তখন তারা শুধু ঘৃণাই করে এবং যুলুম করে। আমরা মানুষ, জানোয়ার নই। আমরা পশুর মতো নিয়ন্ত্রণহীন ঘৃণা ধারণ করি না। কাফির-মুশরিক এবং তাদের বিশ্বাসকে আমরা ঘৃণা করি, এটা সত্য। কিন্তু আমরা কাফির-মুশরিক প্রতিবেশীদের ওপর যুলুম করি না। আল ওয়ালা ওয়াল বারার তৃতীয় প্রকারের অধীনে আমরা এ নিয়ে আলোচনা করেছি।

এ বিষয়টা কাফির-মুশরিকরা বুঝতে পারে না। কারণ, ওরা যখন কাউকে ঘৃণা করে তখন তার আপাদমস্তক সবকিছুকেই ঘৃণা করে। আমাদের এই নিয়ন্ত্রিত ঘৃণার ধারণা তাদের কাছে একেবারেই অপরিচিত। ঘৃণার এই বিষয়টি অনেকেই ভুল বোঝে। অনেক তরুণ এটা নিয়ে প্রশ্ন করে। কাফিরদের প্রতি আমাদের এই ঘৃণা আমাদের অন্তরে থাকবে। কিন্তু দাওয়াহ ও ইহসানের বিষয়টি ভিন্ন। একজন মুসলিমের কাফির সহপাঠী থাকতে পারে, কাফির সহকর্মী থাকতে পারে, প্রতিবেশী থাকতে পারে। তাদের প্রতি সে বিদ্বেষ পোষণ করবে। তেমনি শরীয়াহর সীমারেখার মধ্য থেকে তাদের সাথে

সদাচার সে করতে পারে। আমরা ওয়ালা এবং বারার তৃতীয় প্রকারের আলোচনার সময় এ নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেছি।

কা'ব ইবনু উজরাহ (رضي الله عنه) একবার রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে দেখতে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে কিছুটা দুর্বল দেখাচ্ছিল। কাব (رضي الله عنه) উদ্ভিগ্ন হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,

‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার বাবা-মা আপনার জন্য কুরবান হোক। আপনার চেহারার এই পরিবর্তিত অবস্থা কেন?’

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উত্তর দিলেন,

ما دخل جوفي ما يدخل جوف ذات كبد منذ ثلاث

‘কলিজাওয়ালা পেটে ঢুকতে পারে এমন কোনো খাবার গত দিনে আমার পেটে ঢোকেনি।’

কা'ব (رضي الله عنه) বলেন আমি তৎক্ষণাৎ এক ইহুদীর কাছে গেলাম। সে তার উটের পালকে খাওয়ানোর জন্য কুয়া থেকে পানি তুলছিল। আমি তাকে পানি তুলতে সাহায্য করলাম। প্রত্যেক বালতির জন্য মজুরি হিসেবে সে আমাকে একটি করে খেজুর দিলো। খেজুরগুলো নিয়ে আমি ফিরে গেলাম রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জিজ্ঞাসা করলেন,

‘এগুলো তুমি কোথায় পেলে কা'ব?’ আমি তাঁকে সব বললাম।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জিজ্ঞাসা করলেন,

‘হে কা'ব, তুমি কি আমাকে ভালোবাসো?’

আমি বললাম, ‘হ্যাঁ, আমার পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক।’^[২০০]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর কাজটির—মানে ইহুদীর অধীনে গতর খেটে খেজুর নেয়ার কাজটি—অনুমোদন করলেন। আত তাবারানীসহ অনেক আলিম এ বর্ণনাকে সহীহ বলেছেন। এ রকম একটি ঘটনার বর্ণনা আলী (رضي الله عنه)-এর ক্ষেত্রেও বিশুদ্ধ সূত্রে পাওয়া যায়। আলী (رضي الله عنه) একবার এক ইহুদীর অধীনে কাজ করে পারিশ্রমিক হিসেবে খেজুর নিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে এ ব্যাপারে অভিহিত করা হলে তিনি নীরব থেকে এই কাজের অনুমোদন দিয়েছিলেন।^[২০১]

[২০০] ইমাম তাবারানী (رحمته الله), আল মু'জামুল আওসাত : ৭/১৬০, ইমাম হাইসামী (رحمته الله)-এর মতে সনদ জাযিদা-মাজমাউয যাওয়াইদ : ১০/৩১৬

[২০১] এটি সুনানু ইবনু মাজাহর ২৪৪৬ নং হাদীসে এসেছে। আল্লামা শু'আইব আরনাউত্ব (رحمته الله)-এর মতে এই সনদ অত্যন্ত দুর্বল। এই ঘটনা আরও আছে ইমাম বাইহাকী (رحمته الله), সুনানুল কুবরা : ৬/১১৯; মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং : ৬৮৭; ইমাম আবু ইয়া'লা (رحمته الله), আল মুসনাদ, হাদীস

হাসান আল বাসরী^(২০২) (ؒ)-কে একজন প্রশ্ন করেছিল, ‘কার সাথে মেয়ের বিয়ে দেবো?’ তিনি উত্তরে বলেছেন,

‘তোমার মেয়েকে এমন কারও সাথে বিয়ে দাও, যে তাকওয়াবান। যদি সে তাকে ভালোবাসে, তাহলে তাকে সম্মান করবে। আর যদি সে তাকে ঘৃণাও করে, তবুও তার ওপর যুলুম করবে না।’^(২০৩)

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য হয়। সময় সময় অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কিন্তু স্বামী যদি সত্যিকারের মুমিন হয়, তাহলে রাগের সময়, ঘৃণার সময়ও সে যুলুম করবে না। কেননা, একজন মুমিনের রাগ আর ঘৃণাও কুরআন এবং সুন্নাহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

সহজাত ভালোবাস ও ঘৃণার স্বীকৃতি ইসলাম দেয়

আল ওয়ালা ওয়াল বারার আকীদাহকে যারা বিকৃত করতে চায়, তারা আরেকটি সংশয় নিয়ে আসে। তারা বলে, ইসলামে মুসলিম পুরুষের ইহুদী বা খ্রিষ্টান নারীকে বিয়ে করার অনুমতি আছে। এটা কীভাবে সম্ভব যে, সে একই সাথে কাউকে বিয়ে করবে এবং তার প্রতি বিদ্বেষ রাখবে?

এ ধরনের প্রশ্ন এবং সংশয় যারা নিয়ে আসে, তারা আসলে আল ওয়ালা ওয়াল বারার ওপর একটা বিস্তারিত বইও পড়ে দেখেনি। এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণ কী বলেছেন, সেটাও খুঁজে দেখেনি। কোনো মুসলিম যদি কোনো কাফিরকে তার ধর্মের (অর্থাৎ কুফরের) কারণে ভালোবাসে, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। কিন্তু শর্তসাপেক্ষে সীমিত পরিমাণে কিছুটা ভালোবাসাকে ইসলামে জায়েয রাখা হয়েছে। এ ধরনের

নং : ৫০২ তো। সামগ্রিকভাবে ঘটনার ভিত্তি রয়েছে। এ ছাড়া এর ঠিক পরের হাদীসেই আলী (ؓ) বলেছেন, كُنْتُ أَذْلُو الدُّلُو بِنَمْرَةٍ، وَأَشْرَطُ أَثْنًا جَلْدَةً
‘আমি পানি উঠাতাম প্রতি বালতির বদলে একটি খেজুরের মজুরিতে। এবং এই শর্ত দিয়েছিলাম, খেজুরগুলো শুকনো হতে হবে।’ এর সনদ হাসান। এই হাদীসকে পূর্বের হাদীসের স্বপক্ষে ধরা সম্ভব। আল্লাহ্ আ’লাম।

[২০২] ইমাম হাসান বিন ইয়াসার আল বাসরি (ؒ)-এর জন্ম খলিফা উমার (ؓ)-এর শাসনকালে মদীনায় ২১ হিজরিতে। মৃত্যু ১১০ হিজরিতে বসরায়। জীবনের প্রথম অংশ তিনি মদীনাতেই কাটান এবং বহু সাহাবী থেকে ইলম অর্জন করেন। সিফফিনের যুদ্ধের পর তাঁর পরিবার বসরায় চলে গেলে তিনিও বসরায় চলে যান। সাহাবীদের কাছে তাঁর মর্যাদার পরিচয় পাওয়া যায় এই ঘটনায়, একবার আনাস (ؓ)-কে একটা মাস’আলা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেন, سلوا مولانا الحسن
‘তোমরা মাওলানা আল হাসানকে জিজ্ঞেস করো।’-ইমাম ইবন সা’দ (ؒ), আত তাবাকাত : ৭/১৭৬

[২০৩] ইমাম তাকিউদ্দীন আব্দুল মালিক আশ-শাফে’ঈ (ؒ), নুযহাতুন নাযিরিন ফিল আখবার ওয়াল আসার আল মারউইয়্যাহ আনিল আনবিয়া ওয়া সালিহিন, পৃষ্ঠা : ৩২৫

ভালোবাসাকে বলা হয় আল হুবুল ফিতরি আল মওয়ুদ ফী যাতিল ইনসান (الحب الفطري الموجود في ذات الإنسان)। এটাকে ফিতরাতি বা সহজাত ভালোবাসা বলা যেতে পারে। এ ধরনের ভালোবাসা শুধু কাফির স্ত্রীর জন্য না, বরং কাফির আত্মীয়দের ক্ষেত্রেও হতে পারে। যেমন কেউ ইসলাম গ্রহণ করল, কিন্তু তাঁর মা-বাবা অথবা ভাই-বোন কাফির। আসমা বিনতে আবু বাকর (رضي الله عنه) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে জানতে চাইলেন,

إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا؟

‘আমার মা আমার কাছে এসেছেন। তিনি মুশরিক এবং দীন গ্রহণে অনাগ্রহী। আমি কি তার সাথে ভালো ব্যবহার করব?’

কেন তিনি এ প্রশ্ন করলেন? কারণ, তাঁর মধ্যে আল ওয়ালা ওয়াল বারা ছিল। তিনি জানতেন, ঈমানের দাবি হলো কাফির-মুশরিকদের সাথে বৈরিতা রাখা। কিন্তু মায়ের ক্ষেত্রে এর কোনো ব্যতিক্রম আছে কি না সেটাই তিনি জানতে চাচ্ছিলেন।

তাই তিনি প্রশ্ন করেছিলেন,

أَفَأَصِلُهَا؟

আমি কি তার সাথে ভালো ব্যবহার করব?

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন,

نَعَمْ صَلِّ عَلَيْهَا

‘হ্যাঁ। তার সাথে উত্তম আচরণ করবে।’[২০৪]

এই ঘটনার প্রেক্ষাপটেই আল্লাহ (ﷻ) সূরা মুমতাহিনার আট নম্বর আয়াত নাযিল করেন।

لَا يَنْهٰكُمْ اَللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اَللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

‘ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিস্কৃত করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালোবাসেন।’

[সূরা আল-মুমতাহিনা, ৬০: ৮]

আর এই আয়াতটিকেই ওয়ালা এবং বারার তৃতীয় প্রকারের আলোচনায় প্রধানতম

দলিল হিসেবে আমরা আলোচনা করেছি।

কিতাবিয়াহদের (كِتَابِيَّة), অর্থাৎ ইহুদী অথবা খ্রিষ্টান স্ত্রী, অথবা কাফির বাবা-মায়ের প্রতি মানুষের মধ্যে যে অনুভূতি কাজ করে তা হলো সহজাত ভালোবাসা। মানুষের যেমন সহজাত ভালোবাসা রয়েছে তেমনি সহজাত ঘৃণাও রয়েছে। ইসলাম দুটিকেই স্বীকৃতি দিয়েছে।

আল্লাহর শরীয়াহর কথা চিন্তা করুন। কেউ যদি আল্লাহর শরীয়াহর বিধানকে ঘৃণা করে—কারণ আল্লাহ তা প্রণয়ন করেছেন—তাহলে সেটা হবে কুফর। যা ওই ব্যক্তিকে দ্বীন থেকে বের করে দেবে। অন্যদিকে দ্বীনের কিছু বিধান আছে যেগুলো মানুষের কাছে অপছন্দনীয়, এটা আল্লাহ (ﷻ) আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ

‘তোমাদের ওপর কিতালের বিধান দেয়া হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়।’ [সূরা আল বাক্বারাহ, ২: ২১৬]

আল্লাহ (ﷻ) এখানে বলছেন,

كُرْهٌ لَّكُمْ

‘তোমাদের কাছে তা অপছন্দনীয়’

এখানে তিনি বিশ্বাসীদের কথা বলছেন। মুমিনদের কথা বলছেন। আল্লাহ জিহাদ ফরয করেছেন, কিন্তু মানুষ তা অপছন্দ করে। এই অপছন্দ করাটা ফিতরাতি। এটা দ্বীনের দিক থেকে অপছন্দ না। আল্লাহ জিহাদ ফরয করেছেন, এই কারণে যদি কেউ জিহাদকে অপছন্দ করে, তাহলে সে কাফির। কিন্তু এখানে এ ধরনের অপছন্দের কথা বলা হচ্ছে না।

আল-কুরতুবি (رحمته) বলেছেন, মানুষ জিহাদকে অপছন্দ করে কারণ জিহাদের জন্য পরিবার-পরিজন ছেড়ে, নিজ এলাকা থেকে দূরে যেতে হয়। জিহাদে আঘাত, ক্ষত, পঙ্গুত্ব এবং মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে। তাই মানুষ জিহাদ অপছন্দ করে। এটা মানুষের ফিতরাত। সে এমন জিনিস অপছন্দ করে যা তাকে পরিবার-পরিজন থেকে দূরে নিয়ে যায়, তার জীবনে অনিশ্চয়তা নিয়ে আসে, যার কারণে তার ক্ষতি বা মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে। এই সহজাত অপছন্দের স্বীকৃতি ইসলাম দেয়। ইসলাম যে সহজাত ভালোবাসা বা ঘৃণার স্বীকৃতি দিয়েছে তার আরেকটি উদাহরণ হলো নিচের হাদীস। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ

‘কষ্ট থাকার পরও ভালোভাবে ওয়ু করা।’^[২০৫]

কোনো কোনো সময় ওয়ু করতে আলসেমি আসে, ভালো লাগে না। হাড় কাঁপানো শীতের মধ্যে ঘুম থেকে উঠে ওয়ু করতে কারও ভালো না লাগতেই পারে। এটা সহজাত অপছন্দ। যে এমন করতে অপছন্দ করে, তার অপছন্দের কারণ হলো এ কাজটা করা কষ্টকর। আল্লাহ এই বিধান দিয়েছেন, এই কারণে সে অপছন্দ করে না। কাজেই ইসলাম সহজাত ভালোবাসা ও সহজাত ঘৃণা, দুটোরই স্বীকৃতি দিয়েছে। কোনো মুসলিম যদি ইহুদী বা খ্রিষ্টান নারীকে বিয়ে করে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তার মধ্যে স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা কাজ করবে। এটা সহজাত ভালোবাসা।

‘সহজাত ভালোবাসা’ আর শরীয়াহর ‘আল ওয়ালা ওয়াল বারা’ এর নীতি সাংঘর্ষিক না। চাচা আবু তালিবের প্রতি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ভালোবাসার কথা একবার চিন্তা করুন। আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

‘নিশ্চয় তুমি যাকে ভালোবাসো তাকে তুমি হিদায়াত দিতে পারবে না; বরং আল্লাহই যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দেন।’ [সূরা আল ক্বাসাস, ২৮: ৫৬]

মুফাসসিরদের একটি মত অনুযায়ী এখানে ‘তুমি যাকে ভালোবাসো তাকে তুমি হিদায়াত দিতে পারবে না’, দ্বারা আবু তালিবকে বোঝানো হচ্ছে। আবু তালিবের প্রতি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর এই ভালোবাসা হলো সহজাত ভালোবাসা। কাফির পিতামাতা, ভাইবোন কিংবা স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা হলো এ ধরনের সহজাত ভালোবাসা।

মুফাসসিরগণের আরেকটি মত হলো, ভালোবাসার উদ্দেশ্য এখানে আবু তালিবের হিদায়াত। এখানে ব্যক্তি না, বরং হিদায়াত মুখ্য। অর্থাৎ এ আয়াতে বলা হচ্ছে, তুমি যার হিদায়াত ভালোবাসো (যার হিদায়াত হোক তা আকাঙ্ক্ষা করো), তার জন্য হিদায়াত দিতে পারবে না। আমাদের কাছে এই মতটিকেই অপেক্ষাকৃত সঠিক মনে হয়েছে। কিন্তু আমরা যদি প্রথম মতটিও গ্রহণ করি, তাহলে দেখব এখানে সহজাত ভালোবাসার কথা বলা হচ্ছে। এ ভালোবাসা অমুসলিম আত্মীয়দের প্রতি সহজাত

[২০৫] সহীহ বুখারী, হাদীস নং : ২৫১; সুনানুত তিরমিযি, হাদীস নং : ৫১, এটি একটি হাদীসের অংশবিশেষ। হাদীসটি হলো, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, لَا أَذْلُكُمْ عَلَى مَا يَمْخُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ‘আমি কি তোমাদেরকে বলব না যে আল্লাহ তা’আলা কি দিয়ে গুনাহ মুছে দেন এবং মর্যাদা বাড়িয়ে দেন?’ সাহাবাগণ বললেন, ‘হ্যাঁ আল্লাহর রাসূল, হ্যাঁ বলে দিন।’ তিনি তখন বললেন, إِنْ شَاءَ الْوُضُوءُ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخَطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكَ الرِّبَاطُ ‘কষ্ট থাকার পরও ভালোভাবে ওয়ু করা, মসজিদে বেশি বেশি যাতায়াত করা এবং এক সালাত শেষ করে পরবর্তী সালাতের জন্য অপেক্ষায় থাকা। আর এটাই হলো রিবাত।’

ভালোবাসা।

মা অত্যন্ত কষ্ট করে সন্তান জন্ম দেন, বাবা সন্তান লালনপালনের ব্যয়ভার বহন করেন—কাজেই তাদের প্রতি ভালোবাসা থাকা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু মনে রাখতে হবে, সহজাত ভালোবাসার কারণে তাদের শিরক বা কুফর মেনে নেয়া যাবে না। এগুলো অবশ্যই ঘৃণা করতে হবে। মুসলিম সন্তান গিয়ে তার কাফির পিতামাতার ক্রুশ গলায় ঝোলাবে না। তাদের ক্রুশ হাতে করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাবে না। কিংবা তাদের ধর্মীয় উৎসবের দিনে তাদের সাথে অংশগ্রহণ করবে না, এগুলো মেনে নেবে না। খাবার টেবিলে তারা যিশুখ্রিষ্টের কাছে প্রার্থনা শুরু করে দিলে সে ওখানে বসে থাকতে পারবে না। সেখান থেকে উঠে চলে যেতে হবে। তারা যখন কুফর ও শিরক করছে তখন সে উপস্থিত থাকতে চায় না। সে চায় না আল্লাহর অভিশাপ তার ওপর আসুক।

সহজাত ভালোবাসা থাকবেই, তবে প্রাধান্য পাবে শরীয়াহগত ভালোবাসা। প্রাধান্য পাবে ওয়ালা এবং বারা। পিতামাতার প্রতি আমাদের মনে ভালোবাসা থাকবে; কিন্তু আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা আরও শক্তিশালী, আরও ব্যাপক, আরও গুরুত্বপূর্ণ। যখন সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার মুখোমুখি এসে দাঁড়াবার চেষ্টা করবে তখন মুমিনের মনে সব সময় আল্লাহর প্রতি চূড়ান্ত ভালোবাসা, চূড়ান্ত আনুগত্য বিজয়ী হবে এবং সহজাত ভালোবাসার সব চিহ্ন মুছে ফেলবে। এটাই হলো আল ওয়ালা ওয়াল বারা।

আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সুলুলের ছেলের দৃষ্টান্ত

একজন সাহাবীর কথা দিয়ে আলোচনা শেষ করা যাক। সহজাত ভালোবাসার পুরো ব্যাপারটা এ ঘটনা থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়। মদীনাতে মুনাফিকদের সর্দার ছিল আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই। তার এক ছেলে ছিল। ছেলের নামও আব্দুল্লাহ (ﷺ)। এই ছেলে ছিলেন প্রথম সারির একজন সাহাবী।

বনু মুস্তালিকের যুদ্ধের সময় আব্দুল্লাহ বিন উবাই সাহাবীদের মধ্যে একটু মতানৈক্য দেখতে পেল। মুসলিমদের মধ্যে ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে উম্মাহকে বিপদে ফেলা মুনাফিকদের চিরাচরিত কাজ। সুযোগ দেখামাত্র আব্দুল্লাহ বিন উবাই তা কাজে লাগাতে চাইলো। সূরা মুনাফিকুনে সেই সময়ের ঘটনাগুলো আল্লাহ তুলে এনেছেন। আল্লাহ (ﷻ) আমাদের জানাচ্ছেন, আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই দস্তভরে বলছিল,

لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ

‘যদি আমরা মদীনাতে ফিরে যাই, তাহলে অবশ্যই সেখান থেকে সম্মানিতজন

হীনজনকে বহিষ্কৃত করবো।’

এখানে সম্মানিতজন বলতে আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই নিজেই বোঝাচ্ছিল আর হীন ব্যক্তি বলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বুঝিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কানে এ কথা পৌঁছালে তিনি মুনাফিকদের ডেকে পাঠান এবং এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেন। একের পর এক মুনাফিকরা মিথ্যে কসম খেয়ে গেল, ‘না! এ রকম কথা কেউ কখনো বলেইনি।’ অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহই অবগত। তাই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বাহ্যিক অবস্থা দেখে বিচার করলেন। এখানে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা আছে। আমরা বাহ্যিক বা আপাত অবস্থা দেখে বিচার করি। মানুষের অন্তরে কী আছে না আছে সেটা নিয়ে চিন্তা করা আমাদের কাজ না।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুনাফিকদের ছেড়ে দিলেন। তখন তাঁর কাছে আসলেন আব্দুল্লাহ (রাঃ), অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইয়ের ছেলে। তিনি এসে কী বললেন, লক্ষ করুন। তিনি বললেন,

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُرِيدُ قَتْلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَيْمًا بَلَغَكَ عَنْهُ، فَإِنْ كُنْتُ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَمُرْنِي بِهِ، فَأَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ رَأْسَهُ، فَوَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ الْخَزْرَجَ مَا كَانَ لَهَا مِنْ رَجُلٍ أَبْرَ بِوَالِدِهِ مِنِّي

‘ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি খবর পেয়েছি আপনার কাছে আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের ব্যাপারে যে সংবাদ পৌঁছেছে সে মোতাবেক আপনি তাকে হত্যা করতে চান। যদি আসলেই তাকে হত্যা করেন, তাহলে আমাকে আদেশ করুন। আমি তার মাথা কেটে আপনার কাছে নিয়ে আসব। কেননা, আল্লাহর কসম! খায়রাজ গোত্র অবশ্যই জানে যে, তাদের মাঝে পিতার প্রতি সদ্যবহারে আমার চেয়ে অগ্রগণ্য কেউ নেই!’ [২০৬]

আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ছিল মুনাফিকদের সর্দার। আর তার ছেলে এই কথা বলছেন! পুত্র বলছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আপনি অনুমতি দিন, আমি আমার পিতার মাথা কেটে আপনার সামনে এনে রাখি। এটা হলো আল ওয়ালা ওয়াল বারা। এই সাহাবীর মধ্যে সহজাত ভালোবাসা ছিল, কিন্তু তা আল ওয়ালা ওয়াল বারার জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।

[২০৬] ইমাম ইবন হিশাম (রাঃ), আস সিরাতুন নাওয়াউইয়্যাহ : ২/২৯৩; এটি হাদীস গ্রন্থগুলোতেও সহীহ সনদে এসেছে, সেখানে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেছেন, لَا تُبْنِي لَكَ شَيْئًا لَأَتَيْتَكَ بِرَأْسِهِ

‘ইয়া রাসূলুল্লাহ, যে আল্লাহ আপনাকে সম্মানিত করেছেন তাঁর কসম করে বলছি। যদি আপনি চান তাহলে আমি অবশ্যই তার মাথা কেটে এনে আপনাকে দেবো।’-সহীহ ইবনু হিব্বান, হাদীস নং : ৪২৮; ইমাম হাইসামী (রাঃ)-এর মতে এর রিজাল সিকাত। (মাজমাউয যাওয়াইদ : ৯/৩২১)। আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রাঃ)-এর মতে সনদ হাসান। (আস সিলসিলাতুস সহীহাহ : ৭/৬৭৭)

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন তাঁকে এমন করতে নিষেধ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন,

بَلْ تَتَرَفَّقُ بِهِ، وَنُحْسِنُ صُحْبَتَهُ مَا بَقِيَ مَعَنَا

‘আমরা তার সাথে উত্তম আচরণ করব, যতদিন সে আমাদের মাঝে জীবিত থাকবে।’

এটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দয়া এবং বিচক্ষণতার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। মদীনায়ে ফেরার সময় আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইয়ের ছেলে তার পিতাকে হুমকি দিলো,

‘রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অনুমতি দেয়ার আগে মদীনায়ে পা দেয়া তো দূরের কথা, তুমি মদীনার ছায়াও ঘেঁষবে না! তুমি হচ্ছে হীন ব্যক্তি আর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হচ্ছেন সম্মানিতজন।’

এরপর তিনি (ﷺ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইকে নিরাপদে তার বাসায় ফেরার অনুমতি দিলেন এবং আব্দুল্লাহ (ﷺ)-কে তাঁর পিতার কোনো ক্ষতি করতে নিষেধ করলেন।^[২০৭]

সহজাত ভালোবাসা আর আল ওয়ালা ওয়াল বারা কীভাবে সহাবস্থান করে, এটা হলো তার প্রমাণ। এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এসেছে আরেকটি বর্ণনায়।

فَوَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ الْخَزْرَجُ مَا كَانَ لَهَا مِنْ رَجُلٍ أَبْرَ بِوَالِدِهِ مِنِّي، وَإِنِّي أَحْسَى أَنْ تَأْمُرَ بِهِ غَيْرِي فَيَقْتُلَهُ، فَلَا تَدْعُنِي تَفْسِي أَنْظُرُ إِلَى قَاتِلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِشٍ فِي النَّاسِ، فَأَقْتُلُهُ فَأَقْتُلَ مُؤْمِنًا بِكَافِرٍ، فَأَذْخُلَ النَّارَ،

আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইয়ের ছেলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট গিয়ে বললেন, ‘আল্লাহর কসম, খায়রাজ গোত্রের লোকেরা জানে তাদের মাঝে এমন কোনো লোক নেই, যে তার পিতার প্রতি আমার চেয়ে অধিক সন্মত থাকবে। আমার আশঙ্কা হয় আপনি যদি অন্য কাউকে তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেন এবং সে হত্যা করেই ফেলে, তাহলে আমি হয়তো আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইয়ের হত্যাকারীকে মানুষের মাঝে চলাচল করতে দেখে নিজেকে সামলাতে পারব না। আমি হয়তো তাকে হত্যা করে ফেলব। ফলে একজন কাফিরের জন্য একজন মুমিনকে হত্যা করে আমি জাহান্নামে চলে যাব।’^[২০৮]

খেয়াল করে দেখুন, এই মহান সাহাবী (رضي الله عنه) এখানে ‘আমার পিতার হত্যাকারী’ বলেননি, বরং তিনি নাম ধরে বলেছেন ‘আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইয়ের হত্যাকারী’। তিনি আশঙ্কা করছিলেন, অন্য কোনো মুসলিম তাঁর পিতাকে হত্যা করলে সহজাত ভালোবাসার কারণে তিনি হয়তো প্রতিশোধ নিয়ে ফেলবেন। হয়তো মদীনাতে সেই

[২০৭] ইমাম তাবারি (رحمته الله)، জামিউল বায়ান : ২৩/৪০৩

[২০৮] ইমাম ইবন হিশাম (رحمته الله)، আস সিরাতুন নাওয়াউইয়াহ : ২/২৯৩

মুসলিমকে দেখার পর রাগের মাথায় তিনি তাঁকে আক্রমণ করে বসবেন। তিনি কোনো মুমিনকে হত্যা করতে চান না। তাই বলছেন, আমাকে এই দায়িত্ব দিন। আমি নিজ হাতে তাকে হত্যা করব।

সহজাত ভালোবাসা এবং শরীয়াহগত ভালোবাসা এই দুই ভালোবাসার সহাবস্থানের খুব চমৎকার উদাহরণ এটি। ইসলাম দুটিকেই স্বীকৃতি দিচ্ছে। কিন্তু দিনশেষে সহজাত ভালোবাসার ওপরে প্রাধান্য পাবে আল ওয়ালা ওয়াল বারা। যখন সহজাত ভালোবাসা এবং শরীয়াহগত ভালোবাসা মুখোমুখি দাঁড়াবে—তখন সব সময় মুমিনের মনে আল্লাহর প্রতি চূড়ান্ত ভালোবাসা, চূড়ান্ত আনুগত্য বিজয়ী হবে এবং সহজাত ভালোবাসার সব চিহ্ন মুছে ফেলবে। এটাই হলো আল ওয়ালা ওয়াল বারা।

উপসংহার

ওয়ালা এবং বারা নিয়ে আলোচনার এখানেই ইতি টানতে হচ্ছে। আরও অনেক কিছু বলার ছিল, অনেক বিষয়ে আলোচনা করার ইচ্ছে ছিল; কিন্তু এখানে সুযোগ সীমিত। আল্লাহ (ﷻ) যদি সময় করে দেন এবং পরিস্থিতির উন্নতি হয়, তাহলে আমি আল ওয়ালা ওয়াল বারার ওপর একটি স্বতন্ত্র কোর্স নেয়ার ইচ্ছা রাখি।

কয়েক সপ্তাহ আগে, কাফিরদের সাথে পার্থক্য বজায় রাখার ব্যাপারে যে হাদীসগুলো আছে সেগুলোর একত্র করার চেষ্টা করছিলাম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অনেক হাদীসে আমাদেরকে অন্য ধর্মাবলম্বীদের মতো হতে নিষেধ করেছেন। এটি ওয়ালা এবং বারার একটি অংশ। যেমন হাদীসে এসেছে, অমুকদের চেয়ে আলাদা হও, দাড়ি রাখো। এ বিষয়ের ওপর যে হাদীসগুলো কুতুবে সিত্তাহয় এসেছে সেগুলো একত্র করেছিলাম। পাশপাশি মুস্তাদরাক আল হাকিম, মুসান্নাফ ইবনু আবি শায়বা এবং মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক থেকেও এ বিষয়ের হাদীসগুলো আলাদা করেছিলাম। এ নয়টি সংকলন থেকে মোটামুটি ৪৫ থেকে ৪৭টি হাদীস আমি পেয়েছি যেখানে বলা হয়েছে, তোমরা অন্য ধর্মাবলম্বীদের থেকে আলাদা হও। স্বতন্ত্র হও। এবং অন্য ধর্মের অনুসারীদের চেয়ে আলাদা হওয়া আল ওয়ালা ওয়াল বারার একটি নীতি।

এই হাদীসগুলোর মধ্যে অনেকগুলোতে আকীদাহর কথা এসেছে। অর্থাৎ আকীদাহর দিক থেকে তাদের চেয়ে ভিন্ন হও। কিন্তু এমন অনেক হাদীস আছে যেখানে প্রচলন, অভ্যাস বা স্বভাব (آداب), ইসলামী আচরণ, ঐতিহ্য বজায় রাখার কথা এসেছে। এমনকি বাহ্যিকভাবে, পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও তাদের চেয়ে আলাদা হতে বলা হয়েছে। অন্য ধর্মাবলম্বীদের চেয়ে আলাদা হওয়া আল ওয়ালা ওয়াল বারার অংশ। আর ওয়ালা এবং বারা মুসলিমদের স্বকীয়তা রক্ষার ঢালস্বরূপ। মুসলিমরা যদি কাফির-মুশরিকদের মতো হয়ে যায়, তাহলে নিজেদের স্বকীয়তা রক্ষা করবে কীভাবে?

কাফির-মুশরিকদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা যাবে না, এর মানে এই না যে কাফির-মুশরিকদের সাথে আমাদের সহাবস্থান চলবে না; বা কাফির-মুশরিকরা আমাদের অধীনে বসবাস করতে পারবে না। আহলুয যিম্মা তো মুসলিমদের অধীনেই বসবাস করে। তারা আমাদের সাথে বসবাস করতে পারবে; কিন্তু আমাদের নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রাখতে হবে, তাদের অনুসরণ করা যাবে না। স্বকীয়তা বজায় রাখার ব্যাপারটিকে হালকাভাবে নিলে পরিণতি কতটা ভয়াবহ হতে পারে তা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। আমরা স্বকীয়তা বজায় না রাখলে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম কাফির হিসেবে বেড়ে উঠবে।

তো এ বিষয়ের ওপর ৪৫টির মতো হাদীস আমি একত্র করেছি। এর মধ্যে কিছু হলো একই হাদীসের বা একই ধরনের হাদীসের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা। কিন্তু মূল পয়েন্ট হলো, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন কোনো কিছু বারবার বলেন, যখন সেটা চল্লিশের বেশি হাদীসে আসে তখন এর গুরুত্ব নিয়ে আর প্রশ্ন তোলার সুযোগ থাকে না। এটি আল ওয়ালা ওয়াল বারার একটি মূলনীতি। কিন্তু এ যুগের মুনাফিকরা এবং ইন্টারফেইথের লোকজন আমাদেরকে বলে, ‘কাফির-মুশরিকদের মতো হও’। আস্তঃধর্মীয় কার্যকলাপের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো বিশ্বাসের অনুসারীর মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করা। পার্থক্য দূর করা। ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাসের মধ্যে সেতুবন্ধন আবার কীভাবে হয়? আল্লাহ (ﷻ) কি এই আয়াত নাযিল করেননি?

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

‘তোমাদের পথ ও পন্থা তোমাদের জন্য (সে পথে চলার পরিণতি তোমাদেরকেই ভোগ করতে হবে); আর আমার জন্য আমার পথ (যে সত্য পথে চলার জন্য আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, এ পথ ছেড়ে আমি অন্য কোনো পথ গ্রহণ করতে মোটেই প্রস্তুত নই)’ [সূরা আল কাফিরুন, ১০৯: ৬]

কাফির-মুশরিকরা তাদের আস্তঃদীন নিয়ে থাকুক, তাদের এই দীন একদিন তাদেরকে জাহান্নামের স্থালানিতে পরিণত করবে। আমাদের দীন আমাদের কাছে। ইন শা আল্লাহ আমাদের এই দীন একদিন আমাদের জান্নাতে পৌঁছে দেবে। তাই আমরা আমাদের স্বকীয়তা ও আত্মপরিচয় বজায় রাখব। কাফিরদের চেয়ে আলাদা হব। আমাদের দীন ও ঈমানকে আচ্ছাদিত করে রাখব আল ওয়ালা ওয়াল বারার বর্মে।

আলহামদুলিল্লাহ ‘উসুলুস সালাসাহ’ পুস্তিকার দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচনা এই দারসের মাধ্যমে শেষ হলো।

(দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত)

